Contents

ইযহারুল হক

(সত্যের বিজয়)

প্রথম খণ্ড

আল্লামা রাহমাতুল্লাহ
ইবন খলীলুর রাহমান কীরানবী

ইযহারুল হক

(সত্যের বিজয়)

[খৃস্টধর্মের আলোচনায় প্রামাণ্য গ্রন্থ]

প্রথম খণ্ড

মূল
বহুধর্মতত্ত্ববিদ আল্লামা
রাহমাতুল্লাহ ইবন খলীলুর রাহমান কীরানবী

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
অনূদিত
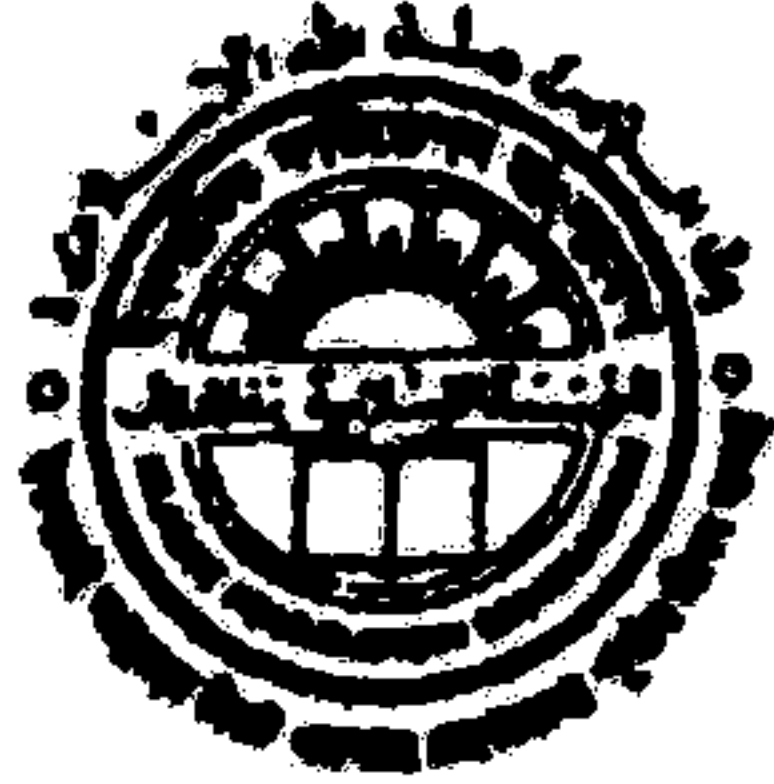
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইযহারুল হক (সত্যের বিজয়) [প্রথম খণ্ড]
মূল : আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবী (র)
অনুবাদ : ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
সম্পাদনা : মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৫৬
অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৩২৪
ইফাবা প্রকাশনা : ২৪৩৭
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯১
ISBN : 984-06-1160-7
প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর : ২০০৭
কার্তিক : ১৪১৪
শাওয়াল : ১৪২৮
মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান
প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪
প্রুফ সংশোধন : আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
বর্ণবিন্যাস
ঝিঙেফুল
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (৩য় তলা), ঢাকা–১১০০
প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দীন
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১
(মূল্য ৪৫০ টাকা মাত্র)

IJHARUL HAQ (Victory of Truth) [Vol. 1] Written by Allama Rahmatullah Ibn Khalilur Rahman Keranvi in Arabic and translated by Dr. Khandker Abdullah Jahangeer into Bangla and published by Director, Translation and Compailation Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka– 1207.

October 2007

Website : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

মহাপরিচালকের কথা

ইসলামই মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত একমাত্র ধর্ম। আর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমেই এ ধর্মকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল। এটা সর্বজন বিদিত যে, ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই যুগে যুগে অমুসলমানেরা এ শাশ্বত দীন এবং এর প্রবর্তক মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে নানাভাবে বিরোধিতা করে আসছে।

১৭৫৭ সালের পর হতেই উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের বেদনাদায়ক অবসানের পর ইংরেজ শাসন শুরু। আর এ বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর ছত্রচ্ছায়ায় খ্রিস্টান মিশনারীরাও এ উপমহাদেশে তাদের মিশনারী কার্যক্রম জোরদার করে। উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় দশকে সুইজারল্যান্ডে। খ্রিস্টধর্মের যোগ্য প্রচারক সৃষ্টির মানসে 'বাসেল মিশনারী সেমিনারী' নামে একটি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রে খ্রিস্টধর্মীয় মতবাদের সাথে সাথে আরবী ভাষা, পবিত্র কুরআন, ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামের ইতিহাসও শিক্ষা দেয়া হতো। এ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মিশনারীরা সাধারণ মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে পুস্তক-পুস্তিকা এবং সভা-সমিতির মাধ্যমে জোর তৎপরতা চালাতে থাকে।

মিশনারীদের এ তৎপরতা এ উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে শুরু হয়, যার ফলে দুর্বল ঈমানের মুসলমানদের পক্ষে ঈমান রক্ষা করা এবং ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। মুসলমানদের এ চরম দুর্দিনে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ ইবন খলীলুর রহমান কীরানবী (র) যেন মহান আল্লাহ্র রহমত হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি দিল্লীর নিকটবর্তী মুজাফফর নগর জেলার কীরানা নামক স্থানে মার্চ ১৮১৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। বক্তৃতা, বিতর্ক ও লেখনীর মাধ্যমে তিনি ইসলামের শাশ্বত বাণীকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন এবং খ্রিস্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের বেশিরভাগ জবাব তিনি তাদেরই ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের উদ্ধৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করে বিস্ময়করভাবে মিশনারী অপতৎপরতা প্রতিহত করেন।

আল্লামা কীরানবী (র) মিশনারীদের এই অপতৎপরতার জবাব সম্বলিত 'ইযহারুল হক' (সত্যের বিজয়) শীর্ষক আরবী ভাষায় একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থখানি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত এ গ্রন্থটি পাঠক মহলে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাভাষী সুধী পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দেয়ার উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ গ্রন্থখানি বাংলায় অনুবাদের উদ্যোগ

গ্রহণ করে। অনুবাদ করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিশিষ্ট আলিম ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর এবং সম্পাদনা করেছেন ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের সাবেক পরিচালক মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী। গ্রন্থটি পাঠে সুধী পাঠকবৃন্দ দীন হিসেবে অন্যান্য সকল ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকেও উপলব্ধি করতে পারবেন।

আমি গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। মহান আল্লাহ্ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমিন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর খ্রিস্টান শাসকদের ছত্রছায়ায় খ্রিস্টান মিশনারিগণ ও পূর্ণোদ্যম ত্রিত্ববাদের প্রচার শুরু করে। শুধু প্রচারই নয়; ছলে বলে কৌশলে এ উপমহাদেশে খ্রিস্টধর্মের প্রসার ঘটানোর জন্য তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ব্যাপটিস্ট মিশনারীর পক্ষে উইলিয়াম কেরী কলকাতায় আগমন করেন। এর পর শুরু হয় বহুমুখী তৎপরতা। অগণিত মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা, মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস করা, ইসলামী শিক্ষার জন্য ওয়াকফকৃত সম্পত্তি জবর দখল, ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে মূল শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামী শিক্ষা অপসারণ, ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেয়া, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে ইসলাম বিরোধী বিকৃত তথ্য উপস্থাপন এবং গোলাম মুহাম্মদ কাদিয়ানী ও অন্যান্য ভণ্ড ধর্মপ্রচারককে সাহায্য করে ইসলামের শিক্ষাকে বিকৃত করার অপচেষ্টা করা। সর্বোপরি ইসলাম, কুরআন মজীদ ও মহানবী (সা)-এর কুৎসা রটনা করে বাংলা উর্দু-ফারসী ভাষায় ছাপিয়ে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া এসব জঘন্য অপতৎপরতারই খণ্ড চিত্র। এরই সঙ্গে খ্রিস্ট ধর্মীয় প্রচারক মিঃ কার্ল গোটালেব ফান্ডার ১৮২৯ সালে খ্রিস্টান পাদরীদের গতানুগতিক মিথ্যাচার, তথ্য বিকৃতি, অপপ্রচার ও বিষোদগার সম্বলিত মীযানুল হক (Scale of Truth) নামক একটি পুস্তক রচনা করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চতুর্মুখী আক্রমণ পরিচালনা করেন। মূল পুস্তকটি জার্মান ভাষায় রচিত হলেও এর উর্দূ ফারসী অনুবাদ করে এ উপমহাদেশের মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে থাকেন। এমনকি তারা এও দাবি করতে থাকেন যে, এ পুস্তকের যুক্তিগুলো খণ্ডন করার সাধ্য কোন মুসলমান আলিমের নেই।

মুসলমানদের এ দুর্দিনে এ উপমহাদেশে একজন বিশিষ্ট আলিম বহু ধর্মতত্ত্ববিদ আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবী (র) মি. ফান্ডার সহ খৃস্টান ধর্ম-প্রচারকদের প্রকাশ্য বিতর্কের এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলে মি. ফান্ডার এতে শর্তারোপ করেন যে, বিতর্কে পরাজিত হলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন। পক্ষান্তরে আল্লামা কীরানবী (র) পরাজিত হলে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবেন। পাঁচজন বিশিষ্ট বিচারক এবং অসংখ্য শ্রোতার উপস্থিতিতে তিনদিন এ বিতর্ক চলার কথা থাকলেও মি. ফান্ডার ও তাঁর দলবল পরপর দুদিন বিতর্কে পরাজিত হয়ে তৃতীয় দিন কিছু অযৌক্তিক শর্তারোপ করে বিতর্ক বন্ধ করে দেন।

শুধু ভারতীয় উপমহাদেশেই নয়, এর পর মি. ফান্ডার খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য তুরস্কে যান। কিন্তু তুরস্ক সরকারের আমন্ত্রণে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবী (র) তুরস্কে গেলে

মি. ফান্ডার গোপনে সেখান থেকে পলায়ন করেন। দুই খণ্ডে সমাপ্ত "ইযহারুল হক" শীর্ষক পুস্তকটি মীযানুল হক-এর জবাবে লিখিত হয়েছে। পুস্তকটিতে মূল খ্রিস্টান পাদ্রীদের অপপ্রচারের জবাব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়েই দেয়া হয়েছে। আল্লামা কীরানবী (র)-এর বৈশিষ্ট্য এখানেই।

বাংলাভাষী পাঠকগণ যাতে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের বিভ্রান্তিকর মিথ্যা অপপ্রচারের স্বরূপ বাইবেলের উদ্ধৃতি থেকেই অনুধাবন করতে সক্ষম হন, এ প্রত্যাশা নিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বইটির অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অনুবাদ করেছেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশিষ্ট আলিম ও পণ্ডিত ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ও প্রুফ সংশোধন করেছেন ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের সাবেক পরিচালক বিশিষ্ট আলিম লেখক ও সম্পাদক জনাব আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী। মহান আল্লাহ মরহুম লেখক, এর অনুবাদক ও সম্পাদক এবং পুস্তকটি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

পুস্তকটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয় খণ্ডটিও স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই প্রকাশ করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশাবাদী। বাংলাভাষী বিজ্ঞ পাঠক মহল পুস্তকটি পাঠে কিঞ্চিৎ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সফল হয়েছে মনে করব।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক দীন বুঝার তৌফিক দিন। আমিন।

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদক ও সংকোলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদকের আরয

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর নিমিত্ত। সালাত ও সালাম মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, বংশধর, সাহাবীগণ ও অনুসারীদের উপর।

অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন : "আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা ডাকে (ইবাদত করে) তাদেরকে তোমরা গালি দিও না" (সূরা আন'আম : ১০৮)। তিনি আরো বলেন : "তোমরা উত্তম ও সৌজন্যময় পন্থা ব্যতীত কিতাবীগণ (ইহূদী-খৃস্টানগণ)-এর সাথে বিতর্ক করো না, তবে তাদের সাথে করতে পার যারা তাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘন করে" (সূরা আনকাবূত : ৪৬)।

খৃস্টান প্রচারকদের সীমালঙ্ঘনের প্রেক্ষাপটেই 'ইযহারুল হক' রচিত। খৃস্টধর্মের ধর্মগ্রন্থ, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় ইতিহাস এবং ইসলাম, কুরআন, হাদীস ও মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে খৃস্টান প্রচারকদের আপত্তি, অভিযোগ ও অপপ্রচারের বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি কালজয়ী এবং অতুলনীয়। খৃস্টধর্ম বিষয়ক সকল আলোচনা তিনি অত্যন্ত নিরপেক্ষতার সাথে কেবল বাইবেলের উদ্ধৃতি ও খৃস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরুদের বক্তব্যের আলোকে করেছেন, যা তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা প্রমাণ করে।

আরেকটি কারণে এ গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, তা হলো ইসলামের বিরুদ্ধে সমসাময়িক পাশ্চাত্য ধর্মগুরু ও রাজনৈতিক গুরুদের আপত্তি ও অভিযোগের উৎস ও জবাব। কুরআন কারীমে ধর্মপ্রাণ ইহূদী-খৃস্টানদের প্রশংসা করা হয়েছে (সূরা আলে ইমরান : ১১৩-১১৫)। বিশেষত খৃস্টানদের মধ্যকার নিরহংকার মানবপ্রেমী সংসার বিরাগীদের প্রশংসা করা হয়েছে (সূরা মায়িদা : ৮২)। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি ঈসা (আ)-এর উর্ধ্বারোহণের পর থেকেই কিছু সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাচারী এ ধর্মের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। এদের অন্যতম ছিলেন সাধু পৌল। তিনি ছিলেন স্বঘোষিত ও স্বীকৃত মিথ্যাচারী। 'ঈশ্বরের গৌরবার্থে' মিথ্যা বলা তিনি গৌরবের কাজ মনে করতেন। এরূপ মিথ্যা তিনি বলতেন বলে সগৌরবে স্বীকারও করেছেন (রোমান ৩/৭)। তাঁর এ নীতির ভিত্তিতেই 'সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য' বা 'ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশের জন্য' মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা, সত্যগোপন ও সত্যের বিকৃতির মাধ্যমে অন্যান্য ধর্ম, ধর্মপ্রচারক ও ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করাকে অনেক খৃস্টান ধর্মগুরু ও প্রচারক 'ধর্মীয় সংলাপ', গসপেল প্রচার বা ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

খৃস্টীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দের ক্রুসেডের প্রাক্কালে এরূপ জঘন্য মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের মাধ্যমে ইউরোপের মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করে প্রায় দু শতাব্দী স্থায়ী ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনা করা হয়। খৃস্টীয় তৃতীয় সহস্রাব্দের ক্রুসেডের প্রেক্ষাপটেও আমরা একই চিত্র দেখতে পাচ্ছি। খৃস্টান ধর্মগুরু ও যাজকগণ এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনীতিবিদগণ একইভাবে ও একইরূপ মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে পাশ্চাত্য জগতের জনমত তৈরি করেছেন। পোপ মুসলিম উম্মাহর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন, জোরপূর্বক ধর্মপ্রচার ছাড়া নতুন কি এনেছেন মুহাম্মাদ? রাজনীতিবিদগণ কুরআন কারীমকে সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক পুস্তক হিসেবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তা নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছেন। মুসলিমদেরকে ঢালাওভাবে সন্ত্রাসী এবং ইসলাম ধর্মকে সন্ত্রাসী ধর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ সকল অপপ্রচারের অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও বাইবেলভিত্তিক উত্তর পাঠক এ পুস্তকে দেখতে পাবেন।

আল্লামা রাহমাতুল্লাহর লেখনির অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, তিনি খৃস্টান পাদরি-প্রচারকদের অপপ্রচার ও অভিযোগ অপনোদনে গতানুগতিক 'আত্মরক্ষামূলক সাফাই' গান নি; বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ইসলামের জিহাদ যদি সন্ত্রাস হয় তবে বাইবেলের জিহাদ কয়েক লক্ষ গুণ বেশি সন্ত্রাস। খৃস্টানদের লেখা ইতিহাসই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলাম নয়, বরং খৃস্টধর্মই অস্ত্রের মুখে জবরদস্তিমূলকভাবে প্রচারিত হয়েছে। মুহাম্মাদ-এর বহু বিবাহ যদি স্বেচ্ছাচারিতা হয় তবে যীশুসহ বাইবেলীয় ভাববাদিগণ বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ী অনেক বেশি অনাচারী ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। কুরআনের আলোচ্য বিষয় যদি আত্মার চাহিদা পূরণ না করে, তাহলে বুঝতে হবে সে আত্মা প্রচলিত বাইবেলের অশ্লীল, অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক ও অমানবিক গল্প ছাড়া আর কিছুতেই তৃপ্ত হবে না।... এভাবে তিনি প্রত্যেক বিষয়ে বাইবেল ও ইহূদী-খৃস্টান লেখকদের লেখনি থেকে তাদের ধর্মের অবস্থা আগে প্রমাণ করেছেন। এরপর অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে বাইবেলের শিক্ষা, কুরআনের শিক্ষা ও ঐতিহাসিক তথ্যাদির মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি খণ্ডন করেছেন।

এ মহামূল্যবান পুস্তকটি বাংলায় অনুবাদ করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। পুস্তকটির অনুবাদের জন্য অনুবাদকের মধ্যে তিনটি বিষয়ে পাণ্ডিত্য থাকার প্রয়োজন। প্রথমত কুরআন-হাদীস ও ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, দ্বিতীয়ত আরবী ভাষা ও তৃতীয়ত খৃস্টান ধর্মতত্ত্ব ও ইহূদী-খৃস্টানদের ধর্মীয় ইতিহাস। এই তিনটি বিষয়েই অনুবাদকের পূর্ণ দখল ও অভিজ্ঞতা না থাকলে অনুবাদটি কখনোই মূল লেখকের অচিন্ত্যনীয় পরিশ্রম ও অগাধ পাণ্ডিত্য ফুটিয়ে তুলতে পারবে না এবং আন্ত-ধর্মীয় সংলাপের ক্ষেত্রে কোন অবদান রাখতে পারবে না। এ তিনটি বিষয়েই আমার যোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে। বিশেষত তৃতীয় বিষয়ে আমার জানার পরিধি অত্যন্ত সীমিত। তারপরও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা

করেছি যেন মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে পাঠকের নিকট অনুবাদটি বোধগাম্য হয়। এ গ্রন্থের সকল পাদটীকাই অনুবাদকের পক্ষ থেকে সংযোজনকৃত। এ সকল টীকার মাধ্যমে মূল বক্তব্য স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ গ্রন্থকার প্রসঙ্গত ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামের ইতিহাস এবং খৃস্টান ধর্মতত্ত্ব ও খৃস্টধর্মের ইতিহাসের অনেক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যে সকল বিষয়ে কিছু ধারণা না থাকলে পাঠকের জন্য আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়ে যায়। আশা করি এ সকল টীকা পাঠককে গ্রন্থকারের মূল বক্তব্য বুঝতে সহায়তা করা ছাড়াও আলোচিত বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত ধারণা প্রদান করবে।

আরবীতে ধর্মীয় পরিভাষাগুলো মুসলিম এবং খৃস্টান সকলের জন্যই প্রায় এক। আল্লাহ, নবী, রাসূল, মালাইকা, আখিরাত, কিয়ামত, হাওয়ারী, সাহাবী, তাবেয়ী, তাওবা, ইসতিগফার, জান্নাত, জাহান্নাম, সালাত, সিয়াম... ইত্যাদি সকল ধর্মীয় পরিভাষা উভয় ধর্মেই এক। বাংলায় ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলমানদের পরিভাষা খৃস্টানদের পরিভাষা থেকে ভিন্ন। খৃস্টীয় পরিভাষা ব্যবহার করলে মুসলিম পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য বা বিরক্তির হতে পারে, আবার মুসলিম পরিভাষা ব্যবহার করলে খৃস্টান পাঠকের কাছে তা অবোধ্য বা বিরক্তিকর হতে পারে। সুতরাং আমি যথাসম্ভব বাইবেলে ব্যবহৃত পরিভাষাই ব্যবহার করেছি। প্রয়োজনে বন্ধনির মধ্যে ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করছি। বাইবেলীয় ভাববাদিগণ বা নবীগণ (আ)-এর নামের ক্ষেত্রে বাইবেলে ব্যবহৃত উচ্চারণ ও মুসলিমদের মধ্যে ব্যবহৃত উচ্চারণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন মোশি ও মূসা, সুলায়মান ও শলোমন ইত্যাদি। আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাইবেলের উচ্চারণই ব্যবহার করেছি।

আরবীতে মুসলিম, ইহূদী ও খৃস্টান সকলেই 'আল্লাহ' শব্দের ব্যবহার করেন। বাংলায় খৃস্টানগণ 'ঈশ্বর' ব্যবহার করেন বলে দেখা যায়। আমি আল্লামা রাহমাতুল্লাহ বা অন্যান্য মুসলিম আলেমদের বক্তব্যের মধ্যে ব্যবহৃত 'আল্লাহ' শব্দের অনুবাদে বাংলায় 'আল্লাহ' লিখেছি। পক্ষান্তরে খৃস্টান পাদরী ও পণ্ডিতদের কথার মধ্যে ব্যবহৃত 'আল্লাহ' শব্দের অনুবাদে 'ঈশ্বর' বা 'সদাপ্রভু' লিখেছি।

বাইবেলের গ্রন্থাবলি ও পত্রাবলির ক্ষেত্রে উইলিয়াম কেরির বাংলা বাইবেলে ব্যবহৃত নামগুলিই ব্যবহার করেছি। বাইবেলের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে কেরির বাংলা বাইবেলের অনুবাদ হুবহু তুলে দিয়েছি। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলা, আরবী, ইংরেজি কিং জেমস ভারসন (KJV) এবং রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্সনের (RSV)-এর ভাষা মিলিয়ে দেখেছি। যেখানে বাংলা বাইবেলের অনুবাদের মধ্যে চতুরতা বা বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে বা গ্রন্থকারের দেওয়া আরবী উদ্ধৃতির সাথে বাংলা অনুবাদের অমিল রয়েছে, সেখানে আমি ইংরেজি বাইবেলের উদ্ধৃতি-সহ অনুবাদ করেছি।

গ্রন্থে উল্লেখিত শত শত ইহূদী ও খৃস্টান ব্যক্তিত্বের নামের পরিচয় লাভ সবচেয়ে কঠিন বিষয়। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত শত শত ধর্মগুরু ও পণ্ডিতের নাম গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি অগণিত স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। এ সকল ব্যক্তি ও স্থানের আরবী নাম প্রচলিত ল্যাটিন বা ইংরেজি নাম থেকে ভিন্ন। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ব্যক্তি বা স্থানের নামের ল্যাটিন বানান ও পরিচিতি প্রদান করতে এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার যুগ বা মৃত্যু তারিখ উল্লেখ করতে। অনেক নামের পরিচয় জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। এগুলি আরবী উচ্চারণ অনুসারে বাংলা করেছি।

আল্লামা রাহ্মাতুল্লাহ্ কীরানবীর জীবনী ও রচনাবলি বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছি যা গ্রন্থটির প্রথমে সংযোজন করা হয়েছে। ইযহারুল হকের আলোচ্য বিষয় ও পটভূমি সম্পর্কেও এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি এ আলোচনা পাঠককে গ্রন্থকারের সংগ্রামী জীবন ও মূল গ্রন্থের বিষয়বস্তু অনুধাবনে সাহায্য করবে।

মহান আল্লাহর মহান রাসূল ঈসা মাসীহ (আ)-এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাচারে লিপ্ত সাধু পৌলের অনুসারী ধর্মগুরু ও পাদরিগণ বিগত দেড় হাজার বছর ধরে জঘন্য মিথ্যা ও অপপ্রচারের মাধ্যমে সত্যের কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে চেয়েছেন। একদিকে তারা সত্যানুসারী তাওহীদপন্থী খৃস্টানদেরকে বর্বরতার সাথে দমন ও নিশ্চিহ্ন করেছেন, অপরদিকে ঈসা মাসীহ (আ)-এর প্রকৃত উত্তরসূরী সত্যের আত্মা আল-আমীন মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রচারিত সত্যের আলোকে মুখের ফুৎকারে নির্বাপিত করতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্যের সরলপ্রাণ মানুষদের বিভ্রান্ত করে তারা তাদেরকে বারংবার ধর্মের নামে ক্রুসেডের মধ্যে লিপ্ত করেছেন এবং করছেন। তাদের এ মিথ্যা প্রতিরোধে ও প্রতিবাদে সত্য প্রকাশের অতুলনীয় গ্রন্থ ইযহারুল হক। আমার মত একজন নগণ্য ও অযোগ্য মানুষকে আল্লাহ এ গ্রন্থটির অনুবাদ করার তাওফীক দিয়েছেন বলে আমি তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এ গ্রন্থটি অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহান আল্লাহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রদান করুন। অনেকেই বইটি অনুবাদের জন্য আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, ফোনে যোগাযোগ করেছেন, খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং বইপুস্তক ও তথ্যাদি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা এ সবকিছুই করেছেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, জাগতিক কোন স্বার্থ তাঁদের নেই। মহান আল্লাহ দয়া করে লেখককে ও তাঁদেরকে ক্ষমা করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ তাঁদেরকে দান করুন।

সর্বশেষ মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে আর্জি, তিনি ভুলত্রুটি ক্ষমা করে এ কর্মটি কবূল করে একে আমার, আমার পিতামাতা, পরিবার-পরিজন ও সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর কল্যাণ ও মুক্তির ওসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

—আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

সূচি

বিবরণ

বিবরণ	পৃষ্ঠা

বিবরণ

আল্লামা রাহ্‌মাতুল্লাহ কীরানবী : জীবন ও কর্ম

১. জন্ম ও বংশ

মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ কীরানবী ১২৩৩ হিজরী সালের জুমাদাল উলা মাসের ১ তারিখ, মুতাবিক ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মার্চের ৮/৯ তারিখে ভারতের রাজধানী দিল্লীর পার্শ্ববর্তী 'মুজাফ্‌ফর নগর' জেলার 'কীরানা' গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খলীলুর রহমান। তিনি ছিলেন তৃতীয় খলীফায়ে রাশেদ হযরত 'উসমান ইবনু 'আফ্‌ফান (রা)-এর বংশধর। তাঁর ২৪তম পিতামহ 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আবদুল 'আযীয সর্বপ্রথম সুলতান মাহমূদ গযনবীর সাথে ভারতে আগমন করেন। এক পর্যায়ে তিনি পানিপথে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। আল্লামা রাহমাতুল্লাহর ৭ম পিতামহ আবদুল করীম একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। ভারতের মোগল সম্রাট আকবরের এক জটিল রোগের চিকিৎসায় তিনি সফল হন। পুরস্কার হিসেবে সম্রাট আকবর তাঁকে 'কীরানা' গ্রামে অনেক লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন। তখন থেকে তাঁরা তথায় বসবাস করতে থাকেন। পরবর্তী মোগল শাসনামলে এ বংশের অনেকেই বিভিন্ন বড় বড় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য তাঁরা প্রসিদ্ধ ছিলেন।[১]

২. শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন

রাহমাতুল্লাহর পিতা, চাচা ও বংশের অনেকেই ছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলিমদের অন্যতম। ইলম, ধার্মিকতা, সম্পদ ও প্রতিপত্তি সবদিক থেকেই তাঁরা প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের হাতেই রাহমাতুল্লাহর লেখাপড়ার হাতে খড়ি হয়। ১২ বছর বয়সে তিনি 'হিফযুল কুরআন' (কুরআন কারীম মুখস্থ) সম্পন্ন করেন। পাশাপাশি তিনি ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা লাভ করেন এবং আরবী, ফার্সী ও উর্দু তিনটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন।

১. ড. মালকাবী, মুহাম্মাদ আহমাদ, সম্পাদকের ভূমিকা, ইযহারুল হক, (আর-রিয়াসাতুল আম্মাহ : দারুল ইফতা, ১৯৮৯) ১/১৫ রিয়াদ; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, ভূমিকা, ইযহারুল হক (বৈরুত, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা. বি.) ২/৫-৬; ড. মোহর আলী, মুওয়াজাহাতুল মুসলিমীন লিল আনশিতাতি তানসীরীয়্যাহ ফিল বানগাল ওয়া শিমালিল হিন্দ (প্রবন্ধ), গবেষণা কেন্দ্র, আল-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাৎসরিক জার্নাল, ১ম সংখ্যা, মুহাররাম ১৪০৩ (১৯৮২), পৃ. ৮০।

এরপর তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রাজধানী দিল্লী গমন করেন। তথায় প্রসিদ্ধ 'আলিম মুহাম্মাদ হায়াতের 'মাদ্‌রাসা'য় (কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়) এ ভর্তি হন। উক্ত মাদরাসায় ও দিল্লীর অন্যান্য 'আলিমের নিকট ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শিক্ষার আগ্রহ রাহমাতুল্লাহকে এখানেই থামতে দেয় নি। দিল্লীর 'আলিমদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করার পর তিনি লক্ষ্ণৌ গমন করেন। ইসলামী জ্ঞানের চর্চায় লক্ষ্ণৌও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। তথাকার সুপ্রসিদ্ধ আলিম ও ফকীহ মুফতী সা'দুল্লাহর নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। ইমাম বখ্‌শ সাহবায়ীর নিকট ফারসী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং তৎকালীন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মুহাম্মাদ ফায়েযের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। এছাড়া তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের নিকট গণিত-শাস্ত্র ও প্রকৌশলবিদ্যা অধ্যয়ন করেন।

এভাবে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ-এর শিক্ষক ও পণ্ডিতদের নিকট থেকে ইসলামী ও প্রচলিত শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি লাভের পরে রাহমাতুল্লাহ তাঁর জন্মস্থান কীরানায় ফিরে আসেন। তথায় তিনি একটি মাদরাসা (কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থান থেকে মেধাবী ছাত্ররা তাঁর মাদরাসায় ভর্তি হয়ে শিক্ষালাভ করতে থাকেন। এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে ইসলামী শিক্ষা প্রচার, খৃস্টধর্ম-প্রচারকদের বিভ্রান্তি প্রতিরোধ ও বৃটিশ আধিপত্য বিরোধী আন্দোলনে তাঁর সাহচর্যে থেকেছেন এবং অনেকেই তাঁদের লিখনী, বক্তব্য ও শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ভারতের মুসলিম জাগরণ ও প্রতিরোধ আন্দোলনে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। এঁদের একজন ছিলেন আল্লামা শাইখ 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব। তিনি মাদ্রাজের প্রথম ইসলামী কলেজ (মাদরাসা) 'আল-বাকিয়াতুস সালিহা' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে মাদ্রাজের সবচেয়ে বড় ইসলামী শিক্ষাপীঠ বলে গণ্য।[২]

৩. ভারতের তৎকালীন অবস্থা ও মিশনারি অপ-তৎপরতা

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার পতন ছিল ইসলাম ও খৃস্টধর্মের ইতিহাসের একটি মোড়। ইসলামের সাথে খৃস্টধর্মের প্রতিযোগিতা ও সংঘাত প্রথম থেকেই। প্রথম থেকেই ইসলামের পাল্লা ভারী থেকেছে। মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক দুর্বলতা ও বিচ্ছিন্নতার সুযোগে খৃস্টীয় ইউরোপ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১০৯৫ খৃস্টাব্দ থেকে পরবর্তী প্রায়

১. তৎকালীন মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় মসজিদ ও মকতবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করা হতো। আর মাদরাসা ছিল উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র। বর্তমান পরিভাষায় যা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় বলে গণ্য। ইউরোপে 'স্কুল' শব্দটিও এই অর্থে ব্যবহৃত হতো ও এখনো হয়ে থাকে।

২. ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/১৬; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত, ২/৬-৭।

দুই শতাব্দী যাবৎ ক্রুসেড নামের মহা-সমর ও মহা-ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েও অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে নি, যদিও ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের অনেকেই প্রাথমিক বিজয়ের পরেই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, আর অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফল হয়েছিল উল্টো। উছমানী তুর্কীগণ ক্রমান্বয়ে ইউরোপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে। এছাড়া দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে উছমানী সাম্রাজ্যের দুর্বলতার পাশাপাশি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সর্বপ্রথম ইউরোপীয় খৃষ্টানগণ একটি মুসলিম দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। খৃষ্টান প্রচারকগণ একে খৃষ্টধর্মের মহাবিজয়ের সূচনা বলে গণ্য করে। তারা অনুভব করে যে, অচিরেই ইসলাম বিলুপ্ত হবে এবং খৃস্টধর্ম তার স্থান দখল করবে। বিপুল উদ্দীপনার সাথে তারা ইসলাম বিরোধী প্রচারণা ও খৃস্টধর্ম প্রচারের দিকে এগিয়ে আসে। একদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ক্রমান্বয়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। অপরদিকে ক্রমান্বয়ে খৃস্টান মিশনারিগণ ভারতে আগমন করতে থাকে। ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে উইলিয়াম কেরি (Willian Carey) ব্যাপটিস্ট মিশনারির পক্ষ থেকে কলকাতায় আগমন করেন। অষ্টাদশ শতক শেষ হওয়ার আগেই মিশনারি কার্যক্রম সুনির্ধারিত রূপ লাভ করে। এ শতক শেষ হওয়ার আগেই ভারতে খৃস্টধর্ম, বিশেষত ইংল্যান্ডের চার্চের নিয়ন্ত্রণে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমত প্রচারের জন্য বিভিন্ন মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেগুলির মধ্যে ছিল :

১. The Baptist Missionary Society (ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি)
২. The Church Missionary Society (চার্চ মিশনারি সোসাইটি)
৩. The London Missionary Society (লন্ডন মিশনারি সোসাইটি)
৪. The Free Church of Scotland Mission (স্কটল্যান্ডীয় ফ্রী চার্চ মিশন)
৫. Society for the Propagation of the Gospel (গসপেল প্রচার সোসাইটি)

এ সকল প্রচারক সমিতি ও সংস্থাকে অর্থ, সম্পদ, প্রচারক, রাজনৈতিক সমর্থন ও বই-পুস্তকাদি দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বৃটিশ ও বিদেশী বাইবেল সোসাইটি (British and Foreign Bible Society) গঠন করা হয়। এছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ও ব্রিটেনের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় হিন্দু ও মুসলিমদেরকে যেকোনোভাবে খৃস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার বিষয়ে অতি-আগ্রহী ছিলেন। ভারতে বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্বের জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে তারা ইংল্যান্ডে বিশেষভাবে প্রচার করেন। ফলে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও উগ্রতার ভিতর দিয়ে বাংলা ও ভারতে খৃস্টধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ধারা শুরু হয়।[১]

---

১. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৭১।

ধর্মান্তরকরণের এ প্রচেষ্টা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। অগণিত মিশনারি স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিলুপ্ত করা, মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি জবরদখল করা, 'ধর্মনিরপেক্ষতার' নামে মূল শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ইসলামী শিক্ষা অপসারণ করা, ইংরেজি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে ইসলাম বিরোধী বিকৃত তথ্যাদি উপস্থাপন করা, মুসলিমদের মধ্য থেকে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও অন্যান্য ভণ্ড ও প্রতারককে সাহায্য করে ইসলামকে বিকৃত করার অপচেষ্টা করা ইত্যাদি। তবে, সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় ছিল বাংলা, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় ইসলাম ধর্ম, কুরআন কারীম ও মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার জন্য বিভিন্ন পুস্তক রচনা করে মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করা, প্রকাশ্যে সকল মুসলিমকে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য নিয়মিত জোরালো দাবি জানানো, এজন্য ব্যক্তিগতভাবে চাপাচাপি করা এবং মুসলিম আলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বহস, বিতর্ক ইত্যাদির চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া।[১]

এভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বাংলা ও ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাবাধীন সকল অঞ্চলে খৃস্টান মিশনারিগণ জনসমাবেশ, বাজার, মসজিদ, মাদরাসা ও সকল জন-সমাগমের স্থানে প্রকাশ্যে ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার, বই-পুস্তক বিতরণ ও মুসলিম আলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকেন। তাদের মিথ্যাচার ও অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে প্রথমদিকে কিছু মুসলিম নামধারী ব্যক্তি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। পাদরিগণ এদের নামের আগে মৌলবী, শেখ ইত্যাদি লাগিয়ে এদের মাধ্যমে তাদের অপপ্রচারের ধারা আরো জোরদার করতে চেষ্টা করেন। অনেক সময় কিছু কথা বলার পরে পাদরিগণ সাধারণ মানুষকে জোর করে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করেন। বিশেষত যখন সাধারণ মানুষেরা ইসলাম ও খৃস্টধর্ম সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কারণে তাদের অপ-প্রচারের জবাব দিতে অক্ষম হতেন তখন পাদরিরা তাদেরকে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করতে পীড়াপীড়ি করতেন।[২]

ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও অপপ্রচার আরো জোরালো হয় মি. ফান্ডারের আগমনের পরে। মুসলিম বিশ্বে খৃস্টধর্ম প্রচারের জন্য প্রচারক তৈরি ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় দশকে সুইজারল্যান্ডের বাসেলে "Basel Missionary Seminary" প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে খৃস্টধর্মীয় ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়াদির পাশাপাশি আরবী ভাষা, কুরআন, ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক পড়ানো হতো। কার্ল গোটালেব ফান্ডার (Carl Gottaleb Pfander)

১. ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত ১/১৩-১৫।
২. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭৭; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত ২/৭।

১৮২৫ সালে এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করার পরে কিছু দিন রাশিয়ার জর্জিয়া ও পারস্যে খৃস্টধর্ম প্রচারে নিয়োজিত থাকেন। এ সময়ে তিনি ফার্সী ভাষাও শিক্ষা করেন। ১৮২৯ সালে তিনি তাঁর 'মীযানুল হক' (Scale of Truth) বা 'সত্যের মাপদণ্ড' নামক গ্রন্থটি জার্মান ভাষায় রচনা করেন। ইসলামের বিরুদ্ধে খৃস্টান পাদরিগণের গতানুগতিক মিথ্যাচার, তথ্যবিকৃতি, অপপ্রচার ও বিষোদগার তিনি এই পুস্তকে একত্রে সংকলন করেন। ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে তিনি বইটির ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে তিনি ফার্সী ভাষায় পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি একই উদ্দেশ্যে ও পদ্ধতিতে ফার্সী ভাষায় 'মিফতাহুল আসরার' (রহস্যের চাবি) ও 'তরীকুল হায়াত' (জীবনের পথ) নামে দুটি পুস্তক রচনা করেন। ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে রুশ সরকার জর্জিয়ায় মিশনারি কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। তখন মি. ফান্ডার বাসেলে ফিরে যান এবং ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। তাঁর আগমনের ফলে ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার তুঙ্গে উঠে। তিনি তাঁর পুস্তকগুলি উর্দু ও ফার্সী ভাষায় ভারতের মুসলিমদের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। এছাড়া মৌখিক প্রচার ও বিষোদগারের ধারা অব্যাহত থাকে।[১]

৪. মিশনারি অপ-প্রচারের প্রতিরোধে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ

ভারতীয় মুসলিমদের এই দুর্দিনে যে সকল মুসলিম মনীষী মিশনারি অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কলম তুলে নেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন আল্লামা রাহমাতুল্লাহ। খৃস্টান মিশনারিদের অপপ্রচারের ব্যাপকতা, গভীরতা ও উগ্রতায় তিনি বিচলিত হয়ে উঠেন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরে তিনি তাঁর অধ্যাপনার দায়িত্ব পরিত্যাগ করে লিখনি, বক্তৃতা ও বিতর্কের মাধ্যমে মিশনারিদের প্রতিরোধে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইংরেজি, আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় লিখিত খৃস্টধর্ম সম্পর্কীয় মৌলিক গ্রন্থাদি ব্যাপক অধ্যয়নের মাধ্যমে এ বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

ডা. উযির খান নামক একজন মুসলিম চিকিৎসক এ বিষয়ে তাঁকে বিশেষ সহযোগিতা করেন। উযির খান বিহারে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাংলার মুর্শিদাবাদে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্ত করার পরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। এসময়ে তিনি মেডিক্যাল কলেজে ও সর্বত্র খৃস্টান মিশনারিদের কার্যক্রমের ব্যাপকতা লক্ষ্য করে বিচলিত হন। ত্রিশের দশকে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ইংল্যান্ডে গমন করেন। তিনি ইংরেজি ও গ্রীক ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ইংল্যান্ডে অবস্থানের সুযোগে তিনি ইংরেজি ভাষায় রচিত খৃস্টধর্ম ও বাইবেল বিষয়ক সমকালীন গবেষকদের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ

১. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৮০।

অধ্যয়ন করেন এবং কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করে ভারতে নিয়ে আসেন। এ সকল গ্রন্থের মধ্যে ছিল :

(১) T. H. Horne রচিত An Introduction to the Critical Study and knowledge of the Holy Scripture.
(২) D. F. Strauss রচিত The Life of Jesus.
(৩) Nathaiel Lardner রচিত The Credibility of Gospel Histry
(৪) G. D'Oyley and R. Mant রচিত Notes, Practical and Explanatory to the Holy Bible
(৫) M. Henry and T. Scot রচিত A Commentary Upon the Holy Bible.

১৮৩২ সালে তিনি লন্ডন থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের পরে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফেরার পরে তিনি আগ্রার মেডিকেল কলেজে ফার্মাকোলোজির (Pharmacology) উপরে অধ্যাপনা করতে থাকেন। মিশনারিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে রাহমাতুল্লাহ্ কীরানবীর প্রচেষ্টা তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি তাঁকে তাঁর নিকট সংগৃহীত তথ্য ও পুস্তকাদি দিয়ে সহযোগিতা করেন। এ সকল তথ্য ও পুস্তক রাহমাতুল্লাহর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। তিনি মিশনারিদের অপ-প্রচারের প্রতিবাদে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। ১৮৫২ খৃস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত ৫ বছরে তিনি উর্দু, ফার্সী ও আরবী ভাষায় অনেকগুলি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি প্রমাণ করে যে, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে, বিশেষত ইহূদী ও খৃস্ট ধর্মের বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা ছিল অতুলনীয়। তিনি সন্দেহাতীতভাবে এ বিষয়ে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বিশেষজ্ঞ ছিলেন।[১]

কলম-যুদ্ধ ছাড়াও তিনি খৃস্টান মিশনারিদের কার্যক্রম প্রতিরোধ করতে মুসলিম প্রচারকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রচারকগণ পরবর্তীকালে খৃস্টান মিশনারিদের অপপ্রচার প্রতিরোধে, প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে ও ইসলাম প্রচারমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদান রাখেন। এছাড়া তিনি সাধারণ মানুষদের মধ্যে এ বিষয়ে ওয়ায ও আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট ছিলেন।

এ সকল খেদমতের পাশাপাশি তিনি প্রকাশ্য বিতর্কের মাধ্যমে খৃস্টান পাদরিদের অপপ্রচার রোধের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। খৃস্টধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের অহঙ্কারে আক্রান্ত ছিলেন খৃস্টান প্রচারকগণ। তাঁরা সর্বস্তরের মুসলিমদের কাছে প্রকাশ্যে প্রচার করতেন যে, মুসলিম আলিমগণ তাঁদের সাথে বিতর্কে নামতে সাহস পান না। বিতর্ক হলে তাঁরা কখনোই জয়লাভ করতে পারবেন না। তাঁদের সামনে দাঁড়ানোর মত ক্ষমতা

১. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮২।

কোনো মুসলিম আলিমের নেই ..... ইত্যাদি। এ সকল অপপ্রচার সাধারণ মুসলিমদের মনে গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছিল। রাহমাতুল্লাহ অনুভব করলেন যে, এ নেতিবাচক প্রভাব দূর করতে প্রকাশ্য বিতর্কই সবচেয়ে কার্যকর পন্থা। এজন্য তিনি মি. ফান্ডার-সহ ভারতের শীর্ষস্থানীয় সকল পাদরি ও প্রচারককে পত্রের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ পেশ করেন। তিনি খৃস্টান পাদরিদের সাথে একাধিক প্রকাশ্য বিতর্কে লিপ্ত হয়ে জয়লাভ করেন। তবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক ছিল মি. ফান্ডারের সাথে তাঁর বিতর্ক।[১]

মি. ফান্ডার আগ্রা ও উত্তর ভারতের ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত সকল এলাকায় খৃস্টধর্ম প্রচারে রত ছিলেন। তিনি হাট-বাজার, মসজিদ, মাদরাসা ও বিভিন্ন জনসমাবেশে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপ-প্রচার চালাচ্ছিলেন এবং সাধারণ মুসলিমদেরকে খৃস্টধর্ম গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছিলেন। আল্লামা রাহমাতুল্লাহ তাঁকে প্রকাশ্য বিতর্কে অংশ গ্রহণের জন্য পত্রের মাধ্যমে আহ্বান জানান। ২৩ শে মার্চ, ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে তাঁদের পত্রালাপ শুরু হয় এবং ৮ই এপ্রিল তা শেষ হয় এবং বিতর্কের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মি. ফান্ডারের পত্রাবলি থেকে সুস্পষ্ট যে, তিনি প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। বিভিন্ন কঠিন শর্ত জুড়ে বিতর্ক এড়াতে চেষ্টা করেন। এ সকল শর্তের মধ্যে ছিল, যে পক্ষ হেরে যাবে তাকে অন্য পক্ষের ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। যদি মি. ফান্ডার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন তবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন। আর যদি আল্লামা রাহমাতুল্লাহ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন তবে তিনি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করবেন। রাহমাতুল্লাহ সকল শর্ত মেনে নিয়েই বিতর্কে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। অবশেষে বিতর্কের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উভয় পক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিতর্ক অনুষ্ঠানে মি. ফান্ডারকে সহযোগিতা করবেন পাদরি মি. ফ্রেঞ্চ (T. V. French)। মি. ফ্রেঞ্চ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করে মিশনারি কাজে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে আগমন করেন। তিনি আগ্রায় মি. ফান্ডারের সাথে কর্মরত ছিলেন। অপরপক্ষে আল্লামা রাহমাতুল্লাহকে সহযোগিতা করবেন ডা. উযির খান।

উভয়পক্ষ সিদ্ধান্ত নেন যে, আকবারআবাদ বা আগ্রার খৃস্টান মিশনারি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে ১৮৫৪ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ সোমবার থেকে বিতর্ক শুরু হবে এবং নিম্নের ৫টি বিষয় নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে :

(১) রহিতকরণ, অর্থাৎ ইসলামের আবির্ভাবের ফলে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহের বিধান রহিত হওয়ার বিষয়

(২) বাইবেলের বিকৃতি

---

১. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০; ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৩৪-৩৫; আবদুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত ২/৮।

(৩) যীশুর ঈশ্বরত্ব ও ত্রিত্ববাদ
(৪) কুরআনের অলৌকিকত্ব
(৫) মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত

বিতর্ক অনুষ্ঠানে ফয়সালা দানের জন্য নিম্নের ৫ জনকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা হয় : খৃস্টানদের পক্ষ থেকে ৩ জন ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে দু'জন।

(১) আগ্রা হাইকোর্টের ইংরেজ বিচারপতি মি. মোসলে স্মিথ (Mosley Smith)
(২) রাজ্য কোষাগারের সেক্রেটারি মি. জর্জ ক্রিস্টিয়ান (George Christian)
(৩) আগ্রার গভর্নরের সেক্রেটারি মি. উইলিয়াম মুর (William Muir)
(৪) মুফতি রিয়াযুদ্দীন
(৫) আগ্রার উর্দু পত্রিকার সম্পাদক মুন্শী খাদেম আলী[১]।

পাঁচ শতাধিক মুসলমান, হিন্দু, বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা ও সাংবাদিকগণের উপস্থিতিতে পূর্ব নির্ধারিত স্থান ও সময়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথম দিনের বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল 'রহিতকরণ ও বিকৃতি'। খৃস্টান পাদরিগণ সর্বদা দাবি করেন যে, ঈশ্বরের বাণী বা বিধান কখনো রহিত বা পরিবর্তিত হতে পারে না। একবার ঈশ্বর যে বিধান প্রদান করেন পরবর্তী সময়ে কখনোই তা রহিত হতে পারে না। কারণ, এতে ঈশ্বরের অজ্ঞতা প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, পূর্ববর্তী নবীর শরীয়ত বা কিতাবের বিধান পরবর্তী শরীয়তে রহিত হতে পারে। এ রহিতকরণ অজ্ঞতা নয়, বরং পূর্ণতা। বিশ্বাস, সংবাদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন রহিতকরণ হয় না। তবে যুগ ও মানব সমাজের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আদেশ-নিষেধ বিষয়ক কোন ব্যবস্থা রহিত হতে পারে। প্রথম দিনে এ বিষয়েই বিতর্ক শুরু হয়। বিতর্ক শুরুর কিছু সময়ের মধ্যেই আল্লামা রাহমাতুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গী ডা. উযির খানের প্রাধান্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তাঁরা খৃস্টানদের বিশ্বাস ও বাইবেলের বিভিন্ন উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, ঈশ্বরের পূর্ববর্তী বিধান পরবর্তী বিধান দ্বারা রহিত হতে পারে এবং হয়েছে। এক পর্যায়ে মি. ফান্ডার ও মি. ফ্রেঞ্চ নীরব হয়ে যান এবং 'রহিতকরণ'-কে 'পূর্ণকরণ' বলে অভিহিত করেন। তখন ডা. উযির খান বলেন, সাধারণভাবে পাদরিগণ এবং বিশেষভাবে আপনি মি. ফান্ডার আপনার 'মীযানুল হক' গ্রন্থে দাবি করেছেন যে, ঈশ্বরের বিধান কখনো রহিত হতে পারে না। এখন প্রমাণিত হলো যে, তা রহিত হতে পারে এবং হয়েছে। আর মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়ত প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে ইঞ্জিলের বিধিবিধান রহিত হওয়ার বিষয়টিও প্রমাণিত। মি. ফান্ডার ও তাঁর সাথী এ সকল প্রমাণের উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হন। মরিয়া হয়ে অবনত মস্তকে তিনি 'রহিতকরণের' সম্ভাবনা স্বীকার করে বলেন, 'আমাদের মতে সম্ভাবনা এক বিষয় আর বাস্তবে রহিত হওয়া অন্য বিষয়।'

১. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮২।

এরপর উভয় পক্ষ 'বিকৃতির' বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। আল্লামা রাহমাতুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গী বাইবেলের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিকৃতি সাধিত হওয়ার পক্ষে সুনিশ্চিত প্রমাণ পেশ করেন। এক পর্যায়ে মি. ফান্ডার স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, বাইবেলের কিছু বিষয়ে বিকৃতি প্রবেশ করেছে। তাঁরা প্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে, ৭টি মৌলিক বিষয়ে বাইবেলের মূল পাঠে বিকৃতি ও জালিয়াতি প্রবেশ করেছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে ত্রিত্ববাদের মূল প্রমাণ যোহনের প্রথম পত্রের ৫ম অধ্যায়ের ৭-৮ আয়াত। যেখানে বলা হয়েছে: "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost; and the three are one. 8. And there are three that bear witness in earth, the spirit, and the water, and the blood : and these three agree in one". "৭ কারণ স্বর্গে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষ্য সংরক্ষণ করেন: পিতা, বাক্য ও পবিত্র আত্মা; এবং তাঁহার তিন একই। ৮ এবং পৃথিবীতে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহার সাক্ষ্য প্রদান করেন: আত্মা, জল ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই।" তাঁরা স্বীকার করেন যে, এ কথাগুলি জাল ও পরবর্তীকালে সংযোজিত।

পাশাপাশি তাঁরা আরো স্বীকার করেন যে, বাইবেবেলর মধ্যে ৪০,০০০ স্থানে 'লিপিকারের ভুল' (erratum) ও পাঠের বিভিন্নতা (Various readings) বিদ্যমান, যে স্থানগুলিতে মূল কথা কি ছিল তা এখন কোনভাবেই জানা যায় না। তাঁরা আরো বলেন যে, অনেক গবেষকের মতে এরূপ ভুলের সংখ্যা দেড় লাখের বেশি। তবে, তিনি দাবি করেন যে, বাইবেলের কিছু অংশের বিকৃতির কারণে গোটা বাইবেলকে বিকৃত বলা যাবে না বা আংশিক বিকৃতির কারণে বাইবেলের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয় না। এ পর্যায়ে উপস্থিত মানুষেরা বিচারকদের মন্তব্য ও রায় জানতে চান। এতে মুফতী রিয়ায উদ্দীন বলেন, কোনো ডকুমেন্টের কিছু অংশ যদি জাল ও বিকৃত বলে প্রমাণিত হয় তবে পুরো ডকুমেন্টটিই আইনের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল বলে গণ্য হবে। তখন উপস্থিত মানুষেরা ইংরেজ বিচারপতি মি. মোসলে স্মিথ (Mosley Smith)-র কাছে তাঁর মতামত জানতে চান। তিনি কোনরূপ মন্তব্য না করে নীরব থাকেন। এতে উপস্থিত শ্রোতাগণের নিকট সত্য প্রকাশিত হয়ে যায়। আল্লামা রাহমাতুল্লাহর বক্তব্য প্রমাণিত হয় এবং প্রথম দিনের মত বিতর্ক শেষ হয়।

প্রথম দিনের বিতর্কে পাদরি মহোদয়দের পরাজয়ের কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। এতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ফলে দ্বিতীয় দিনে সহস্রাধিক ব্যক্তি বিতর্ক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় দিনে যখন বিতর্ক পুনরায় শুরু হলো, তখন মি. ফান্ডার ও তাঁর সঙ্গী নতুন কোন তথ্য উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন বরং তাঁরা বারংবার

স্বীকার করেন যে, বাইবেলের মধ্যে অগণিত স্থানে লিপিকারের ভুল, পাঠের বিভিন্নতা, শব্দের পরিবর্তন, সংযোজন, ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যাখ্যাকে মূল পাঠের মধ্যে সংযোজন ও অন্যান্য পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধিত হয়েছে। আবার তাঁরা দাবি করেন যে, এ সকল পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজনের কারণে যীশুর ঈশ্বরত্ব, ত্রিত্ববাদ, যীশুর রক্তের মাধ্যমে মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্তবাদ ইত্যাদি বাইবেলের মূল শিক্ষাসমূহ বিকৃত হয় নি। এ পর্যায়ে উপস্থিত একজন মুসলিম পণ্ডিত মি. ফান্ডারকে লক্ষ্য করে বলেন, বড় অবাক বিষয় যে, কোন পুস্তকে বিকৃতি সাধিত হবে, কিন্তু তদ্বারা পুস্তকটির ত্রুটি বা অপূর্ণতা প্রমাণিত হবে না!!

এ পর্যায়ে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ উঠে বলেন, আমাদের এবং পাদরি ফান্ডার মহাশয়ের বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য একেবারেই শাব্দিক। আমরা দাবি করেছিলাম যে, বাইবেলের মধ্যে আল্লাহর নাযিলকৃত শব্দের, বাক্যের ও আয়াতের কিছু কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিকৃতি করা হয়েছে। মি. ফান্ডার তা স্বীকার করেছেন, তবে তিনি তা 'লিপিকারের ভুল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ পর্যায়ে মি. ফান্ডার ও মি. ফ্রেঞ্চ বলেন যে, এ সকল বিকৃতি বা ভুলের কারণে মূল গ্রন্থের অপূর্ণতা বা দুর্বলতা প্রমাণিত হয় না। তখন আল্লামা রাহমাতুল্লাহ বলেন : আমার ও আমার সঙ্গীর দায়িত্ব এখানেই শেষ। আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি যে, বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি সাধিত হয়েছে এবং কোন বক্তব্য বাইবেলে আছে বলেই তাকে সন্দেহাতীতভাবে সত্য বা ঈশ্বরের বাণী বলে গ্রহণ করা যায় না; বরং তা বিকৃত বক্তব্য, না অবিকৃত বক্তব্য তা পরখ করার দরকার আছে। এখন কোন্ কথাটি বিকৃত নয় তা প্রমাণ করার দায়িত্ব মি. ফান্ডার ও মি. ফ্রেঞ্চের উপর।

দ্বিতীয় দিনের পরিণতিতে মি. ফান্ডার ভীত হয়ে পড়েন। তিনি বিতর্কের দরজা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও ইতোপূর্বের পত্রালাপে তাঁরা ৫টি বিষয়ে বিতর্কের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বিতর্কের সকল পূর্বশর্ত নির্ধারিত করে নেন, তবুও তিনি পরবর্তী বিতর্কের জন্য নতুন একটি শর্তারোপ করেন। তিনি আল্লামা রাহমাতুল্লাহর কাছে দাবি করেন যে, পরবর্তী বিতর্কে উপস্থিত হওয়ার শর্ত এই যে, বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে মূল বক্তব্য বিকৃতিমুক্ত বলে তাঁকে স্বীকার করতে হবে। বিশেষত, যীশুর ঈশ্বরত্ব ও ত্রিত্ববাদ বিষয়ক বাইবেলের সকল বক্তব্য সঠিক ও বিকৃতিমুক্ত বলে মেনে না নিলে তিনি বিতর্ক করবেন না বলে জানান। তিনি বলেন যে, এ সকল বিষয়ে কোন যুক্তি, বিবেক বা বুদ্ধিবৃত্তিক কথা বলা চলবে না, বরং বাইবেলের সকল বক্তব্য আক্ষরিকভাবে সত্য বলে মেনে নিয়ে বিতর্ক করতে হবে। কারণ যুক্তি, বুদ্ধি বা বিবেক দিয়ে এ বিষয় প্রমাণ করা যায় না।

আল্লামা রাহমাতুল্লাহ বলেন, আমরা তো প্রমাণ করেছি যে, বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি ও জালিয়াতি সংঘটিত হয়েছে। আপনারা নিজেরাও ৭/৮ স্থানে মূল পাঠ বিকৃত হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। এছাড়া ৪০ হাজার স্থানে লিপিকারের ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। যাকে আপনি লিপিকারের ভুল বলছেন আমরা তাকেই বিকৃতি বলছি। কাজেই মূল বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি। এরপরও কিভাবে মেনে নেব যে, বাইবেলের মূল বক্তব্য বিকৃতিমুক্ত বা অবিকৃত?

এ উদ্ভট নতুন শর্ত পেশের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লামা রাহমাতুল্লাহর সাথে বিতর্ক করে সকলের সামনে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা। আল্লামা রাহমাতুল্লাহ এ উদ্ভট শর্তের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। এজন্য তিনি দ্বিতীয় দিনের বিতর্কের শেষে বলেন, তিনি আগামী দুই মাস পর্যন্ত একাধারে মি. ফান্ডারের সাথে বিতর্কে উপস্থিত হতে প্রস্তুত রয়েছেন। এমতাবস্থায় মি. ফান্ডার ও তাঁর সঙ্গীর আর কিছুই বলার থাকে না। তাঁরা পরিপূর্ণ নীরব থাকতে বাধ্য হন।[১]

বিতর্কের ধারা-বিবরণী তাৎক্ষণিকভাবে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সাইয়িদ আবদুল্লাহ আকবারআবাদী ছিলেন বৃটিশ কর্তৃপক্ষের রাষ্ট্রীয় অনুবাদক। তিনি দুদিনই উপস্থিত থেকে বিতর্কের হুবহু ধারা-বিবরণী উর্দুতে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি দু'ভাগে বিতর্কের বিবরণী প্রকাশ করেন। প্রথম ভাগে শাইখ রাহমাতুল্লাহ ও পাদরিদের মধ্যে বিতর্কের আগে ও পরে যে সব পত্রের আদান-প্রদান হয়, সেগুলি তিনি সংকলন করেন ফার্সী ভাষায়। দ্বিতীয় অংশে তিনি দুদিনের বিতর্কের ধারাবিবরণী উর্দু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। প্রথম ভাগের নাম দেন 'আল-মুরাসালাতু'দ-দীনিয়্যা' বা 'ধর্মীয় পত্রালাপ' এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম দেন 'আল-মুবাহাছাতু'দ-দীনিয়্যা' বা 'ধর্মীয় বিতর্ক'। এ দ্বিতীয় অংশকে আবার তিনি ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। বিতর্কের কিছুদিন পরেই, ১২৭০ হিজরীতে (১৮৫৪ খৃস্টাব্দে) তাঁর এই পুস্তক দুটি আগ্রায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

এছাড়া অন্য একজন আলিম শাইখ উযীরুদ্দীন ইবনু শারাফুদ্দীনও উক্ত বিতর্ক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিতর্কের দু'দিনের ধারা-বিবরণী ফার্সী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। তিনিও বিতর্কের বিবরণের সাথে বিতর্কের আগে ও পরে উভয় পক্ষের মধ্যে যে সকল পত্র বিনিময় হয় সেগুলি সংকলন করেন। তিনি তাঁর পুস্তকটির নামকরণ করেন : "আল-বাহছুশ শারীফ ফী ইছবাতি'ন-নাসখি ওয়াত-তাহরীফ" (রহিতকরণ ও বিকৃতির প্রমাণে মর্যাদাময় গবেষণা)। দিল্লীর তৎকালীন মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের পুত্র ও যুবরাজ মির্যা ফখরুদ্দীন ইবনু সিরাজুদ্দীন বাহাদুর শাহ এই পুস্তকটি মুদ্রণ ও প্রচারের

১. ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৩৪-৩৬; ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশে হাফিয আবদুল্লাহ দিল্লীর 'ফাখরুল মাতাবি' নামক প্রেস থেকে পুস্তকটি মুদ্রণ করেন ১২৭০ হিজরীতে (১৮৫৪ খৃস্টাব্দে)

মি. ফান্ডার সহস্রাধিক মানুষের সামনে তাঁর প্রকাশ্য পরাজয় ঢাকার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে এই দু'দিনের বিতর্ক অনুষ্ঠানের একটি ধারা-বিবরণী তৈরি করেন। এতে তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্যের মধ্যে অনেক সংযোজন ও বিয়োজন করেন এবং এই বিকৃত বিবরণীটি ১৮৫৫ সালে প্রকাশ করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত যে সকল স্থানের মানুষেরা বিতর্কে উপস্থিত ছিল না তাদের মধ্যে বিতরণ করেন। এজন্য সাইয়িদ আবদুল্লাহ আকবার আবাদী তাঁর পুস্তকের সাথে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্য ও স্বাক্ষর সংযোজন করে দেন। অনুরূপভাবে, শাইখ উযীরুদ্দীন ইবনু ফখরুদ্দীনও তাঁর রচিত পুস্তক 'আল-বাহছুশ-শারীফ"-এর সাথে ফান্ডারের বিকৃতির উপরে পর্যালোচনা সংযোজন করেন এবং সাথে সাথে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্য ও স্বাক্ষর সংযুক্ত করেন।[১]

৫. ১৮৫৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ও আল্লামা রাহমাতুল্লাহর হিজরত

বিতর্ক অনুষ্ঠানের মাত্র তিন বছরের মধ্যেই 'সিপাহি বিদ্রোহ' নামের ১৮৫৭ সালের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। বস্তুত, পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, পরধর্মের প্রতি বিষোদগার, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, অন্য ধর্মাবলম্বীদের হত্যা, নির্যাতন বা জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা খৃস্টান যাজকদের ও চার্চের মূল বৈশিষ্ট্য। যেদিন থেকে রোমান সম্রাট কন্সটান্টাইন (৩১২-৩৩৭খৃ) খৃস্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়েছেন, সেদিন থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রায় দু' হাজার বছরের খৃস্টধর্মের ইতিহাস মূলত ধর্মীয় সহিংসতার রক্তরঞ্জিত ইতিহাস। খৃস্টান পাদরিগণ এবং খৃস্টান চার্চ সর্বদা অন্যধর্ম ও ভিন্নমতাবলম্বী খৃস্টানদের প্রতি 'শূন্য সহিষ্ণুতা' (Zero tolerance) প্রদর্শন করেছেন। এমনকি ইউরোপে 'সেকুলারিজম' প্রতিষ্ঠার পরেও ইউরোপীয়রা যেখানেই উপনিবেশ গড়েছে সেখানেই বিভিন্ন অজুহাতে জোরপূর্বক ধর্মান্তর করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। তাঁরা 'গসপেল প্রচারের' নামে ভিন্ন ধর্মের প্রতি বিষোদগার করেছেন এবং সকল ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমতকে "hersesy" বা ধর্ম-বিরোধিতা নাম দিয়ে নির্মূল করতে চেষ্টা করেছেন।[২]

ভারতের বৃটিশ উপনিবেশের ইতিহাসও একই সূত্রে বাঁধা। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে অর্ধশতাব্দীর অধিক সময় খৃস্টান শাসক ও প্রচারকগণ বিভিন্নভাবে ইসলাম ও

১. ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৩৫-৩৬।
২. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, Religions and their Representation, Dhaka, The Independent, 22/11/2006, p 7.

হিন্দু ধর্মের প্রতি বিষোদগার, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং জোরপূর্বক বা কৌশলে ধর্মান্তর করার চেষ্টা করেন। আর এ ছিল ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের (সিপাহি বিদ্রোহ) মূল কারণ।[১] স্বভাবতই আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবী এ যুদ্ধের অগ্রনায়কদের অন্যতম ছিলেন। বর্বর হিংস্রতার মাধ্যমে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা যুদ্ধ দমন করতে সক্ষম হন। বিদ্রোহীদের দমনের পরে বিদ্রোহের শাস্তি হিসেবে অগণিত আলিম ও নিরপরাধ মুসলিমকে বিচারের নামে তারা নির্বিচারে হত্যা করেন। এছাড়া আরো অনেককে কারারুদ্ধ বা আন্দামানে নির্বাসিত করেন। তারা আল্লামা রাহমাতুল্লাহকে শাস্তি প্রদানের জন্য অতি-উদগ্রীব হয়ে পড়েন। তারা তাঁকে ধরে দেওয়ার জন্য এক হাজার রুপিয়া পুরস্কার ঘোষণা করেন। তৎকালীন সময়ে তা ছিল অনেক বড় অংক। এছাড়া তারা তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ১৪২০ রুপিয়ায় নিলামে বিক্রয় করেন। সর্বোপরি, তারা তাঁর রচিত সকল পুস্তক প্রচার, মুদ্রণ, সংগ্রহ ও পাঠ নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেন।[২]

সর্বশেষ এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, রাহমাতুল্লাহর বিরুদ্ধে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের আক্রোশ মূলত ছিল ধর্মীয়। রাহমাতুল্লাহ স্বাধীনতা-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও এ বিষয়ে তিনি কিছু লিখেন নি। তাঁর লেখালেখি ছিল মূলত খৃস্টান পাদরিদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্রোহের অজুহাতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ খৃস্টান পাদরিদের মিথ্যাচার ও জালিয়াতির বিরুদ্ধে রাহমাতুল্লাহর কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্নরূপ।

আল্লামা রাহমাতুল্লাহ আত্মগোপন করেন এবং ইয়ামানের পথে মক্কায় হিজরত করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পরের বছর ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে (১২৭৪ হিজরি) তিনি মক্কায় পৌছেন। কিছু দিনের মধ্যেই মক্কার অন্যতম আলিম মাসজিদুল হারামের ইমাম শাইখ আহমদ যীনী দাহলান, মক্কার শাসক শরীফ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আউন ও অন্যান্য আলিম ও গণ্যমান্য ব্যক্তি শাইখ রাহমাতুল্লাহর পরিচয় জেনে ফেলেন। তাঁরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁকে গ্রহণ করেন এবং মসজিদুল হারামে শিক্ষাদানের অনুমতি প্রদান করেন।[৩]

৬. ইস্তাম্বুল সফর ও 'ইযহারুল হক' রচনা

পাদরি ড. ফান্ডার খৃস্টধর্ম ও ইসলাম-ধর্ম সম্পর্কে নিজের জ্ঞান এবং তাঁর রচিত মীযানুল হক ও অন্যান্য পুস্তকের বিষয়ে অত্যন্ত অহঙ্কারী ছিলেন। তাঁর বড়-বড় বুলি

১. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
২. ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/২১; ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
৩. আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত ২/১১-১২; ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত ১/২১।

ভারতের ইংরেজ শাসক ও খৃস্টীয় প্রচারকদের মোহাবিষ্ট করেছিল। তারা ভেবেছিলেন যে, সত্যই মি. ফান্ডারের কোনো জবাব নেই এবং তাঁর সামনে দাঁড়ানোর মত কোন মুসলিম আলেম নেই। এজন্য তাঁর বিষয়ে তাদের বিশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা ছিল এবং তাঁর সুনিশ্চিত বিজয় প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রবল উদ্দীপনার সাথে তারা বিতর্কের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু বিতর্কে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ্র সামনে পরাজয় ও প্রকাশ্য মঞ্চে বাইবেলের মধ্যে কিছু বিকৃতি ও জালিয়াতি আছে বলে স্বীকার করার ফলে তাঁর প্রতি তাদের মোহ ভঙ্গ হয়। যদিও তিনি এ সকল জালিয়াতি ও বিকৃতির কারণে বাইবেলের মূল বক্তব্য বিকৃত হয় নি বলে দাবি করেন, তবে তা উপস্থিত খৃস্টানদেরকে তৃপ্ত করতে পারে না। ভারতের খৃস্টান সমাজে মি. ফান্ডার অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেন। তখন তিনি ইউরোপে ফিরে যান। জার্মান, সুইজারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে কিছু সময় কাটানোর পর চার্চ তাঁকে খৃস্টধর্ম প্রচারের জন্য তৎকালীন ইসলামী খিলাফাতের প্রাণকেন্দ্র তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করে। ১৮৫৮ সালে তিনি তুরস্কে গমন করেন।[১]

'ঈশ্বরের গৌরবার্থে' মিথ্যা বলা প্রচলিত ত্রিত্ববাদী খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি পৌলের শিক্ষা ও নীতি। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ঈশ্বরের গৌরব প্রমাণের জন্য তিনি মিথ্যা কথা বলতেন। তিনি বলেছেন : "For if the truth of God hath more a bounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner? কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?"[২]। এ নীতির ভিত্তিতেই 'সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য' বা 'ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশের জন্য' বাইবেল বিকৃত করাকে ভাল কাজ বলে গণ্য করতেন পূর্ববর্তী খৃস্টান পণ্ডিতগণ। ইযহারুল হক গ্রন্থের মধ্যে খৃস্টান পণ্ডিতদের এরূপ জালিয়াতি ও মিথ্যাচারের অগণিত উদাহরণ পাঠক দেখবেন।

পাদরি ড. ফান্ডারও একই ধারা অনুসরণ করেন। 'ঈশ্বরের গৌরবার্থে' ও 'ঈশ্বরের বাণী মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য' তিনি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি তুরস্কে মুসলিমদের মধ্যে প্রচার করেন যে, তিনি প্রকাশ্য বিতর্কে রাহমাতুল্লাহ ও অন্যান্য ভারতীয় আলিমকে পরাজিত করেন। ফলে ভারতের মুসলিমগণ দলে দলে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। তথাকার মসজিদগুলি গীর্জায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। কাজেই তুরস্কের মুসলিমদেরও উচিত ভারতীয় মুসলিমদের অনুসরণে দলে দলে খৃস্টধর্ম গ্রহণ

১. ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৪৩; ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
২. রোমান ৩/৭।

করা। নানান রঙ মিশিয়ে এ সকল কথা তিনি তুরস্কের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করতে থাকেন।[১]

এ সকল প্রচারে তুরস্কের সাধারণ মুসলিম, এমনকি স্বয়ং খলীফা 'আবদুল 'আযীয খান (রাজত্ব : ১২৭৭-১২৯৩ হি/ ১৮৬০-১৮৭৬ খৃ) বিচলিত হন। তিনি এ বিষয়ে ভারতীয় হাজীদের নিকট থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য মক্কার প্রশাসককে নির্দেশ দেন। বিশেষত মি. ফান্ডারের সাথে আল্লামা রাহমাতুল্লাহর বিতর্ক সম্পর্কে তিনি সঠিক তথ্য জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মক্কার প্রশাসক তাঁকে জানান যে, শাইখ রাহমাতুল্লাহ স্বয়ং মক্কায় অবস্থান করছেন। তখন খলীফা তাঁকে বিশেষ রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। ১৮৬৩ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে (১২৮০ হিজরির রজব মাসে) আল্লামা রাহমাতুল্লাহ তুরস্কে পৌছান। তাঁর তুরস্কে আগমনের কিছুদিনের মধ্যে ড. ফান্ডার সবার অগোচরে তুরস্ক ছেড়ে পালিয়ে যান। দু'বছর পরে ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বরে তিনি লন্ডনে মৃত্যু বরণ করেন।[২]

কোনো কোনো খৃস্টান পাদরি ড. ফান্ডারের পলায়নের এ লজ্জাজনক ইতিহাস মিথ্যা দিয়ে আবৃত করতে চেষ্টা করেন। 'লিওয়াউস সালীব' বা ক্রুশের পতাকা' গ্রন্থের লেখক জনৈক আরবীয় পাদরি মি. বারাকাহ উল্লেখ করেছেন যে, সুলতান আবদুল আযীয খান মি. ফান্ডারকে তুরস্কে আল্লামা রাহমাতুল্লাহর সাথে বিতর্কে বসতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আল্লামা রাহমাতুল্লাহ তুরস্কে পৌছানোর পূর্বেই মি. ফান্ডার মৃত্যুবরণ করেন।

উপরের তথ্যাদি থেকেই এই দাবির মিথ্যাচার স্পষ্ট হয়েছে। বস্তুত আল্লামা রাহমাতুল্লাহর তুরস্কে পৌছানোর দু' বছর পরে পরাজিত-ভগ্নহৃদয় মি. ফান্ডার মৃত্যুবরণ করেন। বাস্তব ঘটনাবলির আলোকে প্রমাণিত যে, আল্লামা রাহমাতুল্লাহর তুরস্কে পৌছানোর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ১৮৬৪ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মি. ফান্ডার তুরস্ক ত্যাগ করেন। বস্তুত বিতর্কে অংশ নিয়ে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার হাত থেকে বাঁচার জন্যই তিনি পালিয়ে যান।[৩]

তুরস্কের সুলতান 'আবদুল 'আযীয খান আল্লামা রাহমাতুল্লাহকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। তিনি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও উলামায়ে কেরামের সামনে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, মুসলিমদের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের বর্বরতা, খৃস্টানগণের অপপ্রচারের অবস্থা, অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মুসলিম উলামায়ে কেরামের ভূমিকা ও বিশেষ করে মি. ফান্ডারের সাথে তাঁর বিতর্কের ঘটনা বর্ণনা করতে অনুরোধ করেন। সকল ঘটনা শ্রবণ

১. ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৪৩; ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
২. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪; ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৪৩-৪৪।
৩. ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৪৪।

করার পর সুলতান খৃস্টান মিশনারিদের প্রতি বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেন। তিনি তুরস্কে তাদের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাদের কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেন।

পক্ষান্তরে আল্লামা রাহমাতুল্লাহর প্রতি সুলতানের শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রায় প্রতিদিন সালাতুল ইশার পরে প্রধানমন্ত্রী খায়রুদ্দীন পাশা তুনূসী, প্রধান মুফতি শায়খুল ইসলাম সাইয়িদ আহমদ আস'আদ মাদানী ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে শাইখ রাহমাতুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতেন। ইসলাম প্রচারে ও ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার রোধে আল্লামা রাহমাতুল্লাহর কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ সুলতান তাঁকে তুরস্কের রাষ্ট্রীয় খেতাব 'বিসাম মাজীদী' ও পদক প্রদান করেন এবং তাঁর জন্য পাঁচশত তুর্কি স্বর্ণমুদ্রা মাসিক ভাতা নির্ধারণ করেন। সর্বোপরি তিনি তাঁকে মক্কার রাষ্ট্রীয় পরিচালনা পরিষদের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দান করেন।[১]

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে, বিশেষত খৃস্টধর্মের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আল্লামা রাহমাতুল্লাহর অতুলনীয় জ্ঞানের কথা অনুভব করে সুলতান 'আবদুল 'আযীয খান ও প্রধানমন্ত্রী খায়রুদ্দীন পাশা তাঁকে এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য ও মৌলিক পুস্তক রচনার জন্য অনুরোধ করেন। পুস্তকটি রচনার জন্য যতদিন প্রয়োজন ততদিন তাঁরা তাঁকে রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে তুরস্কে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করেন। ইতোপূর্বে মক্কার অন্যতম আলিম মাসজিদুল হারামের ইমাম শাইখ আহমদ যীনী দাহলান তাঁকে এ বিষয়ে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁদের অনুরোধের ভিত্তিতে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ গ্রন্থটি রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১২৮০ হিজরীর রজব মাসের ১৬ তারিখে (২৬/১২/১৮৬৩) তিনি পুস্তকটি রচনা শুরু করেন। ১২৮০ হিজরীর যুলহাজ্জ মাসের শেষে (১৮৬৪ সালের জুন মাসের শুরুতে)– মাত্র ৬ মাসের মধ্যে তিনি এই মহামূল্যবান পুস্তকটি রচনা শেষ করেন।[২]

পুস্তকটির রচনা সমাপ্ত করে তিনি হস্তলিখিত আরবী পাণ্ডুলিপিটি প্রধানমন্ত্রী খায়রুদ্দীন পাশাকে প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী ভূমিকা পাঠ করে দেখেন যে, তিনি ভূমিকায় পুস্তকটি রচনার জন্য অনুরোধকারী হিসেবে মাসজিদুল হারামের ইমাম আল্লামা সাইয়িদ আহমদ বিন যীনী দাহ্লান-এর নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তুরস্কের সুলতান বা প্রধানমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে তিনি আল্লামা রাহমাতুল্লাহকে বলেন, আমি ও খলীফাই তো পুস্তক রচনার আপনাকে অনুরোধ করলাম। কিন্তু আপনি আমাদের নাম লিখলেন না কেন? প্রশংসা বা লোক দেখানোর

১. আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত ২/১২-১৪।
২. রাহমাতুল্লাহ কীরানবী, ইযহারুল হক (বৈরুত, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা. বি.) ১/৪৪, ২/৫৯৬-৫৯৭।

জন্য নয়, কিন্তু প্রকৃত সত্য প্রকাশের জন্য এবং খলীফার অবদান স্বীকার করার জন্য তো অন্তত তাঁর নাম লেখা দরকার ছিল। উত্তরে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ বলেন, এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়। এ বিষয়ক কর্ম অবশ্যই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির মহান উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। এর মধ্যে খলীফা, শাসক বা মন্ত্রীদের নাম, প্রশংসা ইত্যাদি উল্লেখ না করাই উত্তম। এছাড়া 'আল্লামা দাহলানই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে লিখতে আমাকে উৎসাহ দেন। কাজেই তাঁর নামই উল্লেখ করেছি। তাঁর এ দৃঢ়তায় প্রধানমন্ত্রী ও সুলতান অত্যন্ত প্রীত হন। তাঁদের দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়।[১]

সুলতানের নির্দেশে পুস্তকটির দ্রুত মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া সুলতানের উদ্যোগে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তিনি জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি ও তুর্কি ভাষাসহ নয়টি ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করার নির্দেশ দেন।[২]

আল্লামা রাহমাতুল্লাহর প্রতি তুর্কী সুলতান 'আবদুল 'আযীয খান (রাজত্ব : ১২৭৭–১২৯৩ হি/ ১৮৬০-১৮৭৬ খৃ) ও পরবর্তী সুলতান ২য় 'আবদুল হামীদ খানের (রাজত্ব : ১২৯৩-১৩২৮ হি/ ১৮৭৬ - ১৯১০ খৃ)[৩] ভক্তি ও ভালবাসা ছিল অপরিসীম। তাঁরা তাঁকে স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ইস্তাম্বুলে অবস্থানের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু আল্লামা রাহমাতুল্লাহর কাছে খিলাফতের রাজধানীর রাষ্ট্রীয় মর্যাদার চেয়ে মক্কার পবিত্রভূমিতে ইসলামী শিক্ষা ও ইলমের খিদমত ছিল অধিক প্রিয়। তিনি ইস্তাম্বুলে অবস্থানে অপারগতা জানিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। প্রথমবার ১৮৬৩-১৮৬৪ সালের এ সফরের পর পরবর্তীকালে তিনি একাধিকবার রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে তুরস্কে গমন করেন। পরবর্তী খলীফা ২য় আবদুল হামীদও (১৮৭৬-১৯১০ খৃ) তাঁকে বিভিন্ন পদক, উপহার ও সম্মাননা প্রদান করেন। তিনি তাঁকে 'ইমাদুল হারামাইন আশ-শারীফাইন' (দুই পবিত্র হারামের স্তম্ভ) উপাধিতে ভূষিত করেন এবং নির্ভেজাল স্বর্ণ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন প্রশংসো-বাক্য খচিত একটি তরবারী তাকে উপহার দেন।[৪]

৭. আরব-উপদ্বীপে সর্বপ্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

এ সময়ে ভারতের মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থার তুলনায় আরব উপদ্বীপের শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত। আরবের শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল মূলত মসজিদ-নির্ভর। মসজিদে কিছু পুস্তক

---

১. ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৪৫।

২. ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪; ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত ১/৫২, ৭২-৭৩।

৩. মাহমূদ শাকির, আত-তারীখুল ইসলামী (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬) ৮/১৮২-২১১।

৪. আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত ২/১৭-১৮।

পাঠদান ছাড়া সমগ্র আরব-উপদ্বীপে কোন নিয়মতান্ত্রিক 'বিদ্যালয়' বা মাদরাসা ছিল না। মসজিদ ভিত্তিক এ সকল পাঠচক্রের জন্যও কোন নির্ধারিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ছিল না। আলিমগণ আগ্রহী ছাত্রদের নিয়ে কিছু গ্রন্থ পাঠ করতেন। পবিত্রভূমি মক্কার শিক্ষা-ব্যবস্থার এ দুর্বলতা আল্লামা রাহমাতুল্লাহকে ব্যথিত ও চিন্তিত করে। তিনি এ অপূর্ণতা দূর করতে সচেষ্ট হন। সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে ১২৮৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে (১৮৬৮ সালের জুলাই মাসে) তিনি মক্কায় একজন ভারতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসাটি তখন 'আল-মাদরাসা আল-হিনদিয়্যা' অর্থাৎ 'ভারতীয় মাদরাসা' এবং 'মাদরাসাতুশ শায়খ রাহমাতুল্লাহ' বা শায়খ রাহমাতুল্লাহর মাদরাসা' নামে পরিচিত ছিল। স্থানের সংকীর্ণতার কারণে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ মাদরাসাটিকে যথাযথ রূপ দিতে পারছিলেন না। এমতাবস্থায় ১২৮৯ হিজরী সালে (১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ) 'সাওলাতুন নেসা বেগম' নামক একজন ধনাঢ্য বাঙালী মহিলা হজ্জ করতে মক্কায় আগমন করেন। তখন মক্কায় অবস্থানরত ভারতীয় 'আলিমদের মধ্যে রাহমাতুল্লাহই ছিলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। উক্ত মহিলা মক্কায় একটি মুসাফিরখানা বা দরিদ্র হাজীদের জন্য 'রিবাত' প্রতিষ্ঠার জন্য রাহমাতুল্লাহর সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। রাহমাতুল্লাহ তাঁকে মুসাফিরখানার পরিবর্তে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। উক্ত মহিলা এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আল্লামা রাহমাতুল্লাহকে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব প্রদান করেন। সাওলাতুন্নেসার অনুদানের দ্বারা রাহমাতুল্লাহ প্রয়োজনীয় জমি ক্রয় করে তাঁর মাদরাসাটি তথায় স্থানান্তরিত করেন। ১২৯০ হিজরীর ১৫ই শা'বান বুধবার (৮/১০/১৮৭৩) নতুন ভবনে মাদরাসাটির উদ্বোধন হয়। অনুদানকারীর নাম অনুসারে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ মাদরাসাটির নামকরণ করেন 'আল-মাদরাসাতু'স-সাওলাতিয়্যাহ' তথা 'সাওলাতিয়্যা মাদরাসা'। মৃত্যু পর্যন্ত পরবর্তী প্রায় দু'দশক আল্লামা রাহমাতুল্লাহ মাদরাসাটির পরিচালক ও প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[১]

আল্লামা রাহমাতুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত এ মাদরাসাটি ছিল মক্কার প্রথম মাদরাসা। শুধু মক্কা বা হিজাযেই নয়, উপরন্তু সমগ্র আরব উপদ্বীপে বা বর্তমান সৌদি আরবের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম নিয়মতান্ত্রিক বিদ্যালয়। আরব উপদ্বীপের শিক্ষা ও সভ্যতার ইতিহাসে এবং বিশেষ করে মক্কা ও হিজাযের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে এ মাদরাসাটির অবদান অবিস্মরণীয় ও অতুলনীয়। পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত এই মাদরাসাটিই ছিল হিজায ও গোটা সৌদি আরবের শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং শিক্ষা-আন্দোলনের মূল কেন্দ্র।

১. আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত ২/১৫-১৬ : ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪; ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/২১।

৮. জীবনাবসান

ভারতের ইংরেজ শাসকগণ এবং খৃস্টান প্রচারকগণ চেয়েছিলেন রাহ্‌মাতুল্লাহর কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে। সাময়িক সামরিক বিজয় তারা লাভ করেছিলেন। তারা ভেবেছিলেন এ বিজয়ের মাধ্যমেই তারা রাহ্‌মাতুল্লাহকে থামিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। জিহ্বা, কলম ও তরবারীর এ মহান মুজাহিদকে আল্লাহ হেফাযত করলেন, তাঁকে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম হিসেবে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সম্মানিত করলেন এবং কর্মময় দীর্ঘ জীবন দান করলেন। শিক্ষা বিস্তার, ইসলাম প্রচার, খৃস্টান পাদরিদের অপপ্রচারের প্রতিরোধ ও সামগ্রিকভাবে ইসলামের খেদমতে বিভিন্নমুখী অবিস্মরণীয় অবদান রাখার পর প্রায় ৭৫ বছর বয়সে ১৩০৮ হিজরীর রামাদান মাসের ২২ তারিখ শুক্রবার (১/৫/১৮৯১ খৃ) তিনি পবিত্র মক্কায় ইন্তেকাল করেন। মক্কার 'মুআল্লা' গোরস্থানে উম্মুল মুমিনীন খাদীজাতুল কুবরা (রা.)-এর কবরের নিকটে তাঁকে দাফন করা হয়।[১]

৯. রচনাবলী

'আল্লামা রাহ্‌মাতুল্লাহ খৃস্টান পাদরিদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ওয়ায-মাহ্‌ফিল ও গণ-সংযোগের জন্য ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করতেন। এছাড়া প্রচারকদের প্রশিক্ষণেও তিনি কর্মরত ছিলেন। এ সকল কর্মের পাশাপাশি অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে কিছু পুস্তক ছিল ইসলামী আকীদা, ফিক্‌হ ইত্যাদি কেন্দ্রিক। যেমন, শীয়াদের আকীদা বা ধর্মবিশ্বাসের বিভ্রান্তি অপনোদনে প্রসিদ্ধ ভারতীয় আলিম শাহ 'আবদুল 'আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী (১৭৪৬-১৮২৪ খৃ/ ১১৫৯-১২৩৯ হি) রচিত 'আত-তুহফাতুল ইছনা আশারিয়া' নামক ফার্সী গ্রন্থটি তিনি আরবীতে অনুবাদ করেন এবং সালাতের মধ্যে হাত উঠানো বা রাফ'উল ইয়াদাইন বিষয়ে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এছাড়া তিনি তুরস্কে অবস্থানকালে 'ইযহারুল হক' পুস্তক রচনার পরে 'আত-তাম্বীহাত ফী ইছবাতিল ইহতিয়াজ ইলাল বি'ছাতি ওয়াল হাশর' (পুনরুত্থান ও পরকালের প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতার প্রমাণ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি তুর্কি মুসলিম সমাজে বিদ্যমান নাস্তিক ও পরকাল অস্বীকারকারীদের বিশ্বাসের বিভ্রান্তি ও পরকালের বিশ্বাসের যৌক্তিক দিক আলোচনা করেন।

'আল্লামা রাহ্‌মাতুল্লাহর অবশিষ্ট রচনাবলী মূলত খৃস্টান প্রচারকদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বা তাদের রচিত বিভিন্ন পুস্তকের বিভ্রান্তি অপনোদনে রচিত। এ সকল গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে :

---

১. ড. মোহর আলী প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪; ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/২১; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত ২/২২-২৩

(১) ইযালাতুল আওহাম (বিভ্রান্তি অপনোদন)। খৃস্টান পাদরিদের বিভিন্ন ভ্রান্তিকর অপপ্রচার খণ্ডন করতে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ ফার্সী ভাষায় পুস্তকটি রচনা করেন। ১২৬৯ হিজরী সালে (১৮৫৩ খৃস্টাব্দে) দিল্লীতে পুস্তকটি মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত পুস্তকটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৫৬৪। শাইখ নূর মুহাম্মাদ উর্দু ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। তিনি উর্দু অনুবাদটির নামকরণ করেন 'দাফিউল আসকাম' (অনুস্থতার প্রতিকার)।

(২) ইযালাতুশ শুকূক (সন্দেহ অপনোদন)। খৃস্টান পাদরিগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে উর্দু ভাষায় তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, খৃস্টান পাদরিগণ ব্যাপক প্রতারণা, মিথ্যাচার, লোভ বা ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে ঊনবিংশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে কয়েকজন সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত মুসলিমকে বিভ্রান্ত করে খৃস্টান বানাতে সক্ষম হন। তারা এদের নামের আগে মৌলভী, মুনসী ইত্যাদি 'উপাধি' লাগিয়ে এদের নামে বিভিন্ন বই-পুস্তক রচনা করে প্রচার করতেন। করাচী শহরের এরূপ একজন ধর্মান্তরিতের নামে পাদরিগণ 'সুআলাতু কারানজী' বা কারানজীর প্রশ্নাবলী নামে ইসলাম ধর্ম ও মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিকর ২৯টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। বিষয়টি জানতে পেরে দিল্লীর মোগল সম্রাটের পুত্র ও যুবরাজ মির্যা ফখরুদ্দীন বাহাদুর পুস্তকটি আল্লামা রাহমাতুল্লাহর নিকট প্রেরণ করেন এবং প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদানের জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। তিনি সানন্দে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১২৬৮ হিজরী সালে (১৮৫২ খৃস্টাব্দে) প্রশ্নগুলির উত্তরে তিনি দুই খণ্ডে ১১১৬ পৃষ্ঠার এ বিশাল পুস্তক রচনা করেন। অগণিত অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে তিনি এই পুস্তকে মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়তের সত্যতা এবং বাইবেলের বিকৃতি প্রমাণ করেন। আল্লামা রাহমাতুল্লাহর ছাত্র ও মাদ্রাজের 'আল-বাকিয়াতুস সালিহাত' মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা শাইখ আবদুল ওয়াহ্হাব বেল্লোরী নিজ খরচে পুস্তকটি মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন।

(৩) আল-ই'জাযুল ঈসাবী (ঈসার (আ) অলৌকিক কর্ম)। আগ্রায় ১২৭০ হিজরীতে (১৮৫৩-১৮৫৪) তিনি উর্দু ভাষায় পুস্তকটি রচনা করেন এবং ১২৭১ হিজরী সালে (১৮৫৪ খৃস্টাব্দে) পুস্তকটি প্রকাশ করা হয়। ৭৭৩ পৃষ্ঠার এই বৃহৎ পুস্তকে তিনি অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে নিশ্চিত করেন যে, প্রচলিত বাইবেল বিকৃত ও পরিবর্তিত এবং মুহাম্মাদ (স)-এর শরীয়তের দ্বারা বাইবেলের অনেক বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে।

(৪) আহসানুল আহাদীছ ফী ইবতালিত তাছলীছ (ত্রিত্ববাদ খণ্ডনে সর্বোত্তম বক্তব্য)। ১২৭১ হি (১৮৫৪ খৃ) তিনি পুস্তকটি রচনা করেন। এবং পরবর্তীতে তা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি জ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি ও বাইবেলের বিভিন্ন উক্তির আলোকে ত্রিত্ববাদের অসারতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করেন।

(৫) আল-বুরূকুল লামি'আ (উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোকচ্ছটা)। তিনি আরবী ভাষায় পুস্তকটি রচনা করেন। এ পুস্তকে তিনি মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব বিষয়ে বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের বহুসংখ্যক উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, বাইবেলের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুসারেই তিনি শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী। পুস্তকটি মুদ্রিত হয় নি। ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে ইংরেজগণ আল্লামা রাহ্মাতুল্লাহর সম্পত্তি লুট করে, নিলামে বিক্রয় করে এবং তাঁর লিখিত বই-পুস্তক পাঠ, প্রকাশ ও ঘরে রাখা নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করে। এ সময়ে তাঁর লিখিত অমুদ্রিত কয়েকটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি নষ্ট বা লুণ্ঠিত হয়। এগুলির মধ্যে এই পুস্তকটিও ছিল।

(৬) মু'আদ্দিলু ই'ওয়িজাজিল মীযান (মাপযন্ত্রের বক্রতা সংশোধনকারী)। উর্দু ভাষায় তিনি পুস্তকটি রচনা করেন। ড. ফান্ডার রচিত 'মীযানুল হক' (Scale of Truth) বা 'সত্যের মাপদণ্ড' গ্রন্থটির কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। এটি ইসলামের বিরুদ্ধে লিখিত পাদরিদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মক পুস্তক। ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার ও তথ্য-বিকৃতিতে পুস্তকটি পরিপূর্ণ। ১৮৩৩ সালে বইটির প্রথম ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং ১৮৩৫ সালে তিনি এর ফার্সী অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে এর উর্দু অনুবাদও প্রকাশিত হয়। ভারতের পাদরিগণ মুসলিমদের মধ্যে খৃস্টধর্ম প্রচারে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগারের জন্য এ পুস্তকটির উপরেই মূলত নির্ভর করতে থাকেন। ভারতের কতিপয় মুসলিম আলিম এ পুস্তকের মিথ্যাচার ও তথ্য-বিকৃতির বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে ছিল শাইখ আবূ মানসুর দেহলবী লিখিত 'মীযানুল মীযান' (মাপদণ্ডের মাপদণ্ড), শাইখ মুহাম্মাদ আল-হাসান রচিত 'আল-ইসতিফসার' (ব্যাখ্যা অনুসন্ধান) ও আল্লামা রাহ্মাতুল্লাহ লিখিত 'ইযালাতুল আওহাম' (বিভ্রান্তি অপনোদন)। এ সকল গ্রন্থের সমালোচনার কারণে মি. ফান্ডার সতর্ক হন। তিনি তাঁর পুস্তকের কিছু তথ্য পরিবর্তন করেন এবং বিশেষ করে তথ্যাদির পুনর্বিন্যাস করেন এবং ১৮৪৯ সালে আগ্রায় ফার্সী ভাষায় পুস্তকটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। পরবর্তী বছর ১৮৫০ সালে বইটির উর্দু সংস্করণ প্রকাশ করেন। মি. ফান্ডারের পুনর্বিন্যাসের ফলে বইটির বিষয়বস্তু ও মিথ্যাচারের বিশেষ পরিবর্তন না হলেও ভাষা ও বিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে ইসতিফসার বা ইযালাতুল আওহাম গ্রন্থ পাঠ করে 'মীযানুল হক' গ্রন্থের সাথে মিলাতে গেলে পাঠক পৃষ্ঠা, খণ্ড ও বাক্যের মিল খুঁজে পাবেন না। এতে পাঠকের কাছে মনে হবে যে, আল-হাসান বা রাহ্মাতুল্লাহ মি. ফান্ডারের পুস্তক না পড়ে আন্দাযে তাঁর বিরুদ্ধে লিখেছেন। এজন্য শাইখ রাহ্মাতুল্লাহ এ নতুন সংস্করণের বিভ্রান্তি ও মিথ্যাচার প্রকাশের জন্য 'মু'আদ্দিল ই'ওয়িজাজিল মীযান' বা মাপযন্ত্রের বক্রতা সংশোধনকারী নামক এই পুস্তকটি রচনা করেন। স্বাধীনতা

যুদ্ধের কারণে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ পুস্তকটি মুদ্রণ করতে পারেন নি। এ সময়ে পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়।

(৭) তাকলীবুল মাতা'ইন (অভিযোগের প্রত্যুত্তর)। মি. স্মিথ নামক জনৈক পাদরি 'তাহকীকুদ দীনিল হক' (সত্য ধর্ম অনুসন্ধান) নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। ১৮৪২ সালে ভারতে তিনি পুস্তকটি প্রকাশ করেন। শাইখ মুহাম্মাদ আল-হাসান পুস্তকটির প্রতিবাদে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ফলে পাদরি মি. স্মিথ তাঁর বইয়ের বিষয়বস্তু কিছু পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস করেন এবং ১৮৪৬ সালে পুস্তকটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। আল্লামা রাহমাতুল্লাহ 'তাকলীবুল মাতাইন' নামক এই পুস্তকে উক্ত পুস্তকের নতুন সংস্করণের অভিযোগাদি খণ্ডন করেন ও ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরেন। এই গ্রন্থটিও অমুদ্রিত অবস্থায় হারিয়ে যায়।

(৮) 'মি'ইয়ারুত তাহকীক' (সত্যানুসন্ধানের মানদণ্ড)। পাদরি সাফদার আলী 'তাহকীকুল ঈমান' (বিশ্বাসের অনুসন্ধান) নামক একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকটির প্রতিবাদে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ এই পুস্তকটি রচনা করেন। এই পুস্তকটিও অমুদ্রিত অবস্থায় হারিয়ে যায়। উপরের ৮টি পুস্তকই শাইখ রাহমাতুল্লাহ ভারতে থাকা অবস্থায় রচনা করেন।[১]

(৯) ইযহারুল হক (সত্যের প্রকাশ)। আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, গ্রন্থকার ইস্তাম্বুলে বসে ১৮৬৪ সালে পুস্তকটি রচনা করেন। খৃস্টধর্মের আলোচনায় ও ইসলামের বিরুদ্ধে পাদরিদের বিভ্রান্তি অপনোদনে গ্রন্থটি অতুলনীয়। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই অনেক মুসলিম মনীষী তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে ও বিশেষত খৃস্টধর্মের আলোচনায় বিভিন্ন পুস্তক রচনা করেছেন। এছাড়া ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী নওমুসলিম অনেক ইহূদী-খৃস্টান যাজক ও পণ্ডিত এ বিষয়ে অনেক পুস্তক রচনা করেছেন। তবে, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, আলোচনার গভীরতা, তথ্যের বিশুদ্ধতা, তথ্যসূত্রের নিরপেক্ষতা ও নির্ভরযোগ্যতা এবং সামগ্রিক উপস্থাপনায় ইযহারুল হক অসাধারণ ও অতুলনীয়। ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি গ্রন্থকার খৃস্টীয় ধর্মগ্রন্থ, ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসে যে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তা তাঁকে এই অসাধারণ গ্রন্থ রচনায় সক্ষম করেছে।

গ্রন্থটি শুধু মুসলিম জনসাধারণ ও আলিমগণকেই সাহায্য করে নি, উপরন্তু অনেক আলোক-প্রাপ্ত নও মুসলিমও এই পুস্তকটি থেকে উপকৃত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন খৃস্টধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণকারী প্রসিদ্ধ আরবীয় রাজপুত্র, সাহিত্যিক, সমাজসেবক ও রাজনৈতিক নেতা আহমদ ফারিস শিদইয়াক (১৮৮৭ খৃ/ ১৩০৪ হি)

১. ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/১৮-২১; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত ২/১০।

এবং খৃস্টধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণকারী এই শতকের প্রসিদ্ধ মিশরীয় পাদরি, প্রচারক, খৃস্টধর্মতত্ত্ববিদ ও ধর্মতত্ত্বের শিক্ষক ইবরাহীম খলীল আহমদ। একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পাঠককে গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে।

গ্রন্থকার তাঁর আলোচ্য বিষয়কে একটি ভূমিকা ও ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন।

(ক) ভূমিকা : প্রায় অর্ধশতপৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় কিছু মূলনীতি আলোচনা করেছেন, যেগুলি বইয়ের আলোচনা অনুধাবন করতে সাহায্য করবে। এ সকল বিষয়ের মধ্যে রয়েছে (১) ধর্মীয় বিতর্ক ও বাদ-প্রতিবাদের কতিপয় মূলনীতি ও শিষ্টাচার, (২) এ গ্রন্থে খৃস্টধর্ম বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহে বাইবেল এবং খৃস্টান পণ্ডিতদের লেখা যে সকল পুস্তকের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছেন সেগুলির তথ্যাদি বর্ণনা, (৩) মীযানুল হক ও অন্যান্য গ্রন্থে মি. ফান্ডারের মিথ্যাচার ও তথ্য-বিকৃতির নমুনা, (৪) ইসলামী গ্রন্থাদি থেকে উদ্ধৃতি প্রদানের সময় ড. ফান্ডার ও অন্যান্য খৃস্টান লেখকের তথ্য বিকৃতির রীতি, (৫) পরধর্ম আলোচনায় খৃস্টান পাদরিদের অসহিষ্ণুতা, নোংরা গালাগালি ও অপমানজনক শব্দাদি ব্যবহারের রীতি এবং এ সকল বিষয় বর্জন করার বিষয়ে গ্রন্থকারের ইচ্ছা, (৬) বাইবেলীয় নবীগণের বিষয়ে বাইবেলে উল্লিখিত ঘৃণ্য পাপের বর্ণনা ও উদ্ধৃতি উল্লেখের বিষয়ে মূলনীতি, (৭) ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্যের বিষয়ে পাদরি মহাশয়গণের গালভরা দাবি ও প্রকৃত মূর্খতার নমুনা।

(খ) প্রথম অধ্যায় : বাইবেল পরিচিতি। এ অধ্যায়ে গ্রন্থকার বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকাবলির বর্ণনা দিয়েছেন। অধ্যায়টিকে তিনি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে বাইবেলের স্বীকৃত, বিতর্কিত ও সন্দেহযুক্ত পুস্তকাদির নাম উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ সকল পুস্তকের ইতিহাস উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন খৃস্টান গবেষকের দেওয়া তথ্য ও মতামতের আলোকে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, অধিকাংশ পুস্তকের লেখক বা সংকলকের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। যাদের নামে এগুলি প্রচলিত তাঁরা এগুলি লিখেছেন বলেও প্রমাণিত নয় এবং লেখক থেকে পরবর্তী কয়েক শত বা কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত এর কোনো বর্ণনা সূত্র পাওয়া যায় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির মধ্যে বিদ্যমান অগণিত ভুল-ভ্রান্তি ও বৈপরীত্যের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্যের আলোচনা করেছেন এবং বাইবেলের পুস্তকাদির মধ্যে বিদ্যমান ১২৫টি বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে পুরাতন নিয়ম থেকে ৪৫টি স্ববিরোধিতা বা বৈপরীত্যের নমুনা উল্লেখ করেছেন এবং অবশিষ্টগুলি নতুন নিয়ম থেকে উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে তিনি বাইবেল

ঈশ্বরের বাণী কি না তা আলোচনা করেছেন। খৃষ্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরুদের তথ্য ও বক্তব্যের আলোকে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, খৃষ্টানদের পক্ষে বাইবেলের সকল পুস্তক ওহী বা ঐশ্বরিক প্রেরণার মাধ্যমে লিখিত বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তিনি ১৭টি বিষয়ের মাধ্যমে এ সম্পর্কে খৃষ্টান পাদরিদের দাবির অসারতা প্রমাণ করেছেন। বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, মুহাম্মাদ (স)-এর আগমনের পূর্বেই প্রকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিল হারিয়ে গিয়েছে।

(গ) দ্বিতীয় অধ্যায় : বাইবেল বিকৃতি। এ অধ্যায়ে তিনি বাইবেলের বিকৃতি প্রমাণ করেছেন। অধ্যায়টিকে তিনি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি মূল শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বিকৃতির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান এরূপ বিকৃতির ৩৫টি প্রমাণ তিনি উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ৩১টি প্রমাণ পুরাতন নিয়ম থেকে ও অবশিষ্ট ৪টি প্রমাণ নতুন নিয়ম থেকে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মূল বক্তব্যের মধ্যে অতিরিক্ত কথা সংযোজনের মাধ্যমে বিকৃতি সাধনের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান এ জাতীয় বিকৃতির ৪৫টি প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ২৬টি পুরাতন নিয়ম থেকে ও বাকিগুলি নতুন নিয়ম থেকে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি মূল বক্তব্য থেকে কিছু কথা বাদ দিয়ে বক্তব্যকে বিকৃত করার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তিনি বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান এ জাতীয় বিকৃতির ২০টি প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ১৫টি পুরাতন নিয়ম থেকে ও ৫টি নতুন নিয়ম থেকে।

এরপর তিনি বাইবেলের বিশুদ্ধতার দাবিতে যে সকল বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন কথা বলে খৃষ্টান পাদরিগণ মুসলিমদেরকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেন সেগুলি আলোচনা করেছেন এবং অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী দলিল-প্রমাণাদি দিয়ে তাদের এ সকল দাবি-দাওয়ার অসারতা প্রমাণ করেছেন।

(ঘ) তৃতীয় অধ্যায় : রহিতকরণ। এ অধ্যায়ে তিনি রহিতকরণের বাস্তবতা প্রমাণ করেছেন। তিনি রহিতকরণের অর্থ ও ক্ষেত্র ব্যাখ্যা করছেন। এছাড়া যুক্তি ও বিবেকের আলোকে আল্লাহর বিধান রহিত হওয়ার বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। এরপর তিনি বাইবেলের বহু সংখ্যক উদ্ধৃতি দিয়ে তার বাস্তবতা প্রমাণ করেছেন। বাইবেল থেকে প্রায় অর্ধ শত উদাহরণ দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, একই ভাববাদীর (নবীর) ব্যবস্থায় (শরীয়তে) আগের বিধান পরের নির্দেশ দ্বারা রহিত করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী ভাববাদী (নবী)-র শরীয়তের বিধান পরবর্তী ভাববাদীর শরীয়তে রহিত করা হয়েছে। ইহূদী ও খৃষ্টানগণ দাবি করেন যে, মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে ইহূদী ও খৃষ্টান ধর্মের বিধিবিধান রহিত হওয়া অসম্ভব। তিনি তাদের এই দাবির অসারতা প্রমাণ করেছেন।

(ঙ) চতুর্থ অধ্যায় : ত্রিত্ববাদ খণ্ডন। এ অধ্যায়ে গ্রন্থকার ত্রিত্ববাদের অসারতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করেছেন। অধ্যায়টিকে তিনি ১টি ভূমিকা ও তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। ভূমিকায় তিনি ত্রিত্ববাদ ও যীশুর ঈশ্বরত্ব বিষয়ে খৃস্টানদের বিশ্বাস আলোচনার ক্ষেত্রে ১২টি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে ত্রিত্ববাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি যীশুর বক্তব্যের দ্বারা ত্রিত্ববাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। তিনি যীশুর ১২টি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলি সুস্পষ্টভাবে ত্রিত্ববাদকে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি যীশুর ঈশ্বরত্ব ও ত্রিত্ববাদের স্বপক্ষে ত্রিত্ববাদীরা বাইবেলের যে সকল উক্তি উদ্ধৃত করেন সেগুলির আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে এ সকল উক্তির কোনোটিই দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট নয় বরং অন্যান্য সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যের আলোকে এগুলির সঠিক অর্থ ত্রিত্ববাদের অসারতা প্রমাণ করে।

(চ) পঞ্চম অধ্যায় : কুরআনের অলৌকিকত্ব। এ অধ্যায়ে গ্রন্থকার প্রমাণ করেছেন যে, কুরআন সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর বাণী এবং কুরআনের বিষয়ে পাদরিগণের বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের জবাব দিয়েছেন। অধ্যায়টিকে তিনি চারটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে বারটি সুস্পষ্ট বিষয়ের আলোকে প্রমাণ করেছেন যে, কুরআন আল্লাহর বাণী। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি কুরআনের বিষয়ে পাদরিগণের বিভ্রান্তি ও অপ-প্রচারের উত্তর প্রদান করেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট সংরক্ষিত সহীহ হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে তিনি হাদীসের বিষয়ে পাদরিগণের বিভ্রান্তি ও অপ-প্রচারের উত্তর প্রদান করেছেন।

(ছ) ষষ্ঠ অধ্যায় : মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়ত। এ অধ্যায়ে তিনি মুহাম্মাদ (স) নবুওয়ত প্রমাণ করেছেন এবং এ বিষয়ক সন্দেহ ও বিভ্রান্তি অপনোদন করেছেন। তিনি অধ্যায়টিকে দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেন। প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়তের প্রমাণ আলোচনা করেছেন। ৬ দিক থেকে তিনি তা প্রমাণ করেছেন : (১) তাঁর অলৌকিক কর্মসমূহ, (২) তাঁর অসাধারণ চরিত্র ও আচরণ, (৩) তাঁর শরীয়তের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ, (৪) গ্রন্থ ও ব্যবস্থাবিহীন জাতির মধ্যে তাঁর আগমন, (৫) বিশ্বমানবতার প্রয়োজনের সময়ে তাঁর আগমন, (৬) বাইবেলে পূর্ববর্তী ভাববাদিগণ কর্তৃক তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী। প্রত্যেকটি বিষয় তিনি সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন এবং ষষ্ঠ বিষয়ে তিনি বাইবেল থেকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিষয়ে ১৮টি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, যীশুর বিষয়ে বাইবেলের যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী খৃস্টানগণ উল্লেখ করেন, সেগুলির চেয়ে

মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন ও পরিচয় বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অনেক বেশি সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি মুহাম্মাদ (স)-এর বিষয়ে পাদরিগণের উত্থাপিত অভিযোগ ও বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারগুলির জবাব প্রদান করেছেন।

কুরআন ও মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে পাদরিগণের উত্থাপিত আপত্তি ও অভিযোগগুলি খণ্ডনের ক্ষেত্রে আল্লামা রাহমাতুল্লাহর অসাধারণ বৈশিষ্ট্য বাইবেলের আলোকে অভিযোগ খণ্ডন ও তুলনামূলক আলোচনা। প্রতিটি আপত্তি তিনি বাইবেলের সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে খণ্ডন করেছেন। এছাড়া তিনি পাদরিগণের প্রত্যেক অভিযোগের বিষয়ে অসংখ্য উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, তাঁরা কুরআন এবং মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপন করেন সেগুলির প্রত্যেকটি আপত্তি ও অভিযোগ বাইবেল, যীশুখৃষ্ট ও অন্যান্য বাইবেলীয় ভাববাদীর ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রযোজ্য। যেমন পাদরিগণ জিহাদের কারণে ইসলাম ও মুহাম্মাদ (স)-কে অভিযুক্ত করেন, অথচ বাইবেলের মধ্যে গণহত্যা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, অবিশ্বাসীদের হত্যা ও নির্যাতন ও জাতিগত বিদ্বেষের অগণিত নির্দেশ রয়েছে। অনুরূপভাবে পাদরিগণ বহুবিবাহের কারণে মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন, অথচ বাইবেলের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত বহুবিবাহ ছাড়াও যীশু ও অন্যান্য বাইবেলীয় ভাববাদীর জীবনে নারীঘটিত অনেক কলঙ্ক ও অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তুর্কি খলীফার উদ্যোগে মূল 'ইযহারুল হক' গ্রন্থ এবং বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশ খৃস্টানদেরকে অত্যন্ত বিচলিত করে। তারা সুসংগঠিতভাবে চেষ্টা করতে থাকেন বইটিকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে। এর মুদ্রিত কপিগুলি তারা বাজার থেকে ক্রয় করে নষ্ট করে ফেলতে থাকেন যেন কোনো মুসলিম বা খৃস্টান সাধারণ পাঠকের হাতে তা না পৌঁছায়। তবে, পুস্তকটির প্রকাশ ও প্রচারের বিষয়ে তুর্কি খলীফা ও প্রশাসনের বিশেষ মনোযোগ থাকার কারণে তাদের এই অপচেষ্টা পুরোপুরি সফলতা লাভ করতে পারে না।[১]

গ্রন্থটির প্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরে 'লন্ডন টাইমস' (London Times) পত্রিকায় বইটির বিষয়ে মন্তব্য করে বলা হয়, মুসলিমগণ যদি এই পুস্তকটি পাঠ অব্যাহত রাখে তবে মুসলিম সমাজে খৃস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার চিরতরে থেমে যাবে। একজন মানুষও খৃস্টধর্ম গ্রহণ করবে না বরং সকলেই ইসলামকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে।[২]

১. ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৭৪।

২. আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত ২/১৫; ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৭৪।

প্রকৃত অবস্থাও তাই হয়েছে। গ্রন্থটি অগণিত মুসলিম পাঠককে অভূতপূর্ব ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত করেছে, অনেক অমুসলিম পাঠককে ঈমানের পথে অনুপ্রাণিত করেছে, অনেক মুসলিম গবেষককে গবেষণার প্রেরণা ও তথ্য প্রদান করেছে এবং সর্বোপরি এ গ্রন্থ অনেক পাঠককে উদ্বুদ্ধ করেছে খৃস্টান মিশনারি ও পাদরিদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ সমকালীন প্রসিদ্ধতম ইসলাম প্রচারক ও তার্কিক আহমদ দীদাত (রহ)। তিনি কাকতালীয়ভাবে এই পুস্তকটি পাঠ করার সুযোগ পান। এই পুস্তকই খৃস্টান প্রচারকদের বিরুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হতে তাঁকে অভুতপূর্ব প্রেরণা এবং অজেয় জ্ঞানের অস্ত্র প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে তিনি এক স্থানে বলেন, "My discovery of the book 'IZHARUL HAQ' was the turning point in my life. After a short while I was able to invite the trainee missionaries of Adams Mission College and cause them to perspire under the collar until they developed a respect for Islam and its Holy Apostle."[৩৩]

মসি, অসি ও জিহ্বার মুজাহিদ আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবীকে মহান আল্লাহ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাতের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন এবং তাঁর গ্রন্থাবলি, বিশেষত মহামূল্যবান 'ইযহারুল হক' গ্রন্থটি পৃথিবীর সকল সত্য-সন্ধানীর হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন। আমীন।

---

৩৩. Ahmed Deedat Is THE BIBLE GOD'S WORD (Riyadh, International Islamic Publishing House), p 62.

পূর্বকথা

সকল প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি কোন সন্তান পরিগ্রহণ করেন নি। তাঁর রাজত্বে কখনোই তাঁর কোন অংশীদার ছিল না। তাঁরই পবিত্রতার ঘোষণা দিচ্ছি যিনি তাঁর বান্দার উপর গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং সেই গ্রন্থটিকে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য উপদেশ ও জ্ঞানের উৎস করেছেন। তিনি এর আয়াতসমূহের প্রমাণের মাধ্যমে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সত্যের পর্দা উন্মোচন করেছেন এবং এই গ্রন্থের মহামঞ্চে তিনি হেদায়াতের ঝাণ্ডাগুলিকে উড্ডীন করেছেন যেন সত্য তার বাণীসহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মহাগ্রন্থের প্রমাণাদির সম্মুখে সেই সব মানুষের দলীল প্রমাণাদি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে যারা কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্যকে প্রমাণ হিসাবে আঁকড়ে ধরত। 'তারা চাইত যে, আল্লাহর জ্যোতি তাদের মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দেবে। আর আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছুতেই রাজী নন, কাফিররা তা যতই অপছন্দ করুক'।[১]

আর সালাত ও সালাম সেই মহান ব্যক্তিত্বের উপর যাঁর নবুওয়তের অলৌকিক মু'জিযাগুলি সর্বোত্তম উদয়নে উদ্ভাসিত হয়েছে এবং যার শরীয়তের বিধিবিধানগুলি প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূর্ববর্তী সকল ধর্ম ও শরীয়ত রহিত করেছে। তাঁর প্রভু সকল দীনের উপর বিজয়ী করার জন্য তাঁকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁকে সুস্পষ্ট প্রজ্ঞাময় গ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন, যে গ্রন্থের একটি সূরার সমতুল্য সূরা আনয়ন করতে সুসাহিত্যিক বাগ্মীরা অক্ষম হয়েছে। তিনি আমাদের সর্দার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) যাঁর আগমনের সুসমাচার প্রচার করেছে তাওরাত ও ইনজীল এবং যাঁর আগমনে বাস্তবায়িত হয়েছে তাঁর পিতা ইবরাহীম খলীলের (আ) দোআ। আল্লাহর সালাত বর্ষিত হোক তাঁর উপর। তাঁর পরিবার-বংশধরদের উপর, যাঁরা তাঁর শরীয়তের অনুসরণ করে সফলকাম হয়েছেন এবং তাঁরই পথে চলে সুপথ পেয়েছেন। এবং তাঁর সাহাবী-সাথীদের উপর, যাঁদেরকে আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে একত্রিত ও সম্মিলিত করেছিলেন। ফলে তাঁরা হয়েছিলেন 'কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল কোমল।'[২]

অতঃপর, মহান করুণাময় প্রভুর করুণা-প্রত্যাশী বান্দা রাহমাতুল্লাহ ইবনু খলীলুর রাহমান- আল্লাহ তাঁকে ও তাঁর পিতামাতাকে ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন- পাঠকদের সমীপে নিম্নের আরয পেশ করছে।

১. সূরা ৯ : তাওবা, ৩২ আয়াত।

২. সূরা : ৪৮ ফাতহ, ২৯ আয়াত।

ভারতের বুকে ইংরেজদের রাজত্ব শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর তাদের সন্তোষজনক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে ৪৩ বছর পর্যন্ত[১] দেখা যায় নি যে, তাদের পণ্ডিত বা মিশনারীরা তাদের খৃস্টধর্মের দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করছে বা খৃস্টধর্ম প্রচার করছে।

এরপর তারা তাদের ধর্মপ্রচার শুরু করে। তারা ক্রমান্বয়ে এ বিষয়ে অগ্রসর হতে থাকে। এরপর তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বই-পুস্তিকা রচনা করে এবং বিভিন্ন শহরে সাধারণ মানুষদের মধ্যে তা বিতরণ করে। তারা বাজারে, রাস্তাঘাটে ও সাধারণ জনসমাগমের স্থানগুলিতে বক্তৃতা-আলোচনা করতে থাকে।

প্রথম দিকে অনেকদিন যাবৎ সাধারণ মুসলিমগণ তাদের এ সব বক্তৃতা-আলোচনা শুনতে ও তাদের বইপত্র পড়তে একেবারেই আগ্রহ দেখাতেন না। এজন্য ভারতের আলেমগণ খৃস্টান মিশনারীদের এ সকল বইপত্রের প্রতিবাদে কিছু লেখার বিষয়ে কোন দৃকপাত করেন নি। কিন্তু ক্রমান্বয়ে মিশনারী কর্মের প্রতি সাধারণ মানুষদের বিরক্তি কমতে থাকে এবং একেবারে অজ্ঞ অবোধ কিছু সাধারণ মানুষের পদস্খলনের ভয় দেখা দেয়। তখন কতিপয় মুসলিম আলিম এদের প্রতিবাদ প্রতিরোধে মনোনিবেশ করেন।

আমি নগণ্য ও অখ্যাত মানুষদেরই একজন এবং প্রাজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ আলেমদের মধ্যে গণ্য নই। এই মহাগুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আমি উপযুক্তও নই। তবুও আমি যখন তাদের লেখালেখি ও বক্তৃতাদির পর্যালোচনা করলাম এবং তাদের লেখা অনেক বইপত্র আমার কাছে পৌঁছল, তখন আমার কাছে এ বিষয়ে যথাসাধ্য কিছু চেষ্টা করাই ভাল বলে মনে হল।

প্রথমে আমি কিছু বই ও পুস্তিকা রচনা করলাম, যেন এগুলির মাধ্যমে বুদ্ধিবিবেকসম্পন্ন মানুষদের কাছে প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি ভারতে কর্মরত এবং ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিন্দামন্দ ও কুৎসা রটনায় রত খৃস্টান মিশনারী পণ্ডিতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও অভিজ্ঞ পাদ্রীকে প্রকাশ্য বিতর্কের জন্য আহ্বান করলাম। লেখালেখি ও বক্তৃতা-আলোচনা সব বিষয়েই এই ব্যক্তি ছিলেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধতম। তিনি হলেন 'মীযানুল হক' গ্রন্থের প্রণেতা ভারতীয় মিশনারীদের প্রধান পাদ্রী ড. ফানডার। আমি তাঁর ও আমার মধ্যে প্রকাশ্য মজলিসে বিতর্ক অনুষ্ঠানের জন্য তাঁকে চ্যালেঞ্জ করলাম। অনেক খৃস্টান মনে করত যে, মুসলিম

১. ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে ইংরেজরা ভারতের বুকে তাঁদের আধিপত্য শুরু করে। পরবর্তী এক শতাব্দীর মধ্যে তারা সমগ্র ভারত কব্জা করে নেয়। ১৭৯২-১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইংল্যান্ডে বিভিন্ন মিশনারী গঠন করা হয় ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য। বস্তুত উনবিংশ শতকের শুরু থেকেই মিশনারী কর্মের শুরু হয়। সে হিসেবে ১৭৫৭ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত ৪৩ বছর হয়। সম্ভবত গ্রন্থকার এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

আলেমগণ তাঁদের অপারগতার কারণেই পাদ্রীদের এই সকল বই-পুস্তিকার প্রতিবাদ করেন না। তাদের এই ধারণার অসারতা প্রমাণ করতেই ছিল আমার এই চ্যালেঞ্জ।

এর পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম ও খৃস্টানদের মধ্যে বিতর্কিত মূল ৫টি বিষয়ে প্রকাশ্যে বিতর্কের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়গুলি হলো : (১) বিকৃতি[১], (২) রহিতকরণ[২], (৩) ত্রিত্ববাদ[৩], (৪) কুরআনের সত্যতা ও (৫) মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়ত।

১২৭০ হিজরীর রজব মাসে (১৮৫৪ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে[৪]) আকবরাবাদ শহরে (আগ্রায়) প্রকাশ্য বিতর্কের মজলিস অনুষ্ঠিত হয়।

এক সম্মানিত বন্ধু[৫], আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবি করুন, আমাকে এই বিতর্কের মজলিসে সহযোগিতা করেন। অপরদিকে উক্ত পাদ্রীকে (ড. ফানডারকে) অন্য একজন পাদ্রী[৬] সহযোগিতা করেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে (প্রথম দুইদিনের বিতর্কে) রহিতকরণ ও বিকৃতি, এই দুইটি বিষয়ে আমাদের বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত পাদ্রী (ফানডার) লিখিত 'হাল্লুল ইশকাল' বা 'সমস্যা নিরসন' গ্রন্থের ভাষা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি এই দুইটি বিষয়কেই সূক্ষ্মতম ও প্রাচীনতম বিষয় বলে মনে করতেন। তিনি যখন এই দুইটি বিষয়ে পরাজয় দেখতে পেলেন তখন তিনি বাকি বিষয়গুলি নিয়ে বিতর্ক বন্ধ করে দিলেন।

এরপর ঘটনাচক্রে আমি মক্কা মুকাররামায় আগমন করি[৭]। সেখানে আমি হযরত আল্লামা সাইয়েদ আহমদ বিন যীনী দাহ্‌লান[৮] -এর নিকট -আল্লাহ তাঁর প্রেরণাকে কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করুন- উপস্থিত হই। তিনি আমাকে নির্দেশ দেন যে, উক্ত পাঁচটি বিষয়ে আমি আমার বইপুস্তকে যা কিছু লিখেছি তা যেন আমি আরবী ভাষায় অনুবাদ করি। কারণ আমার ইতোপূর্বে লেখা বইগুলি ফার্সী ভাষায় লেখা ছিল অথবা ভারতীয় মুসলমানদের ভাষায় (উর্দু) লেখা ছিল।

---

১. খৃস্টানদের নিকট রক্ষিত ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে বিকৃতি প্রমাণ করা।
২. খৃস্টানদের গ্রন্থাবলী ও বিধিবিধান ইসলামের আবির্ভাবের ফলে রহিত হয়েছে তা প্রমাণ করা।
৩. খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদ বিশ্বাসের অসারতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করা।
৪. ১০ ও ১১ই এপ্রিল, ১৮৫৪, ১১ ও ১২ই রজব, ১২৭০ হিজরী।
৫. ডা. উযীর খান। তিনি ইংল্যান্ডে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য গমন করেন। চিকিৎসা বিদ্যার পাশাপাশি তিনি খৃস্টধর্মের উপর প্রচুর লেখাপড়া করেন এবং এ বিষয়ক অনেক মূল্যবান গ্রন্থ সাথে করে ভারতে নিয়ে আসেন। ডা. উযীর খানের গ্রন্থাবলী ও ব্যক্তিগত সহযোগিতা গ্রন্থকারকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে।
৬. ফ্রেন্‌চ নামক একজন মিশনারী পাদ্রী।
৭. গ্রন্থকার এই বিতর্কের তিন বছর পর, ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে (সিপাহী বিপ্লবে) অংশ গ্রহণ করেন। এজন্য ইংরেজগণ তাঁর সকল সম্পত্তি বাযেয়াপ্ত করে এবং তাঁকে ধরে দেওয়ার জন্য ১ হাজার রুপিয়া পুরস্কার ঘোষণা করে। তখন তিনি ভারত থেকে হিজরত করে ১২৭৮ হিজরী মুতাবিক ১৮৬২ খৃস্টাব্দে মক্কায় পৌঁছান।
৮. মক্কার একজন প্রসিদ্ধ আলিম। ১২৩২ হি (১৮১৭ খৃ) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন মসজিদে হারামে শিক্ষাদান করেন। ১৩০৪ হি (১৮৮৬ খৃ) মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

আমার পূর্বের বইগুলি ফার্সী বা উর্দু ভাষায় লেখার কারণ হলো, প্রথম ভাষাটি ভারতের মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত এবং দ্বিতীয় ভাষাটি তাদের মাতৃভাষা। যে সকল পাদ্রী ভারতে অবস্থান করেন এবং সেখানে ধর্ম প্রচার করেন তাঁরা নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় ভাষায় (উর্দু ভাষায়) অত্যন্ত পারঙ্গম এবং তাঁরা প্রথম (ফার্সী) ভাষাও কিছুটা জানেন। বিশেষত যে পাদ্রী আমার সাথে বিতর্ক করেন ফার্সী ভাষায় তাঁর দখল ছিল উর্দুর চেয়েও বেশি।

আমার অভিভাবক আল্লামা আহমদ দাহলান-এর এই নির্দেশ পালন করা আমি আমার জন্য জরুরী বলে মনে করলাম। আমি তাঁর এই নির্দেশ পালনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু করলাম।

যাঁরা ইনসাফের পথে চলেন এবং বাড়াবাড়ির পথ পরিহার করেন তাঁদের থেকে আমি আশা করব যে, তাঁরা আমার ভুলভ্রান্তিগুলি আবৃত করবেন এবং আমার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করে দেবেন।

যিনি সকল কঠিনকে সহজ করেন সেই মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন দয়া করে আমাকে সত্য ও সঠিক পথে পরিচালিত করেন, এই গ্রন্থটিকে কবুল করেন, একে সাধারণ ও অসাধারণ সকলের জন্য কল্যাণকর করে দেন এবং একে বাতিলপন্থীদের বিভ্রান্তিকর প্রমাণাদি ও অন্যায়পন্থীদের ভিত্তিহীন ধারণা-বিশ্বাস থেকে হেফাযত করেন। তিনিই তো তাওফীক প্রদানের একমাত্র মালিক। তাঁরই হাতে সঠিকতার লাগাম। সর্বোপরি তিনি শক্তিমান এবং প্রার্থনা কবুলের আশা তাঁর থেকেই করা যায়।

আমি এই গ্রন্থটির নাম রেখেছি 'ইযহারুল হক' (সত্যের প্রকাশ)। আমি গ্রন্থটিকে একটি ভূমিকা ও ছয়টি অধ্যায়ে সাজিয়েছি।

ভূমিকা

কতিপয় জরুরী বিষয়ের বিবরণ যেগুলি সম্পর্কে সতর্কতা প্রয়োজন

প্রথম বিষয় : আমি এই গ্রন্থে অনেক স্থানে উন্মুক্তভাবে কিছু কথা উল্লেখ করেছি। এগুলি প্রটেস্ট্যান্ট[১] পণ্ডিতদের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছি। তাঁদেরকে আটকানো ও পরাজিত করার জন্যই এসকল উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। যদি পাঠক দেখেন যে, এসকল কথা ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী, তাহলে তিনি যেন সন্দিগ্ধ বা উদ্বিগ্ন না হন। আমি যখন কোন ইসলামী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি তখন আমি সাধারণত গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছি। তবে বিষয়টি খুব প্রসিদ্ধ হলে ভিন্ন কথা।

দ্বিতীয় বিষয় : আমার এই গ্রন্থে আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী থেকে উদ্ধৃতি এনেছি। খৃস্টান ধর্মগ্রন্থের (বাইবেলের) অনুবাদ, ব্যাখ্যা, ইতিহাস ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই বিষয়টি প্রযোজ্য। কারণ এই সম্প্রদায়ের মানুষেরাই ভারতে আধিপত্য করছে এবং এদের মিশনারী পণ্ডিতগণের সাথেই আমাকে বিতর্ক করতে হয়েছে। এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী আমার নিকট পৌঁছে। কখনো কখনো আমি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছি।

তৃতীয় বিষয় : পরিবর্তন ও সংশোধন প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের জন্য একটি স্বাভাবিক কর্ম। তাদের কোন গ্রন্থ যদি দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয় তাহলে দেখবেন যে, তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হয়েছে, যা প্রথম মুদ্রণে ছিল না। কখনো বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজন করা হয়। কখনো আলোচ্য বিষয়গুলিকে আগে পিছে করা হয়। এজন্য যখন এ সকল গ্রন্থ থেকে কোন উদ্ধৃতি দেওয়া হয় তখন তা উদ্ধৃত গ্রন্থের (Reference-এর) সাথে মিলিয়ে দেখতে গেলে সমস্যা দেখা দেয়। যদি একই সংস্করণ বা মুদ্রণের গ্রন্থ হয় তাহলে উদ্ধৃতি মিলে যায়। নাহলে সাধারণত উদ্ধৃতি মেলে না। এই সম্প্রদায়ের এই অভ্যাসের সাথে যাদের পরিচয় নেই তারা ধারণা করতে পারেন যে, উদ্ধৃতি দানকারী হয়ত ভুল করেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তার উদ্ধৃতি

---

১. গোড়া থেকেই খৃস্টানগণ বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত। মধ্যযুগে ইউরোপে ভ্যাটিকানের পোপের নিয়ন্ত্রিত 'রোমান ক্যাথলিক' মতবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমান যুগেও খৃস্টানদের মধ্যে এই মতই সর্বাধিক প্রচলিত। ষষ্ঠদশ শতকে মার্টিন লুথার (Martin Luther : ১৪৮২-১৫২৯ খৃ) পোপের আধিপত্য, অত্যাচার ও ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এরা প্রটেস্ট্যান্ট নামে পরিচিত। ধর্মবিশ্বাস প্রায় একই; তবে এরা রাষ্ট্র, ব্যক্তি বা ধর্মের উপর পোপের কর্তৃত্ব মানেন না। রাজনৈতিক কারণেই ইংল্যান্ডের রাজারা প্রটেস্ট্যান্ট মত গ্রহণ করেন। উনবিংশ শতকের শুরুতে মূলত ইংল্যান্ডের প্রটেস্ট্যান্ট খৃস্টানদের মিশনারীরাই ভারতে কাজ করছিল। এজন্য গ্রন্থকার এদের বিভ্রান্তি প্রমাণের জন্য তাদের পণ্ডিতদের গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

ঠিকই আছে। এ সকল পাদ্রীর কর্মের মধ্যে এই অভ্যাসটি বিরাজমান। আমি নিজে তাঁদের এই অভ্যাসের সাথে পরিচিত হওয়ার আগে দুইবার বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলাম। এজন্য এই বিষয়ে গবেষণাকারীকে তাঁদের এই স্বভাবের বিষয়ে পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে যেন তিনি নিজে ভুলের মধ্যে না পড়েন বা কেউ তাকে ভুলের মধ্যে না ফেলতে পারে। এক্ষেত্রে উদ্ধৃতি বা তথ্য প্রদানকারী ভুল করেছেন বলে যেন তিনি ধারণা না করেন।

আমি যে সকল গ্রন্থ থেকে আমার এই বইয়ের তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি ও উদ্ধৃতি দিয়েছি সে সকল গ্রন্থের বর্ণনা নিম্নে প্রদান করছি :

১. মূসা (আ)-র পাঁচ গ্রন্থের[১] আরবী অনুবাদ। উইলিয়াম ওয়াট্স কর্তৃক ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে লন্ডনে মুদ্রিত, ১২৬৪ খৃস্টাব্দে রোমে মুদ্রিত সংস্করণের ভিত্তিতে।
২. বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের সকল গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। উপরোক্ত উইলিয়াম ওয়াটস কর্তৃক ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত। এই সংস্করণে তিনি যাবূর গ্রন্থের (গীতসংহিতা, The Book of Psalms) নবম ও দশম পরিচ্ছেদকে একত্র করেছেন। আর তিনি ১৪৭তম পরিচ্ছেদকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এর ফলে ১০ম পরিচ্ছেদ থেকে ১৪৭তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অধ্যায়গুলির ক্রমিক সংখ্যা অন্যান্য অনূদিত সংস্করণের চেয়ে এক কম হয়েছে। এছাড়া বাকি সব একই আছে। যদি গবেষক/পাঠক উদ্ধৃতি বা তথ্যসূত্রের মধ্যে এই ক্ষেত্রে অন্যান্য অনূদিত সংস্করণের সাথে পার্থক্য দেখতে পান তাহলে অবশ্যই এই বিষয়টিকে পার্থক্যের কারণ বলে জানবেন।
৩. নতুন নিয়মের আরবী অনুবাদ। ১৮৬০ সালে বৈরুতে মুদ্রিত। আমি নতুন নিয়মের কোন বাক্য উদ্ধৃত করলে সাধারণত এই সংস্করণ থেকে তা উদ্ধৃত করেছি। কারণ এই সংস্করণের অনুবাদের ভাষা প্রথম অনুবাদের ভাষার মত অত দুর্বল নয়।
৪. আদম ক্লার্ক কর্তৃক নতুন ও পুরাতন নিয়মের ব্যাখ্যা। ১৮৫১ খৃস্টাব্দে লন্ডনে মুদ্রিত।
৫. হর্ন লিখিত ব্যাখ্যা। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে লন্ডনে তৃতীয় মুদ্রণ।
৬. হেনরী ওয়াস্কট লিখিত ব্যাখ্যা। লন্ডনে মুদ্রিত।
৭. লর্ডনার লিখিত ব্যাখ্যা। লন্ডনে ১৭১৭ খৃস্টাব্দে দশ খণ্ডে মুদ্রিত।
৮. ডাওয়ালী ও রজার্ডমেন্ট -এর ব্যাখ্যা। ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে লন্ডনে মুদ্রিত।
৯. হার্সলীর ব্যাখ্যা।
১০. ওয়াসটনের ব্যাখ্যা।

১. বাইবেলের পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি গ্রন্থ, যেগুলিকে একত্রে তাওরাত (Torah or Pentateuch) বলা হয়।

১১. রাজকীয় সীলমোহরসহ প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত বাইবেল[১]। ১৮১৯, ১৮৩০, ১৮২১ ও ১৮৩৬ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত।

১২. রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম। ১৮৪০ খৃস্টাব্দে ডাবলিনে[২] মুদ্রিত।

এ ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি, যেগুলি যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে। ইংরেজ আধিপত্যাধীন দেশগুলিতে এ সকল গ্রন্থ সহজলভ্য। কাজেই এই বইয়ের উল্লিখিত কোন তথ্য বা উদ্ধৃতি সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ হলে তিনি তা মূল গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

চতুর্থ বিষয় : যদি আমার লেখায় কোন স্থানে খৃস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে আসমানী কিতাব বলে স্বীকৃত কোন গ্রন্থের প্রতি বা কোন একজন নবীর প্রতি (আলায়হিমুস সালাম) অবমাননাকর কিছু প্রকাশ পায় তাহলে পাঠক যেন তা আসমানী গ্রন্থসমূহ ও নবীগণের প্রতি আমার বিশ্বাসের দুর্বলতার প্রকাশ বলে মনে না করেন। আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্‌র কোন গ্রন্থের প্রতি বা কোন একজন নবীর প্রতি বে-আদবী করা ঘৃণ্যতম অন্যায়। আল্লাহ আমাকে ও সকল মুসলমানকে তা থেকে রক্ষা করুন।

প্রকৃত বিষয় হলো, বিভিন্ন নবীর নামে প্রচারিত যে সকল গ্রন্থকে আসমানী বা ওহীলব্ধ গ্রন্থ বলে তারা দাবী করছে সেগুলি ওহীলব্ধ গ্রন্থ বলে প্রমাণিত হয় নি বরং উল্টোটাই প্রমাণিত হয়েছে। একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সকল গ্রন্থে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলিকে কঠোরভাবে নিন্দা ও প্রতিবাদ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জরুরী। একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সকল গ্রন্থের মধ্যে ভুল, বৈপরীত্য, পরস্পর বিরোধিতা ও বিকৃতি রয়েছে। এজন্য আমি একথা বলতে বাধ্য যে, এসকল গ্রন্থ আসমানী গ্রন্থ নয়। অনুরূপভাবে এ সকল গ্রন্থের মধ্যে উল্লিখিত কিছু গল্প-কাহিনীর নিন্দা ও প্রতিবাদ করতে আমি বাধ্য।

যেমন তাদের গ্রন্থের (বাইবেলের) মধ্যে রয়েছে যে, লোট বা লূত (আঁ) মদ খেয়ে মাতাল হন এবং তার দুই কন্যার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। তাঁর কন্যাদ্বয় এই ব্যভিচারের মাধ্যমে পিতা কর্তৃক গর্ভধারণ করেন[৩]।

১. KJV : King James Version নামে পরিচিত। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস ১৬০৪ সালে একটি ধর্মীয় সম্মেলনের আহ্বান করেন। উক্ত সম্মেলনের ফলে ১৬১১ খৃস্টাব্দে তৎকালীন প্রচলিত 'বাইবেলের' কাটছাট করে একটি 'বিশুদ্ধ' বাইবেল প্রকাশ করা হয়। বাইবেলের এই সংস্করণ বা ভার্সনই বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত। পরবর্তীতে কয়েকবার তা 'পরিমার্জন' ও 'সংশোধন' করা হয়।

২. ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ আয়ারল্যান্ডের রাজধানী। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী রোমান ক্যাথলিক খৃস্টান। পক্ষান্তরে ইংল্যান্ডের অধিবাসীরা মূলত প্রটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী।

৩. লূত (আ) এর নামে এই ঘৃণ্য মিথ্যা অপবাদের কাহিনীর জন্য পড়ুন, বাইবেল, আদিপুস্তক (Genesis), ১৯ : ৩০-৩৮।

আরো রয়েছে যে, দায়ূদ (আ) উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হন এবং এই ব্যভিচারের ফলে স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হয়। তখন দায়ূদ সেনাপতিকে পরামর্শ দেন কৌশলে যুদ্ধের মাঠে উরিয়কে বধ করার জন্য। এভাবে উরিয় নিহত হয় এবং দায়ূদ তার স্ত্রীকে ভোগ করেন।[১]

আরো রয়েছে যে, হারূন (আ) একটি গো-বৎসের স্বর্ণমূর্তি তৈরি করেন এবং তার পূজার জন্য মন্দির তৈরি করেন। তারপর হারূন (আ) ও ইহূদীগণ সেই মূর্তির উপাসনা করেন, তাকে সাজদা করেন এবং তার উদ্দেশ্যে পশু কুরবানী করেন[২]। অনুরূপভাবে অন্য কাহিনীতে রয়েছে যে, শলোমন (সুলায়মান আ.) শেষ বয়সে ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যান। তিনি মূর্তিপূজা শুরু করেন এবং মূর্তির জন্য উপাসনালয় তৈরি করেন[৩]। তাদের গ্রন্থগুলি বা বাইবেলের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় না যে, তিনি তাওবা করেছিলেন বরং বাহ্যত বুঝা যায় যে, তিনি মুশরিক ও মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

এ সকল কাহিনী এবং অনুরূপ কাহিনীগুলির প্রতিবাদ করা আমাদের জন্য জরুরী। আমরা নিশ্চিতরূপে বলি যে, এগুলি সত্য নয়। আমরা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করি যে, এই প্রকারের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড কখনোই কোন নবী করতে পারেন না।

অনুরূপভাবে যখন আমি ভুলকে ভুল বলব আমাকে তখন বাধ্য হয়েই তা বলতে হবে। এ বিষয়ে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তাঁরা কি দেখেন না যে, কিভাবে তাঁরা কুরআন কারীম ও হাদীসে নববীর অপবাদ প্রদানে সীমালঙ্ঘন করে থাকেন? কিভাবে তাঁদের কলম থেকে আপত্তিকর শব্দাবলী নির্গত হয়? কিন্তু সমস্যা হলো, মানুষ নিজের দোষ দেখতে পায় না, তা যতই বড় হোক। আর অন্যের দোষ যদি সামান্যও হয় তার প্রতিবাদে লিপ্ত হয়। যীশু খৃষ্ট (ঈসা মসীহ আ.) অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন, "আর তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে কুটা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ, কিন্তু তোমার নিজের চক্ষে যে কড়িকাট আছে, তাহা কেন ভাবিয়া দেখিতেছ না? অথবা তুমি কেমন করিয়া আপন ভ্রাতাকে বলিবে, এস, আমি তোমার চক্ষু হইতে কুটা গাছটা বাহির করিয়া দিই? আর দেখ তোমার নিজের চক্ষে কড়িকাট রহিয়াছে! হে কপট, আগে আপনার চক্ষু হইতে কড়িকাট বাহির করিয়া ফেল, আর তখন তোমার ভ্রাতার চক্ষু হইতে কুটা গাছটা বাহির করিবার নিমিত্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।" মথি লিখিত সুসমাচারের ৭ম অধ্যায়ে এ কথা রয়েছে।[৪]

---

১. দাউদ (আ)-এর নামে প্রচারিত এই মিথ্যা কল্পকাহিনীটি বিস্তারিত পড়ুন, বাইবেল, ২ শমূয়েল (2 Samuel), ১১ : ১-২৭।

২. এই জঘন্য মিথ্যাটি 'পবিত্র বাইবেলের' অংশ। দেখুন যাত্রাপুস্তক (Exodus), ৩২ : ১-৩৫।

৩. সুলায়মান (আ)-এর প্রতি আরোপিত এই মিথ্যা কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন : ১ রাজাবলি (1 Kings), ১১ : ১-১৩।

৪. মথি : ৭/৩-৫।

পঞ্চম বিষয় : অনেক সময় প্রতিপক্ষের জন্য কষ্টদায়ক কথাও বলতে হয়। ঈসা মসীহ (আ) কিভাবে ইহুদী অধ্যাপক ও ফরীশীগণকে মুখোমুখি সম্বোধন করেছেন তা লক্ষ্য করুন। তিনি বলেছেন; 'হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটরা, ধিক্ তোমাদিগকে!'[১] 'হা অন্ধ পথ-প্রদর্শকেরা, ধিক্ তোমাদিগকে!'[২], 'মূঢ়েরা ও অন্ধেরা'[৩], 'অন্ধ ফরীশী'[৪], 'সর্পেরা, কালসর্পের বংশেরা, তোমরা কেমন করিয়া বিচারে নরকদণ্ড এড়াইবে?'[৫]।

তিনি সকল মানুষের সামনে তাদের অপকর্মগুলি প্রকাশ করে দেন[৬]। শেষ পর্যন্ত তাদের কেউ কেউ বলে, 'হে গুরু, এ কথা বলিয়া আপনি আমাদেরকে অপমান করিতেছেন।'[৭]

এছাড়া লক্ষ্যণীয়, তিনি কিভাবে কনানীয় (ফিলিস্তিনী) মানুষদেরকে 'কুকুর' বলে আখ্যায়িত করেছেন; কারণ তারা কাফির ছিল।[৮]

আরো লক্ষ্য করুন, কিভাবে যোহন বাপ্তাইজক (ইয়াহইয়া আ.) ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন : 'হে সর্পের বংশেরা, আগামী কোপ হইতে পলায়ন করিতে তোমাদিগকে কে চেতনা দিল?'। মথিলিখিত সুসমাচারের তৃতীয় অধ্যায়ে এ কথা উল্লিখিত রয়েছে।[৯]

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, পণ্ডিতদের মৌখিক বিতর্কের ক্ষেত্রে মানবীয় প্রকৃতির তাড়নাতেই এই প্রকারের শব্দাদির ব্যবহার হয়ে থাকে। একটু তাকিয়ে দেখুন, প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের মুরশিদ ও সংস্কারবাদীদের নেতা মি. লুথার (১৪৮২-১৫২৯ খৃ) সেই যুগের খৃস্টান সম্প্রদায়ের শিরোমণি ও নেতা, তাঁর সমসাময়িক পোপ (দশম লিও : ১৪৭৫-১৫২১ খৃ) সম্পর্কে কি প্রকারের ভাষা ব্যবহার করেছেন! আরো দেখুন তিনি তৎকালীন ক্ষমতাসীন ইংল্যান্ডের রাজা ৮ম হেনরী (১৫৪৭ খৃ) সম্পর্কেই বা কিরূপ ভাষা ব্যবহার করেছেন।

---

১. মথি : ২৩/১৩, ১৪, ১৫, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯।

২. মথি : ২৩/১৬।

৩. মথি : ২৩/১৭, ১৯।

৪. মথি : ২৩/২৬।

৫. মথি : ২৩/৩৩।

৬. দেখুন : মথি ২৩/১৩-৩৬, লূক ১১/৩৭-৫৪।

৭. লূক : ১১/৪৫।

৮. একজন কনানীয় মহিলা তার কন্যার সুস্থতার জন্য যীশুর নিকট দোয়া চাইলে তিনি তাকে দোয়া করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, 'সন্তানের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়।' বিস্তারিত দেখুন, মথি : ১৫/২১-২৮।

৯. মথি ৩/৭।

এখানে আমি 'ক্যাথলিক হেরাল্ড' গ্রন্থের নবম খণ্ডের ২৭৭ পৃষ্ঠা থেকে প্রটেস্ট্যান্ট নেতা লুথারের কিছু বক্তব্য অনুবাদ করছি। এই গ্রন্থের লেখক দাবি করেছেন যে, তিনি লুথারের এই বক্তব্যগুলি লুথার রচিত সপ্তখণ্ড গ্রন্থের ২য় ও ৭ম খণ্ড থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

১৫৫৮ সালে ছাপা গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডের ২৭৪ পৃষ্ঠায় সম্মানিত প্রটেস্ট্যান্ট নেতা পোপের বিষয়ে বলেন,

"আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদের মধ্যে যে সকল বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা হয় তা প্রকাশ করতে। আমি অবশ্যই জানি যে, আল্লাহ্র পবিত্র গ্রন্থ তোমাদের নিকট রয়েছে। হে আমার ক্ষুদ্র পোপ! আস্তে আস্তে চল। হে আমার গর্দভ! নিজেকে পতন থেকে রক্ষা কর। হে আমার গর্দভ পোপ! নিজেকে রক্ষা কর। হে আমার ক্ষুদ্র গর্দভ পোপ! আগে যেও না, হয়তবা তোমার পতন হবে এবং পা ভেঙে যাবে। কারণ, এ বছর বাতাস খুবই কম। ফলে জমাট বরফের স্তর খুবই পুরু এবং তাতে পা পিছলে যাচ্ছে। তুমি যদি পড়ে যাও তাহলে সৃষ্টিজগত উপহাস করবে। এ কী শয়তানী কর্ম! হে পাপিষ্ঠগণ! তোমরা আমার নিকট থেকে দূর হও। নির্বোধ, নীচ, গর্দভেরা! তোমরা অবজ্ঞার সাথে দূর হও। তোমাদের মনে কি কল্পনা হয় যে, তোমরা গর্দভের চেয়েও উত্তম? হে পোপ! তুমি একটি গর্দভ, বরং তুমি একটি নির্বোধ গর্দভ এবং তুমি সদা সর্বদা গর্দভই থেকে যাবে।..."

এরপর তিনি উপরিউক্ত খণ্ডের ৪৭৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "আমি যদি বিচারক হতাম তাহলে ফয়সালা দিতাম যে, পাপিষ্ঠগণ : পোপ ও তার অনুসারিগণ সকলকে বন্দী করতে হবে। এরপর সবাইকে রোম থেকে তিন মাইল দূরে ইসটিয়ার সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে হবে। কারণ তা সুন্দর স্নানাগার এবং সেখানে ডুবালে পোপ ও তার সকল অনুসারী সকল রোগব্যাধি ও দুর্বলতা থেকে সুস্থ হয়ে যাবে। আমি আমার এই বক্তব্য প্রদান করছি; উপরন্তু আমি ঈসা মসীহকে আমার যামানত প্রদান করছি যে, যদি আমি তাদেরকে হাল্কাভাবে আধঘন্টা ডুবিয়ে রাখি তাহলে তারা সবাই সকল রোগব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।..."

উপরিউক্ত খণ্ডের ৪৫১ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, "পোপ এবং তার অনুসারিগণ পাপিষ্ঠ, অশান্তি সৃষ্টিকারী, ধোঁকাবাজ, মিথ্যাবাদীদের একটি দল। তারা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বড় জাহান্নামী, শয়তানে পরিপূর্ণ পাপিষ্ঠদের একটি আখড়া। এই আখড়ার থুথু থেকে এবং কফ থেকে শয়তান উৎপন্ন হয়।..."

১৫৬২ সালে ছাপা ২য় খণ্ডের ১০৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, "আমি প্রথমে বলেছিলাম যে, 'জানহিস'-এর কিছু বিষয় ইঞ্জিলিয়দের (অলঙ্ঘনীয়) বিষয়। এখন আমি সেকথা প্রত্যাহার করে বলছি যে, 'জানহিস'-এর সকল বিষয় যা দাজ্জালটি (পোপ) ও

তার সহচরগণ কন্সটান্স-এর সভায়[১] অস্বীকার করেছে সেগুলি সবই অবশ্য-স্বীকার্য বিষয়। হে আল্লাহর পবিত্র প্রতিনিধি! আমি তোমাকে মুখোমুখি বলছি, এগুলি সবই অনস্বীকার্য বিষয়। আর তোমার প্রত্যেকটি বিষয়ই শয়তানী বিষয় ও অবিশ্বাসের বিষয়। অতএব তুমি 'জানহিস'-এর বিষয়গুলি মেনে নাও এবং ঈশ্বরের করুণায় সেগুলি সমর্থন করতে প্রস্তুত হও।"

'জানহিস' এর বিষয়গুলির মধ্যে একটি বিষয় ছিল : 'শাসক বা যাজক-পাদরী যদি কবীরা গোনাহ বা কঠিন পাপে লিপ্ত হন তাহলে তিনি আর শাসক বা পাদরী থাকতে পারবেন না।'

যেহেতু সংস্কারবাদী প্রটেস্ট্যান্টদের নেতার মতে জানহিস-এর সকল সিদ্ধান্তই অলঙ্ঘনীয় ও অবশ্য-স্বীকার্য, সেহেতু এই মূলনীতির ভিত্তিতে কোন প্রটেস্ট্যান্টই শাসক বা পাদরী হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। কারণ তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে কঠিন পাপসমূহে লিপ্ত নয়।

সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হলো, (এদের মতে) নবীদের জন্যও নিষ্পাপ হওয়া শর্ত নয়।[২] প্রটেস্ট্যান্ট নেতার মতে নবীগণও নিষ্পাপ ছিলেন না- অথচ শাসক ও যাজক হওয়ার জন্য নিষ্পাপ হওয়া শর্ত! সম্ভবত এদের মতে নবীর পদটি পাদরীর পদের চেয়েও নিম্নমানের!

এগুলিতো গেল তৎকালীন পোপের সম্পর্কে প্রটেস্ট্যান্ট নেতার ব্যবহৃত শব্দাবলীর নমুনা। আর তৎকালীন ইংল্যান্ডের সম্রাট ৮ম হেনরী[৩] (১৫০৯-১৫৪৭ খৃ) সম্পর্কে প্রটেস্ট্যান্ট নেতার শব্দাবলী নিম্নরূপ :

১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ৭ম খণ্ডের ২৭৭ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন :

১. নিঃসন্দেহে সম্রাট মিথ্যা কথা ও বাজে কথায় এত লালা ফেলেছেন যে, লুথার ভয় পাচ্ছে।
২. আমি পৌরুষহীন লজ্জাহীন মিথ্যুকের সাথে কথা বলছি। সে যখন নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে নিজের সম্রাটের পদমর্যাদার গুরুত্ব রাখলো না, তখন আমি কেন তার মিথ্যাচার তার কণ্ঠে ছুড়ে মারব না?

---

১. পশ্চিম জার্মানীর একটি শহর, যেখানকার একটি প্রাচীন দুর্গে ১৪১৪-১৪১৮ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান যাজকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনাদি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সকল সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল পোপের কর্মকাণ্ডের সংস্কার। এজন্য পোপ এ সকল সম্মেলনের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করেন।

২. তাদের ধর্মগ্রন্থে নবীদের নামে যে সকল জঘন্যতম পাপের কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে বুঝা যায় যে, তারা নবীদের জন্য নিষ্পাপ হওয়া জরুরী মনে করেন না।

৩. ৮ম হেনরী ১৪৯১ খৃ জন্মগ্রহণ করেন। ১৫০৯ থেকে ১৫৪৭ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ইংল্যান্ডের সিংহাসনে ছিলেন। তিনি প্রথমে লুথার-এর বিরোধিতা করতেন এবং পোপ তাঁকে 'ধর্মরক্ষক' উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে পোপের সাথে মতভেদ হলে ১৫৩৪ খৃ তিনি নিজেকে ইংলিশ চার্চের প্রধান হিসাবে ঘোষণা করেন এবং পোপের সমুদয় কর্তৃত্ব নিজে গ্রহণ করেন। তাঁর সময়েই রোমান ক্যাথলিক চার্চের সাথে ইংল্যান্ডের বিচ্ছেদ ঘটে।

৩. হে অজ্ঞ কাঠের চৌবাচ্চা! তুমি মিথ্যা কথা বল। আর নির্বোধ সম্রাট হলো কাফন চোর।

৪. এভাবেই এই নির্বোধ দুরাচার সম্রাট অর্থহীন প্রলাপ বকে।

এ থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, প্রতিপক্ষের জন্য এই ধরনের শব্দাবলী ব্যবহার করা প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের নিকট বৈধ। তবে যদি তাঁরা দাবী করেন যে, লুথার মানবীয় দুর্বলতার কারণে এই প্রকারের শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন তাহলে ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে আমি বলব যে, তাঁদের আদর্শ নেতা যে সকল শব্দ ব্যবহার করেছেন, আমি ইনশাআল্লাহ ইচ্ছাপূর্বক খৃষ্টান পণ্ডিতদের ক্ষেত্রে এ জাতীয় একটি শব্দও ব্যবহার করব না। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন এমন শব্দ ব্যবহার করে ফেলি যা তাঁদের ধারণায় তাঁদের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তাহলে আমি তাঁদের নিকট ক্ষমা ও প্রার্থনা আশা করছি। যীশু খ্রিস্ট বলেছেন, "তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও; এবং যাহারা তোমাদের তাড়না করে তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও।"[১]

ষষ্ঠ বিষয় : ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এক শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যাদেরকে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ 'অবিশ্বাসী' বা 'ধর্মদ্রোহী' (atheist, heretic, infidel) বলে আখ্যায়িত করেন। এরা নবুওয়ত ও ইলহাম অস্বীকার করেন। তারা ধর্মগুলির প্রতি এবং বিশেষত খৃষ্ট ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ ও উপহাস করেন। তারা নবীগণ সম্পর্কে এবং বিশেষত যীশুখ্রিস্ট সম্পর্কে অসৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলেন। এদের সংখ্যা এ সকল দেশে দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এদের পুস্তকাদি প্রসিদ্ধি লাভ করছে। এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এদের কিছু কথা উদ্ধৃত করা হবে। এদের কথা উদ্ধৃত করতে দেখে যেন কেউ মনে না করেন যে, আমি এদের কথাগুলি বা কর্মকাণ্ড পছন্দ করছি। কখনোই নয়! কস্মিন কালেও নয়!! কারণ যাদের নবুওয়ত আমাদের নিকট প্রমাণিত তাঁদের মধ্য থেকে কোন একজন নবীর নবুওয়ত অস্বীকারকারী, বিশেষত ঈসা মসীহ (আ)-এর নবুওয়ত অস্বীকারকারী ব্যক্তি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত অস্বীকারকারীর মতই অপরাধী। এ সকল ধর্মদ্রোহীদের কথাবার্তা আমি বরং এই উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করেছি যে, প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ যেন জানতে পারেন যে, তাদের জাতির এবং নিজ দেশের অধিবাসিগণ তাদের খৃষ্টীয় ধর্মের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করছেন সেগুলির তুলনায় প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করছেন সেগুলি কিছুই নয়।

সপ্তম বিষয় : অধিকাংশ প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতের অভ্যাস হলো, প্রতিপক্ষের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে তারা জিদ ও প্রতিশোধস্পৃহা নিয়ে প্রতিপক্ষের বইটি ঘাটতে থাকেন। যদি পুরো বইয়ের মধ্যে সামান্য কয়েকটি দুর্বল কথা তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে

---

১. মথি : ৫/৪৪।

তাকে তাঁরা পুঁজি বানিয়ে নেন। তাঁরা সাধারণ পাঠকদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য এই দুর্বল কথাগুলি উদ্ধৃত করেন এবং বলেন, প্রতিপক্ষের পুরো বইটিই এইরূপ দুর্বল কথায় ভরা। অথচ প্রকৃত অবস্থা হলো, তাঁরা প্রচুর খোঁজাখুজি করেও উক্ত বইয়ে এই কয়েকটি দুর্বল কথা ছাড়া আর কোন দুর্বলতা পান নি। এরপর তাঁরা প্রতিপক্ষের যে কথাগুলির ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করতে পারেন সেগুলির আলোচনা করেন। আর প্রতিপক্ষের শক্ত ও সুদৃঢ় কথাগুলি একদম এড়িয়ে যান। সেগুলির দিকে ইঙ্গিতও করেন না। তাঁরা প্রতিবাদ ও প্রতিউত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের গ্রন্থের বক্তব্যগুলি পুরোপুরি উদ্ধৃত করেন না। করলে পাঠকের জন্য উভয় পক্ষের বক্তব্য তুলনা করা সম্ভব হতো। কিন্তু তাঁরা তা করেন না। উপরন্তু তাঁরা প্রতিপক্ষের বক্তব্য উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ততা ও শঠতার আশ্রয় নেন এবং তা বিকৃত করেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হলো, পাঠককে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত করা যেন তাঁদের উদ্ধৃত কয়েকটি বাক্য পড়ে পাঠক মনে করেন যে, উক্ত প্রতিপক্ষের সকল বক্তব্যই এইরূপ।

নিঃসন্দেহে এই অভ্যাস ভাল নয়। যে ব্যক্তি এই অভ্যাস ধরতে পেরেছেন তিনি নিশ্চিতরূপে জেনেছেন যে, প্রতিপক্ষের গ্রন্থে এরা এই কয়েকটি দুর্বলতা ছাড়া আর কোন দুর্বলতা খুঁজে পাননি। আর একথা তো স্পষ্ট যে, উদ্ধৃত এই দুই একটি দুর্বলতা যদি সত্যও হয় তাহলে এর দ্বারা পুরো গ্রন্থের দুর্বলতা প্রমাণিত হয় না। বিশেষত যদি তা বড় গ্রন্থ হয়। কারণ কোন গ্রন্থ যদি ওহী বা Divine Inspiration-এর মাধ্যমে পাওয়া গ্রন্থ না হয় তাহলে তার মধ্যে স্বভাবতই দুই একটি দুর্বল কথা থাকতে পারে। মানবীয় কথা এইরূপ দুর্বলতা থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন। প্রবাদে বলা হয় : প্রত্যেক তরবারীরই স্খলন আছে এবং সব ঘোড়াই হোচট খেয়ে থাকে। আর প্রথম মানুষ প্রথম ভুলকারী।

আমাদের মতে ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিরাপদ থাকে শুধু ওহীর বাণী ও ওহীর গ্রন্থ, আর কিছুই নয়। তাঁরা কি দেখছেন না যে, তাঁদের প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদের নেতা মি. লুথারের সময় থেকে আজ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে এমন একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতও নেই যার কথার মধ্যে কোন দুর্বলতা বা ভুলভ্রান্তি নেই। যদি তাঁরা একথা না মানেন তাহলে দাবী পেশ করুন, আমরা প্রমাণ দেব।

এমতাবস্থায় আমরা যদি তাঁদের প্রশংসিত নেতা মি. লুথার যে সকল দুর্বল কথাবার্তা বলেছেন সেগুলি উদ্ধৃত করি বা তাঁদের অন্যতম নেতা মি. জন ক্যালভিন (১৫০৯-১৯৬৪ খৃ) বা অন্য যে কোন একজন বিশেষজ্ঞ প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতের দুর্বল কিছু কথা উদ্ধৃত করি এবং বলি যে, তাঁর বাকি সকল কথাই এইরূপ বাতুল ও প্রলাপ এবং তাঁদের মধ্যে কোন গভীর জ্ঞান বা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না, তাহলে কি তা এ সকল প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতদের মতে বৈধ হবে?

আমরা কখনোই এরূপ করব না। এরূপ করা ইনসাফ বিরোধী। এরূপভাবে কারো সামান্য কিছু দুর্বলতা উল্লেখ করা যদি তাঁদের কাছে যথেষ্ট বলে গণ্য হয় তাহলে আমরা অনেক পরিশ্রম থেকে বেঁচে যাই। এক্ষেত্রে আমরা তাঁদের নেতৃবৃন্দ এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের সেই সব কথা উদ্ধৃত করব যেগুলিকে তাঁদের অনুসারিগণ নিজেরাই দুর্বল বা ভুল বলে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং এরপর বলব, এদের বাকী কথাগুলিও এই প্রকারের এবং তাঁরা এই প্রকারের মানুষ ছিলেন।

এজন্য আমি আশা করি, তাঁরা যদি আমার এই গ্রন্থের প্রতিবাদে কিছু লিখেন তাহলে অবশ্যই প্রতিবাদের সময় আমার সংশ্লিষ্ট বক্তব্যটি পুরোপুরি উদ্ধৃত করবেন এবং ভূমিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখবেন।

তাঁরা যদি বলেন যে, সব কিছু পড়ার বা সবকিছু উদ্ধৃত করার সময় বা অবসর তাঁদের নেই বা ব্যস্ততার জন্য তাঁরা তা করতে পারেন নি তাহলে তাঁদের সেই ওযরখাহী গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ মুরশিদুত তালিবীন গ্রন্থের লেখক পাদ্রী সাহেব ১৮৪০ সালে মুদ্রিত উক্ত গ্রন্থের ৩১০ পৃষ্ঠায়, ২য় খণ্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে লিখেছেন : "প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার পরিব্রাজক সদাসর্বদা ইঞ্জিল প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন। আর তাদের জন্য প্রায় একশত ওয়ায়েজ, শিক্ষক ও অন্যান্য প্রকারের সহযোগী রয়েছেন যারা খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছেন।"...

এ সকল মানুষ সবাই তাদের দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। ধর্মপ্রচার ছাড়া অন্য কোন কাজ তাদের নেই। কাজেই এই অগণিত মানুষের বিশাল বাহিনী থেকে সময় বা সুযোগের অভাবের অজুহাত কিভাবে গ্রহণ করা যায়?

উপরে খৃস্টান পাদরী, পণ্ডিত ও নেতাদের দুর্বলতা ও ভুলভ্রান্তির বিষয়ে যা-কিছু বললাম তা স্পষ্ট করার জন্য আমি এখানে এই প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের নেতা মি. মার্টিন লুথারের (১৪৮৩-১৫১৭) অনুবাদ করা বাইবেল-এর অবস্থা সম্পর্কে এবং সম্মানিত পাদ্রী ফান্ডার[১] সাহেবের লেখা 'মীযানুল হক', 'হাল্লুল ইশকাল' ও 'মিফতাহুল আসরার' গ্রন্থগুলির অবস্থা সম্পর্কে কিছু বিষয় উল্লেখ করব।

ওয়ার্ড ক্যাথলিক ১৮৪১ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত তাঁর গ্রন্থে মি. লুথার কর্তৃক অনুবাদকৃত বাইবেলের[২] অবস্থা সম্পর্কে বলেন : যোনক্লীস নামক প্রসিদ্ধ প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরু পণ্ডিত

---

১. ড. ফান্ডার একজন আমেরিকান ক্যাথলিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ক্যাথলিক ধর্মমত ত্যাগ করে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতে দীক্ষিত হন। ইংল্যান্ডের চার্চ ভারতে খৃস্টধর্ম প্রচারের জন্য তাকে প্রধান মিশনারী হিসাবে প্রেরণ করে। তিনি খৃস্টধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদর্শন করেন। ফার্সী, উর্দু, আরবী ইত্যাদি ভাষায় খৃস্ট ধর্মের পক্ষে ও ইসলাম ধর্মের নিন্দায় বিভিন্ন বই-পুস্তক রচনা করেন। তিনি মুসলিম আলেমগণকে প্রকাশ্য বিতর্কের আহ্বান করেন। পরে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবীর সাথে প্রকাশ্য বিতর্কে পরাজিত হয়ে তিনি ভারত ত্যাগ করেন।

২. মি. লুথার জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন।

লুথারকে সম্বোধন করে বলেন : হে লুথার! তুমি ঈশ্বরের বাণী বিনষ্ট করছ। তুমি একজন বড় মাপের জালিয়াত ও পবিত্র গ্রন্থের বিকৃতকারী। আমরা তোমার থেকে অত্যন্ত লজ্জা পাই। কারণ এক সময় আমরা তোমাকে অত্যন্ত সম্মান করতাম। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তোমরা আসল রূপ কি...।

পক্ষান্তরে মি. লুথার যোনক্লীস-এর অনুবাদ প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে নির্বোধ, গর্দভ, মিথ্যাচারী, দাজ্জাল ও ধোঁকাবাজ বলে আখ্যায়িত করেন।

পাদ্রী কিকরিমান মি. লুথারের এই অনুবাদের বিষয়ে বলেন, "পুরাতন নিয়মের গ্রন্থগুলির অনুবাদ, বিশেষ করে ইয়োবের (আইউবের) বিবরণ ও ভাববাদীদের পুস্তকগুলি ত্রুটিপূর্ণ। ত্রুটির পরিমাণও কম নয়। নতুন নিয়মের অনুবাদও ত্রুটিপূর্ণ এবং ত্রুটির পরিমাণ কম নয়।"

বিসরিয়াভ সিযাভার লুথারকে বলেন : "তোমার অনুবাদ ভুল।" আর স্টাফিন্স ও এ্যামসিরুস লুথার অনূদিত বাইবেলের শুধু নতুন নিয়মের মধ্যেই ১৪০০ বিভ্রান্তি ও বিকৃতি দেখতে পান যে সকল বিকৃতি ধর্ম পরিবর্তন ও নব-উদ্ভাবন পর্যায়ের। ... ওয়ার্ড ক্যাথলিকের বক্তব্য এখানেই শেষ।

যদি নতুন নিয়মের অনুবাদেই ১৪০০ বিভ্রান্তি ও বিকৃতি থাকে তাহলে বুঝা যায় যে, পুরা বাইবেলের অনুবাদের মধ্যে কমপক্ষে চার হাজার ভুল ও বিকৃতি রয়েছে।

প্রটেস্ট্যান্টগণের মহান নেতার কর্মের মধ্যে এত ভুল, বিভ্রান্তি ও বিকৃতি থাকা সত্ত্বেও যদি তাকে মুর্খ, অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ না বলা হয় তাহলে যে ব্যক্তির কথার মধ্যে বিরুদ্ধপক্ষের মতানুসারেই মাত্র ৫ বা ৬ স্থানে ভুল হয়েছে তাকে মুর্খ বা অনভিজ্ঞ বলা কিভাবে ইনসাফ হতে পারে?

প্রটেস্ট্যান্টদের মহান নেতার অনুবাদের অবস্থা বলার পরে আমি এখন 'মীযানুল হক'[১] ও অন্যান্য গ্রন্থের বিষয়ে কিছু কথা বলব।

সুপ্রিয় পাঠক!

এই বইটির দুইটি সংস্করণ আছে। একটি হলো পুরাতন সংস্করণ।[২] বইটির প্রতিবাদে 'ইসতিফসার' গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই মুদ্রণটি পাদ্রী প্রচারকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ভারতের স্বনামধন্য আলিম ও প্রাজ্ঞ পণ্ডিত আল-হাসান মূহানী

---

১. খৃষ্টান মিশনারিগণ ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে যত গ্রন্থ রচনা করেছেন তন্মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর গ্রন্থ ও মুসলিম দেশগুলিতে খৃষ্টধর্ম প্রচারকারী মিশনারীদের প্রধান বিলম্বন এই গ্রন্থটি। ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যাচার, অপবাদ, বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার এমন বিপুল সমাবেশ অন্য কোনো খৃষ্টীয় গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে খৃষ্টধর্মের সকল দুর্বলতা ও ত্রুটির অপনোদন করার চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। এজন্য পরবর্তী সকল খৃষ্টান প্রচারক মূলত এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করে থাকেন।

২. ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ফন্ডার ইংরেজিতে বইটি প্রকাশ করেন। পরবর্তী ১০ বছর খৃষ্টান মিশনারিগণ এই বইটির উপর নির্ভর করে তাদের প্রচার কাজ চালাতে থাকেন।

(১৭৮৭-১৮৭০ খৃ) মীযানুল হকের প্রতিবাদে 'ইসতিফসার' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি মীযানুল হক গ্রন্থের প্রচলিত মুদ্রণের প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য খণ্ডন করেন। মাননীয় পাদ্রী ফান্ডার সাহেব বইটি পাঠের পর নিজের গ্রন্থের অবস্থা বুঝতে পারেন। তখন তিনি তাঁর বইটি সংস্কার ও পরিমার্জন করে মুদ্রণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পুরাতন মুদ্রণ থেকে অনেক কিছু বাদ দেন এবং অনেক কিছু সংযোজন করেন। এভাবে তিনি বইটি নতুন আঙ্গিকে ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেন। এবার তিনি বইটি ফারসী ভাষায় মুদ্রণ করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বইটি আকবর আবাদ (আগ্রা) শহরে ফারসী ভাষায় প্রকাশিত হয়। ১৮৫০ সালে বইটির উর্দু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই নতুন সংস্করণের কারণে পুরাতন সংস্করণটি তাদের কাছে পরিত্যক্ত ও বাতিল বলে গণ্য হয়। এজন্য আমি উক্ত পুরাতন সংস্করণ থেকে একটি মাত্র বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই উদ্ধৃত করব না। এছাড়া ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'হাল্লুল ইশকাল' গ্রন্থ থেকে ৯টি বক্তব্য উদ্ধৃত করব। আর 'মিফতাহুল আসরার' নামক গ্রন্থের পুরাতন ও নতুন সংস্করণ থেকে দুইটি বক্তব্য উদ্ধৃত করব। সবই আমি আরবীতে অনুবাদ করে উদ্ধৃত করব। সকল ক্ষেত্রে আমি সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের পৃষ্ঠা, অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের কথা উল্লেখ করব।

মীযানুল হক গ্রন্থের অসত্য কথাবার্তার কিছু নমুনা

প্রথম বক্তব্য

'মীযানুল হক' গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক বলেছেন : "কুরআন ও তাফসীরকারগণ এই অধ্যায়ে[১] দাবি করেন যে, যেরূপভাবে যাবূর নাযিল হওয়ার কারণে তাওরাত রহিত হয়ে গিয়েছিল, ইঞ্জিল নাযিল হওয়ার কারণে যাবূর রহিত হয়ে গিয়েছিল তেমনি কুরআন নাযিল হওয়ার কারণে ইঞ্জিল রহিত হয়ে গিয়েছে।"

"যাবূর নাযিল হওয়ার কারণে তাওরাত রহিত হয়ে গিয়েছিল ও ইঞ্জিল নাযিল হওয়ার কারণে যাবূর রহিত হয়ে গিয়েছিল" তাঁর এই কথাটি সম্পূর্ণ বানোয়াট মিথ্যা কথা ছাড়া কিছুই নয়। কুরআন কারীমে বা তাফসীর গ্রন্থসমূহে এ কথার কোন উল্লেখ নেই। ইসলাম ধর্মের কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থেও এর কোন উল্লেখ নেই। আমাদের মতে, যাবূর দ্বারা তাওরাত রহিত হয় নি, আবার ইঞ্জিল দ্বারাও যাবূর রহিত হয়নি। দাউদ (আ) মূসা (আ)-র শরীয়তের বা তাওরাতের অনুসারী ছিলেন। যাবূর তো কিছু দোয়ার সমষ্টিমাত্র। সম্ভবত গ্রন্থকার মি. ফান্ডার কোন সাধারণ মুসলমানের মুখে কথাটা শুনে ভেবেছেন যে, কথাটি বোধহয় কুরআনে আছে এবং এই ধারণার ভিত্তিতেই তিনি কথাটি কুরআনে আছে বলে চালিয়ে দিয়েছেন। এই হলো এই মহাজ্ঞানী পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের অবস্থা। ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে কঠিন অপবাদ ও আপত্তির ভিত্তি রেখেছেন তিনি 'ধারণা'র উপর।

১. অর্থাৎ রহিতকরণ বিষয়ে। মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাস যে, কুরআনের আগমন পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থকে রহিত করেছে। পাদ্রী ফান্ডার সাহেব তাঁর গ্রন্থের এই অধ্যায়ে এই বিশ্বাসের প্রতিবাদ করেন এবং এই বিশ্বাস যে অসম্ভব ও ভুল তা প্রমাণের জন্য চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয় বক্তব্য

উক্ত পরিচ্ছেদের ২৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : "মুহাম্মাদী ব্যক্তির (মুসলমানদের) এই দাবির কোন ভিত্তি নেই যে, যাবূর তাওরাতকে রহিত করেছে এবং ইঞ্জিল তাওরাত ও যাবূর উভয়কে রহিত করেছে।"

এই বক্তব্যটিও উপরের বক্তব্যের মতই অসত্য। কারণ যাবূর তাওরাতকে রহিত করেনি বা ইঞ্জিল দ্বারা রহিত হয়নি যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমার সাথে মি. ফান্ডারের প্রকাশ্য জনসমাবেশে বিতর্কের সময় আমি তাঁকে এই দুইটি বক্তব্য সংশোধন করার দাবি জানাই। তখন তিনি তাঁর এই বক্তব্য দুইটি যে ভুল তা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর পান নি। আকবরআবাদ ও দিল্লী থেকে বারংবার ফারসী ও উর্দুতে প্রকাশিত বিতর্কের পুস্তিকাগুলিতে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আগ্রহী পাঠক তা পড়ে দেখতে পারেন।

তৃতীয় বক্তব্য

এই অধ্যায়ের ২৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : পরবর্তী ধর্মগ্রন্থ বা ধর্ম দ্বারা পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থ বা ধর্ম রহিত হয়ে যায়, এই নীতিতে বিশ্বাস করলে আমাদের ধারণা করতে হবে যে, আল্লাহ ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টির কল্যাণ ও স্বার্থ রক্ষার জন্য এমন কিছু অসম্পূর্ণ বিধান প্রদান করেন যা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে না। এরপর তা আবার সংশোধন করেন। কিন্তু অনাদি অনন্ত সকল পূর্ণতার গুণাবলীর আধার মহিমাময় আল্লাহর শানে এরূপ বাতিল ও অপূর্ণ ধারণা কে করতে পারে?

মুসলিম জাতি 'রহিতকরণ' বলতে যা বোঝে তা একথার দ্বারা খণ্ডন হয় না।[১] মুসলিমগণ রহিতকরণ বলে কি বোঝেন তা আমি ইনশাআল্লাহ তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করব। তবে লক্ষ্যণীয় যে, মি. ফান্ডারের এই আপত্তি খৃস্টানদের মহা পবিত্র ব্যক্তিত্ব মহামতি পৌলের ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য। এই আপত্তি অনুসারে পৌলের কথাগুলি বাতিল ও খণ্ডিত হয়ে যায়। পাদ্রী ফান্ডার যে ধারণাকে বাতিল, অপূর্ণ ও অসম্ভব বলে দাবি করেছেন মহামতি পৌল নিজেই এই 'বাতিল ও অপূর্ণ ধারণা'য় আক্রান্ত ছিলেন। আমি এখানে ১৮৬০ সালে আরবীতে অনূদিত বাইবেল থেকে পৌলের বক্তব্যগুলি উদ্ধৃত করছি।[২]

---

১. পাদ্রী ফান্ডার রহিতকরণ বলতে সংশোধন বুঝেছেন। মহান আল্লাহ তাঁর বিধান সংশোধন করেন না, বরং মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে বিধান রহিত করে নতুন বিধান প্রদান করেন। একজন একটি বিধান দেওয়ার পরে তার ভুল ও অপূর্ণতা প্রকাশিত হলে তা সংশোধন করেন, কিন্তু মুসলিমগণ আল্লাহর ক্ষেত্রে কখনোই তা বিশ্বাস করেন না। মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর সকল বিধানই পূর্ণ ও কল্যাণময়। তিনি কোন কোন বিধান নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রদান করেন। মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে নতুন বিধান প্রদান করেন। এতে পূর্ববর্তী বিধান রহিত হয়।

২. বাংলা অনুবাদে আমরা খৃস্টান যাজকদের বাংলা বাইবেলের অনুবাদ উল্লেখ করেছি, যদিও তাদের আরবী, ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদের তুলনা করলে অনেক অসংগতি ও বিকৃতি ধরা পড়ে।

পৌল তাঁর 'ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের' সপ্তম অধ্যায়ে লিখেছেন : "কারণ এক পক্ষে পূর্বকার বিধির (তাওরাতের) দুর্বলতা ও নিষ্ফলতা প্রযুক্ত তাহার লোপ হইতেছে। কেননা ব্যবস্থা (তাওরাতের বিধান) কিছুই সিদ্ধ করে নাই... ।"[১]

এই পত্রের অষ্টম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন : "কারণ ঐ প্রথম নিয়ম (তাওরাত বা বাইবেলের পুরাতন নিয়ম) যদি নির্দোষ হইত, তবে দ্বিতীয় নিয়মের জন্য স্থানের চেষ্টা করা যাইত না।"[২] "নতুন বলাতে তিনি প্রথমটি (তাওরাত) পুরাতন করিয়াছেন; কিন্তু যাহা পুরাতন ও জীর্ণ হইতেছে, তাহা অন্তর্হিত হইতে উদ্যত।"[৩]

এই পত্রের দশম অধ্যায়ের নবম আয়াতে বলেছেন : "তিনি প্রথম বিষয় লোপ করিতেছেন, যেন দ্বিতীয় বিষয় স্থির করেন।"[৪]

এভাবে আমরা দেখছি যে, তাদের পবিত্রপুরুষ পৌল তাওরাতের বিষয়ে বলছেন যে, তা বাতিল করা হয়েছে, লোপ করা হয়েছে, তা দুর্বল ছিল, তা নিষ্ফল ছিল, তা অপূর্ণ ছিল এবং তা ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তিনি তা জরাজীর্ণ ও বাতিল হয়ে অন্তর্হিত হওয়ার যোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।

উপরন্তু পাদ্রী ফান্ডার সাহেব যে ধারণাকে বাতিল ও অপূর্ণ বলে দাবি করেছেন বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী স্বয়ং আল্লাহ এই অসম্পূর্ণ ও বাতিল ধারণায় আক্রান্ত। যিহিষ্কেল ভাববাদীর মুখে তিনি বলেছেন : "অধিকন্তু যাহা মঙ্গলজনক নয়, এমন বিধিকলাপ এবং যদ্দারা কেহ বাঁচিতে পারে না, এমন শাসনকলাপ, তাহাদিগকে দিলাম।" এই কথাটি যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তক The Book of The Prophet Ezekiel-এর বিংশ অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে রয়েছে।[৫]

এজন্য অতিশয় অবাক হতে হয় এই প্রাজ্ঞ গবেষক পণ্ডিতের ইনসাফের ধরন থেকে যে, তিনি মুসলিমদেরকে এমন বিষয়ের অভিযোগ করছেন যা তাদেরকে স্পর্শ করে না, বরং তাঁর নিজের ধর্মবিশ্বাসকেই খণ্ডন করে।

চতুর্থ বক্তব্য

এই পরিচ্ছেদের ২৬ পৃষ্ঠায় তিনি (বাইবেলের কতিপয় আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে) লিখেছেন : এসকল আয়াতের নির্দেশনা অনুসারে যতদিন আসমান ও যমিন বিদ্যমান থাকবে ততদিন ইঞ্জিল ও পুরাতন নিয়মের গ্রন্থাবলীর বিধিবিধান বহাল থাকবে।

তাঁর এই কথাটি ভুল। কারণ এ কথা যদি ঠিক হয় এবং বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের বিধিবিধান বহাল থাকার কথা যদি সত্য হয় তাহলে সকল খৃষ্টান

১. ইব্রীয় : ৭/১৮-১৯
২. ইব্রীয় : ৮/৭।
৩. ইব্রীয় : ৮/১৩।
৪. ইব্রীয় : ১০/৯।
৫. যিহিষ্কেল : ২০/২৫ ।

পাদ্রীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা অত্যাবশ্যক হবে। কারণ এ সকল পাদ্রী 'শনিবার'-কে মর্যাদা প্রদান করেন না। আর তাওরাতের বিধান অনুসারে যে ব্যক্তি 'শনিবার'-কে মর্যাদা প্রদানে সামান্য ত্রুটি করবে বা শনিবারে কোনরূপ কর্ম করবে তাকে হত্যা করা ফরয।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, এই পরিচ্ছেদের ১৯ পৃষ্ঠায় লেখক স্বীকার করেছেন যে, তাওরাতের বাহ্যিক ও ব্যবহারিক বিধানাবলী ঈসা মাসীহের আগমনের ফলে পূর্ণতা পেয়েছে এবং রহিত হয়ে গিয়েছে। রহিত হওয়ার অর্থ হলো এগুলি পালন করা আর এখন জরুরী নয়। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীই তাওরাতের এ সকল বিধান আসমান ও যমিন যতদিন বিদ্যমান থাকবে ততদিন বিদ্যমান থাকে নি। তিনি পূর্ণতা পাওয়া ও রহিত হওয়ার যে অর্থ এখানে উল্লেখ করেছেন আমরাও বিধিবিধান রহিত হওয়া বলতে সেই অর্থই বুঝাই।

যীশু খ্রিস্ট যখন তাঁর ১২ জন শিষ্যকে প্রেরিতপদে নিযুক্ত করে ধর্ম প্রচারে প্রেরণ করলেন, তখন তিনি তাদেরকে বলেন, "তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না...।"[১]

তিনি আরো বলেছেন : "ইস্রায়েল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারো নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।"[২]

এভাবে তিনি অ-ইহূদী সকল জাতি ও শমরীয়দের মধ্যে খৃস্টধর্ম প্রচার করতে নিষেধ করলেন। এবং তাঁর ধর্মকে শুধু ইস্রায়েল সন্তান বা ইহূদীদের জন্য নির্দিষ্ট বলে ঘোষণা করলেন।

কিন্তু তিনি আসমানে ঊর্ধ্বগমনের সময় বলেন : "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর।"[৩] এভাবে তিনি সমস্ত বিশ্বকে খৃস্টধর্মের দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং তাঁর ধর্মকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করলেন। এভাবে তিনি নিজেই তাঁর প্রথম নির্দেশকে রহিত করলেন।

খৃস্টীয় শিষ্যগণ পরামর্শ করে তাওরাতের মধ্যে নির্দেশিত সকল বিধিবিধান রহিত ঘোষণা করেন, শুধু চারিটি বিষয়ের অবৈধতার বিধান বহাল রাখেন : প্রতিমার জন্য জবাইকৃত পশু, রক্ত, গলা টিপে মারা প্রাণী ও ব্যভিচার—এই চারিটি বিষয় হারাম হওয়ার বিধানগুলি তারা বহাল রাখেন। এই বিষয়ে তাঁরা বিভিন্ন চার্চে-ধর্মস্থানে পত্র লিখেন। প্রেরিতগণের কার্য-বিবরণের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিষয়টি স্পষ্টরূপে লিখিত রয়েছে।[৪]

অতঃপর তাদের পবিত্র-পুরুষ পৌল এক ঢালাও বৈধতার ফতোয়া দিয়ে এই চারিটির মধ্যে প্রথম তিনটির অবৈধতা রহিত করে দেন। রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত

১. মথি : ১০/৬।
২. মথি : ১৫/২৪।
৩. মার্ক : ১৬/১৫।
৪. প্রেরিত : ১৫/২৩-২৯।

পৌলের পত্রের ১৪শ অধ্যায়ের ১৪ আয়াতে এবং তীতের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের প্রথম অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে এই ঢালাও বৈধতার বিধান রয়েছে।

এভাবে শিষ্যগণ তাওরাতের বিধানাবলী রহিত করলেন এবং পবিত্রপুরুষ পৌল শিষ্যগণের বিধানাবলী রহিত করলেন। এ থেকে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, তাওরাতের বিধানাবলী যেমন রহিত হয়েছে, তেমনি ইঞ্জিলের বিধানাবলীও রহিত হয়েছে। তাওরাত ও ইঞ্জিলের এ সকল রহিতকৃত বিধানাবলী আসমান ও যমিন যতদিন বিদ্যমান ততদিন বিদ্যমান থাকে নি। এই গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন, ইনশা আল্লাহ।

এখন আমরা বাইবেলের সেই আয়াতগুলি (পংক্তি) আলোচনা করব যেগুলির ভিত্তিতে ড. ফান্ডার দাবি করেছেন যে, যতদিন আসমান ও যমিন বিদ্যমান থাকবে ততদিন ইঞ্জিল ও পুরাতন নিয়মের গ্রন্থাবলীর বিধিবিধান বহাল থাকবে। তাঁর গ্রন্থের উপরোল্লিখিত পরিচ্ছেদের ২৬ ও ২৭ পৃষ্ঠায় তিনি এই উদ্দেশ্যে নিম্নের চারিটি আয়াত (পংক্তি) উল্লেখ করেছেন :

১. লূক লিখিত সুসমাচারের ২১ অধ্যায়ের ৩৩ আয়াত (পংক্তি) : "আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনো হইবে না।"

২. মথি লিখিত সুসমাচারের পঞ্চম অধ্যায়ের ১৮ আয়াত : "কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্যন্ত ব্যবস্থার (তাওরাতের বিধিবিধানের) এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।"

৩. পিতরের প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায়ের ১৩শ আয়াত : "কারণ তোমরা ক্ষয়ণীয় বীর্য হইতে নয়, কিন্তু অক্ষয় বীর্য হইতে ঈশ্বরের জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য দ্বারা পুনর্জাত হইয়াছ।"

৪. যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৪০ অধ্যায়ের ৮ম আয়াত : "তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, পুষ্প ম্লান হইয়া পড়ে, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল থাকিবে।"

দ্বিতীয় ও চতুর্থ আয়াতদ্বয়কে খৃষ্টানগণ একথার প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে পারেন না যে, তাওরাতের কোন একটি বিধানও রহিত হবে না। কারণ, খৃষ্টানদের প্রচলিত ধর্মে তাওরাতের সকল বাহ্যিক বিধিবিধানই রহিত করা হয়েছে। এছাড়া লক্ষ্যণীয় যে, দ্বিতীয় আয়াতে "ব্যবস্থা" বলতে যীশুখ্রিস্ট শুধু 'দশ-নির্দেশ' (Ten Commandment) বুঝিয়েছেন যা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করব।

১ম ও ৩য় আয়াতদ্বয় দিয়ে খৃষ্টানগণ একথা প্রমাণ করতে পারেন না যে, ইঞ্জিলের কোন একটি বিধানও রহিত হবে না। কারণ ইঞ্জিলের বিধিবিধানও রহিত হয়েছে বলে আমরা ইতোপূর্বে দেখতে পেয়েছি।

এক্ষেত্রে সঠিক কথা হলো, প্রথম আয়াতে 'আমার বাক্য' বলতে আগত দিনগুলি সম্পর্কে ইঞ্জিলে যে সমস্ত ভবিষ্যৎ-বাণী করা হয়েছে সে কথা বুঝানো হয়েছে। বাইবেলের ভাষ্যকার ড্যাওয়ালি রজার্ডমেন্ট এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। পাদ্রী পিরেজ ওয়েডিন স্টানহোপ-এর গৃহীত ব্যাখ্যার বিপরীতে এই মতটিই গ্রহণযোগ্য, এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে যা পাঠক জানতে পারবেন।

এখানে 'আমার বাক্য' বলতে প্রতিটি বাক্য বা সকল বাক্য বুঝনো হয়নি। কাজেই একথার অর্থ নয় যে, আমার মুখ থেকে নির্গত প্রতিটি বাক্যই অনন্তকাল অপরিবর্তিত থাকবে এবং আমার কোন বাক্যই রহিত হবে না। 'আমার বাক্য' বলতে যদি 'আমার প্রতিটি বাক্য' বুঝানো হয় তাহলে ইঞ্জিল নিজেই নিজের মিথ্যাচারের ঘোষণা দিবে; কারণ যীশুর অনেক বাক্যই ইঞ্জিলের মধ্যে রহিত করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে আরো লক্ষ্যণীয় যে, উপরোল্লিখিত ২য় আয়াতে ব্যবস্থার লুপ্ত না হওয়ার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ বলা হয়েছে যে, তা সফল বা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত লুপ্ত হবে না। আমাদের মহামান্য পাদ্রী ফান্ডার সাহেবের মতে যীশুর বিধিবিধানের মাধ্যমে তাওরাতের বিধিবিধান পূর্ণতা লাভ করেছে। কাজেই এরপর আর তা লুপ্ত বা রহিত হওয়াতে কোন বাঁধা নেই।

তৃতীয় আয়াতে 'ঈশ্বরের জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য' কথাটির মধ্যে 'চিরস্থায়ী' শব্দটি নব-সংযোজিত বিকৃতি। নতুন নিয়মের প্রাচীনতম ও বিশুদ্ধতম পাণ্ডুলিপিতে এই শব্দের কোন অস্তিত্ব নেই। আর এজন্যই ১৮৬০ সালে প্রকাশিত বাইবেলের আরবী অনুবাদে এই 'চিরস্থায়ী' শব্দটিকে ব্রাকেট বা বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে। এই সংস্করণের প্রকাশক ও সংশোধকগণ ভূমিকায় বলেছেন যে, ব্রাকেট বা বন্ধনী দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, বন্ধনীর মধ্যকার শব্দগুলির কোন অস্তিত্ব প্রাচীনতম ও বিশুদ্ধতম পাণ্ডুলিপিগুলিতে নেই।

পিতরের কথা "ঈশ্বরের জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য". আর যিশাইয় ভাববাদীর কথা "ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল থাকিবে" উভয়ের ভাব ও ভাষা একই। যিশাইয়র কথা দ্বারা যেমন একথা প্রমাণ করা যায় না যে, তাওরাতের বিধিবিধান রহিত হবে না, তেমনি পিতরের কথা দ্বারাও প্রমাণ করা যায় না যে, ইঞ্জিলের বিধিবিধান রহিত হবে না। খৃস্টানগণ তাওরাতের বিধিবিধান রহিত করতে যেয়ে যিশাইয় ভাববাদীর কথার যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন, ইঞ্জিলের বিধিবিধান রহিত করতে পিতরের কথার হুবহু সেই ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআনের আগমনের ফলে তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের 'রহিত' হওয়ার বিষয়ে ইসলামী বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্য উপরের চারিটি আয়াতের উপর নির্ভর করা যায় না বা সেগুলিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায় না। আর এজন্যই আমার সাথে মাননীয় পাদ্রী ফান্ডারের প্রকাশ্য বিতর্কের সময় এই আয়াতগুলি দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে যেয়ে তিনি সবকিছু গুলিয়ে ফেলেন। দিল্লী এবং

আকবরাবাদ থেকে ফারসী ও উর্দুতে বারংবার প্রকাশিত উক্ত বিতর্কের বিবরণী পুস্তিকাগুলি পাঠ করলেই পাঠক তা দেখতে পাবেন।

পঞ্চম বক্তব্য

মাননীয় পাদ্রী মি. ফান্ডার তাঁর মীযানুল হক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে, ২৯ পৃষ্ঠায় কুরআন মজীদের বিষয়ে দ্বাদশ-ইমামপন্থী শীআগণের ধর্মবিশ্বাস বর্ণনায় মুহাম্মাদ মুহসিন ফানী কাশমিরীর (১৬৪৬-১৬৭০ খৃ) 'দাবিস্তান' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং উদ্ধৃত বক্তব্যটির নোংরা পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটিয়েছেন। ফানীর গ্রন্থের বাক্যটি নিম্নরূপ : "তাদের কেউ কেউ বলে, উসমান কুরআন পুড়িয়েছিলেন।" এই বাক্যটি মি. ফান্ডার উদ্ধৃত করেছেন নিম্নরূপে : "তারা সবাই বলে, উসমান কুরআন পুড়িয়েছিলেন।" এই বিকৃতির জন্য তিনি ফারসীতে মূল বাক্যের দুইটি শব্দ ফেলে দিয়েছেন এবং বাক্যের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে একটি শব্দ বৃদ্ধি করেছেন। এই বিকৃতির মাধ্যমে তিনি ধারণা দিতে চেয়েছেন যে, শীআদের সকলেই এই কথা বলে।

অনুরূপভাবে মাননীয় পাদ্রী তাঁর 'হাল্লুল ইশকাল' গ্রন্থের ১০৩ পৃষ্ঠায় 'ইসতিফসার' গ্রন্থের একটি বাক্য উদ্ধৃত করেছেন নিম্নরূপে : "ইসলামের পূর্বে ইহূদী ও খৃস্টানগণের কারো কাছে নাহউ, সরফ, বালাগাত ও অন্যান্য সকল শাস্ত্র কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না।"

'ইসতিফসার' গ্রন্থে 'ও অন্যান্য সকল শাস্ত্র' কথাটির অস্তিত্ব নেই বরং সেখানে এর বদলে রয়েছে 'ও ভাষার শব্দ-অভিধান'। ইসতিফসার গ্রন্থের লেখকের উদ্দেশ্য হলো, তাওরাত ও ইঞ্জিলের মূল ভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়গুলি ইসলামের পূর্বে ইহূদী ও খৃস্টানদের কারো কাছেই ছিল না। মাননীয় পাদ্রী 'ভাষার শব্দ-অভিধান' বিকৃত করে 'সকল শাস্ত্র' লিখেছেন। এরপর তার প্রতিবাদ করেছেন।

ক্যাথলিকগণ বলেন যে, এসব ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত বিকৃতি প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের একটি অভ্যাস। ক্যাথলিক ওয়ার্ড তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন : "ইংল্যান্ডের সম্রাট প্রথম জেমসের নিকট প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় থেকে এই মর্মে দরখাস্ত পেশ করা হয় যে, আমাদের প্রার্থনা গ্রন্থের মধ্যে যাবূরের যে পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করা রয়েছে সেগুলির সাথে হিব্রু যাবূরের অনেক পার্থক্য। সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে কমবেশি ২০০ স্থানে এই পার্থক্য করা হয়েছে।"

ক্যাথলিক টমাস এঙ্গেলস তাঁর উর্দু ভাষায় লিখিত ও ১৮৫১ সালে প্রকাশিত মিরআতুস সিদ্‌ক বা 'সত্যের দর্পণ' গ্রন্থের ১৭৬ ও ১৭৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "সাধারণ প্রার্থনা গ্রন্থ, প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরুগণ শপথ করে যে গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে ও যে গ্রন্থের প্রতি তাঁদের সন্তুষ্টির বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করেন, সেই গ্রন্থের মধ্যে উদ্ধৃত যাবূর গ্রন্থের শুধু ১৪শ অধ্যায়টি যদি অধ্যয়ন করা হয় এবং এর সাথে প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত যাবূর গ্রন্থের এই অধ্যায়ের সাথে এর তুলনা করা হয়

তাহলে দেখা যাবে যে, প্রার্থনা গ্রন্থের যাবূরের মধ্যে চারিটি আয়াত নেই, যেগুলি প্রটেস্ট্যান্টদের বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত যাবূরের মধ্যে রয়েছে। যদি এই আয়াতগুলি আল্লাহর বাণী হয় তাহলে সেগুলিকে তারা তাদের বাইবেল থেকে বাদ দিল কেন? আর যদি সেগুলি আল্লাহর বাণী না হয় তাহলে প্রার্থনা গ্রন্থের মধ্যে এগুলির অবস্থান সম্পর্কে তারা কোনরূপ উচ্চবাচ্য করে না কেন? প্রকৃত সত্য কথা এই যে, প্রটেস্ট্যান্টগণ আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করেছে এবং যাবূরের এ সকল ভবিষ্যৎবাণীগুলিও পরিবর্তন করেছে, কখনো বাড়িয়েছে এবং কখনো কমিয়েছে।"

একথা তো স্পষ্ট যে, 'তাদের কেউ কেউ' কথা ফেলে দিয়ে 'তারা সকলে' বানানো যাবূর গ্রন্থের চারিটি আয়াত ফেলে দেওয়ার চেয়ে অনেক সহজ। আর 'ভাষার শব্দ-অভিধান' পরিবর্তন করে 'সকল শাস্ত্র' বানানো যাবূর গ্রন্থের ২০০ স্থানে পরিবর্তন করার চেয়ে অনেক সহজ।

ষষ্ঠ বক্তব্য

মীযানুল হক গ্রন্থের ৫৪ পৃষ্ঠায়, প্রথম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার লিখেছেন, "নবীদের (ভাববাদিগণের) বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস নিম্নরূপ : নবীগণ এবং শিষ্যগণ সকল বিষয়েই বিস্মৃতি ও ভুলের মধ্যে নিপতিত হতে পারেন, তবে তাঁরা লিখনি ও প্রচারের ক্ষেত্রে (ঈশ্বরের বাক্য বলা ও লিখার ক্ষেত্রে) ভুল বা বিস্মৃতি থেকে সংরক্ষিত ও মুক্ত।"

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে পাঠক জানতে পারবেন যে, তাঁর এই কথাটি ভুল। এখানে একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। বাইবেলের রাজাবলির প্রথম খণ্ডের ১৩শ অধ্যায়ে একজন নবীর কথা বলা হয়েছে, তিনি আল্লাহর নির্দেশ নিয়ে যিহূদা রাজ্য থেকে যারবিয়ামের[১] নিকট গমন করেন। তিনি যারবিয়ামকে বলেন যে, তিনি প্রতিমাপূজা ও প্রতিমার উদ্দেশ্যে বলিদানের জন্য যে যজ্ঞবেদি নির্মাণ করেছেন তা দায়ূদের (আ) বংশের যোশিয় নামক এক শাসক ধ্বংস করে দেবেন। একথা বলার পরে তিনি পুনরায় যিহূদা রাজ্যের দিকে ফিরে যান। এই বিষয়ে বাইবেলের বিবরণ দেখুন :

"১১ বৈথেলে এক জন প্রাচীন ভাববাদী বাস করিতেন; তাঁহার এক পুত্র আসিয়া, বৈথেলে ঐ দিবসে ঈশ্বরের লোক যাহা যাহা করিয়াছিলেন, সমস্তই তাঁহাকে জ্ঞাত করিল; তিনি রাজাকে যে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্তও পুত্রেরা পিতাকে

১. দাউদ (আ)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র রুহবিয়ামের রাজত্বকালে (খৃ. পূ ৯৭৫ অব্দে) ইহূদীদের ১২ গোত্রের মধ্যে ১০ গোত্র বিদ্রোহ করে এই যারবিয়ামের নেতৃত্বে পৃথক রাজ্য স্থাপন করে। রাজা যারবিয়াম ধর্মত্যাগ করে মূর্তিপূজা শুরু করেন। তার পৌত্তলিকতা ও পাপাচারের বিরুদ্ধে সতর্ক করতে এই নবী এসেছিলেন। আর যারবিয়ামের রাজ্যের অন্য প্রাচীন নবী পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কথা বলাতে অসন্তুষ্ট হয়ে ধোঁকা দিয়ে এই নবীকে ধ্বংস করেন। এই হলো বাইবেলের বিবরণ। বিস্তারিত দেখুন : ১ রাজাবলি ১২ ও ১৩ অধ্যায়।

কহিল। ১২ তাহাদের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোন্ পথে গেলেন? যিহূদা হইতে আগত ঈশ্বরের লোক কোন্ পথ ধরিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পুত্রেরা দেখিয়াছিল। ১৩ তখন তিনি আপন পুত্রদিগকে কহিলেন, আমার জন্য গর্দভ সাজাও; তাহারা তাঁহার জন্য গর্দভ সাজাইলে তিনি তাহার উপরে চড়িলেন। ১৪ আর তিনি ঈশ্বরের লোকের পশ্চাতে গেলেন, এবং এক এলা বৃক্ষের তলে তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, আপনি কি যিহূদা হইতে আগত ঈশ্বরের লোক? ১৫ তিনি কহিলেন, আমি সেই। তখন তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আমার সহিত গৃহে চলুন, আহার করুন। ১৬ তিনি কহিলেন, আমি আপনার সহিত ফিরিয়া যাইতে ও আপনার গৃহে প্রবেশ করিতে পারি না; এই এই স্থানে আপনার সঙ্গে অন্ন ভোজন বা জল পান করিব না; ১৭ কেননা সদাপ্রভুর বাক্য দ্বারা আমাকে বলা হইয়াছে, তুমি সে স্থানে অন্ন ভোজন ও জল পান করিও না, এবং যে পথ দিয়া যাইবে, সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিও না। ১৮ তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আপনি যেমন, আমি তেমনি ভাববাদী; একজন স্বর্গীয় দূত আমাকে সদাপ্রভুর বাক্য দ্বারা এই কথা কহিয়াছেন, তুমি উহাকে অন্ন ভোজন ও জল পান করাইবার জন্য সঙ্গে করিয়া তোমার গৃহে ফিরাইয়া আন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে মিথ্যা কথা কহিলেন। ১৯ তখন তিনি তাঁহার গৃহে অন্ন ভোজন ও জল পান করিলেন। ২০ তাঁহার মেঝে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে যে ভাববাদী উঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল; ২১ তখন তিনি যিহূদা হইতে আগত ঈশ্বরের লোককে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি সদাপ্রভুর বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা তুমি পালন কর নাই; ২২ তিনি যে স্থানের বিষয়ে বলিয়াছিলেন, তুমি অন্ন ভোজন ও জল পান করিও না, সেই স্থানে ফিরিয়া আসিয়া তুমি অন্ন ভোজন ও জল পান করিয়াছ; এই কারণ তোমার শব তোমার পিতৃলোকদের কবরে প্রবিষ্ট হইবে না। ২৩ পরে তাঁহার অন্ন ভোজন ও জল পান সাঙ্গ হইলে তিনি তাঁহার জন্য, অর্থাৎ যাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন সেই ভাববাদীর জন্য গর্দভ সাজাইলেন। ২৪ পরে তিনি যাত্রা করিলে, পথিমধ্যে এক সিংহ তাঁহাকে পাইয়া বধ করিল ও তাঁহা শব পথে পড়িয়া থাকিল।... ২৫. আর দেখ, লোকেরা পথ দিয়া গমন করিতে করিতে দেখিল, শব পথে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং শবের পার্শ্বে সিংহ দাঁড়াইয়া আছে; পরে ঐ প্রাচীন ভাববাদীর নিবাসনগরে আসিয়া সংবাদ দিল। ২৬ আর যে ভাববাদী তাঁহাকে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, তিনি ঐ সংবাদ শুনিয়া কহিলেন...। ২৭ পরে তিনি আপন পুত্রগণকে কহিলেন, আমার জন্য গর্দভ সাজাও; তাহারা তাহা সাজাইল। ২৮ আর তিনি গিয়া দেখিলেন শব পথে পড়িয়া রহিয়াছে...। ২৯ পরে সেই ভাববাদী ঈশ্বরের লোকের শব তুলিয়া লইলেন, এবং গর্দভের উপরে রাখিয়া ফিরাইয়া আনিলেন; সেই প্রাচীন ভাববাদী তাঁহার বিষয়ে বিলাপ করিতে ও তাঁহাকে কবর দিতে আপন নগরে আসিলেন।"....[১]

১. ১ রাজাবলি ১৩/১১-২৯।

এখানে উক্ত প্রাচীন ভাববাদী বা নবীকে পাঁচবার 'ভাববাদী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮ আয়াতে তাঁর পুতপবিত্র মুখে নিজেই নিজেকে ভাববাদী বলে স্বীকার করেছেন। ২০ আয়াতে তাঁর নবুওয়ত বা ভাববাদিত্বের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হয়েছে। আর এই প্রাচীন বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত ভাববাদী প্রচারের ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলেছেন। অসহায় 'ঈশ্বরের লোকটিকে ধোঁকা দিয়েছেন এবং তাকে সদাপ্রভুর ক্রোধের মধ্যে ফেলে ধ্বংস করেছেন'।[১] এতে প্রমাণিত হলো যে, নবীগণ বা ভাববাদিগণ প্রচারের ক্ষেত্রেও সংরক্ষিত নন। তাঁরা ঈশ্বরের নামে বা ধর্মের নামেও মিথ্যা কথা বলেন।

এখন হয়ত আপনি বলবেন যে, ভাববাদিগণ প্রচারের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কথা ও আল্লাহর নামে মিথ্যাচার করতে পারেন। আর মাননীয় পাদ্রী বলেছেন যে, তাঁরা অনিচ্ছাকৃত ভুল ও বিস্মৃতি থেকে মুক্ত ও সংরক্ষিত। আপনার এই কথাটি পাদ্রী সাহেবের কথার ব্যাখ্যায় যদিও চলনসই, তবে এতে নবীদের ক্ষেত্রে ভুল ও বিস্মৃতির চেয়েও জঘন্যতর অপরাধের কথা স্বীকার করতে হয়। সর্বোপরি আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব যে, এই ব্যাখ্যাও ভুল।

এরপর মাননীয় পাদ্রী লিখেছেন : যদি তাদের কারো থেকে তাঁদের লিখনির কোন ক্ষেত্রে কোন বৈপরীত্য এবং জ্ঞানবিরোধী বা জ্ঞানত অসম্ভব কোন কিছু প্রকাশিত হয় তাহলে তা তাঁর জ্ঞান ও অনুধাবন ক্ষমতার অপূর্ণতার প্রমাণ।

তাঁর এই কথাটিও সঠিক নয় বরং কথাটি বিভ্রান্তিকর এবং একান্তই সত্য গোপনের প্রচেষ্টা। তাঁর এই কথাটি ইহূদী ধর্মগুরুগণ এবং বাইবেল ভাষ্যকার আদম ক্লার্ক-এর স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত। আদম ক্লার্ক প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধতম ভাষ্যকারদের অন্যতম। এছাড়া তাঁর এই বক্তব্যটি প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের আরো অনেক গবেষক পণ্ডিতের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত। বিষয়টি আপনি এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম বিষয়ের ১৬শ প্রমাণের আলোচনার মধ্যে জানতে পারবেন।

যদি পাদ্রী তাঁর উপরের দাবিকে সত্য বলে প্রমাণ করতে চান তাহলে আমি তৃতীয় পরিচ্ছেদে যে সকল বৈপরীত্য ও ভুল উল্লেখ করেছি সেগুলির সবকিছুর ব্যাখ্যা তাঁকে উপরের দাবির ভিত্তিতে করতে হবে। তাঁকে অবশ্যই সবগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। শুধু কয়েকটি ভুল ও বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা দিলে হবে না। এছাড়া তাঁর ব্যাখ্যার

১. সবচেয়ে অবাক লাগে বাইবেলের এসকল বানোয়াট কাহিনী রচয়িতাদের মানসিকতা দেখে। একজন নবী প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে কথা বলে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। এতে আরেক নবী বিরক্ত হয়ে মিথ্যা বলে ধোঁকা দিয়ে তাঁকে আল্লাহর নির্দেশের বাইরে নিয়ে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছেন। ধোঁকাবাজ মিথ্যাবাদী নবী কোনো শাস্তি পেলেন না, শাস্তি পেলেন শুধু সরলপ্রাণ ধোঁকাগ্রস্থ নবী।

আগে আমার পূর্ণ বক্তব্য ও আলোচনা পুরোপুরি উল্লেখ করতে হবে যেন পাঠক উভয় পক্ষের কথা পুরোপুরি দেখতে পারেন। যদি তিনি কষ্ট করে হলেও ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ব্যাখ্যা করা যা এরূপ কয়েকটি বৈপরীত্য ও ভুলের ব্যাখ্যা করেন আর বাকিগুলি এড়িয়ে যান তাহলে তাঁর উপরের দাবি বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য হবে।

সপ্তম বক্তব্য

মীযানুল হক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভূমিকায় ৬০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : 'আল্লাহ ৭০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যিরমিয়কে প্রদত্ত ওয়াদা মোতাবেক ইহূদীদেরকে মুক্তি প্রদান করেন এবং তাদেরকে দ্বিতীয়বার তাদের দেশে ফিরিয়ে দেন'।

এই কথাটিও ভুল। কারণ ইহূদীগণ ব্যাবিলনে ৭০ বছর অবস্থান করেন নি। তারা সেখানে ৬৩ বছর অবস্থান করেছিলেন। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আপনি তা জানতে পারবেন।

অষ্টম বক্তব্য

২য় অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ১০৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "এভাবে যীশুর প্রকাশিত হওয়ার সময়ে ৭০ সপ্তাহ পূর্ণ হলো। এই ৭০ সপ্তাহে ৪৯০ বছর হয়েছিল। দানিয়েল নবী এভাবেই সংবাদ দিয়েছিলেন যে, ইহূদীদের ব্যাবিলন থেকে ফেরৎ আসা থেকে যীশুর আগমন পর্যন্ত এই পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হবে।"[১]

এই বক্তব্যটিও ভুল। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে পাঠক তা জানতে পারবেন। সর্বোপরি স্বয়ং পাদ্রী ফান্ডারের হিসাব অনুযায়ীও এই বক্তব্যটি ভুল। তাঁর পূর্বের কথামত যদি আমরা মেনে নিই যে, ইহূদীগণ ব্যাবিলনে ৭০ বছর অবস্থান করেছিল এবং এরপর তারা মুক্তি পেয়েছিল, তাহলেও এই বক্তব্যটি ভুল বলে প্রমাণিত হবে। কারণ তিনি ৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, "যীশু খৃস্টের জন্মের ৬০০ বছর পূর্বে ব্যাবিলন-সম্রাট নেবুকাদনেযার (নবুখদ্‌নিৎসর) ইহূদীদেরকে বন্দী করে নিয়ে যান।" যদি আমরা এই ৬০০ থেকে ৭০ বাদ দি তাহলে বাকি থাকে ৫৩০ বছর। এই হিসাবে ইহূদীদের ব্যাবিলন থেকে ফেরৎ আসা থেকে যীশুর আগমন পর্যন্ত অতিক্রান্ত সময়ের পরিমাণ ৫৩০ বছর হবে, কখনোই ৪৯০ বছর হবে না।

নবম বক্তব্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১০০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : 'আল্লাহ দাউদ নবীকে জানান যে, এই ত্রাণকর্তা তোমারই বংশে আবির্ভূত হবে এবং তাঁর শাসনকাল চিরস্থায়ী হবে'। এই কথাটি শমুয়েল দ্বিতীয় পুস্তকের ৭ম পরিচ্ছেদের ১২ ও ১৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. দেখুন, দানিয়েল : ৯/২৪

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের পাঠক জানতে পারবেন যে, এই দুইটি আয়াতের ভিত্তিতে উপরের সিদ্ধান্ত প্রদান সম্পূর্ণ ভুল।

দশম বক্তব্য

উক্ত গ্রন্থের ১০১ পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন : "এই ত্রাণকর্তার জন্মের স্থান জানা গিয়েছে মীখা ভাববাদীর পুস্তক-এর পঞ্চম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় আয়াত থেকে। আয়াতটি নিম্নরূপ : "আর তুমি, হে বৈথলেহেম-ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সহস্রগণের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলিয়া অগণিতা, তোমা হইতে ইস্রায়েলের মধ্যে কর্তা হইবার জন্য আমার উদ্দেশে এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইবেন; প্রাক্কাল হইতে, অনাদিকাল হইতে (বা অতি পুরাকাল হইতে) তাহার উৎপত্তি।"

খৃস্টানদের সুপ্রসিদ্ধ গবেষক পণ্ডিত হর্ন সাহেব গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, মীখা ভাববাদীর পুস্তকের এই পঙক্তিটি বিকৃত, যে বিষয় পাঠক এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম বিষয়ে ২৩শ প্রমাণের আলোচনায় জানতে পারবেন।

এছাড়া মীখা-র এই বক্তব্য মথিলিখিত সুসমাচারের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ আয়াতের বক্তব্যের বিরোধী।[১] এখন মাননীয় পাদ্রী হয় স্বীকার করবেন যে, মীখার আয়াতটি বিকৃত করা হয়েছে, যেমনভাবে তাদেরই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বীকার করেছেন। অথবা তিনি স্বীকার করবেন যে, মথির আয়াতটি বিকৃত করা হয়েছে। তিনি অবশ্য সাধারণ মানুষদের সামনে বাইবেলের মধ্যে বিকৃতির স্বীকারোক্তি এড়িয়ে চলেন।

তিনি তাঁর স্বীকারোক্তি প্রদান করলে, যদি প্রথম বিষয়টি স্বীকার করেন তাহলে তাঁকে বলতে হবে, কিভাবে তিনি একটি বিকৃত বক্তব্যকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করলেন। আর উভয় অবস্থাতেই তাঁকে জানাতে হবে, কে পরিবর্তন করলেন, কখন পরিবর্তন করলেন এবং কেনই বা এই বিকৃতির আশ্রয় নিলেন। এ জন্য কি তিনি কোন পার্থিব মর্যাদা লাভ করেছেন? অথবা তিনি কি কোন পারলৌকিক সওয়াব ও পুরস্কার লাভ করেছেন?

তিনি মুসলিমগণকে বিভিন্ন বিষয় বুঝিয়ে দিতে বলেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন যে, বিষয়টি বর্ণনা করার দায়িত্ব আপনাদের ঘাড়ে ঋণরূপে রয়ে গেল। আল্লাহর করুণায় মুসলিমগণ এই ঋণের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। আমার লেখা অন্যান্য গ্রন্থ ই'জায ঈসাবী (খৃস্টীয় অলৌকিকত্ব), মু'আদ্দালু ই'ওয়িজাজিল মীযান (মীযান গ্রন্থের বক্রতা সংশোধন), ইযালাতুশ শুকূক (সন্দেহের নিরসন) এবং এই গ্রন্থে তাঁর দাবীকৃত সকল বিষয় বর্ণনা করে মুসলিমগণের ঋণ শোধ করা হয়েছে। এখন তাঁর দায়িত্ব হলো এ সকল বিষয় বর্ণনা করে তাঁর ঋণ শোধ করবেন।

১. মীখার আয়াতে বৈথলেহেমকে অতিক্ষুদ্রা বলা হয়েছে, পক্ষান্তরে মথির বাক্যে বৈথলেহেমকে 'কোন মতেই ক্ষুদ্রতম নও' বলা হয়েছে।

একাদশ বক্তব্য

উক্ত পৃষ্ঠায় তিনি আরো লিখেছেন : "এই ত্রাণকর্তা কুমারী মাতার গর্ভে জন্মধারণ করবেন"। যিশাইয় ভাববাদী তাঁর পুস্তকের ৭ম পরিচ্ছেদের ১৪ আয়াতে এরূপই বলেছেন।

এ বিষয়ে এই আয়াতের উপর নির্ভর করা সন্দেহাতীতভাবে ভুল। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৫০তম ভুল বর্ণনায় বিষয়টি পাঠক জানতে পারবেন। সেখানে একথাও জানতে পারবেন যে, এই পাদরী সাহেব তাঁর 'হাল্লুল ইশকাল' গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠায় যে দাবী করেছেন যে, 'আলামা' বা উলামা শব্দের কুমারী ছাড়া আর কোন অর্থ নেই সেই দাবিটিও মিথ্যা।

দ্বাদশ বক্তব্য

মাননীয় পাদরী সাহেব তাঁর গ্রন্থের ১০৪ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে দ্বাবিংশতম যাবূর বা গীতসংহিতা থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। উদ্ধৃত অংশের মধ্যে রয়েছে : "তাহারা আমার হস্তপদ বিদ্ধ করিয়াছে।"[১]

পুরাতন নিয়মের মূল হিব্রু সংস্করণে এই বাক্যটির কোন অস্তিত্ব নেই বরং সেখানে এর পরিবর্তে রয়েছে : "আমার উভয় হস্ত সিংহের মত।" কিন্তু খৃস্টানদের প্রাচীন ও আধুনিক অনুবাদে এই বাক্যটি রয়েছে। এখন মাননীয় পাদরীকে আমাদের প্রশ্ন হলো, পুরাতন নিয়মের হিব্রু সংস্করণের এই স্থানটি আপনাদের মতে বিকৃত ও পরিবর্তিত কি না? যদি মূল হিব্রু সংস্করণ বিকৃত না হয় তাহলে আপনারা খৃস্টানরা আপনাদের বিশ্বাসমত যীশু খ্রিস্টের জন্য এই বাক্যটি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে তা বিকৃত করলেন কেন?

যদি এই বাক্যটি (হিব্রু বা খৃস্টীয় কোন একটি সংস্করণে) বিকৃত হয় তাহলে অবশ্যই এর বিকৃতি আপনাকে স্বীকার করতে হবে। এরপর পাদরী সাহেব তাঁর মীযানুল হক গ্রন্থে যেভাবে মুসলমানদেরকে বলেছেন, সেভাবেই তাকে প্রশ্ন করব : কে এই বিকৃতি ঘটিয়েছে? কখন এই বিকৃতি ঘটিয়েছে? তার কি এজন্য কোন পার্থিব মর্যাদা লাভ ঘটেছিল? নাকি তিনি এজন্য পারলৌকিক পুরস্কার লাভ করেছিলেন?

১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ বক্তব্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে, ১৬৫ পৃষ্ঠায় মাননীয় পাদরী বাইবেল-এর ঐশ্বরিক বাণী বা আসমানী কিতাব হওয়ার প্রমাণ হিসাবে নিম্নের তিনটি ভবিষ্যৎ-বাণীর বিষয় উল্লেখ করেছেন :

১. দানিয়েলের পুস্তকের ৮ম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত সংবাদ।[২]
২. দানিয়েলের পুস্তকের ১২শ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত সংবাদ।[৩]
৩. মথিলিখিত সুসমাচারের দশম অধ্যায়ের ১৬-২২ আয়াত।

---

১. গীতসংহিতা (যাবূর) ২২/১৬।
২. দানিয়েল ৮/১৩-১৪।
৩. দানিয়েল ১২/১১-১২।

এই তিনটি সংবাদই অসত্য। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৩০ নং, ৩১ নং, ৯৮ নং ভুলের আলোচনায় তা বর্ণনা করা হয়েছে।

১৬শ বক্তব্য

উক্ত গ্রন্থের ২৩৪ পৃষ্ঠায়, তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে লিখেছেন : "মুসলমানদের সকলেই বলে যে, অনেক মানসূখ বা রহিতকৃত আয়াত কুরআনের মধ্যে রয়েছে। কেউ যদি সামান্য চিন্তা করে এবং অতি অল্প অনুধাবন করে তাহলেও বুঝতে পারবে যে, এই নীতিটি ত্রুটিযুক্ত এবং অপূর্ণ।"

আমি বলব যে, এই নীতিটি যদি ত্রুটিযুক্ত ও অপূর্ণ হয় তাহলে তাওরাত ও ইঞ্জিল অধিকতর ত্রুটিযুক্ত ও অধিকতর অপূর্ণ; কারণ উভয় গ্রন্থের মধ্যে অনেক আয়াত বিদ্যমান রয়েছে যা রহিত হয়ে গিয়েছে, চতুর্থ বক্তব্য আলোচনার সময় পাঠক তা জেনেছেন। ইনশাআল্লাহ তৃতীয় অধ্যায়ে তা বিস্তারিত জানতে পারবেন। এজন্য এই গবেষক পণ্ডিতের জন্য অবাক হতে হয়! কুরআনের প্রতি তাঁর বিরাগ থাকার কারণে তিনি কুরআনের ওপর এমন একটি বিষয়ের অপবাদ দিচ্ছেন যে বিষয়টি তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে আরো অনেক বেশি মারাত্মকভাবে বিদ্যমান।

১৭শ বক্তব্য

কুরআন কারীমে আল্লাহ এরশাদ করেছেন, "আপনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন তখন আপনি নিক্ষেপ করেন নি, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।"[১] এই আয়াত থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যে মু'জিযা বা অলৌকিক কর্ম জানা যায় তা মাননীয় পাদরী তাঁর গ্রন্থের ২৪৬ পৃষ্ঠায়, তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে অস্বীকার করেছেন। তাঁর ধারণামতে, তিনি এই অলৌকিকত্ব সম্পর্কে আপত্তি করে বলেন, "উল্লিখিত হাদীসটি– যে হাদীসটি মুফাস্‌সিরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন– যদি আমরা সহীহ বা বিশুদ্ধ হিসাবে মেনে নিই এবং আমরা মেনে নিই যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এক মুষ্টি মাটি নিয়ে শত্রু শিবিরের দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন, তাহলেও এর দ্বারা কোন অলৌকিকত্ব প্রমাণিত হয় না।"

আমার বক্তব্য হলো, এখানে তাফসীরকারগণ যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ : বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের সময় যখন কুরাইশ বাহিনী আকানকাল প্রান্তর দিয়ে আগমন করছিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ! এই কুরাইশ বাহিনী তার অহমিকা ও আত্মগৌরব নিয়ে আগমন করেছে। তারা আপনার রাসূলের সত্যতা অস্বীকার করেছে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে ওয়াদা করেছেন আমি আপনার কাছে তা চাচ্ছি। তখন জিবরাঈল (আ) এসে বলেন, আপনি এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করুন। অতঃপর যখন উভয় বাহিনী

১. সূরা আনফাল : ১৭ আয়াত।

পরস্পরের সম্মুখীন হলো তখন তিনি এক মুষ্টি বালি-কাঁকর হাতে নিয়ে তাদের মুখে নিক্ষেপ করে বলেন : شاهت الوجوه লাঞ্ছিত ও বিকৃত হোক এসকল মুখ! তখন মুশরিক বাহিনীর প্রত্যেক ব্যক্তি তার চোখ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তারা ভীত পরাজিত হয়ে পিছু হটে। মুসলিম বাহিনী তাদের পশ্চাৎ-ধাবন করে তাদের হত ও বন্দী করতে থাকে। এরপর তারা যখন ফিরে যায় তখন আবার পরস্পরে অহংকার ও গৌরব করে বলতে থাকে, আমি যুদ্ধের ময়দানে অমুককে কতল করেছি এবং অমুককে বন্দী করেছি...।

এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে : "তখন জিবরাঈল (আ) এসে বলেন, আপনি এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করুন।" এ থেকে সন্দেহাতীতভাবে বুঝা যায় যে, বিষয়টি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল। এরপর বলা হয়েছে : "তখন মুশরিক বাহিনীর প্রত্যেক ব্যক্তি তার চোখ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে"। একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, বিষয়টি ছিল অলৌকিক। কাজেই হাদীসটি মেনে নেওয়ার পরে আর এ ঘটনার অলৌকিকত্ব অস্বীকার করার কোন উপায় থাকে না। তবে যারা একরোখা, যিদ ও প্রতিহিংসা যার একমাত্র উদ্দেশ্য তার জন্য তো সত্য অস্বীকার করা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

১৮শ বক্তব্য

২৭৫ পৃষ্ঠায়, তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে রয়েছে : "জেনে রাখ, তিন বছর পরে শুধু ১০ বা ১২ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঈমান এনেছিল। ১৩শ বছরে, অর্থাৎ হিজরী প্রথম সনে মক্কার ১০০ জন এবং মদীনার ৭৫ জন মানুষ ঈমান এনেছিল।"

এই কথাটি ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা। এর খণ্ডনের জন্য কুরআনের অনুবাদক ইংরেজ প্রাচ্যবিদ জর্জ সেল (১৬৮০-১৭৩৬খৃ) -এর বক্তব্যই যথেষ্ট। আমি ১৮৫০ সালে[১] প্রকাশিত সংস্করণ থেকে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি : 'হিজরতের পূর্বেই মদীনার অবস্থা এমন হলো যে, মদীনায় একটি বাড়িও পাওয়া দুষ্কর হয়ে গেল যে বাড়িতে মুসলিম নেই।" অতঃপর তিনি বলেন :"যে ব্যক্তি বলে যে, ইসলাম শুধু তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে তার কথা মিথ্যা অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়। কারণ এমন অনেক দেশ আছে যেখানে কখনোই তরবারী প্রবেশ করেনি কিন্তু ইসলাম প্রসার লাভ করেছে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ইসলাম প্রচারের শুরুতে আবূ যার (রা), তাঁর ভাই উনাইস (রা)ও তাঁদের মা ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন তাঁরা নিজ এলাকায় ফিরলেন তখন আবূ যার (রা)-এর আহ্বানে গিফার গোত্রের অর্ধেক মানুষ

১. সেল-এর অনুবাদ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে অনেকবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

ইসলাম গ্রহণ করে। নবুওয়তের ৭ম বছরে ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলা ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। তাঁদের হিজরতের পরেও মক্কায় আরো অনেক মুসলিম অবস্থান করছিলেন। এ সময়ে নাজরানের খৃষ্টানদের মধ্য থেকে প্রায় ২০ জন ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুওয়তের ১০ বছরের আগে দিমাদ আল-আয্দী ইসলাম গ্রহণ করেন।

হিজরতের পূর্বেই তুফাইল ইবনু আমর আদ-দাওসী ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর গোত্রের একজন সম্মানিত নেতা ছিলেন। তিনি নিজ এলাকায় ফিরে ইসলামের দিকে আহ্বান শুরু করলে তাঁর আহ্বানে তাঁর পিতা ও মাতা ইসলাম গ্রহণ করেন।

হিজরতের পূর্বেই মুস'আব (রা)-এর ওয়ায-এর বরকতে এক দিনেই বনূ আশ্হাল গোত্রের সকল মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। পুরো গোত্রের শুধু আমর ইবনু ছাবিত ছাড়া সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। আমর উহুদ যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। আশহাল গোত্রের ইসলাম গ্রহণের পরে মুস'আব মদীনায় ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। মদীনায় এমন একটি বাড়িও ছিল না, যে বাড়িতে কিছু মুসলমান পুরুষ ও নারী ছিলেন না। শুধু মদীনার পূর্ব দিকে পাহাড়ী উপত্যকার মানুষ ইসলামের বাইরে থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনা গমন করছিলেন তখন বুরায়দা আসলামী (রা) স্বেচ্ছায় তাঁর গোত্রের ৭০ জন মানুষ-সহ ইসলাম গ্রহণ করেন। ইথিওপিয়ার সম্রাট নাজাশী হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। হিজরতের পরে আবূ হিন্দ, তামীম, নু'আইম ও আরো চার ব্যক্তি সিরিয়া থেকে মদীনায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়া আরো অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

১৯শ বক্তব্য

২৭৯ পৃষ্ঠায়, তৃতীয় অধ্যায়ের ৫ম পরিচ্ছেদে মাননীয় পাদরী বলেছেন : "প্রথমত, আবূ বকর (রা) তাঁর সেনাবাহিনীর জন্য ১১ জন সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেককে একটি লিখিত বিধান প্রদান করেন যা কাফিরদেরকে পড়ে শোনানোর জন্য নির্দেশ দেন।" এরপর মাননীয় পাদরী লিখেছেন যে, উক্ত বিধানের মধ্যে ছিল : "এ সকল সেনাপতি কোন বিভ্রান্তকে কোনভাবে দয়া করবে না বরং তাদেরকে আগুনে পোড়াবে এবং সর্ব পন্থায় তাদেরকে হত্যা করবে।"

এই কথাটি ভুল। 'রাওযাতুস-সাফা' নামক গ্রন্থে আবূ বকরের ওসীয়ত নিম্নরূপে উদ্ধৃত করা হয়েছে : "আবূ বকর সেনাবাহিনীকে ওসীয়ত করেন যে, তারা কোন প্রকারে কোন ধোঁকার আশ্রয় নেবে না, কোনরূপ চুক্তি ভঙ্গ করবে না। শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ ও মহিলা হত্যা করবে না। কোন ফলদার বৃক্ষ কর্তন করবে না। গীর্জা, মন্দির ও উপাসনালয়ে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত সন্ন্যাসী ও ধর্মযাজকদেরকে কিছু বলবে না।"

অতএব মাননীয় পাদরীকে ইসলামের কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করতে হবে যে, আবূ বকর মুসলমান সৈন্যদেরকে কাফিরদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১]

২০শ বক্তব্য

২৮০ পৃষ্ঠায়, তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে আছে : "যখন উমর (রা) খলীফা হলেন, তখন তিনি আরব বাহিনীকে ইরানে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদের নির্দেশ দেন যে, যদি ইরানবাসিগণ স্বেচ্ছায় ও আনন্দিত চিত্তে 'মুহাম্মাদী ধর্ম'[২] গ্রহণ করে তাহলে ভাল। নইলে জোরপূর্বক তাদেরকে কুরআন ও মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) উপর বিশ্বাস করতে বাধ্য করতে হবে।"

এই কথাটি নিঃসন্দেহে জঘন্য ভুল ও সম্পূর্ণ মিথ্যা। উমর (রা) কখনোই ইরানবাসীদেরকে জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে ইসলামে দীক্ষিত করতে নির্দেশ দেন নি। এই মাননীয় পাদরীর কি মনে নেই প্যালেস্টাইন অধিকার করে উমর খৃস্টানদের সাথে কি ব্যবহার করেছিলেন? তিনি নিজে সশরীরে সেখানে গমন করেন। জেরুযালেমের অধিকার গ্রহণ করার পরে ত্রিত্ববাদী একজন খৃস্টানকেও জোর করে মুসলমান বানান নি। কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে জবরদস্তি করা হয়নি বরং তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানজনক শর্তে আত্মসমর্পণ করার সুযোগ দেন। তাদের একটি গীর্জাও জবরদখল করেন নি। তিনি তাদের সাথে অত্যন্ত সম্মানের সাথে আচরণ করেন। বাইবেলের ভাষ্যকার খৃস্টান পণ্ডিত টমাস নিউটন এই আচরণের জন্য উমর (রা)-এর প্রশংসা করেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে পাঠক তা দেখতে পাবেন।

---

১. এখানে লক্ষণীয় যে, আবূ বকর (রা)-এর দুইটি নির্দেশ ছিল। উপরের নির্দেশ ছিল উসামা বিন যায়দের বাহিনীর প্রতি। অপরটি মুরতাদদের বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যদের প্রতি। ইহূদী, খৃস্টান বা সাধারণ অমুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধের ক্ষেত্রে আবূ বকরের উপরের ওসীয়ত প্রযোজ্য। অপরদিকে মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ধর্মত্যাগ, বিদ্রোহ ও নাশকতামূলক কর্মে লিপ্ত মানুষদের ক্ষেত্রে তাঁর দ্বিতীয় নির্দেশ প্রযোজ্য। তিনি মুরতাদ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সৈন্যদেরকে কঠোরতার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি তাদের নির্দেশ দেন : "কোনো ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীকে তাওবার সুযোগ না দিয়ে হত্যা করবে না। তাদের থেকে তাওবা করে ইসলামে ফিরে আসা ছাড়া আর কোন কিছুই গ্রহণ করা যাবে না। যদি তারা তাওবা করতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের মধ্যে যাকেই পাবে হত্যা করবে এবং পুড়িয়ে ফেলবে। তবে কোনো অবস্থাতেই নারী ও শিশু-কিশোরদেরকে হত্যা করবে না।" আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের বিদ্রোহ ও নাশকতারোধে এই প্রকারের কঠোরতা অতীব প্রয়োজন।

২. প্রাচ্যবিদ ও খৃস্টান পণ্ডিতগণ ইচ্ছাকৃত নোংরামি ও শঠতার কারণে 'ইসলাম' ধর্মকে 'মুহাম্মাদী' ধর্ম বলে উল্লেখ করেন। অথচ কুরআন, হাদীস ও ইসলামের কোনো পরিভাষায় কখনো ইসলামকে 'মুহাম্মাদী' ধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়নি। সম্ভবত তাঁরা এ কথা বুঝাতে চান যে, ইসলাম মুহাম্মাদের বানানো ধর্ম অথবা 'খৃস্টানগণ' যেমন 'খৃস্টের' পূজারী ও উপাসক তেমনি 'মুহাম্মাদীগণ'ও মুহাম্মাদের পূজারী বা উপাসক।

২১শ বক্তব্য

২১০ পৃষ্ঠায়, তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে : "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়ত দাবী করার পূর্বে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তাঁর চাচা আবূ তালিবের সাথে সিরিয়ায় গমন করেন। এরপর তিনি একাকী অনেকবার তথায় গমন করেন।"

এই কথাটিও ভুল ও মিথ্যা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রথমবার যখন তাঁর চাচার সাথে সিরিয়া গমন করেন তখন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুসারে তাঁর বয়স ছিল ৯ বছর। এরপর তিনি দ্বিতীয়বার সিরিয়া গমন করেন খাদীজা (রা)-র ব্যবসায়ের পণ্য নিয়ে খাদিজার দাস মায়সারার সাথে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অনুসারে তখন তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর। নবুওয়তের পূর্বে এই দুইবার ছাড়া আর কখনো তিনি সিরিয়া গমন করেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি। এই পাদরী তাঁর একবার একাকী গমনকে 'অনেকবার' বানিয়ে ফেললেন।

২২শ বক্তব্য

তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে, ২৪৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে : মথিলিখিত সুসমাচারের দ্বাদশ অধ্যায়ে যে অলৌকিক নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, যীশু ইহূদীদেরকে 'ইউনুসের অলৌকিক নিদর্শন বা মু'জিযা' দেখানোর ওয়াদা করেন, সেই নিদর্শনটি তাঁর (যীশুর) পুনরুত্থানের সময় ইহূদীদের কাছে পৌছে যায়।

এই কথাটিও ভুল। কারণ যীশু তাদেরকে যে অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর ওয়াদা করেন, তাতে তিনি শুধু মৃত্যুর পরে পুনরুত্থিত হওয়ার কথা বলেন নি। তাঁর অলৌকিকত্বের ওয়াদাটি ছিল নিম্নরূপ : 'যীশু তিনদিন ও তিন রাত্রি মাটির নিচে অবস্থান করবেন। অতঃপর তিনি পুনরুত্থিত হবেন।' ওয়াদাকৃত এই অলৌকিক নিদর্শন কখনোই ইহূদীরা দেখতে পাই নি (বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যীশু কখনোই তিনদিন তিনরাত মাটির নিচে অবস্থান করেন নি; বরং ১ দিন ২ রাত অবস্থান করেছেন)। পাঠক বিষয়টি বিস্তারিত জানতে পারবেন এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৬০ নং ভুলের বিবরণে।

২৩শ বক্তব্য

২৫৩ পৃষ্ঠায়, তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে রয়েছে : "একথা গোপন নয় যে, যীশুর মু'জিযা বা অলৌকিক কর্মগুলি শিষ্যগণ লিপিবদ্ধ করেছেন যারা সর্বদা যীশুর সাথে থাকতেন এবং স্বচক্ষে সেগুলি দেখেছেন।"

এই কথাটিও ভুল। স্বয়ং পাদরী সাহেব তাঁর 'হাল্লুল ইশকাল' গ্রন্থে যা লিখেছেন এই কথাটি তার বিপরীত। হাল্লুল ইশকাল গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম বক্তব্যের উদ্ধৃতির সময় তা জানতে পারবেন।

২৪শ বক্তব্য

২৮৩ পৃষ্ঠায়, তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে লিখেছেন : "যে ব্যক্তি 'মুহাম্মাদী ধর্ম' ত্যাগ করে কুরআনের নির্দেশ[১] অনুসারে তাকে তারা হত্যা করে। এ কথা তো অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কার যে, তরবারীর আঘাতে সত্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কোন মানুষের পক্ষে জোর-জবরদস্তির কারণে অন্তর দিয়ে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ও অন্তর দিয়ে আল্লাহকে ভালবাসা অসম্ভব, যেমন অসম্ভব জবরদস্তির কারণে অন্যায় ও অনুচিত কাজ থেকে বিরত থাকা। উপরন্তু জবরদস্তি ও জুলুম আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর উপর বিশ্বাসে বাঁধা দেয়।"

মাননীয় পাদরীর এই অভিযোগ তাওরাতের ক্ষেত্রে আরো ভয়ঙ্করভাবে প্রযোজ্য। যাত্রাপুস্তকের ২২ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি কেবল সদাপ্রভু ব্যতিরেকে কোন দেবতার কাছে বলিদান করবে (সে হত্যাকৃত হউক)[২]।

যাত্রাপুস্তকের ৩২ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূসা (আ) (মোশি) আল্লাহর হুকুমে লেবির সন্তানদেরকে যারা গোবৎস পূজা করেছে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। এতে তারা ২৩ হাজার মানুষ হত্যা করে।[৩]

যাত্রাপুস্তকের ৩৫ অধ্যায়ের ২য় আয়াতে শনিবারের বিশ্রামের বিধান দিয়ে বলা হয়েছে : "যে কেহ সেই দিনে কার্য করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।"

গণনাপুস্তকের ১৫ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন ইহুদী ব্যক্তিকে শনিবারের দিন কাঠ কুড়াতে দেখা যায়। এজন্য তাকে আটক করা হয়। তখন মূসা (আ) আল্লাহর নির্দেশে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে ইহুদীগণ সেই ব্যক্তিকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে।[৪]

দ্বিতীয় বিবরণের ১৩শ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, যদি কোন নবীও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত, উপাসনা বা পূজা করার প্রতি আহ্বান করে তাহলে সেই নবীকেও হত্যা করতে হবে, যদিও সেই নবী অনেক বড় বড় মু'জিযা বা অলৌকিক কর্ম প্রদর্শন করেন।[৫]

---

১. কুরআন কারীমে কখনোই ধর্মত্যাগীর মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। তবে হাদীসে এ বিষয়ক বিধান দেওয়া হয়েছে।

২. পরবর্তী সংস্করণগুলিতে অনুবাদে পরিবর্তন করা হয়েছে : বাংলা বাইবেলে এখানে বলা হয়েছে : "সে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে।" ইংরেজিতে বলা হয়েছে : He shall be utterly destroyed.

৩. এই সংখ্যার বর্ণনা বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণে বিভিন্ন রূপে দেওয়া হয়েছে। ১৮৪৪ সালের সংস্করণে ২৩ হাজার, ১৮৬৫ সালের সংস্করণে এবং তার পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ৩ হাজার উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. গণনাপুস্তক : ১৫/৩২-৩৬।

৫ দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/১-৫।

অনুরূপভাবে যদি নবী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কাউকে আল্লাহ ছাড়া কোন দেবতা, প্রতিমা বা কোন কিছুর ভক্তি, সেবা বা উপাসনার প্রতি আগ্রহ প্রদান করে তাহলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। সবচেয়ে প্রিয়তম আত্মীয় বা বন্ধু হলেও তাকে দয়া দেখানো যাবে না।[১]

এছাড়া কোন গ্রাম বা নগরীর অধিবাসীরা যদি ধর্মত্যাগ করে তাহলে সেই গ্রামের বা নগরের সকল মানুষকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে এবং সেই গ্রামের সকল জীব-জানোয়ার পশুও হত্যা করতে হবে। গ্রামের সকল সম্পদ ও দ্রব্যাদি পুড়িয়ে ফেলতে হবে। অগ্নিদগ্ধ গ্রাম বা জনপদটি চিরকালীন ঢিবি হয়ে থাকবে। কখনোই আর তা পুনর্বার নির্মিত হবে না।[২]

দ্বিতীয় বিবরণের ১৭শ অধ্যায়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তির বিষয়ে প্রমাণিত হয় যে, সে আল্লাহ ছাড়া কারো সেবা, উপাসনা বা পূজা করেছে তাহলে সে নারী হোক আর পুরুষ হোক তাকে পাথর মেরে হত্যা করতেই হবে।[৩]

এসকল বাড়াবাড়ি কড়াকড়ি কিছুই কুরআনে নেই। তাই বড় আশ্চর্য হতে হয় এই পক্ষপাতদুষ্ট গোঁড়ামিতে আক্রান্ত পাদরীর জন্য! এত বাড়াবাড়ির জন্য তাওরাতের কোন দোষ হয় না, অথচ কুরআন বাড়াবাড়ি ছাড়াই দোষগ্রস্থ হয়ে যায়!

রাজাবলির প্রথম খণ্ডের ১৮শ অধ্যায়ে আছে যে, নবী (ভাববাদী) এলিয় কীশোন স্রোতোমার্গের[৪] মধ্যে ৪৫০ ব্যক্তিকে বধ করেন; কারণ তারা বাল দেবতার ভাববাদী ছিল।[৫]

এখন মাননীয় পাদরীর কথা থেকে প্রমাণিত হলো যে, যে বিষয়টিকে তিনি 'অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কার' বলে দাবি করেছেন সেই বিষয়টি মূসা (মোশি), এলিয় উভয় নবী (আ) বরং স্বয়ং আল্লাহ নিজেও জানতেন না। তাঁর বক্তব্য অনুসারে এরা সকলেই এত মুর্খ ও নির্বোধ (নাঊযু বিল্লাহ্) ছিলেন যে, এইরূপ একটি অতি স্পষ্ট কথা তাঁরা জানতেন না, যা এই অতি বুদ্ধিমান পাদরীর মতে একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

তবে আমি তাঁকে বলতে চাই যে, ত্রিত্ববাদীদের পবিত্রপুরুষ পৌল করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত তাঁর প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে বলেছেন : "কেননা ঈশ্বরের যে মুর্খতা, তাহা মনুষ্যদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানযুক্ত, এবং ঈশ্বরের যে দুর্বলতা, তাহা মনুষ্যদের অপেক্ষা অধিক সবল।" কাজেই ত্রিত্ববাদীদের পবিত্রপুরুষ পৌলের এই বিশ্বাস অনুসারে আল্লাহর মুর্খতা-নির্বুদ্ধিতা (নাঊযু বিল্লাহ!) এই মহান

১. দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/৬-১১।
২. দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/১২-১৬
৩. দ্বিতীয় বিবরণ ১৭/২-৭।
৪. ফিলিস্তিনের হাইয়া শহরের নিকট ছোট নদী।
৫. ১ রাজাবলি ১৮/৪০।

পাদরীর পাণ্ডিত্য নির্ভর যুক্তি ও মতামতের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। কাজেই তাঁর কাছে যা অত্যন্ত স্পষ্ট বলে প্রতিভাত হয়েছে তা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়।

উপরের বক্তব্যগুলি 'মীযানুল হক' গ্রন্থের নতুন সংস্করণ থেকে নমুনা হিসাবে উল্লেখ করলাম। তাঁর বাকি বক্তব্যগুলি আমি এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন মত উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ্।

মাননীয় পাদরী মীযানুল হক গ্রন্থের অধুনালুপ্ত পুরাতন সংস্করণের ২৫২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "কেয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র খণ্ডিত হয়েছে"[১] আল্লাহর এই বাণীর ব্যাখ্যায় কাযী বায়যাবী ও অন্যান্য কতিপয় মুফাস্‌সির বলেছেন যে; এর অর্থ হলো, অচিরেই চন্দ্র খণ্ডিত হবে।"

এই কথাটি ভুল। কথাটি বায়যাবী বা কারো কথা নয়। কাযী বায়যাবী, যামাখশারী প্রমুখ মুফাস্‌সির কথাটি 'কোন কোন ব্যক্তি বলেছে' বলে উল্লেখ করে তার প্রতিবাদ করেছেন। প্রাজ্ঞ পণ্ডিত আল-হাসান তাঁর ইসতিফসার গ্রন্থে পাদরী সাহেবের এই কথার প্রতিবাদ করে বলেন, "কথাটি ভুল অথবা সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত করার জন্য বিকৃত করা হয়েছে।" পাদরী সাহেব শেষ পর্যন্ত নতুন সংস্করণে বাক্যটি পরিবর্তন করেছেন।

হাল্লুল ইশকাল গ্রন্থের অসত্য কথাবার্তার কিছু নমুনা

পাদরী ফান্ডার সাহেবের অন্য গ্রন্থ 'হাল্লুল ইশকাল' (সমস্যার সমাধান) গ্রন্থের দুইটি বক্তব্য ইতোপূর্বে মীযানুল হক গ্রন্থের পঞ্চম ও একাদশ বক্তব্য আলোচনার সময় উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুইটি বক্তব্যের অবস্থা পাঠক সেখানে দেখতে পেয়েছেন। এই গ্রন্থ থেকে আমি যে নয়টি বক্তব্য নমুনা হিসাবে উদ্ধৃত করতে চেয়েছিলাম তার বাকি ৭টি বক্তব্য এখানে উল্লেখ করছি।

তৃতীয় বক্তব্য

হাল্লুল ইশকাল গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে : "আমরা বলি না যে, আল্লাহ তিন ব্যক্তি অথবা এক ব্যক্তি বরং আমরা এককের মধ্যে তিনটি মূল, তিন ব্যক্তিত্ব বা তিন স্বর্গীয় ব্যক্তির (Divine Person) কথা বলি। তিন ব্যক্তিত্ব ও তিন ব্যক্তির মধ্যে আসমান ও যমিনের পার্থক্য।"

একথাটি একটি খাঁটি ধোঁকাবাজির ঘোরপ্যাচ ছাড়া কিছুই নয়। কারণ 'ব্যক্তি' ছাড়া 'অস্তিত্ব' থাকতে পারে না। তিনি নিজেই স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন যে, 'তিন স্বর্গীয় ব্যক্তি' বলতে তারা বিশ্বাস করেন যে, 'তিন স্বর্গীয় ব্যক্তি' পরিপূর্ণ পৃথক সত্ত্বা ও অস্তিত্ব নিয়ে বিদ্যমান। আর তাই যদি হয় তাহলে 'তিন স্বর্গীয় ব্যক্তি'র অস্তিত্বে বিশ্বাস করার অর্থই হলো তিন পৃথক ব্যক্তিকে ঈশ্বররূপে বিশ্বাস করা।

---

১. সূরা আল-কামার : ১ আয়াত।

তিনজন পৃথক ব্যক্তির কল্পনা করা ছাড়া কোনভাবেই যে তিনজন পৃথক স্বর্গীয় ব্যক্তির ঐক্যরূপ কল্পনা করা যায় না তার বড় প্রমাণ হলো, খৃষ্টানগণই নিজেদের কথার মধ্যে বিভিন্ন ভাবে 'তিনজন ব্যক্তি' বলে স্বীকার করেছেন। মাননীয় পাদরী ফান্ডার প্রথম জীবনে ছিলেন ক্যাথলিক। এরপর ক্যাথলিক ধর্ম ত্যাগ করে তিনি লুথারীয় প্রটেস্ট্যান্ট মতে দীক্ষিত হলেন। অবশেষে তিনি চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের মতে দীক্ষিত হন। এই চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের প্রচারিত 'প্রার্থনা পুস্তকটির' উর্দু সংস্করণ, যা ১৮১৮ সালে রজার্ডওয়াটস প্রেসে ছাপা হয়, তার ২৯ ও ৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে : "হে তিন মহাপবিত্র! বরকতময় সুউচ্চমর্যাদার অধিকারিগণ, যার এক, অর্থাৎ যারা তিনজন ব্যক্তি এবং একজন ঈশ্বর, আমাদেরকে- সন্ত্রস্থ পাপীদেরকে দয়া করুন।"

এখানে তারা তাদেরই ভাষায় 'তিনজন ব্যক্তি' বলে উল্লেখ করেছেন।

চতুর্থ বক্তব্য

১২১ পৃষ্ঠায় আছে : "হ্যাঁ, শুধু মথিলিখিত সুসমাচারের ক্ষেত্রে কিছু পণ্ডিত ধারণা করেন যে, সম্ভবত এই গ্রন্থটি হিব্রু ভাষায় বা আরামিক ভাষায় রচিত ছিল, অতঃপর তা গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়। তবে জোরালো মত হলো যে, এই গ্রন্থটিও শিষ্য মথি গ্রীক ভাষায় লিখেছিলেন।"

তাঁর "কিছু পণ্ডিত ধারণা করেন" এবং "জোরালো মত" এই উভয় কথাই সন্দেহাতীতভাবে অসত্য। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় বিষয়ের ১৮শ প্রমাণের আলোচনায় পাঠক তার বিস্তারিত জানতে পারবেন। এখানে তাঁর উপরিউক্ত বক্তব্যের তিনটি শব্দ লক্ষ্য করুন। প্রথম শব্দ 'কিছু পণ্ডিত ধারণা করেন', দ্বিতীয় শব্দ 'সম্ভবত' এবং তৃতীয় শব্দ 'জোরালো মত'। এই তিনটি শব্দ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তাঁদের ধর্মগ্রন্থের জন্য তাদের কোন সংরক্ষিত অবিচ্ছন্ন সূত্র বা প্রমাণ নেই। এ জন্যই তাঁরা এভাবে ধারণা, কল্পনা ও আন্দাজের উপর সব কথা বলে থাকেন।

পঞ্চম বক্তব্য

১৪৫ পৃষ্ঠায় : "এ কথাটি ঠিক যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইঞ্জিল, অর্থাৎ মার্ক ও লূক লিখিত সুসমাচারদ্বয় যীশুর শিষ্যদের দ্বারা লিখিত নয়।"

অতঃপর তিনি ১৪৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "সকল প্রাচীন খৃষ্টীয় গ্রন্থে অনেক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সনদ বা সূত্রের গ্রন্থসমূহে অনেক প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করা হয়েছে যে, বর্তমান প্রচলিত ইঞ্জিল বা বাইবেলের 'নতুন নিয়ম'টিকে যীশুর শিষ্যরা লিখেছিলেন। প্রথমে তা যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। কোন যুগে কখনো এর ব্যতিক্রম কিছু বিদ্যমান ছিল না।"

পাঠকগণ এই ব্যক্তির পূর্ববর্তী বক্তব্য ও এই দুইটি বক্তব্য, এই তিনটি বক্তব্যের বৈপরীত্য ও সংঘর্ষ লক্ষ্য করুন।

প্রথমত, পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, তাঁদের ধর্মগ্রন্থগুলির কোন সনদ বা সূত্র নেই এবং প্রথম ইঞ্জিল বা মথিলিখিত সুসমাচারটি কোন এক ব্যক্তি হিব্রু বা আরামীয় কোন এক ভাষায় লিখেছিলেন। এরপর তা অনুবাদ করল কে? অজ্ঞাত! অথচ এখানে তিনি বলছেন যে, 'নতুন নিয়ম' পুরোটিই যীশুর শিষ্যগণ লিখেছেন এবং তা সনদ বা সূত্রের গ্রন্থসমূহে অনেক প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত এবং সকল খৃষ্টীয় গ্রন্থে উল্লিখিত।

দ্বিতীয়ত, এখানে প্রথমে তিনি স্বীকার করছেন যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সুসমাচারদ্বয় (মার্ক ও লূক) যীশুর শিষ্যগণ কর্তৃক লিখিত নয়। আবার তার পরেই দাবি করছেন যে, সকল সুসমাচার ও নতুন নিয়ম পুরোটাই যীশুর শিষ্যগণ কর্তৃক লিখিত।

তৃতীয়ত, তিনি পূর্ববর্তী বক্তব্যে স্বীকার করেছেন যে, মথি লিখিত সুসমাচার সম্ভবত প্রথমে হিব্রু অথবা আরামীয় ভাষায় লিখিত ছিল, পরে তা তার বর্তমান রূপ গ্রীক ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। অথচ তিনি এখানে দাবি করছেন যে, পুরো নতুন নিয়ম বর্তমানে যে অবস্থাতে আছে প্রথম যুগ থেকেই এইরূপেই ছিল, এর ব্যতিক্রম কখনোই ছিল না।

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাঠক জানতে পারবেন যে, নতুন নিয়মের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি যীশুর শিষ্যগণ লিখেছেন বলে কোন প্রকার প্রমাণ নেই।

১. যাকোবের পত্র (The General Epistle of James)
২. যিহূদার পত্র (The General Epistle of Jude)
৩. ইব্রীয়দের প্রতি (পৌলের) পত্র (The Epistle of Paul The Apostle of the Hebrews)
৪. পিতরের দ্বিতীয় পত্র (The Second Epistle General of Peter)
৫. যোহনের দ্বিতীয় পত্র (The Second Epistle General of John)
৬. যোহনের তৃতীয় পত্র (The Third Epistle of John)

৩৬৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত উপরের ৬টি পুস্তকের গ্রহণযোগ্যতার ও শিষ্যগণ কর্তৃক লিখিত হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা হতো। এছাড়া "যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য" (The Revelation of St. John The Divine) পুস্তকটির গ্রহণযোগ্যতা ও শিষ্য যোহন কর্তৃক লিখিত হওয়ার বিষয়ে ৩৯৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সন্দেহ পোষণ করা হতো।

খৃস্টান ধর্মগুরু ও পাদরীগণ তাঁদের প্রথম মহাসম্মেলন ৩২৫ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'নিসীয় সম্মেলনে' উপরের গ্রন্থগুলিকে সন্দেহজনক হিসাবে বাতিল বলে গণ্য করেন। ৩৬৪ খৃস্টাব্দে লোডেসিয়ায় অনুষ্ঠিত অপর খৃস্টীয় মহাসম্মেলনেও এই গ্রন্থগুলিকে সন্দেহজনক ও বাতিল হিসাবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রাখা হয়। খৃস্টধর্মের অন্যতম সম্প্রদায় সিরিয়ানী সম্প্রদায় (East Syrian Church) খৃস্টধর্মের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পিতরের দ্বিতীয় পত্র, যিহূদার পত্র, যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র, যোহনের

নিকট প্রকাশিত বাক্য, এই পাঁচটি গ্রন্থকে বাইবেলের অংশ হিসাবে মানতে অস্বীকার করে আসছেন। সকল আরবীয় চার্চও এই গ্রন্থগুলিকে অস্বীকার করে এবং এগুলিকে বাতিল ও বানোয়াট বলে বিশ্বাস করে।

এই পাদরী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত তাঁর গ্রন্থের পরিবর্তিত সংস্করণের ৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠায় উপরে উল্লিখিত নতুন নিয়মের পুস্তকগুলির বিষয়ে নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এগুলি প্রথম যুগে নতুন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এছাড়া নতুন নিয়মের প্রাচীন সিরীয় (সুরিয়ানী ভাষায়) অনুবাদে পিতরের দ্বিতীয় পত্র, যিহূদার পত্র, যোহনের পত্রদ্বয় ও যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য, এই গ্রন্থগুলির এবং যোহন লিখিত সুসমাচারের অষ্টম অধ্যায়ের ২য় আয়াত থেকে ১১ আয়াত পর্যন্ত অংশের এবং যোহনের প্রথম পত্রে পঞ্চম অধ্যায়ের ৭ম আয়াতের কোন অস্তিত্ব নেই।

এজন্যই আমার বন্ধু আল-ইসতিবশার গ্রন্থের লেখক (শাইখ মুহাম্মাদ আল-হাসান মুহানী) এই পাদরীর কথাবার্তা উদ্ধৃত করার পরে বলেছেন, "এই পাদরী সম্পর্কে একটি কথাই বলা যায়, তা হলো তিনি মস্তিষ্কবিকৃত পাগল।"

৬ষ্ঠ বক্তব্য

১৪৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : "সেলসাস (Celsus Epicurean)[১] ছিলেন দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের একজন পৌত্তলিক পণ্ডিত। তিনি খৃস্টধর্মের প্রতিবাদে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার কিছু কথা এখনো পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি কোন স্থানে লিখেন নি যে, ইঞ্জিল বা নতুন নিয়ম শিষ্যদের লেখা নয়।"

তাঁর এই বক্তব্যটি দুই দিক থেকে ভুল ও অসত্য।

প্রথমত, পাদরী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, সেলসাসের মূল গ্রন্থটি পাওয়া যায় না, শুধু তার কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত পাওয়া যায়। তাহলে তিনি কিভাবে মনে করলেন যে, উক্ত গ্রন্থের কোথাও তিনি এ কথা লিখেন নি। আমি প্রায় নিশ্চিত যে, প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরু পণ্ডিতগণ বর্তমান যুগে যেভাবে বিপক্ষের বক্তব্য (আংশিক ও বিকৃতভাবে) উদ্ধৃত করেন, ৩য় শতকেও খৃস্টান ধর্মগুরু পণ্ডিতগণ এভাবেই প্রতিপক্ষের বক্তব্য উদ্ধৃত করতেন। সেলসাসের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন মিসরীয় খৃস্টান ধর্মগুরু দার্শনিক ও যাজক-পণ্ডিত ওরিগন (১৮৫-২৫৪ খৃ) তাঁর লিখিত বিভিন্ন বইয়ে। সেই যুগে খৃস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিথ্যা বলা, ধোঁকা দেওয়া ও প্রবঞ্চনা করা ধর্মীয় মুস্তাহাব ও ভাল কাজের মত মনে করা হতো, এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় নির্দেশনার ষষ্ঠ বক্তব্যে পাঠক তা জানতে পারবেন। ওরিগন নিজে সেই সব পণ্ডিতের অন্যতম ছিলেন, যারা মিথ্যা ও জালিয়াতি করে বই লিখে যীশুর শিষ্যদের নামে বা তাদের শিষ্যদের নামে

---

১. দেখুন Eusebius Pumphilus, The Ecclesiastical History, USA, Michigan, Baker Book House, 13th printing 1987, page 253; The Oxford Illustrated History of Christianity, New York, Oxford University Press, 1990, page 27.

বা প্রসিদ্ধ কোন পাদরীর নামে চালিয়ে দেওয়াকে জায়েয বলে ফতওয়া দিয়েছিলেন। ইংরেজ প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মূর (১৮১৯-১৯০৫ খৃ) লিখিত 'চার্চের ইতিহাস' গ্রন্থের ১৮৪৮ সালের মুদ্রিত উর্দু সংস্করণের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও ধোঁকাকে জায়েব ফতওয়া দিয়েছেন, সেই ফতওয়াবাজের উদ্ধৃতির উপর কিভাবে নির্ভর করা যায়?

আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি যে, এই মান্যবর পাদরী আকবরআবাদে আমার সাথে তাঁর বিতর্কের বিষয়ে ঘটনা বিকৃত করে যে পুস্তিকা ছেপেছেন তাতে আমার নামে অনেক মিথ্যা কথা উদ্ধৃত করেছেন। এজন্য ভারতে বৃটিশ সরকারের কর্মকর্তা জনাব আব্দুল্লাহ, যিনি উক্ত প্রকাশ্য বিতর্কের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রথমে উর্দু ভাষায় ও পরে ফারসী ভাষায় উক্ত বিতর্কের ধারাবিবরণী লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং আকবরআবাদ থেকে তা ছেপেছিলেন। তিনি উক্ত পাদরীর মিথ্যাচারের কারণে বাধ্য হয়ে উক্ত বিতর্ক অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান বিচারপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, মুফতী মুহাম্মাদ রিয়াদ উদ্দীন, জনাব ফাযেল আল-আমজাদ আলী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের, বৃটিশ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও এলাকাবাসীর সাক্ষ্য ও স্বাক্ষরসহ একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয়ত, উক্ত পাদরী যে কথা বলেছেন তা আদৌ সত্য নয়। কারণ দ্বিতীয় খৃষ্টীয় শতকেই সেলসাস (Celsus) চিৎকার করে বলতেন যে, খৃষ্টানগণ তাদের ইঞ্জিলগুলি তিনবার বা চারবার বা তারও বেশিবার কঠিনভাবে পরিবর্তন করেছে, এমনকি সেগুলির বিষয়বস্তুও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।

মানিকীয় (Manichees) সম্প্রদায়ের[১] অগ্রীয় পণ্ডিত ফাস্টিস চতুর্থ শতকে চিৎকার করে ঘোষণা করেছেন : "একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, নতুন নিয়ম যীশুখৃষ্ট লিখেন নি এবং তাঁর শিষ্যগণও লিখেন নি বরং কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তা লিখেছে এবং সেগুলিকে যীশুর শিষ্যগণ এবং তাঁদের সহচরদের নামে চালিয়েছে। কারণ সে ভয় পেয়েছিল যে, যেহেতু যীশুর সময়কালীন যে সকল ঘটনা সে লিখেছে সেগুলি সে

১. তৃতীয় খৃষ্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ ধর্ম প্রচারক মানী (Manes/Mani)। তিনি ২১৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৬/২৭৭ খৃষ্টাব্দের দিকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। তিনি খৃষ্টধর্মের বিভিন্ন শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের ধর্ম প্রচার করতেন, পাশাপাশি তিনি ও তাঁর অনুসারিগণ তৎকালীন খৃষ্টানদের বিভিন্ন বিশ্বাস ও কর্মের প্রতিবাদ করতেন। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তাঁর ধর্ম প্যালেস্টাইন, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল এবং খৃষ্টান ধর্মযাজকদের জন্য মাথা ব্যাথার কারণ ছিল। তাঁর অনুসারিগণকে মানিকীয় (Manichees/ Manichaen/Manichean) বলা হয়। দেখুন Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, page 309; Oxford Illustrated History of Christianity, page 33; মতিওর রহমান খান, ঐতিহাসিক অভিধান, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা ৩০।

প্রত্যক্ষ করেনি এজন্য মানুষেরা তার লেখা গ্রন্থ গ্রহণ করবে না। এই জালিয়াতি কর্মের মাধ্যমে সে যীশুর অনুসারীদেরকে অত্যন্ত কঠিনভাবে কষ্ট দিয়েছে। কারণ সে অগণিত ভুল ও বৈপরীত্যে ভরা কিছু বই লিখেছে।" এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাঠক দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় নির্দেশনায় জানতে পারবেন।

সপ্তম বক্তব্য

১০৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "কোন নবী কখনো গোবৎস পূজা করেন নি। হারোণ (হারূন) শুধু একবার ইহূদীদের ভয়ে গোবৎস পূজা করেছিলেন। আর হারূন তো ভাববাদী বা নবী ছিলেন না। তিনি শুধু পুরোহিত ও মোশির (মূসার) প্রতিনিধি ছিলেন।"

তাঁর এই বক্তব্য দুই দিক থেকে অসত্য ও দুষ্ট।

প্রথমত, তাঁর এই বক্তব্যটি 'আল-ইসতিফসার' গ্রন্থের একটি বক্তব্যের প্রতিবাদে লিখেছেন। উক্ত গ্রন্থে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছিলেন যে, বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ভাববাদী বা নবীগণও মূর্তিপূজা করেছেন এবং গোবৎস পূজা করেছেন। এ কথার প্রতিবাদে পাদরী সাহেব শুধু গোবৎস পূজার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। প্রতিমা পূজার বিষয়ে কোন প্রতিবাদ করলেন না, এসব বিষয়ে কোন কিছুই বললেন না। কারণ এ বিষয়ে কোন প্রতিবাদ করার কোন ক্ষমতাই তাঁর নেই। কিভাবে প্রতিবাদ করবেন? শলোমন (সুলায়মান) তাঁদের মতে ভাববাদী, অথচ তিনি বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী শেষ জীবনে ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যান এবং ধর্মত্যাগ করার পরে তিনি প্রতিমা পূজা করতেন ও প্রতিমা পূজার জন্য তিনি বিভিন্ন মন্দির তৈরি করেন। রাজাবলি প্রথম খণ্ডের ১১শ অধ্যায়ে বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, 'হারোণ ভাববাদী ছিলেন না'; তাঁর এ বক্তব্যও অসত্য। ইনশাআল্লাহ ষষ্ঠ অধ্যায়ে হারোণ (হারূন আ.)-এর অবস্থা বর্ণনা করা হবে।

অষ্টম বক্তব্য

১৫২ পৃষ্ঠায় মাননীয় পাদরী প্রসিদ্ধ ক্যাথলিক ধর্মগুরু, যাজক ও পণ্ডিত অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০ খৃ)[১] -এর বক্তব্য নিম্নরূপে উদ্ধৃত করেছেন : "পবিত্র বাইবেলের গ্রন্থসমূহের পরিবর্তন বা বিকৃতি কোন যুগেই সম্ভব ছিল না। যদি কোন ব্যক্তি এই বিকৃতির ইচ্ছা বা চেষ্টা করত, তাহলে সে সময়েই তা জানা যেত। বাইবেলের অনেক প্রসিদ্ধ কপি সে সময় বিদ্যমান ছিল। এছাড়া তা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। কেউ যদি কোন কারণে পরিবর্তন বা বিকৃত করত তাহলে তা সে সময়েই প্রকাশ পেয়ে যেত।"

১. St. Augustine, Bishop of Hippo.

এই বক্তব্যটি দুই দিক থেকে বিকৃত ও দুষ্ট

প্রথমত, হেনরী ওয়েস্কট প্রণীত বাইবেলের ব্যাখ্যাগ্রন্থে অগাস্টিনের বক্তব্য নিম্নরূপে লেখা হয়েছে : "প্লাবনের যুগ থেকে মোশি (মূসা) পর্যন্ত প্রাচীন মানুষদের যে বিবরণ বাইবেলে রয়েছে, ইহূদীগণ হিব্রু বাইবেলের সেই অংশ পরিবর্তন ও বিকৃত করেছিল। খৃস্টধর্মের বিরোধিতা ও (খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত) বাইবেলের গ্রীক অনুবাদটি অগ্রহণযোগ্য হিসাবে প্রমাণ করার জন্য তারা এই বিকৃতি করেছিল। জানা যায় যে, প্রাচীন খৃস্টানগণ এরূপ বলতেন। তারা বলতেন যে, ইহূদীরা ১৩০ খৃস্টাব্দে তাওরাত বা পুরাতন নিয়মকে বিকৃত করেছিল।"

এই বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, অগাস্টিন ও অন্যান্য প্রাচীন খৃস্টানগণ তাওরাতের বা পুরাতন নিয়মের পরিবর্তন ও বিকৃতির কথা স্বীকার করতেন। তাঁরা দাবি করতেন যে, ১৩০ খৃস্টাব্দে এই বিকৃতি ঘটে।

এখানে আমরা দেখছি যে, মাননীয় পাদরী কর্তৃক উদ্ধৃত অগাস্টিনের বক্তব্য হেনরীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে উদ্ধৃত অগাস্টিনের বক্তব্যের বিপরীত। হেনরীর ব্যাখ্যা গ্রন্থটি প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরু পণ্ডিতদের নিকট অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলে বিবেচিত। কাজেই হেনরীর গ্রন্থের উদ্ধৃতির দ্বারা মাননীয় পাদরীর উদ্ধৃতি বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে। তবে যদি মাননীয় পাদরী দাবি করেন যে, তিনি হেনরীর গ্রন্থের চেয়েও অধিকতর কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে অগাস্টিনের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তাহলে আমি তাঁর কাছে দাবি করব যে, তিনি কোন্ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে কথাটি উদ্ধৃত করেছেন তা উল্লেখ করে তাঁর উদ্ধৃতির বিশুদ্ধতা প্রমাণ করুন।

দ্বিতীয়ত, খৃস্টধর্মের অনুসারী, পক্ষাবলম্বী ও বিরোধিগণ সকলেই সেই দ্বিতীয় শতক থেকে চিৎকার করে ঘোষণা করছেন যে, বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি ঘটেছে। খৃস্টানদের গবেষক পণ্ডিতগণ স্বীকার করছেন যে, বাইবেলের নতুন নিয়ম ও পুরাতন নিয়ম উভয় অংশের অনেকস্থানে তিন প্রকারের বিকৃতি, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তন সবই ঘটেছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাঠক তা জানতে পারবেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, বাইবেলের পরিবর্তন সেই দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই সকলের কাছে প্রকাশ পেয়েছে। তাহলে পাদরী মহাশয় আর কোন্ প্রকারের প্রকাশের অপেক্ষা করছেন?

এজন্যই আল-ইসতিফসার গ্রন্থের লেখক এই পাদরী মহাশয়ের বক্তব্যের অসারত্ব প্রকাশ করে বলেন, পাদরী মহাশয় 'বিকৃতির প্রকাশ পাওয়া' বলতে কি বুঝান তা আমরা বুঝতে পারি না। সম্ভবত যদি বাইবেল বিকৃতকারীকে বৃটিশ বিচারালয়ে নিয়ে বিচার করে বিকৃতির অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় তাহলেই বোধহয় তাঁর মতে 'বিকৃতি প্রকাশ পাবে।'

বিশেষ লক্ষ্যণীয়

এই পাদরী মহাশয় বাইবেলের বিকৃতির দাবি অযৌক্তিক বলে প্রমাণ করার জন্য সর্বদা কিছু প্রশ্ন করেন। প্রশ্নগুলি দেখলে অনভিজ্ঞ ও সাধারণ পাঠক সেগুলিকে খুব জোরালো বলে মনে করতে পারেন। তিনি সর্বদা বলেন : আপনারা যে দাবি করছেন যে, বাইবেলে বিকৃতি ঘটেছে, তাহলে বলুন কে বিকৃত করেছে, কখন বিকৃত করেছে? কেন বিকৃত করেছে? বিকৃত শব্দগুলি কি কি? ...

এখানে আমরা দেখছি যে, মাননীয় পাদরীর পূর্বসুরিগণ আমাদেরকে এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ তাদের এই কর্মের জন্য তাদেরকে পুরস্কৃত করুন। তারা আমাদেরকে বললেন যে, বাইবেলের পুরাতন নিয়মের বিকৃত করেছে ইহূদীরা। বিকৃতির সময় হলো ১৩০ খৃস্টাব্দ। বিকৃতির কারণ হলো খৃস্টধর্মের বিরোধিতা ও গ্রীক অনুবাদকে অচল বানানো। বিকৃত শব্দগুলির মধ্যে রয়েছে প্রাচীন পূর্বপুরুষদের যুগের বর্ণনা।

খৃস্টান পণ্ডিতগণ দাবি করেন যে, যীশু খৃস্ট বাইবেলের পুরাতন নিয়মকে সঠিক বলে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। এই সাক্ষ্য সঠিক বলে মেনে নিলেও বাইবেলের বিকৃতির বিপক্ষে যায় না। কারণ তারা দাবি করেছেন যে, এই বিকৃতি ঘটেছে যীশুর উর্ধ্বারোহণের অনেক পরে। আর এই বিকৃতির কথা একজন বা দুইজন বলছেন না বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাচীন খৃস্টানগণ সকলেই বিকৃতি ও পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার কথা বলেছেন।

নবম বক্তব্য

১২১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "ঐশ্বরিক প্রেরণার (ইলহাম বা ওহীর) মাধ্যমে যীশুর শিষ্যগণ ইঞ্জিল (নতুন নিয়মের গ্রন্থগুলি) লিখেছিলেন। ইঞ্জিল বা পুরাতন নিয়মের গ্রন্থাবলী থেকে একথা বুঝা যায় এবং প্রমাণিত হয়। এছাড়া খৃস্ট ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থাবলী থেকেও একথা প্রমাণিত হয়।" এরপর তিনি লিখেছেন : "যীশুর শিষ্যগণ ইলহাম বা ঐশ্বরিক প্রেরণার মাধ্যমে যীশুর শিক্ষা ও তাঁর অবস্থা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।"

এই কথাটি যে অসত্য ও ভুল তা আমরা একটু আগে হাল্লুল ইশকালের চতুর্থ ও পঞ্চম বক্তব্যের আলোচনার সময় জানতে পেরেছি। আমরা দেখেছি যে, নতুন নিয়মের অধিকাংশ গ্রন্থই যীশুর শিষ্যগণ কর্তৃক লিখিত নয়।

এছাড়া যদি কেউ নতুন নিয়মের গ্রন্থাবলী পাঠ করেন, তবে তিনি নিশ্চিত হবেন যে, পাদরী মহাশয়ের এই কথাটি মোটেও ঠিক নয়। এ সকল গ্রন্থ পাঠ করলে মোটেও বুঝা যায় না যে, এই ইঞ্জিলটি অমুক শিষ্য কর্তৃক ইলহাম বা ঐশ্বরিক প্রেরণার মাধ্যমে গ্রীক ভাষায় লিখিত।

তবে, বাইবেলের প্রকাশক ও মুদ্রকগণ প্রত্যেক পৃষ্ঠার উপরে যাঁর নামের ইঞ্জিল তাঁর নামটি লিখে রেখেছেন। এই কর্মটি তো গ্রন্থটি সেই ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত হওয়ার

কোন প্রমাণ নয়। যেমন তাঁরা "বিচারকর্তৃগণের বিবরণ" (The Book of Judges) গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার উপরে বিচারকর্তৃগণের নাম লিখেন, "রূতের বিবরণ" (The Book of Ruth), গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার উপরে রূতের নাম লিখেন, "ইস্টেরের বিবরণ" (The Book of Esther), গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার উপরে ইস্টেরের নাম লিখেন, "ইয়োবের (আইউবের) বিবরণ" (The Book of Job), গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার উপরে 'ইয়োবের' নাম লিখেন। এদ্বারা মোটেও বুঝা যায় না বা প্রমাণিত হয় না যে, গ্রন্থগুলি এ সকল ব্যক্তির নিজেদের লেখা। অনুরূপভাবে বাইবেল লেখা বা ছাপানোর সময় মার্ক, মথি, লূক, যোহন ইত্যাদি ব্যক্তির নাম পৃষ্ঠার উপরে লিখে দেওয়াতে মোটেও প্রমাণিত হয় না যে, গ্রন্থগুলি তাঁদের লেখা।

মাননীয় পাদরীর এই প্রকারের উদ্ভট কথাবার্তার কারণে মুসলিম আলেমগণ অবাক হন। অনেক সময় অনেক মানুষ অন্তরের সংকীর্ণতার কারণে এমন কথা লিখে ফেলেন যা তাঁর মর্যাদার সাথে খাপ খায় না। এজন্য 'আল-ইসতিবশার' গ্রন্থের লেখক এই স্থানে পাদরী মহাশয়ের বক্তব্য খণ্ডন করার পরে লিখেছেন : "পাদরী ফান্ডার মহাশয়ের মত অন্য একজন পাদরীও আমরা দেখিনি যিনি এভাবে বেপরোয়াভাবে মিথ্যা কথা বলেন।"

এই পাদরীর এই জাতীয় অসত্য ও ভুল কথার উদ্ধৃতি দিতে গেলে গ্রন্থ অত্যন্ত লম্বা হয়ে যাবে এবং পাঠক বিরক্তি অনুভব করবেন। এজন্য তাঁর ভুলের নমুনা উল্লেখ এখানেই শেষ করছি।

মি. ফান্ডারের তিনটি অভ্যাস

এখানে মাননীয় পাদরীর মিথ্যা কথনের ও ভিত্তিহীন বক্তব্যকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করার অভ্যাসটির কথা আমি ব্যাখ্যা করেছি। এখানে তাঁর আরো দুইটি অভ্যাসের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যেন পাঠক এ বিষয়ে সতর্ক থাকেন।

দ্বিতীয় অভ্যাস

মাননীয় পাদরীর অভ্যাস হলো, বিপক্ষের লেখক মানবীয় দুর্বলতার কারণে যদি তাঁর বা তাঁর ধর্মাবলম্বীদের বিষয়ে এমন কোন কথা লিখেন যা তাঁর মতে তাঁর বা তাঁর ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শোভনীয় নয়, তবে তিনি সেই বক্তব্য নিয়ে অনেক আপত্তি ও অভিযোগ করেন। তিনি তিলকে তাল বানিয়ে ফেলেন। কিন্তু বিপক্ষের আলেমদের বিষয়ে তাঁর নিজের কলম কি লিখছে সে বিষয়ে তিনি কোন পরোয়া করেন না। আমি বুঝতে পারি না যে, এর কারণ কি? তিনি কি মনে করেন যে, যত প্রকার ভাল অথবা মন্দ কথা তাঁর কলম থেকে বের হবে সবই ভাল বলে গণ্য হবে এবং যথাযথভাবে প্রযোজ্য হয়েছে বলে বিবেচিত হবে, আর অনুরূপ কথাই যদি বিপক্ষের লেখকের কলম দিয়ে বের হয় তাহলে তা খারাপ ও নোংরা বলে বিবেচিত হবে? যদি তিনি তাই মনে করেন, তাহলে তাঁকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, এই বিশেষ মর্যাদা তাঁর জন্য কিভাবে তিনি লাভ করলেন।

আমি এখানে প্রতিপক্ষের সম্পর্কে তাঁর কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করছি।

লাখনৌ-এর প্রখ্যাত আলেম হাদী আলী 'কাশফুল আসতার' নামক গ্রন্থ রচনা করে পাদরী ফান্ডার মহাশয়ের রচিত 'মিফতাহুল আসরার' নামক গ্রন্থের বক্তব্য খণ্ডন করেন। পাদরী ফান্ডার তাঁর 'হাল্লুল ইশকাল' গ্রন্থে এই সম্ভ্রান্ত ও সুপ্রসিদ্ধ আলেম সম্পর্কে নিম্নরূপ বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন :

এই গ্রন্থের ১ম পৃষ্ঠায় পাদরী মহাশয় লিখেছেন : "এই গ্রন্থকারের ক্ষেত্রে পৌলের নিম্নোক্ত কথাটি প্রযোজ্য".. এ বলে তিনি পৌলের যে বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেন তার মধ্যে রয়েছে : "তাহাদের মধ্যে এই যুগের দেব অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করিয়াছে।"[১] এভাবে তিনি সম্মানিত লেখককে অবিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করলেন।

২য় পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "গোড়ামি ও পক্ষপাতিত্বের কারণে এই গ্রন্থকার ইচ্ছাপূর্বক ন্যায়পরায়ণতার চক্ষু বন্ধ করেছেন।"

৩য় পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "তাঁর উদ্দেশ্য হলো শুধু বিতর্ক ও নির্ভেজাল পক্ষপাতিত্ব।"

৪র্থ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "এই গ্রন্থটি বাতিল আপত্তি, অসার দাবি ও অযৌক্তিক নিন্দায় পরিপূর্ণ।"

এই পৃষ্ঠাতেই লিখেছেন : 'এই গ্রন্থটি বিরোধিতা ও বাতিল কথায় পূর্ণ।"

১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 'অহঙ্কারের কারণে গ্রন্থকার ধারণা করেছেন।"

২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : এ হলো নির্ভেজাল অহঙ্কার এবং পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর করুণা অস্বীকার করা। বিভ্রান্ত বুঝ তাঁকে সুপথ থেকে বের করেছে।"

২৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : এই কথাটি শুধু তাঁর স্বল্পজ্ঞান ও অজ্ঞতারই প্রমাণ নয়, উপরন্তু তা তাঁর ভুল বুঝ ও পক্ষপাতিত্বের দলিল।"

অতঃপর এই পৃষ্ঠাতেই বলেছেন : "একথা স্পষ্ট যে, অহঙ্কার ও পক্ষপাতিত্ব গ্রন্থকারের বুদ্ধি-বিবেক লুপ্ত করেছে এবং তাঁর জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতাকে অন্ধ করে দিয়েছে।"

৩৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "অন্যান্য বাতিল কথাবার্তা ছাড়া তিনি আরো বলেছেন... ।"

৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 'তিনি তাঁর লাল চশমাটি নামালেন।"

এই পৃষ্ঠাতেই লিখেছেন : "এই কথাটি সবই বাতিল ও অর্থহীন।"

৫০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 'এ অহঙ্কার ও অবিশ্বাস ছাড়া কিছুই নয়।"

এই পৃষ্ঠাতেই লিখেছেন : 'এভাবেই এই গ্রন্থকারের অন্তরটি অহঙ্কার ও আত্মগরিমায় ভরে গিয়েছে।"

এই পৃষ্ঠাতেই লিখেছেন : 'এ হলো একান্ত মুর্খতা ও চূড়ান্ত অহঙ্কার।"

১. ২ করিন্থীয় ৪/৪

৫৫ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন : 'এ থেকে তাঁর পড়াশোনার একান্ত অভাব ও পক্ষপাতমূলক গোঁড়ামি প্রমাণিত হয়।"

৫৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "তাঁর এই বর্ণনা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য, একান্তই বাতিল এবং অর্থহীন।"

এই পৃষ্ঠাতেই লিখেছেন : "এ হলো চূড়ান্ত গোঁড়ামি ও অবিশ্বাস।"

৮৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "যে বিষয়ে তিনি জ্ঞান ও বিবেককে বিচারক মেনেছেন সেই বিষয়টি একেবারেই জ্ঞানবহির্ভূত ও বাহানামাত্র।"

তিনি এসকল শব্দ ব্যবহার করেছেন সাইয়েদ হাদী আলীর সম্পর্কে যাঁকে লাখনৌ-এর শাসক পর্যন্ত অত্যন্ত সম্মান করতেন।

আল-ইসতিফসার গ্রন্থের সম্মানিত লেখক আল-হাসান সম্পর্কে যে সকল শব্দ এই পাদরী ব্যবহার করেছেন তার নমুনা নিম্নরূপ :

'হাল্লুল ইশকাল' গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 'এই ব্যক্তি বুদ্ধি-জ্ঞানে শতপতি পৌত্তলিকের চেয়েও কম এবং অবিশ্বাসে এ সকল ইহূদীদের চেয়েও বেশি।"

১১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 'এখন মাননীয় লেখক ৫৯২ পৃষ্ঠায় চূড়ান্ত অবিশ্বাস ও বেপরোয়াভাবে লিখছেন...।"

১২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 'ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বাস উভয়টিই এই মাননীয় ব্যক্তির অন্তরে অনুপস্থিত।"

সম্মানিত লেখক আল-হাসান সম্পর্কে লেখা তাঁর সর্বশেষ চিঠিতে তাঁকে পলায়নের অভিযোগ করেছেন। অথচ তিনি এই শব্দটিকে অসম্মানজনক ও নোংরা বলে মনে করেন এবং কেউ তাঁর সম্পর্কে এই শব্দ বললে খুবই আপত্তি করেন।

এখন যদি এই পাদরী বলেন : আমি এই লেখক সম্পর্কে এ সকল শব্দ ব্যবহার করেছি তার কারণ হলো, তিনি বনী ইসরাঈল বা ইস্রায়েল বংশের নবীগণের (আ) বিষয়ে অনুচিত শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন।

পাদরী যদি একথা বলেন তবে কথাটি হবে নির্ভেজাল জালিয়াতি ও বিভ্রান্তিমূলক কথা। কারণ সম্মানিত লেখক আল-হাসান অনেক স্থানে বারংবার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, খৃস্টান পাদরীগণ ও ধর্মযাজকগণের লিখনি ও কথাবার্তার প্রতিবাদে তাদের কথার অসারতা প্রমাণের জন্য 'আপনাদের কথা ঠিক হলে আপনাদেরকে একথাও বলতে হবে...' এই ভিত্তিতে এ সকল কথা বলেছেন। তিনি কখনোই কোন নবী বা ভাববাদী সম্পর্কে কোনরূপ খারাপ বিশ্বাস পোষণ করেন নি। পাঠক চাইলে তাঁর গ্রন্থ পাঠ করে দেখতে পারেন। ১২৬১ হিজরী সালে (১৮৪৫ খৃস্টাব্দে) মুদ্রিত তাঁর গ্রন্থের ৮, ১৭৭, ৫৫৮, ৫৯৪, ৬০৪ ও অন্যান্য পৃষ্ঠায় পাঠক এই কথাগুলি দেখতে পাবেন।

মাননীয় পাদরী তাঁর 'হাল্লুল ইশকাল' গ্রন্থের ৮৯ পৃষ্ঠায় সকল মুসলমানের বিষয়ে লিখেছেন : 'মুহাম্মাদীগণ মারাত্মক সব কুমন্ত্রণা ও অনেক বাতিল কথায় বিশ্বাস করে'।

আমার দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তন করার পরে এই মহামান্য পাদরী মহাশয় এবং শ্রদ্ধাভাজন ডাক্তার মুহাম্মাদ উযীর খানের মধ্যে পত্রের মাধ্যমে বিতর্ক হয়। ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে আকবর আবাদ থেকে এই বিতর্কের বিবরণ ছাপা হয়। তখন পাদরী মহাশয় ২৯ মার্চ ১৮৫৪ তারিখে লেখা তাঁর দ্বিতীয় পত্রে ডাক্তার উযীর খানকে লিখেন : "সম্ভবত আপনিও সেইসব নাস্তিক প্রকৃতিবাদীদের একজন; কারণ ইসলাম ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে এরূপ মানুষ আছেন যারা প্রকাশ্যে মুহাম্মাদী বলে গণ্য, কিন্তু তারা গোপনে নাস্তিক, প্রকৃতিবাদী।"

এই কথার উত্তরে শ্রদ্ধাভাজন ডাক্তার অনেক বিষয় লিখেন। তন্মধ্যে নিম্নের দুইটি বিষয় ছিল : "প্রকাশ্য বিতর্ক সভায় আপনি স্বীকার করেছেন যে, তাওরাত বা বাইবেলের পুরাতন নিয়মের বিধানাবলী রহিত হয়ে গিয়েছে এবং আপনি উক্ত বিতর্ক সভায় মেনে নিয়েছেন যে, বাইবেলের ৭ অথবা ৮ স্থানে বিকৃতি সংঘটিত হয়েছে। আপনি আরো স্বীকার করেছেন যে, বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণে ত্রিশ অথবা চল্লিশ হাজার স্থানে লেখকদের ভুল হয়েছে, যে ভুলের ফলে টীকার বিভিন্ন বক্তব্য মূল গ্রন্থের (text-এর) মধ্যে প্রবেশ করেছে, মূল গ্রন্থের কথা গ্রন্থ থেকে বাইরে চলে গেছে এবং অনেক পংক্তি পরিবর্তিত হয়েছে।

"আপনি যেহেতু বাইবেলের অপৌরুষতা স্বীকার করে নিচ্ছেন এবং বাইবেলের মধ্যে অগণিত ভুল ও বিকৃতির স্বীকারোক্তি প্রদান করছেন, সেহেতু একথা বলতে অসুবিধা কোথায় যে, আপনি মূলত মনের মধ্যে বিশ্বাস করেন যে, খৃস্ট ধর্ম একটি বাতিল ধর্ম। আপনি অন্তরের মধ্যে জানেন যে, আপনাদের পবিত্রগ্রন্থ বা বাইবেল রহিত ও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে এবং সেগুলির কোন মূল্য আপনার নিকট নেই। তবে জাগতিক লোভ ও পার্থিব লালসার জন্য আপনি প্রকাশ্যে প্রটেস্ট্যান্ট খৃস্ট ধর্ম অনুসরণ করার দাবি করে থাকেন এবং এ সকল বিকৃত গ্রন্থের পক্ষে কথা বলেন।

"আপনি এতদিন ছিলেন লুথারীয় ধর্মমতের অনুসারী এবং কয়েক মাস যাবৎ আপনি ইংলিশ চার্চের মতবাদে দীক্ষা নিয়েছেন। এখন একথা মনে করতেই বা বাধা কোথায় যে, আপনার এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্যও জাগতিক লোভ। আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু পাদরী ফ্রেঞ্জ-এর মুখ থেকেই আমি জেনেছি যে, আপনি ইংল্যান্ডে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এই ধর্মমত পরিবর্তন করেছেন।

"অথবা একথা মনে করতেও বাঁধা নেই যে, আপনার এই মত পরিবর্তনের কারণ হলো পারিবারিক।"

শ্রদ্ধাভাজন ডাক্তার সাহেব আমাকে বলেছেন যে, পারিবারিক বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে, পাদরী মহাশয়ের স্ত্রী ছিলেন ইংলিশ চার্চের অনুসারী। এজন্য স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে তিনি ধর্মমত পরিবর্তন করেন।

এখন এই পাদরীর ছোটাছুটি ও কথাবার্তার নমুনা দেখুন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, তাঁর ধর্মমত পরিবর্তনের কারণ হিসাবে ডাক্তার সাহেব যে দুইটি বিষয় উল্লেখ করেছেন পাদরী মহাশয় চিঠির উত্তরে তার কোনটিই খণ্ডন করেন নি। যদি এই দুই উদ্দেশ্যের কোন একটি উদ্দেশ্যে তিনি ধর্মমত পরিবর্তন করে থাকেন তাহলে নিঃসন্দেহে এটি তাঁর অত্যন্ত ঘৃণিত কর্ম। আর এছাড়া কোন তৃতীয় কারণের কথা তাঁর থেকে শোনা যায় নি।

যাই হোক, এই বিষয়টি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত। এজন্য আমি বিষয়টি ছেড়ে দিয়ে যে বিষয়ে আলোচনা করছিলাম সেই বিষয়ে ফিরে যাচ্ছি। তা হলো তাঁর কিছু অভ্যাস সম্পর্কে পাঠককে সতর্ক করা।

উপরের বিভিন্ন উদ্ধৃতি থেকে আমরা দেখলাম মাননীয় পাদরী ভারতীয় আলেমগণ সম্পর্কে কি প্রকারের কথাবার্তা লিখেছেন। আর তাঁর হাল্লুল ইশকাল গ্রন্থের ১৩৯ পৃষ্ঠায়, তাঁর সর্বশেষ চিঠিতে, মীযানুল হক এবং 'তরীকুল হায়াত' (জীবনের পথ) গ্রন্থে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে, কুরআন সম্পর্কে ও হাদীস সম্পর্কে যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছেন সেগুলি উদ্ধৃত করতে আমার কলম ও আমার অন্তর রাযী নয়। যদিও অবিশ্বাস বা কুফরী কথা উদ্ধৃত করা অবৈধ নয়, তবুও এ সকল নোংরা ও ঘৃণিত কথা আমি উদ্ধৃত করতে চাই না।

১৮৪৪ খৃস্টাব্দে যখন এই পাদরী ও ইসতিফসার গ্রন্থের লেখকের মধ্যে প্রথম লিখিত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হলো, তখন ইসতিফসার গ্রন্থের লেখক তাঁকে তাঁর দ্বিতীয় পত্রে বিতর্কের জন্য চারিটি শর্ত গ্রহণ করতে আহ্বান করেন। সেগুলির মধ্যে প্রথম শর্ত ছিল : "আমাদের নবীর নাম অথবা উপাধি সম্মানের সাথে উল্লেখ করতে হবে। যদি আপনি তা গ্রহণ করতে না পারেন তাহলে অন্তত এভাবে লিখুন : 'আমাদের নবী' অথবা 'মুসলমানদের নবী'। তাঁর দিকে সম্পর্কিত ক্রিয়া ও সর্বনামের ক্ষেত্রে উর্দু ভাষার নিয়ম অনুসারে বহুবচন ব্যবহার করতে হবে। তা না হলে আমরা কথা বলতে পারব না এবং আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হব।"

এই উত্তরে এই পাদরী ২৯ জুলাই ১৮৪৪ তারিখের চিঠিতে লিখেন : "জেনে রাখুন, আপনাদের নবীকে সম্মানের সাথে উল্লেখ করতে আমরা অপারগ। অথবা তাঁর প্রতি সম্পর্কিত ক্রিয়া বা সর্বনামের ক্ষেত্রে বহুবচন ব্যবহার করতেও আমরা অপারগ, আমাদের জন্য মোটেও সম্ভব নয়। তবে আমরা তাঁকে খারাপ উপাধি দিয়ে উল্লেখ করব না বরং আমি শুধু লিখব 'আপনাদের নবী' বা 'মুসলমানদের নবী'। অথবা বলব : মুহাম্মাদ বলেছেন। প্রয়োজন হলে কোথাও বলব : 'মুহাম্মাদ সত্য নবী নয়', অথবা 'সে মিথ্যাবাদী'। আপনারা ভাববেন না যে, আপনাদের মনে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি এ সব শব্দ ব্যবহার করেছি বরং মূল বিষয় হলো, মুহাম্মাদ যেহেতু আমাদের বিশ্বাসে সত্য নবী ছিলেন না, সেহেতু এই বিষয়টি প্রকাশ করা আমাদের জন্য অতীব জরুরী।"

এরপর ৩১শে জুলাই ১৮৪৪ তারিখের চিঠিতে তিনি লিখেন, "মুহাম্মাদের নাম উল্লেখ করে তার ক্রিয়া ও সর্বনামকে বহুবচনে ব্যবহার করে উল্লেখ করা অসম্ভব।"

আমি আমার ১৬ই এপ্রিল ১৮৫৪ তারিখে লেখা চিঠিতেও তাঁর কাছে অনুরূপ দাবি করি। তিনি তার উত্তরে ১৮ই এপ্রিল ১৮৫৪ তারিখে লেখা চিঠিতে আমাকে সে কথাই লিখলেন যা তিনি পূর্বে ইসতিফসার গ্রন্থের লেখককে লিখেছিলেন।

উপরের বর্ণনার আলোকে আমার বক্তব্য হলো, মুসলিম আলেমগণের বিষয়ে তিনি যে বিশ্বাস পোষণ করেন, মুসলিম আলেমগণও তাঁর বিষয়ে একই বিশ্বাস পোষণ করেন। তিনি তাঁদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর বিষয়ে যে বিশ্বাস পোষণ করেন তাঁরা তাঁর ও তাঁর ধর্মের পণ্ডিত ও ধর্মগুরুদের বিষয়ে তার চেয়েও বেশি কিছু বিশ্বাস করেন। কাজেই তিনি যে সকল পবিত্র ও সম্মানীয় শব্দাবলী মুসলিম পণ্ডিতদের সম্পর্কে ব্যবহার করেছেন, সেগুলিকে হুবহু কোনরূপ কমবেশি ছাড়াই যদি কোন মুসলিম পণ্ডিত তাঁর সম্পর্কে বলেন তাহলে তিনি কি বলবেন?

যদি কোন আলেম তাঁর বিষয়ে বলেন : "তাঁর ক্ষেত্রে পৌলের নিম্নোক্ত কথাটি প্রযোজ্য.. তাদের মধ্যে এই যুদ্ধের দেব অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করেছে", "গোড়ামি ও পক্ষপাতিত্বের কারণে তিনি ইচ্ছাপুর্বক ন্যায়পরায়ণতার চক্ষু বন্ধ করেছেন", "তার উদ্দেশ্য হলো শুধু বিতর্ক ও নির্ভেজাল পক্ষপাতিত্ব", "অহঙ্কারের কারণে গ্রন্থকার ধারণা করেছেন", "একথা স্পষ্ট যে, অহঙ্কার ও পক্ষপাতিত্ব গ্রন্থকারের বুদ্ধি-বিবেক লুপ্ত করেছে এবং তার জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতাকে অন্ধ করে দিয়েছে", "অন্যান্য বাতিল কথাবার্তা ছাড়া তিনি আরো বলেছেন...", "এভাবেই এই গ্রন্থকারের অন্তরটি অহঙ্কার ও আত্মগরিমায় ভরে গিয়েছে", "তিনি বুদ্ধি-জ্ঞানে শতপতি পৌত্তলিকের চেয়েও কম এবং অবিশ্বাসে ইহূদীদের চেয়েও বেশি", "তিনি চূড়ান্ত অবিশ্বাস ও বেপরোয়াভাবে লিখেন", "ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বাস উভয়টিই এই মাননীয় ব্যক্তির অন্তরে অনুপস্থিত", "তিনি নাস্তিক প্রকৃতিবাদীদের একজন", "তিনি পলায়নপর" ... যদি কেউ তা বলেন তাহলে তাঁর প্রতিক্রিয়াটি কি হবে?

তাঁর গ্রন্থ 'মীযানুল হক' অগণিত বিভ্রান্তিকর অসত্য কথা, নির্ভেজাল বাতুল বিতর্ক, মিথ্যা ও ভুল দাবি ও দুর্বল প্রমাণাদিতে পরিপূর্ণ। এজন্য কেউ বলতে পারেন যে, "গ্রন্থটি বাতিল আপত্তি, অসার দাবি ও অযৌক্তিক নিন্দায় পরিপূর্ণ।"

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, কুরআন অথবা হাদীস সম্পর্কে যে সকল কথাবার্তা লিখেছেন সেগুলি সম্পর্কে যদি কেউ বলেন : "এ হলো নির্ভেজাল অহঙ্কার এবং পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর করুণা অস্বীকার করা। বিভ্রান্ত বুঝ তাকে সুপথ থেকে বের করেছে", "এই কথাটি শুধু তার স্বল্পজ্ঞান ও অজ্ঞতারই প্রমাণ নয়, উপরন্তু তা তার ভুল বুঝ ও পক্ষপাতিত্বেরও দলীল", "এই কথা সবই বাতিল ও অর্থহীন", "এ হলো একান্ত মুর্খতা ও চূড়ান্ত অহঙ্কার", "এ থেকে তার পড়াশোনার

একান্ত অভাব ও পক্ষপাতমূলক গোঁড়ামি প্রমাণিত হয়", "একথা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য, একান্তই বাতিল এবং অর্থহীন", "এ হলো চূড়ান্ত গোঁড়ামি ও অবিশ্বাস", "একেবারেই জ্ঞানবহির্ভুত ও বাহানামাত্র"...।

যদি কোন মুসলিম পণ্ডিত এভাবে মাননীয় পাদরীর ব্যবহৃত শব্দাবলী দিয়েই তাঁকে আবৃত করেন তাহলে পাদরী সাহেবের মতে তা বৈধ হবে কি? যদি তা বৈধ হয় তাহলে তাঁর সম্পর্কে এ সকল শব্দ ব্যবহারের কারণে কোনমতেই তিনি আপত্তি করতে পারেন না। আর যদি বৈধ না হয় তাহলে তিনি কিভাবে সেগুলি ব্যবহার করলেন?

বড় অবাক লাগে তাঁর ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার নমুনা দেখে যে, তাঁর জন্য এগুলি ব্যবহার করা বৈধ হবে, অথচ মুসলিম আলেমের জন্য তা ব্যবহার করা অবৈধ হবে!

আমরা আশা করি তিনি একথা হৃদয়ঙ্গম করবেন যে, কোন মুসলিম আলেম যখন প্রয়োজনের জন্য তাঁর বা তাঁর ধর্মের পণ্ডিত ও ধর্মগুরুদের বিষয়ে এইরূপ কোন শব্দ লিখেন, তখন তিনি তাঁর বা তাঁর ধর্মাবলম্বীদেরকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে এগুলি লিখেন না বরং উক্ত মুসলিম পণ্ডিত যা সত্য বলে বিশ্বাস করেন তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে অথবা তাঁর নিজের বা তাঁর ধর্মের অন্যান্য পণ্ডিতদের কথার প্রতিদান হিসাবেই এরূপ শব্দাবলী ব্যবহার করেন। আর প্রবাদে তো বলাই হয়েছে : "যেমন কর্ম তেমন ফল।"

তৃতীয় অভ্যাস

তিনি কুরআনের আয়াত অনুবাদ করেন এবং ব্যাখ্যা করেন নিজের মনমত এবং এরপর নিজের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কুরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন। তিনি দাবি করেন যে, তিনি যে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন সেটিই হলো সঠিক ব্যাখ্যা, মুসলিম আলেমগণ ও কুরআনের তাফসীরকারগণ যে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন তা সঠিক নয়।

সাধারণ মানুষদের কাছে নিজের পারঙ্গমতা ও বিদ্যার পূর্ণতা প্রকাশ করার জন্য তাফসীরের কিছু নিয়মনীতি বর্ণনা করেন। যেমন তিনি ১৮৪৯ সালে ফারসী ভাষায় মুদ্রিত মীযানুল হক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ২৩৭ ও ২৩৮ পৃষ্ঠায় এবং ১৮৪৭ সালে মুদ্রিত হাল্লুল ইশকাল গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে ৫১ পৃষ্ঠায় তাফসীর বা ব্যাখ্যার কিছু মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। এখানে তাঁর এই অভ্যাসটির ব্যাখ্যার প্রয়োজনে তাঁর উল্লিখিত দুইটি মূলনীতি উল্লেখ করছি :

পাদরী মহাশয় বলেন, মুফাস্সির বা ব্যাখ্যাকারকে অবশ্যই নিম্নের বিষয়গুলি অর্জন করতে হবে। প্রথমত, তাঁকে অবশ্যই মূল গ্রন্থের বক্তব্য ঠিক তেমনভাবে বুঝতে সক্ষম হতে হবে যেভাবে গ্রন্থের লেখক বা প্রণেতার মনের মধ্যে ছিল। এজন্য পাঠক বা ব্যাখ্যাকারকে অবশ্যই গ্রন্থকারের যুগ, যে সমাজে তিনি প্রতিপালিত হয়েছেন সেই সমাজের আচার-আচরণ ও তাদের ধর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে। অনুরূপভাবে

তাঁকে অবশ্যই গ্রন্থকারের গুণাবলী ও তাঁর অবস্থাদি সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হতে হবে। শুধু একটি ভাষা জানলেই সেই ভাষা থেকে কোন গ্রন্থ অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যস্ত হওয়া যাবে না।

দ্বিতীয়ত, তাঁকে অবশ্যই বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে। তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বক্তব্যের মধ্যকার সম্পর্ক ও ধারাবাহিকতা নষ্ট করতে পারবেন না। যখন কোন বিষয় ব্যাখ্যা করবেন তখন অবশ্যই তাঁকে এই বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সকল স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এরপর তিনি তা ব্যাখ্যা করবেন।

এ হলো পাদরী মহাশয়ের বর্ণিত মূলনীতি। আর তাঁর নিজের অবস্থা হলো যে, অন্যান্য গুণ ও শর্ত তো দূরের কথা মূল আরবী ভাষাতেই তাঁর কোন গ্রহণযোগ্য জ্ঞান নেই। তিনি বিষয়ের ধারাবাহিকতা মোটেও রক্ষা করেন না। তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বক্তব্যের মধ্যকার সম্পর্ক ও ধারাবাহিকতা নষ্ট করেন। একটু পরেই পাঠক তা দেখতে পাবেন। তাহলে এই প্রকারের অসার দাবি ও কর্ম দ্বারা কি বুঝা যায়?

তিনি শ্রদ্ধেয় আলেম হাদী আলী সম্পর্কে যা বলেছেন, আমি যদি তাঁর এই কর্মের কারণে তাঁর বিষয়ে সেই কথায় বলি যে, "অহঙ্কার ও অজ্ঞতা তাঁর বুদ্ধি-বিবেক লুপ্ত করেছে এবং তাঁর জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতাকে অন্ধ করে দিয়েছে" অথবা বলি যে, "এ অজ্ঞতা ও অহঙ্কার ছাড়া আর কিছুই নয়" তাহলে আমার কথাটি সঠিক বলে গণ্য হবে এবং সত্য প্রকাশ পাবে। তবে যেহেতু এ সকল শব্দ ব্যবহার অসমীচীন, এজন্য আমি কখনোই তাঁর বিষয়ে এ সকল শব্দ প্রয়োগ করব না, যদিও তিনি নিজে মুসলিম আলেমগণের সম্পর্কে এগুলি ব্যবহার করেছেন।

এই পাদরী মহাশয় মীযানুল হক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষে লিখেছেন : 'যে ব্যক্তি গোঁড়ামি ও বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ করবেন এবং ন্যায়পরায়ণতার পথে চলবেন তিনি কুরআনের আয়াতগুলি পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারবেন যে, তাফসীরের মূলনীতির আলোকে আমি যে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছি সেটিই হলো সঠিক।"

এই হলো তাঁর দাবি। এখন আমি তাঁর দাবির প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে ত্রিত্ববাদীদের তিন সংখ্যার ভিত্তিতে তিনটি প্রমাণ উল্লেখ করছি :

প্রথম প্রমাণ

আমার ও পাদরী মহাশয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য বিতর্কের দ্বিতীয় বৈঠকে পাদরী মহাশয় দাঁড়িয়ে তাঁর মীযানুল হক গ্রন্থটি হাতে নিয়ে তাঁর প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতগুলি পাঠ করতে শুরু করেন। আয়াতগুলি সুন্দর অক্ষরে পূর্ণ হরকত-সহ লিখা ছিল। তা সত্ত্বেও হরকতের সঠিক উচ্চারণ তো দূরের কথা, পাদরী মহাশয় মূল শব্দগুলি উচ্চারণেই ভুল করতে লাগলেন। ভুলের মাত্রা এত

বেশি ছিল যে, মুসলমানদের জন্য তা সহ্য করা কঠিন হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ অধৈর্য হয়ে পাদরী মহাশয়কে বললেন, আপনি শুধু অনুবাদ পাঠ করুন, মূল আয়াত পড়া বাদ দিন। কারণ ভুল পাঠের ফলে শব্দ পরিবর্তন হয়ে অর্থও পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন মান্যবর পাদরী বলেন, আমাকে ক্ষমা করুন। এ আমার ভাষার দুর্বলতা।

এ হলো আরবী ভাষা পাঠ করতে বা বলতে তাঁর পারঙ্গমতার অবস্থা।

দ্বিতীয় প্রমাণ

আরবী ভাষায় তাঁর পারঙ্গমতা প্রমাণ করার জন্য মাননীয় পাদরী ১৮৪৯ সালে ফারসী ভাষায় মুদ্রিত তাঁর 'মীযানুল হক' গ্রন্থের শেষে এবং ১৮৫০ সালে উর্দু ভাষায় মুদ্রিত 'মীযানুল হক' গ্রন্থের শেষে আরবীতে গ্রন্থটির সমাপ্তির তারিখ লিখেছেন : "এই পুস্তিকাটি খৃস্টীয় এক হাজার আটশত তেত্রিশ অব্দে, মুতাবিক এক হাজার দুইশত আটচল্লিশ হিজরীতে সমাপ্ত হলো।"

১৮৫০ খৃস্টাব্দে ফারসী ভাষায় মুদ্রিত 'মিফতাহুল আসরার' গ্রন্থের শেষে লিখেছেন : 'এই কাগজগুলি খৃস্টীয় এক হাজার আটশত সাইত্রিশ সালে এবং মুহাম্মাদী হিজরতের এক হাজার দুই শত বাহান্ন সালে সমাপ্ত হলো।'

এই বইয়ের উর্দু সংস্করণের শেষেও এই আরবী বাক্যটি লেখা আছে। পার্থক্য হলো 'মুহাম্মাদী হিজরত' শব্দ দুইটির ব্যবহারে ফারসী সংস্করণের শেষে বেশি ভুল রয়েছে। ফারসী ভাষার প্রতি তাঁর লক্ষ্য বেশি থাকায় তিনি বাক্যটি ফারসী সংস্করণে বেশি করে শুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। এজন্য ভুল বেশি হয়েছে।

আরবী ভাষায় যার ন্যূনতম জ্ঞান আছে তিনিও আরবীতে এই বাক্যগুলি পড়লে হাসি সামলাতে পারবেন না। যে কেউ একনজরে বুঝতে পারবেন যে, এই বাক্যটিতে ব্যবহৃত প্রায় সকল শব্দই আরবী ব্যাকরণের আলোকে ভুল। তিনি যে আরবী ভাষার কিছুই জানেন না তা এই বাক্যটি থেকেই বুঝা যায়।

এই হলো আরবী ভাষা লিখতে তাঁর পারঙ্গমতার নমুনা।

তৃতীয় প্রমাণ

১৮৪৩ সালে মুদ্রিত 'মিফতাহুল আসরার' গ্রন্থের পুরাতন সংস্করণের চতুর্থ পৃষ্ঠায় সূরা তাহরীমের এই আয়াতটি উল্লেখ করেছেন : "এবং ইমরান তনয়া মরিয়মের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম।"[১] এবং সূরা নিসার এই আয়াতটি উল্লেখ করেন : "মরিয়ম তনয় ঈসা মসীহ শুধু আল্লাহর রাসূল, তাঁর বাণী যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে আত্মা... ।"[২]

১. সূরা তাহরীম : ১২ আয়াত।
২. সূরা নিসা : ১৭১ আয়াত।

অতঃপর তিনি বলেন, "এই দুইটি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ঈসা-মসীহ আল্লাহর রূহ। তাহলে অবশ্যই তিনি আল্লাহ্‌রই সমমর্যাদাসম্পন্ন হবেন (ঈশ্বরত্বের মর্যাদাসম্পন্ন হবেন)। কারণ আল্লাহ্‌র রূহ তো আল্লাহর থেকে কম মর্যাদার হতে পারে না। কিন্তু কোন কোন মুহাম্মাদী ব্যক্তি বলে, এই দুই আয়াতে 'রূহ' বলতে জিবরাঈলকে (আ) বুঝানো হয়েছে। শুধু শত্রুতার কারণেই তারা এরূপ বলেছেন। কারণ দ্বিতীয় আয়াতে (তার পক্ষ হতে) বাক্যাংশের মধ্যে যে সর্বনাম এবং প্রথম আয়াতে (আমার রূহ) বাক্যাংশের মধ্যে যে সর্বনাম আরবী সর্‌ফ বা শব্দতত্ত্বের (Etymology) নিয়ম অনুসারে উভয় সর্বনাম ফিরিশতার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না, বরং উভয়ই আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য হবে।"

মাননীয় পাদরীর এই বক্তব্য বিভিন্ন দিক থেকে অসত্য ও ভুল :

প্রথমত, আমরা আশা করছি যে, আমরা মাননীয় পাদরীর নিকট থেকে আরবী শব্দতত্ত্ব বা সর্‌ফ শাস্ত্রের একটি নতুন নিয়ম শিক্ষালাভ করলাম। তা হলো এই যে, এই সর্বনাম দুইটি ফিরিশতার অর্থ নির্দেশ না করে আল্লাহর অর্থ নির্দেশ করবে। আমরা 'ইলমুস সর্‌ফ বা আরবী শব্দতত্ত্ব (etymology) শাস্ত্রে এইরূপ কোন নিয়ম বা কায়েদা আছে বলে জানতাম না।[১] এ থেকে স্পষ্ট হলো যে, তিনি জানেনও না যে, সর্‌ফ শাস্ত্রটি কি বিদ্যা এবং এতে কি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সম্ভবত তিনি সর্‌ফ শাস্ত্রের নামটি মাত্র কোথাও শুনেছিলেন এবং এখানে সুযোগমত নামটি লিখে দিয়েছেন, যেন অজ্ঞ-মুর্খ কোন পাঠক মনে করে যে, তিনি আরবী ভাষাশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।

দ্বিতীয়ত, একজন গ্রহণযোগ্য মুসলিম আলেমও বলেন নি যে, 'তাঁর পক্ষ থেকে আত্মা' বলতে এখানে 'জিবরাঈল'কে বুঝানো হয়েছে। অতএব তাঁর এই কথাটি একটি জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। অন্তরের শত্রুতা থেকেই এই অপবাদের জন্ম।

তৃতীয়ত, সূরা নিসার উদ্ধৃত আয়াতটি নিম্নরূপ : "হে কিতাবীগণ (ইহূদী ও খৃস্টানগণ)! ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না ও আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলো না। মরিয়ম তনয় ঈসা মসীহ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে আত্মা। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বলিও না : 'তিন'। নিবৃত্ত হও। নিবৃত্ত হওয়া তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহ্ তো একমাত্র উপাস্য। তিনি একথা থেকে অনেক উর্ধ্বে যে, তাঁর কোন সন্তান থাকবে। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই; কর্ম-বিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।"

১. সর্‌ফ বা শব্দতত্ত্ব শাস্ত্রে (Etymology) কখনোই এ সকল নিয়ম আলোচিত হয় না। সর্‌ফ শাস্ত্রে শব্দের মূল, উৎপত্তি, বিবর্তন, পরিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, এই আয়াতের শুরুতে খৃস্টানদেরকে যীশুর বিষয়ে অতি-ভক্তি ও বাড়াবাড়ি বিশ্বাসের জন্য কঠোরভাবে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এরপর যীশুর সঠিক পরিচয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (ভাববাদী), মেরির প্রতি প্রেরিত আল্লাহর বাণী ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আত্মা। এরপর সঠিক পরিচয়কে বিকৃত করে ত্রিত্ববাদে রূপান্তরিত করতে বা যীশুকে 'ঈশ্বরের জাত' বলে বিশ্বাস করতে নিষেধ করা হয়েছে। এভাবে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসের জন্য তাদেরকে নিন্দা করা হয়েছে। কুরআন কারীমে আরো অনেক স্থানে যীশুকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের জাত বলে বিশ্বাস করাকে নিন্দা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন : "যারা বলে যে, 'আল্লাহই মরিয়ম তনয় মসীহ' তারা তো অবিশ্বাস (সঠিক বিশ্বাসকে অস্বীকার) করেছে...।"[১] তিনি আরো বলেছেন : "যারা বলে : 'আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন' তারা অবিশ্বাস (সঠিক বিশ্বাসকে অস্বীকার) করেছে"[২]। তিনি আরো বলেছেন : "মরিয়ম-তনয় মসীহ তো কেবল একজন রাসূল (ভাববাদী) ভিন্ন কিছুই নন।"[৩]

এখন 'তাফসীরের' বা ব্যাখ্যার মূলনীতি সম্পর্কে এই পাদরী মহাশয়ের সুগভীর পাণ্ডিত্যের এবং তাঁর গভীর দৃষ্টভঙ্গির নমুনা দেখুন। কিভাবে তিনি মূল গ্রন্থকারের মনের কথাটি বর্ণনা করেছেন! কিভাবে তিনি বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন! কিভাবে তিনি আয়াতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কথার সাথে ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন! কিভাবে তিনি এই অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সকল স্থানের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন!

তবে আমি খুবই বেদনাপ্লুত ও অত্যন্ত ব্যথিত যে, এই মহাপণ্ডিত গুরু ও নজিরবিহীন ভাষ্যকার বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের জন্য এইরূপ অতুলনীয় আবিষ্কার, গবেষণা ও পাণ্ডিত্য সমৃদ্ধ একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখলেন না। তাহলে তাঁর ধর্মের অনুসারিগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন। নতুন ও পুরাতন নিয়মের ব্যাখ্যায় তারা অনেক বিষয় জানতে পারতেন যা এই পাদরী মহাশয়ের যুগ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি।

সত্য কথা হলো, এই প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ভাষ্যকার যদি গভীর চিন্তা ও দীর্ঘ গবেষণা করে বলেন যে, দুই এবং দুই মিলে মোট পাঁচ হয় তাহলেও আমি তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং সঠিক চিন্তা সম্পর্কে আশ্চর্য হব না।

এই হলো পাদরী মহাশয়ের আরবী বুঝার অবস্থা। আরবী ভাষা বলায়, লেখায় ও বুঝায় এই পরিমাণ পুঁজি নিয়ে তিনি আশা করেন যে, তাঁর নিম্নমানের অনুবাদ ও ফালতু ব্যাখ্যাকে মুসলিম আলেমগণের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার উপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অহঙ্কার ও আত্মগরিমার ফল ছাড়া এ কিছুই নয়।

১. সূরা মায়িদা : ৭২ আয়াত।
২. সূরা মায়িদা : ৭৩ আয়াত।
৩. সূরা মায়িদা : ৭৫ আয়াত।

Contents

চতুর্থতম, তিনি বলেছেন : "আল্লাহর রূহ আল্লাহ্‌র থেকে কম মর্যাদার হতে পারে না।" এই কথাটি অসত্য। সূরা সাজদায় মহান আল্লাহ আদম (আ)-এর বিষয়ে বলেছেন : "পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর রূহ (আত্মা) থেকে।"[১]

সূরা হিজর ও সূরা সাদ-এ আদমের বিষয়েই বলেছেন : "যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ (আত্মা) সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।"[২]

এ সকল স্থানে আল্লাহ আদমের মধ্যে সঞ্চারিত 'মানবাত্মা'কে 'আমার আত্মা' বা 'তাঁর আত্মা' বলেছেন।

সূরা মরিয়মে জিবরাঈল সম্পর্কে বলেছেন : "অতঃপর আমি তার (মরিয়মের) নিকট আমার রূহকে প্রেরণ করলাম; সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।"[৩] এখানে আমার রূহ বা আমার আত্মা বলতে 'জিবরাঈল'কে বুঝানো হয়েছে।

বাইবেলের পুরাতন নিয়মে যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ৩৭ অধ্যায়ের ১৪ আয়াতে যিহিষ্কেল ভাববাদীর অলৌকিকত্বে আল্লাহ যে হাজার হাজার মানুষকে পুনর্জীবিত করেন তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন : "আর আমি তোমাদের মধ্যে আপন আত্মা দিব।"[৪] এভাবে এখানেও 'মানবাত্মা'কে 'আমার আত্মা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, মাননীয় পাদরীর উপর্যুক্ত গবেষণার ভিত্তিতে যিহিষ্কেল ভাববাদীর গ্রন্থ অনুসারে এ সকল হাজার হাজার পুনর্জীবিত মানুষ সকলকেই ঈশ্বর বলে গণ্য করতে হবে এবং কুরআনের বর্ণনা অনুসারে আদম (আ) ও জিবরাঈলকে (আ) ঈশ্বর বলে গণ্য করতে হবে।

সঠিক কথা হলো, 'তাঁর পক্ষ থেকে আত্মা' বলতে কুরআন কারীমে 'মানবাত্মা' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যীশু আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি মানবাত্মার অধিকারী। তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে : "'রূহ' অর্থ রূহের অধিকারী। 'তাঁর পক্ষ থেকে' বলে বিশেষ সম্মান বুঝানো হয়েছে।" তাফসীরে বায়যাবীতে বলা হয়েছে : "এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ'. একথার অর্থ হলো : তাঁর নিকট থেকে আগত মানবাত্মার অধিকারী। মূল ও ধাতুর স্থূলাভিষিক্ত কোন কিছুর মাধ্যম ব্যতিরেকে যা আগত।"

পাদরী ফান্ডার মহাশয়ের উপর্যুক্ত বাক্যটি শিশুদের হাসি-তামাশার বিষয়ে পরিণত করে। কোন কোন আলেমের প্রতিবাদের কারণে মাননীয় পাদরী নিজে বিষয়টি বুঝতে পেরে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত 'মিফতাহুল আসরার' গ্রন্থের নতুন সংস্করণে এই বাক্যটি পরিবর্তন করে নতুন একটি ধোঁকামূলক দ্ব্যর্থবোধক শীতল বাক্য লিখেছেন। আমি

১. সূরা ৩২ : সাজদা : ৯ আয়াত।
২. সূরা হিজর ২৯ আয়াত ও সূরা সাদ ৭২ আয়াত।
৩. সূরা : ১৯ মরিয়ম, ১৭ আয়াত।
৪. যিহিষ্কেল : ৩৭/১৪।

আমর লেখা 'ইযালাতুশ শুকূক' (ধোঁকা নিরসন) গ্রন্থে তাঁর এই নতুন বাক্য উদ্ধৃত করেছি এবং খণ্ডন করেছি। কোন পাঠক ইচ্ছা করলে বইটি পাঠ করতে পারেন।

এখানে আমি পাদরী মহাশয়ের আলোচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দুইটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

প্রথম ঘটনা

আল্লামা তীবি মিশকাতুল মাসাবীহ্ গ্রন্থের ব্যাখ্যা 'শারহুল মিশকাত' গ্রন্থে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। একজন মুসলিম কুরআন পাঠ করছিলেন। জনৈক পাদরী তাকে এই আয়াতটি পাঠ করতে শুনেন : "এবং তাঁর বাণী যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে আত্মা।" তখন তিনি বলেন, "এ কথা তো আমাদের ধর্মবিশ্বাস সমর্থন করছে এবং মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের বিরোধিতা করছে। কারণ এখানে ঈসা মসীহকে 'আল্লাহর অংশ-রূপ আত্মা' হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে।" 'আন-নযীর' গ্রন্থের লেখক আলী ইবনু হুসায়ন ইবনুল ওয়াকিদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পাদরীর কথার উত্তরে বলেন, এই ধরনের কথা আল্লাহ্ সকল সৃষ্টির বিষয়ে বলেছেন। তিনি বলেছেন : 'তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু তাঁর পক্ষ থেকে।"[১] যদি 'আত্মা তাঁর পক্ষ থেকে' কথার অর্থ হয় 'আত্মা তাঁর অংশ', তবে 'সবকিছু তাঁর পক্ষ থেকে' অর্থ হবে 'সবকিছু তাঁর অংশ'। তাহলে সকল সৃষ্টিকে ঈশ্বর বলে মানতে হবে; কারণ সবকিছুই ঈশ্বরের অংশ হিসারে ঈশ্বরত্ব লাভ করবে। এ কথা শুনে উক্ত পাদরী ন্যায়পরায়ণতার সথে নিজের ভুল স্বীকার করেন এবং ঈমান গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় ঘটনা

দিল্লীর খৃস্টান সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি ত্রিত্ববাদ প্রমাণ করার জন্য 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'কে দলিল হিসাবে পেশ করেন। তিনি দাবি করেন, এখানে আল্লাহর তিনটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে; এতে ত্রিত্ববাদ প্রমাণিত হলো। তাদের এই দলিল শুনে এক রসিক ব্যক্তি বলেন, আপনি তো প্রমাণ সংক্ষিপ্ত করে ফেললেন। কুরআন দিয়ে আপনি সপ্ততত্ত্ববাদ ও সাত ঈশ্বরের অস্তিত্বও প্রমাণ করতে পারবেন। কুরআন কারীমে একই স্থানে আল্লাহর ৭টি নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে : হা-মীম। এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর নিকট হতে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তি প্রদানকারী এবং শক্তিশালী।'[২]

শুধু তাই নয়, আপনি সূরা হাশ্র-এর শেষের তিন আয়াত দিয়ে ১৭ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারবেন; কারণ এই আয়াতগুলিতে একত্রে আল্লাহর ১৭টি নাম বা গুণের উল্লেখ করা হয়েছে।

---

১. সূরা : ৪৫ জাছিয়া, ১৩ আয়াত।

২. সূরা : ৪০ মু'মিন (গাফির) ১-৩।

সুপ্রিয় পাঠক!

উপরের আলোচনা থেকে আপনি মাননীয় পাদরীর ৩৬টি বক্তব্যের অবস্থা জানতে পেরেছেন। এই বইয়ের বিভিন্ন স্থানে আমি তাঁর অন্যান্য বক্তব্য উদ্ধৃত করব এবং খণ্ডন করব। এখন আমি পাদরী মহাশয়কে প্রশ্ন করি : উপরে উদ্ধৃত ও আলোচিত তাঁর এ সকল বক্তব্যের ভিত্তিতে যদি আমি তাঁরই অভ্যাস অনুসারে তাঁর সম্পর্কে বলি যে, এ সকল কথাবার্তা, যেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ভিত্তিহীন এবং কিছু আছে অত্যন্ত দুর্বল, সে সকল কথাবার্তা তাঁর স্বল্প জ্ঞান ও গভীর দৃষ্টির প্রকট অভাব প্রমাণিত করে। যদি তাঁর মধ্যে আংশিক চিন্তাভাবনা ও সামান্যতম জ্ঞানও থাকত তাহলে তিনি এই প্রকারের কথা বলতে পারতেন না। যদি আমি তা বলি তাহলে কি আমার জন্য তা বৈধ হবে, না অবৈধ হবে?

যদি এরূপ বলা অবৈধ হয় তাহলে তাঁকে অবশ্যই বলতে হবে যে, তিনি তাঁর বিপক্ষের গ্রন্থের মধ্যে তাঁর নিজের ধারণা অনুসারে ৫টি বা ৬টি দুর্বল বা দোষযুক্ত কথা আবিষ্কার করলে তাঁর জন্য বিপক্ষকে এ সকল কথা বলা বৈধ হয়, কিন্তু তাঁর বিপক্ষ তার কথার মধ্যে উপরের সংখ্যার ৬ গুণেরও বেশি নিশ্চিত বাতিল কথা পেলেও বিপক্ষের জন্য তাঁর বিষয়ে এই প্রকারের কথা অবৈধ হয় কেন এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

আর যদি এরূপ বলা বৈধ হয় তাহলে তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর রচিত 'মীযানুল হক' (সত্যের তুলাদণ্ড), 'মিফতাহুল আসরার' (রহস্যের চাবিকাঠি), 'হাল্লুল ইশকাল' (সমস্যার সমাধান) ও অন্যান্য গ্রন্থের অসারতা প্রমাণ করার জন্য উপরোল্লিখিত আলোচনাই যথেষ্ট। কারণ এই অবস্থায় তাঁর গ্রন্থগুলির অবশিষ্ট কথাবার্তার অবস্থাও আলোচিত বক্তব্যগুলির মতই অসত্য ও ভুল বলে প্রমাণিত হবে।

প্রবাদের কথাটি কতই সুন্দর ঃ 'যে দরজা তুমি বন্ধ করতে পারবে না সে দরজা তুমি খুলো না এবং যে তীর তুমি ফিরিয়ে আনতে পারবে না সে তীর তুমি ছুড়ো না।'

সম্মানিত পাঠক!

আমি উপরের সাতটি বিষয় আলোচনা করলাম এজন্য যে, যদি কেউ আমার এই 'ইযহারুল হক' গ্রন্থের প্রতিবাদে কোন গ্রন্থ রচনা করতে চান তাহলে তার থেকে আমরা আশা করব যে, তিনি প্রথমে আমার পূর্ণ বক্তব্য উদ্ধৃত করবেন। এরপর আমার বক্তব্য খণ্ডন করবেন। তাহলে পাঠক আমার বক্তব্য ও প্রতিবাদকারীর বক্তব্য উভয় পক্ষের পুরো বক্তব্য অনুধাবন করতে পারবেন। যদি প্রতিবাদকারী আমার সকল বক্তব্য পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করলে তাঁর গ্রন্থের কলেবর বেড়ে যাবে বলে ভয় পান তাহলে তিনি এই বইয়ের ৬টি অধ্যায়ের যে কোন একটি অধ্যায়ের পুরো বক্তব্য উদ্ধৃত করে তার প্রতিবাদ করবেন। এই ভূমিকায় অন্য যে বিষয়গুলি লিখেছি, প্রতিবাদ লেখার ক্ষেত্রে সেগুলির দিকেও লক্ষ্য রাখবেন।

আমরা আশা করি, আমার এই গ্রন্থের বক্তব্য খণ্ডন করতে যেয়ে প্রতিবাদকারী ব্যক্তি ঘোরপ্যাঁচ ও দ্ব্যর্থবোধক কথাবার্তায় অভ্যস্থ প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতদের পথে চলবেন না। তাঁদের এই পথ ন্যায়পরায়ণতার পথ নয়, বরং সত্য থেকে বিচ্যুতি এবং গোঁড়ামি ও বাড়াবাড়ির পাথেয়।

আর যদি মাননীয় পাদরী ফান্ডার সাহেব আমার এই বইয়ের প্রতিবাদ লিখেন তাহলে তাঁর থেকে আমি উপরের বিষয়টি সমভাবে আশা করি। উপরন্তু আমি তাঁর থেকে অতিরিক্ত আশা করি যে, এই ভূমিকায় উদ্ধৃত ও আলোচিত তাঁর ৩৬টি বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করবেন। তাঁর এই ব্যাখ্যা থেকেই বুঝা যাবে তিনি আমার এই বইয়ের বাকি বক্তব্যের ব্যাখ্যা কিভাবে প্রদান করবেন।

আমার ধারণা, ইনশাআল্লাহ, তাঁরা কখনোই আমার এই বইয়ের প্রতিবাদ লিখতে সক্ষম হবেন না। যদি তাঁরা কিছু লিখেন, তবে কখনোই উপরের বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন না বরং আমার অসংখ্য বক্তব্যের মধ্য থেকে কথা বলার মত কয়েকটি বক্তব্য তাঁরা উদ্ধৃত করবেন। অবশিষ্ট শক্তিশালী অখণ্ডনীয় বক্তব্যগুলি সম্পর্কে একটি কথাও বলবেন না। সেগুলি মেনে নেওয়ার স্বীকৃতিও দিবেন না, আবার সেগুলি খণ্ডনও করবেন না। তবে হ্যাঁ, সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য ঢালাও দাবি করবেন যে, 'তার অবশিষ্ট বক্তব্যগুলিও এইরূপ।' তাঁরা যদি আমার এই গ্রন্থের এইরূপ আংশিক প্রতিবাদ ও খণ্ডন করেন, তবে তাঁদের প্রতিবাদের পরিমাণ হবে অতি সামান্য যা এই গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠার বেশি হবে না।

এজন্য আমি অগ্রীম বলে রাখছি যে, তাঁরা যদি আমার এই বইয়ের পূর্ণ প্রতিবাদ ও খণ্ডন না করে আংশিক দুই চারিটি কথার প্রতিবাদ করে অবশিষ্ট বক্তব্যের বিষয় এড়িয়ে যান তাহলে তা তাঁদের অক্ষমতাই প্রমাণ করবে।

অষ্টম বিষয়

বিভিন্ন ব্যক্তি ও স্থানের নামের ক্ষেত্রে আমি ইংরেজি গ্রন্থাদি বা প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের অনূদিত বা রচিত আরবী, উর্দু ও ফারসী গ্রন্থাদির উপর নির্ভর করেছি। প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের গ্রন্থাদি যিনি পাঠ করেছেন তিনি জানেন যে, অনুবাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে তাঁরা নামগুলিকে বেশি বিকৃত করেছেন। কাজেই যদি কোন পাঠক দেখেন যে, কোন ব্যক্তির নাম আমি যেরূপ উল্লেখ করেছি, অন্য ভাষায় তা অন্যরূপে উচ্চারিত হয় তাহলে বিষয়টির জন্য আমাকে দোষারোপ করবেন না।

উপরের ৮টি বিষয় আলোচনার মাধ্যমে আমার ভূমিকা শেষ হলো। এখন আমি মহিমাময় করুণাময় আল্লাহর সাহায্যে মূল বিষয় শুরু করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সত্যকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করার এবং অসত্যকে অসত্য হিসাবে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা প্রদান করুন।

প্রথম অধ্যায়
পুরাতন ও নতুন নিয়মের গ্রন্থাবলীর বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ
গ্রন্থগুলির নাম ও সংখ্যার বর্ণনা

সুপ্রিয় পাঠক! আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, খৃস্টানগণ তাঁদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলিকে দুইভাগে ভাগ করেন। প্রথমভাগে গ্রন্থাবলী সম্পর্কে তারা দাবি করেন যে, যীশুর (ঈসা আ.) পূর্বে আগত নবীগণের মাধ্যমে সেগুলি তাদের নিকট পৌঁছেছে। দ্বিতীয় ভাগের গ্রন্থগুলির বিষয়ে তারা দাবি করেন যে, যীশু (ঈসা আ.) -এর পরে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা (Divine Inspiration) -এর মাধ্যমে সেগুলি লিখিত হয়েছে। প্রথমভাগের গ্রন্থগুলির সমষ্টিকে 'পুরাতন নিয়ম' এবং দ্বিতীয়ভাগের গ্রন্থগুলির সমষ্টিকে 'নতুন নিয়ম' বলে অভিহিত করা হয়। উভয় নিয়মের সমষ্টিকে বলা হয় 'বাইবেল'। এটি একটি গ্রীক শব্দ। এর অর্থ 'গ্রন্থ'।

উভয় নিয়মের প্রতিটি নিয়মই পুনরায় দুই পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে সেসকল গ্রন্থ যেগুলির বিশুদ্ধতার বিষয়ে অধিকাংশ প্রাচীন খৃস্টান একমত। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে সেই গ্রন্থগুলি যেগুলির বিশুদ্ধতার বিষয়ে তাদের মতভেদ রয়েছে।

পুরাতন নিয়মের প্রথম প্রকারের গ্রন্থাবলী

পুরাতন নিয়মের প্রথম পর্যায়ের গ্রন্থাবলী, যেগুলির বিশুদ্ধতার বিষয়ে অধিকাংশ খৃস্টান একমত সেগুলির সংখ্যা ৩৮[১]।

১. খৃস্টানগণের 'বাইবেলের' পুরাতন নিয়মের গ্রন্থাবলী মোট ৩৯টি। গ্রন্থকার আল্লামা রাহমাতুল্লাহ এখানে অধিকাংশ খৃস্টানদের নিকট বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত গ্রন্থের তালিকায় ৩৮টি গ্রন্থ উল্লেখ করেছেন। তিনি খৃষ্টীয় বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ১৭তম গ্রন্থ 'ইস্টেরের বিবরণ' (The Book of Esther) গ্রন্থটি বাদ দিয়েছেন। তিনি এই গ্রন্থটিকে Apocrypha বা সন্দেহজনক গ্রন্থাবলির তালিকায় উল্লেখ করেছেন। মূলত এই গ্রন্থটির দশম অধ্যায়ের পরের শেষের অধ্যায়গুলির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে খৃস্টান ধর্মতত্ত্ববিদগণ সন্দেহ পোষণ করেছেন। ১ম থেকে ১০ম অধ্যায় পর্যন্ত অংশকে তাঁরা বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করেছেন। এজন্য এই গ্রন্থটির ১ম থেকে ১০ অধ্যায় পর্যন্ত অংশ তারা পুরাতন নিয়মের মধ্যে ১৭তম গ্রন্থ হিসাবে সংকলিত করেছেন এবং বাকী অধ্যায়গুলি তাঁরা (Apocrypha) বা সন্দেহজনক গ্রন্থাবলির মধ্যে সংকলিত করেছেন। গ্রন্থকার এ বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রথম খৃষ্টীয় শতাব্দীর (৩৭-৯৫ খৃ) প্রসিদ্ধতম ইহূদী ঐতিহাসিক যোসেফাস (Flavius Josephus) বাইবেলের পুরাতন নিয়ম বা ইহূদী বাইবেলের গ্রন্থের বর্ণনায় বলেন : আমাদের পবিত্র ঐশ্বরিক গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ২২টি। তন্মধ্যে ৫টি মোশির। পরবর্তী নবীগণের লেখা গ্রন্থ ১৩টি। বাকি চারিটি গ্রন্থ ঈশ্বরের বন্দনায় গীত সঙ্গীত ও অনুরূপ বিষয়ের সংকলন। যোসেফাস-এর বক্তব্য দেখুন : Eusebius Pamphilus. The Ecclesiastical History, page 97, 244-245.

১. আদি পুস্তক (Genesis)
২. যাত্রা পুস্তক (Exodus)
৩. লেবীয় পুস্তক (Leviticus)
৪. গণনা পুস্তক (Numbers)
৫. দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy)

এই পাঁচটি গ্রন্থ একত্রে 'তাওরাহ' (Torah or Pentateuch) নামে অভিহিত। 'তাওরাহ' একটি হিব্রু শব্দ। এর অর্থ 'শিক্ষা ও বিধিবিধান'। কখনো কখনো রূপকভাবে পুরাতন নিয়মের সকল গ্রন্থের সমষ্টিকে বা পুরাতন নিয়মকেই 'তাওরাত' বা 'তোরাহ' বলে অভিহিত করা হয়।

৬. যিহোশূয়ের পুস্তক (The Book of Joshua)
৭. বিচারকর্তৃগণের বিবরণ (The Book of Judges)
৮. রূতের বিবরণ (The Book of Ruth)
৯. শমুয়েলের প্রথম পুস্তক (The First Book of Samuel)
১০. শমুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক (The Second Book of Samuel)
১১. রাজাবলির প্রথম খণ্ড (The First Book of Kings)
১২. রাজাবলির দ্বিতীয় খণ্ড (The Second Book of Kings)
১৩. বংশাবলির প্রথম খণ্ড (The First Book of The Chronicles)
১৪. বংশাবলির দ্বিতীয় খণ্ড (The Second Book of The Chronicles)
১৫. ইয্রার পুস্তক (The Book of Ezra)
১৬. নহিমিয়ের পুস্তক (ইয্রার দ্বিতীয় পুস্তক) (The Book of Nehemiah)
১৭. ইয়োবের[১] বিবরণ (The Book of Job)[২]
১৮. গীতসংহিতা (যাবূর) (The Book of Psalms)
১৯. হিতোপদেশ (সুলাইমানের প্রবাদাবলী) (The Proverbs)
২০. উপদেশক (Ecclesiastes or the Preacher)
২১. শলোমনের পরমগীত (The Song of Solomon)
২২. যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক (The Book of the Prophet Isaiah)
২৩. যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তক (The Book of the Prophet Jeremiah)
২৪. যিরমিয়ের বিলাপ (The Lamentations of Jeremiah)
২৫. যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তক (The Book of The Prophet Ezekiel)
২৬. দানিয়েলের পুস্তক (The Book of Daniel)

১. (Job) বা ইয়োব আরবীতে আইউব। এই গ্রন্থটি আইউব (আ)-এর নামে প্রচারিত।
২. বাইবেলে ইয়োবের বিবরণের পূর্বে নহিমিয়ের পুস্তকের পরে ১৭তম পুস্তক হিসাবে ইস্টেরের বিবরণ (The Book of Esther) গ্রন্থটি রয়েছে। পূর্বের টীকায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২৭. হোশেয় ভাববাদীর পুস্তক (Hosea)
২৮. যোয়েল ভাববাদীর পুস্তক (Joel)
২৯. আমোষ ভাববাদীর পুস্তক (Amos)
৩০. ওবদিয় ভাববাদীর পুস্তক (Obadiah)
৩১. যোনা[১] ভাববাদীর পুস্তক (Jonah)
৩২. মীখা ভাববাদীর পুস্তক (Micah)
৩৩. নহূম ভাববাদীর পুস্তক (Nahum)
৩৪. হবক্কূক ভাববাদীর পুস্তক (Habakkuk)
৩৫. সফনিয় ভাববাদীর পুস্তক (Zephaniah)
৩৬. হগয় ভাববাদীর পুস্তক (Haggai)
৩৭. সখরিয়[২] ভাববাদীর পুস্তক (Zechariah)
৩৮. মালাখি ভাববাদীর পুস্তক (Malachi)

ঈসা-মসীহ (আ) এর জন্মের প্রায় ২৪ বছর পূর্বে মালাখি নবী হিসাবে ইহূদীদের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন।

উপরোক্ত ৩৮টি গ্রন্থ খৃস্টান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষের নিকট বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃত ও গৃহীত। শমরীয় (Samaritans) ইহূদীগণ এগুলির মধ্য থেকে শুধু প্রথম সাতটি গ্রন্থ বিশুদ্ধ ও পালনীয় বলে স্বীকার করে ঃ মূসা (আ)-এর গ্রন্থ বলে কথিত ৫টি গ্রন্থ, যিহোশূয়ের পুস্তক (The Book of Joshua) ও বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ (The Book of Judges)। শমরীয়দের মধ্যে প্রচলিত 'তাওরাত' ইহূদীদের মধ্যে প্রচলিত তাওরাত থেকে ভিন্ন।

পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় প্রকারের গ্রন্থাবলী

পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রন্থাবলী যেগুলির বিশুদ্ধতার বিষয়ে খৃস্টানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে[৩] সেগুলির সংখ্যা নয়টি।[৪]

---

১. ইউনুস (আ)।
২. আরবীতে যাকারিয়া।
৩. খৃস্টানদের পরিভাষায় এগুলিকে Apocrypha বা সন্দেহজনক বলা হয়।
৪. এখানে উল্লেখ্য যে, খৃস্টানদের প্রধান দল রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানদের নিকট এই সন্দেহযুক্ত গ্রন্থগুলিও বিশুদ্ধ বলে গৃহীত। এজন্য রোমান ক্যাথলিক বাইবেলে (RCV : Roman Catholic Version/ Douay) পুরাতন নিয়মের গ্রন্থ সংখ্যা ৪৬। বাইবেলের প্রাচীন সংস্করণে এসকল গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। প্রটেস্ট্যান্টরা ১৭শ শতাব্দীতে এগুলি মুছে দিয়ে তাদের বাইবেল মুদ্রণ করে। এজন্য প্রটেস্ট্যান্টদের বাইবেলে (AV : Authorised Version/ KJV : King James Version) পুরাতন নিয়মের গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ৩৯। রোমান ক্যাথলিকগণ যদিও মনে করেন যে, প্রটেস্ট্যান্টগণ 'ঈশ্বরের বাণী' বাদ দিয়েছে, কিন্তু তারা বর্তমানে প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলই প্রচার করেন। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, বাইবেলের নতুন নিয়মের গ্রন্থাবলীর মধ্যে এ সকল মুছে ফেলা গ্রন্থগুলির পরোক্ষ উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। দেখুন : The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition, Vol-2, Biblical Literature, pp 883, 932-935.

১. ইস্টেরের বিবরণ (The Book of Esther)
২. বারুখের পুস্তক (The Book of Baruch)
৩. দানিয়েলের পুস্তকের একটি অংশ
৪. তোবিয়াসের পুস্তক (The Book of Tobias/Tobit)
৫. যুডিথের পুস্তক (The Book of Judith)
৬. উইসডম বা জ্ঞান পুস্তক (The Book of Wisdom/Wisdom of Solomon)
৭. যাজকগণ বা Ecclesiasticus (The Wisdom of Jesus the Son of Sirach)
৮. ম্যাকাবিজের প্রথম পুস্তক (The First Book of Maccabees)
৯. ম্যাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক (The Second Book of Maccabees)

নতুন নিয়মের প্রথম প্রকারের গ্রন্থাবলী

নতুন নিয়মের প্রথম পর্যায়ের গ্রন্থাবলী

যেগুলির বিশুদ্ধতার বিষয়ে অধিকাংশ খৃস্টান একমত সেগুলির সংখ্যা ২০।

১. মথি লিখিত সুসমাচার[১] (The Gospel according To St. Matthew)
২. মার্ক লিখিত সুসমাচার (The Gospel According To St. Mark)
৩. লূক লিখিত সুসমাচার (The Gospel According To St. Luke)
৪. যোহন লিখিত সুসমাচার (The Gospel According To St. John)

এই চারিটি গ্রন্থকে 'ইঞ্জিল চতুষ্টয় বলা হয়। 'ইঞ্জিল' শব্দটি এই চারিটি গ্রন্থের জন্যই শুধু প্রযোজ্য। তবে অনেক সময় রূপকভাবে নতুন নিয়মের সকল গ্রন্থকে একত্রে 'ইঞ্জিল' বলা হয়। 'ইঞ্জিল' মূলত অনারব শব্দ যা আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। মূল গ্রীক 'ইনক্লিয়ন' শব্দ থেকে 'ইঞ্জিল' শব্দটি রূপান্তরিত হয়েছে। এর অর্থ 'সুসংবাদ ও শিক্ষা'।

৫. প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ (The Acts of the Apostles)
৬. রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (The Epistle of Paul The Apostle to the Romans)

---

১. এভাবে খৃস্টানদের প্রচারিত 'বাইবেলে' The Gospel According To St. Mathew-এর অনুবাদ করা হয়েছে 'মথিলিখিত সুসমাচার'। আবার তাদের প্রচারিত 'ইঞ্জিল শরীফ'-এ এর অনুবাদ করা হয়েছে 'প্রথম খণ্ড : মথি'। এই দুই অনুবাদই ধোঁকাপূর্ণ। মূল নামের অনুবাদ হবে 'মথির মতানুসারে সুসমাচার'। ঈসা (আ) একটি সুসমাচার বা ইঞ্জিল প্রচার করেছিলেন বলে সকলেই জানত। তবে কারো কাছেই এর কোন কপি ছিল না। তাঁর তিরোধানের প্রায় শত বছর পরে অনেক মানুষ 'সুসমাচার' লিখে প্রচার করেন যে, এটি ঈসা (আ)-এর সুসমাচার। এজন্য এগুলির এইরূপ নামকরণ করা হয়। অর্থাৎ নাম করা হয় 'অমুকের মতানুসারে এই হলো সুসমাচার', সঠিক সুসমাচার কোনটি তা কেউ জানে না। এই বিষয়টি চাপা দেওয়ার জনই তারা সঠিক অনুবাদ না করে জালিয়াতি করেছেন। বাকী সুসমাচারগুলিরও একই অবস্থা। আমরা অনুবাদে তাদের ব্যবহৃত পরিভাষাই ব্যবহার করেছি।

৭. করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র (The First Epistle of Paul The Apostle to the Corinthians)
৮. করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র (The Second Epistle of Paul The Apostle to the Corinthians)
৯. গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (The Epistle of Paul The Apostle to the Galatians)
১০. ইফিষীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (The Epistle of Paul The Apostle to the Ephesians)
১১. ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (The Epistle of Paul The Apostle to the Philippians)
১২. কলসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (The Epistle of Paul The Apostle to the Colossians)
১৩. থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র (The First Epistle of Paul The Apostle to the Thessalonians)
১৪. থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র (The Second Epistle of paul the Apostle to the Thessalonians)
১৫. তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র (The First Epistle of Paul the Apostle to the Timothy)
১৬. তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র (The Second Epistle of Paul The Apostle to Timothy)
১৭. তীতের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (The Epistle of Paul to Titus)
১৮. ফিলীমনের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (The Epistle of Paul to Philemon)
১৯. পিতরের প্রথম পত্র (The First Epistle General of Peter)
২০. যোহনের প্রথম পত্র (The First Epistle General of John)

নতুন নিয়মের দ্বিতীয় প্রকারের গ্রন্থাবলী

নতুন নিয়মের দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রন্থাবলী, যেগুলির বিশুদ্ধতার বিষয়ে খৃষ্টানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে ৭টি গ্রন্থ এবং যোহনের প্রথম পত্রের কয়েকটি অনুচ্ছেদ।

১. ইব্রীয়দের প্রতি (পৌলের) পত্র (The Epistle of Paul The Apostle to the Hebrews)
২. পিতরের দ্বিতীয় পত্র (The Second Epistle General of Peter)
৩. যোহনের দ্বিতীয় পত্র (The Second Epistle General of John)
৪. যোহনের তৃতীয় পত্র (The Third Epistle of John)
৫. যাকোবের পত্র (The General Epistle of James)

৬. যিহূদার পত্র (The Genera Epistle of Jude)

৭. যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য (The Revelation of St. John The Divine)[১]

সুপ্রিয় পাঠক!

৩২৫ খৃষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পৌত্তলিক সম্রাট কন্সটান্টাইনের[২] (রাজত্ব : ৩২৩-৩৩৭ খৃ) নিকিয়া (Nicaea) শহরে খৃষ্টান বিশপ-যাজকদের প্রথম সাধারণ মহাসম্মেলন (ecumenical council) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল, এ সকল সন্দেহভাজন গ্রন্থাবলী সম্পর্কে পরামর্শ, মতবিনিময়, গবেষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সম্মেলনে উপস্থিত (তিন শতাধিক) বিশপ ও মহাযাজক যে সকল গ্রন্থের বিষয়ে গবেষণা, আলোচনা ও বিশ্লেষণের পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, 'যুডিথের পুস্তক' (The Book of Judith) বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি 'সন্দেহজনক' (Apocrypha) হিসাবেই পরিত্যক্ত থাকবে। (St. Jerome) সেন্ট জিরোম (৩৪২-৪২০ খৃ) এই গ্রন্থের যে ভূমিকা লিখেছেন তা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

এরপর ৩৬৪ খৃষ্টাব্দে লোডেসিয়ায় আরেকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ধর্মগুরুগণ 'যুডিথের পুস্তক' সম্পর্কে পূর্ববর্তী মহাসম্মেলনের সিদ্ধান্ত বহাল রেখে অতিরিক্ত নিম্নবর্ণিত ৭টি গ্রন্থকেও নির্ভরযোগ্য হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন : ১. ইস্টেরের বিবরণ (The Book of Esther), ২. যাকোবের পত্র (The General Epistle of James), ৩. পিতরের দ্বিতীয় পত্র (The Second Epistle General of Peter) ৪. যোহনের দ্বিতীয় পত্র (The Second Epistle General of John), ৫. যোহনের তৃতীয় পত্র

---

১. এখানে উল্লেখ্য যে, এই ৭টি গ্রন্থও বর্তমান প্রচলিত বাইবেলের নতুন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এজন্য প্রচলিত নতুন নিয়মের গ্রন্থ সংখ্যা ২৭। গ্রন্থকার পরবর্তী অনুচ্ছেদে এগুলি সম্পর্কে আলোচনা করবেন। নতুন নিয়মের সন্দেহজনক গ্রন্থাবলী সম্পর্কে দেখুন The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition, Vol-2, Biblical Literature, New Testament Apocrypha, p 973).

২. Constantine the Great ২৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৩১২ খৃষ্টাব্দে রোমের একচ্ছত্র শাসকে পরিণত হন। খৃষ্টধর্মের শুরু থেকে ৩১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমের সম্রাটগণ খৃষ্টধর্মকে রাষ্ট্রবিরোধী বলে গণ্য করতেন এবং খৃষ্টানদের উপর অত্যাচার করতেন। ৩১৩ খৃষ্টাব্দে কন্সটান্টাইন 'মিলান ঘোষণা' (Edict of Milan)-এর মাধ্যমে খৃষ্ট ধর্মকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। এতদিন খৃষ্ট ধর্ম একটি 'গোপন' ধর্ম বলে গণ্য ছিল। এখন খৃষ্টানগণ প্রকাশ্যে ধর্মমত প্রকাশ ও পালন করতে শুরু করেন। এখন তাদের মধ্যকার এতদিনের বিরোধিতাগুলি প্রকাশ পায়। বিশেষত, একত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, যীশুর ঈশ্বরত্ব, বাইবেলের গ্রন্থ বা যীশুর সুসমাচার হিসাবে প্রচারিত বিভিন্ন গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মধ্যকার মতভেদ প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তখন পৌত্তলিক সম্রাট কন্সটান্টাইনের নির্দেশে ও তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে খৃষ্টান ধর্মগুরুগণ ৩২৫ সালে নিকিয়া সম্মেলনে সমবেত হন। ৩৩৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর কিছু পূর্বে সম্রাট কন্সটান্টাইন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন।

(The Third Epistle of John), ৬. যিহূদার পত্র (The General Epistle of Jude), ৭. ইব্রীয়দের প্রতি (পৌলের) পত্র (The Epistle of Paul The Apostle to the Hebrews)।

তারা এই সিদ্ধান্ত একটি সাধারণ পত্রের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপন করেন। এই দুই কাউন্সিল বা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে "যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য" (The Revelation of St. John The Divine) নামক গ্রন্থটি সন্দেহজনক ও অগ্রহণযোগ্য হিসাবে বাইবেলের বাইরে থেকে যায়।

অতঃপর ৩৯৭ খৃস্টাব্দে আরেকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেরন 'কার্থেজ' সম্মেলন নামে পরিচিত। এই সম্মেলনে খৃস্টধর্মের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব একস্টাইন উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছাড়াও ১২৬ জন প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনের সদস্যগণ উপরের দুই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন। উপরন্তু তারা অতিরিক্ত কিছু গ্রন্থ সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। গ্রন্থগুলি হলো :

১. উইসডম বা জ্ঞান পুস্তক (The Book of Wisdom)
২. তোবিয়াসের পুস্তক (The Book of Tobias)
৩. বারুখের পুস্তক (The Book of Baruch)
৪. যাজকগণ বা Ecclesiasticus (The Wisdom of Jesus the Son of Sirach)
৫. ম্যাকাবিজের প্রথম পুস্তক (The First Book of Maccabees)
৬. ম্যাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক (The Second Book of Maccabees)
৭. যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য (The Revelation of St. John The Divine)

তবে এই সম্মেলনের উপস্থিতি 'বারুখের পুস্তক'টিকে 'যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তক'-এর অংশ হিসাবে গণ্য করেন; কারণ বারুখ (আ) যিরমিয় (আ)-এর প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। এজন্য বাইবেলের সূচীপত্রে তারা 'বারুখের পুস্তকের' নাম পৃথকভাবে লিখেন নি।

এরপর 'টরলো সম্মেলন', 'ফ্লোরেন্স সম্মেলন' ও 'ট্রেন্ট সম্মেলন' নামে তিনটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই তিন সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ধর্মগুরুগণ কার্থেজ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন। তবে শেষ দুইটি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারিগণ 'বারুখের পুস্তক'-এর নাম বাইবেলের সূচীপত্রে পৃথকভাবে উল্লেখ করেন।

এ সকল সম্মেলনের পরে উপরোল্লিখিত সকল সন্দেহজনক পুস্তক (Apocrypha) সাধারণ সকল খৃস্টানের নিকট নির্ভরযোগ্য বলে গৃহীত হয়। এভাবেই (খৃস্টীয় ৪র্থ থেকে ১৬শ শতক পর্যন্ত) প্রায় ১২০০ বছর এই গ্রন্থগুলি বাইবেলের অংশ হিসাবে স্বীকৃত থাকে। ১৬শ শতকের প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হলে তারা নিম্নের গ্রন্থগুলিকে বাতিল বলে প্রত্যাখ্যান করেন :

১. বারুখের পুস্তক (The Book of Baruch)
২. তোবিয়াসের পুস্তক (The Book of Tobias)
৩. যুডিথের পুস্তক (The Book of Judith)

৪. উইসডম বা জ্ঞান পুস্তক (The Book of Wisdom)
৫. যাজকগণ বা Ecclesiasticus (The Wisdom of Jesus the Son of Sirach)
৬. ম্যাকাবিজের প্রথম পুস্তক (The First Book of Maccabees)
৭. ম্যাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক (The Second Book of Maccabees)

তারা বলেন যে, এই গ্রন্থগুলি অগ্রহণযোগ্য এবং বাতিল। এগুলিকে কোনভাবেই বাইবেলের অংশ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। এছাড়া তারা 'ইস্টেরের বিবরণ' (The Book of Esther)-এর কিছু অংশ বাতিল বলে গণ্য করেন এবং কিছু অংশ গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থে ১৬টি অধ্যায় ছিল। তারা বলেন যে, প্রথম ৯টি অধ্যায় এবং দশম অধ্যায়ের তিনটি আয়াত সঠিক বলে স্বীকৃত। দশম অধ্যায়ের অবশিষ্ট ১০ আয়াত ও বাকী ৬টি অধ্যায় বাতিল হিসাবে প্রত্যাখ্যাত। উপরের গ্রন্থগুলি বাতিল ও বানোয়াট বলে গণ্য করার ক্ষেত্রে তারা ৬ প্রকারের যুক্তি পেশ করেন :

১. এই গ্রন্থগুলি মূলত হিব্রু, ক্যালিডিয় ইত্যাদি ভাষায় লেখা ছিল। সেসব ভাষায় লিখিত এ সকল গ্রন্থের মূল উৎসগুলি হারিয়ে গিয়েছে।
২. ইহূদীগণ এ সকল গ্রন্থকে ঐশী বা ঐশ্বরিক বলে মানেন না।
৩. সকল খৃস্টান গ্রন্থগুলি মেনে নেন নি।
৪. জিরোম (St. Jerome) বলেছেন যে, ধর্মের বিধিবিধান বর্ণনা ও প্রমাণ করার জন্য এই গ্রন্থগুলি যথেষ্ট নয়।
৫. ক্লাউস বলেছেন যে, এই গ্রন্থগুলি পঠিত হয়, তবে সর্বত্র নয়।
লেখক বলেন যে, একথার অর্থ হলো, সকল খৃস্টান এই গ্রন্থগুলি মানেন না। তাহলে এই ৫ম যুক্তি ও ৩য় যুক্তি একই।
৬. যূসীবিস বা ইউসেবিয়াস (Eusebius Pamphilus)[১] চতুর্থ পুস্তকের ২২শ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই গ্রন্থগুলি বিশেষ করে ম্যাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছে।

এখানে প্রথম, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ যুক্তির দিকে লক্ষ্য করুন। তারা নিজেরাই নিজেদের ধর্মের পূর্ববর্তী প্রজন্মদের অধার্মিকতার স্বীকৃতি প্রদান করছে। তারা নিজেরাই স্বীকার করছে যে, যে সকল গ্রন্থের মূল উৎস হারিয়ে গিয়েছে এবং শুধু অনুবাদগুলি রয়েছে, যেগুলিকে ইহূদীগণ তাদের ধর্মগ্রন্থ হিসাবে মানেন না এবং ম্যাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক-সহ যেগুলি বিকৃত ও পরিবর্তিত সেই গ্রন্থগুলিকে তাদের ধর্মের পূর্ববর্তী অগণিত ধর্মযাজক ও ধার্মিকগণ সঠিক ও বিশুদ্ধ ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন। তাহলে বিপক্ষের কাছে এই ধরনের অধার্মিকদের ঐকমত্যের কী মূল্য থাকতে পারে? ক্যাথলিকগণ তাদের পূর্বসূরীদের অনুসরণে এখন পর্যন্ত এই গ্রন্থগুলিকে ঐশী ও ঐশ্বরিক হিসাবে মেনে থাকেন।

১. ৩য়-৪র্থ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খৃস্টান বিশপ ও ঐতিহাসিক। তাঁর লেখা Ecclesisatical History প্রথম তিন শতকের খৃস্ট ধর্মের ইতিহাস জানার জন্য একটি মৌলিক গ্রন্থ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুরাতন এবং নতুন নিয়মের কোন একটি গ্রন্থেরও অবিচ্ছিন্ন সূত্র (chain of authorities) ইহূদী ও খৃস্টানগণের নিকট সংরক্ষিত নেই

সুপ্রিয় পাঠক!

মহিমাময় আল্লাহ্ আপনাকে সুপথে পরিচালিত করুন। আপনি অবশ্যই জানবেন যে, কোন গ্রন্থকে ওহী (Divine Inspiration)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ঐশী, ঐশ্বরিক বা আসমানী গ্রন্থ হিসাবে স্বীকার করার পূর্বশর্ত হলো :

প্রথমত, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে যে, গ্রন্থটি অমুক নবী বা ভাববাদীর মাধ্যমে লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে যে, উক্ত নবী বা ভাববাদী যেভাবে গ্রন্থটি রেখে গিয়েছেন হুবহু সেভাবে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিকৃতি ব্যতিরেকেই 'অবিচ্ছিন্ন সূত্রে'[১] গ্রন্থটি আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

শুধু ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে কোন গ্রন্থকে কোন ওহী বা প্রেরণা (Inspiration)-প্রাপ্ত ব্যক্তির নামে চালানো হলে বা লিখে দিলেই তা সেই ব্যক্তির লেখা গ্রন্থ বলে প্রমাণিত বা স্বীকৃত হতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন একটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী একটি গ্রন্থকে এরূপ কোন নবী বা ভাববাদীর লেখা গ্রন্থ বলে দাবি করলেই তা তাঁর লেখা বলে প্রমাণিত হয় না।

এরূপ অনেক গ্রন্থই অনেক নবীর নামে প্রচারিত, যেগুলি ইহূদী খৃস্টানগণও সে সকল নবীর গ্রন্থ বলে স্বীকার করেন না। যেমন 'প্রকাশিত বাক্য', 'ক্ষুদ্র আদি পুস্তক', 'ঊর্ধ্বারোহণ পুস্তক' (The Assumption of Moses)[২], 'রহস্য পুস্তক', 'প্রতিজ্ঞা (Testament) পুস্তক' ও স্বীকৃতি পুস্তক, এই ৬টি গ্রন্থ মোশির (মূসা আ.) নামে প্রচারিত। ইয্রার চতুর্থ পুস্তক ইয্রার (Ezra) নামে প্রচারিত। যিশাইয়র ঊর্ধ্বারোহণ (The Ascension of Isaiah)[৩] ও যিশাইয়র নিকট প্রকাশিত বাক্য দুইটি গ্রন্থ যিশাইয় (Isaiah)

---

১. অর্থাৎ ভাববাদী থেকে গ্রন্থটি কে বা কারা লিখিত পাণ্ডুলিপি ও মৌখিক শ্রুতির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের থেকে গ্রন্থটি কে বা কারা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তার স্পষ্ট বর্ণনা থাকবে এবং সূত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সুপরিচিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রসিদ্ধ হবেন, যাঁদের বুদ্ধি, বিশ্বস্ততা, সততা ও ধার্মিকতা হবে প্রশ্নাতীত।

২. পুস্তকটি সম্পর্কে দেখুন : The New Encyclopaedia Britannica, Vol-2, page 936 : Biblical Literature.

৩. পুস্তকটি সম্পর্কে দেখুন : The New Encyclopaedia Britannica, Vol-2, page 935 : Biblical Literature.

ভাববাদীর নামে প্রচারিত। যিরমিয় (Jeremiah) ভাববাদীর প্রসিদ্ধ পুস্তক ছাড়াও আরো একটি তাঁর নামে প্রচারিত (paralipomena of Jeremiah)[১]। হবক্কুক (Habakkuk) ভাববাদীর নামে অনেকগুলি কথা প্রচারিত এবং সলোমনের (সুলাইমান) নামে কয়েকটি যাবুর বা গীতসংহিতা (Psalms of Solomon)[২] প্রচারিত।

নতুন নিয়মের উপরোল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও ৭০টির অধিক গ্রন্থ খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, যেগুলি যীশু, মেরি, শিষ্যগণ বা তাঁদের শিষ্যদের নামে প্রচারিত ও প্রচলিত ছিল। আজকাল খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, এগুলি সবই বানোয়াট ও মিথ্যা। গ্রীক অর্থোডক্স, রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট সকলেই এই গ্রন্থগুলিকে জাল বলে দাবি করেন।

ইয্রার তৃতীয় পুস্তক ইয্রার নামে প্রচারিত। গ্রন্থটি গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের অনুসারীদের নিকট বাইবেলের অংশ এবং পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে অনস্বীকার্য। অপরদিকে রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট চার্চের অনুসারীদের নিকট এই গ্রন্থটি বানোয়াট, মিথ্যা ও জাল। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাঠক এ সকল বিষয় বিস্তারিত জানতে পারবেন।

প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা থেকে পাঠক জানতে পেরেছেন যে, বারুখের পুস্তক, তোবিয়াসের পুস্তক, যুডিথের পুস্তক, উইসডম বা জ্ঞান পুস্তক, যাজকগণের পুস্তক, ম্যাকাবিজের প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক, ইস্টেরের বিবরণের একটি অংশ ক্যাথলিকগণের নিকট পবিত্র ও ঐশ্বরিক গ্রন্থ হিসাবে অবশ্য স্বীকার্য, অথচ প্রটেস্ট্যান্টদের নিকট জাল হিসাবে অবশ্য পরিত্যাজ্য।

অবস্থা যখন এরূপ তখন শুধু কোন একটি গ্রন্থকে কোন একজন নবী বা শিষ্যের নামে প্রচার করলেই আমরা গ্রন্থটিকে সেই নবী বা শিষ্যের লেখা বা সংকলিত গ্রন্থ বলে মেনে নিতে পারি না। শুধু এইরূপ দাবির ভিত্তিতে কোন গ্রন্থকে ঐশী বা ঐশ্বরিক বলে স্বীকার করা যায় না।

এজন্য আমরা খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রাজ্ঞ জাঁদরেল পণ্ডিতদের নিকট বারংবার দাবি করেছি যে, বাইবেলের গ্রন্থসমূহের অবিচ্ছিন্ন সনদ বা সূত্র পেশ করুন। তাঁরা সূত্র উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমার সাথে পাদরীগণের যে প্রকাশ্য বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় সেই বিতর্কানুষ্ঠানের মধ্যে একজন পাদরী[৩] একথা বলে ওজরখাহি পেশ করেন যে, এ সকল গ্রন্থের সূত্র বা সনদ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। খৃস্টধর্মের শুরু থেকে ৩১৩ বছর পর্যন্ত আমাদের উপর যে জুলুম-অত্যাচার হয়েছিল তার ফলে এই গ্রন্থগুলির সনদ বা সূত্র-পরম্পরার বিবরণ আমাদের নিকট থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

১. দেখুন : প্রাগুক্ত।

২. দেখুন প্রাগুক্ত।

৩. মি. ফান্ডারের সঙ্গী মি. ফ্রেঞ্চ।

আমরা খৃস্টানদের নিকট সংরক্ষিত সূত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলী গভীরভাবে অনুসন্ধান করে দেখেছি যে, ধারণা ও অনুমান ছাড়া তাদের কোন প্রকার সূত্র (chain of authorities) নেই। অনুমান করে তারা কিছু বলেন। এরপর কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় উল্লেখ করে অনুমানকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। একথা তো স্পষ্ট যে, এই বিষয়ে ধারণা ও অনুমানের কোন মূল্য নেই।

এভাবে আমরা দেখছি যে, খৃস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণ বারংবার দাবি করা সত্ত্বেও তাঁদের ধর্মগ্রন্থসমূহের বিশুদ্ধতার পক্ষে কোন স্পষ্ট প্রমাণ এবং কোন সূত্র-পরম্পরা পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের ব্যর্থতাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাঁরা যেহেতু সূত্র প্রমাণ করতে পারেন নি, সেহেতু সূত্র না থাকাটাই প্রমাণিত হলো।

এ সকল গ্রন্থের সূত্র প্রমাণ করার দায়িত্ব তাঁদের। সূত্রহীনতা প্রমাণ করার দায়িত্ব আমাদের নয় (কারণ তারা যতক্ষণ সেগুলির বিশুদ্ধ সূত্র-পরম্পরা প্রমাণ করতে না পারবেন ততক্ষণ আমরা জানব যে, সেগুলির কোন সূত্র নেই)। তা সত্ত্বেও আমি অতিরিক্ত দাক্ষিণ্য হিসাবে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। বাইবেলের প্রত্যেক গ্রন্থের সূত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা বইয়ের কলেবর অকারণে দীর্ঘ করবে এবং পাঠককে বিরক্ত করবে। এজন্য আমি কিছু বইয়ের সূত্র-পরম্পরা সম্পর্কে আলোচনা করব। আমি মহান আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীক প্রার্থনা করছি।

১. তোরাহ বা তাওরাত (Torah or Pentateuch)

মোশি (মূসা আ.) -এর নামে প্রচারিত তাওরাহ বা তোরাহ-এর গ্রন্থগুলি যে মোশির নিজের হাতে লিখিত বা সংকলিত সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই। নিম্নের বিষয়গুলি থেকে তা জানা যায়।

প্রথম বিষয় : এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, চতুর্থ বিভ্রান্তির উত্তরে এই বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বাইবেলের গ্রন্থাবলীতে বিকৃতি ও পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব বলে খৃস্টানগণ দাবি করে থাকেন। তাদের দাবির অসারতা সেখানে আলোচনা করেছি। বিষয়টির সার-সংক্ষেপ হলো,দাউদ বংশের শাসক যোশিয়া বিন আমোন (Josiah, son of Amon) খৃস্টপূর্ব ৬৪১ সালের কাছাকাছি সময়ে ইহুদী রাজ্যের (যুডাহ প্রদেশের) শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর রাজত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাওরাতের কোন প্রসিদ্ধি বা প্রচলন পাওয়া যায় না। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের ১৮ বছর পরে তাওরাতের যে কপিটি পাওয়া গিয়েছিল তা মোটেও নির্ভরযোগ্য ছিল না। কয়েক বছর পরে খৃস্টপূর্ব ৫৮৮ বা ৫৮৬ অব্দে[১] যখন ব্যাবিলন সম্রাট নেবুকাদনেযার (Nebuchadnezzar) বা বখত নসর জেরুযালেম নগরী ও ইহুদী রাজ্য ধ্বংস করে সকল ইহুদীকে বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যান তখন এই অনির্ভরযোগ্য ও সূত্রবিহীন কপিটির প্রায় পুরোটুকুই হারিয়ে যায়।

১. বিস্তারিত দেখুন, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃষ্ঠা ৮, James Hastings,

নেবুকাদনেজারের এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তোরাহ ও পুরাতন নিয়মের পূর্বেকার সকল গ্রন্থ ভূপৃষ্ঠ থেকে একেবারেই বিলীন হয়ে যায়। ইহূদীদের ধারণা অনুযায়ী প্রায় এক শতাব্দী পরে ইয্রা পুনরায় পুরাতন নিয়মের এ সকল গ্রন্থ নিজের পক্ষ থেকে লিখেন। খৃ. পূ. ১৬৮ অব্দে সিরিয়ার গ্রীক শাসক চতুর্থ এন্টিয়ক (Antiochus Epiphanes) জেরুযালেম ও ইহূদী রাজ্য পুনরায় ধ্বংস করেন এবং সলোমনের মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে গ্রীক প্রতিমা মন্দির স্থাপন করেন।[১] এই ঘটনায় ইয্রার লেখা কপিগুলি এবং এর অধিকাংশ উদ্ধৃতি বিনষ্ট হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিষয় : ইহূদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই বলেন যে, ইয্রা (আ) হগয় ভাববাদী ও ইদ্দোর পুত্র সখরিয়, এই দুইজন ভাববাদীর সহায়তায় 'বংশাবলির প্রথম খণ্ড' (The First Book of the Chronicles), 'বংশাবলির দ্বিতীয় খণ্ড' (The Second Book of The Chronicles) গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। এই গ্রন্থদ্বয় মূলত এই তিন ভাববাদীর লেখা। অথচ এই দুই গ্রন্থের বিবরণের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। আবার এই দুই গ্রন্থের সাথে তোরাহ-এর বিবরণের বৈপরীত্য রয়েছে। বংশাবলির ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে বিন্যামীন-এর সন্তানদের বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। আবার এই দুই অধ্যায়ের বর্ণনার সাথে তোরাহ-এর প্রসিদ্ধ বর্ণনার বৈপরীত্য রয়েছে। দুই দিক থেকে এই বৈপরীত্য : প্রথমত, নামের বর্ণনায় এবং দ্বিতীয়ত, সংখ্যার বিবরণে।

বংশাবলির ৭ম অধ্যায়ের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বিন্যামীনের সন্তান তিনজন।[২] পক্ষান্তরে ৮ম অধ্যায়ের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বিন্যামীনের সন্তান পাঁচজন।[৩] অথচ তোরাহ-এর বর্ণনায় বিন্যামীনের সন্তান ১০ জন[৪]।

ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ একমত যে, বংশাবলি প্রথম খণ্ডের বর্ণনা ভুল। এই ভুলের কারণ হিসাবে তারা উল্লেখ করেন যে, ইয্রা পুত্র ও পৌত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন নি এবং যে বংশতালিকা দেখে তিনি বংশাবলির এই তালিকা লিখেছিলেন সেই মূল বংশতালিকাটি ছিল অসম্পূর্ণ।

একথা তো স্পষ্ট যে, এই তিনজন ভাববাদী তাদের নিকট প্রচলিত 'তোরাহ'-এর বর্ণনা অনুসরণ করে তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যদি মোশির (মূসা আ.) যে তোরাহ-এর উপর তাঁরা নির্ভর করেছিলেন আজকের প্রচলিত তোরাহ যদি সেই মোশির তোরাহই হতো তাহলে কোন মতেই এই তিন ভাববাদীর বর্ণনার সাথে তোরাহ-এর

১. Encyclopaedia of Religion and Ethics, Volume 7, page 449.
২. "বিন্যামীনের সন্তান- বেলা, বেখর ও যিদীয়েল, তিন জন।" ১ বংশাবলি ৭/৬।
৩. "বিন্যামীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বেলা, দ্বিতীয় অস্‌বেল, তৃতীয় অহর্হ, চতুর্থ নোহা ও পঞ্চম রাফা" ১ বংশাবলি ৮/১।
৪. "বিন্যামীনের পুত্র বেলা, বেখর, অস্‌বেল, গেরা, নামন, এহী, রোশ, মুপ্পীম, হুপ্পীম ও অর্দ"। আদিপুস্তক ৪৬/২১।

বর্ণনার বৈপরীত্য দেখা দিত না বা তাঁরা কোনভাবেই তোরাহ্-এর বিরোধিতা করতেন না। আর যদি ইয্রার সময়ে মোশির তোরাহ্-এর কোন অস্তিত্ব থাকত তাহলে তিনি কখনোই তোরাহ্ বাদ দিয়ে 'অসম্পূর্ণ বংশতালিকা'র উপর নির্ভর করতেন না।

ইহূদী-খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, ইয্রা ওহী বা ইলহামের (Divine Inspiration) মাধ্যমে তোরাহ্ নতুন করে লিখেছিলেন। যদি বর্তমান প্রচলিত তোরাহ্-ই ইয্রা লিখিত তোরাহ্ হতো তাহলে কখনোই ইয্রা লিখিত বিবরণের সাথে তোরাহ্-এর বিবরণে বৈপরীত্য থাকতো না।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, বর্তমানে বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত তোরাহ্ (পুরাতন নিয়মের প্রথম ৫টি গ্রন্থ) মোশি বা মূসা (আ) প্রদত্ত তোরাহ্ নয় এবং তা ইয্রা লিখিত তোরাহ্-ও নয়। সত্য কথা হলো, তোরাহ্ (Torah or Pentateuch) নামে প্রচলিত এই গ্রন্থগুলি তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন গল্প, কাহিনী, বর্ণনা ইত্যাদির সংকলন মাত্র। ইহূদী ধর্মগুরুগণ এ সকল প্রচলিত গল্প-কাহিনী ইত্যাদি কোন রকম বাছবিচার ও বাছাই ছাড়াই সংকলন করেছেন।

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, ইহূদী-খৃস্টানগণের মতে ভাববাদীগণ পাপ করতে পারেন। তাঁরা কবীরা গোনাহ্ বা কঠিন পাপ থেকে সংরক্ষিত নন। বংশাবলির বিবরণে উল্লিখিত ভুল থেকে আরো প্রমাণিত হলো যে, ভাববাদীগণ ধর্মীয় বিধান বা ঐশ্বরিক বাণী প্রচার, সংকলন বা লেখার ক্ষেত্রের ভুলের উর্ধ্বে নন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম উদ্দেশ্যের ১৬ প্রমাণের আলোচনায় পাঠক এ সকল বিষয় বিস্তারিত জানতে পারবেন।

তৃতীয় বিষয় : যদি কেউ যিহিস্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ৪৫শ ও ৪৬শ অধ্যায়দ্বয়ের সাথে গণনা পুস্তকের ২৮শ ও ২৯শ অধ্যায়দ্বয়ের তুলনা করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, উভয়ের মধ্যে ঐশ্বরিক বিধানাদি বর্ণনার ক্ষেত্রে স্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। একথা স্পষ্ট যে, যিহিস্কেল ভাববাদী নিজ গ্রন্থে লিখিত ঐশ্বরিক বিধানাদি বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর যুগে প্রচলিত 'তোরাহ্'-এর উপর নির্ভর করেছিলেন। যদি বর্তমান যুগে প্রচলিত তোরাহ্-ই তাঁর যুগের তোরাহ্ হতো তাহলে কখনোই তিনি ঐশ্বরিক বিধানের বর্ণনায় তোরাহ্-এর বিরোধিতা করতেন না।

তোরাহ্ বা তাওরাতের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, পিতাদের পাপের কারণে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত বংশধরদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে।[১] অথচ যিহিস্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে বলা হয়েছে : "যে প্রাণী পাপ করে, সেই

১. "কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর; আমি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানদিগের উপর বর্তাই। যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্তাই।" যাত্রাপুস্তক ২০/৫। আরো দেখুন যাত্রাপুস্তক ৩৪/৭ ও দ্বিতীয় বিবরণ ৫/৯।

মরিবে; পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না, ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না; ধার্মিকের ধার্মিকতা তাহার উপর বর্তিবে, ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার উপর বর্তিবে।"

এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাউকেই অন্যের পাপের জন্য শাস্তি প্রদান করা হবে না। আর এই হলো সত্য ও সঠিক কথা যা কুরআন কারীমেও ঘোষণা দেওয়া হয়েছে : "এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করিবে না।"[১]

চতুর্থ বিষয় : যিনি গীতসংহিতা, নহিমিয়ের পুস্তক, যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তক ও যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তক অধ্যয়ন করবেন তিনি নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারবেন যে, বর্তমান যুগে মুসলিম লেখকগণ যেভাবে পুস্তক রচনা করেন, তৎকালেও পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে সেই একই নিয়ম প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ যখন লেখক নিজের বিভিন্ন অবস্থা এবং নিজের দেখা বিভিন্ন ঘটনাদি লিপিবদ্ধ করেন তখন (উত্তম পুরুষের ব্যবহারের মাধ্যমে) এমনভাবে সেগুলি লিখেন যে, পাঠক বুঝতে পারেন, লেখক নিজের অবস্থা বা নিজের দেখা ঘটনাদি লিখছেন।

প্রচলিত 'তোরাহ' বা তাওরাতের একটি স্থান থেকেও বুঝা যায় না যে, মোশি (মূসা) নিজে এই গ্রন্থের কথাগুলি লিখেছেন বরং তোরাহ-এর ভাষা ভাব স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করে যে, 'অন্য কোন ব্যক্তি' এই গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেছেন। এই 'অন্য ব্যক্তি' ইহূদীদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন গল্প-কাহিনী ও বর্ণনাগুলি সংকলন করেছেন। সংকলক যে কথাটিকে 'ঈশ্বরের কথা'বলে মনে করেছেন সে কথার বিষয়ে বলেছেন 'ঈশ্বর/সদাপ্রভু বলেন'। আর যে কথাকে মোশির কথা বলে মনে করেছেন সে কথার বিষয়ে বলেছেন : 'মোশি বলেন'। সকল ক্ষেত্রে 'মোশির' জন্য 'নাম পুরুষ' বা 'তৃতীয় পুরুষ' ব্যবহার করেছেন। যদি এ সকল গ্রন্থ মোশির নিজের প্রণীত হতো তাহলে তিনি তাঁর নিজের ক্ষেত্রে 'উত্তম পুরুষ' ব্যবহার করতেন। কিছু না হলেও অন্তত একটি স্থানে নিজের জন্য 'উত্তম পুরুষ' ব্যবহার করতেন। কারণ 'উত্তম পুরুষ' ব্যবহার পাঠক বা শ্রোতার অতিরিক্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে।

এভাবে তোরাহ-এর গ্রন্থাবলী থেকে এক কথাটিই স্পষ্ট যে, এগুলি মোশি কর্তৃক সংকলিত বা প্রদত্ত নয়; বরং পরবর্তী যুগের কেউ এগুলি সংকলন করেছেন। এর বিপরীতে কোন শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত এই কথাটিই স্বীকৃত সত্য বলে গৃহীত হবে। কেউ যদি এর বিপরীত কোন দাবি করেন তাহলে তাকে তার দাবি প্রমাণ করতে হবে।

পঞ্চম বিষয় : 'তোরাহ' বা তাওরাতের মধ্যে এমন কতগুলি অনুচ্ছেদ ও অধ্যায় আছে যেগুলি সম্পর্কে কেউই দাবি করতে পারবেন না যে, সেগুলি মোশির বক্তব্য। কতক অনুচ্ছেদের বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, এগুলির লেখক দায়ূদ (আ)-এর

১. সূরা : ৬ আন'আম, ১৬৪ আয়াত; সূরা : ১৭ ইসরা (বনী ইস্রাঈল), ১৫ আয়াত; সূরা : ৩৫ ফাতির, ১৮ আয়াত, সূরা : ৩৯ যুমার, ৭ আয়াত; সূরা : ৫৩ : নাজম, ৩৮ আয়াত।

সমসাময়িক বা পরবর্তী কোন ব্যক্তি। তিনি কোন অবস্থাতেই দায়ূদ (আ)-এর পূর্ববর্তী হতে পারেন না। ইনশা আল্লাহ, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় 'আলোচ্য বিষয়ে' পাঠক এ সকল অনুচ্ছেদ ও অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

খৃস্টান পণ্ডিতগণ ভিত্তিহীন অনুমান ও কাল্পনিক আন্দাজের উপর নির্ভর করে বলেন, 'সম্ভবত কোন একজন ভাববাদী (নবী) এই অনুচ্ছেদ ও অধ্যায়গুলি তোরাহ-এর মধ্যে সংযুক্ত করেছিলেন।'

তাঁদের এই বক্তব্য একেবারেই ভিত্তিহীন ও প্রত্যাখ্যাত। কথাটি প্রমাণহীন ভিত্তিহীন একটি দাবি ছাড়া কিছুই নয়। কোন একজন ভাববাদীও তাঁর গ্রন্থে লিখেন নি যে, আমি তোরাহ-এর অমুক গ্রন্থের অমুক অধ্যায়ের মধ্যে অমুক অনুচ্ছেদটি সংযোজন করেছি। অনুরূপভাবে কোন একজন ভাববাদীও কোথাও লিখেন নি যে, অমুক একজন ভাববাদী এভাবে তোরাহ-এর কোথাও কিছু সংযোজিত করেছেন। এছাড়া অন্য কোন নিশ্চিত গ্রহণযোগ্য প্রমাণের মাধ্যমেও বিষয়টি প্রমাণিত হয়নি যা পাঠক দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় 'আলোচ্য বিষয়ের' মধ্যে জানতে পারবেন।

শুধু ধারণা ও অনুমান এক্ষেত্রে একেবারেই মূল্যহীন। যতক্ষণ কোন শক্তিশালী দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত না করা যাবে যে, এ সকল অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ কোন ভাববাদী কর্তৃক সংযোজিত ততক্ষণ সেগুলি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করবে যে, তোরাহ নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলি পুরোটাই মোশির পরে লিখিত এবং এর কোন অংশই মোশির নিজের লেখা নয়।

ষষ্ঠ বিষয় : 'খুলাসাতু সায়ফিল মুসলিমীন' গ্রন্থের লেখক 'বেনি এনসাইক্লোপিডিয়া'র ১০ম খণ্ড থেকে উদ্ধৃত করেছেন : "প্রখ্যাত নির্ভরযোগ্য খৃস্টান পণ্ডিত আলেকজান্ডার কীথ নতুন বাইবেলের ভূমিকায় লিখেছেন : "লুক্কায়িত প্রমাণাদির মাধ্যমে আমার কাছে তিনটি বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে : প্রথমত, প্রচলিত তোরাহ মোশির রচিত নয়। দ্বিতীয়ত, তোরাহ-এর গ্রন্থগুলি ইহূদীদের কেনানে (সিরিয়ায়) আগমনের পরে বা জেরুযালেমে আগমনের পরে লেখা হয়েছে। অর্থাৎ মোশির সময়ে, যখন ইস্রাঈল সন্তানগণ মরুভূমিতে অবস্থান করছিলেন তখন লেখা হয়নি। তৃতীয়ত, দায়ূদ[১]-এর যুগের পূর্বে (খৃস্টপূর্ব ১০ শতক) এবং হিযকিয়[২]-এর পরে (খৃস্টপূর্ব ৭ম শতক) সেগুলি লেখা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয় না বরং আমার মতে তোরাহ-এর গ্রন্থগুলি লেখা হয়েছে সলোমন (আ) এর যুগে, অর্থৎ যীশুখৃস্টের জন্মের ১০০০ বছর পূর্বে অথবা এরই নিকটবর্তী কোন সময়ে, যে সময়ে গ্রীক কবি হোমার বেঁচে ছিলেন।[৩] মূল কথা হলো, তোরাহ-এর গ্রন্থগুলি মোশির মৃত্যুর ৫০০ বছর পরে লেখা হয়েছে।

---

১. দাউদ (আ) খৃস্টপূর্ব ১০ম শতকের মানুষ। খৃস্টপূর্ব ৯৭০ সালের দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন।
২. দাউদের বংশের একজন শাসক। শাসনকাল খৃস্টপূর্ব ৭২১-৬৯৩ সাল।
৩. ইলিয়ড ও ওডেসী মহাকাব্যদ্বয়ের প্রণেতা গ্রীক মহাকবি হোমার খৃস্টপূর্ব ৮ম শতকে এশিয়া মাইনরে বাস করতেন বলে মনে করা হয়।

সপ্তম বিষয় : খৃস্টান পণ্ডিত নর্টন বলেন : "তোরাহ্ বা পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি গ্রন্থের ভাষার ব্যবহার বা বাচনভঙ্গি এবং পুরাতন নিয়মের অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি, যেগুলি ইস্রাঈল সন্তানদের ব্যবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্তির পরে লেখা সেগুলির ভাষার ব্যবহার বা বাচনভঙ্গির মধ্যে কোন গ্রহণযোগ্য পার্থক্য নেই। অথচ মোশির যুগ এবং মুক্তি পরবর্তী যুগ এই দুই যুগের মধ্যে ৯০০ বছরের ব্যবধান। অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, যুগের পরিবর্তনের ফলে ভাষার ব্যবহারের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। যেমন, আমরা যদি বর্তমান যুগের ইংরেজি ভাষার সাথে ৪০০ বছর পূর্বের ইংরেজি ভাষার তুলনা করি তাহলে উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখতে পাব। যেহেতু তোরাহ-এর ভাষা ও পরবর্তী গ্রন্থগুলির ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, সেহেতু হিব্রু ভাষায় পরিপূর্ণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত লিউসডিন মনে করেন যে, এ সকল গ্রন্থ সবই একই যুগে লেখা হয়েছে।

গ্রন্থকার বলেন, যুগের পরিবর্তনের ফলে ভাষার ব্যবহারে পরিবর্তন হওয়ার বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ ও নিশ্চিত সত্য। কাজেই নর্টনের সিদ্ধান্ত ও লিউসডিন-এর ধারণা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য।

অষ্টম বিষয় : দ্বিতীয় বিবরণের ২৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "৫ আর সে স্থানে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞবেদি, প্রস্তরের এক বেদি গাঁথিবে, তাহার উপরে লৌহাস্ত্র তুলিবে না।... ৮ আর সেই প্রস্তরের উপরে এই ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য অতি স্পষ্টরূপে লিখিবে।"

এখানে "এই ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য" বলতে পূর্ণ 'তোরাহ' বুঝানো হয়েছে। খৃস্টানদের প্রচারিত ১৮৩৯ সালে মুদ্রিত ও ১৮৪৫ সালে মুদ্রিত ফারসী বাইবেলের এখানে স্পষ্টতই বলা হয়েছে : "সেই প্রস্তরের উপর এই ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য অর্থাৎ তাওরাতকে অতি স্পষ্টরূপে লিখিবে।"

যিহোশূয়ের পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত হয়েছে যে, মোশি যেভাবে আদেশ করেছিলেন সেভাবে যিহোশূয় যজ্ঞবেদি নির্মাণ করেন এবং সেই বেদির উপরে তাওরাত লিখে রাখেন : "তৎকালে যিহোশূয় এবল পর্বতে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞবেদি নির্মাণ করিলেন। সদাপ্রভুর দাস মোশি ইস্রায়েল-সন্তানদেরকে যেমন আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তেমনি তাহারা মোশির ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত আদেশানুসারে অতক্ষিত প্রস্তরে, যাহার উপরে কেহ লৌহ উঠায় নাই, এমন প্রস্তরে ঐ যজ্ঞবেদি নির্মাণ করিল।...। আর তথায় প্রস্তরগুলির উপরে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে তিনি মোশির লিখিত ব্যবস্থার এক অনুলিপি লিখিলেন।"[১] এখানেও "মোশির লিখিত ব্যবস্থা" বলতে পূর্ণ তাওরাত বুঝানো হচ্ছে। ১৮৩৯ ও ১৮৪৫ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত বাইবেলের ফারসী সংস্করণে এখানে বলা হয়েছে : "মোশির লিখিত তাওরাতের এক অনুলিপি লিখিলেন।"[২]

---

১. যিহোশূয়ের পুস্তক ৮/৩০-৩২

২. আরবী বাইবেলেও বলা হয়েছে : "মূসার তাওরাতের একট অনুলিপি লিখিলেন।"

উপরের বিবরণ থেকে জানা গেল যে, মোশির উপর অবতীর্ণ বা মোশি লিখিত তাওরাত বা তোরাহ্-এর আকৃতি ও পরিমাণ এমন ছিল যে, একটি যজ্ঞবেদির পাথরে তা পুরোপুরি লিখে রাখা যেত। তোরাহ্ বলতে যদি বর্তমানে প্রচলিত বিশালাকৃতির ৫টি গ্রন্থ বুঝানো হতো তাহলে কোন অবস্থাতেই তা সম্ভব হতো না। এ থেকে বুঝা গেল যে, প্রচলিত তোরাহ জনশ্রুতি ও গল্পকাহিনীর ভিত্তিতে পরবর্তী যুগের মানুষদের সংকলন, যা চতুর্থ বিষয়ে আমরা উল্লেখ করেছি।

নবম বিষয় : পাদরী নর্টন বলেন : "মোশির যুগে লিপিপদ্ধতি প্রচলিত হয় নি।" গ্রন্থকার বলেন, পাদরী সাহেবের উদ্দেশ্য হলো এ দ্বারা প্রমাণ করা যে, মোশি এই ৫টি গ্রন্থ লিখেন নি। যদি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে এই কথাটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণ বলে গণ্য হবে।

লিপি, কাগজ ও বর্ণমালার উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস পাদরী নর্টনের বক্তব্যের সমর্থন করে। ১৮৫০ সালে চার্লস ডালমিন প্রেসে মুদ্রিত ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, "প্রাচীন যুগে মানুষের লোহা বা পিতলের কাটা বা হাঁড় দিয়ে সীসার পাত, কাঠ বা মোমের উপর বিভিন্ন নকশা অঙ্কনের মাধ্যমে লিখত। এরপর মিসরবাসিগণ সর্বপ্রথম প্যাপিরাসের পাতার ব্যবহার আবিষ্কার করে। এরপর বিরগামস শহরে 'ওয়াসলী' আবিষ্কৃত হয় এবং তুলা ও রেশম থেকে কাগজ তৈরি করা হয় খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে। ত্রয়োদশ খৃস্টীয় শতাব্দীতে কাপড় থেকে কাগজ বানানো হয়। খৃস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কলমের ব্যবহার চালু হয়।"

এই ঐতিহাসিকের বর্ণনা যদি খৃস্টানগণের নিকট সঠিক বলে গৃহীত হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে নর্টন সাহেবের এই বক্তব্যের সমর্থন করবে।

দশম বিষয় : প্রচলিত তোরাহ্-এর মধ্যে অনেক ভুল রয়েছে। মোশির (মূসা আ.) কথায় এই ধরনের ভুল থাকতে পারে না। যেমন আদিপুস্তকের ৪৬ অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে : "ইহারা লেয়ার সন্তান। তিনি পদ্দন- আরামে যাকোবের জন্য ইহাদিগকে এবং তাহার কন্যা দীনাকে প্রসব করেন। যাকোবের এই পুত্র কন্যারা সর্বশুদ্ধ তেত্রিশ প্রাণী।"

এখানে 'তেত্রিশ প্রাণী' কথাটি ভুল। সঠিক কথা হলো 'চৌত্রিশ প্রাণী'। প্রসিদ্ধ খৃস্টান পণ্ডিত ও বাইবেল-ভাষ্যকার মি. হার্সলী স্বীকার করেছেন যে, এই তথ্যটি ভুল। তিনি বলেন : "বাইবেলে বর্ণিত যাকোবের সন্তানদের নামগুলি গণনা করে তার সাথে কন্যা দীনার নাম যোগ করলে মোট সংখ্যা হয় ৩৪। আর দীনাকে এই গণনার মধ্যে ধরা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। (কারণ এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে 'পুত্র ও কন্যারা', আর যাকোবের নিজের একমাত্র কন্যা দীনা।) এর পরের পংক্তিতে গণনার মধ্যে যাকোবের পুত্র আশোরের কন্যা সেরহকে গণনা করা হয়েছে এবং তাকে সহ সিল্পার সন্তানদের সংখ্যা মোট ১৬ গণনা করা হয়েছে।

অনুরূপ আরেকটি ভুল কথা হলো দ্বিতীয় বিবরণের ২৩ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আয়াত, যাতে বলা হয়েছে : "জারজ ব্যক্তি সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিবে না; তাহার দশম পুরুষ পর্যন্তও সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পাইবে না।"

এই বিধানটিকে ভুল বলে গণ্য করতে হবে। নইলে এর দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, স্বয়ং দায়ূদ (আ) এবং তাঁর উর্ধ্বতন দশ পুরুষ যিহূদার পুত্র পেরস পর্যন্ত কেউই সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করতে পারবেন না। কারণ তোরাহ্-এর আদিপুস্তকের ৩৮ অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাকোবের পুত্র যিহূদা (ইয়াহূদ) নিজের আপন পুত্রবধু তামর-এর সাথে ব্যভিচার করেন এবং এই ব্যভিচারের ফলে অবৈধ জারজ সন্তান 'পেরস' এর জন্ম হয়।[১] মথিলিখিত সুসমাচার ও লূকলিখিত সুসমাচারে বর্ণিত যীশুর বংশতালিকা থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাউদ হচ্ছেন পেরস-এর দশম পুরুষ।[২]

পক্ষান্তরে গীতসংহিতার বিবরণ অনুসারে দায়ূদ হচ্ছেন সদাপ্রভুর সমাজের প্রধান এবং ঈশ্বরের প্রথম পুত্র।[৩]

অনুরূপভাবে যাত্রাপুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ৪০ আয়াতে যা বলা হয়েছে তা ভুল। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় আলোচ্য বিষয়ের প্রথম প্রমাণের আলোচনা থেকে পাঠক জানতে পারবেন যে, যাত্রাপুস্তকের এই তথ্যটি সন্দেহাতীতভাবে ভুল ও অসত্য।[৪]

'তোরাহ্'-এর ভুল তথ্যসমূহের আরেকটি বিষয় যা গণনাপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে : "স্ব স্ব পিতৃকুলানুসারে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, অর্থাৎ বিংশতি বছর ও ততোধিক বয়স্ক ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষ গণিত হইলে গণিত লোকদের সংখ্যা ছয় লক্ষ তিন সহস্র পাঁচ শত পঞ্চাশ হইল। আর লেবীয়েরা আপন পিতৃবংশানুসারে তাহাদিগের মধ্যে গণিত হইল না।"[৫]

---

১. আদিপুস্তক ৩৮/৬-৩০।

২. দেখুন, মথি : ১/১-১৭ ও লূক ৩/২৩-৩৮। এখানে উল্লেখ্য যে, নতুন নিয়মের কিং জেমস ভার্সন ও অন্যান্য সকল প্রাচীন সংস্করণ ও মুদ্রণে মথি ও লূক উভয় গ্রন্থেই দায়ূদকে পেরস-এর দশম পুরুষ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী কোন কোন আরবী, বাংলা ইত্যাদি অনুবাদে লূকলিখিত সুসমাচারে একজনের নাম অতিরিক্ত সংযোজন করে দাউদকে পেরস-এর একাদশ পুরুষ হিসাবে দেখানো হয়েছে। ইংরেজি ও বাংলা বাইবেলের তুলনা করলেই লূক ৩/৩২-৩৩ আয়াতদ্বয়ের ইংরেজি ও বাংলা মিলিয়ে দেখলেই তা বুঝা যাবে। তবে সর্বাবস্থায় মথির সুসমাচারে দাউদ পেরস-এর দশম পুরুষ।

৩. গীতসংহিতা ৮৯/২৬-২৭।

৪. যাত্রাপুস্তক ১২/৪০ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, "ইস্রায়েল-সন্তানেরা চারিশত ত্রিশ বৎসরকাল মিসরে প্রবাস করিয়াছিল।" তথ্যটি সন্দেহাতীতভাবে ভুল।

৫. গণনাপুস্তক ১/৪৫-৪৭

এই আয়াতগুলি থেকে জানা যায় যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন মোশির সাথে মিসর ত্যাগ করে তখন তাদের যুদ্ধেসক্ষম পুরুষদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ। চার শ্রেণীর মানুষ এই গণনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে :

১. লেবীয় বংশের সকল নারী, ২. লেবীয় বংশের সকল পুরুষ, ৩. অন্যান্য সকল বংশের সকল নারী এবং ৪. সকল বংশের ২০ বছরের কম বয়স্ক সকল যুবক ও কিশোর পুরুষ বাদ দিয়েই ছিল এই সংখ্যা।

তাহলে যদি এই চার প্রকারের নারী, পুরুষ ও যুবক-কিশোরদের গণনায় ধরা হয় তাহলে মিসর ত্যাগকালে তাদের সংখ্যা দাঁড়াবে কমপক্ষে অন্তত ২৫ লক্ষ। আর এই তথ্য কোনমতেই সঠিক হতে পারে না। কারণ :

প্রথমত, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন মিসরে প্রবেশ করে তখন তাদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন। আদিপুস্তকের ৪৬ অধ্যায়ের ২৭ আয়াতে, যাত্রাপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ৫ম আয়াতে, দ্বিতীয় বিবরণের ১০ অধ্যায়ের ২২ আয়াতে এই সংখ্যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় আলোচ্য বিষয়ের প্রথম প্রমাণের আলোচনা থেকে পাঠক জানতে পারবেন যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ মিসরে অবস্থান করেছিলেন সবমোট ২১৫ বছর। এর বেশি তারা অবস্থান করেন নি। যাত্রাপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মিশর ত্যাগের ৮০ বছর পূর্ব থেকে তাদের সকল পুত্র সন্তানকে হত্যা করার বিষয়। আমরা যদি পুত্র সন্তান হত্যার বিষয়টি একেবারে বাদ দিই এবং মনে করি যে, ইস্রায়েল সন্তানগণ মিসরে অবস্থানকালে তাদের জনসংখ্যা এত বেশি বৃদ্ধি পেত যে, প্রতি ২৫ বছরে তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যেত, তাহলেও তাদের সর্বমোট জনসংখ্যা ২১৫ বছরে ৭০ থেকে ৩৬০০০ (ছত্রিশ হাজার)-ও হতে পারে না। তাহলে সর্বমোট জনসংখ্যা ২৫ লক্ষ হওয়া বা লেবীয়গণ বাদে মোট পুরুষ যোদ্ধার সংখ্যা সাড়ে ছয় লক্ষ হওয়া কিভাবে সম্ভব! এর সাথে যদি শেষ ৮০ বছরের পুরুষ সন্তান হত্যার বিষয় যোগ করা হয় তাহলে বিষয়টি আরো অসম্ভব ও অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয়ত, একথা একেবারেই অসম্ভব যে, ২১৫ বছরে ইস্রায়েল সন্তানদের সংখ্যা ৭০ থেকে ২৫ লক্ষ হবে, অথচ মিসরীয়গণ, যারা আরাম-আয়েশ ও সম্পদের মধ্যে বসবাস করত তাদের সংখ্যা এভাবে বাড়বে না। অনুরূপভাবে একথাও অবিশ্বাস্য যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ এই বিশাল সংখ্যায় একই স্থানে একত্রিত বসবাস করবেন, আর মিসরীয় শাসক তাদের উপরে এরূপ অকথ্য ও অমানবিক অত্যাচার চালাবেন, অথচ এই বিশাল একত্রিত ঐক্যবদ্ধ জনগণ কোন প্রতিবাদ করবে না, বিদ্রোহ করবে না বা দেশত্যাগ করবে না। জীব-জানোয়ারেরাও তাদের সন্তানদের উপর হামলা করা হলে তা প্রতিহত করার চেষ্টা করে ও সন্তানদের রক্ষার চেষ্টা করে!

তৃতীয়ত, যাত্রাপুস্তকের ১২ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন মিসর পরিত্যাগ করে তখন তাদের সাথে ছিল গৃহপালিত পশুর বিশাল বাহিনী।[১] সাথে সাথে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকল মানুষ ও পশু একরাতের মধ্যে সমুদ্র পার হয়েছিলেন।[২] এছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইস্রায়েল সন্তানদের যাত্রার জন্য মোশির নিজের মুখের নির্দেশই যথেষ্ট ছিল (এ সকল কথা থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, মিসর ত্যাগের সময় তাদের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশি ছিল না)।

চতুর্থত, ২৫ লক্ষ মানুষ ও তাদের বিশাল পশুর বাহিনীর অবতরণ ও সমবেত হওয়ার জন্য বিশাল প্রান্তরের প্রয়োজন। সিনাই পর্বতের পার্শ্ববর্তী স্থান এবং ইলমের ১২টি ঝর্ণার পার্শ্ববর্তী স্থানের সীমিত পরিসরে এই বিশাল সংখ্যার মানুষ ও পশুপালের সংকুলান হলো কিভাবে?

পঞ্চমত, দ্বিতীয় বিবরণের ৭ অধ্যায়ের ২২ আয়াতে ইহূদীগণের হাতে ফিলিস্তীনের অধিকার প্রদানের বিষয়ে বলা হয়েছে : "আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সম্মুখ হইতে ঐ জাতিগণকে অল্পে অল্পে দূর করিবেন; তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে পারিবে না, পাছে তোমার প্রতিকূলে বন্যপশুগণ বর্দ্ধিত হয়।"

১৮৪০ সালে ফাল্টায় মুদ্রিত 'মুরশিদুত তালিবীন' গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায়, গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে লেখক উল্লেখ করেছেন যে, ফিলিস্তীনের আয়তন দৈর্ঘ্যে ২০০ মাইল এবং প্রস্থে ৯০ মাইল। মিসর থেকে বের হওয়ার সময় ইস্রায়েল সন্তানদের সংখ্যা যদি সাড়ে বাইশ লক্ষ হতো তাহলে ফিলিস্তীনের মূল অধিবাসীদের সবাইকে হত্যা করলেও ইস্রায়েল-সন্তানদের প্রতিকূলে বন্যপশু বৃদ্ধি পাওয়ার কোনরূপ সম্ভাবনা থাকতো না। কারণ এর চেয়ে অনেক কম সংখ্যক মানুষ এই আয়তনের একটি দেশ পুরোপুরি বসবাস ও আবাদ করতে সক্ষম।

ঐতিহাসিক ইবনু খালদূনও (৮০৮ হি/১৪০৫ খৃ) তাঁর ইতিহাসের ভূমিকায় এই সংখ্যার বিষয়ে আপত্তি করেছেন। কারণ (বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে) গবেষক পণ্ডিতগণ উল্লেখ করেছেন যে, মোশি ও যাকোবের মধ্যে মাত্র তিনটি প্রজন্ম অতিবাহিত হয়েছে।[৩] আর মাত্র চার প্রজন্মে জনসংখ্যা এভাবে বৃদ্ধি পাওয়া (৭০ জন থেকে ২৫ লক্ষ হওয়া) অসম্ভব।

ষষ্ঠত, যাত্রাপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে দুইজন ধাত্রী ছিল : একজনের নাম শিফ্রা ও অন্যজনের নাম পূয়া। মিসরের রাজা

১. যাত্রাপুস্তক ১২/৩৮।

২. যাত্রাপুস্তক ১২/৪২।

৩. তোরাহ-এর বর্ণনায় মোশির বংশ পরিচয় নিম্নরূপ : মোশির পিতা অম্রম (ইমরান), তাঁর পিতা কহাৎ, তাঁর পিতা লেবি, তাঁর পিতা যাকোব। যাকোব ও মোশির মধ্যে তিন পুরুষ মাত্র। দেখুন যাত্রাপুস্তক ৬/১৮, গণনাপুস্তক ৩/৯ ও ১ বংশাবলী ৬/১৮।

ফরৌণ এই দুই ইব্রীয়া ধাত্রীকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তোমরা ইব্রীয় (ইস্রায়েলী) মহিলাদের সন্তান প্রসব করানোর সময় তাদের পুত্র সন্তান হলে হত্যা করবে এবং কন্যা সন্তান হলে তাকে জীবিত রাখবে।[১] যদি ইস্রায়েলীগণের সংখ্যা এত বেশি হতো তাহলে কোন অবস্থাতেই মাত্র দুইজন ধাত্রী তাদের সকলের জন্য ধাত্রীকর্ম করতে পারতো না বরং তাদের মধ্যে শতশত ধাত্রী থাকতো।

সপ্তমত, যাত্রাপুস্তকের ৫ম অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, ইস্রায়েল সন্তানগণ প্রতিদিন ইষ্টক গঠন করত। যদি তাদের সংখ্যা এত অধিক হতো তাহলে তাদের বানানো ইস্টক দিয়ে শুধু মিসর নয়, সারা পৃথিবী বাড়িঘর বানিয়ে ভরে ফেলা যেত।

অষ্টমত, ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে লেবীয়গণ বাদেও যদি শুধু বয়স্ক যোদ্ধাদের সংখ্যা সাড়ে ছয় লাখ হতো তাহলে মিসরের রাজাকে এই বিশাল যোদ্ধা বাহিনীসম্পন্ন একটি বিশাল জাতিকে দমন ও নিপীড়নের মধ্যে রাখার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে অন্তত ৭ লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত রাখতো হতো যেন তারা কখনো বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের সাহস না পায় বা তাদের দমন করা যায়। একথা তো পরিষ্কার যে, মিসরের রাজা তো দূরের কথা, পৃথিবীর কোন একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাটের রাজধানীতেও ৭ লক্ষ সৈন্যের সার্বক্ষণিক সেনাবাহিনী প্রস্তুত করা ছিল না।

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, মিসর ত্যাগের সময় ইস্রায়েল-সন্তানদের সংখ্যা ছিল, ৭০ জন থেকে স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ২১৫ বছরে যেমন হতে পারে, যে সংখ্যাকে মিসরের কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলেই নিপীড়ন করতে পারতো, একদিনে মৌখিক আদেশ প্রদান করেই মোশি যাদেরকে নিয়ে সমুদ্র পার হতে পেরেছেন, সিনাই পর্বতের পাদদেশে এবং ইলমের সংকীর্ণ স্থানে সাথের গৃহপালিত পশুসহ যাদের স্থান সংকুলান হয়েছিল, যারা একেবারে পুরো ফিলিস্তীনের অধিকার লাভ করলে পুরো ফিলিস্তীন সংরক্ষণ করতে পারতো না, যাদের মহিলাদের ধাত্রী-কর্ম করার জন্য দুইজন ধাত্রীই যথেষ্ট ছিল, যাদের বানানো ইষ্টক দিয়ে মিসরের নির্মাণ কাজ চলতো, মিসর-রাজের স্বাভাবিক বাহিনী যাদের নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে পারতো (এতে প্রমাণিত হলো যে, তোরাহ-এ উল্লিখিত ইস্রায়েল সন্তানদের উপর্যুক্ত সংখ্যাটি ভুল)।

উপরের দশটি বিষয় প্রমাণ করে যে, ইহুদী-খৃস্টানগণের নিকট এমন কোন সূত্র বা প্রমাণ নেই, যদ্দ্বারা তারা প্রমাণ করতে পারেন যে, মোশির নামে প্রচলিত তাওরাতের পাঁচটি গ্রন্থ মোশির লিখিত বা মোশি প্রদত্ত। আর যেহেতু তারা এগুলিকে মূসার (আ) তাওরাত বলে প্রমাণ করতে পারেন নি, সেহেতু আমরা এগুলিকে তাওরাত হিসাবে স্বীকার করতে বাধ্য নই বরং আমরা এগুলির সঠিকত্ব অস্বীকার করতে পারি।

১. যাত্রাপুস্তক ১/১৫-১৬

২. যিহোশূয়ের পুস্তক (The Book of Joshua)

উপরের আলোচনা থেকে পাঠক ইস্রায়েলী ধর্মের মূল ভিত্তি তওরাত (Torah or Pentateuch) -এর অবস্থা জানতে পারলেন। এখন আমরা তাওরাতের পরেই যে গ্রন্থের স্থান সেই 'যিহোশূয়ের পুস্তক' -এর অবস্থা আলোচনা করব। প্রথমেই যে কথা উল্লেখ করা দরকার তা হলো, এখন পর্যন্ত ইহুদী-খৃস্টানগণ নিশ্চিতরূপে জানেন না যে, গ্রন্থটির লেখক কে এবং কোন্ যুগে তা লেখা হয়েছে। এই গ্রন্থটির বিষয়ে তাদের পাঁচটি মত রয়েছে :

১. গ্রেহার্ড, ডিওডিটি, হিউট, প্যাট্রিক, টামলাইন, ড. কেরি প্রমুখ বলেন যে, গ্রন্থটি (মোশির শিষ্য) যিহোশূয়ের লিখিত।
২. ড. লাইট ফিট বলেন : গ্রন্থটি (হারোণের পৌত্র) পীনহস কর্তৃক লিখিত।
৩. ক্যালভিন বলেন : গ্রন্থটি (হারোণের পুত্র, পীনহসের পিতা) ইলিয়াসর কর্তৃক প্রণীত।[১]
৪. ভ্যান্টল বলেন : গ্রন্থটি শমূয়েল কর্তৃক রচিত।
৫. হেনরী বলেন : গ্রন্থটি যিরমিয় কর্তৃক রচিত। উল্লেখ্য যে, যিহোশূয় এবং যিরমিয়র মধ্যে সময়ের ব্যবধান হলো কমবেশি প্রায় ৮৫০ বছর।[২]

তাঁদের ধর্মের একটি মূলগ্রন্থ সম্পর্কে তাদের এই ব্যাপক মতভেদ লক্ষ্য করুন। এই মতভেদই পূর্ণরূপে প্রমাণ করে যে, এই গ্রন্থটির লেখক সম্পর্কে তাঁদের নিকট কোন সূত্র নেই। প্রত্যেক গবেষক তাঁদের নিজের ধারণা ও অনুমানের উপর নির্ভর করে মতামত প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেকে পারিপার্শ্বিক কিছু নির্দেশনার উপর নির্ভর করে সম্পূর্ণ আন্দাজে ঢিল ছুড়ে বলছেন যে, অমুকই বোধহয় এই গ্রন্থের লেখক। এই আন্দাজই হলো তাঁদের একমাত্র সনদ বা সূত্র।

যদি আমরা যিহোশূয়ের পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের ৬৩ আয়াতের দিকে লক্ষ্য করি[৩] এবং শমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৬, ৭ ও ৮ আয়াতের[৪] সাথে তুলনা করি

১. পীনহস ও ইলিয়াসরের পরিচয় দেখুন : ১ বংশাবলি ৬/৩-৪।

২. যিরমিয় ভাববাদী খৃস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের মানুষ। আর মোশির শিষ্য যিহোশূয়ের সময়কাল নিয়ে ইহুদী-খৃস্টান পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মোশির মৃত্যুর পরে খৃস্টপূর্ব ১৬শ, ১৫শ বা ১৩শ শতকের তিনি ইহুদীদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। উভয়ের মধ্যে ৭, ৮ বা ৯ শতকের ব্যবধান।

৩. "পরন্তু যিহূদা-সন্তানগণ যিরূশালেম-নিবাসী যিবূষীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিতে পারিল না; যিবূষীয়েরা অদ্যপি যিহূদা-সন্তানগণের সহিত যিরূশালেমে বাস করিতেছে।" যিহোশূয় ১৫/৬৩।

৪. এই আয়াতত্রয় থেকে জানা যায় যে, ইহুদীদের দুই রাজ্যের এক রাজ্য যিহূদা রাজ্যের রাজত্ব গ্রহণের ৭ বছর ৬ মাস পরে ইহুদীদের দ্বিতীয় রাজ্য যিরূশালেমের রাজত্ব গ্রহণ করেন। এর পরেই তিনি তথায় বসবাসরত যিবূষীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে সেখানে দায়ূদ-নগর স্থাপন করেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, দাউদের যিরূশালেমের রাজত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত যিবূষীয়গণ তথায় বসবাস করছিলেন। আর উপরের আয়াতের 'অদ্যপি' থেকে বুঝা যায় যে, দাউদের এই যুদ্ধের কিছু পূর্বে যিহোশূয়ের পুস্তকটি লিখিত হয়েছিল। যিহোশূয়ের প্রায় ৫০০ বছর পরে খৃস্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীতে (খৃ. পূ. ৯৯৫ অব্দে বা তার কাছাকাছি সময়ে) দাউদ ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের রাজা নির্বাচিত হন।

তাহলে একথা বুঝা যায় যে, দায়ূদ (আ)-এর রাজ্যভার গ্রহণের ৭ম বছরের পূর্বে যিহোশূয়ের গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে। এজন্য হেনরী ওয়াসকট প্রণীত বাইবেলের ভাষ্যগ্রন্থের সংকলকগণ যিহোশূয়ের পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের ৬৩ আয়াতের ব্যাখ্যার টীকায় লিখেছেন : "এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, যিহোশূয়ের পুস্তক দাউদের রাজত্বভার গ্রহণের ৭ম বছরের পূর্বে রচিত হয়েছে।"

যিহোশূয়ের পুস্তকের ১০ অধ্যায়ের ১৩ আয়াত থেকে জানা যায় যে, এই গ্রন্থের লেখক অন্য একটি গ্রন্থ থেকে কিছু কথা উদ্ধৃত করছেন।[১] এই অজ্ঞাত পরিচয় গ্রন্থের লেখকের নাম বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদে বিভিন্নভাবে লেখা হয়েছে। কোথাও 'আল-ইয়াসির' লেখা হয়েছে, কোথাও 'ইয়াসার' লেখা হয়েছে এবং কোথাও 'ইয়াশির' লেখা হয়েছে।[২] ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে এই গ্রন্থটির নাম লেখা হয়েছে 'পূণ্যবানদের পুস্তক'। ১৮১১ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে গ্রন্থটির নাম লেখা হয়েছে : "সুপথের পুস্তক"।

যিহোশূয়ের পুস্তকে উদ্ধৃত এই পুস্তকটির অবস্থা, সেটির লেখকের পরিচিতি, রচনার সময়কাল ইত্যাদি কিছুই জানা যায় না। তবে শমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ১৮ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, এই অজ্ঞাত পরিচয় গ্রন্থের লেখক 'যাশের' দায়ূদের (আ) সমসাময়িক ছিলেন বা তাঁর পরের যুগের ছিলেন।[৩] এ থেকে বুঝা যায় যে, যিহোশূয়ের গ্রন্থের লেখক দায়ূদের পরবর্তী যুগের মানুষ ছিলেন।

সর্বাবস্থায় অধিকাংশের মতামতই আলোচনা করতে হয়। অধিকাংশ ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিত কোনরূপ দলিল-প্রমাণ ছাড়াই আন্দাজে দাবি করেন যে, যিহোশূয়ের পুস্তকটি স্বয়ং যিহোশূয় কর্তৃক প্রণীত। এজন্য অন্যদের মতামত উপেক্ষা করে এই মতটির বিষয়ে আমি বলছি যে, তাঁদের এই দাবি ভিত্তিহীন ও বাতিল। কারণ :

প্রথমত, ইতোপূর্বে তোরাহ-এর সূত্র আলোচনার সময় প্রথমেই আমরা জেনেছি যে, খৃ পূ ৬৪১ অব্দে দাউদ বংশের শাসক যোশিয়া বিন আমোন (Josiah, son of amōn)-এর রাজত্বের আগে তাওরাত ও ইহূদীদের অন্যান্য কোন গ্রন্থের কোন লিখিত পাণ্ডুলিপি ইহূদীদের নিকট রক্ষিত ছিল না।

---

১. যিহোশূয়ের পুস্তকের লেখক কথা প্রসঙ্গে বলেছেন : "এই কথা কি যাশের গ্রন্থে লিখিত নাই?" যিহোশূয় ১০/১৩ ও ২ শমূয়েল ১/১৮।

২. প্রচলিত ইংরেজি বাইবেলে Jasher এবং বাংলা বাইবেলে "যাশে" লেখা হয়েছে।

৩. "পরে দায়ূদ শৌলের ও তাঁহার পুত্র যোনাথনের বিষয়ে এই বিলাপ-গাথায় বিলাপ করিলেন; এবং যিহূদার সন্তানদিগকে এই ধনুর্গীত শিখাইতে আজ্ঞা দিলেন; দেখ তাহা যাশের গ্রন্থে লিখিত আছে।" এ থেকে বুঝা যায় যে, দায়ূদের এই কর্ম ও শিক্ষার কথাটি যাশে তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি দায়ূদের সমসাময়িক বা তাঁর পরের যুগের মানুষ না হলে দায়ূদের ঘটনা কিভাবে লিখবেন?

দ্বিতীয়ত, তোরাহ-এর সূত্রপরম্পরা আলোচনার ক্ষেত্রে যে চতুর্থ বিষয়টি উল্লেখ করেছি তা যিহোশূয়ের পুস্তকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই গ্রন্থটির ভাষা ও বর্ণনা থেকে কখনোই বুঝা যায় না যে, গ্রন্থটি যিহোশূয়ের নিজের লেখা বা নিজের বর্ণনা।

তৃতীয়ত, এই পুস্তকটির মধ্যে এমন অনেক আয়াত আছে যা কোন অবস্থাতেই যিহোশূয়ের কথা হতে পারে না বরং এই গ্রন্থের অনেক অনুচ্ছেদ নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে, এই গ্রন্থের লেখক দায়ূদের সমসাময়িক বা তাঁর পরবর্তী যুগের মানুষ। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। আর এই জাতীয় অনুচ্ছেদগুলি ইনশা-আল্লাহ দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পাঠক জানতে পারবেন।

খৃস্টান পণ্ডিতগণ ভিত্তিহীন অনুমান ও কাল্পনিক আন্দাজের উপর নির্ভর করে বলেন, 'সম্ভবত পরবর্তী কোন একজন ভাববাদী (নবী) এই অনুচ্ছেদ ও অধ্যায়গুলি যিহোশূয়ের পুস্তকের মধ্যে সংযুক্ত করেছিলেন।'

তাঁদের এই বক্তব্য একেবারেই বাতিল বা অসত্য। কথাটি প্রমাণবিহীন একটি দাবি ছাড়া কিছুই নয়; কাজেই তা গ্রহণ করার কোন উপায় নেই।

যতক্ষণ কোন শক্তিশালী দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত না করা যাবে যে, এ সকল আয়াত ও অনুচ্ছেদ পরবর্তী কোন ভাববাদী কর্তৃক সংযোজিত ততক্ষণ সেগুলি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করবে যে, যিহোশূয়ের নামে প্রচলিত এই পুস্তকটির পুরোটাই পরবর্তী যুগে লিখিত এবং এর কোন অংশই যিহোশূয়ের নিজের লেখা নয়।

চতুর্থত, যিহোশূয়ের পুস্তকের ১৩ অধ্যায়ে রয়েছে : "২৪ আর মোশি গাদ-সন্তানদের গোষ্ঠী অনুসারে গাদ বংশকে অধিকার দিয়েছিলেন। ২৫ যাশের ও যিলিয়দের সমস্ত নগর, এবং রব্বার সম্মুখস্থ অরোয়েরর পর্যন্ত অম্মোন-সন্তানদের অর্ধ দেশ তাহাদের অঞ্চল হইল।"

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বিবরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে : "যখন তুমি অম্মোন-সন্তানদের সম্মুখে উপস্থিত হও, তখন তাহাদিগকে ক্লেশ দিও না, তাহাদের সহিত বিরোধ করিও না; কারণ আমি তোমাকে অধিকারার্থে অম্মোন-সন্তানদের দেশের অংশ দিব না, কেননা আমি লোটের সন্তানদেরকে তাহা অধিকার করিতে দিয়াছি।"[১]

এই অধ্যায়েই এরপর বলা হয়েছে : "... আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু সে সমস্ত (নগর) আমাদের সম্মুখে দিলেন। কেবল অম্মোন-সন্তানদের দেশ... এবং যে কোন স্থানের বিষয়ে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই সকলের নিকটে তুমি উপস্থিত হইলে না।"[২]

---

১. দ্বিতীয় বিবরণ ২/১৯।

২. দ্বিতীয় বিবরণ ২/৩৬-৩৭।

এভাবে আমরা দুইটি পুস্তকের মধ্যে পূর্ণ বিরোধিতা ও বৈপরীত্য দেখতে পাচ্ছি।[১] ইহূদী-খৃস্টানদের দাবি অনুসারে যদি প্রচলিত তোরাহ মোশির রচিত হতো তাহলে কখনোই মোশির শিষ্য যিহোশূয় তার বিরোধিতা করতেন না এবং তাঁর নিজের উপস্থিতিতে মোশি যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন তা পাল্টে দিতেন না; বরং একথা কল্পনা করা যায় না যে, কোন একজন ভাববাদী ও ঐশ্বরিক প্রেরণা (ইলহাম) প্রাপ্ত ব্যক্তি এভাবে তোরাহ্-এর বিপরীত কোন বিধান প্রদান করবেন।

তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে, হয় প্রচলিত 'তোরাহ' মোশির রচিত গ্রন্থ নয় অথবা প্রচলিত 'যিহোশূয়ের পুস্তক' যিহোশূয়ের বা অন্য কোন ঐশ্বরিক প্রেরণা (Divine Inspiration) প্রাপ্ত ব্যক্তির রচিত নয়।

৩. বিচারকর্তৃগণের বিবরণ (The Book of Judges)

বিচার কর্তৃগণের বিবরণ নামের এই গ্রন্থটি ইহূদীদের ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে তৃতীয় গ্রন্থ বলে বিবেচিত। এই গ্রন্থটির বিষয়ে ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণের মতভেদ অত্যন্ত ব্যাপক। এর রচয়িতা এবং রচনাকাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

১. খৃস্টানদের কেউ বলেন : এর রচয়িতা (হারোণের পৌত্র) পীনহস।

২. তাঁদের কেউ বলেন : এর রচয়িতা যিহূদার রাজা হিষ্কিয় (Hezekiah)[২]

উপরের দুইটি মতানুসারে গ্রন্থটি ওহী বা ঐশ্বরিক প্রেরণা (Divine Inspiration)-এর ভিত্তিতে লেখা হয়নি (কারণ এই দুই ব্যক্তি ভাববাদী ছিলেন না)।

৩. তাদের কারো মতে এই গ্রন্থটির রচয়িতা যিরমিয়।

৪. তাদের কারো মতে এই গ্রন্থটির প্রণেতা যিহিষ্কেল।

৫. তাদের কারো মতে এই গ্রন্থটির প্রণেতা ইয্রা।

লক্ষ্যণীয় যে, ইয্রা এবং পীনহসের মধ্যে সময়ের দূরত্ব ৯০০ বছরেরও বেশি। যদি তাদের কাছে গ্রন্থটির লেখক থেকে কোনরূপ সূত্র-পরম্পরা থাকত তাহলে একটি গ্রন্থের লেখকের বিষয়ে এত উদ্ভট মতপার্থক্য দেখা দিত না।

৬. ইহূদীদের নিকট উপরের ৫টি মতের কোনটিই সঠিক নয়। তারা সম্পূর্ণ আন্দাজে ঢিল ছুড়ে বলেন যে, গ্রন্থটি রচনা করেছেন শমূয়েল।

এভাবে আমরা দেখছি যে, এই গ্রন্থটির রচয়িতা ও রচনা কাল সম্পর্কে ৬টি মত রয়েছে!

---

১. মোশি অম্মোন-সন্তানদের দেশ ইস্রায়েলীয়গণ দখল করবে না; কারণ তা লোটের সন্তানদের জন্য বরাদ্দ। আর যিহোশূয় বলছেন, অম্মোন-সন্তানদের অর্ধ দেশ ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য বরাদ্দ।

২. দায়ূদের প্রায় ৩০০ বছর পরে, খৃ. পূ. ৮ম শতাব্দীর শেষে হিষ্কিয় যিহূদা রাজ্যের রাজা ছিলেন। সে সময় ইহূদীদের ভাববাদী ছিলেন যিশাইয় (Isaiah), যাকে হিষ্কিয়র মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র পরবর্তী রাজা মনঃশি (Manasseh) হত্যা করেন। বিস্তারিত দেখুন : বাইবেল, ২ রাজাবলি ১৮-২০ অধ্যায়; ঐতিহাসিক অভিধান, পৃষ্ঠা ৮, James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, Volume 7, page 445.

৪. রূতের বিবরণ (The Book of Ruth)

রূতের বিবরণ গ্রন্থটি ইহূদীদের চতুর্থ গ্রন্থ বলে বিবেচিত। এই গ্রন্থের বিষয়েও মতভেদ রয়েছে:

১. তাদের কেউ বলেন, গ্রন্থটির রচয়িতা যিহূদার রাজা হিষ্কিয় (Hezekiah)। এই মতানুসারে গ্রন্থটি ঐশ্বরিক বা আসমানী গ্রন্থ নয় (কারণ হিষ্কিয় রাজা ছিলেন, ভাববাদী বা নবী ছিলেন না)।

২. তাদের কেউ বলেন, গ্রন্থটির রচয়িতা ইস্রা।

৩. ইহূদীগণ এবং অধিকাংশ খৃস্টান বলেন, গ্রন্থটির রচয়িতা শমূয়েল।

১৮৪৪ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত ক্যাথলিক হেরাল্ডের ৭ম খণ্ডের ২০৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে: "১৮১৯ খৃস্টাব্দে স্টারবুর্গ-এ মুদ্রিত বাইবেলের ভূমিকায় লেখা আছে যে, রূতের বিবরণটি একটি ঘরোয়া গল্প এবং যোনা ভাববাদীর পুস্তকটি (Jonah) একটি কাহিনী।" অর্থাৎ এগুলি অনির্ভরযোগ্য গল্প ও অসত্য কাহিনী।

৫. নহিমিয়ের পুস্তক (The Book of Nehemiah)

নহিমিয়ের পুস্তকের বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ খৃস্টান মনে করেন যে, গ্রন্থটি নহিমিয়ের রচিত। ইটহানসিচ, ইভানিচ, ক্রিযাসটিম ও অন্যান্য অনেক খৃস্টান পণ্ডিত বলেন যে, গ্রন্থটি ইস্রা ভাববাদী কর্তৃক রচিত। প্রথম মতানুসারে গ্রন্থটি ঐশ্বরিক গ্রন্থ বা আসমানী গ্রন্থ নয় (কারণ নহিমিয় গভর্নর ছিলেন, ভাববাদী ছিলেন না[১])।

এই পুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ১-২৬ আয়াত কোনভাবেই নহিমিয়ের লিখিত হতে পারে না।[২] এই আয়াতগুলির সাথে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের কোন সুন্দর সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এই আয়াতগুলির মধ্যে ২৪ আয়াতে পারস্য সম্রাট দারা (পারসিক দারিয়াবস) -এর উল্লেখ করা হয়েছে। পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারা পারস্যের রাজত্ব

১. খৃস্টপূর্ব ৫৮৮ বা ৫৮৬ অব্দে ব্যবিলন সম্রাট নেবুকাদনেযার (Nebuchadnezzar) জেরুযালেম নগরী ও ইহূদী রাজ্য ধ্বংস করে সকল ইহূদীকে বন্দী করে ব্যবিলনে নিয়ে যান। নির্বাসিত বন্দী ইহূদীগণের মধ্য থেকে যারা পরবর্তী ব্যবিলন রাজার প্রিয়পাত্র হতে পেরেছিলেন তাদের অন্যতম ছিলেন নহিমিয়। খৃ. পূ. ৪৪৫ সালে ব্যবিলন রাজ (Artaxerxes) নহিমিয়কে জেরুযালেমে প্রত্যাবর্তন করে বিধ্বস্ত নগরীকে পুনর্নির্মাণ করার অনুমতি প্রদান করেন। পরবর্তীতে ব্যবিলন রাজ নহিমিয়কে জেরুযালেম-এর গভর্নর নিয়োগ করেন। নহিমিয় তাঁর সমকালিন ভাববাদী ইস্রা (উযাইর আ.)-এর সহযোগিতায় ব্যবিলন থেকে ইহূদীদেরকে জেরুযালেমে ফিরিয়ে আনেন। বিস্তারিত দেখুন, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃষ্ঠা ১২-১৩, James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, Volume 7, page 453, 454.

২. এই আয়াতগুলিতে পরবর্তী যুগের কোন এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি 'দেশাধ্যক্ষ নহিমিয় ও অধ্যাপক ইস্রা যাজকের সময়ে' যে সকল যাজক ও লেবীয় বিদ্যমান ছিলেন তাদের নামের তালিকা প্রদান করেছেন। এছাড়া নহিমিয়ের এক শতক পরে পারস্য সম্রাট দারার যুগের যারা যাজক ছিলেন তাদেরও তালিকা প্রদান করেছেন।

করেন নহিমিয়ের মৃত্যুর এক শতাব্দী পরে। দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়ে পাঠক জানতে পারবেন যে, বাইবেলের ভাষ্যকারগণ সর্বদা স্বীকার করেন যে, এই আয়াতগুলি পরবর্তী যুগে সংযোজন করা হয়েছে। আরবী অনুবাদক এগুলিকে ফেলে দিয়েছেন।

৬. ইয়োবের বিবরণ (The Book of Job)

ইয়োবের (আইউব আ.) বিবরণ গ্রন্থটির অবস্থা পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির চেয়ে অনেক বেশি খারাপ। এই পুস্তকটির বিষয়ে ২৪ প্রকারের মতভেদ রয়েছে। ইহূদীদের প্রখ্যাত ধর্মগুরু পণ্ডিত রাব্বী মমানীডিয, মিকাইলস, লেকারক, স্মলার, স্টক ও অন্যান্য খৃস্টান ধর্মগুরু পণ্ডিত মনে করেন যে, ইয়োব নামে কোন নবী বা ভাববাদীর অস্তিত্ব ছিল না। এটি একটি কাল্পনিক নাম। ইয়োবের বিবরণ পুস্তকটি একটি বাতুল গল্প ও মিথ্যা কাহিনী। ৫ম খৃস্টীয় শতকের পাদরী থিয়োডর এই গ্রন্থটির অত্যন্ত নিন্দা করেছেন। প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের গুরু মার্টিন লুথার বলেন : "এই গ্রন্থটি নির্ভেজাল গালগল্প মাত্র।"

এসকল পণ্ডিতদের বিরোধীরা যারা ইয়োবের গ্রন্থটিকে ঐশ্বরিক বলে বিশ্বাস করেন, তারাও এই গ্রন্থের লেখক কে তা বলতে পারেন না। আন্দাজে ঢিল ছুড়ে তারা অনেকের নাম বলেন। তাদের এসকল আনুমানিক কথার ভিত্তিতে যদি আমরা ধরে নিই যে, গ্রন্থটি আলিহো নামক এক ব্যক্তি লিখেছেন অথবা তারই বংশের কোন ব্যক্তি লিখেছেন, অথবা আমরা যদি ধরে নিই যে, যিহূদা রাজ্যের রাজা মনঃশি (Manasseh) (খৃ. পূ ৬৯৩-৬৩৯ অব্দ) -এর সমসাময়িক কোন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি গ্রন্থটি লিখেছেন, তবে গ্রন্থটি ঐশ্বরিক বা আসমানী গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে না।

খৃস্টান পণ্ডিতদের এ সকল কথাবার্তা ও মতভেদই সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, তাঁদের নিকট এ সকল গ্রন্থের কোন সনদ বা সূত্র-পরম্পরা নেই। তাঁরা যা কিছু বলেন সবই ধারণা ও অনুমানের উপর নির্ভর করে বলেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় বিভ্রান্তির অপনোদনের আলোচনায় পাঠক এ সকল বিষয় জানতে পারবেন।

৭. দায়ূদের গীতসংহিতা (The Book of Psalms)

গীতসংহিতা বা দায়ূদের যাবূর গ্রন্থের অবস্থা ইয়োবের বিবরণের অবস্থার কাছাকাছি। কোন নির্ভরযোগ্য উৎস বা সূত্র-পরম্পরা থেকে এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি যে, গ্রন্থটির রচয়িতা অমুক। (বিভিন্ন নবীর নামে প্রচারিত) এই যাবূরগুলিকে বা গীতগুলিকে (১৫০টি গীত) কোন্ যুগে একত্রে সংকলিত করা হয়েছে তা জানা যায় না। এ সকল গীতের নামগুলি ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ কিনা তাও জানা যায় না।

প্রাচীন খৃস্টান পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থটির রচয়িতার বিষয়ে মতভেদ করেছেন। ওরিগন, ক্রীযাস্টম, এক্সটাইন, এনব্রোস, ইউথিমিস ও অন্যান্য প্রাচীন খৃস্টান পণ্ডিত দাবি করেছেন যে, পুরো গ্রন্থটিই দায়ূদ কর্তৃক রচিত। তাঁদের এই কথার প্রতিবাদ করেছেন ক্লিরী, ইটহানসিস, জিরোম, যোশেফ বিস ও অন্যান্য পণ্ডিত। হর্ন বলেন : "প্রথম মতটি

একেবারেই বাতুল ও ভুল। কোন কোন ভাষ্যকার বলেন যে, কিছু গীত ম্যাকাবিজদের যুগে[১] লেখা হয়েছে। তবে এই মতটি দুর্বল।"

দ্বিতীয় দলের মতে ত্রিশেরও অধিক গীত বা যাবূরের রচয়িতার নাম জানা যায় না। ৯০ থেকে ৯৯ পর্যন্ত দশটি গীত (যাবূর) মোশির (মূসা আ.) রচিত। ৭১টি গীত (যাবূর) দায়ূদের রচিত। ৮৮ নং গীত (যাবূর) হেমনের রচিত। ৮৯ নং গীত এথনের রচিত। ৭২ নং এবং ১২৭ নং গীত সলোমনের রচিত। তিনটি গীত (৩৯, ৬২ ও ৭৭) যিদুথূনের রচিত। ১২টি গীত (৫০ ও ৭৩-৮৩) আসফের রচিত। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এগুলির মধ্য থেকে ৭৪ নং ও ৭৯ নং গীতদ্বয় আসফের রচিত নয়। এগারটি গীত (৪২, ৪৪-৪৯, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৮) কোরহ-সন্তানদের রচিত। আবার অন্যরা বলেন যে, কোন এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি এগুলি লিখে কোরহ-সন্তানদের নামে চালিয়েছে। অন্য কিছু গীত (যাবূর) অন্য এক ব্যক্তির রচিত।

ক্যামিথ বলেন, দায়ূদ শুধু ৪৫টি যাবূর বা গীত রচনা করেছিলেন। বাকী (১০৫টি) যাবূর বা গীত অন্যদের রচিত।

প্রাচীন ইহূদী ধর্মগুরু পণ্ডিতেরা বলেন, এ সকল যাবূর বা গীতের রচয়িতা হচ্ছেন নিম্নের ব্যক্তিবর্গ : আদম, আবরাহাম, মোশি, আসফ, হেমন, যিদুথূন এবং কোরাহ-এর তিন সন্তান। দায়ূদ-এর কর্ম এক্ষেত্রে শুধু সেগুলিকে একত্রে সংকলন করা। এভাবে তাঁদের মতে দায়ূদ গীতসংহিতার রচয়িতা নন, সংকলক মাত্র।

হর্ন বলেন : "পরবর্তী যুগের ইহূদী পণ্ডিতগণ এবং সকল খৃস্টান ভাষ্যকারের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো, নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ গীতসংহিতার গীতগুলি রচনা করেন : মোশি, দায়ূদ, সলোমন, আসফ, হেমন, এথন, যিদুথূন এবং কোরাহ-এর তিন সন্তান।"

অপরদিকে গীতগুলিকে একত্রিত সংকলন করার বিষয়েও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : দায়ূদের যুগে[২] এগুলি সংকলিত হয়েছে। কেউ বলেন, যিহূদার রাজা হিষ্কিয় (Hezekiah)- এর যুগে[৩] তার কতিপয় প্রিয়পাত্র এগুলি একত্রে সংকলিত করেন। অন্য অনেকে বলেন, এগুলি বিভিন্ন যুগে সংকলিত হয়েছে।

এছাড়া যাবূরগুলি বা গীতগুলির নামের বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, এগুলি ওহী বা ঐশ্বরিক প্রেরণা (Divine Inspiration) দ্বারা প্রাপ্ত। কেউ বলেন, অ-ভাববাদী কোন একব্যক্তি এগুলির নামকরণ করেছে।

বিশেষ লক্ষণীয়

১৮৪৫ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত বাইবেলের ফারসী অনুবাদে গীতসংহিতার ৭২ নং গীতের ২০ নং আয়াত নিম্নরূপ : "যিশয়ের পুত্র দায়ূদের প্রার্থনা সকল সমাপ্ত"।[৪] আরবী

১. খৃ. পূ. দ্বিতীয় শতকের দিকে।

২. খৃ. পূ. একাদশ-দশম শতকের দিকে।

৩. দায়ূদের প্রায় ৩০০ বছর পরে, খৃ. পূ. ৮ম/৭ম শতকের দিকে।

৪. ইংরেজি King James Version-এর ১৯৮৮ সালের পুনর্মুদ্রণে রয়েছে : 20 The Prayers of David the son of Jesse are ended.

অনুবাদে এই যাবূরটি ৭১ নং যাবূর হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] এর কারণ আমি ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। উক্ত আরবী সংস্করণে এই গীত বা যাবূরের মধ্যে এই আয়াতটি নেই।[২]

সম্ভবত আরবী অনুবাদকগণ ইচ্ছাপূর্বক আয়াতটিকে ফেলে দিয়েছেন যেন পাঠক মনে করে যে, পুরো গীতসংহিতাই দায়ূদের রচিত যা প্রথম মতের অনুসারীদের দাবি।

অথবা এমনও হতে পারে যে, দ্বিতীয় দলের মানুষের যারা দাবি করেন যে, শুধু ৭১টি বা ৪৫টি যাবূর (গীত) দায়ূদের রচিত এবং বাকী গীতগুলি অন্যদের রচিত, তারা হয়ত তাদের মত প্রমাণ করার জন্য এই আয়াতটি এই স্থানে সংযোজন করে দিয়েছেন। এই দুই ব্যাখ্যার যেটিই তার গ্রহণ করুন উভয় ক্ষেত্রেই একথা প্রমাণিত হলো যে, বাইবেলকে সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃত করা হয়েছে।

৮. শলোমনের হিতোপদেশ (The Proverbs)

শলোমনের হিতোপদেশের অবস্থাও করুণ। কেউ কেউ দাবি করেন যে, এই পুস্তকটি পুরোটাই শলোমন রচনা করেন। এই দাবি বাতিল। নিম্নের বিষয়গুলি এই দাবির অসারতা প্রমাণ করে :

১. ভাষা ও উপস্থাপনাভঙ্গির পার্থক্য

২. একই অনুচ্ছেদ বা পরিচ্ছেদের বারংবার উল্লেখ

৩. এই গ্রন্থের শেষ দুই অধ্যায় : ৩০ অধ্যায়ের প্রথম আয়াত ও ৩১ অধ্যায়ের প্রথম আয়াত প্রমাণ করে যে, গ্রন্থটি শলোমনের কথা নয়।

পাঠক আয়াতদ্বয়ের বিষয়ে পরবর্তীতে জানতে পারবেন।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এই গ্রন্থটির কিছু অংশ শলোমন কর্তৃক রচিত তাহলে বাহ্যিক অবস্থার আলোকে ধরা যায় যে, শেষের এই দুইটি অধ্যায় বাদে ২৯টি অধ্যায় তাঁর রচিত।

এই ২৯টি অধ্যায়ও তাঁর যুগে লেখা হয়নি। অন্তত শেষ ৫টি অধ্যায়, অর্থাৎ ২৫ থেকে ২৯ অধ্যায় যিহূদা রাজ্যের রাজা হিষ্কিয় (Hezekiah)-এর লোকেরা লিখেছিলেন। ২৫ অধ্যায়ের ১ম আয়াতে তা স্পষ্ট করে লেখা হয়েছে। শলোমনের মৃত্যুর ৩৭৫ বছর পরে এই লিখন বা সংকলনের কর্মটি সংঘটিত হয়।

কেউ কেউ বলেন, এই পুস্তকটির প্রথম থেকে ৯টি অধ্যায় শলোমনের রচিত নয়। দ্বিতীয় বিভ্রান্তির অপনোদনে বাইবেল ভাষ্যকার আদম ক্লার্ক-এর কথা থেকে তা পাঠক জানতে পারবেন।

---

১. ১৬৭১ খৃস্টাব্দে রোমে মুদ্রিত মূল বাইবেলের ভিত্তিতে ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে উইলিয়াম ওয়াটস কর্তৃক প্রকাশিত আরবী অনুবাদে এরূপ হয়েছে।

২. পরবর্তী সময়ে মুদ্রিত আরবী বাইবেলে এই আয়াতটি কোন আয়াত নম্বর ব্যতিরেকে টীকা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা বাইবেলেও আয়াত নং সহ আয়াতটিকে টীকায় দেখানো হয়েছে।

এই গ্রন্থের অধ্যায়টি আগূরের রচিত। আর ৩১ অধ্যায়টি লমূয়েল-এর রচিত। বাইবেল ভাষ্যকারগণ গবেষণা করে এখনো জানতে পারেন নি যে, এই দুই ব্যক্তির পরিচয় কি? তারা কে ছিলেন? কোথায় ও কোন যুগে তাঁরা বসবাস করতেন? তাঁরা ভাববাদী ছিলেন কি না? এ সকল তথ্য কিছুই তাঁরা জানতে পারেন নি। তবে তাঁরা তাঁদের অভ্যাস মত আন্দাজ ও অনুমানের উপর ঢিল ছুড়েন। তাঁরা অনুমানের উপরে বলেন, এরা দুইজন ভাববাদী ছিলেন।

কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, লমূয়েল শলোমনেরই নাম। এই অনুমানটি বাতুল ও ভিত্তিহীন। হেনরী ওয়াস্কট প্রণীত বাইবেলের ভাষ্যগ্রন্থের সংকলকগণ বলেন : "লমূয়েল শলোমনের নাম, এই ধারণাটির প্রতিবাদ করেছেন হল্যান্ড। তিনি গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, তা অন্য কোন ব্যক্তির নাম। সম্ভবত তাদের (প্রাচীন ইহূদীদের) নিকট পর্যাপ্ত প্রমাণ ছিল যে, লমূয়েলের গ্রন্থ এবং আগূরের গ্রন্থ উভয় গ্রন্থ ঐশ্বরিক বা আসমানী। একথা প্রমাণিত নাহলে এই গ্রন্থদ্বয় ধর্মীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে স্থান পেত না।"

"সম্ভবত তাদের (প্রাচীন ইহূদীদের) নিকট পর্যাপ্ত প্রমাণ ছিল..." ভাষ্যকারদের এই বক্তব্য মোটেও ঠিক নয়। কারণ তাঁদের প্রাচীন মুরব্বীগণ আরো অনেক পুস্তক 'ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর' মধ্যে স্থান দিয়েছেন যেগুলি তারা নিজেরাই বাতিল করে দিয়েছেন। কাজেই কোন সূত্র বা প্রমাণ ছাড়া শুধু প্রাচীন ধর্মগুরুদের কর্মকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করার কোন উপায় তাঁদের নেই। এই পরিচ্ছেদের শেষে পাঠক তা আরো ভালভাবে জানতে পারবেন।

আদম ক্লার্ক তাঁর ভাষ্যগ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ২৫১২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "লমূয়েল বলতে শলোমনকে বুঝানো হয়েছে, একথার কোন প্রমাণ নেই। এই অধ্যায়টি শলোমনের যুগের অনেক পরে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের শুরুতে ক্যালডিয় ভাষায় যে সকল কথাবার্তা ও আলোচনা লেখা হয়েছে তা একথার বড় প্রমাণ।

৩১ অধ্যায়ের বিষয়ে তিনি বলেন : "এ কথা নিশ্চিত যে, এই অধ্যায়টি শলোমনের রচিত নয়।"

হিতোপদেশ পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ের প্রথম আয়াতটি নিম্নরূপ : "নিম্নলিখিত হিতোপদেশগুলিও শলোমনের; যিহূদা-রাজ হিষ্কিয়ের লোকেরা এগুলি লিখিয়া লন।"

১৮৩৮ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত বাইবেলের ফারসী সংস্করণে ৩০ অধ্যায়ের প্রথম আয়াতটির অনুবাদ নিম্নরূপ ; "এগুলি যাকির পুত্র আগূরের কথা, অর্থাৎ যে সকল কথা তিনি নিজে বলেছেন, ঈথীয়েলের প্রতি, বরং ঈথীয়েল ও উকলের প্রতি।" আর ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বাইবেলের ফারসী সংস্করণে কথাটি নিম্নরূপ : "এগুলি যাকির পুত্র আগূরের কথা, অর্থাৎ যে সকল কথা তিনি বর্ণনা করেছেন ঈথীয়েলের প্রতি, ঈথীয়েল ও উকলের প্রতি।"

অন্যান্য ভাষার অনুবাদও এই ফারসী অনুবাদের অনুরূপ[১]। তবে আরবী অনুবাদগুলি এর থেকে ভিন্ন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে এই আয়াতটি একেবারে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ১৮৩১ ও ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদ নিম্নরূপ : "এই কথাগুলি আলকাই-এর পুত্র আলগামিয়-এর, যে স্বপ্ন (প্রকাশিত কথা) বলেছেন সেই লোকটি যার সাথে ঈশ্বর আছেন। আর যার সাথে ঈশ্বর থাকেন তাকে সাহায্য করেন।"

এখানে আরবী অনুবাদের সাথে অন্যান্য অনুবাদের পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।[২]

৩১ অধ্যায়ের ১ম আয়াত নিম্নরূপ : "লমূয়েল রাজার কথা। তাঁহার মাতা তাঁহাকে এই ভারবাণী শিক্ষা দিয়াছিলেন।"

সম্মানিত পাঠক!

উপরের আলোচনা থেকে আপনার নিকট একথা স্পষ্ট যে, এই গ্রন্থটির সবটুকু শলোমনের রচনা বলে দাবি করার কোন উপায় নেই। অনুরূপভাবে তাঁকে এর সংকলক বলে মনে করাও সম্ভব নয়। এজন্যই অধিকাংশ খৃষ্টান স্বীকার করেন যে, হিষ্কিয়, যিশাইয়, সম্ভবত ইয্রা এবং আরো অনেক মানুষের সংকলনের একত্রিত রূপ হলো এই গ্রন্থটি।

৯. উপদেশক (Ecclesiastes or the Preacher)

উপদেশক নামের এই পুস্তকটির বিষয়েও মতভেদ ব্যাপক। কেউ কেউ বলেছেন, পুস্তকটি শলোমনের রচিত। প্রসিদ্ধ ইহূদী ধর্মবেত্তা রাব্বী কামজী বলেন : পুস্তকটি রচনা করেছেন যিশাইয়। ইহূদী তালমূদ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন ; গ্রন্থটি রচনা করেছেন রাজা হিষ্কিয়। ক্রোটিস বলেন : (শল্টীয়েলের পুত্র) সরুব্বাবিল[৩] -এর নির্দেশে তার পুত্র আবিহূদকে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে জনৈক ব্যক্তি গ্রন্থটি রচনা করেন। খৃষ্টান ধর্মবেত্তা পণ্ডিত জিহান এবং কতিপয় জার্মান পণ্ডিত বলেন : ইস্রায়েলীয়গণ ব্যবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হওয়ার পরে গ্রন্থটি রচিত হয়। যারকিল বলেন : এন্টিয়কাস ইপিফানস (Antiochus Epiphanes)-এর সময়ে গ্রন্থটি রচিত হয়। ব্যবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হওয়ার পরে ইহূদীগণ গ্রন্থটিকে ধর্মগ্রন্থাদির তালিকা থেকে বের করে দেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে আবার তা ধর্মগ্রন্থাদির মধ্যে ফিরে আসে।

---

১. বাংলা অনুবাদ : "যাকির পুত্র আগূরের কথা : ভারবানী। ঈথীয়েলের প্রতি, ঈথীয়েল ও উকলের প্রতি সেই ব্যক্তির উক্তি।"

২. পরবর্তী আরবী অনুবাদগুলি অন্যান্য অনুবাদের কাছাকাছি করা হয়েছে।

৩. ব্যবিলনের বন্দিদশা থেকে প্রত্যাবর্তন ও যিরূশালেমের পুনর্নির্মাণে ইহূদীদের অন্যতম নেতা। দেখুন বাইবেল : ইয্রা ৫/১-২, নহিমিয় ৭/৬-৭, ১২/১।

১০. শলোমনের পরমগীত (The Song of Solomon)

পরমগীত বা শলোমনের পরমগীত নামে পরিচিত গ্রন্থটির অবস্থা খুবই করুণ। খৃস্টানদের কেউ কেউ বলেন : গ্রন্থটি শলোমন অথবা তাঁর কোন সমসাময়িক ব্যক্তির রচিত। ড. কেনিকাট ও অন্য কতিপয় আধুনিক গবেষক বলেন : গ্রন্থটিকে শলোমনের রচনা বলে মনে করা একেবারেই ভুল। এই গ্রন্থটি শলোমনের মৃত্যুর অনেক পরে রচিত হয়েছে।

খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের প্রসিদ্ধ খৃস্টান পাদরী থিয়োডর এই পুস্তক ও ইয়োবের বিবরণ এই দুইটি পুস্তককে অত্যন্ত নিন্দা করেছেন। সিমন ও লী ক্লার্ক এই দুইটি গ্রন্থের বিশুদ্ধতা স্বীকার করতেন না। ওয়াস্টন বলেন : এই গ্রন্থটি অশ্লীল গানের সমষ্টি; কাজেই গ্রন্থটিকে পবিত্রগ্রন্থের মধ্য থেকে বাদ দেওয়া উচিত। আরো কিছু আধুনিক গবেষক একথা সমর্থন করেছেন। স্মিলর বলেন : স্পষ্টত বুঝা যায় যে, গ্রন্থটি জাল ও বানোয়াট। ক্যাথলিক ওয়ার্ড বলেন : ক্রাসটিলো এই পুস্তকটিকে পুরাতন নিয়ম থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন; কারণ পুস্তকটি নোংরা অপবিত্র গানের সমাহার মাত্র।"

১১. দানিয়েলের পুস্তক (The Book of Daniel)

থিয়োডোশানের গ্রীক অনুবাদে, ল্যাটিন অনুবাদে এবং রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সকল অনুবাদে দানিয়েলের পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে শিশুদের তিনটি গান রয়েছে। অনুরূপভাবে বাইবেলের এ সকল সংস্করণে দানিয়েলের পুস্তকের শেষে ১৩শ ও ১৪শ অধ্যায় রয়েছে। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় এই গান তিনটি এবং গ্রন্থটির এই দুইটি অধ্যায়কে ঐশ্বরিক গ্রন্থের অংশ বলে বিশ্বাস করেন। প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় এগুলিকে মিথ্যা ও জাল বলে গণ্য করেন। তাদের বাইবেলে এগুলি নেই।

১২. ইস্টেরের বিবরণ (The Book of Esther)

ইস্টেরের বিবরণ নামে প্রচারিত পুস্তকটির রচয়িতার নাম ও রচনাকাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। কেউ কেউ বলেন : ইয্রার যুগ থেকে শীমোনের যুগ পর্যন্ত মন্দিরের পুরোহিত-পণ্ডিতগণ গ্রন্থটি রচনা করেন। প্রথম খৃস্টীয় শতকের প্রখ্যাত ইহূদী পণ্ডিত ও দার্শনিক যিহূদীয় ফ্লোন বলেন : ব্যবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভের পরে যাজক যেশূয়ের পুত্র যোয়াকীম[১] গ্রন্থটি রচনা করেন। একস্টাইন বলেন : গ্রন্থটি ইয্রার রচিত। কেউ কেউ বলেন : গ্রন্থটি যায়ীরের পুত্র মর্দখয় নামক জনৈক ইহূদী ব্যক্তির রচিত।[২] কেউ বলেন : গ্রন্থটি মর্দখয় ও (তার চাচাতো বোন) ইস্টেরের রচিত।

ইনশা আল্লাহ, এই পুস্তকটি সম্পর্কে অবশিষ্ট আলোচনা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়ের প্রথম প্রমাণের মধ্যে পাঠক দেখতে পাবেন।

---

১. ইহূদীদের একজন পুরোহিত। দেখুন নহিমিয় ১২/১০।

২. নেবুকাদনেজার কর্তৃক বন্দিকৃত একজন ইহূদী। তিনি ব্যবিলন রাজার সাথে নিজের চাচাতো বোন ইস্টেরকে বিবাহ দেন এবং ইহূদীদের মুক্তির ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। ইস্টেরের বিবরণ পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় দেখুন।

১৩. যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তক (The Book of The Prophet Jeremiah)

যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকের ৫২ অধ্যায়টি কোন অবস্থাতেই যিরমিয় ভাববাদীর রচিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে ১০ অধ্যায়ের ১১শ আয়াতটিও যিরমিয় ভাববাদীর রচিত নয়।

প্রথমত, ৫২ অধ্যায়টি যিরমিয়ের রচিত না হওয়ার বিষয়ে নিশ্চয়তার কারণ হলো ৫১ অধ্যায়ের সর্বশেষ ৬৪ নং আয়াতের শেষে নিম্নের বাক্যটি রয়েছে :

১৮৩৮ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত ফারসী বাইবেলের ভাষা : "এখানে শেষ হলো যিরমিয়ের বাক্যাবলী।"

১৮৪৫ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত ফারসী বাইবেলের ভাষা : "এই স্থান পর্যন্ত পূর্ণ হলো যিরমিয়ের বাক্যাবলী।"

১৮৪৪ সালে মুদ্রিত আরবী বাইবেলের ভাষা : "এই পর্যন্ত যিরমিয়ের বাক্য।"[১]

দ্বিতীয়ত, ১০ অধ্যায়ের ১১ আয়াতের বিষয় হলো এই যে, এই আয়াতটি কাসডীয় ভাষায় লেখা, অথচ অবশিষ্ট পুরো গ্রন্থ হিব্রু ভাষায় লেখা। যিরমিয়র পুস্তকের ৫২ অধ্যায়টি এবং ১০ অধ্যায়ের ১১ আয়াতটি কে এই পুস্তকের মধ্যে সংযোজন করেছেন তা জানা যায় না। খৃস্টান ব্যাখ্যাকারগণ সম্পূর্ণ আন্দাজে ঢিল ছুড়ে বলেন, সম্ভবত অমুক বা তমুক এগুলি সংযোজন করেছেন।

হেনরী ওয়াস্কট প্রণীত বাইবেলের ভাষ্যগ্রন্থের সংকলকগণ উপর্যুক্ত ৫২ অধ্যায়ের বিষয়ে বলেন : "জানা যায় যে, ইয্রা অথবা অন্য কোন একজন ব্যক্তি এই অধ্যায়টি সংযোজন করেছেন যেন এই অধ্যায়ের দ্বারা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত ভবিষ্যৎবাণীগুলির বিষয়টি এবং পরবর্তী যিরমিয়ের বিলাপ পুস্তকটির বিষয় পরিষ্কার হয়।"

হর্ন তাঁর ভাষ্যগ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১৯৫ পৃষ্ঠায় বলেন : "এই অধ্যায়টি যিরমিয়ের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েলীয়গণের ব্যবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভ করে ফিলিস্তীনে প্রত্যাবর্তনের পরে সংযোজন করা হয়েছে। এজন্য ব্যবিলনের বন্দিদশার কিছু বিবরণ এই অধ্যায়ে পাওয়া যায়।"

এরপর তিনি এই খণ্ডেই বলেন : "এই ভাববাদীর সকল কথাই হিব্রু ভাষায় লিখিত। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো দশম অধ্যায়ের একাদশ আয়াত। এই আয়াতটি কাসডীয়দের ভাষায় লিখিত। পাদরী ভেনমা বলেন : এই আয়াতটি সংযোজিত।"

১৪. যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক (The Book of The Prophet Isaiah)

ক্যাথলিক কার্কর্ন ও প্রটেস্ট্যান্ট ওয়ারেন-এর মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় এবং এই বিতর্ক ১৮৫২ খৃস্টাব্দে আকবরআবাদে মুদ্রিত হয়। ক্যাথলিক কার্কর্ন এই বিতর্কের দ্বিতীয় পুস্তিকায় লিখেছেন : "প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত স্টাহেলন বলেছেন : যিশাইয়

১. বাংলা বাইবেলেও অনুরূপ রয়েছে।

ভাববাদীর পুস্তকের ৪০ অধ্যায় থেকে ৬৬ অধ্যায় পর্যন্ত অধ্যায়গুলি কোন মতেই যিশাইয় ভাববাদীর রচিত হতে পারে না।"

তাহলে দেখুন, যিশাইয়র নামে প্রচারিত ৬৬ অধ্যায়ের পুস্তকের ২৭টি অধ্যায়ই যিশাইয়র রচিত নয়।

১৫. মথিলিখিত সুসমাচার (The Gospel According To St. Matthew)

সুপ্রিয় পাঠক! এই গ্রন্থের তৃতীয় আলোচ্যের অষ্টম প্রমাণ থেকে আপনি জানতে পারবেন যে, সকল প্রাচীন খৃস্টান ধর্মবেত্তা পণ্ডিত ও অগণিত আধুনিক খৃস্টান পণ্ডিত একমত যে, মথিলিখিত সুসমাচারটি মূলত হিব্রু ভাষায় লেখা ছিল। খৃস্টান সম্প্রদায়গুলির বিকৃতির কারণে সেই মূল হিব্রু গ্রন্থটি হারিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে শুধু সেই মূল গ্রন্থটির গ্রীক অনুবাদ গ্রন্থটির প্রাচীনতম সূত্র হিসাবে বিদ্যমান। এই গ্রীক অনুবাদটিরও কোন সূত্র-পরম্পরা তাদের নিকট নেই। এমনকি, এখন পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে জানা যায়নি যে, এই গ্রীক অনুবাদটির অনুবাদক কে? প্রাচীন খৃস্টান ধর্মবেত্তা পণ্ডিত জিরোম তা স্বীকার করেছেন। অনুবাদকের নামই যখন জানা যায়নি, তখন অনুবাদকের সততা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি অবস্থা জানার আর সুযোগ কোথায়?

হ্যাঁ, খৃস্টান ধর্মগুরু পণ্ডিতগণ সম্পূর্ণ আন্দাজে ঢিল ছুড়ে বলেন যে, সম্ভবত অমুক বা তমুক হয়ত অনুবাদ করেছিলেন। এই আন্দাজ কথা বিপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অনুরূপভাবে এইরূপ প্রমাণবিহীন আন্দাজ ও অনুমানের উপর নির্ভর করে কোন পুস্তকের লেখকের নামও নির্ধারণ করা যায় না।

ভূমিকায় উল্লিখিত ৭ম বিষয়ের মধ্যে পাঠক দেখেছেন যে, মীযানুল হক গ্রন্থের লেখক তাঁর প্রমাণবিহীন উগ্রতা সত্ত্বেও এই সুসমাচারের ক্ষেত্রে এর কোন সূত্র দাবি করতে পারেন নি বরং তিনি অনুমানের উপর বলেছেন : "সম্ভবত মথি গ্রন্থটি গ্রীক ভাষায় লিখেছিলেন।" তাঁর এই প্রমাণবিহীন অনুমান একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

যেহেতু এই গ্রন্থটির মূল হারিয়ে গিয়েছে এবং প্রচলিত অনুবাদটির অনুবাদক অজ্ঞাত পরিচয়, কাজেই এই অনুবাদগ্রন্থটি মথির লিখিত সুসমাচার হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়, বরং এই অনুবাদ পুস্তকটিকে বাতিল বলে পরিত্যাগ করা উচিত।

বোয়ী ইনসাইক্লোপিডিয়ায় মথিলিখিত সুসমাচারের বিষয়ে লেখা হয়েছে : "৪১ খৃস্টাব্দে এই গ্রন্থটি হিব্রু ভাষায় অথবা সে সময়ে ফিলিস্তীনে প্রচলিত কিলদানীয় ও সিরিয় ভাষার মিশ্র ভাষারূপে লিখিত হয়। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে শুধু এর গ্রীক অনুবাদ। বর্তমানে হিব্রু ভাষায় যে মথিলিখিত সুসমাচারটি প্রচলিত তা উক্ত গ্রীক অনুবাদের অনুবাদ।"

১৬. মার্কলিখিত সুসমাচার (The Gospel According To St. Mark)

১৭. লূকলিখিত সুসমাচার (The Gospel According To St. Luke)

ক্যাথলিক ওয়ার্ড তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন : "জিরোম তাঁর চিঠিতে লিখেছেন যে, কোন কোন প্রাচীন ধর্মগুরু পণ্ডিত মার্কলিখিত সুসমাচারের শেষ অধ্যায়ের (১৬ অধ্যায়ের) বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতেন। কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিত ধর্মগুরু লূকলিখিত সুসমাচারের ২২ অধ্যায়ের কিছু আয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন। কতিপয় প্রাচীন ধর্মগুরু পণ্ডিত এই সুসমাচারের প্রথম দুইটি অধ্যায়ের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতেন। মারসিওনীয় সম্প্রদায়ের খৃস্টানগণের নিকট সংরক্ষিত বাইবেলের লূকলিখিত সুসমাচারে এই অধ্যায় দুইটি নেই।"

গবেষক পণ্ডিত নর্টন ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে বোস্টন শহরে মুদ্রিত তাঁর গ্রন্থের ৭০ পৃষ্ঠায় মার্কলিখিত সুসমাচারের বিষয়ে লিখেছেন : "এই সুসমাচারের একটি পরিচ্ছেদ সম্পর্কে যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন। পরিচ্ছেদটি হলো শেষ (১৬শ) অধ্যায়ের ৯ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত।[১] আশ্চর্য হতে হয় যে, ক্রীসবাখ বাইবেলের মূল পাঠের মধ্যে এই আয়াতগুলিকে সন্দেহভাজন বলে চিহ্নিত করেন নি; অথচ তিনি তাঁর ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক প্রমাণ পেশ করেছেন যে, এগুলি পরবর্তী যুগে সংযোজিত।" এরপর নর্টন ক্রীসবাখের প্রমাণগুলি আলোচনা করেন এবং এরপর লিখেন : এ সকল প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, মার্কলিখিত সুসমাচারের এই অংশটি সন্দেহজনক; বিশেষ করে যদি আমরা লিপিকারদের অভ্যাসটির দিকে লক্ষ্য রাখি যে, তারা কোন কথাকে গ্রন্থ থেকে বের করার চেয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতেই বেশি পারঙ্গম।

ক্রীসবাখ প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের নিকট অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। নর্টন অতদূর গ্রহণযোগ্য না হলেও ক্রীসবাখের মতামত এখানে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ।

১৮. যোহনলিখিত সুসমাচার (The Gospel According to St. John)

কোন পূর্ণ সূত্র-পরম্পরার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়নি যে, এই সুসমাচারটি যীশুর শিষ্য যোহন কর্তৃক রচিত বরং বিভিন্ন বিষয় এর বিপরীত কথাটিই প্রমাণ করে।

প্রথম বিষয় : তোরাহ-এর উৎস আলোচনার চতুর্থ বিষয়ে যে কথাটি বলেছি তা এখানেও প্রযোজ্য। তা হলো, বর্তমান যুগে মুসলিম লেখকগণ যেভাবে পুস্তক রচনা করেন, তৎকালেও পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে সেই একই নিয়ম প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ যখন লেখক নিজের বিভিন্ন অবস্থা এবং নিজের দেখা বিভিন্ন ঘটনাদি লিপিবদ্ধ করেন তখন (উত্তম পুরুষের ব্যবহারের মাধ্যমে) এমনভাবে সেগুলি লিখেন যে, পাঠক বুঝতে পারেন যে, লেখক নিজের অবস্থা বা নিজের দেখা ঘটনাদি লিখছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের

১. ১৯৫২ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত বাইবেলের RSV -এ মার্কলিখিত সুসমাচারের এই শেষ বা ১৬ তম অধ্যায়টির ১-৮ আয়াত রাখা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৯-২০ আয়াত বাদ দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীতে আবার সেগুলি সংযোজিত করা হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন, Ahmed Deedat, The Choice, Vol-2 Is the Bible God's Word? page 80-97.

তৃতীয় আলোচ্যের ৮ম প্রমাণের আলোচনায় বিষয়টি আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে লক্ষণীয় যে, যোহনলিখিত সুসমাচার পাঠ করে মোটেও বুঝা যায় না যে, যীশুর শিষ্য যোহন নিজের চোখে দেখে সে সকল বিষয় লিখছেন বরং বাহ্যত বুঝা যায় যে, পরবর্তী কোন ব্যক্তি এগুলির বর্ণনা করেছেন। 'বাহ্যত' যা বুঝা যায় তার উপরেই নির্ভর করতে হবে যতক্ষণ না এর বিপরীত কোন শক্তিশালী প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় বিষয় : যোহনলিখিত সুসমাচারের শেষে, ২১ অধ্যায়ের ২৪ আয়াতটি নিম্নরূপ : "সেই শিষ্যই এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন, এবং এই সকল বিষয় লিখিয়াছেন; আর আমরা জানি, তাঁহার সাক্ষ্য সত্য।"

এখানে আমরা দেখছি যে, সুসমাচারের লেখক শিষ্য যোহনের বিষয়ে বলছেন : 'সেই শিষ্যই এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন', 'তাঁহার সাক্ষ্য', ইত্যাদি। এভাবে তিনি যোহনের জন্য নাম পুরুষে সর্বনাম ব্যবহার করছেন। পক্ষান্তরে লেখক তাঁর নিজের জন্য উত্তম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করে বলছেন : 'আমরা জানি'[১]। এ থেকে স্পষ্টতই জানা যায় যে, এই সুসমাচারের লেখক যোহন ছাড়া অন্য কেউ। সম্ভবত এই 'অন্য ব্যক্তিটি' যোহনের লিখিত কিছু পেয়েছিলেন, অতঃপর তিনি তা নিজের পছন্দমত কমবেশি করে নিজের ভাষায় লিখেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

তৃতীয় বিষয় : দ্বিতীয় খৃষ্টীয় শতকে অনেকেই এই 'সুসমাচারটিকে' অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, এটি যোহনের লিখিত নয়। এই সময়ে আরিনূস (১৩০-২০০খৃ)[২] জীবিত ছিলেন। আরিনূস ছিলেন বোলিকার্পের (St. bolycarp, Bishop of Smyrna c. 69-155) শিষ্য। আর বোলিকার্প ছিলেন যীশু-শিষ্য যোহনের শিষ্য। যখন

---

১. এর পরের আয়াতটি (যোহন ২১/২৫) নিম্নরূপ : "যীশু আরও অনেক কর্ম করিয়াছেন। সে সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তবে আমার বোধ হয়, লিখিতে লিখিতে এত গ্রন্থ হইয়া উঠে যে, জগতেও তাহা ধরে না।" এই দুই আয়াতের মাধ্যম এই সুসমাচারের ইতি টানা হয়েছে। এখানে এই আয়াতের 'আমার' (I) ও উপরের আয়াতের 'আমরা' (We) এর সাথে সেই শিষ্য... তাহার.. ইত্যাদির তুলনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, সেই শিষ্য বলতে যোহনকে বুঝানো হয়েছে। যোহনের কথার ভিত্তিতে অন্য কেউ এই গসপেল বা সুসমাচারটি রচনা করেছেন এবং সুসমাচারের শেষে বিষয়টি বর্ণনা করে এর ইতি টেনেছেন।

২. (Irenaeus) দ্বিতীয় খৃষ্টীয় শতকের প্রখ্যাত খৃস্টান। তিনিই সর্বপ্রথম খৃস্টধর্মকে একটি কেতাবী ধর্ম হিসাবে রূপ দানের চেষ্টা করেন। এর পূর্বে খৃষ্ট ধর্মপ্রচারক ও ধর্মগুরুগণ মূলত ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ বা পুরাতন নিয়মের গ্রন্থগুলিকেই নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থরূপে মেনে চলতেন। যীশুর শিক্ষা মৌখিক প্রচার করা হতো, যদিও কিছু কিছু শিক্ষা, গসপেল, চিঠি ইত্যাদি তাদের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত ছিল। তিনিই প্রথম ২০০ খৃস্টাব্দের দিকে প্রথম তিনটি গসপেলের (মথি, মার্ক ও লূক) কথা উল্লেখ করেন। সর্বপ্রথম তাঁর কথা থেকেই এই তিনটি গসপেলের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এরপর ২১৬ খৃস্টাব্দে ক্লিমেন্ট ইসকান্দ্রিয়ানূস (Clement of Alexandira) এই তিনটি গসপেলের কথা উল্লেখ করেছেন। দেখুন : Oxford Illustrated History of Christianity, New York, Oxford University Press, 1990, page 30-31. তারিখ কানীসাতিল মাসীহ, পৃষ্ঠা ৪৫।

মানুষেরা যোহনের নামে প্রচারিত এই সুসমাচারটি অস্বীকার করছিলেন তখন তিনি একটিবারের জন্যও বলেন নি যে, আমি আমার গুরু বোলিকার্পকে বলতে শুনেছি যে, এই সুসমাচারটি তার গুরু যোহনের রচিত।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যীশু শিষ্য যোহন যদি কোন 'সুসমাচার' লিখে থাকতেন তাহলে তাঁর শিষ্য বোলিকার্প তা জানতেন এবং আরিনূসকে বলতেন।

একথা কল্পনা করা যায় না যে, আরিনূস তাঁর গুরু বোলিকার্প থেকে বিভিন্ন অতি সাধারণ বিষয় বারংবার শুনবেন এবং উদ্ধৃত করবেন, অথচ সুসমাচার-এর মত এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটিবারও শুনবেন না।

আবার একথা কল্পনা করা আরো বেশি অসম্ভব যে, আরিনূস তাঁর গুরু থেকে যোহনের সুসমাচারের বিষয়ে শুনেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি তা ভুলে যান। ফলে যখন পুস্তকটি নিয়ে আপত্তি উঠে তখন তিনি কিছু বলতে পারেন নি। কারণ আমরা জানি, আরিনূস মৌখিক বর্ণনাকে গুরুত্ব প্রদান করতেন এবং যা শুনতেন তা ভালভাবে মুখস্থ রাখতেন।

ঐতিহাসিক যোসিবিস ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের ৫ম পুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ২১৯ পৃষ্ঠায় মৌখিক শ্রুতি ও বর্ণনার বিষয়ে আরিনূসের নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন : "ঈশ্বরের কৃপায় আমি এ সকল কথা পূর্ণ গুরুত্ব সহকারে শ্রবণ করেছি এবং সেগুলিকে আমি কাগজে নয়, বরং আমার হৃদয়ের মধ্যে লিখে নিয়েছি। আর পুরানো দিন থেকেই আমার অভ্যাস হলো, আমি সর্বদা হৃদয়ে লিখিত কথাগুলি পাঠ করে থাকি।"[১]

সর্বোপরি একথাও কল্পনা করা যায় না যে, আরিনূস সুসমাচারটি সম্পর্কে জেনেছিলেন এবং বিষয়টি তাঁর মনেও ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বিতর্কের সময় সুসমাচারটির পক্ষে কিছু বলেন নি।

এই আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারছি যে, খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকেই অনেকে যোহনলিখিত সুসমাচারটি অস্বীকার করছেন। যারা এই গ্রন্থটি বিশুদ্ধ ও শিষ্য যোহনের লিখিত বলে দাবি করছেন তারা এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি। তাহলে আমরা কেবল প্রথম পুস্তকটির বিশুদ্ধতা অস্বীকার করছি না।

দ্বিতীয় বিভ্রান্তির উত্তরে পাঠক জানতে পারবেন যে, দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের একজন পৌত্তলিক পণ্ডিত ছিলেন সেলসাস। তিনি সেই সময়েই চিৎকার করে বলতেন যে, খৃস্টানগণ তাদের ইঞ্জিলগুলি তিনবার বা চারবার বা তারও বেশিবার কঠিনভাবে পরিবর্তন করেছে, এমনকি সেগুলির বিষয়বস্তুও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। পাঠক আরো জানতে পারবেন যে, 'মানীকীয়' সম্প্রদায়ের অস্ত্রীয় পণ্ডিত ফাস্টিস চতুর্থ শতকে চিৎকার করে

১. Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, page 203-205.

ঘোষণা করেছেন : "একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, নতুন নিয়ম যীশু খৃষ্ট লিখেন নি এবং তাঁর শিষ্যগণও লিখেন নি বরং কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তা লিখেছে এবং সেগুলিকে যীশুর শিষ্যগণ এবং তাঁদের সহচরদের নামে চালিয়েছে। কারণ সে ভয় পেয়েছিল যে, যে যীশুর সময়কালীন যে সকল ঘটনা সে লিখেছে সেগুলি সে প্রত্যক্ষ করেনি। এজন্য মানুষেরা তার লেখা গ্রন্থ গ্রহণ করবে না। এই জালিয়াতি কর্মের মাধ্যমে সে যীশুর অনুসারীদেরকে অত্যন্ত কঠিনভাবে কষ্ট দিয়েছে। কারণ সে অগণিত ভুল ও বৈপরীত্যে ভরা কিছু বই লিখেছে।"

চতুর্থ বিষয় : ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ক্যাথলিক হেরাল্ডের ৭ম খণ্ডের ২০৫ পৃষ্ঠায় আছে : "স্টাডলিন তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আলেকজান্দ্রীয় স্কুলের একজন ছাত্র যোহনলিখিত সুসমাচারটি লিখেছে।"

তাহলে দেখুন, স্টাড্লিন কিভাবে ঘোষণা করছেন যে, এই সুসমাচারটি যোহনের রচিত নয়; বরং অনেক পরের যুগের আলেকজান্দ্রীয় স্কুলের একজন ছাত্রের রচিত।

পঞ্চম বিষয় : পণ্ডিত ব্রিটিশনিডার বলেছেন : "এই সুসমাচারটির কোন কিছু এবং যোহনের নামে প্রচলিত পত্রগুলি যোহনের নিজের রচিত নয়; বরং দ্বিতীয় শতকের শুরুতে কোন একজন তা রচনা করেছে।"

ষষ্ঠ বিষয় : প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ক্রোটিস বলেছেন : "এই সুসমাচারটি ছিল ২০ অধ্যায়। যোহনের মৃত্যুর পরে অফসিস চার্চের পক্ষ থেকে এতে ২১ অধ্যায়টি সংযুক্ত করা হয়।"

সপ্তম বিষয় : দ্বিতীয় শতকে বিদ্যমান 'এ্যালোগিন' নামক খৃষ্টীয় সম্প্রদায় এই সুসমাচারটি এবং যোহনের নামে প্রচলিত পত্রগুলি মানতেন না এবং এগুলিকে বাইবেলের অংশ মনে করতেন না।

অষ্টম বিষয় : দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আলোচ্যে পাঠক জানতে পারবেন যে, এই সুসমাচারের ৮ম অধ্যায়ের প্রথম ১১ আয়াতকে অধিকাংশ খৃস্টান ধর্মগুরু পণ্ডিত বাইবেলের অংশ হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। পাঠক শীঘ্রই আরো জানতে পারবেন যে, বাইবেলের প্রাচীন সিরিয় ভাষার অনুবাদে এই আয়াতগুলির অস্তিত্ব নেই।[১]

উপরের বিষয়গুলি থেকে একথা স্পষ্ট যে, খৃস্টানগণের নিকট যদি এই সুসমাচারের কোন মূল পাণ্ডুলিপি বা সূত্রপরম্পরা রক্ষিত থাকত তাহলে কখনোই তাদের গবেষক পণ্ডিতগণ ও তাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় এসকল কথা বলতেন না বা এত মতভেদ করতেন

১. খৃস্টান ধর্মগুরু পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, খৃস্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়ম তৎকালীন প্রাচীন সিরীয় (সুরিয়ানী) ভাষায় অনুবাদ করা হয়। লেবানন, সিরিয়া ইত্যাদি দেশে বসবাসরত খৃস্টানগণের মধ্যে বাইবেলের এই প্রাচীন সিরীয় সংস্করণ এখনো প্রচলিত। এই বাইবেলে যোহনলিখিত সুসমাচারের এই অংশ অবিদ্যমান। এছাড়া যিহূদার পত্র, পিতরের দ্বিতীয় পত্র, যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র, যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য ইত্যাদি গ্রন্থের কোন অস্তিত্ব এই বাইবেলে নেই।

না। এজন্য এই সুসমাচারের বিষয়ে পণ্ডিত স্টাডলিন ও পণ্ডিত ব্রিটশনিডার যা বলেছেন তাই হলো সঠিক কথা।

নবম বিষয় : উপর্যুক্ত সুসমাচার চতুষ্টয়ের রচনাকাল সম্পর্কেও ভিত্তিহীন ও সূত্রহীন অনেক দুর্বল ও বাতুল কথাবার্তা খৃস্টান পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত। এসকল পরস্পরবিরোধী অগণিত কথাবার্তা একটি কথাই প্রমাণ করে তা হলো, এই গ্রন্থগুলি রচনার সময়কাল সম্পর্কে তাঁদের নিকট কোন স্পষ্ট তথ্য বা সূত্র নেই।

বাইবেল ভাষ্যকার হর্ন ১৮২২ সালে মুদ্রিত তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের দ্বিতীয় অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন : "প্রাচীন চার্চের বা খৃস্টধর্মের ঐতিহাসিকগণের পক্ষ থেকে সুসমাচারগুলির রচনার সময় ও অবস্থা সম্পর্কে যে সকল তথ্য আমরা পেয়েছি সেগুলি অনির্ধারিত ও অসম্পূর্ণ। এ সকল মতামত ও বক্তব্য আমাদেরকে কোন একটি নির্ধারিত সিদ্ধান্তে পৌছাতে দেয় না। প্রথম যুগের ধর্মগুরু পণ্ডিতগণ বানোয়াট, বাতুল বা দুর্বল বর্ণনাগুলিকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছেন এবং লিখে রেখেছেন। তাঁদের পরে যারা এসেছেন তারা পূর্ববর্তীদের প্রতি ভক্তির কারণে এসকল বাতুল বিবরণগুলিকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। এ সকল সত্য ও মিথ্যা বিবরণ এক লেখক থেকে অন্য লেখক গ্রহণ করেছেন। এখন বর্তমান যুগে এগুলির মধ্য থেকে সঠিক তথ্য বাছাই করার কোন সুযোগ আর নেই।"

অতঃপর তিনি এই খণ্ডেই বলেন : "প্রথম (মথিলিখিত) সুসমাচারটি ৩৭ অথবা ৩৮ অথবা ৪১ অথবা ৪৩ অথবা ৪৮ অথবা ৬১ অথবা ৬২ অথবা ৬৩ অথবা ৬৪ খৃস্টাব্দে রচিত হয়েছে।

"দ্বিতীয় (মার্কলিখিত) সুসমাচারটি ৫৬ অথবা তার পরে ৬৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রচিত হয়েছে। যতদূর মনে হয়, গ্রন্থটি ৬০ খৃস্টাব্দে অথবা ৬৩ খৃস্টাব্দে রচনা করা হয়েছে।

"তৃতীয় (লূকলিখিত) সুসমাচারটি ৫৩ অথবা ৬৩ অথবা ৬৪ খৃস্টাব্দে রচিত হয়েছে। চতুর্থ (যোহনলিখিত) সুসমাচারটি ৬৮ অথবা ৬৯ অথবা ৭০ অথবা ৯৭ অথবা ৯৮ খৃস্টাব্দে রচিত হয়েছে।"

১৯. নতুন নিয়মের বিভিন্ন পত্র

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র, পিতরের দ্বিতীয় পত্র, যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র, যাকোবের পত্র, যিহূদার পত্র, যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য এবং যোহনের প্রথম পত্রের কিছু অনুচ্ছেদ যীশুর এ সকল শিষ্যের রচিত বলে দাবি করার কোন প্রকারের ভিত্তি বা প্রমাণ নেই। খৃস্টানগণ নিজেরাই এগুলিকে সন্দেহজনক বলে গণ্য করতেন ৩৬৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এবং এ সকল পত্রের কিছু কিছু অনুচ্ছেদ এখনো পর্যন্ত অধিকাংশ খৃস্টান ধর্মবেত্তা গবেষক পণ্ডিতের নিকট ভুল ও বানোয়াট বলে গণ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আলোচ্যে পাঠক এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন। বাইবেলের প্রাচীন

সিরীয় ভাষার অনুবাদে এ সকল পত্রের কোন অস্তিত্ব নেই। এছাড়া আরব দেশগুলির সকল প্রাচীন খৃস্টান সম্প্রদায় পিতরের দ্বিতীয় পত্র, যোহনের পত্রদ্বয়, যিহূদার পত্র এবং যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য এই গ্রন্থগুলিকে বাতিল বলে গণ্য করেছেন। সিরীয় খৃস্টান চার্চ এখন পর্যন্ত এ সকল পত্র ও পুস্তিকা বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি থেকে এ সকল বিষয় পাঠক বুঝতে পারবেন।

বাইবেল ভাষ্যকার হর্ন ১৮২২ সালে মুদ্রিত তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২০৬ ও ২০৭ পৃষ্ঠায় বলেন : "বাইবেলের প্রাচীন সিরীয় ভাষার অনুবাদে পিতরের দ্বিতীয় পত্র, যিহূদার পত্র, যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র, যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য, যোহনলিখিত সুসমাচারের ৮ম অধ্যায়ের ২য় আয়াত থেকে ১১শ আয়াত পর্যন্ত অংশের এবং যোহনের প্রথম পত্রের ৫ম অধ্যায়ের ৭ম আয়াতটির কোন অস্তিত্ব নেই।"

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রাচীন সিরীয় ভাষার অনুবাদকগণ বাইবেলের এ সকল অংশকে অনির্ভরযোগ্য ও অশুদ্ধ হওয়ার কারণে সেগুলিকে অনুবাদ থেকে বাদ দিয়েছেন।

ক্যাথলিক ওয়ার্ড ১৮৪১ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত তাঁর গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় বলেন : "প্রটেস্ট্যান্টদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রজার্স তাঁর সম্প্রদায়ের অনেক পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করেছেন যারা নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে বিশ্বাস করার কারণে পবিত্র বাইবেল থেকে বের করে দিয়েছেন। গ্রন্থগুলি হলো : ইব্রীয়দের প্রতি(পৌলের) পত্র, যাকোবের পত্র, যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র, যিহূদার পত্র এবং যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য।

"প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত ড. উইলসন বলেন : (চতুর্থ শতাব্দীর প্রসিদ্ধতম খৃস্টান ধর্মগুরু ও ঐতিহাসিক) যোসিবিসের বা ইউসেবিয়াস (Eusebius) যুগ পর্যন্ত নতুন নিয়মের সকল পুস্তক গ্রহণযোগ্য হিসাবে স্বীকৃত ছিল না। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দাবি করেন যে, যাকোবের পত্র, যিহূদার পত্র, পিতরের দ্বিতীয় পত্র ও যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র যীশুর এ সকল শিষ্যের রচিত নয়। ইব্রীয়দের প্রতি পত্রটি দীর্ঘসময় পর্যন্ত অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য ছিল। প্রাচীন সিরীয় চার্চগুলি কখনোই স্বীকার করেন নি যে, পিতরের দ্বিতীয় পত্র, যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র, যিহূদার পত্র এবং যোহনের প্রতি প্রকাশিত বাক্য গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ। অনুরূপভাবে আরবীয় চার্চগুলিও এ সকল গ্রন্থ অস্বীকার করেন। তবে আমরা সেগুলিকে স্বীকার করি।"

লার্যার তাঁর বাইবেল-ভাষ্যগ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ১৭৫ পৃষ্ঠায় বলেন : "সার্ল ও তাঁর যুগের যিরুশালেমের চার্চ 'যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য' গ্রন্থটিকে বাইবেলের গ্রন্থ বলে স্বীকার করতেন না। বাইবেলের গ্রন্থাবলীর যে তালিকা তিনি লিখে গেছেন তাতে এই গ্রন্থটির উল্লেখ নেই।"

অতঃপর ৩২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "প্রাচীন সিরীয় ভাষার অনুবাদে 'যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য' গ্রন্থটির অস্তিত্ব নেই। (বাইবেলের প্রাচীন ভাষ্যকার) বারহি বরিয়ুস ও যাকোব এই গ্রন্থটির কোন ব্যাখ্যা লিখেন নি। বিদাগসু তাঁর বাইবেলের গ্রন্থ-তালিকার

মধ্যে পিতরের দ্বিতীয় পত্র, যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র, যিহূদার পত্র, যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য-এই পাঁচটি গ্রন্থের উল্লেখ করেন নি। প্রাচীন সিরীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অন্যান্য পণ্ডিতও এই মত পোষণ করেন।

১৮৪৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত ক্যাথলিক হেরাল্ড-এর ৭ম খণ্ডের ২০৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "রোয তাঁর গ্রন্থের ১৬১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, অনেক গবেষক প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত ধর্মবেত্তা 'যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য' গ্রন্থটিকে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করেন না। প্রবরা যোয়াল্ড অত্যন্ত শক্তিশালী সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, যোহনের নামে প্রচারিত সুসমসাচার, পত্রাবলী এবং প্রকাশিত বাক্য কোন অবস্থাতেই একই ব্যক্তির রচিত হতে পারে না।"

(চতুর্থ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু পণ্ডিত) ইউসেবিয়াস (Eusebius) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের ৭ম গ্রন্থের ২৫ অধ্যায়ে বলেন : "ডিওনিসীস (Dionysius) বলেন: কোন কোন প্রাচীন ধর্মগুরু 'যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য' গ্রন্থটিকে পবিত্র বাইবেলের গ্রন্থাবলী থেকে বের করে দিয়েছেন এবং এই গ্রন্থটির অপ্রামাণ্যতা প্রমাণ করতে অনেক পরিশ্রম করেছেন।

"তিনি বলেছেন : এগুলি সবই অর্থহীন। গ্রন্থটির জালিয়াতি বা অপ্রামাণ্যতা অনুধাবনের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা হলো অজ্ঞতা ও বুদ্ধিহীনতা। গ্রন্থটিকে যীশুশিষ্য যোহনের রচনা বলে মনে করা ভুল। এই গ্রন্থের রচয়িতা যীশুর শিষ্য তো নয়ই নয়, কোন সৎ মানুষও নয়, এমনকি কোন খৃস্টানও নয় বরং সেরিনথাস (Cerinthus) নামক এক অবিশ্বাসী ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি গ্রন্থটিকে যোহনের নামে চালিয়েছে। কিন্তু আমি গ্রন্থটিকে বাইবেলের গ্রন্থাবলী থেকে বের করে দিতে পারছি না; কারণ অনেক ভাই গ্রন্থটিকে ভক্তি করেন। আমি নিজে মনে করি যে, এই গ্রন্থটি কোন একজন ঐশ্বরিক প্রেরণাপ্রাপ্ত ব্যক্তির রচিত। তবে সেই ব্যক্তিটি সিবদিয়ের পুত্র, যাকোবের ভাই সুসমাচার লেখক যীশু-শিষ্য যোহন বলে আমি সহজে মানতে পারছি না, বরং গ্রন্থটির আলোচনা ও বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, এর লেখক যীশুশিষ্য যোহন নন।

'প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ' গ্রন্থের মধ্যে অন্য যে যোহনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে[১] এই গ্রন্থের লেখক সেই যোহনও নয়। কারণ এই যোহন এশিয়ায়[২] আগমন

---

১. এই যোহন যীশুর শিষ্য ছিলেন না, বরং যীশু-শিষ্যদের সহচর ছিলেন। তাকে মার্ক নামেও ডাকা হতো। দেখুন : প্রেরিত ১২/১২, ২৫, ১৩/৫, ১৩, ১৫/৩৭।

২. বাইবেলের নতুন নিয়মের বিভিন্ন পত্রে 'এশিয়া' বলতে এশিয়া মাইনর বা তুরস্কের এশীয় অংশে ইজিয়ান সাগরের পূর্বতীরের রোমান অঞ্চল বুঝানো হতো। এই এলাকার প্রধান শহর ছিল ইফেসাস (Ephesus)। এ ছিল প্রথম কয়েক শতাব্দী যাবত 'পূর্বাঞ্চলীয় খৃস্টানগণের' একটি বড় কেন্দ্র। বাইবেল-গবেষকগণ বলেন যে, যোহনলিখিত সুসমাচার ও যোহনের নামে প্রচারিত পত্রাবলী এই এশিয় অঞ্চলে বা ইফেসাস শহরে বসে প্রথম শতাব্দীর শেষে বা তারও পরে লেখা হয়েছিল। দেখুন : The New Encyclopaedia Britannica, Vol-2, page 955 (Biblical Literature).

করেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি বরং প্রকাশিত বাক্যের রচয়িতা এশিয়া নিবাসী অন্য আরেক যোহন। ইফেসাস (Ephesus) শহরে দুইটি কবর আছে, যে দুইটিতেই যোহনের নাম লেখা আছে।

"ভাষা ও বিষয়বস্তুর তুলনামূলক আলোচনা থেকে জানা যায় যে, সুসমাচার রচয়িতা যোহন এই 'প্রকাশিত বাক্য' গ্রন্থের রচয়িতা যোহন নন। কারণ সুসমাচার গ্রন্থ এবং যোহনের পত্র সুন্দর ও সহজ গ্রীক ভাষায় রচিত। এর মধ্যে কোন কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। পক্ষান্তরে 'প্রকাশিত বাক্য' গ্রন্থের ভাষা প্রচলিত গ্রীক ভাষা-পদ্ধতির বিপরীত। এই গ্রন্থের লেখক কঠিন গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করেছেন।

"অপরদিকে সুসমাচারের মধ্যে এবং যোহনের অন্যান্য পত্রের মধ্যে যীশুশিষ্য যোহনের নিজের নামের ব্যবহার খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজের কথা বলতে নাম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করেছেন বা উত্তম পুরুষের ব্যবহার করেছেন। এ সকল গ্রন্থের রচয়িতা কোন ভূমিকা ছাড়াই মূল বক্তব্য শুরু করেছেন।

"পক্ষান্তরে 'প্রকাশিত বাক্য' গ্রন্থের রচয়িতা যোহন নামক ব্যক্তি বিভিন্ন স্থানে নিজের নাম বারংবার লিখেছেন। প্রথম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন : "১ যীশু খৃস্টের প্রকাশিত বাক্য, ঈশ্বর যাহা তাঁহাকে দান করিলেন, যেন তিনি, যাহা যাহা শীঘ্র ঘটিবে, সেই সকল আপন দাসগণকে দেখাইয়া দেন; আর তিনি নিজের দূত প্রেরণ করিয়া আপন দাস যোহনকে তাহা জ্ঞাত করিলেন।... ৪ যোহন- এশিয়ায় স্থিত সপ্ত মণ্ডলীর সমীপে...। ৯ আমি যোহন, তোমাদের ভ্রাতা এবং যীশু সম্বন্ধীয় ক্লেশভোগের রাজ্যে ও ধৈর্যে তোমাদের সহভাগী...।" ২২ অধ্যায়ের ৮ আয়াতে লিখেছেন : "আমি যোহন এই সমস্ত দেখিলাম ও শুনিলাম।"

"এভাবে 'প্রকাশিত বাক্যের' লেখক এ সকল আয়াতে বারংবার নিজের নাম প্রকাশ করেছেন। অথচ সুসমাচারের লেখকের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। একথা বলার অবকাশ নেই যে, যীশু-শিষ্য যোহনই তাঁর নিজস্ব রীতি অনুসরণ না করে গ্রন্থকারের নাম প্রকাশের জন্য এই গ্রন্থে বারংবার তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন।

"এ কথা বলার অবকাশ এই জন্য নেই যে, যদি এই গ্রন্থের লেখক যীশু শিষ্য যোহন হতেন এবং গ্রন্থটি তাঁর নিজের লেখা বলে নিশ্চিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য হতো তাহলে তিনি তাঁর নামের সাথে পরিচয়ও লিখতেন। যে কথা লিখলে নিশ্চিতভাবে তাঁকেই চেনা যায় সে কথা তিনি লিখতেন। এক্ষেত্রে তিনি লিখতেন : "আমি সিবদিয়ের পুত্র, যাকোবের ভাই যোহন..."। অথবা লিখতেন : "আমি প্রভুর প্রিয়শিষ্য যোহন..."।

"কিন্তু আমরা দেখছি যে, 'প্রকাশিত বাক্যের' যোহন নামীয় লেখক নিজের পরিচয় সম্পর্কে অনেক 'সাধারণ গুণাবলী' উল্লেখ করছেন, অথচ এইরূপ কোন বিশেষ পরিচয় লিখছেন না। যেমন তিনি লিখছেন : "আমি যোহন, তোমাদের ভ্রাতা এবং যীশু সম্বন্ধীয়

ক্লেশভোগের রাজ্যে ও ধৈর্যে তোমাদের সহভাগী... ।" তিনি এত কথা লিখলেন, অথচ যে পরিচয় দিলে সহজেই তাঁকে চেনা যেত তা লিখলেন না।

"আমি এ সকল কথা বিদ্রূপ করার জন্য লিখছি না। শুধু যীশু-শিষ্য যোহন লিখিত গ্রন্থাদির লেখকের ভাষা ও পদ্ধতির সাথে 'প্রকাশিত বাক্য' গ্রন্থটির লেখকের ভাষা ও পদ্ধতির পার্থক্য তুলে ধরতে চাচ্ছি।"

এ হলো ডিওনিসীস-এর বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ যা যূসীবিসের ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত করা হলো।[১]

যূসীবিস বা ইউসেবিয়াস তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের ৩য় গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়ে লিখেছেন: "পিতরের প্রথম পত্রটি সত্য। তবে পিতরের দ্বিতীয় পত্রটি কখনোই কোন সময়ে পবিত্র বাইবেলের গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তা আলাদা একটি পাঠ্যপুস্তিকারূপে বিদ্যমান ছিল। আর পৌলের পত্রগুলির সংখ্যা হলো ১৪টি, তবে কিছু মানুষ "ইব্রীয়দের প্রতি পত্র" বাদ দিয়েছেন।[২]

উপর্যুক্ত গ্রন্থের ২৫ অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন : "যাকোবের পত্র, যিহূদার পত্র, পিতরের দ্বিতীয় পত্র, যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র; এই পত্রগুলির রচয়িতা যীশুশিষ্য প্রেরিতগণ, না তাদেরই নামের অন্য কোন মানুষেরা এগুলি রচনা করেছেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে! তবে একথা বুঝতে হবে যে, পৌলের কার্য-বিবরণ (Acts of Paul), যাজকীয় পত্রাদি (Pastor/Pastoral Letters)[৩], পিতরের নিকট প্রকাশিত বাক্য (Apcalypse/Revelation of Peter), বার্নাবাসের পত্র (Epistle of Barnabas), শিষ্যগণের পত্রাবলী (Institurions of the Apostles) এগুলি সবই জাল ও বানোয়াট। প্রমাণসাপেক্ষ 'যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য' গ্রন্থটিও এইরূপ গণ্য করা উচিত।[৪]

ইউসেবিয়াস (Eusebius) তাঁর গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৫ অধ্যায়ে ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের বিষয়ে অরিগন (Origen)[৫] -এর নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন : "এই গ্রন্থটি

---

১. দেখুন : Eusebius, The Ecclesiastical History, page 297-301;

২. দেখুন : Eusebius, The Ecclesiastical History, page 83-84;

৩. ১ ও ২ তীমথিয় এবং তীত, এই পত্রগুলি যাজকীয় পত্র বা Pastoral Letters বলে পরিচিত। বাইবেলের তৃতীয় শতাব্দীর প্রাচীন পাণ্ডুলিপি (P 46)-এর মধ্যে এই পত্রগুলি নেই। আধুনিক যুগের বাইবেলবিদ খৃস্টান গবেষকগণ পৌলের অন্যান্য পত্রের সাথে এই পত্রগুলির শব্দ, ভাষা-পদ্ধতি, চার্চীয় বিবরণ, ঐতিহাসিক বর্ণনা ও ধর্মতাত্ত্বিক নির্দেশনা ইত্যাদির তুলনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, এই পত্রগুলি পৌলের রচিত নয়। কম্পিউটার টেকনোলজির ব্যবহারও এই কথারই নির্দেশ করে। বিস্তারিত দেখুন The New Encyclopedia Britannica, Vol-2, page 966 (Biblical Literature).

৪. দেখুন : Eusebius, The Ecclesiastical History, page 110;

৫. তৃতীয় শতাব্দীর আলেকজান্দ্রিয়ার খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রধান।

সম্পর্কে মানুষদের মতামতের অবস্থা এই ছিল যে, কেউ বলেছেন : গ্রন্থটি রোমের বিশপ ক্লীমেন্থ[১], কেউ বলছেন : লূক এই গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন।"[২]

১৭৮ খৃস্টাব্দের দিকে লিনীস-এর বিশপ আর্নেস এই গ্রন্থটিকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন। অনুরূপভাবে ২২০ সালে হিপ্পলিটাস (Hippolytus c. 170-236) ও ২৫১ সালের দিকে রোমের প্রেসবিটার (Presbyter) যাজকমণ্ডলী-প্রধান নয়েটস এই গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করেন। ২০০ খৃস্টাব্দের দিকে কার্থেজের প্রেসবিটার (Presbyter) যাজকমণ্ডলী-প্রধান টার্টোলিন (Tertullian) বলতেন যে, এই গ্রন্থটি বার্নাবাসের রচিত।

২১২ খৃস্টাব্দে রোমের প্রেসবিটার (Presbyter) যাজকমণ্ডলী-প্রধান কীস বাইবেলের মধ্যে পৌলের পত্রের সংখ্যা ১৩টি বলে উল্লেখ করেছেন এবং ইব্রীয়গণের প্রতি পত্রটিকে সেগুলির মধ্যে গণ্য করেন নি। ২৩৮ খৃস্টাব্দে কার্থেজের বিশপ সাইপ্রিয়ান (St. Cyprian d. 258) বাইবেলের গ্রন্থতালিকায় এই গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করেন নি। সিরীয় চার্চ এখন পর্যন্ত পিতরের দ্বিতীয় পত্র ও যোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের বিশুদ্ধতা স্বীকার করে না। স্কালগার বলেন : যে লোকটি পিতরের দ্বিতীয় পত্র রচনা করেছে সে তাঁর সময় অকারণে নষ্ট করেছে।

ইউসেবিয়াস (Eusebius) তাঁর ইতিহাসের ২য় গ্রন্থের ২৩ অধ্যায়ে যাকোবের পত্রের বিষয়ে বলেন : "এই পত্রটিকে জাল ও বানোয়াট বলে মনে করা হয়। প্রাচীনকালের খুব কম পণ্ডিতই এর উল্লেখ করেছেন। 'যিহূদার পত্র' বলে অভিহিত পত্রটির অবস্থাও অনুরূপ। তবে আমরা জানি যে, বর্তমানে অধিকাংশ চার্চে অন্যান্য পত্রের সাথে এই পত্র দুইটিও ব্যবহৃত হয়।"[৩]

১৮৫০ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত বাইবেলের ইতিহাসে বলা হয়েছে : "কর্টিস বলেছেন : যিহূদার পত্রটির রচয়িতা 'যিহূদা' ছিলেন রোমান সম্রাট হাড্রিয়ান (Hadrian/Adrian)-এর শাসনামলে (১১৭-১৩৮খৃ) যিরুশালেমের বিশপ। তিনি যিরুশালেমের ১৫তম বিশপ ছিলেন।"[৪]

ইউসেবিয়াস (Eusebius) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের ৬ষ্ঠ গ্রন্থের ২৫ অধ্যায়ে লিখেছেন : "যোহনলিখিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা পঞ্চম খণ্ডে অরিগন (Origen) বলেছেন : পৌল

১. ৯১-৯৬ খৃস্টাব্দে রোমের বিশপ ছিলেন। সম্ভবত এর পূর্বে ৮০-৯০ খৃস্টাব্দের দিকে গ্রন্থটি রচিত হয়। দেখুন : The New Encyclopedia Britannica, Vol-2, page 967-968 : Biblical Literature.

২. দেখুন : Eusebius, The Ecclesiastical History, page 247.

৩. দেখুন : Eusebius, The Ecclesiastical History, page 79.

৪. এতে জানা গেল যে, পত্রটির রচয়িতা যীশু-শিষ্য 'যিহূদা' নন, বরং অনেক পরের একজন যিহূদা।

সকল চার্চমণ্ডলীর কাছে কোন কিছুই লিখে পাঠান নি। দুই একটি চার্চমণ্ডলীর নিকট যা লিখে পাঠিয়েছিলেন তা দুই চার লাইনের বেশি নয়।"[১]

অরিগনের এই কথা থেকে জানা গেল যে, পৌলের নামে প্রচারিত এতগুলি বড়বড় পত্র সবই জাল ও বানোয়াট। এর দুই একটির মধ্যে হয়ত দুই বা চার লাইন পৌলের নিজের কথা থাকতে পারে।

প্রিয় পাঠক!

উপরে উল্লিখিত বক্তব্যগুলি চিন্তা করলে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বাইবেলের নতুন নিয়মের গ্রন্থগুলির বিষয়ে 'ফস্টেটের' কথাই সঠিক। তিনি বলেছেন, "এই নতুন নিয়মটি যীশু রচনা করেন নি, তাঁর শিষ্যগণও তা রচনা করেন নি; বরং একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তা রচনা করে যীশুর শিষ্যগণ ও তাঁদের সহচরদের নামে চালিয়ে দিয়েছে।"

উপরের বক্তব্যগুলি চিন্তা করলে জানা যায় যে, ফস্টেটের এই কথাটি সন্দেহাতীতভাবে সত্য। তিনি এ বিষয়ে সঠিক কথাটি বলতে পেরেছিলেন।

আমি প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি যে, নতুন নিয়মের ৬টি পত্র ও প্রকাশিত বাক্য ৩৬৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অনির্ভরযোগ্য ও সন্দেহজনক বলে গণ্য ছিল। ৩২৫ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নিকীয়া (Nicaea) মহা সম্মেলন (ecumenical council) এই গ্রন্থগুলিকে সঠিক বলে গ্রহণ করে নি।

এরপর ৩৬৪ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত লোডেসিয়া সম্মেলন ৬টি পত্রকে 'নির্ভরযোগ্য' বলে গ্রহণ করা হয়। এই সম্মেলনেরও 'প্রকাশিত বাক্য' অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যক্ত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরপর ৩৯৭ খৃস্টাব্দে কার্থেজ সম্মেলনে এটিকেও গ্রহণ করা হয়। তবে এই দুই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নয়। নিম্নের তিনটি বিষয় থেকে তা জানা যাবে :

প্রথম বিষয় : উপর্যুক্ত ২টি সম্মেলনসহ খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রথম ৬টি সম্মেলনে 'যুডিথের পুস্তক' (The Book of Judith) বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

এই গ্রন্থটি ছাড়াও লোডেসিয়ার সম্মেলনে ইস্টেরের বিবরণ (The Book of Esther) গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ের ১০ আয়াত এবং ১০ম অধ্যায়ের পরের ৬ অধ্যায় বিশুদ্ধ হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

কার্থেজ সম্মেলনে উপস্থিত ধর্মগুরু বিশপগণ কর্তৃক নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিকে সঠিক বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় :

১. উইসডম বা জ্ঞান পুস্তক (The Book of Wisdom)

২. তোবিয়াসের পুস্তক (The Book of Tobias)

৩. বারুখের পুস্তক (The Book of Baruch)

---

১. দেখুন : Eusebius, The Ecclesiastical History, page 246.

৪. যাজকগণ বা Ecclesiasticus (The Wisdom of Jesus the Son of Sirach).
৫. ম্যাকাবিজের প্রথম পুস্তক (The First Book of Maccabees)
৬. ম্যাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক (The Second Book of Maccabees)
পরবর্তী তিনটি সম্মেলনে উপরের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হয়।

এখন যদি আমরা মনে করি যে, উপরোক্ত সম্মেলনগুলির সিদ্ধান্ত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে তাহলে আমাদেরকে উপরোক্ত সকল গ্রন্থকেই প্রামাণ্য বলে মেনে নিতে হবে। আর যদি আমরা মনে করি যে, এ সকল সম্মেলনে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ বা সূত্র ব্যতিরেকেই আন্দাজের ভিত্তিতে এ সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে -আর এটিই হলো সঠিক কথা- তাহলে তাদের সকল সিদ্ধান্তই বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এসকল পুস্তক সবই অপ্রামাণ্য ও বাতিল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

বড় অবাক লাগে যে, প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের মানুষেরা নতুন নিয়মের ৬টি পত্র ও প্রকাশিত বাক্যের বিষয়ে উপর্যুক্ত সম্মেলনগুলির সিদ্ধান্ত মেনে নেন, অথচ বাকী গ্রন্থগুলির বিষয়ে সম্মেলনগুলির সিদ্ধান্ত মানেন না। বিশেষ করে যুডিথের পুস্তকটিকে উপরের সকল সম্মেলনেই প্রামাণ্য বলে মেনে নেওয়া হলেও প্রটেস্ট্যান্টগণ গ্রন্থটিকে মানেন না।

ইস্টেরের বিবরণ ছাড়া বাকি যে গ্রন্থগুলিকে তারা প্রত্যাখ্যান করেন সেগুলির বিষয়ে তাদের খোঁড়া যুক্তি একেবারেই অচল। তারা বলেন যে, এই গ্রন্থগুলির মূল পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গিয়েছে, এজন্য সেগুলিকে গ্রহণ করা যায় না। এই যুক্তিটি দুইটি কারণে অচল :

প্রথমত, জিরোম বলেছেন যে, যুডিথের পুস্তক ও তোবিয়াসের পুস্তকের ক্যালিডীয় ভাষার মূলগ্রন্থ এবং ম্যাকাবিজের ১ম পুস্তকের ও যাজকগণ বা Ecclesiasticus গ্রন্থের হিব্রু ভাষার মূলগ্রন্থ তিনি দেখেছেন। এই গ্রন্থগুলি সে সকল মূল গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, তাদের এই যুক্তি অনুসারে তাদেরকে মথিলিখিত সুসমাচারকে অপ্রামাণ্য বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে; কারণ এই গ্রন্থটির মূল ভাষার পাণ্ডুলিপি চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় : দ্বিতীয় যে কারণে উক্ত সম্মেলনগুলির সিদ্ধান্তের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই তা হলো, ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, বাইবেল ভাষ্যকার হর্ন স্বীকার করেছেন, প্রচলিত বিবরণ, পুস্তক, পত্র ইত্যাদি গ্রহণ করার বিষয়ে প্রাচীন যুগের খৃস্টান ধর্মগুরুগণ কোন বাছ-বিচার বা যাচাই-বাছাই করতেন না বরং তারা সত্যমিথ্যা, গালগল্প যা কিছু শুনতেন সবই সত্য বলে মেনে নিতেন এবং লিখে রাখতেন। পরবর্তী যুগের ধর্মবেত্তাগণ পূর্ববর্তীদের সবকিছুকে অন্ধভাবে মেনে নিতেন। এ থেকে এ কথাই স্পষ্ট যে, উক্ত সম্মেলনগুলিতে উপস্থিত বিশপ ও ধর্মগুরুগণের নিকটও অনুরূপ কিছু সত্যমিথ্যা গালগল্প ও অনির্ভরযোগ্য বিবরণ পৌঁছেছিল, যেগুলির ভিত্তিতে তাঁরা

এই গ্রন্থগুলিকে সঠিক বলে গ্রহণ করেছিলেন, অথচ গ্রন্থগুলি দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য ছিল।

তৃতীয় বিষয় : তৃতীয় যে কারণে উক্ত সম্মেলনগুলির সিদ্ধান্তের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই তা হলো, খৃস্টানগণের নিকট পবিত্রগ্রন্থ বা বাইবেলের অবস্থা হলো সরকার প্রবর্তিত আইন-কানুন ও নিয়মরীতির মত (অর্থাৎ পরের মানুষদের সিদ্ধান্তের ফলে পূর্বের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়) অথচ ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রথম যুগের ধর্মবেত্তাদের মতই সঠিক হওয়া উচিত।

নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন :

১. যীশুশিষ্যগণের যুগ থেকে শুরু করে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত খৃস্টান সম্প্রদায়ের নিকট বাইবেলের গ্রীক অনুবাদটিই ছিল মূল নির্ভরযোগ্য উৎস। তারা বিশ্বাস করতেন যে, হিব্রু ভাষায় লিখিত ও প্রচারিত বাইবেলটি বিকৃত এবং গ্রীক অনুবাদটিই বিশুদ্ধ। ১৫০০ বছর পরে এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ উল্টে গেল। এখন তাদের কাছে বিকৃতটিই বিশুদ্ধ এবং বিশুদ্ধটিই বিকৃত বলে গণ্য হয়ে গেল।[১] এতে প্রমাণিত হলো যে, খৃস্টানদের পূর্বসূরিগণ সকলেই ১৫০০ বছর পর্যন্ত মুর্খতা ও অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন।

২. প্রাচীন খৃস্টানগণের নিকট 'দানিয়েলের পুস্তক'-এর গ্রীক অনুবাদটি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য ছিল। (৩য় শতাব্দীতে) অরিগন যখন এই গ্রীক অনুবাদটিকে অশুদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন তখন তারা তা পরিত্যাগ করে থিওডোশনের অনুবাদ গ্রহণ করলেন।

৩. আরিসটিস-এর পত্রটি (The Letter of Aristeas)[২] ১৬শ শতক পর্যন্ত বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য ছিল। এরপর ১৭শ শতকে তারা এর বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করতে লাগলেন এবং অধিকাংশ প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মবেত্তা পণ্ডিত পত্রটি মিথ্যা ও জাল বলে গণ্য করলেন।

৪. ক্যাথলিকগণের নিকট বাইবেলের ল্যাটিন অনুবাদটি বিশুদ্ধ বলে গণ্য। পক্ষান্তরে প্রটেস্ট্যান্টগণ তাকে বিকৃত ও অনির্ভরযোগ্য বলে বিশ্বাস করেন।

৫. এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাঠক দেখতে পাবেন যে, "ক্ষুদ্র আদিপুস্তক" নামক গ্রন্থটি ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রামাণ্য বলে গণ্য ছিল। এরপর ১৬শ শতাব্দীতে এসে গ্রন্থটি অশুদ্ধ ও জাল গ্রন্থে পরিণত হলো।

৬. ইস্রার তৃতীয় পুস্তককে গ্রীক অর্থোডক্স সম্প্রদায় এখন পর্যন্ত প্রামাণ্য ঐশ্বরিক গ্রন্থ হিসাবে মেনে চলে, অথচ রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় গ্রন্থটিকে বাতিল বলে গণ্য করেন।

---

১. প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, গ্রীক অনুবাদটি বিকৃত ও অশুদ্ধ এবং হিব্রু বাইবেলই বিশুদ্ধ।

২. পত্রটি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন : The New Encyclopaedia Britannica, Vol-2, page 935 : Biblical Literature.

৭. শলোমনের গীতসংহিতা (Psalms of Solomon) নামক গ্রন্থটি প্রাচীন খৃষ্টানগণ ঐশ্বরিক গ্রন্থ হিসাবে মানতেন এবং বাইবেলের মধ্যে তা লিখিত ছিল। এখন পর্যন্ত বাইবেলের প্রাচীন আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপিতে (Codex Alexandrinus)[১] তা রয়েছে। এখন এই গ্রন্থটি জাল ও সংযোজিত বলে গণ্য করা হয়। আমরা আশা করি, ইনশাআল্লাহ, এভাবে ক্রমান্বয়ে তারা স্বীকার করবেন যে, বাইবেলের সকল গ্রন্থই জাল ও বানোয়াট।

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে জ্ঞানী পাঠকের নিকট এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, খৃষ্টানগণের নিকট বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের গ্রন্থগুলির কোনটিরই কোন মূল উৎস বা সূত্র-পরম্পরা সংরক্ষিত নেই। যখন তাদেরকে এ বিষয়ে প্রমাণ পেশ করার জন্য চাপাচাপি করা হয় তখন তারা উপায়ান্তর না দেখে বলেন, যীশু নিজেই পুরাতন নিয়মের গ্রন্থগুলির বিশুদ্ধতার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। যীশুর এই সাক্ষ্যের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে পাঠক বিস্তারিত জানতে পারবেন এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় বিভ্রান্তির উত্তর আলোচনার মধ্যে। পাঠক অপেক্ষা করুন।

---

১. ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে বাইবেলের একটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়। পাণ্ডুলিপিটি খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর দিকে লেখা বলে মনে করা হয়। পাণ্ডুলিপিটি মূলত আলেকজান্দ্রিয়ার প্রধান বিশপের ছিল বলে সেটিকে 'আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপি বলে নামকরণ করা হয়। এই পাণ্ডুলিপিটি বাইবেলের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলির অন্যতম। উল্লেখ্য যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্বের কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। এজন্য এগুলিকেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে খৃষ্টানগণ মনে করেন। দেখুন : Oxford Illustrated History of Christianity, page 351-353.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাইবেলের গ্রন্থগুলির অগণিত বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তির[১] বর্ণনা

এই পরিচ্ছেদটিকে আমি দুইটি অংশে বিভক্ত করেছি : বৈপরীত্যের বর্ণনার জন্য একটি অংশ ও ভুলভ্রান্তির বর্ণনার জন্য দ্বিতীয় অংশ। প্রত্যেক অংশে আমি অনেক উদাহরণ উল্লেখ করব।

প্রথম অংশ : বৈপরীত্যের বর্ণনা

বৈপরীত্য-১

যদি কেউ যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ৪৫ ও ৪৬ অধ্যায়দ্বয়ের সাথে গণনাপুস্তকের ২৮ ও ২৯ অধ্যায়দ্বয়ের তুলনা করেন তাহলে দেখবেন যে, উভয় গ্রন্থে প্রদত্ত বিধানাবলী সুস্পষ্টরূপে পরস্পরবিরোধী।

বৈপরীত্য-২

যিহোশূয়ের পুস্তকের ১৩শ অধ্যায় ও দ্বিতীয় বিবরণের ২য় অধ্যায়ে উভয় স্থানে গাদ বংশের উত্তরাধিকারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে সুস্পষ্ট বৈপরীত্য ও বিরোধিতা রয়েছে এবং উভয় বর্ণনার একটি সন্দেহাতীতভাবে ভুল। ইতোপূর্বে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যিহোশূয়ের পুস্তকের অবস্থা আলোচনার সময়ে পাঠক বিষয়টি জানতে পেরেছেন।

---

১. বৈপরীত্য বলতে লেখক বুঝাচ্ছেন পরস্পর-বিরোধিতা। বাইবেলের এক গ্রন্থে বর্ণিত বিধান বা তথ্যের সাথে অন্য কোন গ্রন্থে বর্ণিত বিধান বা তথ্যের মধ্যে অনেক বৈপরীত্য ও পরস্পরবিরোধিতা পাওয়া যায়। এমনকি একই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে বা একই গ্রন্থের একই অধ্যায়ের মধ্যে লিখিত তথ্যও অনেক সময় পরস্পরবিরোধী। এছাড়া বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, অনুবাদ ইত্যাদির মধ্যেও বৈপরীত্য ও পরস্পরবিরোধিতা দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম অংশে গ্রন্থকার উদাহরণ হিসাবে ১২৫টি বৈপরীত্য উল্লেখ করেছেন। প্রদত্ত তথ্যের বা বিধানের শুদ্ধতা বা বিশুদ্ধতা এখানে বিচার করা হয় নি। শুধু বাইবেলের একাধিক স্থানে, সংস্করণে বা অনুবাদে প্রদত্ত তথ্যের তুলনা করে পরস্পর-বিরোধিতা ও বৈপরীত্য প্রমাণ করা হয়েছে।
অপরদিকে ভুলভ্রান্তি বলতে লেখক বুঝাচ্ছেন যে, বাইবেলে প্রদত্ত অগণিত তথ্য ইতিহাস, বাস্তবতা বা নিরীক্ষার মাধ্যমে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে গ্রন্থকার বাইবেলের মধ্যে প্রদত্ত এইরূপ ভুল-ভ্রান্তির ১১০টি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন।

বৈপরীত্য-৩

বংশাবলির প্রথম খণ্ডের ৭ম ও ৮ম অধ্যায়দ্বয়ে বিন্যামীনের সন্তানদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে সুস্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। অনুরূপভাবে এই দুই অধ্যায়ের বর্ণনার সাথে আদিপুস্তকের ৪৬ অধ্যায়ের বর্ণনার স্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে।[১] ইহূদী ও খৃস্টান বাইবেলবিদ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন যে, বংশাবলির প্রথম খণ্ডে যে তথ্য লিখা হয়েছে তা ভুল। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আলোচ্যে সে বিষয়ে পাঠক জানতে পারবেন।

বৈপরীত্য-৪

বংশাবলির প্রথম খণ্ডের ৮ম অধ্যায়ের ২৯-৩৮ আয়াতে ও একই পুস্তকের ৯ম অধ্যায়ের ৩৫-৪৪ আয়াতে একই ব্যক্তির বংশ বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু উভয় বিবরণে প্রদত্ত নামগুলির মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান।

বাইবেল ভাষ্যকার আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন : "ইহূদী ধর্মগুরু পণ্ডিতগণ বলেন যে, ইস্রা দুইটি পুস্তক পান, যে দুইটিতে এই বংশতালিকাটি দুইভাবে লিখা ছিল। পরস্পর-বিরোধী দুইটি বংশতালিকার মধ্যে কোনটি সঠিক বা অধিকতর গ্রহণযোগ্য তা তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। এজন্য তিনি দুইটি তালিকাই উদ্ধৃত করে দিয়েছেন।"

বৈপরীত্য-৫

শমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তকের ২৪ অধ্যায়ের ৯ম আয়াতটি নিম্নরূপ : "পরে যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা রাজার কাছে দিলেন; ইস্রায়েলে খড়্গধারী আট লক্ষ বলবান লোক ছিল; আর যিহূদার পাঁচ লক্ষ লোক ছিল।"[২]

অপর দিকে বংশাবলি প্রথম খণ্ডের ২১ অধ্যায়ের ৫ম আয়াত নিম্নরূপ : "আর যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা দায়ূদের কাছে দিলেন। সমস্ত ইস্রায়েলের এগার লক্ষ খড়্গধারী লোক ও যিহূদার চারি লক্ষ সত্তর সহস্র খড়্গধারী লোক ছিল।"

উভয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্যের পরিমাণ দেখুন! ইস্রায়েলের জনসংখ্যা বর্ণনায় ৩ লক্ষের কমবেশি এবং যিহূদার জনসংখ্যার বর্ণনায় ত্রিশ হাজারের কমবেশি।

বৈপরীত্য-৬

শমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তকের ২৪ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতটি নিম্নরূপ : "পরে গাদ দায়ূদের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন, কহিলেন, আপনার দেশে সাত বৎসর

---

১. দেখুন আদিপুস্তক ৪৬/২১, ১ বংশাবলী ৭/৬ ও ৮/১

২. দায়ূদের নির্দেশে তাঁর সেনাপতি যোয়াব লোকসংখ্যা গণনা করেন। দায়ূদ ও শলোমনের পরে প্যালেস্টাইনে ইহূদীদের রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর প্যালেস্টাইনের রাজ্যকে শামেরা বা ইস্রাইল রাজ্য বলা হতো। এর রাজধানী ছিল নাবলুস। আর দক্ষিণ প্যালেস্টাইনের রাজ্যকে 'যিহূদা রাজ্য' বলা হতো। এর রাজধানী ছিল যিরুশালেম। এখানে উভয় অংশের লোকগণনার কথা বলা হয়েছে।

ব্যাপিয়া কি দুর্ভিক্ষ হইবে?" অপর দিকে বংশাবলি প্রথম খণ্ডের ২১ অধ্যায়ের ১২ আয়াত নিম্নরূপ : "হয় তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ..."।

প্রথম আয়াতে ৭ বছর ও দ্বিতীয় আয়াতে ৩ বছর! বাইবেলের ব্যাখ্যাকারগণ স্বীকার করেছেন যে, প্রথম আয়াতের তথ্য ভুল।

বৈপরীত্য-৭:

রাজাবলি দ্বিতীয় খণ্ডের ৮ম অধ্যায়ের ২৬ আয়াতটি নিম্নরূপ : "অহসিয় বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরশালেমে এক বৎসর রাজত্ব করিলেন।" আর বংশাবলি দ্বিতীয় খণ্ডের ২২ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আয়াত নিম্নরূপ : "অহসিয় বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং যিরূশালেমে এক বৎসরকাল রাজত্ব করেন।"

উভয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় তথ্যটি সন্দেহাতীতভাবে ভুল যা ইহূদী-খৃস্টান ব্যাখ্যাকারগণ স্বীকার করেছেন। কারণ, অহসিয়ের পিতা যিহোরাম ৪০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার মৃত্যুর পরপরই অহসিয় রাজ-সিংহাসনে বসেন। বাইবেলের উপর্যুক্ত অধ্যায়ের বর্ণনা থেকেই তা জানা যায়। এখন যদি দ্বিতীয় তথ্যটি সঠিক হয় তাহলে অহসিয় তার পিতার চেয়েও দুই বছরের বড় হবেন।

বৈপরীত্য-৮

২ রাজাবলীর ২৪ অধ্যায়ের ৮ম আয়াত নিম্নরূপ : "যিহোয়াখীন আঠার বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন...।"

২ বংশাবলির ৩৬ অধ্যায়ের ৯ম আয়াত নিম্নরূপ : "যিহোয়াখীন আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন...।"

উভয় তথ্যের মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। ইহূদী-খৃস্টান ভাষ্যকারগণও স্বীকার করেছেন যে, দ্বিতীয় তথ্যটি ভুল। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আলোচ্যে পাঠক বিষয়টি জানতে পারবেন।

বৈপরীত্য-৯

২ শমূয়েল ২৩ অধ্যায়ের ৮ আয়াতের সাথে ১ বংশাবলি ১১ অধ্যায়ের ১১ আয়াতের সুস্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে।[১] আদম ক্লার্ক শমূয়েল-এর আয়াতের টীকায় বলেন : "ড. কেনিকাট বলেন : এই আয়াতটিতে তিনটি মারাত্মক বিকৃতি রয়েছে।"

তাহলে চিন্তা করুন, একটিমাত্র আয়াতেই তিনটি ভুল!

বৈপরীত্য-১০

২ শমূয়েলের ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, পলেষ্টীয়দের সাথে যুদ্ধ করার পরে দায়ূদ নিয়ম-সিন্দুক আনয়ন করেন। অথচ ১ বংশাবলির ১৩ ও ১৪ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, দায়ূদ পলেষ্টীয়দের সাথে যুদ্ধের আগেই নিয়ম-সিন্দুকটি আনয়ন করেন।

১. উভয় স্থানে দায়ূদের বীরগণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং উভয় বর্ণনা পরস্পরবিরোধী।

উপর্যুক্ত অধ্যায়গুলি পাঠ করলে পাঠক নিশ্চিত বুঝতে পারবেন যে, উভয় বিবরণ একই ঘটনার। কাজেই দুইটি পরস্পর-বিরোধী বিবরণের একটি অবশ্যই ভুল।

বৈপরীত্য-১১

আদিপুস্তকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১৯ ও ২০ আয়াত থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বর নোহকে নির্দেশ দেন, সর্বজাতীয় পশু, সর্বজাতীয় পক্ষী ও সর্বজাতীয় ভূচর সরীসৃপ স্ত্রীপুরুষ জোড়া জোড়া সাথে নিতে।

আর ৭ম অধ্যায়ের ২ ও ৩ আয়াত থেকে জানা যায়, তিনি তাকে 'শুচি (পবিত্র) পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত সাত যোড়া এবং অশুচি (অপবিত্র) পশুর স্ত্রী-পুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির এক এক যোড়া এবং আকাশের পক্ষীদিগেরও স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত সাত যোড়া' সঙ্গে রাখতে নির্দেশ দেন।

বৈপরীত্য-১২

গণনাপুস্তকের ৩১ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, মোশির (মূসা-আ.) সময়ে ইস্রায়েল-সন্তানগণ মিদিনীয়দেরকে সম্পূর্ণ বিনাশ করেন। তাদের সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু ও বালককে তারা বধ করেন। এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকেও তারা বধ করেন। অনুরূপভাবে মিদিয়নীয়দের সকল প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাকেও তারা বধ করেন। শুধু 'যে বালিকারা শয়নে পুরুষের পরিচয় পায় নাই' তাদেরকে নিজেদের ব্যবহারের জন্য জীবিত রাখেন।

অপরদিকে বিচারকর্তৃগণের বিবরণ-এর ৬ষ্ঠ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, বিচারকর্তৃগণের যুগে মিদিয়নীয়গণ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। তাদের শক্তি এত বেশি ছিল যে, ইস্রায়েল সন্তানগণ তাদের শক্তির সামনে সম্পূর্ণ পরাজিত ও অসহায় হয়ে পড়েছিলেন।

মোশির যুগ ও বিচারকর্তৃগণের যুগের মধ্যে মাত্র ২০০ বছরের ব্যবধান। এখন আমার প্রশ্ন হলো, মোশির যুগে যদি মিদিয়নীয়গণকে এভাবে সমূলে বিনাশ করা হয়ে থাকে তাহলে তারা মাত্র ২ শতাব্দীর মধ্যে কিভাবে এত শক্তিশালী হলেন যে, ৭ বছর ধরে ইস্রায়েল-সন্তানদেরকে অসহায় ও পরাজিত করে রাখলেন?

বৈপরীত্য-১৩

যাত্রাপুস্তকের নবম অধ্যায়ে রয়েছে : "পরদিন সদাপ্রভু তাহাই করিলেন, তাহাতে মিসরের সকল পশু মরিল, কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানদের পশুদের মধ্যে একটিও মরিল না।"[১]

এরপর এই ঘটনার পরবর্তী ঘটনা বর্ণনায় এই অধ্যায়েই বলা হয়েছে : "তখন ফরৌণের দাসগণের মধ্যে যে কেহ সদাপ্রভুর বাক্যে ভীত হইল, সে শীঘ্র আপন দাস ও পশুদিগকে গৃহমধ্যে আনিল; আর যে কেহ সদাপ্রভুর বাক্যে মনোযোগ করিল না, সে আপন দাস ও পশুদিগকে ক্ষেত্রে থাকিতে দিল।"

১. যাত্রাপুস্তক ৯/৬।

এখানে প্রথমে বলা হচ্ছে সকল পশুই মরিল। আবার তার কয়েকদিন পরের কথা বলা হচ্ছে তারা তাদের সকল পশু ঘরে বা মাঠে রেখে দিল। উভয় বক্তব্যের মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট।

বৈপরীত্য-১৪

যাত্রাপুস্তকের ৮ম অধ্যায়ে রয়েছে : "৪ তাহাতে সপ্তম মাসে, সপ্তদশ দিনে অরারটের পর্বতের উপরে জাহাজ লাগিয়া রহিল। ৫ পরে দশম মাস পর্যন্ত জল ক্রমশঃ সরিয়া হ্রাস পাইল; ঐ দশম মাসের প্রথম দিনে পর্বতগণের শৃঙ্গ দেখা গেল।"

এই দুই আয়াতের বিবরণ পরস্পর বিরোধী। কারণ যদি দশম মাসে পর্বতশৃঙ্গ দেখা যায় তবে সপ্তম মাসে জাহাজ অরারটের পর্বতের উপরে লেগে থাকল কিভাবে?

বৈপরীত্য-১৫-২৬

২ শমূয়েলের ৮ম অধ্যায় এবং ১ বংশাবলি ১৮ অধ্যায় উভয় স্থানে দায়ূদের দিগ্বিজয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মূল হিব্রু বাইবেলে উভয় বর্ণনার মধ্যে অনেক বৈপরীত্য রয়েছে, যদিও অনুবাদকগণ কিছু কিছু বৈপরীত্য সংশোধন করেছেন। এখানে আমি বাইবেল ব্যাখ্যাকার আদম ক্লার্ক-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে শমূয়েলের টীকা থেকে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি।

২ শমূয়েল ৮ম অধ্যায়		১ বংশাবলি ১৮ অধ্যায়	
আয়াত	বক্তব্য	আয়াত	বক্তব্য
১	দায়ূদ পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে করের লাগাম গ্রহণ করিলেন[১]	১	পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে গাৎ ও তাহার উপনগর সকল হরণ করিলেন
৩	হদদেষর	৩	হদরেষর
৪	সতের শত অশ্বারোহী	৪	এক সহস্র রথ, সাত সহস্র অশ্বারোহী
৮	দায়ূদ রাজা হদদেষরের বেটহ ও বেরোথা নগর হইতে বিস্তর পিত্তল আনিলেন	৮	দায়ূদ হদরেষরের টিভৎ ও কূন নগর হইতে বিস্তর পিত্তল আনিলেন
৯	রাজা তয়ি...হদদেষের...আপন	৯	রাজা তয়ূ... হদরেষের ...
১০	পুত্র যোরামকে	১০	আপন পুত্র হদোরামকে
১১	অরাম	১১	ইদোম
১৩	অরাম	১৩	ইদোম
১৭	অহীমেলক যাজক ছিলেন; এবং সরায় লেখক ছিলেন	১৬	অবীমেলক যাজক ছিলেন; এবং শবৃশ লেখক ছিলেন

১. প্রচলিত বাংলা বাইবেলে : "আর দায়ূদ পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে প্রধান নগরের কর্তৃত্ব হরণ করিলেন।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, একই বিষয়ের বিবরণে দুইটি অধ্যায়ের মধ্যে ১২ স্থানে বৈপরীত্য রয়েছে।

বৈপরীত্য-২৭-৩২

উপর্যুক্ত বাইবেল-ভাষ্যকার (আদম ক্লার্ক) ২ শমূয়েল-এর ১০ অধ্যায় এবং ১ বংশাবলি ১৯ অধ্যায়ের মধ্যে বৈপরীত্যের বিবরণে বলেন :

আয়াত	২ শমূয়েল ১০ অধ্যায়	আয়াত	১ বংশাবলি ১৯ অধ্যায়
১৬	হদদেষরের (হদরেষরের) দলের সেনাপতি শোবক	১৬	হদরেষরের দলের সেনাপতি শোফক
১৭	হেলমে উপস্থিত হইলেন[1]	১৭	তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন হেলম[2]
১৮	আর দায়ূদ অরামীয়দের সাত শত রথারোহী ও চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য বধ করিলেন, এবং তাহাদের দলের সেনাপতি শোবককেও...		আর দায়ূদ অরামীয়দের সাত সহস্র রথারোহী ও চল্লিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য বধ করিলেন, এবং দলের সেনাপতি শোফককে

বৈপরীত্য-৩৩

১ রাজাবলির ৪র্থ অধ্যায়ের ২৬ আয়াতটি নিম্নরূপ : "শলোমনের রথের নিমিত্ত চল্লিশ সহস্র অশ্বশালা ও বারো সহস্র অশ্বারোহী ছিল।"

২ বংশাবলির ৯ম অধ্যায়ের ২৫ আয়াতটি নিম্নরূপ : "শলোমনের চারি সহস্র ঘর (অশ্বশালা) ও দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ছিল।"

ফারসী ও উর্দু অনুবাদে এরূপই আছে। তবে ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে ২ বংশাবলির 'চারি সহস্র'-কে বিকৃত করে 'চল্লিশ সহস্র' করা হয়েছে। বাইবেল ভাষ্যকার আদমক্লার্ক বংশাবলির এই আয়াতের টীকায় প্রথম অনুবাদ ও ব্যাখ্যার বৈপরীত্যগুলি আলোচনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন : "এ সকল বৈপরীত্যের আলোকে সংখ্যাটির উল্লেখের ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটেছে বলে স্বীকার করে নেওয়াই আমাদের জন্য উত্তম।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, উভয় অধ্যায়ের মধ্যে ৬টি বৈপরীত্য রয়েছে।

---

১. প্রচলিত ইংরেজি বাইবেলে passed over Jordan and came to Helam, বাংলা বাইবেলে : এবং যর্দন পার হইয়া হেলমে উপস্থিত হইলেন।

২. প্রচলিত ইংরেজি বাইবেলে passed over Jordan and came upon them, বাংলা বাইবেলে : এবং যর্দন পার হইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন।

বৈপরীত্য-৩৪

১ রাজাবলির ৭ম অধ্যায়ের ২৪ আয়াতের সাথে ২ বংশাবলির ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় আয়াতের বৈপরীত্য রয়েছে।[১] আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বংশাবলির বক্তব্যের টীকায় বলেছেন : "বড় বড় গবেষক পণ্ডিত মনে করেন যে, এখানেও আমাদের উচিত রাজাবলির কথাটিই স্বীকার করে নেওয়া। সম্ভবত বংশাবলির মধ্যে শব্দের বিকৃতির ফলে 'বাক'য়ীম' শব্দটি 'বাকরীম' হয়ে গিয়েছে।

'বাকরীম' অর্থ বলদ বা ষাড়। আর বাক'য়ীম অর্থ গিরা বা ছোট বৃত্ত। আমরা দেখছি যে, এই ভাষ্যকার বংশাবলির বাক্যে বিকৃতি ঘটেছে বলে স্বীকার করছেন। তাঁর মত অনুসারে বংশাবলির তথ্যটি ভুল।

হেনরী ওয়াস্কট-এর ভাষ্যগ্রন্থের সংকলকগণ বলেন : "অক্ষরের পরিবর্তনের ফলে এখানে পার্থক্য দেখা দিয়েছে।"

বৈপরীত্য-৩৫

২ রাজাবলির ১৬শ অধ্যায়ের ২য় আয়াত নিম্নরূপ : "আহস বিংশতি বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরুশালেমে ষোল বৎসর কাল রাজত্ব করেন।"

আর আহস-রাজার পুত্র হিষ্কিয় সম্পর্কে এই পুস্তকেরই ১৮শ অধ্যায়ের ২ আয়াতে বলা হয়েছে : "তিনি ২৫ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন।"

এ থেকে বুঝা যায় যে, হিষ্কিয়ের জন্মের সময় তার পিতা আহসের বয়স ছিল এগার বছর। এটি অস্বাভাবিক কথা। এতে বুঝা যায় যে, উভয় বিবরণের মধ্যে একটি ভুল। বাইবেল ভাষ্যকারগণ প্রথম আয়াতটির তথ্য ভুল বলে স্বীকার করেছেন। হেনরী ওয়াস্কট-এর ভাষ্যগ্রন্থের সংকলকগণ ২ রাজাবলির ১৬ অধ্যায়ের টীকায় লিখেছেন : "সম্ভবত ৩০ এর স্থলে ২০ লেখা হয়েছে।" এই পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের ২ আয়াত দেখুন।

বৈপরীত্য-৩৬

২ বংশাবলির ২৮ অধ্যায়ের ১ আয়াত নিম্নরূপ : আহস বিংশতি বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং ষোল বৎসর কাল রাজত্ব করেন।"

এই পুস্তকের ২৯ অধ্যায়ের ১ আয়াত নিম্নরূপ : "হিষ্কিয় পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন।"

এখানেও দুইটি বিবরণের একটি ভুল। বাহ্যত প্রথম বিবরণটিই ভুল। পূর্বের অনুচ্ছেদ থেকে আমরা তা দেখতে পেয়েছি।

---

১. দুইটি আয়াতই শলোমনের মন্দিরের বর্ণনায়। প্রচলিত অনুবাদগুলিতে এই বৈপরীত্য লুকানোর চেষ্টা করা হয়েছে। প্রচলিত বাংলা বাইবেরে প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : "চারিদিকে কাণার নিচে সমূদ্র-পাত্র বেষ্টনকারী বার্তাকীর শ্রেণী ছিল (Knops compassing it)।" দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : "চারিদিকে তাহার নীচে সমুদ্রপাত্র বেষ্টনকারী বলদের আকৃতি ছিল (the similitude of oxen. which did compass it)।"

বৈপরীত্য-৩৭

২ শমূয়েল-এর ১২ অধ্যায়ের ৩১ আয়াতের সাথে ১ বংশাবলির ২০ অধ্যায়ের ৩ আয়াতের বৈপরীত্য রয়েছে। হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলেছেন : "শমূয়েলের কথাই সঠিক। কাজেই বংশাবলির বক্তব্য সংশোধন করে শমূয়েলের অনুরূপ করে দেওয়া উচিত।"

তাহলে তাঁর মতে বংশাবলির কথা ভুল। বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন, কিভাবে তিনি 'পবিত্রগ্রন্থের' বক্তব্য বিকৃত ও পরিবর্তন করে 'সংশোধন' করার স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছেন। অবাক হতে হয় যে, ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত আরবী অনুবাদের অনুবাদক শমূয়েলের কথাটিকেই বংশাবলির কথার মত করে 'সংশোধিত' করেছেন। ন্যায়ত বলতে গেলে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটাই তো তাঁদের মহান অভ্যাস।

বৈপরীত্য-৩৮

১ রাজাবলির ১৫ অধ্যায়ের ৩৩ আয়াত নিম্নরূপ : "যিহূদা-রাজ আসার তৃতীয় বৎসরে অহিয়ের পুত্র বাশা তির্সাতে সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিলেন।"

২ বংশাবলির ১৬ অধ্যায়ের ১ আয়াত নিম্নরূপ : "আসার রাজত্বের ছত্রিশ বৎসরে ইস্রায়েল-রাজ বাশা যিহূদার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।"

উভয় তথ্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে এবং উভয়ের একটি নিঃসন্দেহে ভুল। কারণ প্রথম আয়াতের বর্ণনা অনুসারে 'আসা'র রাজত্বের ছত্রিশ বছরে ইস্রায়েল-রাজ বাশা'-র মৃত্যুর পরে দশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তাহলে মৃত্যুর দশ বছর পরে কিভাবে তিনি 'যিহূদার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন?'

হেনরি ওয়াস্কটের ভাষ্যগ্রন্থের সংকলকগণ বংশাবলির বক্তব্যের টীকায় বলেন : "বাহ্যত এই তারিখটি ভুল। খৃস্টান সম্প্রদায়ের অন্যতম পণ্ডিত আশের বলেন : এ ছিল ইস্রায়েল সন্তানগণের রাজত্ব বিভক্ত হওয়ার[১] ৩৬তম বৎসর; আসার রাজত্বের ৩৬তম বৎসর নয়।"

তাহলে এসকল খৃস্টান ধর্মগুরু পণ্ডিতগণও স্বীকার করছেন যে, বংশাবলির বক্তব্য ভুল। দুই স্থানের এক স্থানে ভুল হয়েছে : হয় চব্বিশ-এর স্থলে ছত্রিশ লেখা হয়েছে। অথবা রাজ্য বিভক্ত হওয়ার স্থলে আসার রাজত্বের লেখা হয়েছে।

বৈপরীত্য-৩৯

২ বংশাবলির ১৫ অধ্যায়ের ১৯ আয়াত নিম্নরূপ : "আসার রাজত্বের পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত আর যুদ্ধ হইল না।" অর্থাৎ যিহূদা-রাজ আসা ও ইস্রায়েল-রাজ বাশার মধ্যে এ সময়ে কোন যুদ্ধ হইল না।

---

১. শলোমনের মৃত্যুর পরে ইহুদীদের রাজ্য ইস্রায়েল রাজ্য ও যিহূদা রাজ্য এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

পূর্বের আলোচনা থেকে পাঠক স্পষ্ট জানতে পেরেছেন যে, এই বক্তব্যটি ১ রাজাবলির ১৫ অধ্যায়ের ৩৩ আয়াতের বক্তব্যের সাথে অসমঞ্জস (কারণ ২৬ বছর বাঁচলেন, কিন্তু ৩৫ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন না—একথা বলার কোন অর্থ থাকে না)।

বৈপরীত্য-৪০

১ রাজাবলির ৫ম অধ্যায়ের ১৬ আয়াতে বলা হয়েছে : "তদ্ভিন্ন শলোমনের কর্মকারী লোকদের উপরে কর্তৃত্বকারী তিন সহস্র তিন শত প্রধান কার্যাধ্যক্ষ ছিল।" অথচ ২ বংশাবলি ২ অধ্যায়ের ২ আয়াতে বলা হয়েছে : "ও তাহাদের অধ্যক্ষরূপে তিন সহস্র ছয় শত লোক নিযুক্ত করিলেন।"

প্রথম আয়াতে কার্যাধ্যক্ষদের সংখ্যা ৩৩০০ বলা হয়েছে, কিন্তু পরের আয়াতে ৩৬০০ বলা হয়েছে। বাইবেলের গ্রীক অনুবাদের অনুবাদকগণ রাজাবলির বক্তব্যটি বিকৃত করেছেন এবং '৩৬০০' লিখেছেন।

বৈপরীত্য-৪১

১ রাজাবলির ৭ম অধ্যায়ের ২৬ আয়াতে বলা হয়েছে : "তাহাতে দুই সহস্র বাৎ (baths) ধরিত।" একই বিষয়ে ২ বংশাবলি ৪ অধ্যায়ের ৫ আয়াতে বলা হয়েছে : "তাহাতে তিন সহস্র বাৎ (baths) ধরিত।" উভয় তথ্য পরস্পরবিরোধী এবং দুয়ের মধ্যে এক হাজারের পার্থক্য।

বৈপরীত্য-৪২

যদি কেউ ইয্রার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাথে নহিমিয়ের পুস্তকের ৭ম অধ্যায়ের তুলনা করেন তাহলে উভয়ের মধ্যে অধিকাংশ স্থানে কঠিন বৈপরীত্য দেখতে পাবেন।[1] তবে বৈপরীত্য ও পরস্পরবিরোধিতা বাদ দিলেও উভয় স্থানে অন্য একটি ভুল রয়েছে। তা হলো উভয় স্থানে প্রত্যাগত ব্যক্তিদের বংশভিত্তিক সংখ্যা প্রদান করার পরে সংখ্যার যোগফল উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় স্থানেই বলা হয়েছে : "একত্রীকৃত সমস্ত সমাজ বিয়াল্লিশ সহস্র তিন শত ষাট জন ছিল।"[2]

কিন্তু ইয্রা বা নহিমিয় কারো প্রদত্ত সকল সংখ্যা যোগ করলে কখনোই এই সংখ্যা পাওয়া যায় না। ইয্রার বক্তব্য অনুযায়ী সকল সংখ্যা যোগ করলে যোগফল হয় ২৯,৮১৮। আর নহিমিয়ের বক্তব্য অনুযায়ী যোগফল হয় ৩১,০৮৯।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, উভয় গ্রন্থ ঐকমত্যের সাথে যে তথ্য প্রদান করছে তা ঐতিহাসিকদের তথ্য অনুযায়ীও ভুল। প্রথম খৃস্টীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধতম ইহুদী ঐতিহাসিক যোসেফাস (Flavius Josephus)[3] তাঁর ইতিহাসের ১১শ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বলেছেন : "ব্যবিলন থেকে যিরুশালেমে আগতদের সংখ্যা ছিল ৪২,৪৬২ জন।"

১. উভয় অধ্যায়েই ব্যবিলনের বন্দিদশা থেকে প্রত্যাগত ইহুদীদের প্রথম গ্রুপের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তালিকার নামে ভয়ানক বৈপরীত্য রয়েছে।

২. ইয্রা ২/৬৪ ও নহিমিয় ৭/৬৬।

৩. ফ্লাভিয়াস যোসেফাস (৩৭-৯৫ খৃ) ইহুদী ধর্মগুরু ও ঐতিহাসিক। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ইতিহাস ও ইহুদীদের প্রাচীন ইতিহাসের উপর একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

হেনরী ওয়াস্কট-এর বাইবেল-ভাষ্যগ্রন্থের সংকলকগণ ইয্রার বক্তব্যের ব্যাখ্যার টীকায় বলেন : "এই অধ্যায় এবং নহিমিয়ের পুস্তকের ৭ম অধ্যায়ের মধ্যে মুদ্রক বা লেখকগণের (copier) ভুলের কারণে অনেক বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে। যখন ইংরেজি অনুবাদ তৈরি করা হয় তখন বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির মধ্যে তুলনা করে অনেক ভুল সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ভুলগুলির ক্ষেত্রে গ্রীক অনুবাদ মূল হিব্রু পাঠ বুঝতে সহায়তা করবে।"

হে বুদ্ধিমান পাঠক! এবার তাঁদের 'পবিত্র বাইবেলের' অবস্থা বুঝুন। তাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গ্রন্থগুলির 'সংশোধন' করে চলেছেন। এই 'সংশোধন' অর্থ যে বিকৃতি ও পরিবর্তন তা বুঝতে আশা করি পাঠকের কোন কষ্ট হচ্ছে না। এত বিকৃতির পরেও গ্রন্থগুলিতে অগণিত ভুল রয়ে গিয়েছে।

এক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য কথা হলো, গ্রন্থগুলি মুল গ্রন্থকারের সময় থেকেই ভুল তথ্যে ভরা। 'সংশোধনকারিগণের' কাজের ত্রুটি একটিই ঃ তারা যখন কোনভাবেই আর সমাধান বা 'সংশোধন' করতে না পারেন, তখন মুদ্রক বা লেখক (copier)-এর ঘাড়ে দোষটি চাপিয়ে দেন। আর প্রকৃতপক্ষে এসকল অগণিত ভুল ও অসত্য গ্রন্থের মূল গ্রন্থকার থেকেই বিদ্যমান। সেগুলির জন্য মুদ্রকগণের কোনরূপ দায়বদ্ধতা নেই।

যদি কেউ এই দুই অধ্যায় তুলনা করে দেখেন তবে ২০ টিরও বেশি বৈপরীত্য ও পরস্পরবিরোধিতা দেখতে পাবেন। আমরা জানি না, আগামি দিনে এ সকল 'সংশোধনকারী' কি করবেন এবং কিভাবে তারা এগুলিকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করবেন।

বৈপরীত্য-৪৩

২ বংশাবলির ১৩ অধ্যায়ের ২ আয়াতে (যিহূদা রাজ্যের দ্বিতীয় রাজা, রহবিয়ামের[১] পুত্র) অবিয়-এর সম্পর্কে বলা হয়েছে : "তাঁহার মাতার নাম মীখায়া, তিনি গিবিয়া-নিবাসী ঊরীয়েলের কন্যা।"

আবার উপরোক্ত পুস্তকের ১১ অধ্যায়ের ২০ আয়াত থেকে জানা যায় যে, তার মাতার নাম 'মাকা, তিনি অবশালোমের কন্যা'।

আর ২ শমূয়েল-এর ১৪ অধ্যায়ের ২৭ আয়াত থেকে জানা যায়, অবশালোমের একটিই মাত্র কন্যা ছিল যার নাম ছিল 'তামর'।

বৈপরীত্য-৪৪

যিহোশূয়ের পুস্তকের ১০ম অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন যিরুশালেমের রাজাকে হত্যা করলেন তখন তারা তার দেশ অধিকার করেন। অথচ একই পুস্তকের ১৫ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, তারা যিরুশালেম রাজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি বা রাজ্যের অধিবাসিগণকে অধিকারচ্যুত করতে পারেন নি।[২]

১. রহবিয়াম শলোমনের পুত্র। শলোমনের মৃত্যুর পরে রহবিয়াম প্যালেস্টাইনের রাজা হন। তাঁর সময়ে ইহুদীরা দুই রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। দক্ষিণের যিহূদা রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ রহবিয়ামের হাতে থাকে। তার পরে তার পুত্র অবিয় যিহূদার রাজা হন।

২. বিশেষ করে দেখুন : যিহোশূয় ১০/৪২ ও ১৫/৬৩।

বৈপরীত্য-৪৫

২ শমূয়েল-এর ২৪ অধ্যায়ের ১ম আয়াত থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বর সদাপ্রভু স্বয়ং দায়ূদকে প্ররোচিত করেন ইস্রায়েল সন্তানদের জনসংখ্যা গণনা করতে। আর ১ বংশাবলির ২১ অধ্যায়ের ১ম আয়াত থেকে জানা যায় যে, শয়তান দায়ূদকে জনসংখ্যা গণনা করতে প্ররোচিত করে।

খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে ঈশ্বর অমঙ্গলের বা খারাপ কাজ সৃষ্টি করেন না। এর ফলে দুইটি আয়াতের মধ্যে কঠিন বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে।

বৈপরীত্য--৪৬-৫১

যদি কেউ মথিলিখিত সুসমাচারে প্রদত্ত যীশুখ্রিষ্টের বংশতালিকা বা বংশাবলি-পত্রের[১] সাথে লূকলিখিত সুসমাচারে[২] উল্লিখিত যীশু খ্রিষ্টের বংশাবলি- পত্রের তুলনা করেন তাহলে উভয়ের মধ্যে নিম্নরূপ ৬টি বৈপরীত্য দেখতে পাবেন :

১. মথি থেকে জানা যায় যে, মরিয়মের স্বামী যোষেফ-এর পিতার নাম 'যাকোব'। আর লূক থেকে জানা যায় যে, যোষেফ-এর পিতা এলি।
২. মথি থেকে জানা যায় যে, যীশু দায়ূদের পুত্র শলোমনের বংশধর। লূক থেকে জানা যায় যে, যীশু দায়ূদের পুত্র নাথন-এর বংশধর।
৩. মথি থেকে জানা যায় যে, দায়ূদ থেকে ব্যবিলনের নির্বাসন পর্যন্ত যীশুর পূর্বপুরুষগণ সকলেই সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। লূক থেকে জানা যায় যে, দায়ূদ ও নাথন বাদে যীশুর পূর্বপুরুষগণের মধ্যে কেউই রাজা ছিলেন না বা কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন না।
৪. মথি থেকে জানা যায় যে, শল্টীয়েল-এর পিতার নাম যিকিনিয়। আর লূক থেকে জানা যায় যে, শল্টীয়েলের[৩] পিতার নাম নেরি।

---

১. মথি : ১/১-১৬।

২. লূক : ৩/২৩-৩৮।

৩. যীশুর সুদীর্ঘ বংশতালিকার একটি সাথে আরেকটির কোন মিল নেই। প্রথমে যোশেফ ও শেষে দায়ূদ এই দুইটি নামে মিল আছে। আর মধ্যস্থানে সরুব্বাবিল ও শল্টীয়েলের নাম উভয় তালিকাতেই আছে। তবে নামের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। মথির বর্ণনায় শল্টীয়েল যীশুর ১৩ তম ঊর্ধ্বপুরুষ। আর লূকের বর্ণনায় শল্টীয়েল যীশুর ২২তম ঊর্ধ্বপুরুষ। ১ বংশাবলি ৩/১৫-১৯ থেকে জানা যায় যে, দায়ূদের বংশধর রাজা যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম, তার পুত্র যিকনিয়। যিকনিয়ের ৭ পুত্রের মধ্যে একপুত্র শল্টীয়েল এবং অন্য পুত্র পদায়। এই পদায়ের পুত্র সরুব্বাবিল, তার দুই পুত্র মশুল্লম ও হনানিয়, আর এক কন্যা শালোমীৎ। তাহলে শল্টীয়েল সরুব্বাবিলের চাচা। মথি থেকে জানা যায় যে, রাজা যিকনিয় ও তার ভাইগণ রাজা যোশিয়ের পুত্র। যিকনিয়-এর পুত্র শল্টীয়েল, তার পুত্র সরুব্বাবিল, তার পুত্র অবীহূদ। লূক থেকে জানা যায় যে, মল্কির পুত্র নেরি, তার পুত্র শল্টীয়েল,তার পুত্র সরুব্বাবিল, তার পুত্র রীষা। এখানে জানা গেল যে, শল্টীয়েলের যোশিয় বা যিহোয়াকীমের বংশধর নন। তিনি নেরির পুত্র, তিনি মল্কির পুত্র....।

৫. মথি থেকে জানা যায় যে, সরুব্বাবিলের পুত্রের নাম অবীহূদ। আর লূক থেকে জানা যায় যে, সরুব্বাবিলের পুত্রের নাম রীষা। মজার কথা হলো, ১ বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ে সরুব্বাবিলের সন্তানগণের নাম লেখা আছে, সেখানে অবীহূদ বা রীষা কোন নামই লেখা নেই। এজন্য প্রকৃত সত্য কথা হলো, মথি ও লূক উভয়ের বর্ণনাই ভুল।

৬. মথির বিবরণ অনুযায়ী দায়ূদ থেকে যীশু পর্যন্ত উভয়ের মাঝে ২৬ প্রজন্ম। আর লূকের বর্ণনা অনুযায়ী উভয়ের মাঝে ৪১ প্রজন্ম। দায়ূদ ও যীশুর মধ্যে ১০০০ বছরের ব্যবধান। এতে প্রত্যেক প্রজন্মের সময়কাল মথির বিবরণ অনুসারে ৪০ বছর এবং লূকের বর্ণনা অনুসারে ২৫ বছর।

এই দুই অধ্যায়ের মধ্যে এই পরস্পরবিরোধিতা সামান্যতম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। ফলে এই দুই 'সুসমাচারের' প্রসিদ্ধিলাভের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সকল যুগের খৃস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণ এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা প্রদান করে চলেছেন, যেগুলি সবই দুর্বল ও অপ্রাসঙ্গিক। একারণে অনেক খৃস্টান গবেষক স্বীকার করে নিয়েছেন যে, উভয় বর্ণনা অর্থগতভাবেই পরস্পরবিরোধী। এদের মধ্যে রয়েছেন একহর্ন, সীজার, হীস, ডিওট, উইনস, ফারশ প্রমুখ।

এই মতটিই বাস্তবসম্মত ও ন্যায় দাবি। যদি এমন হতো যে, এই দুই সুসমাচারের অন্য কোথাও কোন বৈপরীত্য, পরস্পরবিরোধিতা বা অসংলগ্নতা নেই, শুধু এই স্থানেই আছে, তাহলে হয়ত অযৌক্তিক বা দূরবর্তী কোন ব্যাখ্যা দিয়ে উভয়ের সমন্বয়ের চেষ্টা করা যেত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হলো, এই দুই সুসমাচারের আরো অনেক স্থানে অনেক বৈপরীত্য বা পরস্পর-বিরোধিতা রয়েছে। সেগুলির মত এটিও আরেকটি নমুনা। একে মেনে না নিয়ে অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা করে সমন্বয়ের চেষ্টা করা বাতুলতা।

লূকলিখিত সুসমাচারের তৃতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় আদম ক্লার্ক বিভিন্ন পণ্ডিতের ব্যাখ্যাগুলি উল্লেখ করেছেন এবং একটিও গ্রহণ করেন নি। তিনি এ বিষয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা প্রকাশ করেছেন। এরপর তাঁর ভাষ্যগ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৪০৮ পৃষ্ঠায় মিস্টার হারমারসির একটি অগ্রহণযোগ্য ওযরখাহি পেশ করেছেন। তিনি বলেন : "ইহূদীগণ সুন্দররূপে বংশতালিকার নথিপত্র সংরক্ষণ করতেন। সকল জ্ঞানী মানুষই জানেন যে, প্রভুর বংশতালিকা বর্ণনায় মথি ও লূক এত ব্যাপকভাবে পরস্পরবিরোধিতা করেছেন যে, প্রাচীন ও আধুনিক গবেষক পণ্ডিতগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে সুসমাচার লেখকের উপর আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে সকল আপত্তি তার পক্ষেই গিয়েছে। অনুরূপভাবে এই আপত্তিও পরিষ্কার হলে সুসমাচার লেখকের পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণে পরিণত হবে। কিন্তু সময়ই তা প্রমাণ করবে।"

এখানে তিনি স্বীকার করছেন যে, উভয়ের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা এত ব্যাপক যে, "প্রাচীন ও আধুনিক গবেষক পণ্ডিতগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন।"

তিনি বলেছেন : "ইহূদীগণ সুন্দররূপে বংশতালিকার নথিপত্র সংরক্ষণ করতেন।" তাঁর এই কথাটি সঠিক নয়। কারণ ইহূদীদের বংশতালিকার নথিপত্র বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ও হারিয়ে যায়। এজন্য স্বয়ং ইয্রা ও তাঁর সহচর দুই ভাববাদী (হেগয় ও সখরিয়) কোন কোন বংশ বর্ণনায় ভুল করেছেন। এই ভাষ্যকারও সে কথা স্বীকার করেছেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আলোচ্যের ১৬শ প্রমাণে পাঠক তা দেখবেন।

ইয্রার যুগে যখন এই অবস্থা ছিল, তখন যীশুশিষ্যদের যুগের অবস্থা কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। আর যদি রাজা ও পুরোহিতদের বংশ তালিকাই সংরক্ষিত না থাকে তাহলে অতিসাধারণ হতদরিদ্র সূত্রধর যোশেফ-এর আর কী মূল্য থাকে?

তিনজন ভাববাদী বংশবর্ণনায় ভুল করেছিলেন এবং কোনটি ভুল এবং কোনটি সঠিক তা যাচাই করতে অক্ষম হয়েছিলেন। এমতাবস্থায় মথিলিখিত সুসমাচারের অজ্ঞাতনামা অনুবাদকের অবস্থা আর কি হতে পারে যে, অনুবাদকের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কিছু জানা বা তার প্রেরণা-প্রাপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, এখন পর্যন্ত যার নামও জানা যায়নি? অনুরূপভাবে একথা সুনিশ্চিত যে, লূক যীশুশিষ্যগণের (apostles) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি ঐশ্বরিক প্রেরণা-প্রাপ্ত ছিলেন বলে কখনোই প্রমাণিত হয়নি।

এজন্য এক্ষেত্রে যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় তা হলো, মথি ও লূক সূত্রধর যোশেফের বংশতালিকার বিবরণে দুইটি পৃথক কাগজ পেয়েছিলেন। কোনটি যে সঠিক তা নির্ণয় করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। এজন্য প্রত্যেকে নিজ অনুমান অনুসারে একটি তালিকা গ্রহণ করেছেন।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যাকার আশা করেছেন যে, "সময়ই বিষয়টিকে পরিষ্কার ও প্রমাণিত করবে।" এটা একটি ভিত্তিহীন আশা। এই দীর্ঘ ১৮০০ বছরেও বিষয়টি পরিষ্কার হয়নি। বিশেষত, গত তিন (১৭, ১৮ ও ১৯শ) শতাব্দীতে ইউরোপে বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও পুস্তকাদির গবেষণা বিষয়ক জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছে। অথচ এই সময়েও এই বিষয়টি পরিষ্কার করতে তাঁরা সক্ষম হন নি।

এ সময়ে তাঁরা সকল বিষয় গবেষণা ও অনুসন্ধান করে সংশোধিত ও পরিমার্জিত করেছেন। এমনকি ধর্মকেও তাঁরা এভাবে পরিমার্জিত করেছেন। তাঁরা প্রথমে তাঁদের ধর্মকে কিছু সংস্কার করেন। এরপর সাধারণ ক্যাথলিক ধর্মমতকে প্রথমেই বাতিল বলে বিধান প্রদান করেন। আর সকল খৃস্টানের ধর্মগুরু পোপকে ধোঁকাবাজ, মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড বলে ঘোষণা করেন। অতঃপর তাঁরা সংস্কারের প্রক্রিয়ায় মতভেদ করেন এবং

বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এরপর তাঁরা প্রতিদিন তাদের সংস্কারের মধ্যে সংযোজন ও বৃদ্ধি করতে থাকেন। এভাবে তাঁদের মধ্যে অগণিত গবেষক পণ্ডিতের জন্ম হয়েছে যাঁরা তাঁদের গবেষণার আধিক্যে সংস্কারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছেন, এমনকি তাঁরা খৃস্ট ধর্মকে বাতিল, গালগল্প ও ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী বলে বুঝে নিয়েছেন। এত কিছুর পরেও যা পরিষ্কার হলো না তা ভবিষ্যতে পরিষ্কার হবে বলে আশা করা অর্থহীন বাতুলতা ছাড়া কিছু হতে পারে না।

এই দুই সুসমাচারে প্রদত্ত পরস্পরবিরোধী বংশতালিকার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে খৃস্টানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা হলো : এমন হতে পারে যে, মথি যোষেফ-এর বংশতালিকা লিখেছেন এবং লূক মরিয়মের বংশতালিকা লিখেছেন। এই ব্যাখ্যা অনুসারে যোষেফ এলির পুত্র নয়, বরং জামাতা। কিন্তু বংশতালিকা বর্ণনায় যোষেফকে তাঁর শ্বশুর এলির পুত্র হিসাবে দেখানো হয়েছে।

এই ব্যাখ্যাটি বিভিন্ন কারণে বাতিল।

প্রথম কারণ : এই ব্যাখ্যা অনুসারে যীশু দায়ূদের পুত্র শলোমনের বংশধর থাকবেন না; বরং তিনি দায়ূদের পুত্র নাথনের বংশধর বলে প্রমাণিত হবেন। কারণ তাঁর মাতার বংশই তাঁর বংশ। তাঁর মাতার স্বামী যোষেফের বংশ যাই হোক না কেন তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। আর এই ব্যাখ্যা অনুসারে তাঁর মাতা যেহেতু নাথনের বংশধর সেহেতু তিনি নাথনের বংশধর, শলোমনের বংশধর নন। এ থেকে প্রমাণিত হবে যে, তিনি ত্রাণকর্তা মসীহ বা খৃস্ট (Christ) ছিলেন না।[১]

এজন্য প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের নেতা ক্যালভিন এই ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করে বলেন : "যে ব্যক্তি শলোমনকে যীশুর বংশতালিকা থেকে বাদ দিল, সে প্রকৃতপক্ষে যীশুর খৃস্টত্ব বা মসীহত্ব বাতিল করে দিল।"

দ্বিতীয় কারণ : এই ব্যাখ্যা তখনই গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে যখন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস থেকে দুইটি বিষয় প্রমাণিত হবে। প্রথমত, মরিয়মের পিতার নাম ছিল এলি এবং দ্বিতীয়ত, তিনি নাথনের বংশধর ছিলেন। শুধু সম্ভাবনা দিয়ে এখানে কিছু বলা অর্থহীন। বিশেষত যেখানে আদম ক্লার্ক ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যাখ্যাকার এই ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাঁদের নেতা ক্যালভিন তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেখানে এই ব্যাখ্যাকে দাঁড় করাতে হলে সুস্পষ্টভাবে উপরের বিষয় দুইটি প্রমাণ করতে হবে। আর প্রকৃত সত্য হলো কোন শক্তিশালী প্রমাণ তো দূরের কথা, কোন দুর্বল প্রমাণ দিয়েও উপরের বিষয় দুইটি প্রমাণিত করা যায় নি।

---

১. কারণ বাইবেলের সকল বর্ণনা এবং ইহূদী ও খৃস্টানগণের সকলেই একমত যে, ত্রাণকর্তা মসীহ বা খৃস্ট শলোমনের বংশধর হবেন।

উপরন্তু, এর বিপরীত বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। যাকোবের সুসমাচার[১] (Gospel of James/Protevangelium of James)[২] পুস্তকটিতে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মরিয়মের পিতার নাম ছিল যিহোয়াকীম (Jehoi'akim) ও মাতার নাম আনা (হিব্রু Hannah, ল্যাটিন Anna ও ইংরেজি Anne)। বর্তমান যুগের খৃস্টানগণ মনে করেন যে, এই সুসমাচারটি ঐশ্বরিক বা অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত গ্রন্থ নয় এবং যীশুর শিষ্য যাকোব-এর রচিত নয়। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, গ্রন্থটি প্রথম যুগের কোন খৃস্টান ধর্মগুরুর রচিত এবং অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচয়িতা প্রথম শতাব্দীর প্রাচীন ধর্মগুরুদের একজন। এজন্য গ্রন্থটি ঐশ্বরিক গ্রন্থের মর্যাদা না পেলেও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এই গ্রন্থে প্রদত্ত কোন তথ্যের বিপরীতে শুধু 'সম্ভাবনা' ভিত্তিক কোন কথার কোন মূল্য নেই।

একেস্টাইন লিখেছেন যে, তাঁর যুগে (৪র্থ খৃস্টীয় শতকে) প্রচলিত কোন কোন গ্রন্থে স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে যে, মরিয়ম লেবির বংশধর। এই মতানুসারে তিনি নাথনের বংশধর হতে পারেন না।[৩]

নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন :

প্রথমত, গণনাপুস্তকের ৩৬ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, ইহূদীদের প্রত্যেক পুরুষ তার নিজের বংশে ও নিজের গোত্রের মধ্যে বিবাহ করতেন। অনুরূপভাবে তাদের মহিলাগণ প্রত্যেকে নিজের বংশে ও নিজের গোত্রের মধ্যে বিবাহ করতেন। (সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্দেশে মোশি বিধান প্রদান করেন)। এই বিধানের উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রত্যেক বংশের ও গোত্রের উত্তরাধিকার ও সম্পদ যেন নিজেদের মধ্যে থাকে এবং এক বংশের সাথে অন্য বংশের রক্ত মিশে না যায়।

দ্বিতীয়ত, লূকলিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোহন বাপ্তাইজকের পিতা সখরিয় (যাকারিয়া)-এর স্ত্রী ছিলেন হারোণ-বংশীয়া।[৪] এই সুসমাচারে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, মরিয়ম যাকারিয়ার স্ত্রীর আত্মীয়া বা চাচাতো/মামাতো বোন (Cousin) ছিলেন[৫]।

১. যীশুখৃস্টের ভ্রাতা জেমস বা যাকোবের নামে প্রচারিত একটি গসপেল।

২. এই সুসমাচারে যীশুখৃস্টের জন্ম ও শিশুকাল সম্পর্কে অনেক কাহিনী আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন : The New Encyclopedia Britannica, vol-2, Biblical Literature, p 973.

৩. কারণ যাকোব (ইয়াকূব আ.) বা ইস্রায়েলের ১২ সন্তানের একজন লেবি ও অন্যজন যিহূদা। মোশি ও হারোণ ছিলেন লেবির বংশধর। অপরদিকে দায়ূদ ছিলেন যিহূদার বংশধর। লেবির বংশধর হলে যিহূদার বংশধর বা দায়ূদের বংশধর হওয়া যায় না।

৪. "... সখরিয় নামে একজন যাজক ছিলেন; তাঁহার স্ত্রী হারোণ-বংশীয়া, তাঁহার নাম ইলীশাবেৎ।" লূক ১/৫।

৫. "...আর দেখ, তোমার জ্ঞাতি যে ইলিশাবেৎ (Thy cousin Elisabeth) তিনিও বৃদ্ধ বয়সে পুত্রসন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছেন...।" লূক ১/৩৬।

তৃতীয়ত, উপরের বিষয় দুইটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মরিয়মের লেবি-বংশীয় হওয়ার যে কথাটি কোন কোন গ্রন্থে লিখিত হয়েছে সেই বিষয়টিই সঠিক। কারণ যোহনের মাতা ইলীশাবেৎ (এলিজাবেথ) হারোণ-বংশীয়া হলে তাঁর চাচাতো বোন মরিয়মও অবশ্যই হারোন-বংশীয়া হবেন।

চতুর্থত, উপরের বিষয়গুলির আলোকে একথা স্পষ্ট যে, হারোণ-বংশীয়া মরিয়মের স্বামী যোশেফও অবশ্যই হারোণ বংশীয় ছিলেন। কারণ তোরাহ্-এ স্পষ্ট বিধান দেওয়া হয়েছে যে, ইহূদীদের প্রত্যেক নারী ও পুরুষ তার নিজ বংশে ও গোত্রের মধ্যে বিবাহ করবে।

উপরের বিষয়গুলির আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, উভয় সুসমাচারের বিবরণই ভুল এবং ত্রিত্ববাদীদের জালিয়াতি। যীশুকে দায়ূদের বংশধর প্রমাণ করার জন্য তারা জালিয়াতি করে এই বংশতালিকা তৈরি করেছেন যেন ইহূদীরা তাদের প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা মসীহ বা খৃস্ট হওয়ার বিষয়ে আপত্তি না তুলতে পারে (কারণ তোরাহ ও পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন পুস্তকের অগণিত বর্ণনা ও ইস্রায়েলীয় ভাববাদীগণের ভবিষ্যৎ-বাণী অনুসারে ইহূদীগণ বিশ্বাস করেন যে, প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী মসীহ অবশ্যই যিহূদার বংশধারায় দায়ূদের পুত্র শলোমনের বংশের হবেন)।

যেহেতু এই সকল 'সুসমাচার' বা 'ইঞ্জিল' দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রচলন ও প্রসিদ্ধি লাভ করেনি, এজন্য এক বিকৃতিকারী অন্য লেখকের বানোয়াট বিকৃতির বিষয়ে জানতে পারেন নি। এজন্য উভয়ের বিকৃতির মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

তৃতীয় কারণ : মরিয়ম যদি এলির কন্যা হতেন তাহলে প্রাচীন খৃস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণের তা জানা থাকতো। আর বিষয়টি তাঁদের জানা থাকলে তাঁরা বংশতালিকা দুইটির সমন্বয়ের জন্য এতসব আজেবাজে ও ফালতু ব্যাখ্যা করতেন না, যেগুলিকে পরবর্তীতে যুগের ধর্মগুরু পণ্ডিতগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং নিন্দা করেছেন।

চতুর্থ কারণ : মথির ভাষা নিম্নরূপ : "যাকোবের পুত্র যোষেফ (and Jacob begat Joseph)"।[১] আর লূকের ভাষা নিম্নরূপ : যীশু... যোষেফের পুত্র- ইনি এলির পুত্র (and Jesus... the son of Joseph, which was the son of Heli)।[২]" উভয় বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা উভয়েই যোষেফের নিজের পিতৃ-বংশের তালিকা প্রদান করছেন।

পঞ্চম কারণ : যদি আমরা অনুমানের উপর ধরে নিই যে, মরিয়ম এলির কন্যা ছিলেন তাহলেও লূকের দেওয়া যোষেফের বংশতালিকাকে মরিয়মের বংশতালিকা বলে গ্রহণ করা যাবে না যতক্ষণ না প্রমাণিত হয় যে, ইহূদীদের রেওয়াজ ছিল যে, স্ত্রীর কোন

১. মথি ১/১৬।
২. লূক ৩/২৩।

ভাই না থাকলে জামাইকে শ্বশুরের বংশতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হতো এবং আপনাকে শ্বশুরের পুত্র হিসাবে লেখা হতো। এই বিষয়টি এখনো পর্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে প্রমাণ করা যায় নি। কতিপয় প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরু পণ্ডিতের উদ্ভট কল্পনা ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য দুর্বল বক্তব্য আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য নই।

আমরা একথা বলছি না যে, একজন মানুষকে তার নিজের জন্মদাতা পিতা ছাড়া আর কারো সাথে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করা একেবারেই অসম্ভব। আমরা মনে করি যে, পিতা ছাড়াও অন্যের সাথে একজন মানুষকে সম্পর্কিত করার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। কোন বংশীয় আত্মীয়, সামাজিক সম্পর্ক, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, জাগতিক বা ধর্মীয় প্রসিদ্ধি ইত্যাদির কারণেও একজন মানুষকে অন্য মানুষের সাথে সম্পর্কিত করা যেতে পারে। যেমন বলা হতে পারে : অমুক অমুকের ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, অমুক নেতা বা শাসকের জামাতা বা অমুকের ছাত্র, বা অমুকের মুরীদ ইত্যাদি। কিন্তু এই ধরনের সম্পর্ক উল্লেখ করা এক কথা, আর কাউকে কারো বংশধর বলে উল্লেখ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

আমরা এই দ্বিতীয় বিষয়টি অস্বীকার করছি। জামাতাকে পুত্র হিসাবে বংশতালিকায় উল্লেখ করা বা শ্বশুরকে পিতা বানিয়ে বংশতালিকা বলা ইহূদীদের রেওয়াজ ছিল বলে কখনোই প্রমাণিত হয়নি।

দ্রষ্টব্য : মথিলিখিত এই সুসমাচারটি লূকের যুগে প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য ছিল না। নইলে কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, লূক যীশুখ্রিস্টের এমন একটি বংশতালিকা প্রদান করছেন যা প্রথম নযরেই মথির প্রদত্ত বংশতালিকার বিপরীত এবং বৈপরীত্য এত কঠিন যে, সকল প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মবেত্তা পণ্ডিত যার সমাধান করতে যেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ছেন। তিনি জেনে শুনে এমন একটি কাজ করবেন অথচ এর সমাধানে একটি বা দুটি শব্দও লিখবেন না তা কিভাবে কল্পনা করা যায়?

বৈপরীত্য-৫২-৫৩

যদি কেউ মথিলিখিত সুসমাচারের ২য় অধ্যায়ের সাথে লূক লিখিত সুসমাচারের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তুলনা করেন তাহলে অত্যন্ত কঠিন বৈপরীত্য দেখতে পাবেন এবং তা থেকে তিনি নিশ্চিত হবেন যে, উভয় সুসমাচার কখনোই ঐশ্বরিক বা অনুপ্রেরণা-প্রসূত হতে পারে না। আমি এখানে শুধু দুইটি বৈপরীত্য উল্লেখ করছি :

প্রথমত, মথির কথা থেকে বুঝা যায় যে, যীশুখ্রিস্টের জন্মের পরে তাঁর পিতামাতা বৈৎলেহমেই অবস্থান করছিলেন। তাঁর বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, যীশুর জন্মের পর থেকে প্রায় দুই বছর পর্যন্ত তারা বৈৎলেহমেই অবস্থান করতেন। এই সময়ে পূর্বদেশীয় কয়েকজন পণ্ডিত সেখানে আগমন করেন। এরপর তাঁরা মিসরে গমন করেন এবং

হেরোদ (Herod[১]) রাজা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তারা মিসরেই ছিলেন। হেরোদের মৃত্যুর পরে তারা ফিরে আসেন এবং নাসরৎ নামক নগরে বসবাস করতে লাগলেন।

লূকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, বৈৎলেহমে যীশুর জন্মের পরে যখন মোশির ব্যবস্থানুসারে মরিয়মের শুচি হওয়ার সময় পূর্ণ হলো তখন মরিয়ম ও যোষেফ শিশু যীশুকে যিরূশালেমে নিয়ে যান। সেখানে বলি উৎসর্গ করার পরে তাঁরা তাঁদের নিজ নগর নাসরতে ফিরে গেলেন এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকলেন। তাঁরা সেখান থেকে প্রতি বছর নিস্তার-পর্বের সময়[২] যিরূশালেমে গমন করতেন। এভাবে নিয়মিত চলতে থাকে। যীশুর বয়স যখন ১২ বছর তখন পর্ব থেকে ফিরে আসার সময় যীশু পিতামাতাকে না জানিয়ে তিন দিন যিরূশালেমে অবস্থান করেন।

লূকের বক্তব্য অনুসারে পূর্বদেশীয় পণ্ডিতগণ কোন অবস্থাতেই বৈৎলেহমে আসতে পারেন না। তাঁরা যদি এসেও থাকেন তাহলে তাঁরা নাসরতে এসেছিলেন। যিরূশালেমে যাতায়াতের পথে তাঁদের সাথে যীশুর সাক্ষাতও সুদূরপরাহত।[৩]

অনুরূপভাবে লূকের বক্তব্য অনুসারে যীশুর পিতামাতা কখনোই মিসরে গমন করেন নি এবং মিসরে অবস্থান করেন নি। কারণ লূকের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, জন্মের পর থেকে কখনোই যীশু ইহূদীদের দেশ ছেড়ে অন্য কোন দেশে গমন করেন নি। মিসর বা অন্য কোন দেশেই নয়।

দ্বিতীয়ত, মথির বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের সংবাদ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (যীশুর জন্মের পরে প্রায় দুই বছর পর্যন্ত) যেরূশালেমবাসী এবং তাদের রাজা হেরোদ যীশুর জন্মের বিষয়ে কিছুই জানতেন না এবং তারা তাঁর শত্রু ছিলেন।

লূকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, যীশুর জন্ম-পরবর্তী শুচিলাভ করার পরেই তাঁর পিতামাতা তাঁকে নিয়ে যিরূশালেমে গমন করেন এবং সেখানে বলি উৎসর্গ করেন। তখন 'শিমিয়োন নামক ব্যক্তি' যিনি "ধার্মিক ও ভক্ত... এবং পবিত্র আত্মা তাঁহার উপরে ছিলেন। আর পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তিনি প্রভুর খৃষ্টকে দেখিতে না পাইলে মৃত্যু দেখিবেন না" সেই ব্যক্তি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে ধর্মধামে বা মন্দিরে (Temple) প্রবেশ করেন এবং যীশুকে তার কোলে তুলে নেন। তিনি

১. খৃ. পূ ৩৭ অব্দ থেকে ৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ফিলিস্তীনের শাসক ছিলেন।

২. এপ্রিলের ১৫ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত ৭ দিনব্যাপী ইহূদীদের ঈদ। মিসরের ফরৌণের হাত থেকে পলায়ন ও নিস্তার উপলক্ষে এই ঈদ। এই সময়ে তারা শলোমনের মন্দিরে জীবজানোয়ার বলি দিতেন। পরবর্তীতে এই উপলক্ষ্যে ইহূদী-বিরোধীদের সন্তানদের বলি দেওয়ার প্রথা চালু হয়।

৩. বৈৎলেহম যিরূশালেমের দক্ষিণে অবস্থিত এবং নাসরৎ যিরূশালেমের উত্তরে অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে দূরত্ব ১১৫ কিলোমিটার। কাজেই কোন অবস্থাতেই বৈৎলেহমে বসে নাসরত নিবাসী যীশুর সাথে সাক্ষাত করা সম্ভব নয়। যাতায়াতের পথেও পড়ে না।

সেখানে যীশুর গুণাবলী বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে হান্না নাম্নী এক বৃদ্ধা ভাববাদিনী "সেই দণ্ডে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন, এবং যত লোক যিরূশালেমের মুক্তির অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদিগকে যীশুর কথা বলিতে লাগিলেন।"

যদি হেরোদ ও যিরূশালেমবাসিগণ যীশুর সাথে শত্রুভাবাপন্ন হতেন, তাহলে কখনোই ধর্মধামের মধ্যে, যেখানে সদাসর্বদা লোকজন সমবেত থাকত, শিমিয়োন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে এভাবে যীশুর গুণাবলি বর্ণনা করতেন না। আর হান্না ভাববাদিনীও এভাবে হেরোদের রাজধানী যিরুশালেমের সকল মানুষকে যীশুর কথা বলতেন না।

মাননীয় নর্টন সাহেব 'সুসমাচারের' (গসপেল বা ইঞ্জিল-এর) পক্ষে প্রতিরক্ষা প্রদানকারী একজন পণ্ডিত। কিন্তু তিনি এখানে স্বীকার করেছেন যে, উভয় বর্ণনার মধ্যে সত্যিকারের অর্থগত বৈপরীত্য রয়েছে। তিনি বলেছেন যে, মথির বর্ণনা ভুল এবং লূকের বর্ণনাই সঠিক।

বৈপরীত্য-৫৪

মার্কলিখিত সুসমাচারের ৪র্থ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, যীশু সমুদ্রের তীরে উপস্থিত জনগণকে 'দৃষ্টান্তভিত্তিক উপদেশাবলী' প্রদান করেন। এরপর তিনি উপস্থিত সকলকে চলে যেতে বলেন এবং এরপর রাতে সমুদ্রের মধ্যে ঝড় ওঠে এবং প্রবল তরঙ্গমালার সৃষ্টি হয়।

মথিলিখিত সুসমাচারের অষ্টম অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, উপস্থিতদেরকে চলে যেতে বলা এবং সমুদ্রের ঝড় ও তরঙ্গমালার ঘটনা দুইটি ঘটেছিল যীশু পর্বতে দত্ত উপদেশের পরে। এর অনেক পরে ১৩ অধ্যায়ে মথি 'দৃষ্টান্তভিত্তিক উপদেশাবলী' উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই ঘটনাটি ঝড়ের ঘটনার অনেক পরে ঘটেছিল। কারণ মথির বর্ণনামতে গালীলের পর্বতের উপরে প্রদত্ত উপদেশের অনেক পরে সমুদ্রতীরের 'দৃষ্টান্ত ভিত্তিক উপদেশ' প্রদানের ঘটনা ঘটেছিল।

দুইটি বিবরণের একটি অবশ্যই ভুল। যারা নিজেরা দাবি করছেন যে, তাঁরা ঐশ্বরিক প্রেরণার ভিত্তিতে লিখছেন, অথবা যাদের পক্ষে দাবি করা হচ্ছে যে, তাঁরা ঐশ্বরিক প্রেরণার ভিত্তিতে লিখেছেন তাদের জন্য ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে আগে পিছে করে বর্ণনা করা ও ঘটনার সময়কালকে অগ্রবর্তী বা পশ্চাদবর্তী করা পরস্পরবিরোধিতা বলে গণ্য হবে।

বৈপরীত্য-৫৫

মার্ক তাঁর সুসমাচারের ১১শ অধ্যায়ে লিখেছেন যে, যীশুর যিরুশালেমে প্রবেশের তৃতীয় দিনে তাঁর সাথে ইহূদী প্রধান যাজক, অধ্যাপক ও প্রাচীনবর্গের বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আর মথি ১১শ অধ্যায়ে লিখেছেন যে, যিরূশালেমে প্রবেশের দ্বিতীয় দিনে এই বিতর্ক সংঘটিত হয়। উভয় বর্ণনার একটি ভুল।

উপর্যুক্ত ৫৪ ও ৫৫ নং বৈপরীত্যের বিষয়ে বাইবেল-ব্যাখ্যাকার হর্ন ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ২৭৫ ও ২৭৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন : "এই অবস্থাগুলিতে উভয় তথ্যের মধ্যে সমন্বয় দেওয়ার জন্য কোন প্রকার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।"

বৈপরীত্য-৫৬

মথি তাঁর গ্রন্থের ৮ম অধ্যায়ে লিখেছেন যে, পর্বতের উপরে উপদেশ প্রদানের পরে যীশু প্রথমে একজন কুষ্ঠীকে সুস্থ করেন। এরপর তিনি কফরনাহূমে প্রবেশ করার পরে একজন শতপতির দাসকে সুস্থ করেন। এরপর পিতরের শাশুড়ীর জ্বর ভাল করেন।

লূক তাঁর সুসমাচারের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথমে পিতরের[১] শাশুড়ীর জ্বর ভাল করার কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর ৫ম অধ্যায়ে কুষ্ঠীকে ভাল করার কথা লিখেছেন। এরপর ৭ম অধ্যায়ে শতপতির দাসকে সুস্থ করার কথা উল্লেখ করেছেন।

ঘটনা-পরম্পরা বর্ণনার ক্ষেত্রে উভয় বর্ণনার একটি ভুল বলে গণ্য হবে।[২]

বৈপরীত্য-৫৭

যোহন বাপ্তাইজকের বিষয়ে যোহনলিখিত সুসমাচারে উল্লেখ করা হয়েছে : "যিহূদীগণ কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে দিয়া তাঁহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, 'আপনি কে?' তখন তিনি স্বীকার করিলেন... যে, আমি সেই খৃষ্ট নই। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি? আপনি কি এলিয় (Eli'jah)? তিনি বলিলেন, আমি নই।"[৩]

এখানে যোহন স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন যে, তিনি এলিয় নন।

অপরদিকে মথিলিখিত সুসমাচারের ১১শ অধ্যায়ের ১৪ আয়াতে এই যোহন বাপ্তাইজকের বিষয়ে যীশু বলেছেন : "আর তোমরা যদি গ্রহণ করিতে সম্মত হও, তবে জানিবে, যে এলিয়ের আগমন হইবে, তিনি এই ব্যক্তি।"

এছাড়া মথিলিখিত সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ে রয়েছে : '১০ তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে অধ্যাপকেরা কেন বলেন যে, প্রথমে এলিয়ের আগমন হওয়া আবশ্যক? ১১ তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সত্য বটে, এলিয় আসিবেন, এবং সকলই পুনঃস্থাপন করিবেন; ১২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এলিয় আসিয়া গিয়াছেন, এবং লোকেরা তাঁহাকে চিনে নাই, বরং তাঁহার প্রতি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়াছে; তদ্রূপ

১. লূক ৪/৩৮ এ শিমোনের শাশুড়ী বলা হয়েছে। পিতরের আরেক নাম শিমোন।

২. এ সকল বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, 'সুসমাচারের' লেখকগণ কেউই যীশুর সহচর ছিলেন না বা এ সকল ঘটনা চাক্ষুস দেখেন নি। তাঁরা লোকমুখে শুনে বিভিন্ন ঘটনা সংকলন করেছেন, ফলে সঠিক পরম্পরা জানতে বা লিখতে পারেন নি।

৩. যোহন ১/১৯-২১

মনুষ্যপুত্রকেও তাহাদের হইতে দুঃখভোগ করিতে হইবে। ১৩ তখন শিষ্যেরা বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে যোহন বাপ্তাইজকের বিষয় বলিয়াছেন।"

মথির এই দুই বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, যোহন বাপ্তাইজকই ছিলেন প্রতিশ্রুত এলিয়। এতে যোহনের বক্তব্য ও যীশুর বক্তব্যের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা ও বৈপরীত্য দেখা দিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বাইবেল অনুসারে যীশু প্রতিশ্রুত মসীহ নন

যদি কেউ বাইবেলের বক্তব্যগুলি ভালভাবে চিন্তা করেন তবে যীশুকে সত্যিকার প্রতিশ্রুত মসীহ (The Messiah) বা খৃস্ট (The Christ, The Anointed) বলে মানতে পারবেন না। নিম্নের চারিটি বিষয় থেকে তা বুঝা যায় :

প্রথম বিষয় : যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমের সময়ে তৎকালীন ভাববাদী যিরমিয়কে সদাপ্রভু নির্দেশ প্রদান করেন একটি জড়ান পুস্তকে সদাপ্রভুর বাক্যগুলি লিখে সকল ইস্রায়েল সন্তানকে শোনানোর জন্য। যিরমিয়র শিষ্য বারূক যিরমিয়ের মুখ থেকে বাক্যগুলি শুনে এক জড়ান পুস্তকে লিখেন। অবাধ্য পাপী রাজা যিহোয়াকীমকে পুস্তকখানি কেটে টুকরো করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। তখন যিরমিয় ভাববাদীর নিকট সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হয় (ওহী নাযিল হয়) : "অতএব যিহূদা রাজ যিহোয়াকীমের বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন; দায়ূদের সিংহাসনে উপবেশন করিতে তাহার কেহ থাকিবে না (He shall have none to sit upon the throne of David)।"[১]

এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকের ৩৬ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

বাইবেলের স্পষ্ট ঘোষণা এবং ইহূদী ও খৃস্টানদের বিশ্বাস হলো, প্রতিশ্রুত মসীহ বা খৃস্ট অবশ্যই দায়ূদের সিংহাসনে বসবেন। দায়ূদের সিংহাসনে বসার জন্যই তাঁর আগমন হবে। লূক তাঁর সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে লিখেছেন যে, গাব্রিয়েল দূত (জিবরাঈল আ.) মরিয়মকে যীশুর বিষয়ে বলেন : "আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন।"[২]

দ্বিতীয় বিষয় : প্রতিশ্রুত মসীহ বা খৃস্টের আগমনের শর্ত হলো, তাঁর পূর্বে এলিয়ের আগমন হবে। যে সকল কারণে ইহূদীগণ যীশুকে প্রতিশ্রুত মসীহ বলে মানতে অস্বীকার করেন তার অন্যতম কারণ ছিল যে, এলিয় তখনো আগমন করেন নি। মসীহ-এর আগমনের পূর্বে এলিয়ের আগমন জরুরী। যীশু নিজেও স্বীকার করেছেন যে, এলিয় প্রথমে আসবেন। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, তিনি এসেছেন, কিন্তু মানুষেরা তাঁকে চিনতে পারে নি।

---

১. যিরমিয় ৩৬/৩০।
২. লূক ১/৩২।

তৃতীয় বিষয় : খৃষ্টানগণের মত হলো, অলৌকিক কর্মকাণ্ড দেখানোর ক্ষমতা কোন ব্যক্তির ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হওয়া তো দূরের কথা, তার ভাববাদিত্বের প্রমাণও নয়। এমনকি অলৌকিকত্ব কারো বিশ্বাসের বিশুদ্ধতার প্রমাণও নয়।

মথিলিখিত সুসমাচারের ২৪ অধ্যায়ের ২৪ আয়াতে যীশুর বক্তব্য নিম্নরূপ : "ভাক্ত খ্রীষ্টেরা ও ভাক্ত ভাববাদীরা (false Christs and false prophets) উঠিবে, এবং এমন মহৎ মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভুত অদ্ভুত লক্ষণ (great signs and wonders) দেখাইবে যে, যদি হইতে পারে, তবে মনোনীতদিগকেও ভুলাইবে।"

থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯ আয়াতে পৌল দাজ্জাল বা পাপ-পুরুষ ও বিনাশ-সন্তান সম্পর্কে লিখেছেন : "সেই ব্যক্তির আগমন শয়তানের কার্যসাধন অনুসারে মিথ্যার সমস্ত পরাক্রম ও নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ সহকারে হইবে।"

চতুর্থ বিষয় : যদি কেউ ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করার আহ্বান করে তাহলে তোরাহ্-এর বিধান মতে তাকে হত্যা করা অত্যাবশ্যক, যদিও সেই ব্যক্তি মহৎ মহৎ অলৌকিক কর্মকাণ্ড দেখাতে সক্ষম হয়। আর এই ব্যক্তির চেয়েও নিকৃষ্ট হলো ঐ ব্যক্তি যে নিজের জন্য ঈশ্বরত্ব দাবি করে। আর এই ব্যক্তিও ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো উপাসনার আহ্বান করে; কারণ এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য ব্যক্তিত্ব। এজন্য নিজের ঈশ্বরত্বের দাবি করে নিজের উপাসনার প্রতি মানুষদেরকে আহ্বান করার অর্থ হলো ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো উপাসনার প্রতি আহ্বান করা। এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে এই বিষয়টি প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

উপরের চারিটি বিষয়ের আলোকে যীশু প্রতিশ্রুত মসীহ বা খৃষ্ট হতে পারেন না। কারণ,

১. মথিলিখিত সুসমাচারের বংশতালিকা অনুসারে যীশু যিহোয়াকীমের বংশধর। কাজেই তিনি কোন অবস্থাতেই দায়ূদের সিংহাসনে বসার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। প্রথম বিষয়টি থেকে তা জানা যায়।

২. যীশুর পূর্বে এলিয় আসেন নি; কারণ যোহন নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি এলিয় নন। আর তিনি নিজে যে কথা অস্বীকার করেছেন তার বিষয়ে অন্য কেউ সেকথা বললে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। একথা তো কল্পনা করা যায় না যে, এলিয় একজন ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত ভাববাদী হবেন, অথচ নিজের পদমর্যাদা ও অবস্থা সম্পর্কে তিনি নিজেই জানবেন না। এভাবে আমরা দেখি যে, দ্বিতীয় বিষয়টির আলোকে যীশু প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা খৃষ্ট হতে পারেন না।

৩. ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানগণের ধারণা অনুসারে যীশু নিজের জন্য ঈশ্বরত্ব দাবি করেছেন। কাজেই চতুর্থ বিষয় অনুসারে তাকে হত্যা করা অত্যাবশ্যক। সুসমাচারসমূহে উল্লিখিত অলৌকিক কর্মকাণ্ড সঠিক বলে বিপক্ষের কাছে প্রমাণিত নয়। সেগুলিকে যদি সত্য বলে ধরেও নেওয়া হয় তাহলেও সেগুলি যীশুর বিশ্বাসের বিশুদ্ধতারও প্রমাণ নয়, ভাববাদিত্বের প্রমাণ হওয়া তো দূরের কথা। তাহলে বলতে হবে যে, তোরাহ-এর বিধান অনুসারে তাঁকে হত্যা করে ইহূদীরা ঠিক কাজই করেছিল (না'উযূ বিল্লাহ।)

৪. এই মসীহ, যাকে খৃস্টানগণ প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা খৃস্ট বলে বিশ্বাস করেন এবং ইহূদীগণের মসীহ দাজ্জাল-এর মধ্যে পার্থক্য কি? কিভাবে বুঝা যাবে যে, ইনি সত্যবাদী ও তিনি মিথ্যাবাদী? প্রত্যেকেই তো নিজের জন্য সঠিকত্ব দাবি করছেন এবং খৃস্টানগণের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীই উভয়েই মহান মহান অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করছেন। কাজেই এখানে অবশ্যই এমন একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন থাকতে হবে, যদ্বারা সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করে চেনা যাবে এবং বিরুদ্ধবাদীও যা মানতে বাধ্য হবেন।

আমরা মহিমাময় মহান আল্লাহর প্রশংসা করি যে, তিনি তাঁর প্রিয়তম নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে এই সব ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, মরিয়মের পুত্র যীশু সত্য নবী ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন প্রতিশ্রুত মসীহ। তিনি কখনোই নিজের জন্য ঈশ্বরত্বের দাবি করেন নি। ত্রিত্ববাদিগণ তাঁর নামে মিথ্যাচার করে তাঁর জন্য ঈশ্বরত্বের দাবি করেছে।

বৈপরীত্য-৫৮-৬৩

মথিলিখিত সুসমাচারের ১১শ অধ্যায়ে, মার্কলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ে এবং লূকলিখিত সুসমাচারের ৭ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে (ইনি সেই ব্যক্তি যাঁহার বিষয়ে লেখা আছে/ যিশাইয় ভাববাদীর গ্রন্থে যেমন লেখা আছে) :

"দেখ, আমি আপন দূতকে তোমার সম্মুখে/ অগ্রে প্রেরণ করি; সে তোমার অগ্রে তোমার পথ প্রস্তুত করিবে।"

বাইবেল ভাষ্যকারগণ উল্লেখ করেছেন যে, এই তিন সুসমাচার লেখক এই বক্তব্যটি মালাখি ভাববাদীর পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ের ১ম আয়াত থেকে উদ্ধৃত করেছেন। মালাখির আয়াতটি নিম্নরূপ : "দেখ, আমি আপন দূতকে প্রেরণ করিব, সে আমার অগ্রে পথ প্রস্তুত করিবে।"

এখানে আমরা দেখছি যে, মূল পাঠ ও উদ্ধৃত পাঠের মধ্যে দুই প্রকারের বৈপরীত্য রয়েছে :

প্রথমত, প্রথম বাক্যে 'আমি আপন দূতকে তোমার সম্মুখে প্রেরণ করিব' এই কথাটির মধ্যে 'তোমার সম্মুখে' কথাটি মালাখির বক্তব্যে নেই, অথচ তিন সুসমাচার লেখক তা বাড়িয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, মালাখির বক্তব্যে দ্বিতীয় বাক্যে প্রথম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে: 'আমার অগ্রে'; অথচ তিন সুসমাচার লেখকই মধ্যম পুরুষের সর্বনাম দিয়ে লিখেছেন 'তোমার অগ্রে'।

হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ড. রুডলফ থেকে উদ্ধৃত করেছেন: "এই বৈপরীত্যের কারণ ব্যাখ্যা করা সহজ নয়; তবে এতটুকু বলা যায় যে, প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলিতে কিছু বিকৃতি সাধিত হয়েছিল।"

তাহলে তিন সুসমাচারে দুইটি করে বৈপরীত্য হিসাবে এখানে মোট ৬টি বৈপরীত্য আছে।

বৈপরীত্য-৬৪-৬৭

১. মথিলিখিত সুসমাচারের ২য় অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ আয়াতটি মীখা ভাববাদীর পুস্তকের ৫ম অধ্যায়ের ২য় আয়াতের বিপরীত।[১]

২. আরবী অনুবাদ অনুসারে গীতসংহিতা পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের এবং অন্যান্য ভাষার অনুবাদ অনুসারে গীতসংহিতার ১৬ অধ্যায়ের ৮ থেকে ১১ পর্যন্ত ৪টি আয়াত প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৫ থেকে ২৮ পর্যন্ত ৪ আয়াতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিন্তু উদ্ধৃতির মধ্যে অনেক বিকৃতি ও পরিবর্তন করা হয়েছে।

৩. ইব্রীয়দের প্রতি পত্রে ১০ অধ্যায়ের ৫-৭ তিন আয়াতে পৌল গীতসংহিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আরবী অনুবাদ অনুসারে গীতসংহিতা পুস্তকের ৩৯ অধ্যায়ের এবং অন্যান্য ভাষার অনুবাদ অনুসারে গীতসংহিতার ৪০ অধ্যায়ের ৬-৮ তিনটি আয়াত পৌল তাঁর পত্রের উক্ত স্থানে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু উদ্ধৃতির মধ্যে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে।[২]

---

১. মথি লিখেছেন: 'ভাববাদী দ্বারা এইরূপ লিখিত হইয়াছে: আর তুমি, হে যিহূদা দেশের বৈৎলেহম, তুমি যিহূদার অধ্যক্ষদের মধ্যে কোন মতে ক্ষুদ্রতম নও...।" খৃষ্টান পণ্ডিতগণ একমত যে, এখানে ভাববাদীর লেখা বলতে মীখা ভাববাদীর পুস্তকের ৫ অধ্যায়ের দুই আয়াত বুঝানো হচ্ছে। আয়াতটি নিম্নরূপ: 'আর তুমি, হে বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সহস্রগণের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলিয়া অগণিতা..."। এখানে মথি আয়াতটিকে সম্পূর্ণ বিকৃত ও পরিবর্তিত করে উদ্ধৃত করেছেন।

২. পৌল ও তার সহচরগণ নিজেদের নতুন মতবাদগুলি পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চাইতেন। এই উদ্ধৃতিগুলি তারা বিকৃত করতেন, যেন তাদের মত সমর্থন করে। এখানে মূল আয়াতে মোশির ব্যবস্থা (শরীয়ত) সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে, অথচ পৌল আয়াতগুলি বিকৃত করে এরপর বিকৃত উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝাচ্ছেন যে, মোশির ব্যবস্থা পুরাতন ও রহিত হয়ে গিয়েছে এবং যীশু নতুন নিয়ম প্রচলন করতে এসেছিলেন।

৪. প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ১৫ অধ্যায়ের ১৬-১৭ দুইটি আয়াতে আমোষ ভাববাদীর পুস্তকের ৯ম অধ্যায়ের ১১-১২ দুইটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। উদ্ধৃতিতে আয়াত দুটিতে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে।[১]

বাইবেলের ব্যাখ্যাকারগণ এই স্থানগুলির বৈপরীত্য ও পরস্পর-বিরোধিতা স্বীকার করেছেন এবং তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, বাইবেলের হিব্রু কপিটি বিকৃত। এই স্থানগুলিতে অনেক উদ্ধৃতি ও উদ্ধৃত বক্তব্যের মধ্যে অনেক বৈপরীত্য ও পরস্পর-বিরোধিতা রয়েছে। কিন্তু যেহেতু আমি বিস্তারিত আলোচনা করছি না, সেহেতু এগুলিকে চারিটি বৈপরীত্য বলে উল্লেখ করলাম।

বৈপরীত্য-৬৮

১ করিন্থীয় ২ অধ্যায়ের ৯ আয়াতটি নিম্নরূপ : "কিন্তু যেমন লেখা আছে, 'চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই; যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।"

বাইবেলের ভাষ্যকারগণ বলেছেন যে, এই উদ্ধৃতিটি যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৬৪ অধ্যায়ের ৪ আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে। আয়াতটি নিম্নরূপ : "কারণ পুরাকাল অবধি লোকে শুনে নাই, কর্ণে অনুভব করে নাই, চক্ষুতে দেখে নাই যে, তোমা ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর আছেন, যিনি তাঁহার অপেক্ষাকারীর পক্ষে কার্য সাধন করেন।"

উভয় বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। খৃষ্টান বাইবেল বিশারদগণ এই বৈপরীত্যের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁরা দাবি করেন যে, যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকটি বিকৃত করা হয়েছে।

বৈপরীত্য-৬৯

মথি তাঁর সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ে লিখেছেন যে, যিরীহো হতে বের হওয়ার পরে তিনি দুইজন অন্ধকে দেখতে পান, যারা পথের পাশে বসেছিল এবং তিনি তাদেরকে সুস্থ করেন। কিন্তু মার্ক তাঁর সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে লিখেছেন যে, যিরীহো হতে বের হওয়ার পরে তিনি পথে 'তিমিয়ের পুত্র বরতিময়' নামক একজন অন্ধকে দেখতে পান এবং তাকে সুস্থ করেন।[২]

বৈপরীত্য-৭০

মথি ৮ম অধ্যায়ে লিখেছেন যে, যীশু যখন গালীলের পরপারস্থ গাদারীয়দের (গেরাসেনীদের) দেশে উপস্থিত হন তখন দুইজন ভুতগ্রস্থ লোক কবরস্থান হতে বের হয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং তিনি পাগল দুইটিকে রোগমুক্ত করেন।

১. পৌল ও তাঁর সহচরগণ যীশুর শিক্ষা ও মোশির ব্যবস্থা পরিবর্তন করেন। তখন অনেকে আপত্তি করলে এই উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের কর্মের সঠিকত্ব দাবি করেন। কিন্তু মূল বক্তব্য ও উদ্ধৃত বক্তব্য তুলনা করলে পাঠক অবাক হয়ে দেখবেন যে, কিছু শব্দ ও বাক্য এমনভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে যে, অর্থ সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গিয়েছে।

২. দেখুন মথি ২০/২৯-৩৪ ও মার্ক ১০/৪৬-৫২।

অপরদিকে মার্ক ৫ম অধ্যায়ে এবং লূক ৮ম অধ্যায়ে লিখেছেন যে, এ সময়ে একজন ভুতগ্রস্থ ব্যক্তি কবরস্থান থেকে বের হয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং তিনি তাকে রোগমুক্ত করেন।[১]

বৈপরীত্য-৭১

মথি ২১ অধ্যায়ে লিখেছেন, যিরূশালেমের নিকটবর্তী হওয়ার পরে যীশু তাঁর দুইজন শিষ্যকে নিকটবর্তী গ্রামে প্রেরণ করেন 'গর্দভী ও তার সাথে তার বৎসটিকে' খুলে আনার জন্য। শিষ্যদ্বয় গর্দভী ও তার বৎসটিকে খুলে এনে যীশুকে দেন এবং যীশু উভয়ের উপর আরোহণ করেন। বাকি তিন সুসমাচার লেখক উল্লেখ করেছেন যে, এ সময়ে যীশু তাঁর দুইজন শিষ্যকে প্রেরণ করেন 'গর্দভশাবকটিকে' নিয়ে আসতে। তারা গর্দভশাবকটিকে নিয়ে আসেন এবং যীশু তার উপরে আরোহণ করেন।[২]

বৈপরীত্য-৭২

মার্ক ১ম অধ্যায়ে লিখেছেন, যোহন বাপ্তাইজক 'পঙ্গপাল ও বনমধু ভোজন করিতেন।' কিন্তু মথি ১১শ অধ্যায়ে লিখেছেন যে, যোহন ভোজন ও পান কিছুই করিতেন না।[৩]

বৈপরীত্য-৭৩-৭৫

যদি কেউ মার্কলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়, মথিলিখিত সুসমাচারের ৪র্থ অধ্যায় ও যোহনলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের মধ্যে তুলনা করেন তাহলে যীশুর শিষ্যদের বিশ্বাস স্থাপনের ও শিষ্যত্ব গ্রহণের পদ্ধতি বর্ণনায় তিনটি বৈপরীত্য দেখতে পাবেন।[৪]

প্রথমত, মথি ও মার্ক উভয়েই লিখছেন যে, যীশু পিতর, আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহন এই চারজনকে গালীল সমুদ্রের তীরে দেখতে পান। তখন তিনি তাদেরকে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান করেন। তাঁরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর অনুগমন করেন। কিন্তু যোহন লিখছেন যে, যাকোব ছাড়া বাকি তিনজনের সাথে যীশুর সাক্ষাত হয় যর্দন নদীর পরপারে (বৈথনিয়াতে)।

দ্বিতীয়ত, মথি ও মার্ক লিখেছেন যে, গালীলের সমুদ্রের তীরে প্রথমে পিতর ও আন্দ্রিয়র সাথে যীশুর সাক্ষাত হয়। এর অল্প পরেই এই সমুদ্র তীরেই তাঁর সাথে যাকোব ও যোহনের সাক্ষাত হয়।

কিন্তু যোহন লিখছেন যে, যোহন ও আন্দ্রিয় প্রথমে যীশুর সাথে সাক্ষাত করেন। এরপর আন্দ্রিয় তার ভাই পিতরকে যীশুর নিকট ডেকে আনেন। এরপর পরদিন যখন

১. মথি ৮/২৮-৩৪; মার্ক ৫/১-১৭; লূক ৮/২৬-৩৭।
২. মথি ২১/১-৭; মার্ক ১১/১-৮; লূক ১৯/২৮-৩৬; যোহন ১২/১৪।
৩. মার্ক ১/৬; মথি ১১/১৮।
৪. মথি ৪/১৮-২২, মার্ক ১/১৬-২০ ও যোহন ১/৩৫-৫০।

যীশু গালীলে গমনের ইচ্ছা করলেন তখন তিনি ফিলিপের দেখা পেলেন। অতঃপর ফিলিপের কথায় নথনেল যীশুর নিকট আগমন করেন। যোহনের সুসমাচারের এখানে যাকোবের কোন উল্লেখই নেই।

তৃতীয়ত, মথি ও মার্ক লিখেছেন যে, যীশুর সাথে যখন পিতর, আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহন এই চারজনের প্রথম সাক্ষাত হয় তখন প্রথম দুইজন সমুদ্রে জাল ফেলছিলেন এবং শেষ দুইজন নৌকায় জাল মেরামত করছিলেন। যোহন জালের কোনরূপ উল্লেখ করেন নি; বরং তিনি লিখেছেন যে, যোহন ও আন্দ্রিয় যোহন বাপ্তাইজকের মুখে যীশুর বিবরণ শুনে যীশুর কাছে আগমন করেন। এরপর আন্দ্রিয়র আহ্বানে তার ভাই পিতর আগমন করেন।

বৈপরীত্য-৭৬

যদি কেউ মথিলিখিত সুসমাচারের ৯ম অধ্যায়ের বর্ণিত অধ্যক্ষের কন্যাকে জীবিত করার ঘটনার সাথে মার্কলিখিত সুসমাচারের ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত উক্ত ঘটনার তুলনা করেন, তবে উভয় বর্ণনার বৈপরীত্য দেখতে পাবেন।

মথি লিখেছেন : অধ্যক্ষটি যীশুর কাছে এসে বলেন : "আমার কন্যা এতক্ষণ মরিয়া গিয়াছে : কিন্তু আপনি আসিয়া তাহার উপরে হস্তার্পণ করুন, তাহাতে সে বাঁচিবে।"

কিন্তু মার্ক লিখেছেন যে, অধ্যক্ষটি যীশুর কাছে এসে বলেন : "আমার মেয়েটি মারা যায়, আপনি আসিয়া তাহার উপরে হস্তার্পণ করুন, যেন সে সুস্থ হইয়া বাঁচে।" যীশু তার সাথে তার বাড়ি যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে "অধ্যক্ষের বাটী হইতে লোক আসিয়া কহিল, আপনার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, গুরুকে আর কেন কষ্ট দিতেছেন?"

উভয় বর্ণনার মধ্যে অর্থগত বৈপরীত্য ও পার্থক্য সুস্পষ্ট যা বর্তমান যুগের খৃস্টান গবেষক পণ্ডিতগণ মেনে নিয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ প্রথম বিবরণকে সঠিক ও দ্বিতীয়টিকে ভুল বলে মনে করেছেন, আর কেউ বিপরীত মত পোষণ করেছেন। এই বর্ণনা থেকে কেউ কেউ প্রমাণ করেছেন যে, যীশুশিষ্য মথি এই সুসমাচার লিখেন নি। তিনি যদি এই পুস্তকের রচয়িতা হতেন তাহলে এভাবে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতেন না। লূকও মার্কের অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, তবে তিনি লিখেছেন : "সমাজাধ্যক্ষের বাটি হইতে এক জন আসিয়া কহিল, আপনার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে...।"

এই ঘটনায় উল্লিখিত মেয়েটি কি প্রকৃতপক্ষেই মৃত্যুবরণ করেছিল, না সে মৃতপ্রায় অচেতন (coma) হয়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে খৃস্টান ধর্মবেত্তা পণ্ডিতগণ মতভেদ করেছেন। পণ্ডিত নিয়েন্ডার মনে করতেন যে, মেয়েটি প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুবরণ করে নি। তিনি বলেন যে, সম্ভবত মেয়েটি মরেনি, বরং সে অচেতন (coma) অবস্থায় ছিল। যীশুর কথাও তাদের কথা সমর্থন করে। যীশু মেয়েটিকে দেখে বলেছিলেন : "বালিকাটি মরে নাই, ঘুমাইয়া রহিয়াছে।" এ সকল পণ্ডিতের মতানুসারে এই ঘটনাটি মৃতকে জীবিত করার অলৌকিকত্ব বলে গণ্য হবে না।

বৈপরীত্য-৭৭

মথিলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ের ১০ আয়াত থেকে এবং লূকলিখিত সুসমাচারের ৯ অধ্যায়ের ৩ আয়াত থেকে জানা যায় যে, যীশু যখন শিষ্যদেরকে (apostles) প্রেরণ করেন তখন তাদেরকে লাঠি বা যষ্টি লইতে নিষেধ করেন।[১] কিন্তু মার্কলিখিত সুসমাচারের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৮ আয়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি তাদেরকে যষ্ঠি বা লাঠি লইতে অনুমতি প্রদান করেন।[২]

বৈপরীত্য-৭৮

মথিলিখিত সুসমাচারের ৩য় অধ্যায়ে রয়েছে : 'যীশু যোহন দ্বারা বাপ্তাইজিত হইবার জন্য গালীল হইতে যর্দনে তাঁহার কাছে আসিলেন। কিন্তু যোহন তাঁহাকে বারণ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, আপনার দ্বারা আমারই বাপ্তাইজিত হওয়া আবশ্যক, আর আপনি আমার কাছে আসিতেছেন? ...' এরপর (অনেক কথার পরে) 'যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া জল হইতে উঠিলেন। তখন 'ঈশ্বরের আত্মা' কপোতের ন্যায় তাঁহার উপর নামিয়া আসিলেন।'[৩]

যোহনলিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে যীশুর বিষয়ে যোহন বাপ্তাইজক বলেছেন যে, তিনি তাঁকে চিনতেন না, কিন্তু আত্মাকে তাঁর উপর কপোতের ন্যায় নেমে আসতে দেখে তাঁকে চিনতে পেরেছেন।[৪]

আবার মথি পরবর্তীতে ১১ অধ্যায়ে লিখেছেন যে, "পরে যোহন কারাগারে থাকিয়া খৃস্টের কর্মের বিষয় শুনিয়া আপনার শিষ্যদের দ্বারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, যাঁহার আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকিব?"[৫]

এখানে মথির প্রথম বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, যীশুর উপর আত্মা অবতরণের পূর্ব থেকেই যোহন বাপ্তাইজক যীশুকে প্রতিশ্রুত মসীহ বা খৃস্ট হিসাবে চিনতেন।

আর যোহনের বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, যীশুর উপর আত্মা অবতরণের পূর্বে যোহন তাঁকে চিনতেন না, এর পরেই শুধু তাঁকে চিনেছেন।

তৃতীয় বক্তব্য থেকে অর্থাৎ মথির পরবর্তী বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, যীশুর উপর আত্মা অবতরণের পরেও যোহন তাঁকে চিনতে পারেন নি।

'মীযানুল হক' গ্রন্থের লেখক (পাদ্রী ফানডার) তাঁর 'হাল্লুল ইশকাল' গ্রন্থের ১৩৩ পৃষ্ঠায় প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তব্যের মধ্যকার বৈপরীত্যের সমন্বয়ের জন্য একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আল-ইসতিবশার গ্রন্থের লেখক সেই ব্যাখ্যাটিকে পূর্ণরূপে খণ্ডন

১. লূক ৯/৩ : "পথের জন্য কিছুই লইও না, যষ্টিও না... ।" আরো দেখুন : মথি ১০/৯-
২. "তোমরা যাত্রার জন্য এক এক যষ্টি ব্যতিরেকে আর কিছু লইও না।"
৩. মথি ৩/১৩-১৬।
৪. যোহন ১/৩২-৩৩।
৫. মথি ১১/২।

করেছেন এবং তা মীযানুল হক গ্রন্থের প্রণেতার নিকট পাঠিয়ে দেন। আমি... 'ইযালাতুশ শুকূক' গ্রন্থে ফান্ডার সাহেবের এই ব্যাখ্যা খণ্ডন করেছি। যেহেতু ব্যাখ্যা একেবারেই দুর্বল এবং এই ব্যাখ্যা দ্বারা মথির দুই বক্তব্যের পরস্পরবিরোধিতা দূর হয় না, এজন্য আমি উক্ত ব্যাখ্যাটির আলোচনা করে বইয়ের কলেবর বাড়াতে চাই না।

বৈপরীত্য-৭৯

যোহনলিখিত সুসমাচারের ৫ম অধ্যায়ের ৩১ আয়াতে যীশু বলেন : "আমি যদি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিই তবে আমার সাক্ষ্য সত্য নয়।"

আর এই পুস্তকেরই ৮ম অধ্যায়ের ১৪ আয়াতে যীশু বলেন : "যদিও আমি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিই তথাপি আমার সাক্ষ্য সত্য।"

বৈপরীত্য-৮০

নতুন নিয়মের একাধিক পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন 'অ-ইহুদী' স্ত্রীলোক তার ভূতে-ধরা মেয়েকে সুস্থ করে দেওয়ার জন্য যীশুর নিকট কাকুতিমিনতি করেন[১], কিন্তু স্ত্রীলোকটির পরিচয় প্রদানে বৈপরীত্য রয়েছে। মথিলিখিত সুসমাচারের ১৫ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, স্ত্রীলোকটি ছিল 'কনানীয়'। অথচ মার্কলিখিত সুসমাচারের ৭ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, "স্ত্রীলোকটি ছিল গ্রীক, জাতিতে সুর-ফৈনীকী।"

বৈপরীত্য-৮১

মার্ক তাঁর সুসমাচারের ৭ম অধ্যায়ে লিখেছেন যে, উক্ত 'অ-ইহূদী' স্ত্রীলোকের ঘটনার পরে যীশু গালীল সমুদ্রের ধারে একজন 'বধির তোৎলাকে' সুস্থ করেন। মথি বিষয়টিকে বাড়িয়ে রঙ চড়িয়ে একজনকে অগণিত বানিয়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন : "আর বিস্তর লোক তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল, তাহারা আপনাদের সঙ্গে খঞ্জ, অন্ধ, বোবা, নুলা ও আরও অনেক লোককে লইয়া তাঁহার চরণের নিকট ফেলিয়া রাখিল; আর তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন।"[২]

এই রকমের রঙ চড়িয়ে বাড়ানোর আরেকটি নযির হলো অন্য চতুর্থ সুসমাচারের শেষে লেখকের কথা : "যীশু আরও অনেক কর্ম করিয়াছিলেন; যে সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তবে আমার বোধ হয়, লিখিতে লিখিতে এত গ্রন্থ হইয়া উঠে যে, জগতেও তাহা ধরে না।"[৩]

---

১. মহিলাটি ইহূদী না হওয়াতে যীশু মহিলার কন্যার ভূত ছাড়িয়ে দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, "ইস্রায়েল-কুলের হারানো মেষ ছাড়া আর কাহারো নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই। ... সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়।" মথি ১৫/২১-২৭ ও মার্ক ৭/২৫-২৮।

২. মার্ক ৭/৩১-৩৭ ও মথি ১৫/২৯-৩১।

৩. যোহন ২১/২৫।

তাঁর বিশুদ্ধ বোধ ও ধারণাটি একবার ভাবুন! আর আমাদের বোধ যে, একটি অত্যন্ত ছোট ঘরের একটি কোণেই এ সকল গ্রন্থের স্থান সংকুলান হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে এরা ছিলেন 'ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত' মানুষ। কাজেই তাঁরা 'ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা' বা ইলহাম দিয়ে যা ইচ্ছা বলবেন, তাতে কার কি বলার আছে?

বৈপরীত্য-৮২

মথিলিখিত সুসমাচারের ২৬ অধ্যায়ে রয়েছে, "যীশু তাঁর ১২ শিষ্যকে বলেন : 'তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে সমর্পণ করিবে।[১] তখন তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রত্যেক জন তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, প্রভু, সে কি আমি? তিনি উত্তর করিলেন, যে আমার সঙ্গে ভোজনপাত্রে হাত ডুবাইল[২], সেই আমাকে সমর্পণ করিবে। ... তখন যিহূদা কহিল, রব্বি, সে কি আমি? তিনি তাহাকে কহিলেন, তুমিই বলিলে।"[৩]

যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ে যীশু বলেন : "তোমাদের মধ্যে এক জন আমাকে সমর্পণ করিবে। শিষ্যেরা এক জন অন্যের দিকে চাহিতে লাগিলেন, স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি কাহার বিষয় বলিলেন। তখন যীশুর শিষ্যদের এক জন, যাঁহাকে যিশু প্রেম করিতেন (যোহন)... পিতর তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলেন ও কহিলেন, বল, উনি যাহার বিষয় বলিতেছেন, সে কে? ... যীশু উত্তর করিলেন : যাহার জন্য আমি রুটীখণ্ড ডুবাইব ও যাহাকে দিব, সেই। পরে তিনি রুটীখণ্ড ডুবাইয়া লইয়া ঈষ্করিয়োতীয় শিমোনের পুত্র যিহূদাকে দিলেন।"[৪] (এখানে মথির বর্ণনা অনুসারে যিহূদা নিজে হাত ডুবালেন। আর যোহনের বর্ণনা অনুসারে যীশু নিজে হাত ডুবালেন।)

বৈপরীত্য-৮৩

যীশুকে গ্রেফতার করার ঘটনার বর্ণনাতেও বৈপরীত্য রয়েছে। মথি তাঁর ২৬ অধ্যায়ে যীশুকে গ্রেফতার করার ঘটনার বিবরণে লিখেছেন যে, যিশুর শিষ্য ইষ্করিয়োতীয় যিহূদা, যিনি অর্থের বিনিময়ে যীশুকে ইহূদীদের হাতে সমর্পণ করেন, তিনি ইহূদীদেরকে যীশুকে চিনিয়ে দেওয়ার সঙ্কেত হিসাবে বলেন যে, "আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সে ঐ ব্যক্তি, তোমরা তাহাকে ধরিবে। সে তখনই যীশুর নিকট গিয়া বলিল, রব্বি, নমস্কার, আর তাঁহাকে আগ্রহপূর্বক চুম্বন করিল। ... তখন তাহারা নিকটে আসিয়া

১. ষড়যন্ত্র করে ইহূদীদের হাতে তুলে দিবে।

২. আরবী অনুবাদে يغمس অর্থাৎ 'ডুবাইবে'।

৩. মথি ২৬/২১-২৫।

৪. যোহন ১৩/২১-২৬।

যীশুর উপরে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে ধরিল।"[১] কিন্তু যোহন তাঁর সুসমাচারের ১৮ অধ্যায়ে লিখেছেন : "অতএব যিহূদা সৈন্যদলকে, এবং প্রধান যাজকদের ও ফরীশীদের নিকট হইতে পদাতিকদিগকে প্রাপ্ত হইয়া মশাল, দীপ ও অস্ত্রশস্ত্রের সহিত সেখানে আসিল। তখন যিশু, আপনার প্রতি যাহা যাহা ঘটিতেছে, সমস্তই জানিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, আর তাহাদিগকে কহিলেন, কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা তাঁহাকে উত্তর করিল, নাসরতীয় যীশুর। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, আমিই তিনি। আর যিহূদা যে তাঁহাকে সমর্পন করিতেছিল, সে তাহাদের সহিত দাঁড়াইয়াছিল। তিনি যখন তাহাদিগকে বলিলেন, আমিই তিনি, তাহারা পিছাইয়া গেল, ও ভূমিতে পড়িল। পরে তিনি তাহাদিগকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা বলিল, নাসরতীয় যীশুর। যীশু উত্তর করিলেন, আমি ত তোমাদিগকে বলিলাম যে, আমিই তিনি; অতএব তোমরা যদি আমার অন্বেষণ কর, তবে ইহাদিগকে যাইতে দেও।... তখন সৈন্যদল, এবং সহস্রাপতি ও যিহূদিগণের পদাতিকেরা যীশুকে ধরিল ও তাঁহাকে বন্ধন করিল... ।"[২]

বৈপরীত্য-৮৪

সুসমাচারগুলিতে বলা হয়েছে যে, যীশুর গ্রেফতারের সময় তাঁর প্রিয় শিষ্য পিতর গ্রেফতারের ভয়ে তিনবার যীশুর সাথে তার সম্পর্কের অস্বীকার করেন এবং গালি দিয়ে শপথ করে বলেন যে, তিনি যীশুকে চিনেন না। কিন্তু এই অস্বীকৃতির বিস্তারিত বর্ণনায় সুসমাচার লেখকগণ ৮ ভাগে পরস্পরবিরোধী ও বিপরীত বিবরণ প্রদান করেছেন।[৩]

প্রথম বিষয় : পিতরকে চিনতে পেরে তাকে যীশুর শিষ্য বলে দাবি করেছিলেন কে কে তার বর্ণনায় বৈপরীত্য রয়েছে। মথি ও মার্ক লিখেছেন যে, দুই জন দাসী ও উপস্থিত লোকজন তাকে যীশুর শিষ্য বলে দাবি করেন।[৪]

---

১. মথি ২৬/৪৭-৫১। মার্ক ও লূকও একইরূপ বর্ণনা করেছেন। দেখুন মার্ক ১৪/৪৩-৫২; লূক ২২/৪৭-৫৩।

২. যোহন ১৮/৩-১২। উভয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য যে কোন অতি সাধারণ পাঠকের কাছেও স্পষ্ট। যোহন-এর লেখক আগাগোড়াই যীশুকে দেবতা হিসাবে চিত্রায়িত করতে গল্প সাজিয়েছেন।

৩. পিতরের অস্বীকৃতির বিবরণ মথি ২৬/৬৯-৭৫; মার্ক ১৪/৬৬-৭২; লূক ২২/৫৫-৬২; যোহন ১৮/১৬-১৮ ও ২৫-২৭।

৪. মথি ও মার্কের বিবরণ কাছাকাছি হলেও উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। মথি স্পষ্ট লিখেছেন যে, দুইবার দুইজন দাসী তাঁকে চিনতে পারে। কিন্তু মার্কের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, একই দাসী দুইবার এবং তৃতীয়বার উপস্থিত লোকজন তাকে যীশু শিষ্য বলে দাবি করেন।

পক্ষান্তরে লূক-এর বর্ণনা অনুসারে প্রথমে একজন দাসী, এরপর এক পুরুষ এবং তারপর আরেক পুরুষ তাকে যীশুশিষ্য বলে দাবি করেন।[১]

দ্বিতীয় বিষয় : প্রথম দাসী যখন পিতরকে চিনতে পেরে তাকে যীশুর শিষ্য বলে দাবি করেন তখন পিতর কোথায় অবস্থান করছিলেন তার বর্ণনায় বৈপরীত্য রয়েছে। মথি লিখেছেন যে, সে সময় পিতর 'বাহিরে প্রাঙ্গণে বসিয়াছিলেন' (Sat without in the palace)। আর লূকের বর্ণনা অনুসারে তিনি তখন 'প্রাঙ্গণের মধ্যে আগুন পোহাচ্ছিলেন' (in the midst of the hall)। মার্কের বর্ণনা অনুসারে তিনি তখন 'নীচে প্রাঙ্গণে ছিলেন' (beneath in the palace)। যোহনের বর্ণনা অনুসারে তিনি তখন 'বাড়ির ভিতরে' (in the court) ছিলেন।

তৃতীয় বিষয় : পিতরকে কি বলে প্রশ্নগুলি করা হয়েছিল তার বর্ণনায় বৈপরীত্য রয়েছে।

চতুর্থ বিষয় : কুকড়ার (মোরগের) ডাকের বিবরণে বৈপরীত্য রয়েছে। মথি, লূক ও যোহনের বর্ণনা অনুসারে পিতর তিনবার যীশুকে অস্বীকার করার পরে কুকড়া ডেকে ওঠে। আর মার্কের বর্ণনা অনুসারে পিতর একবার যীশুকে অস্বীকার করার পরে কুকড়া ডেকে ওঠে।

পঞ্চম বিষয় : এ বিষয়ে যীশুর ভবিষ্যৎ-বাণী কি ছিল তার বর্ণনায় বৈপরীত্য রয়েছে। মথি ও লূকের বর্ণনায় যীশু পিতরকে বলেন : 'কুকড়া ডাকিবার পূর্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে।' আর মার্কের বর্ণনা অনুসারে যীশু পিতরকে বলেন : 'কুকড়া দুইবার ডাকিবার পূর্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে।'

ষষ্ঠ বিষয় : প্রথম দাসীর প্রশ্নের উত্তরে পিতর কি বলেছিলেন তার বিবরণে বৈপরীত্য রয়েছে। মথির বর্ণনায় পিতর বলেন : "তুমি কি বলিতেছ আমি বুঝিতে পারিলাম না।" যোহনের বর্ণনায় পিতর শুধু বলেন : "আমি নই।" মার্কের বর্ণনায় তিনি বলেন : "তুমি যাহা বলিতেছ আমি তাহা জানিও না, বুঝিও না।" লূকের বর্ণনায় তিনি বলেন : "হে নারী, আমি তাহাকে চিনি না।"

সপ্তম বিষয় : দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে পিতর কি বলেছিলেন তার বিবরণেও বৈপরীত্য রয়েছে। মথি লিখেছেন : "তিনি (পিতর) দিব্য করিয়া কহিলেন, আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না।" যোহনের বর্ণনায় তিনি বলেন : "আমি নই।" মার্ক লিখেছেন : "তিনি আবার অস্বীকার করলেন।" লূকের বর্ণনায় তিনি বলেন : "ওহে আমি নই।"

অষ্টম বিষয় : মার্কের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, তৃতীয় বারে যখন উপস্থিত লোকেরা তাকে যীশুর বিষয়ে প্রশ্ন করে তখন তারা বাইরে ছিলেন। আর লূকের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, তৃতীয় বারের প্রশ্নের সময় প্রশ্নকারী ও পিতর সকলেই ভিতরে ছিলেন।

১. যোহনের বর্ণনা আরো বিপরীত। তাঁর বর্ণনায় প্রথমে একজন দাসী, এরপর উপস্থিত লোকেরা এবং সর্বশেষ পিতর যার কান কেঁটেছিলেন তার এক কুটুম্ব তাকে যীশুশিষ্য বলে দাবি করেন।

বৈপরীত্য-৮৫

ক্রুশে চড়ানোর জন্য যীশুকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার বর্ণনায় লূকলিখিত সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "পরে তাহারা তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে, ইতিমধ্যে শিমোন নামে এক জন কুরীণীয় লোক পল্লীগ্রাম হইতে আসিতেছিল, তাহারা তাহাকে ধরিয়া তাহার স্কন্ধে ক্রুশ রাখিল, যেন সে যীশুর পশ্চাৎ তাহা বহন করে।"[১]

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "তখন তাহারা যীশুকে লইল; এবং তিনি আপনি ক্রুশ বহন করিতে করিতে বাহির হইয়া মাথার খুলির স্থান নামক স্থানে গেলেন।"[২]

বৈপরীত্য -৮৬

প্রথম তিন সুসমাচার (মথি, মার্ক ও লূক) থেকে বঝা যায় যে, বেলা ছয় ঘটিকার সময় যীশু ক্রুশের উপর ছিলেন। আর যোহন থেকে বুঝা যায় যে, বেলা ছয় ঘটিকার সময় যীশু দেশাধ্যক্ষ পীলাতের দরবারে উপস্থিত ছিলেন।[৩]

বৈপরীত্য-৮৭

মথি ও মার্ক লিখেছেন যে, "যে দুইজন দস্যু তাঁহার (যীশুর) সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহারাও সেই রূপে তাঁহাকে তিরস্কার করিল।"[৪]

পক্ষান্তরে লূক লিখেছেন যে, দুই দস্যুর একজন তাঁহাকে নিন্দা ও তিরস্কার করছিল, কিন্তু দ্বিতীয় দস্যু তিরস্কারকারী দস্যুকে অনুযোগ ও রাগ করে এবং যীশুকে বলে : "যীশু আপনি যখন আপন রাজ্যে আসিবেন, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন।" তখন যীশু "তাহাকে কহিলেন : আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্যই তুমি পরমদেশে (ফিরদাউস / Paradise) আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে।"[৫]

বাইবেলের উর্দু অনুবাদকগণ ১৮৩৯, ১৮৪০, ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত উর্দু বাইবেলে মথি ও মার্কের পাঠ বিকৃত করে দ্বিবচনকে একবচনে রূপান্তরিত করেছেন যেন এই বৈপরীত্য ধরা না পড়ে। এই বিকৃতি তাদের স্থায়ী স্বভাব। তাদের থেকে আশা করা যায় না যে, তারা এই অভ্যাসটি কখনো পরিত্যাগ করবেন।

বৈপরীত্য-৮৮

মথিলিখিত সুসমাচারের ২০ ও ২১ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, যীশু যিরীহো থেকে যাত্রা শুরু করে যিরুশালেমে আগমন করেন।[৬]

---

১. লূক ২৩/২৬।

২. যোহন ১৯/১৭।

৩. মথি ২৭/৪৫; মার্ক ১৫/৩৩; লূক ২৩/৪৪; যোহন ১৯/১৪-১৬।

৪. মথি ২৭/৪৪; মার্ক ১৫/৩২।

৫. লূক ২৩/৩৯-৪৩

৬. মথি ২০/২৯-৪১; ২১/১-১০।

পক্ষান্তরে যোহনলিখিত সুসমাচারের ১১ ও ১২ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, যীশু ইফ্রয়িম নামক নগর থেকে যাত্রা শুরু করেন। সেখান থেকে বৈথনিয়াতে গমন করেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করেন। অতঃপর তিনি যিরূশালেমে আগমন করেন।[১]

বৈপরীত্য -৮৯

'সুসমাচার' চতুষ্টয় থেকে জানা যায় যে, 'স্বর্গারোহণ' বা কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত যীশু মোট তিন জন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেন :

১ম : অধ্যক্ষের কন্যা, যার কথা শুধু প্রথম তিন সুসমাচর লেখক (মথি, মার্ক ও লুক) উল্লেখ করেছেন।[২]

২য় : শুধু লূক তাঁর গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়ে যে মৃত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন।[৩]

৩য় : লাসার নামক ব্যক্তি যাকে জীবিত করার ঘটনা শুধু যোহন তাঁর পুস্তকের ১১শ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।[৪]

(পক্ষান্তরে বাইবেলের অন্যান্য গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, যীশুই ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি মৃত্যুর পরে জীবিত হয়েছেন।) প্রেরিতদের কার্য বিবরণের ২৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : খৃষ্টকে দুঃখভোগ করিতে হইবে, এবং তিনিই হইবেন প্রথম, যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে পুনরুত্থিত হইবেন...।[৫]

১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ "২০ কিন্তু বাস্তবিক খৃষ্ট মৃতগণের মধ্য হইতে উথাপিত হইয়াছেন, তিনি নিদ্রাগতদের অগ্রিমাংশ। ২২. সকলেই জীবন প্রাপ্ত হইবে। ২৩ কিন্তু প্রত্যেক জন আপন শ্রেণীতে; খৃষ্ট অগ্রীমাংশ, পরে খৃষ্টের লোক সকল তাঁহার আগমন কালে।"

কলসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ১ম অধ্যায়ের ১৮ আয়াত নিম্নরূপ : "আর তিনিই দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মস্তক, তিনি আদি, মৃতগণের মধ্য হইতে প্রথমজাত, যেন সর্ববিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য হন।"

---

১. যোহন : ১১/৫৪, ১২/১ ও ১২

২. মথি ৯/২৫; মার্ক ৫/৪২; লূক ৮/৫৫।

৩. নায়িন্ নামক নগরের এ বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান। লূক ৭/১১-১৬।

৪. যোহন ১১/১-৪৪।

৫. প্রেরিত : ২৬/২৩। উপরের অনুবাদ অনুবাদকের নিজের। আরবী ও ইংরেজী বাইবেলের আলোকে এই অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলা অনুবাদে অনুবাদকগণ বিভ্রান্তি ও বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। মূল ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদের পার্থক্য লক্ষ্য করুন। ইংরেজী : that Christ should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead, and should show light unto the people, and to the Gentiles. বাংলা: "আর তাহা এই, খৃষ্টকে দুঃখভোগ করিতে হইবে, আর তিনিই প্রথম, মৃতগণের পুনরুত্থান দ্বারা, প্রজালোক এবং পরজাতীয় লোক উভয়ের কাছে দীপ্তি প্রচার করিবেন।" উভয় পাঠের মধ্যে পার্থক্য ও বাংলা অনুবাদের বিকৃতি ও প্রবঞ্চনার প্রচেষ্টা যে কোন পাঠকের কাছে স্পষ্ট।

এ সকল কথা থেকে জানা যায় যে, যীশুর পূর্বে কোন মৃত জীবিত হন নি; বরং তিনিই প্রথম মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত। তা নাহলে এ কথাগুলি কিভাবে সত্য হবে যে, তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে প্রথম পুনরুত্থিত, তাদের অগ্রিমাংশ, খৃষ্ট অগ্রীমাংশ, মৃতগণের মধ্যে প্রথমজাত।

এই কথাগুলির সত্যতার সাক্ষ্য দেয় বাইবেলের নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলি :

(১). প্রকাশিত বাক্যের ১ম অধ্যায়ের ৫ম আয়াত : "এবং যিনি বিশ্বস্ত সাক্ষী, মৃতগণের মধ্যে প্রথমজাত ... সেই যীশু খৃষ্ট হইতে।"

(২). ইয়োবের বিবরণের ৭ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "৯ মেঘ যেমন ক্ষয় পাইয়া অন্তর্হিত হয়, তেমনি যে পাতালে[১] নামে, সে আর উঠিবে না। ১০ সে আপনার গৃহে আর ফিরিয়া আসিবে না, তাহার স্থান আর তাহাকে চিনিবে না।"

(৩) ইয়োবের বিবরণের ১৪ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১২ তদ্রূপ মনুষ্য শয়ন কালে আর উঠে না, যাবৎ আকাশ লুপ্ত না হয়, সে জাগিবে না, নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবে না। ১৪ মনুষ্য মরিয়া কি পুনর্জীবিত হইবে?"

উপরের সকল বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মৃতকে জীবিত করার কোন অলৌকিক ঘটনা খৃষ্ট কর্তৃক কখনোই সংঘটিত হয়নি। ইতোপূর্বে ৭৬ নং বৈপরীত্যের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, অধ্যক্ষের কন্যাকে জীবিত করার বিষয়ে খৃষ্টান পণ্ডিতগণই মতভেদ করেছেন।

ইয়োবের গ্রন্থের বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, যীশুর মৃত্যুর পরে কবর থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার কথাও অসত্য। নতুন নিয়মের গ্রন্থাবলীতে বিধৃত তাঁর ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার কাহিনী সবই ত্রিত্ববাদীদের মিথ্যাচার ও জালিয়াতি।

বি. দ্র. আমার এ বক্তব্য বাইবেলের ভুল প্রমাণ করার জন্যই, যীশুখৃষ্ট কর্তৃক মৃতকে জীবিত করার অলৌকিকত্ব অস্বীকার করার জন্য নয়। (অর্থাৎ প্রচলিত বাইবেল প্রমাণ করে যে, যীশু খৃষ্ট কোন মৃতকে জীবিত করেন নি। তবে কুরআনের বর্ণনার আলোকে আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি এরূপ অলৌকিক চিহ্ন প্রদর্শন করেছিলেন)।

পবিত্রগ্রন্থের এই কথা থেকে জানা গেল যে, কবরে প্রবেশের পরে কেউই আর জীবিত হতে পারে না। কাজেই যীশুর কবর থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার কথাও অসত্য।

বৈপরীত্য -৯০

কবর থেকে যীশুর পুনরুত্থানের বিবরণে অনেক বৈপরীত্য রয়েছে। মথিলিখিত সুসমাচার থেকে জানা যায় যে, মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম (যাকোবের মাতা)

১. পাতাল বলতে কবর বুঝানো হয়েছে। আরবীতে লেখা 'বাইবেল অভিধান', ১০০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(রবিবার প্রত্যুষে) যখন যীশুর কবরের নিকট পৌঁছুলেন, তখন মহা-ভূমিকম্প হয় এবং প্রভুর এক দূত (ফিরিশতা) স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া (কবরের মুখের) সেই পাথরখানা সরাইয়া দিলেন, এবং তাহার উপর বসিলেন। সেই দূত স্ত্রীলোক কয়টিকে কহিলেন, তোমরা ভয় করিও না.... এবং শীঘ্র গিয়া শিষ্যগণকে সংবাদ দাও।[১]

আর মার্কলিখিত সুসমাচার থেকে জানা যায় যে, দুই মরিয়ম ও শালোমী যখন কবরের নিকট পৌঁছান তখন তারা দেখতে পান যে, "পাথরখান সরান গিয়াছে। পরে তাহারা কবরের ভিতরে গিয়া দেখিলেন, দক্ষিণ পার্শ্বে শুক্লবস্ত্র পরিহিত এক জন যুবক বসিয়া আছেন।"[২]

পক্ষান্তরে লূকলিখিত সুসমাচার থেকে জানা যায় যে, তারা "দেখিলেন, কবর হইতে প্রস্তরখান সরান গিয়াছে, কিন্তু ভিতরে গিয়া প্রভু যীশুর দেহ দেখিতে পাইলেন না। তাহারা এই বিষয়ে ভাবিতেছেন, এমন সময়ে, দেখ, উজ্জ্বল বস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ তাঁহাদের নিকটে দাঁড়াইলেন।"[৩]

বৈপরীত্য-৯১

মথির বিবরণ থেকে জানা যায় যে, প্রভুর দূত (ফিরিশতা) যখন দুই মহিলাকে যীশুর পুনরুত্থানের সংবাদ প্রদান করেন তখন তারা শিষ্যদেরকে সংবাদ প্রদানের জন্য গমন করছিলেন। পথিমধ্যে "যীশু তাহাদের সম্মুখবর্তী হইলেন এবং কহিলেন, তোমাদের মঙ্গল হউক ... তোমরা যাও, আমার ভ্রাতৃগণকে সংবাদ দেও, যেন তাহারা গালীলে যায়; সেইখানে তাহারা আমাকে দেখিতে পাইবে।"[৪]

লূকের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই মহিলাগণ যখন পুরুষদ্বয়ের নিকট থেকে যীশুর পুনরুত্থানের সংবাদ জানতে পারলেন, তখন তারা "কবর হইতে ফিরিয়া গিয়া সেই এগারো জনকে এবং অন্য সকলকে এই সমস্ত সংবাদ দিলেন। কিন্তু তারা তাহাদের কথায় অবিশ্বাস করিলেন।"[৫]

আর যোহন লিখেছেন যে, যীশু কবরের পার্শেই মগদলীনী মরিয়মকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন।[৬]

---

১. মথি ২৮/১-৭।
২. মার্ক ১৬/১-৫
৩. লূক ২৪/১-৪। এই তিনটি বিবরণ সুস্পষ্টরূপে পরস্পর বিরোধী।
৪. মথি ২৮/২-১০
৫. লূক ২৪/৫-১১।
৬. যোহন ২০/১-১৭।

বৈপরীত্য-৯২

লূকলিখিত সুসমাচারের ১১শ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, সৃষ্টির শুরু থেকে যত ভাববাদী নিহত হয়েছেন, হেবল (হাবিল) থেকে সখরিয় (যাকারিয়া) পর্যন্ত, সকলের রক্তের প্রতিশোধ যীশুর সমকালীন ইহুদীদের থেকে গ্রহণ করতে হবে।[১]

পক্ষান্তরে যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ১৮ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, একজনের অপরাধে অন্যের শাস্তি হইবে না।[২]

আবার তোরাহ্-এর বিভিন্ন স্থান থেকে জানা যায় যে, তিন পুরুষ বা চার পুরুষ পর্যন্ত পুত্রগণ পিতার অপরাধের কারণে শাস্তি লাভ করবে।[৩]

বৈপরীত্য-৯৩

তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্রের ২য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "৩ তাহাই আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের সম্মুখে উত্তম ও গ্রাহ্য; তাঁহার ইচ্ছা এই, যেন সমুদয় মনুষ্য পরিত্রাণ পায়, ও সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত পঁহুছিতে পারে।"

থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্রের ২য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "১১ আর সেই জন্য ঈশ্বর তাহাদের কাছে ভ্রান্তির কার্যসাধন পাঠান, যাহাতে তাহারা সেই মিথ্যায় বিশ্বাস করিবে; ১২ যেন সেই সকলের বিচার হয়, যাহারা সত্যে বিশ্বাস করিত না, কিন্তু অধার্মিকতায় প্রীত হইত।"

প্রথম বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বর ইচ্ছা করেন যে, সকল মানুষই পরিত্রাণ লাভ করুক এবং সত্যের তত্ত্বজ্ঞানে পৌছাক। আর দ্বিতীয় বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বর মানুষদের কাছে 'ভ্রান্তির কার্যসাধন' পাঠান যেন তারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে বিভ্রান্ত হয় এবং তার পর ঈশ্বর তাদের শাস্তি প্রদান করেন।

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ এই প্রকারের বক্তব্য অন্য ধর্মে থাক্‌লে তাতে আপত্তি করেন। এ সকল আপত্তিকারী পণ্ডিতগণকে আমরা প্রশ্ন করি, বিভ্রান্তি প্রেরণ করে প্রথমে মানুষদেরকে বিপথগামী করা এবং এরূপর তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা কি আপনাদের মতো পরিত্রাণ লাভ ও সত্যের তত্ত্বজ্ঞানে পৌছানোর একটি প্রকরণ?

---

১. যীশু বলেন : "যেন জগতের পত্তনাবধি যত ভাববাদীর রক্তপাত হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ এই কালের লোকদের কাছে লওয়া যায়-হেবলের রক্ত অবধি সেই সখরিয়ের রক্ত পর্যন্ত, যিনি যজ্ঞবেদি ও মন্দিরের মধ্যস্থানে নিহত হইয়াছেন। হাঁ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এই কালের লোকদের কাছে তাহার প্রতিশোধ লওয়া যাইবে।" লূক ১১/৫০-৫১।

২. "যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে; পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না, ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না ...।" যিহিষ্কেল ১৮/২০।

৩. দেখুন : যাত্রাপুস্তক ২০/৫; ৩৪/৭।

বৈপরীত্য-৯৪-৯৬

শৌলের[১] (পৌলের) মনপরিবর্তন ও যীশুর উপর বিশ্বাস স্থাপনের ঘটনাটি প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ-এর ৯, ২২ ও ২৬ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। আর তিন স্থানের বর্ণনার মধ্যে অনেক বৈপরীত্য রয়েছে। আমি 'ইযালাতুশ শুকূক' (সন্দেহ নিরসন) নামক গ্রন্থে ১০টি বৈপরীত্যের কথা উল্লেখ করেছি। এখানে আমি মাত্র তিনটি দিক উল্লেখ করছি।

প্রথম দিক : ৯ম অধ্যায়ের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দামেশক যাওয়ার পথে শৌল যখন আকাশ থেকে আলোক দেখলেন ও যীশুর কথা শুনতে পেলেন, তখন শৌলের সহযাত্রিগণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং যীশুর কথা শুনতে পাচ্ছিলেন: "আর তাঁহার সহ-পথিকেরা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা ঐ বাণী শুনিল বটে কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।"[২]

পক্ষান্তরে ২২শ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, তাঁর সহযাত্রিগণ কোন কথা শুনতে পান নি: "আর যাহারা আমার সঙ্গে ছিল তাহারা সেই আলো দেখিতে পাইল বটে, কিন্তু যিনি আমার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তাঁহার বাণী শুনিতে পাইল না।"[৩]

এভাবে প্রথমে বলা হলো, 'তাহারা ঐ বাণী শুনিল' আর পরে বলা হলো : "তাঁহারা বাণী শুনিতে পাইল না।" আর ২৬ অধ্যায়ে সহযাত্রীদের শোনা অথবা না শোনার বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি।

দ্বিতীয় দিক : ৯ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, যীশু পৌলকে বলেন : "কিন্তু উঠ, নগরে প্রবেশ কর, তোমাকে কি করিতে হইবে, তাহা বলা যাইবে।"[৪]

২২শ অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "প্রভু আমাকে কহিলেন, উঠিয়া দামেশকে যাও, তোমাকে যাহা করিতে হইবে বলিয়া নিরূপিত আছে, সে সমস্ত সেখানেই তোমাকে বলা যাইবে।"[৫]

পক্ষান্তরে ২৬শ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "কিন্তু উঠ, তোমার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও, তুমি যে যে বিষয়ে আমাকে দেখিয়াছ এবং যে যে বিষয়ে আমি তোমাকে দর্শন দিব, সেই সকল বিষয়ে যেন তোমাকে সেবক ও সাক্ষী নিযুক্ত করি, সেই অভিপ্রায়ে তোমাকে দর্শন দিলাম। আমি যাহাদের নিকটে তোমাকে প্রেরণ করিতেছি, সেই

---

১. শৌল একজন ইহুদী ছিলেন, যিনি খৃষ্টানদের উপর অত্যাচার করতেন। তিনি দাবি করেন যে, দামেশকের খৃষ্টানদের শাস্তি প্রদানের জন্য গমনের পথে তিনি যীশুর দর্শন লাভ করেন এবং পৌল নাম ধারণ করে খৃষ্টধর্ম প্রচার শুরু করেন। প্রচলিত খৃষ্ট ধর্ম মূলত তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

২. প্রেরিত ৯/৭।

৩. প্রেরিত ২২/৯।

৪. প্রেরিত ২২/৯।

৫. প্রেরিত ২২/১০।

প্রজালোকদের ও পরজাতীয় লোকদের হইতে তোমাকে উদ্ধার করিব, যেন তুমি তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দাও, যেন তাহারা অন্ধকার হইতে জ্যোতির প্রতি, এবং শয়তানের কর্তৃত্ব হইতে ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইবে, যেন আমাতে বিশ্বাস করণ দ্বারা পাপের মোচন ও পবিত্রীকৃত লোকেদের মধ্যে অধিকার প্রাপ্ত হয়।"[১]

তাহলে প্রথম দুই অধ্যায়ে বলা হচ্ছে, পৌলকে ওয়াদা করা হয়েছিল যে, নগরে পৌছানোর পরে তাঁকে তাঁর করণীয় বিষয় সম্পর্কে জানানো হবে।

আর শেষ অধ্যায় থেকে জানা গেল যে, তাঁকে নগরে পৌছানোর পরে কিছু জানানোর ওয়াদা করা হয়নি; উপরন্ত এই স্থানেই তাঁকে তাঁর করণীয় সম্পর্কে জানানো হয়েছিল।

তৃতীয় দিক : ৯ম অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, দামেশক যাওয়ার পথে শৌল যখন আকাশ থেকে আলোক দেখলেন ও যীশুর কথা শুনতে পেলেন, তখন শৌলের সহযাত্রিগণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন : "আর তাঁহার সহ-পথিকেরা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।"

পক্ষান্তরে ২৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, তার সহযাত্রীরা ভূমিতে পতিত ছিলেন : "তখন আমরা সকলে ভূমিতে পতিত হইলে আমি এক বাণী শুনিলাম।"[২] আর ২২ অধায়ে সহযাত্রীদের দাঁড়ানো বা শুয়ে পড়ার বিষয়ে কোন কিছুই বলা হয়নি।

বৈপরীত্য-৯৭

ইস্রায়েল সন্তানগণ মোয়াবের কন্যাদের সাথে ব্যভিচার করেছিল। এ কারণে সদাপ্রভু ঈশ্বর ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের মধ্যে মহামারী প্রেরণ করেন। এই বিষয়ে করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্রের ১০ অধ্যায়ের ৮ আয়াতে পৌল লিখেছেন : "আর যেমন তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক ব্যভিচার করিয়াছিল, এবং এক দিনে তেইশ হাজার লোক মারা পড়িল, আমরা যেন তেমনি ব্যভিচার না করি।"

এ বিষয়ে গণনাপুস্তকের ২৫ অধ্যায়ের ৯ আয়াতে বলা হয়েছে : "যাহারা ঐ মারীতে মরিয়াছিল তাহারা চব্বিশ সহস্র লোক।"

উভয় বর্ণনার মধ্যে এক হাজারের পার্থক্য এবং দুইটির একটি ভুল।

বৈপরীত্য-৯৮

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণের ৭ম অধ্যায়ের ১৪ আয়াতটি নিম্নরূপ :

"পরে যোষেফ আপন পিতা যাকোবকে এবং আপনার সমস্ত জ্ঞাতিকে, পচাত্তর প্রাণীকে, আপনার নিকট ডাকিয়া পাঠাইলেন।"

১. প্রেরিত ২৬/১৬-১৮।
২. প্রেরিত ২৬/১৪।

এই বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, যোষেফ ও তাঁর সন্তানগণ যারা এই ঘটনার আগেই মিসরে অবস্থান করছিলেন, তারা বাদে ও যোষেফের জ্ঞাতি বা ইস্রায়েল সন্তানগণ, যারা মিসরে গমন করলেন, তাদের সংখ্যা ছিল ৭৫ জন।

পক্ষান্তরে আদিপুস্তকের ৪৬ অধ্যায়ের ২৭ আয়াতে বলা হয়েছে: "যাকোবের পরিজন, যাহারা মিসরে গেল, তাহারা সর্বশুদ্ধ সত্তর প্রাণী।"

এই সত্তরের মধ্যে যোষেফ ও তার দুই পুত্রও রয়েছে। ডাওয়ালী ও রজার্ড প্রণীত বাইবেলের ব্যাখ্যাগ্রন্থে আদিপুস্তকের এই বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : "লেয়ার সন্তানগণ ৩২ জন, সিল্পার সন্তানগণ ১৬ জন, রাহেলের সন্তানগণ ১১ জন ও বিল্হার সন্তানগণ ৭ জন।[১] এই মোট ৬৬ জন। এদের সাথে যাকোব, যোষেফ ও তাঁর দুই পুত্রকে যোগ করলে মোট সংখ্যা হয় ৭০ জন।"

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, বাইবেলের নতুন নিয়মের বর্ণনা ভুল ও অসত্য।

বৈপরীত্য-৯৯

মথির সুসমাচারের ৫ম অধ্যায়ের ৯ আয়াতে আছে: "ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয় (Blessed are the peacemakers), কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।"

আর মথির ১০ অধ্যায়ের[২] বর্ণনা অনুসারে যীশু বলেন : "মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি; শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়্গ দিতে আসিয়াছি।"

উভয় বক্তব্যের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। উভয়ের সমন্বিত অর্থ হলো যে, যাদেরকে ধন্য (Blessed) বলা হবে যীশু তাদের অর্ন্তভুক্ত নন এবং তাঁকে ঈশ্বরে পুত্রও বলা যাবে না।

বৈপরীত্য -১০০

মথি তাঁর সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদার মৃত্যুর কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন। আর লূক প্রেরিতদের কার্যবিবরণে পিতরের যবানীতে তা উদ্ধৃত করেছেন। উভয় বর্ণনার মধ্যে দুই দিক থেকে বৈপরীত্য দেখা যায় :

প্রথমত, মথি লিখেছেন যে, যিহূদা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল: "তখন সে ঐ মুদ্রা সকল মন্দিরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল, গিয়ে গলায় দড়ি দিয়া মরিল।[৩] কিন্তু পিতর বলছেন যে, মাটিতে উল্টে পড়ে পেট ফেটে মরে যায় : "এবং অধোমুখে ভূমিতে পতিত হইলে তাহার উদর ফাটিয়া যাওয়াতে নাড়ী ভুঁড়ী সকল বাহির হইয়া পড়িল।"[৪]

---

১. লেয়া ও রাহেল যাকোবের দুই স্ত্রী এবং সিল্পা ও বিল্হা তাঁর দুই দাসী।

২. ৩৪ আয়াত।

৩. মথি ২৭/৫।

৪. প্রেরিত ১/১৮।

দ্বিতীয়ত, মথির বিবরণ থেকে জানা যায় যে, যীশুকে ধরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে যে ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রা যিহূদা পেয়েছিল, সেই মুদ্রাগুলিকে পরদিন প্রভাতেই অনুশোচনা করে প্রধান যাজক ও প্রাচীনবর্গের নিকটে ফেরৎ দেয়। তারা তা না নিলে সে মুদ্রাগুলি মন্দিরের মধ্যে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা করে। তখন প্রধান যাজকেরা সেই মুদ্রাগুলি নিয়ে সেগুলি দিয়ে বিদেশীদের কবর দেওয়ার জন্য 'কুম্ভকারের ক্ষেত্র' ক্রয় করেন, যে ক্ষেত্রকে 'রক্তক্ষেত্র' বলা হতো।[১] পক্ষান্তরে পিতরের যবানীতে লূক লিখেছেন যে, যিহূদা নিজেই তার এই 'অধর্মের বেতন' দিয়ে একটি ক্ষেত্র ক্রয়[২] করে, যে ক্ষেত্রটি 'রক্তক্ষেত্র' নামে পরিচিত ছিল।[৩]

পিতর বলেছেন : "যিরূশালেম নিবাসী সকল লোকে তাহা জানিতে পরিয়াছিল।" এ থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, এই কথাই সঠিক এবং মথি যা লিখেছেন তা ভুল।

আরো পাঁচটি বিষয় থেকে মথির বক্তব্য ভুল বলে প্রমাণিত হয় :

১. মথি লিখেছেন যে, এ সময়ে যীশুর বিচার হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁকে শাস্তি প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কথাটি ভুল। মথির বিবরণ মতই দেখা যায় যে, এ সময়ে প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনবৃন্দ তাঁকে বেঁধে নিয়ে দেশাধ্যক্ষ (Governor) পীলাতের নিকট সমর্পণ করে।

২. মথি লিখেছেন যে, যিহূদা মন্দিরের মধ্যেই তার ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা প্রধান যাজক ও প্রাচীনবর্গের নিকট ফেরৎ দেয়। এই কথাটিও ভুল। কারণ, এ সময় প্রধান যাজক ও প্রাচীনবর্গ গভর্নর পীলাতের নিকট যেয়ে যীশুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করছিলেন। তারা এ সময়ে মন্দিরের মধ্যে ছিলেন না।

৩. মথির সুসমাচারের এই অধ্যায়টি ভাল করে পাঠ করলে তা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই অধ্যায়ের ১ম আয়াত ও ১১ আয়াতের মাঝখানে এই কাহিনীটিকে বৃদ্ধি করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৪. মথি লিখেছেন যে, যে রাত্রে যিহূদা যীশুকে ধরিয়ে দিল, তার পরদিন প্রভাতেই সে অনুশোচনা করে আত্মহত্যা করল। এই বিষয়টি একেবারেই অযৌক্তিক। যিহূদা নিজেই জানত যে, ইহূদীরা যীশুকে ধরে হত্যা করবে। তা সত্ত্বেও সে তাঁকে ধরিয়ে দিল। সেই যিহূদা এত তাড়াতাড়ি অনুতপ্ত হয়ে আত্মহত্যা করবে, এ কথা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়।

৫. মথির সুসমাচারে এই কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে ৯ম আয়াতে সুস্পষ্ট ভুল রয়েছে যা পাঠক দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

---

১. মথি ২৭/১-৯।

২. ইংরেজী বাইবেলে বলা হয়েছে : Purchased a field। কিন্তু বাংলা বাইবেলে বলা হয়েছে : "একখান ক্ষেত্র লাভ* করিল"। বাংলা অনুবাদকগণ Purchase অর্থ লাভ লিখেছেন কেন তা তারাই জানেন।

৩. প্রেরিত ১/১৮-১৯।

বৈপরীত্য-১০১

যোহনের প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আয়াত থেকে জানা যায় যে, সমস্ত জগতের পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছেন নিষ্পাপ যীশু খৃষ্ট। পক্ষান্তরে হিতোপদেশের ২১ অধ্যায়ের ১৮ আয়াত থেকে জানা যায় যে, দুষ্টরা হচ্ছে ধার্মিকদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা মুক্তির মূল্যস্বরূপ।

বৈপরীত্য-১০২

ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ৭ম অধ্যায়ের ১৮ আয়াত থেকে এবং একই পত্রের ৮ম অধ্যায়ের ৭ম আয়াত থেকে জানা যায় যে, মোশির ব্যবস্থা বা শরীয়ত (Law/ Commandment) দুর্বল, দোষযুক্ত ও নিষ্ফল[১]। পক্ষান্তরে গীতসংহিতার ১৮ নং গীতের[২] ৭ম আয়াত থেকে জানা যায় যে, তা ত্রুটিমুক্ত ও সত্য।[৩]

বৈপরীত্য-১০৩

(যীশুর কবর থেকে পুনরুত্থানের বিষয়ে) মার্কলিখিত সুসমাচারের ১৬ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, সূর্য উদিত হওয়ার পরে তিনজন মহিলা যীশুর কবরে উপস্থিত হন। পক্ষান্তরের যোহনলিখিত সুসমাচারের ২০ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, শুধু একজন মহিলা সেখানে গমন করেন এবং তিনি 'অন্ধকার থাকিতে থাকিতে' কবরে উপস্থিত হন।[৪]

বৈপরীত্য-১০৪

গভর্নর পীলাত যীশুর বিচার করে ক্রুশে চড়ানোর সময় তাঁর অপরাধের বিবরণ লিখে মাথার উপর টাঙিয়ে দেন। সামান্য কয়েকটি শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে অপরাধের বিবরণ লেখা হয়েছিল, সেই শব্দগুলির বিবরণেও চার সুসমাচার লেখক চার প্রকারের বাক্য লিখেছেন:

মথির সুসমাচার : "এ ব্যক্তি যীশু, যিহূদীদের রাজা"।[৫]

মার্কের সুসমাচার : "যিহূদীদের রাজা।[৬]

লূকের সুসমাচার : " এ ব্যক্তি যিহূদীদের রাজা।"[৭]

যোহনের সুসমাচার: "নাসরতীয় যীশু, যিহূদীদের রাজা।"[৮]

---

১. ইব্রীয় ৭/১৮: "কারণ এক পক্ষে পূর্বকার বিধির দুর্বলতা ও নিষ্ফলতা প্রযুক্ত তাহার লোপ হইতেছে.." ইব্রীয় ৮/৭: "কারণ ঐ প্রথম নিয়ম যদি নির্দোষ হইত, তবে দ্বিতীয় এক নিয়মের জন্য স্থানের চেষ্টা করা যাইত না"।

২. পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ১৯ নং গীত।

৩. গীতসংহিতা ১৯/৭: "সদাপ্রভুর ব্যবস্থা সিদ্ধ, প্রাণের স্বাস্থ্যজনক...।"

৪. মার্ক ২৭/৩৭

৫. মথি ২৭/৩৭।

৬. মার্ক ১৫/২৬।

৭. লূক ২৩/৩৮।

৮. যোহন ১০/১৯।

কোন স্কুল-ছাত্রও যদি এই প্রকারের ঘটনায় এইরূপ একজন ব্যক্তির মাথার উপরে লটকানো এই রকম একটি ছোট্ট বাক্য একবার মাত্র দেখে তাহলে সে আর কখনো তা ভুলবে না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই সামান্য সংক্ষিপ্ত বাক্যটিকেও সুসমাচার লেখকগণ হুবহু মুখস্থ রাখতে পারেন নি; তাহলে দীর্ঘ ঘটনাগুলির বর্ণনায় তাঁদের স্মৃতির উপর কিভাবে নির্ভর করা যায়?

বৈপরীত্য -১০৫

মার্কলিখিত সুসমাচারের ৬ষ্ঠ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, রাজা হেরোদ যোহনকে ধার্মিক ও পবিত্র লোক জানিয়া ভয় করিতেন ও তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। আর তাঁহার কথা শুনিয়া তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইতে, এবং তাঁহার কথা শুনিতে ভাল বাসিতেন। শুধু তার স্ত্রী 'হেরোদিয়ার নিমিত্ত আপনি লোক পাঠাইয়া যোহনকে ধরিয়া কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলেন' এবং পরে হেরোদিয়ার চাপে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে হত্যা করেন।[১]

পক্ষান্তরে লূকলিখিত সুসমাচারের ৩য় অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, হেরোদ রাজা যোহনের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি শুধু স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্যই নয়, উপরন্তু নিজের দুষ্কর্মসমূহের কারণেও যোহনকে কারাগারে বদ্ধ করেন।[২]

বৈপরীত্য-১০৬

যীশুর শিষ্যগণের (apostles) নামের বিষয়েও বৈপরীত্য রয়েছে। মথি, মার্ক ও লূক ১১ জন শিষ্যের নামের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, এরা হলেন : ১. শিমোন, পিতর, ২. আন্দ্রিয় (পিতরের ভাই), ৩. সিবদিয়ের পুত্র যাকোব, ৪. যোহন (যাকোবের ভাই), ৫. ফিলিপ, ৬. বর্থলময়, ৭. থোমা, ৮. মথি, ৯. আল্‌ফেয়ের পুত্র যাকোব, ১০. (কাননী) শিমোন ও ১১. ঈস্করিয়োতীয় যিহূদা। দ্বাদশ শিষ্যের নাম হলো লিব্বিয়াস, যাকে থাদ্দেয়াস (থদ্দেয়) বলে ডাকা হতো (Lebbe'us, Whose surname was Thad'deus)[৩]

মার্ক লিখেছেন যে, এই দ্বাদশ শিষ্যের নাম হল "থদ্দেয়"।[৪]

লূক লিখেছেন যে, যীশুর দ্বাদশ শিষ্য ছিলেন যাকোবের ভ্রাতা যিহূদা।[৫]

---

১. মার্ক ৬/১৭-২৬

২. লূক ৩/১৯-২০।

৩. বাংলা বাইবেলে শুধু 'থদ্দেয়' লেখা হয়েছে; মূল নাম লেখা হয়নি। সম্ভবত নামের বৈপরীত্য কিছুটা লুকানোর জন্য এরূপ করা হয়েছে।

৪. মার্ক ৩/১৪-১৯।

৫. লূক ৬/১৩-১৬; প্রেরিত ১/১৩-১৪।

বৈপরীত্য-১০৭

প্রথম তিন সুসমাচারের লেখকগণ এক ব্যক্তির কথা লিখেছেন, যিনি কর গ্রহণ-স্থানে বসে ছিলেন। তখন যীশু তাকে তাঁর অনুসরণের জন্য আহ্বান করেন। লোকটি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করে এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু এই ব্যক্তির নামের বর্ণনায় তাঁরা পরস্পরবিরোধী কথা বলেছেন।

মথির সুসমাচারের লেখক ৯ম অধ্যায়ে লিখেছেন যে, এই লোকটির নাম ছিল মথি।[১] আর মার্ক তাঁর দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন যে, লোকটির নাম ছিল "আল্‌ফেয়ের পুত্র লেবি"।[২] আর লূক তাঁর ৫ম অধ্যায়ে লিখেছেন যে, লোকটির নাম ছিল "লেবি"। লূক এখানে লেবির পিতার নাম উল্লেখ করেননি।[৩]

উল্লেখ্য যে, তিন সুসমাচার লেখক তাঁদের উল্লিখিত অধ্যায়গুলির পরে যখন যীশুর শিষ্যগণের নাম লিখেছেন তখন তাঁরা সকলেই যীশুর শিষ্য হিসাবে মথির নাম লিখেছেন। আর আল্‌ফেয়ের পুত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন 'যাকোব'-এর নাম।[৪]

বৈপরীত্য-১০৮

মথি তাঁর সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ে লিখেছেন যে, যীশু তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য পিতর সম্পর্কে বলেন: " আর আমিও তোমাকে কহিতেছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের (নরকের) পুরদ্বার সকল তাহার বিরুদ্ধে প্রবল হইবে না। আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দিব; আর তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।"[৫]

---

১. "আর সে স্থান হইতে যাইতে যাইতে যীশু দেখিলেন যে, মথি নামক এক ব্যক্তি কর গ্রহণ স্থানে বসিয়া আছে; তিনি তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাতে আইস। তাহাতে সে উঠিয়া তাঁহার পশ্চাতে গমন করিল"। মথি ৯/৯ এই আয়াত থেকে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, শিষ্য মথি এই সুসমাচারের লেখক নন। কারণ তিনি নিজে এই সুসমাচারটি লিখলে এখানে নিজেকে বুঝানোর জন্য উত্তম পুরুষের ব্যবহার করতেন।

২. "আর তিনি যাইতে যাইতে দেখিলেন, আল্‌ফেয়ের পুত্র লেবি কর-গ্রহণ স্থানে বসিয়া আছেন; তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাতে আইস। তাহাতে তিনি উঠিয়া তাঁহার পশ্চাতে গমন করিলেন।" মার্ক ২/১৪।

৩. "তৎপরে তিনি বাহিরে গেলেন, আর দেখিলেন, লেবি নামে একজন করগ্রাহী কর গ্রহণ স্থানে বসিয়া আছেন; তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাতে আইস। তাহাতে তিনি সকলই পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া তাঁহার পশ্চাতে গমন করিলেন।" লূক ৫/২৭।

৪. এখানে পরস্পরবিরোধিতা খুবই স্পষ্ট। খৃস্টান পণ্ডিতগণ বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, মথিরই আরেক নাম ছিল 'আলফেয়ের পুত্র লেবি'। কথাটি ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক ও বাইবেলের বাহ্যিক পাঠের বিপরীত। নিজেদের কল্পনা ছাড়া অন্য কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক বা গ্রন্থীয় তথ্য দিয়ে তাঁরা তা প্রমাণ করতে পারেন না।

৫. মথি ১৬/১৮-১৯।

অত:পর মথি এই অধ্যায়েই লিখেছেন যে, যীশু এরপর পিতরকে বলেন: "আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শয়তান! তুমি আমার বিঘ্নস্বরূপ; কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের তাহাই তুমি ভাবিতেছ।"[১]

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ তাঁদের পুস্তিকাসমূহে পিতরের নিন্দায় প্রাচীন খৃষ্টীয় ধর্মগুরুদের অনেক বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এ সকল বক্তব্যের মধ্যে একটি হলো স্বর্ণমুখী যোহন (৩৪৫-৪০৭ খৃ)[২] মথিলিখিত সুসমাচারের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: "পিতর ছিলেন অত্যন্ত জঘন্য প্রকারের অহংকার ও বিরোধিতার রোগে আক্রান্ত। আর তার জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল দুর্বল।"

অনুরূপভাবে অগাস্টিন বলেন: "পিতরের কোন স্থিরতা ছিল না। তিনি কখনো বিশ্বাস করতেন এবং কখনো সন্দেহ পোষণ করতেন।"

এখন আমার বক্তব্য হলো, যে ব্যক্তি এই প্রকারের অহংকার, সন্দেহ ইত্যাদি গুণাবলীতে গুণান্বিত, তিনিই কি স্বর্গরাজ্যের মালিকানা লাভ করবেন? যাকে যীশু নিজেই 'শয়তান' বলছেন, সেই শয়তান কি এতই শক্তিশালী যে, পাতালের বা নরকের পুরদ্বারগুলি তার বিরুদ্ধে প্রবল হতে পারবে না?

বৈপরীত্য-১০৯

লূক তাঁর সুসমাচারের ৯ম অধ্যায়ে লিখেছেন যে, একটি শমরীয় গ্রামের বিষয়ে অভিশাপ প্রদানের জন্য যীশুর শিষ্য যাকোব ও যোহন যীশুর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেন : " প্রভো, আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, এলিয় যেমন করিয়াছিল, তেমনি আমরা বলি, আকাশ হইতে অগ্নি নামিয়া আসিয়া ইহাদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলুক।" তখন যীশু উত্তরে বলেন : "তোমরা কি প্রকার আত্মার লোক, তাহা জান না। কারণ মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের প্রাণনাশ করিতে আইসেন নাই, কিন্তু রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।"[৩]

এরপর লূক তাঁর পুস্তকের দ্বাদশ অধ্যায়ে যীশুর বাণী উদ্ধৃত করেছেন: "আমি পৃথিবীতে অগ্নি নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছি; আর এখন যদি তাহা প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তবে আর চাই কি?"[৪]

বৈপরীত্য-১১০

মথি, মার্ক ও লূক উল্লেখ করেছেন যে, যখন যীশুর উপর পবিত্র আত্মা অবতীর্ণ হলেন তখন স্বর্গ হতে বা আকাশ হতে একটি বাণী শোনা যায়। এই ছোট্ট বাক্যটির বর্ণনায় তাঁদের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে :

---

১. মথি ১৬/২৩।

২. "স্বর্ণমুখি যোহন" নামে পরিচিত যোহন ক্রেসিসটেম ৩৯৮-৪০৪ খৃষ্টাব্দে কন্সট্যান্টিনোপলের প্রধান যাজক (Patriarch) ছিলেন।

৩. লূক ৯/৫২-৫৬।

৪. লূক ১২/৪৯।

মথির বর্ণনায় বলা হয়: "ইনিই আমার পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত।" মার্কের বর্ণনায় বলা হয়: "তুমিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত"। লূকের বর্ণনায় বলা হয়: "তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।"[১]

বৈপরীত্য-১১১

মথি তাঁর সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ে (২০-২১ আয়াতে) উল্লেখ করেছেন যে, সিবদিয়ের পুত্রদ্বয়ের মাতা, অর্থাৎ যাকোব ও যোহনের মাতা যীশুর কাছে আবেদন করেন যে, "আজ্ঞা করুন, যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই পুত্রের একজন আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে, আর একজন আপনার বাম পার্শ্বে, বসিতে পায়।"

আর মার্ক তাঁর সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে (৩৫-৩৭ আয়াতে) উল্লেখ করেছেন যে, সিবদিয়ের পুত্রদ্বয় (যাকোব ও যোহন) নিজেরাই যীশুর কাছে এই আবেদন করেছিলেন।

বৈপরীত্য-১১২

বৈথনিয়া থেকে যিরূশালেম নগরে যাওয়ার পথে যীশু একটি ডুমুর গাছকে অভিশাপ প্রদান করেন। এ বিষয়ে মথি লিখেছেন: "প্রাতঃকালে নগরে ফিরিয়া যাইবার সময়ে তিনি (যীশু) ক্ষুধিত হইলেন। পথের পার্শ্বে একটা ডুমুরগাছ দেখিয়া তিনি তাহার নিকটে গেলেন, এবং পত্র বিনা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি গাছটিকে কহিলেন, আর কখনও তোমাতে ফল না ধরুক; আর হঠাৎ সেই ডুমুরগাছটা শুকাইয়া গেল। তাহা দেখিয়া শিষ্যেরা আশ্চর্য জ্ঞান করিয়া কহিলেন, ডুমুরগাছটা হঠাৎ শুকাইয়া গেল কিরূপে? যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন.."[২]

এ বিষয়ে মার্ক লিখেছেন: "পরদিবস তাঁহারা বৈথনিয়া হইতে বাহির হইয়া আসিলে পর তিনি ক্ষুধার্ত হইলেন; এবং দূর হইতে সপত্র এক ডুমুরগাছ দেখিয়া, হয় ত তাহা হইতে কিছু ফল পাইবেন বলিয়া, কাছে গেলেন; কিন্তু নিকটে গেলে পত্র বিনা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না; কেননা তখন ডুমুর ফলের সময় ছিল না। তিনি গাছটিকে বলিলেন, এখন অবধি কেহ কখনও তোমার ফল ভোজন না করুক। এ কথা তাঁহার শিষ্যেরা শুনিতে পাইলেন। পরে তাঁহারা যিরূশালেমে আসিলেন, ...। আর সন্ধ্যা হইলে তাঁহারা নগরের বাহিরে যাইতেন।[৩] প্রাতঃকালে তাঁহারা যাইতে যাইতে দেখিলেন, সেই ডুমুরগাছটি সমূলে শুকাইয়া গিয়াছে। তখন পিতর পূর্বকথা স্মরণ

১. মতি ৩/১৭ ও ১৭/৫, মার্ক ১/১১; লূক ৩/২২।

২. মথি ২১/১৮-২১।

৩. আরবী অনুবাদে লেখা হয়েছে: 'সন্ধ্যা হইলে তিনি নগরের বাহিরে গেলেন।' ইংরেজি অনুবাদেও অনুরূপ লেখা হয়েছে : And when even was come, he went out of the city। বাংলা অনুবাদে 'তিনি' স্থলে 'তাহারা' এবং 'গেলেন' স্থলে 'যাইতেন' লেখার কারণ কি তা অনুবাদকগণই জানেন।

করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রব্বি, দেখুন, আপনি যে ডুমুরগাছটিকে শাপ দিয়াছিলেন, সেটি শুকাইয়া গিয়াছে। যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন ...।"[১]

দুইটি বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য স্পষ্ট। তবে এখানে এই বৈপরীত্য ছাড়াও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। তা হলো, যীশুর অধিকার ছিল না যে, ডুমুরগাছটির মালিকের অনুমতি ছাড়া তিনি তার ফল ভক্ষণ করবেন। আর একথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অমানবিক যে, তিনি ডুমুরগাছটিকে অভিশাপ প্রদান করবেন। এতে আল্লাহর একটি সৃষ্টিকে বিনা অপরাধে ধ্বংস করা ছাড়াও গাছটির মালিককে ক্ষতিগ্রস্থ করা হলো। কোন জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান মানুষ কখনো অসময়ে বা অ-মৌসুমে কোন বৃক্ষ থেকে ফল আশা করতে পারেন না। অনুরূপভাবে কোন জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান মানুষ ফলের মৌসুম ছাড়া অন্য মৌসুমে কোন গাছে ফল না থাকার কারণে সেই গাছের উপর রাগ করতে পারেন না। কারণ অ-মৌসুমে ফল দানের ক্ষমতা তো গাছের নেই; বরং যীশুর অলৌকিক ক্ষমতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতো এই যে, তিনি ডুমুরগাছটির ফলদানের জন্য প্রার্থনা করতেন এবং গাছটি তৎক্ষণাৎ ফলে পূর্ণ হতো। এরপর তিনি গাছটি মালিকানাধীন হলে মালিকের অনুমতিক্রমে গাছ থেকে ফল ভক্ষণ করতেন। এতে মালিকও লাভবান হতো।

উপরের ঘটনা থেকে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, যীশু ঈশ্বর ছিলেন না। তিনি যদি ঈশ্বর হতেন বা তাঁর মধ্যে যদি ঐশ্বরিক শক্তি থাকত তাহলে তিনি অবশ্যই জানতেন যে, এই গাছটিতে কোন ফল নেই এবং এই সময়ে এই গাছে ফল থাকে না এবং তিনি বৃক্ষটির উপর ক্রোধান্বিত হতেন না।[২]

বৈপরীত্য-১১৩

মথিলিখিত সুসমাচারের ২১ অধ্যায়ে যীশু গৃহকর্তা ও কৃষকদের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। দৃষ্টান্তের শেষে তিনি সমবেত মানুষদের উদ্দেশ্যে বলেন :

"অতএব দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা যখন আসিবেন, তখন সেই কৃষকদিগকে কি করিবেন? তাহারা তাঁহাকে বলিল, সেই দুষ্টদিগকে নিদারুণরূপে বিনষ্ট করিবেন, এবং সেই ক্ষেত্র এমন অন্য কৃষকদিগকে জমা দিবেন, যাহারা ফলের সময়ে তাঁহাকে ফল দিবে।"[৩]

লূকলিখিত সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ে একই ঘটনার বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দৃষ্টান্তের শেষে তিনি সমবেত মানুষদের উদ্দেশ্যে বলেন:

এক্ষণে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা তাহাদিগকে কি করিবেন? তিনি আসিয়া এই কৃষকদিগকে বিনষ্ট করিবেন এবং ক্ষেত্র অন্য লোকদিগকে দিবেন। এই কথা শুনিয়া তাহারা কহিল, এমন না হউক।[৪]

---

১. মার্ক ১১/১২-২২।

২. ঈশ্বর তো দূরের কথা, ১৫/২০ বছরের একজন সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষও নিজ এলাকার ফলের মৌসুম জানেন এবং অসময়ে কোন গাছে ফল আশা করেন না বা অসময়ে কোন গাছে ফল না থাকার কারণে ক্রোধান্বিত হন না।

৩. মথি ২১/৪-৪১।

৪. লূক ২০/১৫-১৬।

উভয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য স্পষ্ট। প্রথম বর্ণনা অনুসারে সমবেত শ্রোতারা বলেছিল যে, ক্ষেত্রের মালিক উক্ত কৃষকদিগকে নিদারুণরূপে বিনষ্ট করবেন। আর দ্বিতীয় বর্ণনা অনুসারে, শ্রোতাগণ একথা বলেনি, (বরং যীশু নিজে এ কথা বলেছেন) এবং তারা যীশুর মুখে এ কথা শুনে তা অস্বীকার করেছে।

বৈপরীত্য-১১৪

মথি তাঁর সুসমাচারের ২৬ অধ্যায়ে, মার্ক তাঁর সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ে এবং যোহন তাঁর সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে একজন মহিলা কর্তৃক যীশুর দেহে একপাত্র মূল্যবান সুগন্ধি ঢেলে দেওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের বর্ণিত ঘটনাগুলি তুলনা করে পাঠ করলে পাঠক ৬দিক থেকে বৈপরীত্য দেখতে পাবেন।[১]

প্রথম, মার্ক উল্লেখ করেছেন যে, এই ঘটনাটি ঘটেছিল নিস্তারপর্বের দুই দিন পূর্বে। অপরদিকে যোহন লিখেছেন যে, ঘটনাটি ঘটেছিল নিস্তারপর্বের ছয় দিন পূর্বে। মথি স্পষ্টভাবে লিখেন নি যে, নিস্তারপর্বের কয়দিন পূর্বে ঘটনাটি ঘটেছিল।[২]

দ্বিতীয়ত, মার্ক ও মথি লিখেছেন যে, এই ঘটনাটি ঘটেছিল কুষ্ঠী শিমোনের বাড়িতে। অপরদিকে যোহন-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই ঘটনাটি ঘটেছিল মরিয়ম-এর[৩] আবাসস্থলে।

তৃতীয়ত, মথি ও মার্ক উল্লেখ করেছেন যে, মহিলাটি বহুমূল্য সুগন্ধিটুকু 'যীশুর মস্তকে ঢালিয়া দেন।' অপর দিকে যোহন উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তা 'যীশুর চরণে মাখাইয়া দেন।'।

চতুর্থত, মার্ক লিখেছেন, যে বহুমূল্য সুগন্ধি ঢেলে দেওয়ার কারণে উপস্থিত কোন কোন ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে পরস্পরের মধ্যে আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন। আর মথি লিখেছেন যে, শিষ্যেরাই বিরক্ত হয়ে তার কাজের প্রতিবাদ করেন। পক্ষান্তরে যোহন লিখেছেন যে, শুধু ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদাই এই কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন।

পঞ্চমত, যোহন লিখেছেন যে, আতরটুকুর মূল্য ছিল 'তিন শত সিকি'। মার্ক একটু বাড়িয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, তার মূল্য ছিল 'তিন শত সিকিরও অধিক। মথি মূল্যের পরিমাণ অস্পষ্ট রেখে বলেছেন 'অনেক টাকা'।

---

১. মথি ২৬/৩-১৩; মার্ক ১৪/১-৯; যোহন ১২/১-৮।

২. ঘটনার বর্ণনার সময় স্পষ্টরূপে সময়ের উল্লেখ না করলেও মথির বর্ণনা থেকেও জানা যায় যে, ঘটনাটি নিস্তারপর্বের দুইদিন পূর্বে ঘটেছিল। ২৬ অধ্যায়ের ১ম আয়াতে মথি লিখেছেন, যীশু শিষ্যদেরকে বলেন : "তোমরা জান, দুই দিন পরে নিস্তারপর্ব আসিতেছে..।" এরপর ৬ আয়াত থেকে সুগন্ধি ঢালার ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

৩. লাসার নামক যে ব্যক্তিকে যীশু জীবিত করেছিলেন বলে বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে এই মরিয়ম হচ্ছেন তার বোন। তার অপর বোনের নাম মার্থা।

ষষ্ঠত, এ সময়ে যীশু কি বলেছিলেন তার বর্ণনাতেও তাদের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, সুগন্ধি বা আতর ঢালার ঘটনা একাধিকবার ঘটেছিল বলে দাবি করার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।[১]

একথা চিন্তা করা যায় না যে, কয়েকদিনের মধ্যে বারবার আতর ঢালার ঘটনা ঘটবে এবং প্রত্যেকবারেই একজন মহিলা আতর ঢালবেন এবং প্রত্যেকবারেই খাওয়ার সময়েই ঢালবেন এবং প্রত্যেকবারেই দাওয়াত বা নিমন্ত্রণ খাওয়ার সময়ে তা ঘটবে এবং যীশু প্রথমবারে কাজটি অনুমোদন করার দুই একদিন পরেই আবার উপস্থিত মানুষেরা বা শিষ্যেরা তার প্রতিবাদ ও আপত্তি করবেন এবং প্রত্যেকবারেই ঢেলে দেওয়া আতরের মূল্য তিন শত সিকি বা তার অধিক হবে এবং এভাবে যীশু ৬০০ সিকি মূল্যের আতর পরপর দুই দিনে তার মাথায় বা পায়ে ঢেলে দেওয়া অনুমোদন করবেন যা নিঃসন্দেহে অপচয়।

এজন্য সত্য কথা হলো, তিন সুসমাচার লেখক একই ঘটনার বিবরণ প্রদান করেছেন। আর একই ঘটনার বিবরণে পরস্পরবিরোধী ও বিপরীত তথ্যাদি প্রদান করা তো সুসমাচার লেখকদের অতি পরিচিত অভ্যাস।

বৈপরীত্য-১১৫

'নিস্তারপর্ব পালন ও প্রভুর ভোজ স্থাপন' বিষয়ে লূকের ২২ অধ্যায়ের বিবরণ, মথির ২৬ অধ্যায়ের বিবরণ ও মার্কের ১৪ অধ্যায়ের বিবরণের মধ্যে তুলনা করলে পাঠক দুইটি পার্থক্য দেখতে পাবেন:

প্রথমত, লূক দুইবার পানপাত্র গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন : ভোজের পূর্বে একবার এবং ভোজের পরে একবার। অপর দিকে মথি ও মার্ক একবার পানপাত্র গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। এরা দুইজনে যেহেতু একই তথ্য লিখছেন, এজন্য সম্ভবত এদের বর্ণনাই সঠিক ও লূকের বর্ণনা ভুল।

লূকের বর্ণনাকে ভুল না ধরলে ক্যাথলিকগণ বিশেষ করে কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়বেন। কারণ তারা দাবি করেন যে, রুটি ও মদ প্রত্যেকটিই মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্বের সমন্বিত পরিপূর্ণ যীশুতে রূপান্তরিত হয়। তাহলে লূকের বিবরণ সঠিক হলে দুইটি পানপাত্র পূর্ণ দুইটি যীশুতে রূপান্তরিত হয়। এর সাথে রুটি সংযুক্ত হলে ত্রিত্ববাদীদের সংখ্যা অনুসারে দুই পানপাত্র ও রুটি মোট তিনটি পূর্ণ যীশু অস্তিত্বলাভ করে। এর সাথে পূর্বের যীশু যুক্ত হলে মোট চারিটি যীশুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে।

এছাড়া লূকের বর্ণনা সত্য হলে ক্যাথলিক-সহ সকল খৃষ্টান একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন, তা হলো, লূকের বর্ণনা অনুসারে দুইবার পানপাত্র ব্যবহার না করে তারা কেন 'প্রভুর ভোজে' একটিবার মাত্র পানপাত্র ব্যবহার করেন?

১. ঘটনাটি পাঠ করলে পাঠক নিশ্চিত হবেন যে, তিন জনেই একই ঘটনা বর্ণনা করছেন।

দ্বিতীয়ত, লূকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যীশুর শরীর তাঁর শিষ্যদের নিমিত্ত প্রদত্ত (এবং তাঁর রক্ত তাদেরই জন্য পাতিত)। মার্কের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তাঁর রক্ত 'অনেকের জন্য পাতিত'। আর মথির বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর দেহ কারো জন্য প্রদত্ত নয় এবং তাঁর রক্তও কারো জন্য পাতিত নয়; বরং নতুন নিয়মই পাতিত ও প্রবাহিত, যদিও 'নিয়ম' পাতিত বা প্রবাহিত হয় না।[১]

সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হলো, যোহন এই ঘটনাটি উল্লেখই করেননি, যদিও এই ঘটনাটি খৃস্টানদের ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভিত্তি। অথচ তিনি আতর ঢেলে দেওয়া, গাধার পিঠে আরোহণ করা এবং অন্যান্য অনেক খুটিনাটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যেগুলি অন্য তিন সুসমাচারেও উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈপরীত্য-১১৬

মথির সুসমাচারের ৭ম অধ্যায়ের ১৪ আয়াত নিম্নরূপ: "কেননা জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম।" এই পুস্তকেরই ১১ অধ্যায়ে (২৯-৩০ আয়াতে) বলা হয়েছে: "আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে তুলিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর .. কারণ আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু।"

উভয় বক্তব্য একত্র করে সমন্বিত করলে এর অর্থ হয় এই যে, যীশুর অনুসরণ জীবনের পথে পরিচালিত করে না (কারণ জীবনের পথ কঠিন অথচ যীশুর পথ সহজ)।

বৈপরীত্য-১১৭

মথির সুসমাচারের ৪র্থ অধ্যায়ে রয়েছে: তখন দিয়াবল তাঁহাকে পবিত্র নগরে লইয়া গেল, এবং ধর্মধামের চূড়ার উপরে দাঁড় করাইল, (এবং তাঁহাকে সেখান হইতে নীচে ঝাঁপ দিতে প্ররোচিত করিল)... আবার দিয়াবল তাঁহাকে অতি উচ্চ এক পর্বতে (exceeding high mountain) লইয়া গেল, (এবং তাঁহাকে জগতের সকল রাজত্ব দেখাইল, এবং রাজত্বের লোভে দিয়াবলকে সাজদা বা প্রণাম করিতে প্ররোচনা দিল) ... তিনি (যীশু) গালীলে চলিয়া গেলেন; আর নাসরৎ ত্যাগ করিয়া সমুদ্র তীরে .. কফরনহূমে গিয়া বাস করিলেন।[২]

লূকের সুসমাচারের ৪র্থ অধ্যায়ে রয়েছে: পরে সে (দিয়াবল) তাঁহাকে (যীশুকে) উচ্চ এক পর্বতে (high mountain)[৩] লইয়া গেল, (এবং তাঁহাকে জগতের সকল রাজত্ব দেখাইল, এবং রাজত্বের লোভে দিয়াবলকে সাজদা বা প্রণাম করিতে প্ররোচনা দিল) .. আর সে তাঁহাকে যিরূশালেমে (পবিত্র নগরে) লইয়া গেল, এবং ধর্মধামের চূড়ার

---

১. মথি ২৬/২০-২৯; মার্ক ১৪/১৭-২৫; লূক ২২/১৪-২১।

২. মথি ৪/৫, ৮, ১২, ১৩।

৩. মথি ও লূক উভয় সুসমাচারেই ইংরেজীতে High mountain বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলায় প্রথম স্থানে উচ্চ পর্বত বলা হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় স্থানে "উপরে" বলা হয়েছে।

উপরে দাঁড় করাইল, (এবং তাঁহাকে সেখান হইতে নীচে ঝাঁপ দিতে প্ররোচিত করিল) ... তখন যীশু গালীলে ফিরিয়া গেলেন। ... আর তিনি তাহাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিয়া সকলের দ্বারা গৌরবান্বিত হইতে লাগিলেন। আর তিনি যেখানে পালিত হইয়াছিলেন, সেই নাসরতে উপস্থিত হইলেন।[১]

বৈপরীত্য -১১৮

মথির সুসমাচারের ৮ম অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, (যে শতপতির অসুস্থ দাসকে যীশু সুস্থ করেন সেই) শতপতি নিজে সশরীরে যীশুর নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে অনুরোধ করেন তার অসুস্থ দাসকে সুস্থ করে দেওয়ার জন্য। যীশু তাকে বলেন যে, তিনি তার বাড়িতে যেয়ে তাকে সুস্থ করবেন। এতে শতপতিটি বলেন: "হে প্রভূ, আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার ছাদের নীচে আইসেন; কেবল বাক্যে বলুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে।" এতে যীশু তার প্রশংসা করেন এবং তাকে বলেন: "চলিয়া যাও, যেমন বিশ্বাস করিলে, তেমনি তোমার প্রতি হউক। আর সেই দণ্ডেই তাহার দাস সুস্থ হইল।"[২]

অপরদিকে লূকের সুসমাচারের ৭ম অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, উক্ত শতপতি কখনোই নিজে সশরীরের যীশুর নিকট আগমন করেননি বরং তিনি যীশুর সংবাদ শুনিয়া যিহূদীদের কয়েকজন প্রাচীনকে দিয়া তাঁহার কাছে নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন, যেন তিনি আসিয়া তাঁহার দাসকে বাঁচান।...

তখন 'যীশু তাহাদের সহিত গমন করিলেন, আর তিনি বাটীর অনতিদূরে থাকিতেই শতপতি এক জন বন্ধু দ্বারা তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, প্রভু, আপনাকে কষ্ট দিবেন না, কেননা আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার ছাদের নীচে আইসেন; সেই জন্য আমাকেও আপনার নিকটে আসিবার যোগ্য বুঝিলাম না; আপনি বাক্যে বলুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে।'... এতে যীশু তার প্রশংসা করেন। 'পরে যাঁহাদিগকে পাঠান হইয়াছিল, তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া গিয়া সেই দাসকে সুস্থ দেখিতে পাইলেন।'[৩]

বৈপরীত্য-১১৯

মথি তাঁর সুসমাচারের ৮ম অধ্যায়ে (১৮-২২ আয়াতে) উল্লেখ করেছেন যে, একজন অধ্যাপক তাঁর অনুসরণের অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং অন্য এক ব্যক্তি তার মৃত পিতাকে কবর দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। এরপর যীশু কি কি অলৌকিক কার্যাদি সম্পন্ন করেন ও উপদেশ প্রদান করেন তার বিস্তারিত বিবরণ তিনি প্রদান করেছেন (৮ম অধ্যায়ের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ১৬ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত এ

১. লূক ৪/৫, ৯, ১৪-১৬।
২. মথি ৮/৫-১৩।
৩. লূক ৭/২-১০।

সকল কাহিনী তিনি লিখেছেন)। এরপর ১৭ অধ্যায়ে তিনি যীশুর উজ্জ্বল রূপ গ্রহণ করার ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

পক্ষান্তরে লূক (৪র্থ অধ্যায় থেকে ৯ম অধ্যায় পর্যন্ত) উপরের সকল অলৌকিক ঘটনা ও উপদেশ প্রদানের ঘটনা বর্ণনা করার পরে ৯ম অধ্যায়ের মাঝামাঝি এসে যীশুর রূপান্তর বা উজ্জ্বল রূপ গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

উভয় বর্ণনার একটি অসত্য ও ভুল। কারণ, ইতোপূর্বে ৫৪নং বৈপরীত্য আলোচনার সময় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা দাবি করছেন যে, তাঁরা ঐশ্বরিক প্রেরণার মাধ্যমে নির্ভুল কথা লিখছেন, তাদের জন্য ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে আগে পিছে করে বর্ণনা করা ও ঘটনার সময়কালকে অগ্রবর্তী বা পশ্চাতবর্তী করা পরস্পরবিরোধিতা বলে গণ্য হবে।

বৈপরীত্য-১২০

মথি তাঁর সুসমাচারের ৯ম অধ্যায়ে ভুতগ্রস্ত গোঁগার কাহিনী উল্লেখ করেছেন।[১] যীশু কর্তৃক শিষ্যগণকে অশুচি আত্মাগণের উপর ক্ষমতা প্রদান ও রোগ-ব্যাধি আরোগ্য করার ক্ষমতা প্রদান এবং তাদেরকে প্রেরণ করার ঘটনা উল্লেখ করেছেন।[২] এরপর তিনি পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে অনেক কাহিনী উল্লেখ করেছেন। এরপর ১৭ অধ্যায়ে তিনি যীশুর রূপান্তর ও উজ্জ্বল রূপ গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

অপর দিকে লূক ৯ম অধ্যায়ে যীশু কর্তৃক শিষ্যগণকে ক্ষমতা প্রদানের ঘটনা উল্লেখ করেছেন।[৩] এরপর যীশুর রূপান্তরের ঘটনা উল্লেখ করেছেন।[৪] এরপর এই অধ্যায়ে, পরবর্তী ১০ম অধ্যায়ে ও ১১শ অধ্যায়ের শুরুতে অন্য অনেক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি ভুতগ্রস্ত গোঁগার কাহিনী উল্লেখ করেছেন।[৫]

বৈপরীত্য-১২১

যীশুর ক্রুশে চড়ানোর সময় সম্পর্কে মার্ক তাঁর সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে লিখেছেন যে, "তৃতীয় ঘটিকার সময় তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিল।" পক্ষান্তরে যোহন তাঁর সুসমাচারের ১৯ অধ্যায়ের ১৪ আয়াতে লিখেছেন যে, বেলা ছয় ঘটিকার সময়েও যীশু গভর্নর পীলাতের দরবারে ছিলেন (এরপরে পীলাত তাঁকে যিহূদীগণের নিকট সমর্পণ করেন এবং তারা তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়)।

---

১. মথি ৯/৩২-৩৪।
২. মথি ১০/১-১০।
৩. লূক ৯/১-৬।
৪. লূক ১১/১৪-১৫।
৫. লূক ১১/১৪-১৫।

বৈপরীত্য -১২২

মথি তাঁর গ্রন্থের ২৭ অধ্যায়ে (৪৬ আয়াত) লিখেছেন: "আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, "এলী এলী লামা শবক্তানী," অর্থাৎ "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?"

মার্কের সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ে (৩৪ আয়াতে) রয়েছে: "আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চরবে ডাকিয়া কহিলেন, এলোই, এলোই, লামা শবক্তানী"; অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ ঃ "এই ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?"

পক্ষান্তরে লূকের সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ে (৪৪-৪৬ আয়াতে) উল্লেখ করা হয়েছে : "আর নবম ঘটিকা পর্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হইয়া রহিল .. আর যীশু উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া কহিলেন, পিতঃ, তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি।"[১]

বৈপরীত্য-১২৩

মথি ও মার্কের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, দেশাধ্যক্ষ (গভর্নর) পীলাতের সেনাগণই যীশুকে উপহাস ও বিদ্রূপ করেছিল এবং উপহাসের পোশাক পরিধান করিয়েছিল, হেরোদের সেনাগণ নয়। কিন্তু লূকের বক্তব্য থেকে এর বিপরীত বুঝা যায়।[২]

বৈপরীত্য ১২৪

মার্কের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, শাস্তিপ্রদানকারিগণ 'তাঁহাকে গন্ধরসে মিশ্রিত দ্রাক্ষারস (মদ: wine mingled with myrth) দিতে চাহিল; কিন্তু তিনি গ্রহণ করিলেন না।'[৩] অন্য তিন সুসমাচার থেকে জানা যায় যে, তারা তাঁকে 'সিরকা' (vinegar)[৪] প্রদান করে। মথি ও যোহনের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, তিনি সেই সিরকা পান করেন।

---

১. এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের বর্ণনাতেও বৈপরীত্য।

২. মথি ২৭/২৩-৩১; মার্ক ১৫/১৪-২০; লূক ২৩/৪-১২।

৩. মার্ক ১৫/২৩।

৪. মথি ২৭/৩৪; লূক ২৩/৩৬; যোহন ১৯/২৩-৩০। ইংরেজীতে তিন স্থানেই Vinegar শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু বাংলায় একস্থানে 'দ্রাক্ষারস,' দ্বিতীয় স্থানে 'অম্লরস' ও তৃতীয় স্থানে 'সিরকা' লেখা হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশ: ভুল-ভ্রান্তির বর্ণনা

প্রথম অংশে বৈপরীত্যের ভুলগুলি ছাড়াও বাইবেলের গ্রন্থগুলির মধ্যে আরো অগণিত ভুলভ্রান্তি রয়েছে (যা ঐতিহাসিকভাবে, সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে বা জ্ঞান ও বুদ্ধির আলোকে ভুল ও অসত্য বলে প্রমাণিত) যেগুলির কিছু উদাহরণ এখানে আলোচনা করা হলো :

ভুল-১

যাত্রাপুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ৪০ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'ইস্রায়েল-সন্তানেরা চারি শত ত্রিশ বৎসর কাল মিসরে প্রবাস করিয়াছিল।' এই তথ্যটি ভুল। ইস্রায়েল-সন্তানগণ ৪৩০ বৎসর নয়, বরং ২১৫ বছরকাল মিসরে অবস্থান করেছিল। তাদের বাইবেল-ব্যাখ্যাকার ও ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করেছেন যে, এই তথ্যটি ভুল। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় আলোচ্য বিষয়ের প্রথম প্রমাণের আলোচনা থেকে পাঠক তা জানতে পারবেন।

ভুল-২

গণনাপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে: "স্ব স্ব পিতৃকুলানুসারে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, অর্থাৎ বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষ গণিত হইলে গণিত লোকদের সংখ্যা ছয় লক্ষ তিন সহস্র পাঁচ শত পঞ্চাশ হইল। আর লেবীয়েরা আপন পিতৃবংশানুসারে তাহাদিগের মধ্যে গণিত হইল না।"[১]

এই আয়াতগুলি থেকে জানা যায় যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন মোশির সাথে মিসর ত্যাগ করে তখন তাদের যুদ্ধেসক্ষম পুরুষদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ। লেবীর বংশের সকল নারী, লেবীয় বংশের সকল পুরুষ, অন্যান্য সকল বংশের সকল নারী এবং সকল বংশের ২০ বছরের কম বয়স্ক সকল যুবক ও কিশোর পুরুষ বাদ দিয়েই ছিল এই সংখ্যা।

এই তথ্যটি ভুল। ইতোপূর্বে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তোরাহ-এর অবস্থা বর্ণনার ১০ম বিষয়ে পাঠক তা বিস্তারিত জানতে পেরেছেন।

ভুল-৩

দ্বিতীয় বিবরণের ২৩ অধ্যায়ের ২য় আয়াতটি ভুল।[২]

---

১. গণনাপুস্তক ১/৪৫-৪৭।

২. দ্বিতীয় বিবরণ ২৩/২: "জারজ ব্যক্তি সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিবে না; তাহার দশম পুরুষ পর্যন্তও সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" এই বক্তব্যটি ভুল বলে গণ্য হওয়ার দুইটি কারণ: প্রথমত, একজনের অপরাধে অন্যকে শাস্তি দেওয়া ঐশ্বরিক বিধান হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এই বিধান অনুসারে ইহূদী ও খৃষ্টানগণের মূল গৌরব দায়ূদ সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করতে পারবেন না; কারণ বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে তিনি ছিলেন যিহূদার জারজ সন্তান পেরসের দশম পুরুষ। দেখুন ঃ আদিপুস্তক ৩৮/১২-৩০; মথি ১/৩-৬।

ভুল-৪

আদি পুস্তকের ৪৬ অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে: "ইহারা লেয়ার সন্তান। তিনি পদ্দন-আরামে যাকোবের জন্য ইহাদিগকে এবং তাহার কন্যা দীনাকে প্রসব করেন। যাকোবের এই পুত্র কন্যারা সর্বশুদ্ধ তেত্রিশ প্রাণী।" এখানে 'তেত্রিশ প্রাণী' কথাটি ভুল। সঠিক কথা হলো 'চৌত্রিশ প্রাণী'। তৃতীয় ও চতুর্থ ভুলের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাও পাঠক ইতোপূর্বে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তোরাহ-এর অবস্থা বর্ণনার ১০ম বিষয়ে জানতে পেরেছেন।

ভুল-৫

১ শমূয়েল-এর ৬ অধ্যায়ের ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে : "পঞ্চাশ সহস্র জনকে।"[১] এই কথাটি নির্ভেজাল ভুল ও অসত্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আলোচ্যে পাঠক তা বিস্তারিত জানতে পারবেন।

ভুল-৬ ও ৭

২ শমূয়েল-এর ১৫ অধ্যায়ে ৭ম আয়াতে "চল্লিশ" এবং ৮ম আয়াতে "আরাম" শব্দ উভয়টিই ভুল। সঠিক তথ্য হলো, প্রথম স্থানে "চল্লিশ"-এর পরিবর্তে "চার" হবে এবং দ্বিতীয় স্থানে "আরাম"-এর পরিবর্তে "আদোম" হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আলোচ্যে পাঠক তা জানতে পারবেন। আরবী অনুবাদে অনুবাদকগণ "চল্লিশ"-কে বিকৃত করে "চার"-এ রূপান্তরিত করেছেন।[২]

ভুল-৮

২ বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ আয়াতে শলোমনের মন্দিরের[৩] বর্ণনায় বলা হয়েছে: "আর গৃহের সম্মুখস্থ বারাণ্ডা গৃহের প্রস্থানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও এক শত বিংশতি হস্ত উচ্চ হইল।"

"১২০ হাত উচ্চ" কথাটি নিখাদ ভুল। ১ রাজাবলির ৬ অধ্যায়ের ২ আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছ যে, শলোমনের নির্মিত মন্দিরটির উচ্চতা ছিল 'ত্রিশ হস্ত'। তাহলে বারাণ্ডা কিভাবে ১২০ হাত উঁচু হবে?

আদম ক্লার্ক তাঁর ভাষ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে স্বীকার করেছেন যে, এই কথাটি ভুল। সিরিয় (সুরিয়ানী) ভাষায় ও আরবী ভাষায় অনুবাদে অনুবাদকগণ ১২০ সংখ্যাকে বিকৃত করেছেন। তারা "এক শত" কথাটি ফেলে দিয়ে বলেছেন: "বিশ হাত উচ্চ"।

১. "ফলতঃ তিনি লোকেদের মধ্যে সত্তর জনকে, এবং পঞ্চাশ সহস্র জনকে আঘাত করিলেন।"

২. বাংলা অনুবাদেও এই বিকৃতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। ইংরেজী পাঠ : And it came to pass after forty years, that Ab'salom said unto the king.. বাংলা অনুবাদ : পরে চারি বৎসর অতীত হইলে অবশালোম রাজাকে কহিল..)।

৩. সুলায়মান (আ)-এর মসজিদে বা আল-মাসজিদুল আকসা।

ভুল-৯

যিহোশূয়ের পুস্তকের ১৮অধ্যায়ের ১৪ আয়াতে বিন্যামীন-সন্তানগণের এলাকার সীমারেখা বর্ণনাকালে বলা হয়েছে: "তথা হইতে ঐ সীমা ফিরিয় সমুদ্রের[১] পার্শে.."।

এখানে সমুদ্রের পার্শে কথাটি ভুল। তাদের এলাকায় বা নিকটে কোন সমুদ্র ছিল না। বাইবেলের দুই ভাষ্যকার ডাওয়ালী ও রজার্ডমেন্ট স্বীকার করেছেন যে, এই কথাটি ভুল। তাঁরা বলেছেন: "যে হিব্রু শব্দটিকে 'সমুদ্র' বলে অনুবাদ করা হয়েছে, তার অর্থ হবে পশ্চিম।"

দুই ভাষ্যকারের দেওয়া এই অর্থ আমরা কোন অনুবাদেই পাইনি। সম্ভবত এই অর্থটি তাঁদের আবিষ্কার। ধরে ফেলা ভুল থেকে বাঁচার জন্যই এই আবিষ্কার।

ভুল-১০

যিহোশূয়ের পুস্তকের ১৯ অধ্যায়ের ৩৪ আয়াতে নপ্তালি-সন্তানগণের এলাকার সীমা বর্ণনায় বলা হয়েছে: "ও সূর্যোদয়ের দিকে যর্দন সমীপস্থ যিহূদা পর্যন্ত গেল।"

এই তথ্যটিও ভুল; কারণ যিহূদা রাজ্যের সীমা দক্ষিণ দিকে আরো অনেক দূরে ছিল। আদম ক্লার্ক এই তথ্যটি ভুল বলে স্বীকার করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাঠক তা জানতে পারবেন।[২]

ভুল-১১

বাইবেল ভাষ্যকার হার্সলী বলেছেন: "যিহোশূয়ের পুস্তকের ১৩ অধ্যায়ের ৭ ও ৮ আয়াত দুইটি ভুল।"

ভুল-১২

বিচারকর্তৃগণের বিবরণ-এর ১৭ অধ্যায়ের ৭ আয়াতে বলা হয়েছে: "তৎকালে যিহূদা গোষ্ঠীর বৈৎলেহম-যিহূদার একটি লোক ছিল, সে লেবীয় (of the family of Judah, who was a Lavite), ও সে তথায় প্রবাস করিত।"

'সে লেবীয়' এই কথাটি ভুল। কারণ যিহূদা গোষ্ঠীর হলে কিভাবে সে লেবীয় হবে?[৩] বাইবেল ভাষ্যকার হার্সলী স্বীকার করেছেন যে, এই কথাটি ভুল। হিউপি কেন্ট তাঁর সম্পাদিত বাইবেল থেকে এই কথাটুকু ফেলে দিয়েছেন।

---

১. বাংলা অনুবাদে এখানে "পশ্চিম পার্শে" লেখা হয়েছে। ইংরেজীতে সমুদ্রই লেখা আছে : And the border was drawn thence, and compassed the corner of the sea..। একটু পরেই লেখক উল্লেখ করবেন যে, কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই শুধু সংশোধনের জন্য সমুদ্র শব্দকে তারা পশ্চিম বলে অনুবাদ করেছেন।

২. নপ্তালিদের রাজ্য ছিল ফিলিস্তীনের উত্তরে এবং যিহূদা ছিল ফিলিস্তীনের দক্ষিণে। উভয়ের মধ্যে ছিল অনেক দূরত্ব। কাজেই এক রাজ্য অন্য রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত ছিল বলে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা ভুল।

৩. যিহূদা ও লেবী যাকোব বা ইসরাইলের (ইয়াকূব আ.) ১২ পুত্রের দুই পুত্র।

ভুল-১৩

২ বংশাবলির ১৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "অবিয় চারি লক্ষ মনোনীত যুদ্ধবীরের সহিত যুদ্ধে গমন করিলেন, এবং যারবিয়াম আট লক্ষ মনোনীত বলবান বীরের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা করিলেন। ...১৭ আর অবিয় ও তাঁহার লোকেরা মহাসংহারে উহাদিগকে সংহার করিলেন; বস্তুত ইস্রায়েলের পাঁচ লক্ষ মনোনীত লোক মারা পড়িল।"

উপরের আয়াতদ্বয়ে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি সবই ভুল। বাইবেল ব্যাখ্যাকারগণ তা স্বীকার করেছেন। ল্যাটিন বাইবেলের অনুবাদকগণ এই ভুল সংশোধনের জন্য 'চারি লক্ষ'-কে বিকৃত করে 'চল্লিশ হাজার', 'আট লক্ষ'-কে বিকৃত করে 'আশি হাজার' এবং 'পাঁচ লক্ষ'-কে বিকৃত করে 'পঞ্চাশ হাজার' বানিয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাঠক তা জানতে পারবেন।

ভুল-১৪

২ বংশাবিলর ২৮ অধ্যায়ের ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে: " ইস্রায়েল রাজ আহসের জন্য সদা প্রভু যিহূদাকে নত করিলেন..."। এখানে "ইস্রায়েল-রাজ" কথাটি নিঃসন্দেহে ভুল; কারণ আহস ইস্রায়েল রাজ্যের রাজা ছিলেন না বরং তিনি যিহূদা রাজ্যের রাজা ছিলেন। এই ভুলটি এত স্পষ্ট ও দৃষ্টিগ্রাহ্য যে, বাইবেলের গ্রীক ও ল্যাটিন অনুবাদকগণ এই শব্দটিকে বিকৃত করে 'ইস্রায়েল-রাজ' শব্দের পরিবর্তে 'যিহূদা-রাজ' লিখেছেন। এই পরিবর্তন ও সংশোধন বিকৃতি ছাড়া কিছুই নয়।

ভুল-১৫

২ বংশাবলির ৩৬ অধ্যায়ের ১০ আয়াতে যিরূশালেমের রাজা যিহোয়াখীন সম্পর্কে বলা হয়েছে: "পরে বৎসর ফিরিয়া আসিলে নবূখদ্নিৎসর রাজা লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ও সদাপ্রভুর গৃহস্থিত মনোরম পাত্র সকল ব্যাবিলে লইয়া গেলেন, এবং যিহূদা ও যিরূশালেমের উপরে তাঁহার ভ্রাতা সিদিকিয়কে রাজা করিলেন।"

এখানে 'তাঁহার ভ্রাতা' কথাটি ভুল। সঠিক হবে: 'তাঁহার চাচা'। আর এজন্য বাইবেলের গ্রীক ও আরবী অনুবাদে অনুবাদকগণ ' তাঁহার ভ্রাতা' কথাটিকে পরিবর্তন করে 'তাঁহার চাচা' লিখেছেন। এই সংশোধন বিকৃতি ছাড়া কিছুই নয়।

ক্যাথলিক ওয়ার্ড বলেন, "যেহেতু এই কথাটি ভুল, সেহেতু গ্রীক অনুবাদে ও অন্যান্য অনুবাদে তা পরিবর্তন করে 'চাচা' লেখা হয়েছে।"

ভুল-১৬

২ শমূয়েল-এর ১০ অধ্যায়ের ১৬ ও ১৯ আয়াতে ৩ স্থানে এবং ১ বংশাবলির ১৮ অধ্যায়ের ৩, ৫, ৭, ৮, ৯ ও ১০ আয়াতে ৭ স্থানে 'হদরেষর শব্দটি এসেছে। এই নামটি ভুল লেখা হয়েছে। সঠিক নাম হবে 'হদ্দেষর', অর্থাৎ র-এর পরিবর্তে 'দ' হবে।

ভুল-১৭

যিহোশূয়ের পুস্তকের ৭ অধ্যায়ের ১৮ আয়াতে "আখন" নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। নামটি হবে 'আখর', 'ন'-এর পরিবর্তে 'র' হবে।[১]

ভুল-১৮

১ বংশাবলির ৩ অধ্যায়ের ৫ আয়াতে বলা হয়েছে: "এই চারিজন অম্মীয়েলের কন্যা বৎসূয়ার সন্তান।" এখানে নামটি ভুল লেখা হয়েছে। সঠিক নাম হবে "ইলিয়ামের কন্যা বৎশেবা"।[২]

ভুল-১৯

২ রাজাবলির ১৪ অধ্যায়ের ২১ আয়াত: "আর যিহূদার সমস্ত লোক ষোল বৎসর বয়স্ক 'অসরিয়কে' লইয়া তাঁহার পিতা অমৎসিয়ের পদে রাজা করিল।" এখানে 'অসরিয়' (Azari'ah) শব্দটি ভুল। এই রাজার সঠিক নাম হলো 'উষিয়' (Uzzi'ah)।[৩]

ভুল-২০

২ বংশাবলির ২১ অধ্যায়ের ১৭ অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে যিহোরাম রাজার সম্পর্কে বলা হয়েছে: "কনিষ্ঠ পুত্র 'যিহোয়াহস' ব্যতীত তাঁহার একটি পুত্রও অবশিষ্ট থাকিল না।" এখানে 'যিহোয়াহস' (Jeho'ahaz) নামটি ভুল লেখা হয়েছে। তার সঠিক নাম ছিল 'অহসিয়' (Ahazi'ah)।[৪]

সত্য কথা হলো, বাইবেলের পুস্তকগুলিতে খুব কম নামই সঠিকভাবে লেখা হয়েছে। অধিকাংশ নামই ভুল লেখা হয়েছে।

ভুল-২১

২ বংশাবলির ৩৬ অধ্যায়ে যিরূশালেমের রাজা যিহোয়াকীম সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে: "বাবিল রাজ নবূখদ্‌নিৎসর আসিয়া বাবিলে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে পিত্তল-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন।"[৫]

এই তথ্যটি ভুল। সঠিক তথ্য হলো, নেবুকাদনেযার বা নবূখদ্‌নিৎসর রাজা যিহোয়াকীমকে যিরূশালেমেই হত্যা করেন এবং তার নির্দেশে মৃতদেহ যিরূশালেম শহর-প্রাচীরের বাইরে ফেলে রাখা হয়। তাকে কবরস্থ করতে নিষেধ করা হয়।

---

১. ১ বংশাবলি ২/৭ এ 'আখর' লেখা হয়েছে।

২. দেখুন ২ শমূয়েল ১১/৩।

৩. সঠিক নাম দেখুন: ২ রাজাবলি ১৫/১৩, ৩০, ৩২, ৩৪।

৪. সঠিক নাম দেখুন: ২ রাজাবলি ৮/২৫; ২ বংশাবলি ২২/১, ২, ৮, ৯।

৫. ১৮৪৪ সালে মুদ্রিত আরবী বাইবেলে: "তাহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন এবং বাবিলে লইয়া গেলেন।"

প্রথম খৃস্টীয় শতাব্দীর (৩৭-৯৫ খৃ) প্রসিদ্ধতম ইহূদী ঐতিহাসিক যোসেফাস (Flavius Josephus) তাঁর ইতিহাসের ১০ম গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লিখেছেন "ব্যবিলন-রাজ শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিয়ে আগমন করেন এবং বিনা যুদ্ধে [illegible] অধিকার করেন। তিনি নগরে প্রবেশ করেন এবং যুবকদেরকে হত্যা করেন। তিনি যিহোয়াকীমকে হত্যা করেন এবং তার মৃতদেহ নগর-প্রাচীরের বাইরে ফেলে রাখেন। তিনি যিহোয়াকীমের পুত্র যিহোয়াখীনকে রাজ-সিংহাসনে বসান। তিনি তিন হাজার ব্যক্তিকে বন্দি করে নিয়ে যান। যিহিষ্কেল ভাববাদীও এ সকল বন্দিদের একজন ছিলেন।"

ভুল-২২

যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৭ম অধ্যায়ের ৮ আয়াতটি ১৬৭১ সালে মুদ্রিত ও ১৮৩১ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদ ও ১৮৩৮ সালে মুদ্রিত ফারসী অনুবাদ অনুসারে নিম্নরূপ: "আর পঁয়ষট্টি বৎসর গত হইলে ইফ্রমিয়[1] বিনষ্ট হইবে, আর জাতি থাকিবে না।"[2]

এই কথাটি নিঃসন্দেহে ভুল। কারণ এই ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যিহূদা-রাজ আহসের সময়। আহস ষোল বছর রাজত্ব করেন। এরপর তার পুত্র হিষ্কিয় রাজা হন। হিষ্কিয়ের রাজত্বের ষষ্ঠ বছরে অশূর-রাজ্যের হাতে ইফ্রমিয় বা উত্তর প্যালেস্টাইনের ইহূদীদের শমরীয় রাজ্যের পতন ঘটে।[3] এভাবে দেখা যায় যে, এই ভবিষ্যৎবাণীর ২১ বছরের মধ্যে ইফ্রমিয় বিনষ্ট হয়ে যায়।

প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মবেত্তা ওয়াট রিংকা বলেন: "এই স্থানে উদ্ধৃতিতে ভুল হয়েছে। মূল কথা ছিল: ষোল ও পাঁচ। এই সময়কাল নিম্নরূপে বিভক্ত: আহসের রাজত্বকালের ১৬ বছর ও হিষ্কিয়ের রাজত্বকালের ৫ বছর।"

এই পণ্ডিতের কথাটি (পঁয়ষট্টি-কে ষোল ও পাঁচ বানানো) যদিও ভিত্তিহীন ব্যাখ্যা; তবে তিনি স্বীকার করে নিলেন যে, যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের মধ্যে বিদ্যমান এই বক্তব্যটি ভুল। ১৮৪৩ সালে মুদ্রিত বাইবেলের উর্দু অনুবাদের অনুবাদকগণ এই বাক্যটিকে বিকৃত করেছেন।[4] আল্লাহ্ এদের সুপথে পরিচালিত করুন, এরা তাদের প্রাচীন অভ্যাসটি ছাড়তে রাজী নন।

---

১. রাজা দায়ূদের পুত্র রাজা শলোমনের পরে প্যালেস্টাইনে ইহূদীদের রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর প্যালেস্টাইনের রাজ্যকে শামেরা বা ইস্রাইল রাজ্য বলা হলো। এর রাজধানী ছিল নাবলুস। আর দক্ষিণ প্যালেস্টাইনের রাজ্যকে 'যিহূদা রাজ্য' বলা হতো। এর রাজধানী ছিল যিরুশালেম। উত্তর রাজ্য শামেরা বা ইস্রাইলকে 'ইফ্রমিয়' বলা হতো। এখানে এই রাজ্যের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

২. বাংলা অনুবাদও একই রূপ।

৩. দেখুন ঃ ২ রাজাবলী ১৮/৯-১০; ২ বংশাবলী ২৮/১, ২৭, ২৯/১।

৪. 'পঁয়ষট্টি বৎসর গত হইলে'-র পরিবর্তে 'পঁয়ষট্টি বৎসরের মধ্যে' লেখা হয়েছে, যদিও এতে তাদের খুব বেশি উপকার হয় না। কারণ ৬৫ বছরের মধ্যে ঘটবে বলার পরে যদি তা ২১ বছরের মধ্যে ঘটে যায় তাহলে তাকে সঠিক ভবিষ্যৎবাণী বলা যায় না।

ভুল-২৩

আদিপুস্তকের ২য় অধ্যায়ের ১৭ আয়াতটি নিম্নরূপ: "কিন্তু সদসদ-জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে।"

এই কথাটি ভুল। কারণ আদম (আ) এই বৃক্ষের ফল ভোজন করেছেন এবং যে দিন এই বৃক্ষের ফল ভোজন করেছেন, সেই দিন তিনি মরেন নি; বরং এর পরেও ৯০০ বছরেরও বেশি সময় তিনি জীবিত ছিলেন।

ভুল-২৪

আদিপুস্তকের ৬ অধ্যায়ের ৩ আয়াতটি নিম্নরূপ: "তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, আমার আত্মা মানুষের মধ্যে সর্বদা অবস্থান করিবে না; কারণ সেও তো মাংসমাত্র; পরন্তু তার সময় এক শত বিংশতি বৎসর হইবে।"[১]

"মানুষের আয়ু ১২০ বৎসর হইবে" এই কথাটি ভুল। কারণ পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের বয়স আরো অনেক দীর্ঘ ছিল। (বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ীই) নোহ (নূহ) ৯৫০ বছর জীবিত ছিলেন।[২] শেম (সাম) ৬০০ বছর জীবিত ছিলেন।[৩] অর্ফক্ষদ ৩৩৮ বছর আয়ু লাভ করেন।[৪] এভাবে অন্যান্যরা দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। আর বর্তমান যুগে ৭০ বা ৮০ বছর আয়ু পাওয়ার ঘটনাও কম ঘটে।

ভুল-২৫

আদিপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ের ৮ আয়াতে ঈশ্বর আবরাহামকে বলেন: "আর তুমি যে কনান দেশে প্রবাস করিতেছ, ইহার সমুদয় আমি তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে চিরস্থায়ী অধিকারার্থে দিব, আর আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব।"

এই কথাটিও ভুল। কনান দেশের সমুদয় স্থান কখনোই আবরাহামের অধিকারে প্রদান করা হয়নি। অনুরূপভাবে তাঁর বংশধরেরাও চিরস্থায়ীভাবে তার দখল রাখতে পারেনি। এই দেশে যত বিপ্লব-পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে সেইরূপ আর কোন দেশে

---

১. এই আয়াতটির ইংরেজী পাঠ নিম্নরূপ : And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh; yet his days shall be a hundred and twenty years. এই ইংরেজী পাঠের ভিত্তিতে ও গ্রন্থকারের প্রদত্ত আরবী পাঠের ভিত্তিতে উপরের বাংলা অনুবাদটি করা হয়েছে। এখানে প্রচলিত বাংলা বাইবেলের ভাষা নিম্নরূপ: "তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, আমার আত্মা মনুষ্যদের মধ্যে নিত্য অধিষ্ঠান করিবে না; তাহাদের বিপথগমনে তাহারা মাংসমাত্র। পরন্তু তাহাদের সময় এক শত বিংশতি বৎসর হইবে।"

২. আদিপুস্তক ৯/২৯।

৩. আদিপুস্তক ১১/১০-১১।

৪. আদিপুস্তক ৯/১২-১৩।

হয়নি। সেই দেশে থেকে ইস্রায়েল-সন্তানদের রাজত্ব শেষ হওয়ার পরেও অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে।[১]

ভুল-২৬, ২৭,২৮

যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ যোশিয়ের পুত্র যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমের চতুর্থ বৎসরে, অর্থাৎ বাবিল-রাজ বনূখদনিৎসরের প্রথম বছরে, যিহূদার সমস্ত লোকের বিষয়ে এই বাক্য যিরমিয়ের নিকট উপস্থিত হইল; .. ১১ তাহাতে এই সমগ্র দেশ উৎসন্ন স্থান ও বিস্ময়ের বিষয় হইবে; এবং এই জাতিগণ সত্তর বৎসর বাবিল-রাজের দাসত্ব করিবে। ১২ সদাপ্রভু আরও কহেন, সত্তর বৎসর সম্পূর্ণ হইলে আমি বাবিল-রাজকে ও সেই জাতিকে তাহাদের অপরাধের সমুচিত প্রতিফল দিব, (এবং) কল্‌দীয়দের দেশকে[২] এবং তাহা চিরস্থায়ী ধ্বংসস্থান করিব।"

এই পুস্তকের ২৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১ যিকনিয় রাজা[৩] মাতারাণী ও নপুংসক সকল এবং যিহূদার ও যিরূশালেমের অধ্যক্ষগণ, শিল্পকরেরা ও কর্মকারেরা যিরূশালেম হইতে প্রস্থান করিলে পর, ২ যিরমিয় ভাববাদী নির্বাসিত লোকদের অবশিষ্ট প্রাচীনবর্গের নিকটে, এবং নবূখদনিৎসর কর্তৃক যিরূশালেম হইতে বন্দিরূপে বাবিলে নীত যাজকগণের, ভাববাদিগণের ও সমস্ত লোকের নিকটে শাফনের পুত্র ইলিয়াসা ও হিল্কিয়ের পুত্র গমরিয়ের হাতে যিরূশালেম হইতে একখানি পত্র পাঠাইয়া দেন। ... ১০ বস্তত সদাপ্রভু এই কথা কহেন, বাবিলের সম্বন্ধে সত্তর বৎসর সম্পূর্ণ হইলে (After seventy years be accomplished at Babylon) আমি তোমাদের তত্ত্বাবধান করিব, এবং তোমাদের পক্ষে আমার মঙ্গলবাক্য সিদ্ধ করিব, তোমাদিগকে পুনর্বার এই স্থানে ফিরাইয়া আনিব।"

এই ১০ম আয়াতের অনুবাদে ১৮৩৮ সালে মুদ্রিত ফারসী বাইবেলে বলা হয়েছে : "বাবিলে ৭০ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে পরে আমি তোমাদিগকে পুনর্বার এই স্থানে ফিরাইয়া আনিব।" ১৮৪৫ সালে মুদ্রিত ফারসী বাইবেলে বলা হয়েছে: "বাবিলে ৭০ বৎসর সম্পূর্ণ হইবার পর ...।"

---

১. খৃষ্টপূর্ব ৭২২ সালে উত্তরের ইস্রায়েল রাজ্য বা শমরীয়দের রাজ্য বিনষ্ট হয়। খৃষ্টপূর্ব ৫৮৭ অব্দে দক্ষিণের যিহূদা রাজ্য বিনষ্ট হয়। প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে প্যালেস্টাইনের কিছু অংশে জবরদখল করে 'ইসরাঈল' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। কনানের বাকি অংশে আরব, গ্রীক, বাবিলনীয়, আশুরীয়, রোমান ও অন্যান্য জাতিদের রাজত্ব ও বসবাস ছিল ও আছে।

২. আরবী ও ইংরেজী বাইবেলের সাথে বাংলা বাইবেলের কিছু বৈপরীত্য রয়েছে।

৩. যিকনিয় রাজা বলতে রাজা যিহোয়াখীনকে বুঝানো হচ্ছে। তিনি যিহোয়াকীমের পুত্র। নেবুকাদনেযার যিহোয়াকীমকে হত্যা করার পরে যিহোয়াখীনকে রাজা বানান। তাকে হত্যা করার পরে সিদকিয়কে রাজা বানান। সিদকিয়কে হত্যা করে যিহূদাকে বিরান করেন। দেখুন: বাইবেল: ২ রাজাবলি ২৩/৩৪-৩৭, ২৪/১-২০; ২৫/১-৩০; যিরমিয় ৫২/১-৩৪।

এই পুস্তকের ৫২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "২৮ নবূখদ্‌রিৎসর কর্তৃক এই সকল লোক বন্দিরূপে নীত হইল; সপ্তম বৎসরে তিন সহস্র তেইশ জন যিহূদী (ইহূদী)। ২৯ নবূখদ্‌রিৎসরের অষ্টাদশ বৎসরে তিনি যিরূশালেম হইতে আটশত বত্রিশ জনকে বন্দি করিয়া লইয়া যান। ৩০ নবূখদ্‌রিৎসরের ত্রয়োবিংশ বৎসরে রক্ষ-সেনাপতি নবূষরদন সাতশত পঁয়তাল্লিশ জন যিহূদীকে বন্দি করিয়া লইয়া যান। ইহারা সর্বশুদ্ধ চারি সহস্র ছয়শত প্রাণী।"

উপরের বক্তব্যগুলি থেকে তিনটি বিষয় জানা যায়:

প্রথম বিষয় : যিহূদা-রাজ যিহোয়াকীমের সিংহাসনারোহণের চতুর্থ বছরে নেবুকাদনেযার (নবূখদ্‌রিৎসর/ বুখত নসর) ব্যাবলিনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই হলো সঠিক কথা। (প্রথম খৃস্টীয় শতকের প্রখ্যাত) ইহূদী ঐতিহাসিক যোসেফাস (Flavius Josephus) তাঁর ইতিহাসের ১০ম পুস্তকে এই কথাই লিখেছেন। তিনি বলেন: "যিহোয়াকীমের সিংহাসনারোহণের চতুর্থ বছরে নেবুকাদনেযার বাবিলের রাজ্যভার গ্রহণ করেন।"[১] যদি কেউ এর বিপরীত কোন দাবি করেন তবে তা অসত্য বলে গণ্য হবে এবং যিরমিয় ভাববাদীর বক্তব্যের বিপরীত হবে। সন গণনায় সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, নেবুকাদনেযারের ১ম বছর হবে যিহোয়াকীমের ৪র্থ বছর।

দ্বিতীয় বিষয় : উপরের আয়াতগুলি থেকে জানা গেল যে, যিকনিয় রাজা, মাতারাণী ও নপুংসক সকল এবং যিহূদার ও যিরূশালেমের অধ্যক্ষগণ, শিল্পকরেরা ও কর্মকারেরা যিরূশালেম হইতে প্রস্থান করিলে পর যিরমিয় ভাববাদী এই পত্রটি লিখেছিলেন।

তৃতীয় বিষয় : উপরের আয়াতগুলি থেকে জানা গেল যে, তিনবারের অপসারণ বা স্থানান্তরের মাধ্যমে সর্বশুদ্ধ চারি সহস্র ছয়শত প্রাণীকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়। তৃতীয়বারের অপসারণের ঘটনা ঘটেছিল নেবুকাদনেযারের সিংহাসনারোহণের ২৩তম বছরে।

গ্রন্থকার বলেন, এখানে তিনটি ভুল রয়েছে:

প্রথম ভুল : ঐতিহাসিকগণের বিবরণ অনুসারে যিকনিয় রাজা মাতারাণী, শিল্পকর, কর্মকার ও অন্যান্যদের যিরূশালেম হইতে বন্দি করে অপসারণ ও বাবিলে আগমনের ঘটনাটি ঘটেছিল খৃ. পূ. ৫৯৯ সালে। 'মীযানুল হক' গ্রন্থের প্রণেতা (ড. ফানডার)

---

১. যিহূদা-রাজ্য ছিল মিসরের নিয়ন্ত্রণাধীন। মিসরের ফারাও দ্বিতীয় নেকু (Neku) খৃ. পূ. ৬০৮ অব্দে যিহূদা-রাজ যিহোয়াহসকে অপসারিত করে তাঁর পুত্র যিহোয়াকীমকে যিহূদার রাজা নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন যিহূদা রাজ্যের ১৭শ রাজা। খৃ. পূ. ৬০৫ অব্দে ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী কারচেমিস্ (Carchemish) নামক স্থানের যুদ্ধে ব্যাবিলনের রাজকুমার নেবুকাদনেযার মিসরের ফারাও নেকুকে পরাজিত করেন। এই সময়ে ব্যাবিলন-সম্রাট নেবু পলেসার পরলোক গমন করেন। নেবুকাদনেজার ব্যাবিলনে ফিরে ব্যাবিলনের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। দেখুন: বাইবেল: ১ রাজাবলি ২৩/৩১-৩৭, ২৪/১-৫; মতিওর রহমান খান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ ১০।

১৮৪৯ সালে মুদ্রিত তাঁর গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, খৃষ্টপূর্ব ৬০০ সালে এই অপসারণ সংঘটিত হয়। যিরমিয় ভাববাদী এদের বন্দি করে ব্যাবিলনে নেওয়ার পরে তাঁর পত্রটি লিখেন। তাহলে যিহূদীগণকে ব্যাবিলনে অবশ্যই এরপর ৭০ বছর অবস্থান করতে হবে। কিন্তু তথ্যটি ভুল। প্রকৃতপক্ষে তারা ৭০ বছর অবস্থান করেনি।

পারস্য রাজ সাইরাস (কোরস) ব্যাবিলন-রাজকে পরাভূত করে ব্যাবিলন অধিকার করার পরে তার নির্দেশে ইহূদীগণকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ৫৩৬ সালে। তাহলে ব্যাবিলনে ইহূদীগণ ৬৩ বছর অবস্থান করেছিল, ৭০ বছর নয়।

১৮৫২ সালে বৈরুতে মুদ্রিত খৃস্টানদের প্রকাশিত আরবী ভাষায় রচিত 'মুরশিদুত তালিবীন ইলাল কিতাবিল মুকাদ্দাসিস সামীন' (মহামূল্য পবিত্র গ্রন্থের জন্য জ্ঞানান্বেষকের নির্দেশিকা) নামক গ্রন্থ থেকে আমি নিম্নের তারিখগুলি উদ্ধৃত করেছি। এখানে প্রকাশ থাকে যে, ইতোপূর্বে ১৮৪০ সালে প্রকাশিত এই পুস্তকটির বিবরণের সাথে ১৮৫২ সালে মুদ্রিত সংস্করণের অধিকাংশ স্থানে অমিল আছে। বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে বক্তব্যের হেরফের করা খৃস্টান সম্প্রদায়ের নিয়মিত অভ্যাস। কাজেই যিনি আমার উদ্ধৃতি মূল গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে চাইবেন, তাকে অবশ্যই ১৮৫২ সালে মুদ্রিত সংস্করণের সাথে মিলাতে হবে। এই সংস্করণটির কপি ইস্তাম্বুলের বায়েযিদ মসজিদের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

গ্রন্থকার বলেন, এই গ্রন্থের ১৮৫২ সালে প্রকাশিত সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের ২০ পরিচ্ছেদে পবিত্র বাইবেলের ঐতিহাসিক নির্ঘণ্ট নিম্নরূপে দেওয়া আছে:

খৃ. পূ সাল	ঘটনা	পৃথিবীর বয়স
৫৯৯	যিরমিয় ভাববাদী তথাকার, অর্থাৎ বাবিলের বন্দিদের নিকট পত্র লিখলেন	৩৪০৫
৫৩৬ (৬৩ বৎসর পরে)	সাইরাস (Cyrus) বা কোরসের মামা মিডিয়ান (মাদিয়ান, দেশে দারার (Darius) মৃত্যু। সাইরাস তার পরে মাদিয়া, পারস্য ও ব্যাবিলনের রাজত্ব গ্রহণ করেন। সাইরাস ইহূদীদেরকে মুক্ত করেন এবং তাদেরকে ইহূদী ধর্মে যাওয়ার অনুমতি দেন।	৩৪৬৮

দ্বিতীয় ভুল : উপরের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, তিনবারে 'সর্বশুদ্ধ চারি সহস্র ছয়শত প্রাণী'-কে বন্দি করে বাবিলে নেওয়া হয়। পক্ষান্তরে ২ রাজাবলির ২৪ অধ্যায়ের ১৪ আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, একবারেই দশ সহস্র প্রধান লোক ও বলবান বীরকে বন্দি করে বাবিলে নেওয়া হয়। বন্দিকৃত শিল্পকার ও কর্মকারদের সংখ্যা ছিল এই গণনার বাইরে।

তৃতীয় ভুল : উপরের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, নেবুকাদনেজার-এর সিংহাসনারোহণের ২৩তম বছরে তৃতীয় অপসারণ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ২ রাজাবলির ২৫ অধ্যায়ে (৮ আয়াত) থেকে জানা যায় যে, নেবুকাদনেজারের সিংহাসনারোহণের ১৯তম বছরে তা সংঘটিত হয়েছিল।[১]

ভুল-২৯

যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ২৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "আর একাদশ বৎসরে, মাসের প্রথম দিবসে, সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ... প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি উত্তরদিক হইতে অশ্ব, রথ ও অশ্বারোহিগণের এবং জনসমাজের ও অনেক সৈন্যের সহিত রাজাধিরাজ বাবিলরাজ নবূখদ্‌রিৎসরকে আনাইয়া সোরে (Tyrus) উপস্থিত করিব। সে জনপদে অবস্থিতা তোমার কন্যাদিগকে খড়্গাঘাতে বধ করিবে, তোমার বিরুদ্ধে গড় গাঁথিবে, তোমার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধিবে, ও তোমার বিরুদ্ধে ঢাল উত্তোলন করিবে। আর সে তোমার প্রাচীরে দুর্গভেদক যন্ত্র স্থাপন করিবে, ও আপন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তোমার উচ্চগৃহ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। ... সে আপন অশ্বগণের খুরে তোমার সমস্ত পথ দলিত করিবে, খড়্গ দ্বারা তোমার প্রজাদিগকে বধ করিবে, ও তোমার পরাক্রমসূচক স্তম্ভ সকল ভূমিসাৎ হইবে। উহারা তোমার সম্পত্তি লুট করিবে, তোমার বাণিজ্য দ্রব্য হরণ করিবে, তোমার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, ও তোমার মনোরমা গৃহ সকল ধ্বংস করিবে; এবং তাহারা তোমার প্রস্তর, কাষ্ঠ ও ধুলি জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে।.. আমি তোমাকে শুষ্ক পাষাণ করিব; তুমি জাল বিস্তার করিবার স্থান হইবে; তুমি আর নির্মিত হইবে না...।"[২]

এই ভবিষ্যৎবাণীটি ভুল।[৩] কারণ সোর (Tyrus)-কে চিরতরে বিধ্বংস করা তো দূরের কথা, নেবুকাদনেযার সোর অধিকারই করতে পারেননি। নেবুকাদনেযার ১৩ বছর

১. নেবুকাদনেজার খৃ. পূ ৬০৫/৬০৪ সালে ব্যবিলনের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। বাইবেলের ১ম বর্ণনা ঠিক হলে তৃতীয় অপসারণ ঘটেছিল খৃ. পূ. ৫৮২ সালে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ঘটেছিল খৃ. পূ. ৫৮৭ সালে, অর্থাৎ নেবুকাদনেজারের রাজত্বের ১৭/১৮তম বছরে। এথেকে বুঝা যায় যে, প্রথম বক্তব্যটি ভুল। দেখুন: মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ১১।

২. যিহিষ্কেল ২৬ অধ্যায়ের ১ থেকে ১৪ আয়াতের আংশিক উদ্ধৃতি। এই আয়াতগুলিতে সোর-এর সোর শহরের চিরস্থায়ী ধ্বংসের ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে। এই ভবিষ্যতবাণী ভুল ও অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৩. মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, সকল নবী-রাসূলই নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য ওহী পেয়েছেন ও সত্য ভবিষ্যতবাণী করেছেন। তাঁদের অনেক সত্য ভবিষ্যৎবাণী বাইবেলে রয়েছে। আবার অনেক ভবিষ্যৎবাণী ইহুদী-খৃষ্টানগণ বিকৃত ও পরিবর্তন করেছে। এখানে কোন নবীর ভুল ধরা উদ্দেশ্য নয় বরং বাইবেলের বর্ণনার বৈপরীত্য ও বিকৃতি তুলে ধরা উদ্দেশ্য।

যাবৎ সোর অবরোধ করে রাখেন। তিনি তা অধিকার করার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তা দখল করতে অক্ষম হন এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান।

এই ভবিষ্যৎবাণী ভুল হয়ে যাওয়াতে যিহিস্কেল ভাববাদী ওযরখাহী (নাউযু বিল্লাহ!) পেশ করতে বাধ্য হলেন। যিহিস্কেলের পুস্তকের ২৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "আর সপ্তবিংশ বৎসরের প্রথম মাসে, মাসের প্রথম দিবসে, সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য-সন্তান, বাবিল-রাজ নুবখদ্‌রিৎসর আপন সৈন্যসামন্তকে সোরের (Tyrus) বিরুদ্ধে ভারী পরিশ্রম করাইয়াছে; সকলের মস্তক টাকপড়া ও সকলের স্কন্ধ জীর্ণত্বক্‌ হইয়াছে; কিন্তু সোরের বিরুদ্ধে সে যে পরিশ্রম করিয়াছে, তাহার বেতন সে কিম্বা তাহার সৈন্য সোর হইতে পায় নাই। এই জন্য প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি বাবিল-রাজ নেবুখদ্‌রিৎসরকে মিসর দেশ দিব; সে তাহার লোকারণ্য লইয়া যাইবে, তাহার দ্রব্য লুট করিবে ও তাহার সম্পত্তি অপহরণ করিবে; তাহাই তাহার সৈন্যের বেতন হইবে। সে যে পরিশ্রম করিয়াছে, তাহার বেতন বলিয়া আমি মিসর দেশ তাহাকে দিলাম, কেননা তাহারা আমার জন্যই কার্য করিয়াছে।"[১]

এখানে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, নেবুকাদনেযার ও তার সেনাবাহিনী সোর অবরোধ করে কঠিন পরিশ্রম করেছে, কিন্তু কোনরূপ কোন বিনিময় লাভ করতে পারেনি। এজন্য সদাপ্রভু ঈশ্বর তাদেরকে মিসর দেশ প্রদানের ওয়াদা করলেন। এই ওয়াদার অবস্থাও কি পূর্ববর্তী সোর-বিজয়ের ওয়াদার মত হয়েছিল, না এই ওয়াদা পূরণ হয়েছিল তা আমরা জানতে পারিনি!

কি দুর্ভাগ্যের কথা! এই কি হবে সদাপ্রভু ঈশ্বরের ওয়াদার অবস্থা?

ভুল-৩০

দানিয়েলের পুস্তকের ৮ম অধ্যায়ে দানিয়েল-এর স্বপ্নের বিবরণে বলা হয়েছে: "১৩ পরে আমি এক পবিত্র ব্যক্তিকে কথা কহিতে শুনিলাম। এবং যিনি কথা কহিতেছিলেন, তাঁহাকে আর এক পবিত্র ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই নিত্য নৈবেদ্যের অপহরণ, ও সেই ধ্বংসজনক অধর্ম, দলিত হইবার জন্য ধর্মধামের ও বাহিনীর সমর্পণ সম্বন্ধীয় দর্শন কত লোকের জন্য? ১৪ তিনি তাঁহাকে কহিলেন, দুই সহস্র তিন শত সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের নিমিত্ত (Unto two thousand and three hundred days), পরে ধর্মধামের পক্ষে বিচার নিস্পত্তি হইবে।"

ইহুদী ও খৃস্টান পণ্ডিতগণ সকলেই এই খবরের মর্ম নির্ধারণ অনিশ্চয়তায় ভুগেছেন এবং নানামুখি বিক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেছেন। ইহুদী ও খৃস্টান উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ বাইবেল ব্যাখ্যাকার বলেন যে, এই ভবিষ্যৎবাণী দ্বারা রোম সম্রাট এন্টিয়কাসের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যিনি খৃস্টপূর্ব ১৬১ সালে ফিলিস্তীন

১. যিহিস্কেল ২৯/১৭-২০।

অধিকার করেন।[১] আর এখানে (Day) বা 'দিবস' অথবা 'সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল' বলতে সাধারণ দিনরাত্রি ২৪ ঘন্টার দিবসকেই বুঝানো হয়েছে। যোসেফাসও (Flavius Josephus) এই মত গ্রহণ করেছেন। তবে এই মতের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী আপত্তি রয়েছে। তা হলো, এন্টিয়কাসের ঘটনায় সাড়ে তিন বছর যাবৎ যিরুশালেমকে পদদলিত করা হয়েছিল। কিন্তু দানিয়েলের বর্ণনা অনুসারে ২৩০০ দিবসে সৌর বছর হিসাবে আনুমানিক ৬ বছর ৩ মাস ১৯ দিন হয়। যেহেতু এন্টিয়কাসে ঘটনা এই দীর্ঘ সময় স্থায়ী ছিল না, সেহেতু আইজাক নিউটন বলেছেন যে, এই খবরে এন্টিয়কাসের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়নি।

বাইবেলের মধ্যে উল্লিখিত ভবিষ্যৎবাণীগুলির ব্যাখ্যা করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন টমাস নিউটন। তাঁর গ্রন্থটি ১৮০৩ সালে লন্ডনে মুদ্রিত হয়েছে। এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের ১ম খণ্ডে তিনি অধিকাংশ বাইবেল ব্যাখ্যাকারের উপর্যুক্ত মতটি উল্লেখ করেছেন। এরপর আইজাক নিউটনের মত তিনিও তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর তিনি বলেন: চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, এই খবরের উদ্দেশ্য এন্টিয়কাসের ঘটনা নয়। এরপর তিনি আন্দাজ করেন যে, এই ভবিষ্যতবাণীর উদ্দেশ্য হলো রোমের সম্রাটগণ এবং পোপগণ।

স্নেল গ্যাম্পিও বাইবেলের মধ্যে উল্লিখিত ভবিষ্যৎবাণীগুলির ব্যাখ্যা করে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে, ৮৫টি ব্যাখ্যাগ্রন্থের সার সংক্ষেপ তিনি উক্ত গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। তিনি এই খবরের ব্যাখ্যায় লিখেছেন:

এই খবরের সময়কাল কখন থেকে শুরু হবে তা নির্ধারণ করতে প্রাচীন কাল থেকেই পণ্ডিতগণ অত্যন্ত সমস্যা বোধ করছেন। এ বিষয়ে অধিকাংশের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো এই, '২৩০০' দিবসের শুরু ধরতে হবে নিম্নোক্ত চারিটি সময়ের যে কোন একটি সময়কে, যখন ইরানের শাসকগণের পক্ষ থেকে ইহূদীদের বিষয়ে ফরমান জারি করা হয়:

প্রথম; খৃ. পূ. ৫৩৬ অব্দ। এ বছর সাইরাস (Cyrus/ কোরস) ফরমান জারি করেন।

দ্বিতীয়: খৃ. পূ. ৫১৮ অব্দ। এ বছর দারা (Dari'us/ দারিয়াবস) ফরমান জারি করেন।

তৃতীয়: খৃ. পূ. ৪৫৭ অব্দ। এ বছর, পারস্য সম্রাট আর্দসের (Artaxerxes/ অর্তক্ষস্ত) তার সিংহাসনারোহণের ৭ম বছরে ইয্রার জন্য ফরমান জারি করেন।

চতুর্থ: খৃ. পূ. ৪৪৪। এ বছর আর্দসের তার সিংহাসনারোহণের ২০তম বছরে নহিমিয়ের জন্য ফরমান জারি করেন।

তিনি লিখেছেন যে, এখানে 'দিবস' বলতে 'বছর' বুঝানো হয়েছে। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে দানিয়েলের বক্তব্যের সময়কাল শেষ হবে :

---

১. খৃ. পৃ. ১৬১ অব্দে বা তার কাছাকাছি সময়ে সিরিয়ার গ্রীক শাসক চতুর্থ এন্টিয়ক (Antiochus Epiphanes) জেরুযালেম অধিকার করে চল্লিশ হাজার ইহূদীর প্রাণনাশ করেন। তিনি ইহূদী রাজ্য ধ্বংস করেন এবং সলোমনের মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে গ্রীক প্রতিমা-মন্দির স্থাপন করেন।

প্রথম হিসাব অনুসারে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে। দ্বিতীয় হিসাব অনুসারে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে। তৃতীয় হিসাব অনুসারে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে। চতুর্থ হিসাব অনুসারে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে।

প্রথম ও দ্বিতীয় সময়কাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ সময়কাল সামনে রয়েছে। তৃতীয় মতটিই সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। আর আমি নিশ্চিতরূপে মনে করি যে, এই তৃতীয় ব্যাখ্যাটিই সঠিক (অর্থাৎ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ধর্মধাম বা মন্দিরের দলিত হওয়া শেষ হবে)।

কেউ কেউ মনে করেন যে, আলেকজান্ডারের এশিয়া দখল থেকে এই সময়কালের শুরু হবে। এই হিসাবে ১৯৬৬ সালে এই সময়কাল শেষ হবে।

এই ব্যাখ্যাকারের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা বিভিন্ন দিক থেকে প্রত্যাখ্যাত:

প্রথম বিষয়: তিনি বলেছেন যে, এই বক্তব্যে উল্লিখিত সময়কালের শুরু নির্ধারণ করা খুবই সমস্যাসঙ্কুল। তাঁর এই কথাটি মোটেও ঠিক নয়। এখানে একটিই মাত্র সমস্যা আছে, তা হলো, এই বক্তব্যটি নিঃসন্দেহে ভুল। এ ছাড়া আর কোন সমস্যা এখানে নেই। কারণ দানিয়েলের বক্তব্যে উল্লিখিত সময়কালের শুরু অবশ্যই দানিয়েলের স্বপ্ন দর্শনের সময় থেকেই হবে; এর পরবর্তী কোন সময় থেকে তা শুরু হতে পারে না।

দ্বিতীয় বিষয় : তিনি বলেছেন: 'এখানে দিবস বলতে বছর বুঝানো হয়েছে।' তাঁর এই কথাটি ভিত্তিহীন আজগুবি কথা। কারণ দিবসের প্রকৃত অর্থ সবাই জানেন। বাইবেলের নতুন ও পুরাতন উভয় নিয়মের যে সকল স্থানে 'দিবস' শব্দটি সময়কাল গণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, সে সকল স্থানে তা প্রচলিত ও প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সময়কাল গণনার জন্য কোথাও 'দিবস' শব্দকে 'বছর' অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। তার পরেও যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া হয় যে, বাইবেলে কোন স্থানে সময় গণনার ক্ষেত্রে 'দিবস' শব্দকে 'বছর' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তাহলে তা অবশ্যই রূপক অর্থে। আর পারিপার্শ্বিক প্রমাণ ও নির্দেশনা ছাড়া কোন শব্দকে তার প্রকৃত অর্থ থেকে সরিয়ে রূপক অর্থে ব্যবহার করা যায় না।

এখানে 'দিবস' শব্দটি সময়কাল গণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বাক্যের মধ্যে এমন কোন নির্দেশনা নেই যে, দিবস বলতে বছর বুঝতে হবে। এমতাবস্থায় কিভাবে 'দিবস' শব্দটিকে রূপক অর্থে ব্যবহার করা যাবে?

এজন্যই অধিকাংশ বাইবেল ব্যাখ্যাতা এখানে 'দিবস' শব্দটিকে তার প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত বলে গণ্য করেছেন এবং সেভাবেই তাঁরা এর ব্যাখ্যা করেছেন, যে ব্যাখ্যাকে আইজাক নিউটন, টমাস নিউটন ও বর্তমান যুগের অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই ব্যাখ্যাকারও তাঁদের দলের।

তৃতীয় বিষয় : উপরের দুইটি বিষয় বাদ দিলেও আমরা দেখছি যে, উপর্যুক্ত ব্যাখ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় মতটি যে সঠিক নয় তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি

যে মতটিকে সবচেয়ে শক্তিশালী ও একমাত্র গ্রহণযোগ্য বলে নিশ্চিত হয়েছেন সেই তৃতীয় মতটির অশুদ্ধতাও প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। অনুরূপভাবে চতুর্থ মতটির অশুদ্ধতাও প্রকাশিত হয়েছে। এভাবে দেখা গেল যে, প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যার চেয়ে আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যা বেশি ভুল।

বাকি থাকলো ৫ম মতটি। এই মতটি অধিকাংশ বাইবেল ব্যাখ্যাকারের মতেই দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য এবং প্রথম ও দ্বিতীয় আপত্তি এই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কাজেই এই মতটিও গ্রহণযোগ্য নয়। এই যুগে যারা থাকবেন তারা ইনশাআল্লাহ দেখতে পাবেন যে, তাও অশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে।[১]

১৮৩৩ খৃস্টাব্দে মোতাবেক ১২৪৮ হিজরীতে যোশেফ ওয়েলফ নামক এক পাদ্রী লাখনৌ শহরে আগমন করেন। তিনি দানিয়েলের এই বক্তব্য ও তাঁর নিজের মিথ্যা ইলহাম বা ঐশ্বরিক প্রেরণার উপর নির্ভর করে বলেন, এখানে 'দিবস' বলতে 'বছর' বুঝানো হয়েছে এবং এই গণনার শুরু হবে দানিয়েলের মৃত্যু থেকে। দানিয়েল খৃ. পূ. ৪৫৩ অব্দে মৃত্যু বরণ করেন। ২৩০০ বছর থেকে এই সময় বাদ দিলে থাকে ১৮৪৭ বছর। এ কথার উপর ভিত্তি করে তিনি দাবি করেন যে, ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে যীশু খৃস্টের (ঈসা মাসীহের) অবতরণ ঘটবে। এই পাদরী মহাশয় এবং কোন কোন মুসলিম পণ্ডিতের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই পাদরীর বক্তব্য বিভিন্ন দিক থেকে প্রত্যাখ্যাত। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো, আজ থেকে[২] ১৭ বছর আগেই এই পাদরীর কথার অশুদ্ধতা ও ভিত্তিহীনতা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে (১৮৪৭ সাল অতিবাহিত

---

১. উপরের সবগুলি ব্যাখ্যাই ভিত্তিহীন গালগল্প মাত্র। ২৩০০ দিবসের এই সময়কালের শুরু অবশ্যই দানিয়েলের দর্শনের সময় থেকে হবে। দিন হোক আর বছর হোক সর্বাবস্থায় গণনার শুরু হতে হবে দর্শনের সময় থেকে অথবা অন্তত পক্ষে যিরূশালেমের দলিত হওয়ার সময় থেকে। দানিয়েল এই স্বপ্নটি দেখেন ব্যবিলন রাজ নেবুকাদনেযারের পুত্র রাজা নেবু নিডাস (Belshazzar: বেলশৎসর)-এর রাজত্বের তৃতীয় বছরে (দানিয়েল ৮/১)। খৃ. পূ. ৫৫৬ অব্দে নেবু নিডাস বা বেল্‌শৎসর রাজ্যলাভ করেন (ঐতিহাসিক অভিধান, ১২)। তাহলে খৃ. পূ. ৫৫৩ সালে দানিয়েল স্বপ্নটি দেখেন। এর অর্ধ শতাব্দী পূর্ব থেকেই ধর্মধামের পদদলিত হওয়া শুরু হয়েছে। বিশেষত নেবুকাদনেযার খৃ. পূ. ৫৯৯/৫৯৮ সালে যিরূশালেম নগরীর সাথে ধর্মধাম বা শলোমনের মন্দির বিনষ্ট ও পদদলিত করেন। যদি এখানে দিবস বলতে বছর বুঝানো হয় তবে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে এই সময় পূর্ণ হবে। সময়ের গণনা পূর্ব বা পর থেকে শুরু করার কোন ভিত্তি নেই। উপরের যে ফরমানগুলির কথা বলা হয়েছে বা আলেকজান্ডারের আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে, সে সকল সময় থেকে গণনা শুরুর কোনরূপ ভিত্তিই এই বক্তব্যের মধ্যে নেই। বিশেষত এ সকল ফরমান থেকে বা আলেকজান্ডারের এশিয়া দখল থেকে যিরূশালেম বা ধর্মধামের দলিত হওয়া শুরু হয়নি। এগুলির সাথে যিরূশালেমের দলিত হওয়ার প্রারম্ভের কোন রূপ সম্পর্ক নেই।

২. ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে (১২৮০ হিজরীতে) ইযহারুল হক গ্রন্থ প্রণয়নের সময়ে গ্রন্থকার একথা লিখেন।

হয়েছে এবং যীশুর আবির্ভাব ঘটেনি)। কাজেই তাঁর বক্তব্য খণ্ডনের জন্য দীর্ঘ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সম্ভবত কোন মদের আসরে মাতাল হয়ে উক্ত ...দরী মহাশয় কিছু কল্পনা করেছিলেন এবং সেই মাতালের কল্পনাকে তিনি ইলহাম বা ঐশ্বরিক প্রেরণা বলে মনে করেছিলেন।

ডাওয়ালী ও রজার্ডমেন্টের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে: "এই সংবাদের সময়কাল পূর্ণ হওয়ার আগে এর শুরু ও শেষ নির্ধারণ করা অসুবিধাজনক। যখন এই ভবিষ্যৎবাণীর সময় পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন বাস্তবতাই তাকে প্রকাশ করে দেবে।"

এটি এমন একটি দুর্বল ব্যাখ্যা যা শুনলে হয়ত সন্তানহারা মাতাও হেসে উঠবেন। এভাবে যদি ভবিষ্যৎবাণী করা হয় তাহলে যে কোন পাপিষ্ঠ শুরু ও শেষ নির্ধারণ না করে এই রূপ অনেক ভবিষ্যৎ-বাণী করতে পারবে এবং বলবে, যখন এই সময় পূর্ণ হবে তখন বাস্তবতাই একে প্রকাশ করে দেবে। হক কথা হলো, এই বক্তব্যটি মূলতই বিকৃত; কাজেই এ সকল পণ্ডিতের এসব আজগুবি ব্যাখ্যা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কি সুন্দর কথাই না বলেছেন কবি : "বয়স যা নষ্ট করেছে পার্লারে তা ঠিক করা যায় না।"

ভুল-৩১

দানিয়েল-এর ১২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "১১ আর যে সময়ে নিত্য নৈবেদ্য নিবৃত্ত ও ধ্বংসকারী ঘৃণার্হ বস্তু স্থাপিত হইবে, তদবধি এক সহস্র দুই শত নব্বই দিন হইবে। ১২ ধন্য সেই, যে ধৈর্য ধরিয়া সেই এক সহস্র তিন শত পঁয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত থাকিবে।"

উপরের বক্তব্যটির মত এটিও ভুল। এই সময়সীমার শেষে খৃষ্টানদের খৃস্টেরও (The messiah/ মাসীহ) আগমন ঘটেনি এবং ইহূদীদের খৃস্টেরও (The messiah/ মাসীহ) আগমন ঘটেনি।

ভুল-৩২

দানিয়েল-এর ৯ম অধ্যায়ে রয়েছে : "তোমার জাতির ও তোমার পবিত্র নগরের সম্বন্ধে সত্তর সপ্তাহ নিরূপিত হইয়াছে-অধর্ম সমাপ্ত করিবার জন্য, পাপ শেষ করিবার জন্য, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য, অনন্তকাল স্থায়ী ধার্মিকতা আনয়ন করিবার জন্য, দর্শন ও ভাববাদী মুদ্রাঙ্কিত (খতম) করিবার জন্য (seal up vision and prophecy), এবং মহাপবিত্রকে অভিষেক করিবার জন্য (and to anont the Most Holy)।"[১]

এই ভবিষ্যৎ-বাণীটিও ভুল। (খৃস্টপূর্ব ৫৩৬ সালে সাইরাস কর্তৃক) ইহূদীদের ব্যবিলন থেকে মুক্তিপ্রাপ্তির বা যিরূশালেমের পুনঃস্থাপনের নির্দেশ প্রাপ্তির ৭০ সপ্তাহ

১. দানিয়েল ৯/২৪। পরবর্তী আয়াতটি নিম্নরূপ: অতএব তুমি জ্ঞাত হও, বুঝিয়া লও যিরূশালেমকে পুনঃস্থাপন ও নির্মাণ করিবার আজ্ঞা বাহির হওয়া অবধি, অভিষিক্ত ব্যক্তি (The Messiah) নায়ক, পর্যন্ত সাত সপ্তাহ আর বাষট্টি সপ্তাহ হইবে। এ থেকে স্পষ্ট যে, যিরূশালেমের পুন:স্থাপনের নির্দেশের সময় থেকে এই সময় গণনা শুরু এবং মসিহের আগমনে তা পূর্ণ হবে।

শেষে দুই খৃষ্টের এক খৃষ্টও আবির্ভূত হননি। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, এখন পর্যন্ত ইহুদীদের খৃষ্ট বা মসীহের আগমন ঘটেনি। এ বিষয়ে খৃষ্টান ধর্মগুরু পণ্ডিতগণ যে সকল অবাস্তব ও ভিত্তিহীন ঘোরপ্যাচের মাধ্যমে এই ভবিষ্যৎ-বাণীকে যীশু খৃষ্টের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চান সেগুলি দৃকপাতেরও অযোগ্য। কারণ:

প্রথমত, দিবস বলতে তারা বছর বুঝান (৭০ সপ্তাহ অর্থ ৪৯০ বছর)। আর সময় গণনার ক্ষেত্রে কোন রূপ প্রাসঙ্গিক নির্দেশ ছাড়া দিবস বলতে বছর বুঝানোর দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, যদি আমরা মেনেও নিই যে, এখানে দিবস বলতে বছর বুঝানো হয়েছে, তবুও তা দুই খৃষ্টের কোন খৃষ্টের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে না। কারণ যোসেফাসের (Flavius Josephus) বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সাইরাসের (কোরস) সিংহাসনারোহণের প্রথম বছর, যে বছর তিনি ইহুদীদেরকে ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্তি দান করেন, সেই বছর থেকে যীশু খৃষ্টের আবির্ভাব পর্যন্ত সময়কাল ছিল আনুমানিক ৬০০ বছর। আর স্নেল গ্যান্সির গবেষণা অনুসারে এই সময়কালের পরিমাণ ছিল ৫৩৬ বছর। ৩০ নং ভুলের আলোচনায় পাঠক তা দেখতে পেয়েছেন। অনুরূপভাবে ২৬ নং ভুলের আলোচনায় পাঠক আরো দেখেছেন যে, 'মুরশিদুত তালিবীন' গ্রন্থের প্রণেতাও ১৮৫২ সালে প্রকাশিত সংস্করণে গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, খৃষ্টপূর্ব ৫৩৬ সালে সাইরাস ইহুদীদের মুক্ত করেন। মুরশিদুত তালিবীন গ্রন্থের প্রণেতা দ্বিতীয় খণ্ডের ২০ পরিচ্ছেদে স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, যে বছরে ইহুদীগণ মুক্তি লাভ করেন, সেই বছরেই তারা যিরূশালেমে ফিরে আসেন এবং ধর্মধামে বা শলোমনের মন্দিরে নতুনভাবে পশু উৎসর্গ ও নৈবেদ্য প্রদান শুরু করেন। অর্থাৎ খৃ. পূ. ৫৩৬ সালেই এ সব ঘটেছিল।

এভাবে জানা গেল যে, যিরূশালেমের পুনঃস্থাপনের অনুমতি থেকে যীশু খৃষ্টের আগমন পর্যন্ত সময় ছিল ৬০০ বছর বা ৫৩৬ বছর। আর দিবসকে বছর ধরলে ৭০ সপ্তাহে ৪৯০ বছরের বেশি হয় না। কাজেই এই ভবিষ্যৎ -বাণী যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আর ইহুদীদের খৃষ্টের ক্ষেত্রে যে তা প্রযোজ্য নয় তা স্পষ্ট (কারণ তাঁর আবির্ভাব এখনো ঘটে নি।)

তৃতীয়ত, যদি উপরের ভবিষ্যৎ-বাণী যীশু খৃষ্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতো তাহলে যীশুর মাধ্যমেই নবুওয়ত, ভাববাণী বা প্রেরিতত্ত্বের পরিসমাপ্তি ঘটত এবং যীশুর শিষ্যগণকে 'প্রেরিত' বা ভাববাদী হিসেবে গণ্য করা যেত না। খৃষ্টানদের বিশ্বাস তা নয়। তারা বিশ্বাস করেন যে, 'প্রেরিতগণ' মোশি ও অন্য সকল ইস্রায়েলী ভাববাদীর চেয়ে উত্তম ও অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন। আর 'প্রেরিতগণের' মর্যাদা অনুধাবন করার জন্য

ঈস্করিয়োতীয় যিহূদার অবস্থা অনুধাবন করাই যথেষ্ট; কারণ তিনিও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ এ সকল মহান ব্যক্তিগণের একজন ছিলেন।

চতুর্থ, উপরের ভবিষ্যৎ-বাণী যীশুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে তাঁর মাধ্যমে 'দর্শন' (vision)-এরও পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। অথচ 'দর্শন' তো এখন পর্যন্ত অবশিষ্ট রয়েছে।

পঞ্চমত, ওয়াটসন তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ড. ক্রীপের পত্র উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত পত্রে তিনি লিখেছেন: "ইহূদীগণ এই সংবাদের মধ্যে বিরতি বৃদ্ধি করে এমনভাবে বিকৃত করেছে যে, এখন আর তা যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, খৃস্টানদের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বক্তব্য অনুসারেই এই সংবাদটি যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিকৃতির দাবি ব্যতিরেকেই ইহূদীদের নিকট সংরক্ষিত দানিয়েল ভাববাদীর পুস্তকের মূল পাণ্ডুলিপিরই এই অবস্থা। প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতদের বিকৃতির এই দাবি ইহূদীদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এ হলো মূল গ্রন্থের অবস্থা। তাহলে খৃস্টানদের প্রণীত অনুবাদগুলির উপর নির্ভর করা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

ষষ্ঠত: এখানে লক্ষ্যণীয় যে, এখানে উল্লিখিত 'অভিষিক্ত খৃস্ট বা 'মাসীহ' (The Messiah, The Anointed, The Christ) ইহূদী বা খৃস্টানগণের দুই মাসীহের এক মাসীহ হওয়া জরুরী নয়। কারণ মাসীহ বা খৃস্ট শব্দটি ইহূদীদের প্রত্যেক শাসকের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়, সে শাসক সৎ হোক আর পাপাচারীই হোক।[১] গীতসংহিতার ১৭ নং গীতের[২] ৫০ আয়াত নিম্নরূপ: "তিনি আপন রাজাকে মহাপরিত্রাণ দেন, আপন অভিষিক্তের প্রতি, দায়ূদের প্রতি দয়া করেন, ও তাঁর বংশের প্রতি যুগে যুগে।"[৩]

অনুরূপভাবে গীতসংহিতার ১৩১ গীতের[৪] ১০ আয়াতেও দায়ূদকে মসীহ অর্থাৎ অভিষিক্ত বা খৃস্ট বলা হয়েছে। তিনি ইস্রায়েল বংশের একজন নবী ও সৎ শাসক ছিলেন।

বাইবেলের বিবরণ অনুসারে শৌল ছিলেন ইহূদীদের একজন পাপাচারী রাজা। ১ শমূয়েল ২৪ অধ্যায়ে এই পাপী রাজার বিষয়ে দায়ূদ (আ) বলেন: "আমার প্রভুর প্রতি সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তির (আরবীতে: মাসীহুর রাব্ব, ইংরেজিতে: the anotinted of

---

১. আরবী বাইবেলে এখানে উল্লিখিত আয়াতগুলিতে সর্বত্র 'মাসীহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইংরেজীতে The Messiah বা The Christ ব্যবহার না করে Anointed ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ শব্দগুলির অর্থ একই। সমস্যা হলো, খৃস্টান অনুবাদকগণ কখনো ব্যক্তির নামের (proper noun) অনুবাদ করেন, আবার কখনো উপাধিকে নাম হিসাবে ব্যবহার করেন।

২. অন্যান্য সংস্করণে ১৮ নং গীত।

৩. বাংলা বাইবেলে আয়াতটির অনুবাদে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। ইংরেজি পাঠ নিম্নরূপ: ..and showeth merch to his anointed, to Devid.. এখানে স্পষ্ট যে, দায়ূদকে ঈশ্বরের অভিষিক্ত বা ঈশ্বরের মাসীহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলা অনুবাদে বিষয়টিকে অস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

৪. অন্যান্য সংস্করণে ১৩২ নং গীত।

the Lord) প্রতি এমন কর্ম করিতে, তাহার বিরুদ্ধে আমার হস্ত বিস্তার করিতে সদাপ্রভু আমাকে না দিউন; কেননা তিনি সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তি (ঈশ্বরের মসীহ্ বা the anointed of the Lord) । ... আমার প্রভুর বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিব না, কেননা তিনি সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তি (ঈশ্বরের মসীহ বা the anointed of the Lord)" ।[১]

অনুরূপভাবে ১ শমূয়েলের ২৬ অধ্যায়ে ও ২ শমূয়েলের ১ম অধ্যায়ে শৌলকে বারংবার সদাপ্রভুর অভিষিক্ত, অর্থাৎ মসীহ বা খৃষ্ট (anointed) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[২]

শুধু তাই নয়, 'মসীহ' শব্দটিকে ইহূদীদের শাসক ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে। যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৪৫ অধ্যায়ের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে: "সদাপ্রভু আপন অভিষিক্ত ব্যক্তি, কোরসের (সাইরাসের), বিষয়ে এই কথা কহেন, আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়াছি... ।"

এখানে পারস্য-রাজ সাইরাসকে মসীহ বলা হয়েছে, যিনি ইহূদীগণকে ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেন এবং তাদেরকে ধর্মধাম বা শলোমনের মন্দির পুনর্নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন।

ভুল-৩৩

২ শমূয়েল-এর ৭ম অধ্যায়ে ভাববাদী নাথনের যবানীতে ঈশ্বর ইস্রায়েল সন্তানগণকে নিম্নরূপ ওয়াদা করেন: "১০ আর আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের জন্য একটি স্থান নিরূপণ করিব ও তাহাদিগকে রোপন করিব; যেন আপনাদের সেই স্থানে তাহারা বাস করে এবং আর বিচলিত না হয়। দুষ্ট লোকেরা তাহাদিগকে আর দুঃখ দিবে না, যেমন পূর্বে দিত, ১১ এবং যে অবধি আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের উপরে বিচারকর্তৃগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সেই অবধি যেমন দিত।"

তাহলে ঈশ্বর ওয়াদা করলেন যে, ইস্রায়েল সন্তানগণ এই স্থানে শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে নিরিবিলি অবস্থান করবে। খারাপ মানুষদের দ্বারা তাদের কোনরূপ কষ্ট পেতে হবে না। এই স্থানটি যিরূশালেম। ইস্রায়েল সন্তানগণ সেখানে বসবাস করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের এই ওয়াদা তাদের জন্য পূর্ণ হয়নি।[৩] তারা এই স্থানেও কঠিন কষ্ট পেয়েছে। ব্যাবিলনের শাসক তাদেরকে তিনবার কঠিনভাবে কষ্ট প্রদান করেন। তিনি ইস্রায়েলীয়গণকে হত্যা করেন, বন্দি করেন এবং তাদেরকে নিজ দেশ থেকে অপসারণ করেন।

১. ১ শমূয়েল ২৪/৬ ও ১০।

২. ১ শমূয়েল ২৬/৯, ১১, ১৬, ২৩ ও ২ শমূয়েল ১/১৪, ১৬।

৩. আল্লাহ কখনোই তার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। এ সকল স্থানে লেখকের উদ্দেশ্য হলো, প্রচলিত বাইবেলের বিকৃতি ও ভুল প্রমাণ করা। অর্থাৎ আল্লাহ এভাবে কোন ওয়াদা করেননি। ইহূদীগণ এগুলিকে সংযোজন করেছে বা মূল ওয়াদাকে বিকৃত করেছে।

অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশের (আসুরীয়, মিসরীয়, রোমান)ও শাসকগণ তাদেরকে কষ্ট প্রদান করেন। রোমান সম্রাট টিটাস (Titus)[১] তাদের উপর সীমাহীন অত্যাচার করেন। তার আক্রমণের ঘটনায় হত্যা, ক্রুসবিদ্ধ করে হত্যা ও ক্ষুধার তাড়নায় ১১ লক্ষ ইহূদী প্রাণত্যাগ করে। টিটাস ৯৭ হাজার ইহূদীকে বন্দি করে নিয়ে যান। তাদের সন্তানগণ এখনো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপমানকর জীবন যাপন করছে।[২]

ভুল-৩৪

এই অধ্যায়েই (২ শমূয়েল ৭ম অধ্যায়ে) ভাববাদী নাথনের যবানীতে ঈশ্বর দায়ূদকে নিম্নরূপ ওয়াদা করেন: "১২ তোমার দিন সম্পূর্ণ হইলে যখন তুমি আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইবে, তখন আমি তোমার পরে তোমার বংশকে, যে তোমার ঔরসে জন্মিবে তাহাকে স্থাপন করিব, এবং আমি তাহার রাজসিংহাসন চিরস্থায়ী করিব। ১৪ আমি তাহার পিতা হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে; সে অপরাধ করিলে আমি মনুষ্যগণের দণ্ড ও মনুষ্য-সন্তানদের প্রহার দ্বারা তাহাকে শাস্তি দিব। ১৫ কিন্তু আমি তোমার সম্মুখ হইতে যাহাকে দূর করিলাম, সেই শৌল হইতে আমি যেমন আপন দয়া অপসারণ করিলাম, তেমনি আমার দয়া তাহা হইতে দূরে যাইবে না। ১৬ আর তোমার কুল ও তোমার রাজত্ব তোমার সম্মুখে চিরকাল স্থির থাকিবে; তোমার সিংহাসন চিরস্থায়ী হইবে।"

১ বংশাবলির ২২ অধ্যায়ে এই ওয়াদাটির ভাষা নিম্নরূপ: "৯ দেখ, তোমার এক পুত্র জন্মিবে, সে বিশ্রামের মনুষ্য হইবে; আমি তাহার চারিদিকের সকল শত্রু হইতে তাহাকে বিশ্রাম দিব, কেননা তাহার নাম শলোমন (শান্ত) হইবে, এবং তাহার সময়ে আমি ইস্রায়েলকে শান্তি ও নির্বিঘ্নতা দিব। ১০ সেই আমার নামের জন্য গৃহ নির্মাণ করিবে; আর সে আমার পুত্র হইবে, এবং আমি তাহার পিতা হইব; এবং ইস্রায়েলের উপরে তাহার রাজসিংহাসন চিরকালের জন্য স্থির করিব।"

এখানে ঈশ্বরের ওয়াদা হলো যে, দায়ূদের বংশের রাজত্ব চিরস্থায়ী এবং তা কখনোই অপসারিত হবে না। এই ওয়াদাও পূর্ণ হয়নি। অনেক যুগ আগেই দায়ূদ বংশের রাজত্ব অপসারিত হয়েছে।

---

১. ইহূদীদের বিদ্রোহ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে রোমান সম্রাট বাসপাসিয়ান তার পুত্র (পরবর্তী সম্রাট) টিটাসকে যিরূশালেমের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ৭০ খৃস্টাব্দে টিটাস যিরূশালেম ধ্বংস করেন।

২. যে পাপ, অত্যাচার ও অনাচারের কারণে আল্লাহ তাদেরকে এভাবে বারংবার লাঞ্ছিত করেন, আবারো সেই অত্যাচার, হত্যা ও যুদ্ধের মাধ্যমে তারা পুনরায় যিরূশালেমকে দখল করেছে। কিন্তু শান্তি ও স্থিতি তারা পায়নি। এবারের পরিণতিও আগের মতই হবে, ইনশা আল্লাহ।

ভুল-৩৫

ত্রিত্ববাদীদের পবিত্রপুরুষ পৌল উল্লেখ করেছেন যে, যীশু খৃস্টের মর্যাদা ছিল ফিরিশতা বা স্বর্গদূতগণের চেয়েও বেশি; কারণ ঈশ্বর যীশুর ক্ষেত্রে যা বলেছেন স্বর্গদূতদের ক্ষেত্রে তা বলেন নি। এই মর্যাদা প্রমাণ করার জন্য তিনি ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ১ম অধ্যায়ের ৫ আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, ঈশ্বর যীশুর ক্ষেত্রে বলেছেন: "আমি তাঁহার পিতা হইব, ও তিনি আমার পুত্র হইবেন।" খৃস্টান ধর্মগুরু পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলেছেন যে, এখানে পৌল ২ শমূয়েল-এর ৭ম অধ্যায়ের উপরোল্লিখিত আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যে আয়াতটি উপরের ৩৪ নং ভুলের আলোচনায় উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই আয়াতটি যীশুর জন্য বলা হয়েছে বলে তাদের দাবি বা ধারণা ভুল ও ভিত্তিহীন, নিম্নের বিষয়গুলি তা প্রমাণ করে:

প্রথমত, ১ বংশাবলিতে স্পষ্টত বলা হয়েছে যে, দায়ূদের এই পুত্র (ঈশ্বর যার পিতা হবেন এবং যিনি ঈশ্বরে পুত্র হবেন) তাঁর নাম "শলোমন"।

দ্বিতীয়ত, উভয় পুস্তকে (২ শমূয়েল ও ১ বংশাবলি) স্পষ্ট বলা হয়েছে: "আমার নামের নিমিত্ত সে এক গৃহ নির্মাণ করিবে", "সেই আমার নামের জন্য গৃহ নির্মাণ করিবে"। কাজেই দায়ূদের এই পুত্র (ঈশ্বর যার পিতা হবেন এবং যিনি ঈশ্বরে পুত্র হবেন) তাঁকে অবশ্যই ঈশ্বরের মন্দির বা ধর্মধামের নির্মাতা হতে হবে। আর এই মন্দিরের নির্মাতা শলোমন ভিন্ন আর কেউ নন। ধর্মধামের নির্মাণের ১০০৩[১] বছর পরে যীশুর জন্ম। তিনি তো এই ধর্মধামের ধ্বংস ও বিনাশের সংবাদ প্রদান করতেন। মথিলিখিত সুসমাচারের ২৪ অধ্যায়ে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। ৭৯ নং ভুলের আলোচনায় পাঠক তা জানতে পারবেন।

তৃতীয়ত, উভয় পুস্তকেই স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ব্যক্তি (ঈশ্বর যার পিতা হবেন এবং যিনি ঈশ্বরের পুত্র হবেন) সম্রাট বা রাজা হবেন। যীশু কখনোই রাজা ছিলেন না। তিনি দরিদ্র ছিলেন। এমনকি তিনি নিজের বিষয়ে বলেছেন: "শৃগালদের গর্ত আছে, এবং আকাশের পক্ষিগণের বাসা আছে; কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই।" মথিলিখিত সুসমাচারের ৮ম অধ্যায়ের ২০ আয়াতে তাঁর এই কথাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

চতুর্থত, শমূয়েলের পুস্তকে বলা হয়েছে, দায়ূদের এই পুত্র (ঈশ্বর যার পিতা হবেন এবং যিনি ঈশ্বরের পুত্র হবেন) 'সে অপরাধ করিলে আমি .. তাহাকে শাস্তি দিব'। এ থেকে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত যে, ঈশ্বরের এই পুত্রটি নিষ্পাপ হবেন না বা পাপ থেকে সংরক্ষিত থাকবেন না; বরং তাঁর দ্বারা জুলুম ও অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আশংকা

১. মাসজিদুল আকসা বা শলোমনের ধর্মধাম নির্মাণের তারিখ এবং দায়ূদ ও শলোমনের রাজত্বের তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বর্ণনার মধ্যে কিছু মতপার্থক্য দেখা যায়। সর্বাবস্থায় ধর্মধাম নির্মাণের প্রায় ৯৫০ বা ১০০০ বছর পরে যীশুর জন্ম।

থাকবে। শলোমনের ব্যাপারে ইহুদী-খৃষ্টানগণ এরূপই বিশ্বাস করেন। পবিত্র বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে শলোমন শেষ জীবনে ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যান, মূর্তিপূজা করেন, মূর্তিপূজার জন্য মন্দির নির্মাণ করেন। এভাবে তিনি নবুওয়তের মর্যাদাময় আসন থেকে বেরিয়ে শিরকের লাঞ্ছনার মধ্যে নিপতিত হন। আর শিরকের চেয়ে বড় জুলুম ও অপরাধ আর কি হতে পারে? পক্ষান্তরে খৃষ্টানদের বিশ্বাস অনুসারে যীশু পাপ ও অপরাধের উর্ধ্বে ছিলেন। তাঁর দ্বারা কোনরূপ পাপ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব ছিল।

পঞ্চমত, ১ বংশাবলিতে বলা হয়েছে: "সে বিশ্রামের মনুষ্য হইবে; আমি তাহার চারিদিকের সকল শত্রু হইতে তাহাকে বিশ্রাম দিব।" যীশুর ক্ষেত্রে এই কথাটি মোটেও খাটে না। শিশুকাল থেকে শুরু করে খৃষ্টানদের বিশ্বাস মত হত হওয়া পর্যন্ত কখনোই তিনি বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করতে পারেন নি। দিবারাত্র সর্বদা তিনি ইহুদীদের থেকে ভীত থেকেছেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি তাদের ভয়ে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। এভাবেই শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে বন্দি করে, লাঞ্ছিত করে, প্রহার করে এবং ক্রুশবিদ্ধ করে। পক্ষান্তরে শলোমনের ক্ষেত্রে উপরের কথাটি পুরোপুরি খাটে।

ষষ্ঠত, ১ বংশাবলিতে আরো বলা হয়েছে : "তাহার সময়ে আমি ইস্রায়েলকে শান্তি ও নির্বিঘ্নতা দিব"। যীশুর সময়ে ইস্রায়েল সন্তানগণ পরাধীন ও দুর্বল ছিল। তারা রোমান সম্রাটের অধীনে অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল।

সপ্তমত, শলোমন নিজেই দাবি করেছেন যে, সদাপ্রভুর এই ওয়াদা তাঁর জন্যই ছিল। ২ বংশাবলির ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে শলোমনের এই বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

খৃষ্টানগণ হয়ত বলতে পারেন যে, এই ওয়াদাটি বাহ্যিকভাবে শলোমনের জন্যই করা হয়েছিল, তবে শলোমনের বংশধর হিসাবে প্রকৃতপক্ষে যীশুই ছিলেন এই ওয়াদার উদ্দেশ্য। খৃষ্টানগণ এরূপ দাবি করলে আমি বলব যে, তাদের এই দাবি ঠিক নয়। কারণ, ওয়াদাটি প্রকৃতপক্ষে যার জন্য করা হয়েছে, তার মধ্যে ওয়াদায় উল্লেখকৃত গুণাবলি বিরাজমান থাকতে হবে। আমরা দেখেছি যে, যীশুর মধ্যে এ সকল গুণাবলি ছিল না।

এ সকল বিশেষণ বা গুণাবলির কথা বাদ দিলেও এই ওয়াদাটি অধিকাংশ আধুনিক খৃস্টান গবেষকের মতে যীশুর জন্য প্রযোজ্য হবে না। আমরা দেখেছি যে, যীশুর বংশতালিকা বর্ণনায় লূক ও মথির মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে (মথির বর্ণনায় যীশু দায়ূদের পুত্র শলোমনের বংশধর ছিলেন এবং লূকের বর্ণনায় যীশু দায়ূদের পুত্র নাথনের বংশধর ছিলেন)। এই বৈপরীত্যের সমাধানের জন্য অধিকাংশ আধুনিক খৃস্টান পণ্ডিত বলছেন যে, যীশুর যে বংশ তালিকা মথি উল্লেখ করেছেন তা হলো সূত্রধর যোষেফের বংশতালিকা। আর লূক যে বংশ তালিকা প্রদান করেছেন তা হলো মরিয়মের বংশ তালিকা। এ কথা তো স্পষ্ট যে, যীশু যোষেফের ঔরসজাত পুত্র ছিলেন না। যীশুকে

১. ২ বংশাবলি ৬/৮-১০।

যোষেফের পুত্র বলা বা তাঁর বংশধর বলা কাল্পনিক স্বপ্নাচার ছাড়া কিছুই নয়। মূলত যীশু ছিলেন মরিয়মের পুত্র । এভাবে আমরা দেখছি যে, যীশু শলোমনের বংশধর ছিলেন না, বরং তাঁর ভাই নাথনের বংশধর ছিলেন। কাজেই শলোমনের বংশধর হিসেবেও যীশু এই ওয়াদার মধ্যে প্রবেশ করতে পারছেন না।

ভুল-৩৬

১ রাজাবলি ১৭ অধ্যায়ে এলিয় ভাববাদী (Eli'jah) সম্পর্কে বলা হয়েছে: "পরে তাঁহার নিকট সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি এই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া পূর্বদিকে যাও, এবং যর্দনের সম্মুখস্থ করীৎ স্রোতের ধারে লুকাইয়া থাক। সে স্থানে তুমি স্রোতের জল পান করিতে পাইবে, আর আমি কাকদিগকে তোমার খাদ্য দ্রব্য যোগাইবার আজ্ঞা দিয়াছি। তখন তিনি গিয়া সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে কর্ম করিলেন, যর্দনের সম্মুখস্থ করীৎ স্রোতের ধারে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। আর কাকেরা তাঁহার জন্য প্রাতঃকালে রুটী ও মাংস, এবং সন্ধ্যাকালেও রুটী ও মাংস আনিয়া দিত; আর তিনি স্রোতের জল পান করিতেন।"[১]

এখানে 'কাকদিগকে' ও 'কাকেরা' শব্দের জন্য মূল হিব্রুতে 'উরবাম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সেন্ট জিরোম (৩৪২-৪২০ খৃ) ছাড়া বাকি খৃস্টান পণ্ডিতগণ এখানে 'উরবাম' শব্দের অর্থ 'কাক' লিখেছেন। জিরোম এই শব্দের অর্থ করেছেন 'আরব'। যেহেতু সেন্ট জিরোমের মতটি এই স্থলে দুর্বল, তাই তাঁর অনুসারিগণও তাঁর অনুবাদ বিকৃত করে 'আরব' শব্দটিকে 'গিরবান' বা 'কাক' বানিয়ে দিয়েছেন। আর অ-খৃস্টানদের জন্য বড় একটি উপহাস ও হাস্য উদ্রেককারী বিষয় হলো যে, কাকেরা ভাববাদীকে খাদ্য যোগাবে এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর জন্য রুটী ও মাংস এনে দেবে।

প্রটেস্ট্যান্টদের পণ্ডিত হর্ন এখানে হোচট খেয়েছেন ও দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছেন। তিনি জিরোমের মতকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। তিনি ধারণার ভিত্তিতে বলেন: "সম্ভবত এখানে 'উরবাম' অর্থ 'আরব', 'কাক' নয়।" তিনি তিনটি কারণে বাইবেলের অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকারদের মত বাতুল বলে গণ্য করেছেন।

তিনি তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৬৩৯ পৃষ্ঠায় বলেন : "কোন কোন বিরুদ্ধবাদী কঠিন আপত্তি করেছেন যে, এ কথা কিভাবে মেনে নেওয়া যায় যে, কাকের মত একটি অপবিত্র পাখি একজন ভাববাদীকে খাদ্য যোগাবে এবং তাঁর জন্য সকাল বিকালে খাবার এনে দেবে। কিন্তু যদি তারা এখানে মূল হিব্রু শব্দটি দেখতেন তবে এই আপত্তি করতেন না। কারণ এখানে মূলে রয়েছে "উরবাম" শব্দ। এর অর্থ হলো "আরব"। ২ বংশাবলির ২১ অধ্যায়ের ১৬ আয়াতে এবং নহিমিয়ের পুস্তকের ৪র্থ অধ্যায়ের ৭ম আয়াতে "উরবাম" শব্দটি এই "আরব" অর্থেই ব্যবহৃত ও অনূদিত হয়েছে।

১. ১ রাজাবলি ১৭/২-৬।

"ইহুদী ধর্মবেত্তাগণ আদিপুস্তকের ব্যাখ্যায় "গ্রীষ্ট রাব্বা" নামক যে গ্রন্থটি রচনা করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, এই ভাববাদীকে "বীতশান" অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী একটি জনপদে আত্মগোপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। জিরোম বলেছেন: "উরবাম" হলো আরবদের সীমানার একটি জনপদের বাসিন্দাগণ। তারাই এই ভাববাদীকে খাদ্য প্রদান করতেন। জিরোমের তরফ থেকে এ হলো একটি অতি মূল্যবান সাক্ষ্য। যদিও মুদ্রিত সকল ল্যাটিন অনুবাদে "উরবাম" অর্থ 'কাক' লেখা হয়েছে, তবুও বংশাবলি, নহিমিয় ও জিরোম "উরবাম" শব্দের অনুবাদ করেছেন "আরব"। আরবী অনুবাদ থেকে জানা যায় যে, এই শব্দের দ্বারা কিছু মানুষ বুঝানো হয়েছে, কিছু কাককে বুঝানো হয়নি। প্রখ্যাত ইহূদী ভাষ্যকার আল-জারজিও অনুরূপ অনুবাদ করেছেন।

"আর একথা কিভাবে মেনে নেওয়া যায় যে, কাকের মত একটি অপবিত্র পাখির মাধ্যমে ব্যবস্থার (মূসার শরীয়তের) বিরুদ্ধাচরণ করে মাংস যোগান দেওয়া হবে একজন পবিত্র ভাববাদীকে, যিনি ব্যবস্থার (মূসার শরীয়তের) একজন কঠোর পালনকারী ও সংরক্ষণকারী ছিলেন? তিনি কিভাবে জানবেন যে, এই অপবিত্র পাখিগুলি মাংস নিয়ে আসার আগে কোন অপবিত্র মৃতদেহের উপরে থামে নি বা নামে নি? এছাড়া এভাবে এক বছর ধরে এলিয়কে মাংস ও রুটি সরবরাহ করা হয়। এ কথা কিভাবে মনে করা যায় যে, এই দীর্ঘ সময়ের নিয়মিত খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে 'কাকেরা'? কাজেই, যতদূর বুঝা যায়, সম্ভবত, 'উরাব' বা 'উরাবূ' এলাকার বাসিন্দাগণ এই ভাববাদীকে খাদ্য সরবরাহের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন।" হর্নের বক্তব্য এখানেই শেষ।

এখন প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ দুইটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করবেন ঃ হয় তারা তাঁদের এই গবেষক পণ্ডিতের মত গ্রহণ করবেন এবং অবশিষ্ট অগণিত ব্যাখ্যাকার ও অনুবাদকের মূর্খতা ও অজ্ঞতা স্বীকার করবেন। অথবা এই গবেষক পণ্ডিতকে অর্বাচীন বলে ঘোষণা করবেন এবং স্বীকার করবেন যে, কাক কর্তৃক ভাববাদীকে মাংস ও রুটী সরবরাহ করার একটি কাহিনীও বাইবেলে রয়েছ যা এই গবেষকের উল্লিখিত তিনটি কারণে অসম্ভব, অবাস্তব ও বিবেকবানদের জন্য হাস্যকর উদ্ভট গল্প।

ভুল-৩৭

১ রাজাবলির ৬ অধ্যায়ের ১ আয়াতে বলা হয়েছে: "মিসর দেশ হইতে ইস্রায়েল-সন্তানদের বাহির হইয়া আসিবার পর চারি শত আশী বৎসরে ইস্রায়েলের উপরে শলোমনের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরের সিব মাসে অর্থাৎ দ্বিতীয় মাসে শলোমন সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে গৃহ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।"

এই তথ্যটি ঐতিহাসিগণের মতো ভুল। আদম ক্লার্ক তাঁর প্রণীত বাইবেলের ভাষ্যগ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১২৯৩ পৃষ্ঠায় এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: "(ইস্রায়েল সন্তানদের মিসর থেকে বের হওয়ার সময় থেকে শলোমন কর্তৃক মন্দির নির্মাণের

আরম্ভ পর্যন্ত) এই সময়কালের বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ নিম্নরূপ মতভেদ করেছেন: হিব্রু বাইবেলের পাঠ অনুসারে ৪৮০ বছর, বাইবেলের গ্রীক ভার্সনের বিবরণ অনুসারে ৪৪০ বছর, ক্লিকাসের মতে ৩৩০ বছর, মিলকিওরকানোসের মতে ৫৯০ বছর, যোসেফাসের মতে ৫৯২ বছর, সিলবি সিউস সোইরোস-এর মতে ৫৮৮ বছর, আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্টের মতে ৫৭০ বছর, সীদরীনিস-এর মতে ৬৭২ বছর, কোডোমনস-এর মতে ৫৯৮ বছর, যুসিবীস ও কাবালুস-এর মতে ৫৮০ বছর, স্রারিওস-এর মতে ৬৮০ বছর, নিকোলাস আবরাহামের মতে ৫২৭ বছর, মিস্টলিনোস-এর মতে ৫৯২ বছর এবং পিটইয়াউস ও ওয়াল্টহি রোশ-এর মতে ৫২০ বছর।"

যদি হিব্রু বাইবেলের তথ্য (৪৮০ বছর) সঠিক হতো এবং ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ হতো তাহলে বাইবেলের গ্রীক অনুবাদকগণ সেই তথ্যের বিরোধিতা করতেন না এবং ইহুদী ও খৃস্টান ঐতিহাসিকগণও তার বিরোধিতা করতেন না। আরো লক্ষ্যণীয় যে, যোসেফাস (Flavius Josephus) ও আলেকজান্দ্রীয় ক্লিমেন্ট (Clement of Alexandira) গ্রীক অনুবাদে প্রদত্ত তথ্যেরও বিরোধিতা করেছেন, অথচ তাঁরা নিজেদের ধর্মমতে অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, বাইবেলের গ্রন্থাবলিকে তাঁরা অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থের সমপর্যায়ের মনে করতেন, তাঁরা এগুলিকে ঐশী গ্রন্থ বা ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করতেন না। তা না হলে তাঁদের মত ধার্মিক মানুষ নিজের ধর্মের ঐশী গ্রন্থের বিরোধিতা করতেন না।

ভুল-৩৮

মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১৭ আয়াতটি নিম্নরূপ: "এইরূপে অব্রাহাম অবধি দায়ূদ পর্যন্ত সর্বশুদ্ধ চৌদ্দ পুরুষ; দায়ূদ অবধি বাবিলে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; এবং বাবিলে নির্বাসন অবধি খ্রীষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।"

এ কথা থেকে জানা গেল যে যীশুর বংশতালিকা তিন অংশে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অংশে ১৪ পুরুষ রয়েছে। এই কথাটি সুস্পষ্ট ভুল। কারণ, প্রথম অংশ দায়ূদে পূর্ণ হচ্ছে। দায়ূদ যদি প্রথম অংশের মধ্যে প্রবেশ করেন তাহলে তিনি অবশ্যই দ্বিতীয় অংশের বাইরে থাকবেন। তাহলে দ্বিতীয় অংশ নিঃসন্দেহে শুরু হবে শলোমন থেকে এবং যিকনিয়তে এসে শেষ হবে। যেহেতু যিকনিয় দ্বিতীয় অংশের অন্তর্ভূক্ত, সেহেতু অবশ্যই তিনি তৃতীয় অংশের মধ্যে আসবেন না। এভাবে তৃতীয় অংশ অবশ্যই শুরু হবে শল্টীয়েল থেকে এবং যীশুতে এসে শেষ হবে। এই তৃতীয় অংশে মাত্র ১৩ পুরুষ রয়েছেন।

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এই ভুলটি ধরা হয়েছে এবং আপত্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তৃতীয় খৃস্টীয় শতকে বোরফেরী এই বিষয়টি সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেন। খৃস্টান পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক ওজর-আপত্তি পেশ করার চেষ্টা করেছেন. যেগুলি বিবেচনারও যোগ্য নয়।

ভুল-৩৯-৪২

মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১১ আয়াতটি নিম্নরূপ:

"যোশিয়ের সন্তান যিকনিয় ও তাহার ভ্রাতৃগণ, বাবিলে নির্বাসন কালে জাত।"

এ কথা থেকে জানা গেল যে, ব্যাবিলেনের নির্বাসনে যেয়েও যোশিয় জীবিত ছিলেন এবং ব্যাবিলনেই তার পুত্র যিকনিয় ও তার ভ্রাতৃগণ জন্মগ্রহণ করেন। এই তথ্যটি চার দিক থেকে ভুল:

প্রথমত, ব্যাবিলনের নির্বাসনের ১২ বছর পূর্বেই যোশিয় মৃত্যুবরণ করেন (খৃ. পূ. ৬০৯/৬০৮ সালে মিসরের ফরৌণ নখো (নেকু) তাকে হত্যা করেন)। তার মৃত্যুর পরে তার পুত্র যিহোয়হস তিন মাস সিংহাসনে বসেন। এরপর যোশিয়ের অন্য পুত্র যিহোয়াকীম সিংহাসনে বসেন। তিনি ১১ বছর রাজত্ব করেন। যিহোয়াকীমের পরে তার পুত্র যিকনিয় (যিহোয়াখীন)[১] তিন মাস রাজত্ব করেন। এরপর (খৃ. পূ. ৫৯৭ সালে) নেবুকাদনেযার তাকে বন্দি করেন এবং অন্যান্য ইস্রায়েল সন্তানদের সাথে তাকেও ব্যাবিলনে নিয়ে যান।[২]

দ্বিতীয়ত, উপরের আলোচনা থেকে পাঠক জানতে পেরেছেন যে, যিকনিয় যোশিয়ের পুত্র নয় বরং পৌত্র।

তৃতীয়ত, ব্যাবিলনে নির্বাসনে যাওয়ার সময়ে যিকনিয়ের বয়স ছিল ১৮ বছর।[৩] কাজেই তিনি কিভাবে 'বাবিলে নির্বাসন কালে জাত' হলেন?

চতুর্থত, যিকনিয়ের 'ভ্রাতৃগণ' ছিল না। হ্যাঁ, তাঁর পিতার তিনটি ভাই ছিল।[৪]

পূর্ববর্তী ৩৮ নং ভুল ও এই ভুলগুলির কারণে বাইবেলের ব্যাখ্যাকার আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন: "ক্যামিট বলেছেন: মথির ১ম অধ্যায়ের ১১শ আয়াতটি নিম্নরূপে পাঠ করতে হবে: 'যোশিয়ের সন্তান যিহোয়াকীম ও তাহার ভ্রাতৃগণ, এবং যিহোয়াকীমের সন্তান যিকনিয়, বাবিলে নির্বাসন কালে জাত।"

---

১. বাইবেলে তার নাম কোন কোন স্থানে যিকনিয় ও কোন কোন স্থানে যিহোয়াখীন বলা হয়েছে। ২ রাজাবলি ২৩/২৯-৩৪, ২৪/১-১৮; ১ বংশাবলি ২/১৪-১৭; ২ বংশাবলি ৩৫/২০-২৭, ৩৬/১-১০।

২. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: বাইবেল ২ রাজাবলি ২৩/২৯-৩৪, ২৪/১-১৮; ২ বংশাবলি ৩৫/২০-২৭, ৩৬/১-১০।

৩. এখানেও বাইবেলে সুস্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। কোথাও ৮ এবং কোথাও ১৮ বলা হয়েছে। ২ রাজাবলি ২৪/৮; "যিহোয়াখীন আঠার বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে তিন মাস রাজত্ব করেন।" ২ বংশাবলি ৩৬/৩; "যিহোয়াখীন আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করেন।" তবে উভয় স্থানেই বলা হয়েছে যে, তিন মাস বা তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করার পরে নেবুকাদনেযার তাকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যান।

৪. বাইবেলের বিবরণ অনুসারে যোশিয়ের ছিল চারিটি পুত্র। অর্থাৎ যিকনিয়ের পিতা যিহোয়াকীমের তিনটি ভাই ছিল। আর যিকনিয়ের একটিমাত্র ভাই ছিল। ১বংশাবলি ২/১৫-১৬।

এভাবে তিনি বাইবেলের আয়াতকে বিকৃত করতে এবং এর মধ্যে যিহোয়াকীমকে অতিরিক্ত সংযুক্ত করতে নির্দেশ দিলেন। আর এত বিকৃতি ও সংযোজনের পরেও উপরে আলোচিত তৃতীয় সমস্যাটি দূরীভূত হচ্ছে না।

আমার মনে হয়, কোন ধার্মিক ও সৎ খৃস্টান পাদরী ইচ্ছাপূর্বক 'যিহোয়াকীম' শব্দটিকে এই স্থান থেকে বাদ দিয়েছিলেন। কারণ, ইতোপূর্বে ৫৭ নং বৈপরীত্যের আলোচনার সময় পাঠক জেনেছেন যে, যিহোয়াকীমের উপর ঈশ্বরের অভিশাপ ছিল যে, তার বংশের কেউ দায়ূদের সিংহাসনে বসার যোগ্যতা পাবে না। যীশু যদি 'যিহোয়াকীম'-এর বংশধর বলে প্রমাণিত হন, তবে তিনি দায়ূদের সিংহাসনে বসার অযোগ্য বলে প্রমাণিত হবেন। আর এর অর্থই হলো যে, তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ বা খৃস্ট (The Messiah, The Christ, The Anointed) ছিলেন না। এই সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই সম্ভবত কেউ এরূপ করেছেন।

কিন্তু এই ধার্মিক ব্যক্তি বুঝতে পারেন নি যে, এই একটি নাম উহ্য করে দেওয়ার ফলে অনেক ভুলের উৎপত্তি হবে। এমনও হতে পারে যে, তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু ভেবেছিলেন যে, যীশুর মসীহ বা খৃস্ট হওয়ার অযোগ্যতা প্রমাণ করার চেয়ে মথির নামে কিছু ভুল প্রমাণিত হওয়া সহজতর।

ভুল-৪৩

যিহূদা থেকে সল্‌মোন পর্যন্ত সময় ছিল প্রায় ৩০০ বছর। আর সল্‌মোন থেকে দায়ূদ পর্যন্ত সময় ছিল ৪০০ বছর। মথি প্রথম ৩০০ বছরের জন্য ৭ পুরুষের উল্লেখ করেছেন এবং পরের ৪০০ বছরের জন্য ৫ পুরুষের উল্লেখ করেছেন। নিঃসন্দেহে তা ভুল। কারণ প্রথম সময়ের মানুষদের আয়ু দ্বিতীয় সময়ের মানুষদের চেয়ে বেশি ছিল।

ভুল-৪৪

আমরা দেখেছি যে, মথি লিখেছেন: "দায়ূদ অবধি বাবিলে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।" এই কথাটি ভুল। ১ বংশাবলির ১ম অধ্যায় থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, এই পর্যায়ে ১৮ পুরুষ ছিল, ১৪ পুরুষ নয়।[১]

১. মথির বিবরণ অনুসারে শলোমন থেকে যিকনিয় পর্যন্ত বংশধারা নিম্নরূপ : ১. শলোমন, ২. রহবিয়াম, ৩. অবিয়, ৪. আসা, ৫. যিহোশাফট, ৬. যোরাম, ৭. উষিয়, ৮. যোথাম, ৯. আহস, ১০. হিষ্কিয়, ১১. মনঃশি, ১২. আমোন, ১৩. যোশিয় ও ১৪. যিকনিয়। অপরদিকে ১ বংশাবলির বিবরণ অনুসারে শলোমন থেকে যিকনিয় পর্যন্ত বংশধারা নিম্নরূপ: ১. শলোমন, ২. রহবিয়াম, ৩. অবিয়, ৪. আসা, ৫. যিহোশাফট, ৬. যোরাম, ৭. অহসিয়, ৮. যোয়াশ, ৯. অমৎসিয়, ১০. অসরিয় (৭. উষিয়,) ১১.(৮) যোথাম, ১২(৯) আহস, ১৩.(১০) হিষ্কিয়, ১৪ (১১) মনঃশি, ১৫.(১২) আমোন, ১৬. (১৩) যোশিয়, ১৭. যিহোয়াকীম ও ১৮.(১৪) যিকনিয়। এখানে বাইবেলের দুই স্থানেই স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী ব্যক্তি পরবর্তী ব্যক্তিকে জন্ম দিয়েছেন বা পরবর্তী ব্যক্তি পূর্ববর্তী ব্যক্তির পুত্র। মথি যোরাম ও উষিয় (অসরিয়)-এর মধ্যে তিন পুরুষ ফেলে দিয়েছেন এবং যোশিয় ও যিকনিয়র মাঝে এক পুরুষ ফেলে দিয়েছেন। তিনি শুধু ফেলে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, উপরন্ত এখানে যে আর কেউ ছিল না নিশ্চিত করতে এই পর্যায়ে সর্বমোট ১৪ পুরুষ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

এজন্য প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ কার্ডিনাল জন হেনরী নিউম্যান (১৮০১-১৮৯০) আফসোস করে বলেন, খৃস্ট ধর্মে একথা বিশ্বাস করা জরুরী যে, তিনে এক হয় বা তিন ও এক একই সংখ্যা। কিন্তু এখন একথাও বিশ্বাস করা জরুরী হয়ে গেল যে, ১৪ এবং ১৮ একই সংখ্যা; কারণ পবিত্র গ্রন্থে কোন ভুল থাকার সম্ভাবনা নেই।

ভুল-৪৫-৪৬

মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ৮ম আয়াতটি নিম্নরূপ : "যোরাম জন্ম দেন উষিয়কে (Jeho'ram begat Uzziah)"[১]। এখানে দুইটি ভুল রয়েছে।

প্রথমত, এই কথা থেকে জানা যায় যে, যোরাম ছিলেন উষিয়ের জন্মদাতা পিতা এবং উষিয় যোরামের ঔরসজাত পুত্র (এদের মাঝে যে আর কেউ নেই তা নিশ্চিত করেছেন মথি ১৪ পুরুষের কথা উল্লেখ করে)। মথির এই কথাটি ভুল। কারণ, উষিয় যোরামের পুত্র নন। যোরামের পুত্র অহসিয়, তার পুত্র যোয়াশ, তার পুত্র অমৎসিয় এবং তার পুত্র অসরিয় (উষিয়)। এখানে উভয়ের মধ্যে ৩ পুরুষ বা ৩ প্রজন্ম ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই তিন পুরুষ (অহসিয়, যোয়াশ ও মৎসিয়) সকলেই ইহূদীদের প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন।[২] এদের বিস্তারিত বিবরণ ২ রাজাবলির ৮ম, ১২শ ও ১৪শ অধ্যায়ে এবং ২ বংশাবলির ২২শ, ২৪শ ও ২৫শ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কাজেই এদের নাম ফেলে দেওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। একটিই মাত্র কারণ পাওয়া যায়, তা হলো ভুল। মথি অজ্ঞতা ও ভুলের কারণে এদের নাম উল্লেখ করেন নি। কারণ যদি কোন ঐতিহাসিক একটি যুগ নির্ধারণ করে বলেন যে, এই যুগের এত বছরে এতটি প্রজন্ম বাস করেছিল এবং সেখানে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কয়েকটি প্রজন্ম বাদ দেন তাহলে নিঃসন্দেহে উক্ত ঐতিহাসিককে ভুল ও অসত্য তথ্য পরিবেশনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে।

দ্বিতীয়ত, এই ব্যক্তির নাম 'উষিয়' নয় বরং এর নাম ছিল অসরিয়; ১ বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ে এবং ২ রাজাবলির ১৪ ও ১৫ অধ্যায় থেকে তা জানা যায়।

ভুল-৪৭

মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১২ আয়াতে বলা হয়েছে: "শল্টীয়েল জন্ম দেন সরুব্বাবিলকে (She-al'ti-el begat Zerub'babel)।"[৩]

এ থেকে জানা গেল যে, সরুব্বাবিল শল্টীয়েলের ঔরসজাত পুত্র। একথাটিও ভুল। সরুব্বাবিল ছিলেন শল্টীয়েলের ভাই পদায়ের পুত্র। ১ বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ে (১৭-১৮ আয়াত) তা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. বাংলা বাইবেলে অনুবাদ করা হয়েছে: "যোরামের পুত্র উষিয়।"
২. এরা যিহূদা রাজ্যের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম রাজা ছিলেন।
৩. বাংলা বাইবেলে অনুবাদ করা হয়েছে: "শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল।"

ভুল-৪৮

মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১৩ আয়াতে বলা হয়েছে: "সরুব্বাবিল জন্ম দেন অবীহূদকে (Zerub'babel begat Abi'ud)।"[১]

এ থেকে জানা গেল যে, অবীহূদ সরুব্বাবিলের পুত্র। এ কথাটিও ভুল। ১ বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ের ১৯ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরুব্বাবিলের ৫টি পুত্র ছিল, তাদের মধ্যে এই (অবীহূদ) নামে কোন পুত্র ছিল না।

এভাবে আমরা দেখছি যে, যীশুর বংশতালিকা বর্ণনায় মথি ১১টি ভুল করেছেন। এই পরিচ্ছেদের প্রথম অংশে বৈপরীত্য আলোচনার সময় পাঠক দেখেছেন যে, মথির বর্ণনার সাথে লূকের বর্ণনার অনেক অমিল ও বৈপরীত্য রয়েছে। এই ভুলগুলির সাথে সেই বৈপরীত্যগুলি যোগ করলে মোট ভুলের সংখ্যা হবে ১৭টি। তাহলে শুধু বংশতালিকা বর্ণনাতেই ১৭টি ত্রুটি পাওয়া গেল।

ভুল-৪৯

মথি তাঁর সুসমাচারের ২য় অধ্যায়ে যীশুর জন্মের সময় পূর্বদেশ হতে কয়েক জন পণ্ডিতের (মাজূসদের) আগমনের কাহিনী উল্লেখ করেছেন। তাঁরা পূর্ব দেশে যীশুর তারা (তারকা) দেখতে পেয়ে যিরূশালেমে আগমন করেন। সেই তারাটির পিছে পিছে তাঁরা যিরূশালেম থেকে বৈৎলেহমে গমন করেন। তারাটি তাঁদের আগে আগে চলতে থাকে এবং শিশু যীশুর উপরে যেয়ে থামে।[২]

এই বিবরণটি সঠিক নয়; কারণ গতিশীল সপ্ত তারকা এবং অন্যান্য গতিশীল সপুচ্ছ তারকার গতি পশ্চিম থেকে পূর্বে হয়। আর কোন কোন সপুচ্ছ তারকার গতি পূর্ব থেকে পশ্চিমে হয়। এতে বুঝা যায় যে, এই কাহিনীটি অসত্য। কেননা, বৈৎলেহম যিরূশালেমের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত (আর তারকারা তো উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে না যে, তাঁরা তারকার পিছে পিছে যাবেন!

হ্যাঁ, কোন কোন সপুচ্ছ তারকা তার আবর্তনের মধ্যে উত্তর থেকে সামান্য দক্ষিণে ঝুঁকে পড়ে। পশ্চিমা বৈজ্ঞানিকগণের মতানুসারে পৃথিবীর গতির সাথে এই ঝুঁকে পড়ার গতি অতি ধীর ও সামান্য। এজন্য দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত না হলে এই দক্ষিণমুখী গতি অনুভব করা যায় না। অল্প দূরত্বের মধ্যে এই গতি অনুভব করা যায় না বললেই চলে; বরং এ সকল তারকার গতির চেয়ে মানুষের হাঁটার গতি অনেক বেশি হয়। কাজেই তারকা দেখে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলার কোনরূপ সম্ভাবনা থাকে না।

এছাড়া দুরবীন ব্যবহার বা তারকা দেখে চলার নিয়ম এই নয় যে, আগে তারকার থেমে যাওয়া দেখা যাবে এবং এরপর তারকার পিছে চলমান ব্যক্তি থামবে, বরং এক্ষেত্রে নিয়ম হলো চলন্ত ব্যক্তি আগে থামবে, এরপর তারকার স্থির হওয়া দেখা যাবে।

১. বাংলা বাইবেলে অনুবাদ করা হয়েছে: "শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল।"
২. মথি ২/১-১২।

ভুল-৫০

মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ে রয়েছে: "এই সকল ঘটিল, যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত প্রভুর এই বাক্য পূর্ণ হয়, "দেখ, সেই কুমারী[১] গর্ভবতী হইবে এবং পুত্র প্রসব করিবে, আর তাঁহার নাম রাখা যাইবে ইম্মানুয়েল"; অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ, 'আমাদের সহিত ঈশ্বর'।"[২]

খৃস্টান ধর্মগুরুগণ একমত যে, এখানে "ভাববাদী" বলতে যিশাইয় ভাববাদীকে বুঝানো হয়েছে। যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৭ম অধ্যায়ের ১৪ আয়াতে তিনি বলেছেন; "অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দিবেন; দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানুয়েল রাখিবে।"

বিভিন্ন দিক থেকে এই কথাটি ভুল:

প্রথমত, এখানে সুসমাচার লেখক এবং যিশাইয়র পুস্তকের অনুবাদক যে শব্দটির অনুবাদে 'কুমারী' লিখেছেন সেই শব্দটি হলো "আলামাহ"। শব্দটি "আলাম" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। ইহূদী পণ্ডিতগণের নিকট এর অর্থ হলো "যুবতী মেয়ে, সে কুমারী হোক অথবা কুমারী না হোক।" তারা বলেন, এই শব্দটি হিতোপদেশ-এর ৩০ অধ্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে শব্দটি "বিবাহিত যুবতী নারী" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাইবেলের প্রাচীন তিনটি গ্রীক অনুবাদে আকুইলার[৩] অনুবাদ, থিওডোশানের[৪] অনুবাদ ও সীমাকাসের[৫] অনুবাদে যিশাইয়র বাক্যে ব্যবহৃত এই 'আলামাহ' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে 'যুবতী কন্যা'। এই অনুবাদত্রয় তাঁদের মতে প্রাচীন অনুবাদ। তাঁরা দাবি করেন যে, প্রথমটি ১২৯ খৃস্টাব্দে, দ্বিতীয়টি ১৭৫ খৃস্টাব্দে এবং তৃতীয়টি ২০০ খৃস্টাব্দে সম্পন্ন হয়। এই অনুবাদগুলি, বিশেষত থিওডোশানের অনুবাদটি প্রাচীন খৃস্টান পণ্ডিতগণের নিকট নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য ছিল। এভাবে আমরা দেখছি যে, ইহূদী পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা অনুসারে এবং এই তিন অনুবাদকের অনুবাদ অনুসারে মথির বক্তব্যের অশুদ্ধতা অতি স্পষ্ট।

---

১. এখানে ইংরেজী বাইবেলে (KJV) virgin বা কুমারী বলা হয়েছে। বাংলা বাইবেলের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে কুমারীর পরিবর্তে 'কন্যা' লিখা হয়েছে। যিশাইয় ৭/১৪ তেও একই ভাবে ইংরেজিতে Virgin ও বাংলায় 'কন্যা' লেখা হয়েছে।

২. মথি ১/২২-২৩।

৩. খৃস্টান ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে ১৩০ খৃস্টাব্দে তিনি (Aquila of Pontus) বাইবেলের প্রাচীন নিয়মকে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন।

৪. Theodotian of Ephesus.

৫. খৃস্টান ঐতিহাসিকদের মতে তিনি (Symmachus) ২১৮ খৃস্টাব্দে বাইবেলের অনুবাদ কর্ম সমাপ্ত করেন। তৃতীয় খৃস্টীয় শতকে যুসীবিস তাঁর ইতিহাসে এই তিনজনের অনুবাদের কথা উল্লেখ করেছেন। Eusebius, The Ecclesiastical History, page 189, 236.

হিব্রু ভাষার বিষয়ে কেরি যে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং যে গ্রন্থটিকে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন, সেই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন যে, এই 'আলামাহ' শব্দের অর্থ কুমারীও হতে পারে এবং 'যুবতী'ও হতে পারে। কেরির কথা অনুসারে এই শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। হিব্রু ভাষা যাদের নিজের ভাষা সেই ইহুদী পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যার বিপরীতে কেরির কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। এরপর তাঁর কথাটি সঠিক বলে মেনে নিয়েও আমি বলব যে, এই আয়াতে এই শব্দটির অর্থে ইহুদী পণ্ডিতগণ ও প্রাচীন গ্রীক অনুবাদকগণ যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা বাদ দিয়ে 'কুমারী' অর্থটি বিশেষভাবে এখানে গ্রহণ করতে হলে প্রমাণ আবশ্যক। মীযানুল হক গ্রন্থের রচয়িতা তাঁর 'হাল্লুল ইশকাল' নামক গ্রন্থে বলেছেন: "এই শব্দের অর্থ 'কুমারী' ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।" তাঁর এই বক্তব্যটি খণ্ডনের জন্য উপরের আলোচনাই যথেষ্ট।[১]

দ্বিতীয়ত, কখনোই কেউ যীশুকে 'ইম্মানুয়েল' নাম রাখেন নি : তাঁর পিতাও না, মাতাও না বরং তাঁরা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'যীশু'। অনুরূপভাবে মথির সুসমাচারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রভুর দূত (ফিরিশতা) যীশুর পিতাকে স্বপ্নে বলেন যে, 'তুমি তাঁহার নাম যীশু (ঈয়াসূ, যিহোশূয় বা যিশাইয়) রাখিবে।'[২] লূকের বর্ণনা অনুসারে গাব্রিয়েল দূত (জিবরাঈল) যীশুর মাতাকে বলেন : "তাঁহার নাম যীশু রাখিবে।"[৩] যীশু নিজেও কখনই দাবি করেননি যে, তাঁর নাম 'ইম্মানুয়েল'।

তৃতীয়ত, যিশাইয়ের পুস্তকে যে কাহিনীর মধ্যে এই কথাটি বলা হয়েছে, সেই কাহিনীর প্রেক্ষাপটে দেখলে নিশ্চিত বুঝা যায় যে, এই কথাটি কখনোই যীশু খৃস্টের আগমনের ইঙ্গিত বা ভবিষ্যৎ-বাণী হতে পারে না। কাহিনীটি নিম্নরূপ:

যিহূদা-রাজ আহসের সময়ে অরাম-রাজ রৎসীন ও ইস্রায়েল-রাজ পেকহ যিহূদার রাজ্য বা যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে একত্রিত হন। দুই রাজা একত্রিত হওয়াতে যিহূদা-রাজ আহস অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর যিশাইয় ভাববাদীকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন রাজা আহসকে শান্তনা প্রদান করে বলেন, আপনি ভয় পাবেন না। এই দুইজন আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। শীঘ্রই তাদের রাজত্ব বিনষ্ট হবে। তাদের দুই রাজ্য (ইস্রায়েল ও অরাম রাজ্য) বিনষ্ট হওয়ার চিহ্ন হিসাবে যিশাইয় আহসকে জানান যে, একজন যুবতী নারী গর্ভবতী হবেন এবং পুত্র প্রসব করবেন। সেই পুত্রটি ভালমন্দ জ্ঞান লাভ করার পূর্বেই এই দুই রাজার রাজ্য বিনষ্ট হবে।[৪]

১. এখানে কুমারী অর্থটি ভুল হওয়ার কারণেই পরবর্তী সংস্করণগুলিতে এর অর্থ 'কন্যা' বলা হয়েছে। কাজেই ড. ফান্ডারের কথাটি যে নিছক গোঁড়ামি তা আমরা বুঝতে পারছি। তা সত্ত্বেও ড. ফান্ডারের গ্রন্থগুলিই সারা বিশ্বে মুসলিম দেশগুলিতে কর্মরত খৃস্টান মিশনারীদের মূল অবলম্বন। সেগুলির আলোকেই তারা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন।

২. মথি ১/২১।

৩. লূক ১/৩১।

৪. বিস্তারিত দেখুন : যিশাইয় ৭/১-২৫।

পরবর্তী ঘটনা থেকে জানা যায় যে, এই সংবাদ প্রদানের ২১ বছরের মধ্যে পেকহ-এর রাজ্য বা ইস্রায়েল বিনষ্ট হয়[১]। কাজেই নিঃসন্দেহে এই সময়ের কিছু পূর্বে 'ইমানুয়েল' নামক এই পুত্রটি জন্মলাভ করেছিল এবং তার ভালমন্দ জ্ঞান লাভের পূর্বেই রাজ্যটি ধ্বংস হয়েছিল। আর যীশু জন্ম গ্রহণ করেন ইস্রায়েল-রাজ্য বিনষ্ট হওয়ার ৭২১ বছর পরে।

যিশাইয় ভাববাদী প্রদত্ত এই চিহ্নের ব্যাখ্যায় ইহূদী-খৃষ্টান পণ্ডিতগণ মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, এখানে যিশাইয় 'যুবতী নারী' বলতে নিজের স্ত্রীকে বুঝাচ্ছেন। তিনি বলছেন যে, তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হবেন এবং একটি পুত্র প্রসব করবেন। এই পুত্রটি বড় হয়ে ভালমন্দ জ্ঞান লাভ করার আগেই এই দুই রাজ্য বিনষ্ট হবে। ড. বেনসন এই ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন। আমার মতে এই ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য এবং যুক্তিগ্রাহ্য।

ভুল-৫১

(যীশুকে নিয়ে তাঁর পিতামাতার মিসরে গমনের বিষয়ে) মথিলিখিত সুসমাচারের ২য় অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে: "এবং হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে থাকিলেন, যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়: 'আমি মিসর হইতে আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম'।"

এখানে ভাববাদী বলতে হোশেয় ভাববাদীকে বুঝানো হয়েছে। সুসমাচার লেখক মথি এখানে হোশেয় ভাববাদীর পুস্তকের ১১ অধ্যায়ের ১ম আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই আয়াতটিকে যীশুর জন্য প্রয়োগ করা ভুল। যীশুর সাথে এই আয়াতের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। ১৮১১ সালে প্রকাশিত আরবী বাইবেল অনুসারে আয়াতটি নিম্নরূপ: "ইস্রায়েলের বাল্যকালে আমি তাহাকে ভালবাসিতাম, এবং মিসর হইতে আমি তাহার পুত্রগণকে ডাকিয়া আনিলাম।" এভাবে আমরা দেখছি যে, মোশির যুগে ইস্রায়েল সন্তানদের প্রতি সদাপ্রভু যে করুণা করেছিলেন তা বর্ণনা করা হয়েছে এই আয়াতে। সুসমাচার লেখক তা বিকৃত করে বহুবচনকে একবচন এবং নাম পুরুষের সর্বনামকে উত্তম পুরুষের সর্বনামে পরিণত করেছেন। এভাবে তিনি যা বলার বলেছেন ('পুত্রগণের' স্থলে পুত্র ও 'তাহার' স্থলে 'আমার' বলেছেন।) তার অনুসরণ করার জন্য ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে হোশিয়ের পুস্তকের আয়াতটিকে অনুরূপভাবে বিকৃত করা হয়েছে।

---

১. খৃ. পূ. ৭৩০ বা ৭২৫ অব্দে অ্যাসিরিয়ানদের হাতে রৎসীন-এর অরাম রাজ্য বা সিরিয়া বিনষ্ট হয়। আর খৃ. পূ. ৭২২ অব্দে অ্যাসিরিয়ানদের হাতে ইস্রায়েল রাজ্য বা সামারিয়া বিধ্বংস হয়। মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৭-৮।

কিন্তু এই অধ্যায়টি যিনি পুরো পড়বেন এবং এই আয়াতের সাথে পরের আয়াত মিলিয়ে দেখবেন তিনি সহজেই এই বিকৃতি ধরতে পারবেন। 'ডাকিয়া আনা' ব্যক্তিগণের বিষয়ে এর পরের আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করে বলা হয়েছে (১৮১১ সালের আরবী অনুবাদ অনুসারে) "তাহাদিগকে ডাকা হইলে তাহারা দৃষ্টিপথ হইতে দূরে গেল, বাল দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিল এবং প্রতিমাগণের উদ্দেশে ধুপ জ্বালাইল।"[১]

এই বিষয়গুলি কোন অবস্থাতেই যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এমনকি যীশুর সমসাময়িক ইহূদীগণের ক্ষেত্রেও এই বিষয়গুলি প্রযোজ্য নয়। যীশুর জন্মের ৫০০ বছর আগে যারা ছিলেন তাদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য নয়। কারণ যীশুর জন্মের ৫৩৬ বছর আগে, ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে ইহূদীগণ প্রতিমা পূজা বা বাল দেবতার পূজা পরিত্যাগ করেন এবং সুন্দরভাবে তাওবা করেন। এই তাওবার পরে আর কখনোই তারা প্রতিমা পূজার নিকটবর্তী হয়নি। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে তা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে।

ভুল-৫২

মথিলিখিত সুসমাচারের ২য় অধ্যায়ের ১৬ আয়াতটি নিম্নরূপ: "পরে হেরোদ যখন দেখিলেন যে, তিনি পণ্ডিতগণ কর্তৃক তুচ্ছীকৃত হইয়াছেন, তখন মহাক্রুদ্ধ হইলেন, এবং সেই পণ্ডিতদের নিকটে বিশেষ করিয়া যে সময় জানিয়া লইয়াছিলেন, তদনুসারে দুই বৎসর ও তাহার অল্প বয়সের যত বালক বৈৎলেহম ও তাহার সমস্ত পরিসীমার মধ্যে ছিল, লোক পাঠাইয়া সে সকলকে বধ করাইলেন।"

ঐতিহাসিকভাবে এবং বুদ্ধি-বিবেচনা উভয় দিক থেকেই এই কথাটি ভুল। ঐতিহাসিকভাবে তথ্যটি অশুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য অ-খৃস্টান অগণিত ঐতিহাসিকের মধ্য থেকে কেউই এই ঘটনাটি লিখেননি। [প্রথম খৃস্টীয় শতাব্দীর (৩৭-৯৫ খৃ.) প্রসিদ্ধতম] ইহূদী ঐতিহাসিক যোসেফাস (Flavius Josephus) বা অন্যান্য সমসাময়িক ইহূদী ঐতিহাসিক হেরোদের ভুলত্রুটিগুলি বিশেষভাবে লিখেছেন এবং তার অপরাধ ও জুলুম অত্যাচারের বিষয়গুলি খুটিয়ে খুটিয়ে আলোচনা করেছেন।

---

১. পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ১ম আয়াতের সাথে ২য় আয়াতটির অনুবাদও কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে: "১ ইস্রায়েলের বাল্যকালে আমি তাহাকে ভালবাসিতাম, এবং মিসর হইতে আপন পুত্রকে (তাহার পুত্রদেরকে) ডাকিয়া আনিলাম। ২ তাহারা লোকদিগকে ডাকিলে লোকেরা দৃষ্টিপথ হইতে দূরে গেল, বাল দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিল, এবং প্রতিমাগণের উদ্দেশে ধুপ জ্বালাইল।" এত বিকৃতির পরেও উভয় আয়াত একত্রে পাঠ করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রথম আয়াতে বহুবচনের শব্দ ছিল। 'আপন পুত্রকে' পরিবর্তন করে 'তাহার পুত্রদেরকে' লিখলেই দ্বিতীয় আয়াতের 'তাহারা' শব্দটি অর্থবহ হয়। তা না হলে তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এছাড়া গ্রন্থকারের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারছি যে, এই বিকৃতি বা পরিবর্তনের পরেও এই আয়াতদ্বয়কে কোন ভাবে যীশু বা যীশুর সমসাময়িক ইহূদীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না।

নিরপরাধ শত শত শিশুকে হত্যা করা নিঃসন্দেহে কঠিন জুলুম ও ভয়ঙ্কর অন্যায়। যদি প্রকৃতই ঘটে থাকত তাহলে এ সকল ঐতিহাসিক অবশ্যই তা বিস্তারিত বিবরণসহ লিখতেন। কোন খৃস্টান ঐতিহাসিক যদি এই ঘটনা লিখেন তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না; কারণ তিনি মথির বিবরণের উপর নির্ভর করে লিখেছেন।

বুদ্ধি, বিবেচনা ও যুক্তির মাপকাঠিতেও বর্ণনাটি অসত্য। কারণ বৈৎলেহম একটি ছোট্ট শহর ছিল, কোন বড় শহর ছিল না আর তা ছিল হেরোদের রাজধানী যিরূশালেমের কাছেই, কোন দূরবর্তী শহর ছিল না। শহরটি ছিল হেরোদের নিয়ন্ত্রণাধীন, অন্য কারো নিয়ন্ত্রণে ছিল না। এজন্য হেরোদের পক্ষে খুবই সহজ ছিল যে, তিনি নিজের রাজধানীর নিকটবর্তী নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন এই ছোট্ট জনপদটিতে খোঁজ নিয়ে জেনে নেবেন যে, পণ্ডিতগণ কার বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং কার পুত্র কাকে তারা উপহারাদি প্রদান করেছিলেন। কাজেই নিরপরাধ নিষ্পাপ শিশুদেরকে বধ করার তার কোন প্রয়োজন ছিল না।[১]

ভুল-৫৩

মথিলিখিত সুসমাচারের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে: "১৭ তখন যিরমিয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হইল, ১৮ 'রামায় শব্দ শুনা যাইতেছে, হাহাকার ও অত্যন্ত রোদন; রাহেল আপন সন্তানদের জন্য রোদন করিতেছেন, সান্ত্বনা পাইতে চান না, কেননা তাহারা নাই।"

এই কথাটিও ভুল এবং সুসমাচার লেখক একে বিকৃত করেছেন। কারণ এই কথাটি যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকের ৩১ অধ্যায়ের ১৫ আয়াত। যে কোন পাঠক যদি যিরমিয়ের এই আয়াতটির পূর্বের ও পরের আয়াতগুলি পাঠ করেন তাহলে জানতে পারবেন যে, এই আয়াতটি হেরোদের ঘটনার বিষয়ে বলা হয়নি, বরং যিরমিয় ভাববাদীর সময়ে সংঘটিত নেবুকাদনেযারের ঘটনার বিষয়ে বলা হয়েছে। এই ঘটনায় হাজার হাজার ইহূদী নিহত হন এবং হাজার হাজার ইহূদীকে বন্দি করা হয় এবং ব্যাবিলনে নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া হয়। যেহেতু এদের মধ্যে (যাকোবের স্ত্রী) রাহেলের বংশের অনেক মানুষ ছিলেন: সেহেতু পরলোকেও তাঁর আত্মা কেঁদেছিল। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর তাকে ওয়াদা করেন যে, 'তোমার সন্তানগণ আপনাদের অঞ্চলে ফিরিয়া আসিবে'।[২]

১. কোন বিজয়ী শাসকও চায় না যে, অকারণে শাসিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনরোষ সৃষ্টি হোক। বাইবেলের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, রোমান গভর্নর যীশুকে নিরপরাধ মনে করতেন এবং তাঁকে শাস্তি প্রদানে আগ্রহী ছিলেন না, ইহূদী জনমতের প্রতি লক্ষ্য রেখে যীশুকে শাস্তি দেন। তাহলে আমরা কিভাবে কল্পনা করতে পারি যে, একেবারেই অপ্রয়োজনে রোমান শাসক অগণিত নিরপরাধ শিশুকে বধ করে ইহূদী জনগোষ্ঠীকে ক্ষিপ্ত করবেন?

২. যিরমিয় ৩১/১৫-১৭।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

যিরমিয়ের বক্তব্য ও সুসমাচার লেখক মথির স্বীকৃতি থেকে জানা যায় যে, পরলোকে অবস্থানরত মৃত ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে অবস্থানরত তাদের আত্মীয়-স্বজনের অবস্থাদি বুঝতে পারেন এবং তাদের বিপদে তারা ব্যথা পান। কিন্তু প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় এ কথা বিশ্বাস করেন না।

ভুল-৫৪

মথি উল্লেখ করেছেন যে, হেরোদের মৃত্যুর পরে যীশুর পিতামাতা তাঁকে নিয়ে মিসর থেকে ফিলিস্তীনে ফিরে আসেন এবং গালীল প্রদেশের নাসরৎ নামক শহরে বসবাস করতে থাকেন। এ বিষয়ে মথির ২য় অধ্যায়ের ২৩ আয়াতটি নিম্নরূপ: "এবং নাসরৎ নামক নগরে গিয়া বসতি করিলেন; যেন ভাববাদীগণের দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয় যে, তিনি নসরতীয় বলিয়া আখ্যাত হইবেন।"

মথির এই কথাটি সত্য নয়। কোন ভাববাদীর কোন পুস্তকেই এ কথা নেই। ইহূদীগণ এই কথাটির বিষয়ে কঠিনভাবে আপত্তি করেন। তারা বলেন যে, মথির এই কথাটি ভাববাদিগণের নামে জঘন্য মিথ্যাচার ও জালিয়াতি। উপরন্তু তারা বিশ্বাস করেন যে, নাসরৎ নগর তো দূরের কথা, গালীল প্রদেশ থেকেই কোন ভাববাদী আবির্ভূত হন নি। যোহনলিখিত সুসমাচারের ৭ম অধ্যায়ের ৫২ আয়াতে বিষয়টি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] খৃষ্টান পণ্ডিতগণ এখানে বিভিন্ন বাতুল ও বাজে ওজর-আপত্তি পেশ করে থাকেন। এ সকল ওজরখাহি বিবেচনারও অযোগ্য।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মথি তাঁর সুসমাচারের প্রথম দুই অধ্যায়ের মধ্যেই ১৭টি ভুল বা অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন।

ভুল-৫৫

মথিলিখিত সুসমাচারের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পংক্তিটি নিম্নরূপ: "সেই সময়ে (In those days: সেই দিনগুলিতে) যোহন বাপ্তাইজক উপস্থিত হইয়া যিহূদিয়ার প্রান্তরে প্রচার করিতে লাগিলেন।"

এই আয়াতটির পূর্বের আয়াতগুলিতে, অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে মথি উল্লেখ করেছেন যে, হেরোদের মৃত্যুর পরে তার পুত্র আর্খিলায় পিতার স্থলে যিহূদিয়াতে রাজত্ব শুরু করেন এবং এ সময়ে যীশুর পিতা তাঁর স্ত্রী ও পুত্র যীশুকে নিয়ে ফিলিস্তীনে গালীল প্রদেশের নাসরৎ নগরে ফিরে আসেন। তাহলে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আয়াতে 'সেই সময়' বা 'সেই দিনগুলি' বলতে এই সময়কেই বুঝানো হয়েছে। তাহলে এই আয়াতটির অর্থ হচ্ছে: "যে সময়ে আর্খিলায় যিহূদিয়ার সিংহাসনে বসলেন এবং যোষেফ স্ত্রী-পুত্রসহ ফিরে আসলেন সেই সময়ে যোহন বাপ্তাইজক উপস্থিত হইয়া যিহূদিয়ার প্রান্তরে প্রচার করিতে লাগিলেন।"

---

১ "অনুসন্ধান করিয়া দেখ, গালীল হইতে কোন ভাববাদীর উদয় হয় না।" যোহন ৭/৫২।

এই কথাটি নিঃসন্দেহে ভুল। কারণ এখানে যে সকল ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির ১৮ বছর পরে যোহন বাপ্তাইজক প্রচার শুরু করেন।

ভুল-৫৬

মথিলিখিত সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ের ৩য় আয়াতটি নিম্নরূপ: "কারণ হেরোদ আপন ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্য যোহনকে ধরিয়া বাঁধিয়া কারাগারে রাখিয়াছিলেন।"

এই কথাটি ভুল। কারণ, হেরোদিয়ার স্বামীর নামও ছিল 'হেরোডাস', তার নাম 'ফিলিপ' ছিল না। যোসেফাস তাঁর ইতিহাসের ৮ম গ্রন্থের ৫ম অধ্যায়ে তা স্পষ্টরূপে লিখেছেন।

ভুল-৫৭

মথিলিখিত সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে আছে: "৩ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা ক্ষুধিত হইলে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই? তিনি ত ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহারা দর্শন-রুটী ভোজন করিলেন, যাহা তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের ভোজন করা বিধেয় ছিল না, কেবল যাজকবর্গেরই বিধেয় ছিল।"

এখানে 'ও তাঁহার সঙ্গীরা' এবং 'তাঁহার সঙ্গীদের' কথা দুইটি ভুল। একটু পর ৭২ নং ভুলের আলোচনায় পাঠক তা বিস্তারিত জানতে পারবেন।

ভুল-৫৮

মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ের ৯ আয়াত নিম্নরূপ: "তখন যিরমিয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হইল, 'আর তাহার সেই ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা লইল..।"

এই কথাটি সন্দেহাতীতভাবে ভুল।[১] দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আলোচ্যের ২৯ নং প্রমাণ আলোচনার সময় পাঠক তা বিস্তারিত জানতে পারবেন।

ভুল-৫৯

মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ে রয়েছে: "৫১ আর দেখ, মন্দিরের তিরস্করিণী (Veil) উপর হইতে নীচ পর্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল, ভুমিকম্প হইল, ও শৈল সকল বিদীর্ণ হইল, ৫২ এবং কবর সকল খুলিয়া গেল, আর অনেক নিদ্রাগত পবিত্র লোকের দেহ উত্থাপিত হইল; ৫৩ এবং তাঁহার পুনরুত্থানের পর তাঁহারা কবর হইতে বাহির হইয়া পবিত্র নগরে প্রবেশ করিলেন, আর অনেক লোককে দেখা দিলেন।"

এই কাহিনীটি মিথ্যা। পণ্ডিত নর্টন পবিত্র বাইবেলের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য সদা সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনিও তাঁর পুস্তকে এই কাহিনীটি মিথ্যা বলে বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করেছেন। এরপর তিনি বলেন, "এই কাহিনীটি মিথ্যা। সম্ভবত যিরূশালেমের ধ্বংসের

১. এই বাক্যটি বা এ অর্থের কোন বাক্য যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকের কোথাও নেই।

পর থেকে এই ধরনের কিছু গল্পকাহিনী ইহূদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সম্ভবত কেউ একজন মথিলিখিত সুসমাচারের হিব্রু পাণ্ডুলিপির টীকায় তা লিখেছিলেন এবং অনুলিপি লেখক (copicr) লেখার সময় তা মূল পাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এরপর সেই কপিটিই অনুবাদকের হাতে পড়ে এবং সেভাবেই তিনি অনুবাদ করেন।

নিম্নের বিষয়গুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই কাহিনীটি মিথ্যা:

প্রথমত, যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার পরদিন ইহূদীরা গভর্নর পীলাতের নিকট যেয়ে বলে : "মহাশয়, আমাদের মনে পড়িতেছে, সেই প্রবঞ্চক জীবিত থাকিতে বলিয়াছিল, তিন দিনের পরে আমি উঠিব। অতএব তৃতীয় দিবস পর্যন্ত তাহার কবর চৌকি দিতে আজ্ঞা করুন।"[১] এই অধ্যায়েই মথি উল্লেখ করেছেন যে, পীলাত এবং তার স্ত্রী যীশুকে হত্যা করতে রাজি ছিলেন না।[২] যদি এ সকল বিষয় সত্যই সংঘটিত হতো, তবে ইহূদীদের জন্য কখনোই সম্ভব হতো না যে, যে সময়ে মন্দিরের তিরস্করিণী (veil বা পর্দা) উপর হইতে নীচ পর্যন্ত চিরে দুইখান হয়ে রয়েছে, পাথরগুলি বিদীর্ণ হয়ে রয়েছে, কবরগুলি খোলা রয়েছে, মৃতরা তখনো জীবিত হয়ে রয়েছেন, আর সেই অবস্থাতে তারা পীলাতের কাছে যেয়ে বলছে যে, সেই লোকটি প্রবঞ্চক ছিল। পীলাত তো প্রথম থেকেই তাঁকে হত্যা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি এ সকল বিষয় দেখতে পেলে অবশ্যই ইহূদীদের শত্রুতে পরিণত হতেন এবং তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলতেন। অনুরূপভাবে হাজার হাজার মানুষ তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা করত।

দ্বিতীয়ত, এগুলি অনেক বড় অলৌকিক নির্দশন। যদি সত্যই এগুলি ঘটে থাকত তবে স্বভাবতই অনেক রোমান ও ইহূদী যীশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করত। বাইবেলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যীশুর পুনরুত্থানের পরে, তাঁর প্রেরিত শিষ্যগণ যখন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন এবং বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন তখন মানুষেরা আশান্বিত ও চমৎকৃত হয়ে কমবেশী তিন হাজার লোক তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের সাথে সংযুক্ত হয়। প্রেরিতদের কার্য-বিবরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই ঘটনা বিবৃত রয়েছে।[৩] বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার চেয়ে এই ঘটনাগুলি অনেক বড় অলৌকিক নিদর্শন।

তৃতীয়ত, এই বিষয়গুলি অত্যন্ত বড় বিষয়। মথির দাবি অনুসারে এই বিষয়গুলি প্রকাশ্যে সকলেই অবলোকন করেছিল। অথচ একমাত্র মথি ছাড়া সেই সময়ের অন্য কোন ঐতিহাসিক এই ঘটনাগুলি লিখলেন না! এমনকি এই পরের যুগের কোন ঐতিহাসিকও এ বিষয়ে কিছু লিখেন নি। যদি মনে করা হয় যে, অ-খৃস্টান ঐতিহাসিকগণ ধর্মীয় বিরোধ ও যীশু সম্পর্কে খারাপ ধারণার কারণে এই ঘটনাগুলি লিখেননি, তাহলে অন্তত যীশুর অনুসারী ও পক্ষাবলম্বী ঐতিহাসিকগণ তো সেগুলি

১. মথি ২৭/৬২-৬৪।
২. মথি ২৭/১৭-২৫।
৩. প্রেরিত ২/১-৪১।

লিপিবদ্ধ করবেন। বিশেষত লূক ছিলেন আশ্চর্য ও অলৌকিক ঘটনাবলির সংকলনে অত্যন্ত আগ্রহী। তাঁর লেখা সুসমাচারের প্রথম অধ্যায় এবং তাঁর লেখা 'প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ'-এর প্রথম অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, তিনি যীশুর সকল কর্মকাণ্ড ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে সবিশেষ অনুসন্ধান করতেন। এ কথা কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, সুসমাচার লেখকগণ সকলেই অথবা অধিকাংশই সাধারণ লৌকিক ঘটনা ও অবস্থাদি লিখবেন, অথচ মথি ছাড়া কেউই এই অসাধারণ অলৌকিক ঘটনাগুলি লিখবেন না? মার্ক ও লূক শুধু মন্দিরের তিরস্করিণী বা পর্দা ফেটে যাওয়ার কথা লিখবেন[১], অথচ বাকী অত্যাশ্চর্য ঘটনাগুলি (ভূমিকম্প, কবর ফেটে যাওয়া, পাথর ফেটে যাওয়া, মৃত ব্যক্তিদের পুনরুত্থিত হওয়া, শহরের মধ্যে এসে জনগণকে দেখা দেওয়া ইত্যাদি) কিছুই লিখবেন না?

চতুর্থত, মন্দিরের veil বা পর্দা ছিল অত্যন্ত পাতলা কাতান কাপড়ের।[২] তাহলে ভূমিকম্পের ধাক্কায় মন্দিরের পর্দা উপর হতে নীচ পর্যন্ত চিরিয়া দুইখানা হওয়ার অর্থ কি? আর যদি ভূমিকম্পের ধাক্কায় পর্দাটি এভাবে ফেটে যায় তাহলে মন্দিরের ভবনটি কিভাবে অক্ষত থাকল? অথচ 'তিরস্করিণী' বা পর্দা চিরিয়া যাওয়ার কথাটুকু মথি, মার্ক ও লূক তিনজনেই লিখেছেন।

পঞ্চমত, 'অনেক নিদ্রাগত পবিত্র লোকের দেহ উত্থাপিত হওয়া' পৌলের কথার বিপরীত। পৌল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যীশুই ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি মৃত্যুর পরে জীবিত হয়েছেন। পূর্ববর্তী অংশে ৮৯ নং বৈপরীত্যের আলোচনায় পাঠক তা জানতে পেরেছেন।

এভাবে আমরা জানতে পারছি যে, পণ্ডিত নর্টন যা বলেছেন তাই ঠিক। মথির সুসমাচারের (মূল হিব্রু থেকে প্রথম গ্রীক) অনুবাদক ছিলেন 'রাতের আঁধারে কাঠ-সংগ্রহকারীর মত' বিবেচনা ও বিচার শক্তিবিহীন। শুকনো ও ভিজের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এই গ্রন্থের মধ্যে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ যা কিছু পেয়েছেন সবই অনুবাদ করেছেন। এইরূপ একজনের সম্পাদনার উপরে কি নির্ভর করা যায়? কখনোই না।

ভুল-৬০, ৬১, ৬২

মথিলিখিত সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে রয়েছে: "৩৯ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে (অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চায়), কিন্তু যোনা ভাববাদীর (ইউনুস আ.) চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহাদিগকে দেওয়া যাইবে না। ৪০ কারণ যোনা (ইউনূস) যেমন তিন দিবারাত্র (three days and three nights) বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্র (three days and three nights) পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন।"

১. মার্ক ১৫/৩৮ ও লূক ২৩/৪৫।
২. তিরস্করিণী বা পর্দার বিবরণ দেখুন যাত্রাপুস্তক ২৬/৩১-৩৫।

মথির ১৬ অধ্যায়ের ৪ আয়াতটি নিম্নরূপ: "এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ব্যতিরেকে আর কোন চিহ্ন তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে না।" এখানেও স্বভাবত যোনা ভাববাদীর চিহ্ন বলতে 'তিন দিন ও তিন রাত্র'[1] মাটির অভ্যন্তরে থাকা বুঝানো হয়েছে।

মথির ২৭ অধ্যায়ের ৬৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার পরদিন ইহূদীরা গভর্নর পীলাতের নিকট যেয়ে বলে : "মহাশয়, আমাদের মনে পড়িতেছে, সেই প্রবঞ্চক জীবিত থাকিতে বলিয়াছিল তিন দিনের পরে আমি উঠিব।"

এই বক্তব্য তিনটিই ভুল। কারণ যোহনের সুসমাচারের ১৯ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, শুক্রবার দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে (বেলা অনুমান ছয় ঘটিকা) যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়। নয় ঘটিকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। 'পরে সন্ধ্যা হইলে' অরিমাথিয়ার যোষেফ গভর্নর পীলাতের নিকট যেয়ে যীশুর দেহ প্রার্থনা করেন, মার্কের সুসমাচারে তা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[2] এ থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারছি যে, শুক্রবার দিবাগত রাত্রে যীশুকে কবরস্থ করা হয়। এরপর রবিবার প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের পূর্বেই এই দেহটি কবর থেকে অদৃশ্য হয়। যোহনের সুসমাচারে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।[3]

এভাবে আমরা দেখছি যে, যীশুর দেহ কোন অবস্থাতেই পৃথিবীর গর্ভে তিন দিন ও তিন রাত্র (three days and three nights) থাকে নি; বরং এক দিন ও দুই রাত্রি তা পৃথিবীর গর্ভে ছিল। 'তিন দিনের পরে' যীশু উঠেন নি। কাজেই মথির এই বক্তব্য তিনটিই ভুল।

এই কথাগুলি ভুল হওয়ার কারণে পালস এবং স্টার স্বীকার করেছেন যে, তিন দিনের এই কথাটি যীশুর কথা নয়; বরং মথির ব্যাখ্যা মাত্র। তাঁরা বলেছেন, "যীশুর কথার উদ্দেশ্য ছিল, নীনবীয়গণ যেমন যোনা ভাববাদীর ঘোষণা ও প্রচারেই বিশ্বাস করেছিল এবং কোন চিহ্ন বা অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চায়নি, তদ্রূপভাবে এ সকল লোকদের উচিত যে, তারা কোন চিহ্ন বা অলৌকিক নিদর্শন দেখতে না চেয়ে আমার প্রচারে বিশ্বাস করা।"

এই দুই গবেষকের আলোচনা থেকে জানা গেল যে, এই ভুলটির উৎপত্তি হয়েছে মথির ভুল বুঝা থেকে। এ থেকে স্পষ্ট হলো যে, মথি তাঁর সুসমাচার ঈশ্বরের অনুপ্রেরণার দ্বারা লিখেন নি। এখানে যেমনভাবে তিনি যীশুর কথা বুঝতে অক্ষম হয়েছেন এবং ভুল করেছেন, তেমনি অন্যান্য স্থানেও তাঁর ভুল বুঝা ও ভুল উদ্ধৃত করার আশংকা রয়েছে। কাজেই তাঁর বর্ণনার উপরে কিভাবে ভালভাবে নির্ভর করা যায়? আর তাঁর বর্ণনাকে কিভাবে ঐশী প্রেরণা বা ঐশ্বরিক বলে গণ্য করা যায়? ঐশ্বরিক প্রেরণার মাধ্যমে লেখা বক্তব্য কি এমন হতে পারে?

১. যোনা ১/১৭।
২. মথি ২৭/৪৫-৬১; মার্ক ১৫/৩৩-৪৭; লূক ২৩/৪৪-৫৬; যোহন ১৯/২৫-৪২।
৩. যোহন ২০/১-১৮। আরো দেখুন : মথি ২৮/১-১০; মার্ক ১৬/১-১১; লূক ২৪/১-১২।

ভুল-৬৩

মথির সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ে রয়েছে: "২৭ কেননা মনুষ্যপুত্র আপন দূতগণের (angeles : ফিরিশতাগণ) সহিত আপন পিতার প্রতাপে আসিবেন, আর তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল দিবেন। ২৮ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যাহারা এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এমন কয়েক জন আছে, যাহারা কোন মতে মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না, যে পর্যন্ত মনুষ্যপুত্রকে আপনার রাজ্যে আসিতে না দেখিবে।"

এই কথাটি ভুল। কারণ, সেখানে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সকলেই মৃত্যুর আস্বাদ পেয়েছে, প্রাচীন অস্থি ও মাটিতে পরিণত হয়েছে এবং তাদের মৃত্যুর পরে ১৮০০ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই ঈশ্বরের পুত্রকে ফিরিশতাগণের সাথে আপন পিতার প্রতাপে আপনার রাজ্যে এসে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল দিতে দেখেন নি।

ভুল-৬৪

মথির সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ের ২৩ আয়াতটি নিম্নরূপ: যীশু তাঁর ১২ জন শিষ্যকে ভুত ছাড়ানোর ও রোগ ভাল করার ক্ষমতা দিয়ে পাঠানোর সময় তাদেরকে যে নির্দেশ দেন, " কোন গ্রামের লোকেরা যখন তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে, তখন অন্য গ্রামে পলাইয়া যাইও। আমি তোমাদের সত্যই বলিতেছি, ইস্রায়েল দেশের সমস্ত গ্রামে তোমাদের যাওয়া শেষ হইবার আগেই মনুষ্যপুত্র আসিবেন।[১]

এই কথাটিও ভুল। তারা ইস্রায়েলের সকল গ্রামে যাওয়া শেষ করেছেন, সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাদের মৃত্যুর পরে ১৮০০ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে কিন্তু মনুষ্যপুত্র তাঁর রাজত্বে আসেন নি।

(শীঘ্রই ফিরে আসার বিষয়ে) উপরের বক্তব্য দুইটি যীশুর স্বর্গারোহণের পূর্বে বলা। স্বর্গারোহণের পরে (যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্যে) এ বিষয়ক তাঁর বক্তব্যগুলি নিম্নরূপ:

ভুল-৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

প্রকাশিত বাক্যের ৩য় অধ্যায়ের ১১ আয়াতে যীশুর কথাটি নিম্নরূপ: "আমি শীঘ্র আসিতেছি।"

প্রকাশিত বাক্যের ২২ অধ্যায়ে যীশুর কথাগুলি নিম্নরূপ : "৭ আর দেখ, আমি শীঘ্রই আসিতেছি। .. ১০ তুমি এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল মুদ্রাঙ্কিত করিও না; কেননা সময় সন্নিকট। .. ২০ আমি শীঘ্র আসিতেছি।"

১. এই অনুবাদটি বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত 'ইঞ্জিল শরীফ' থেকে নেওয়া। অনুবাদটি মুল ইংরেজি পাঠের নিকটবর্তী। 'পবিত্র বাইবেল'-এর অনুবাদটি এখানে অস্পষ্ট।

এই কথাগুলির অবস্থা পাঠক আগেই জানতে পেরেছেন। যীশু খৃষ্টের এ সকল কথার উপর নির্ভর করে প্রথম প্রজন্মের খৃস্টানগণ বিশ্বাস করতেন যে, যীশু তাদের যুগেই পুনরাগমন করবেন এবং কেয়ামত ও শেষ বিচার অতি সন্নিকটে। তারা বিশ্বাস করতেন যে, তারা যুগের শেষ প্রান্তে বাস করছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে পাঠক জানতে পারবেন যে, খৃস্টান ধর্মগুরু পণ্ডিতগণ একথা স্বীকার করেন যে, প্রথম প্রজন্মের খৃস্টানগণ এইরূপই বিশ্বাস করতেন।[১] তাঁরা তাদের বিভিন্ন লেখালেখি ও আলোচনার মধ্যে এ কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের নিম্নের বক্তব্যগুলি থেকে পাঠকের নিকট তা স্পষ্ট হবে।

ভুল-৬৯-৭৫

১. যাকোবের পত্রের ৫ম অধ্যায়ের ৮ম আয়াতটি নিম্নরূপ: "তোমরাও দীর্ঘসহিষ্ণু থাক, আপন আপন হৃদ সুস্থির কর, কেননা প্রভুর আগমন সন্নিকট।"

২. পিতরের প্রথম পত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ৭ম আয়াতটি নিম্নরূপ: "এখন সমস্ত কিছুর শেষ সময় নিকটে আসিয়াছে (কিন্তু সকল বিষয়ের পরিণাম সন্নিকট)।"[২]

৩. যোহনের প্রথম পত্রের ২য় অধ্যায়ের ১৮ আয়াতটি নিম্নরূপ: "শিশুগণ, শেষকাল উপস্থিত।"

৪. থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের ১ম পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে; "১৫ কেননা আমরা প্রভুর বাক্য দ্বারা তোমাদিগকে ইহা বলিতেছি যে, আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকিব, আমরা কোন ক্রমেই সেই নিদ্রাগত লোকদের অগ্রগামী হইব না। ১৬ কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনিসহ, প্রধান দূতের রবসহ, এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্যসহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে তাহারা প্রথমে উঠিবে। ১৭ পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব; আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব।"

৫. ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ৫ম আয়াত নিম্নরূপ: "প্রভু নিকটবর্তী।"

৬. করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্রের ১০ অধ্যায়ের ১১ আয়াত নিম্নরূপ: "আমাদের, যাহাদের উপরে যুগকলাপের অন্ত আসিয়া পড়িয়াছে (and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come.)।"

---

১. তারা বিশ্বাস করতেন যে, শিষ্য যোহনের মৃত্যুর পূর্বেই কেয়ামত হবে এবং যীশু বিচারাসনে বসে সবাইকে বিচার করবেন।

২. প্রথম অনুবাদ 'ইঞ্জিল শরীফ' থেকে নেওয়া।

৭. এই পত্রেরই ১৫ অধ্যায়ে রয়েছে ঃ "৫১ দেখ, আমি তোমাদিগকে এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি; আমরা সকলে নিদ্রাগত হইব না, কিন্তু সকলে রূপান্তরীকৃত হইব; ৫২ এক মুহূর্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে, শেষ তূরীধ্বনিতে হইবে; কেননা তূরী বুঝিবে, তাহাতে মৃতেরা অক্ষয় হইয়া উত্থাপিত হইবে, এবং আমরা রূপান্তরীকৃত হইব।"[১]

প্রথম প্রজন্মের খৃস্টানদের বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা উপরে যা বলেছি তা এই ৭টি বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো। তাদের জীবদ্দশাতেই কেয়ামত (পুনঃসৃষ্টি) হবে এবং যীশু এসে যাবেন, এই ছিল তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা কোনরূপ ঘোরপ্যাঁচ বা ব্যাখ্যা ছাড়াই স্পষ্ট ও প্রকাশ্য অর্থে এই কথাগুলি বলেছেন। আর এভাবে এগুলি সবই ভুল। এভাবে আমরা এখানে ৭টি ভুল বা অসত্য তথ্য দেখতে পাচ্ছি।

ভুল-৭৬, ৭৭, ৭৮

মথিলিখিত সুসমাচারের ২৪ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মথি জৈতুন পর্বতের উপর বসে ছিলেন। তখন তাঁর শিষ্যগণ তাঁর নিকট যেয়ে, যে সময়ে ধর্মধাম (যিরূশালেমের মন্দির) ধ্বংস হবে, যীশুর পুনরাগমন ঘটবে এবং কেয়ামত বা যুগান্তর ঘটবে সেই সময়ের চিহ্ন জানতে চান। তখন তিনি এই তিনটি বিষয়েরই চিহ্ন বর্ণনা করেন। প্রথমে তিনি ধর্মধামের বিনষ্ট হওয়ার সময়ের বর্ণনা প্রদান করেন। অতঃপর বলেন: ধর্মধাম ধ্বংস হওয়ার পরপরই কোনরূপ বিরতি ছাড়াই আমার অবতরণ ঘটবে এবং যুগ শেষ হবে বা কেয়ামত হবে।

এভাবে এই অধ্যায়ের ২৮ আয়াত পর্যন্ত ধর্মধাম বিনষ্ট হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। ২৯. আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত কেয়ামত ও যীশুর পুনরাগমনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পালস, স্টার ও অন্যান্য খৃস্টান ধর্মগুরু পণ্ডিত এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। এই অধ্যায়টি আগাগোড়া পাঠ করলে এইরূপই বুঝা যায়। কেউ যদি এর বিপরীত ব্যাখ্যা করেন তাহলে তা ভুল হবে এবং গ্রহণযোগ্য হবে না।[২]

এই অধ্যায়ের কিছু আয়াতের অনুবাদ নিম্নরূপ:

"২৯ আর সেই সময়ের ক্লেশের পরেই (Immediately after the tribulation of those days) সূর্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না, আকাশ হইতে তারাগণের পতন হইবে ও আকাশমণ্ডলের পরাক্রম সকল বিচলিত হইবে। ৩০ আর তখন মনুষ্য পুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে, আর তখন পৃথিবীর সমুদয় গোষ্ঠী বিলাপ করিবে, এবং মনুষ্যপুত্রকে আকাশীয় মেঘরথে পরাক্রম ও মহাপ্রতাপে আসিতে দেখিবে। ৩১

১. অর্থাৎ আমরা মরব না; বরং যীশুর আগমনে কেয়ামত হবে, মৃতরা পুনরুত্থিত হবে এবং আমরা মৃত্যু ছাড়াই রূপান্তরিত হয়ে স্বর্গে প্রবেশ করব।

২. ইংরেজি বাইবেলে (KJV/AV) এভাবেই শিরোনাম লেখা হয়েছে।

আর তিনি মহা তূরীধ্বনি সহকারে আপন দূতগণকে (ফিরিশতাগণকে) প্রেরণ করিবেন; তাঁহারা আকাশের এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্যন্ত চারি বায়ু হইতে তাঁহার মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন।.. ৩৪ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই কালের লোকদের (this generation) লোপ হইবে না, যে পর্যন্ত না এ সমস্ত সিদ্ধ হয়। ৩৫ আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না।"

এই কথাগুলি সত্য হলে ধর্মধাম ও যিরূশালেমের বিধ্বংস হওয়ার পরপরই[১] কোনরূপ বিরতি ছাড়াই যীশুর পুনরাগমন ও অবতরণ ঘটতে হবে। "আর সেই সময়ের ক্লেশের পরেই (Immediately after the tribulation of those days)" থেকে এ কথাই বুঝা যায়। এছাড়া এই বক্তব্য থেকে একথাও জানা যায় যে, ধর্মধামের বিধ্বংস হওয়া, যীশুর অবতরণ ও যুগের সমাপ্তি বা কেয়ামত তিনটি বিষয়ই যীশুর সমসাময়িক মানুষেরা স্বচক্ষে দেখবেন। এই তিনটি বিষয় সংঘটিত হওয়ার আগে সেই যুগের মানুষদের বা সেই প্রজন্মের লোপ হবে না। কারণ এই তিনটি বিষয় সংঘটিত হওয়ার আগেই যদি সেই কালের লোকদের লোপ হয় তাহলে যীশুর বাক্যের লোপ হবে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যীশুর বাক্য বাস্তবায়িত না হয়ে লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হয়নি। যে সত্য তিনি বলেছিলেন তা মিথ্যায় পরিণত হয়েছে (না'উযু বিল্লাহ[২])।

মথি এখানে যে কথাগুলি লিখেছেন, মার্ক তাঁর সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ে এবং লূক তাঁর সুসমাচারের ২১ অধ্যায়ে সে কথাগুলি লিখেছেন। এভাবে তিন সুসমাচার লেখকই এই ভুল তথ্য লিখেছেন। এভাবে তিন সুসমাচারে তিনটি ভুল পাওয়া গেল।

ভুল-৭৯, ৮০, ৮১

মথিলিখিত সুসমাচারের ২৪ অধ্যায়ের ২য় আয়াতে (যিরূশালেমের মন্দিরের বা ধর্মধামের বিধ্বংস হওয়ার বিষয়ে) যীশু বলেন: "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই স্থানের একখানি পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকিবে না, সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে।"

যীশুর এই কথার ভিত্তিতে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ বলেন যে, শলোমনের মন্দির বা ধর্মধামের (মসজিদুল আকসার) ভিত্তির স্থানে কোন ভবন অবশিষ্ট থাকবে না। যখন সেখানে কোন কিছু বানানো হবে তখনই তা যীশুর কথা অনুসারে ধ্বংস ও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

১. যীশুর শিষ্যগণ ও প্রথম প্রজন্মের খৃস্টানদের জীবদ্দশাতেই ৭০ খৃস্টাব্দে রোমন সম্রাট টিটাস ধর্মধামসহ যিরুশালেম ধ্বংস করেন। ইহূদীদের বারংবার বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে, এর প্রায় ৭০ বছর পরে, ১৩৬ খৃস্টাব্দে রোমান সম্রাট হার্ডিয়ান (Hadrian) যিরূশালেম ও ধর্মধাম ধুলিস্যাত ও নিশ্চিহ্ন করেন। তিনি ইহূদীদের ধর্মধাম বা মন্দিরের স্থানে জুপিটার ও ভেনাস দেবীর মন্দির স্থাপন করেন এবং যিরুশালেমের নাম পরিবর্তন করে Ilea Capitolia রাখেন। প্রথম প্রজন্মের খৃস্টানগণ এ সময়ে যীশুর আগমনের অপেক্ষা করতেন।

২. এখানে যীশুর কথাকে মিথ্যা বলা উদ্দেশ্য নয় বরং যীশুর কথা উদ্ধৃত করতে সুসমাচার লেখকগণ যে বিকৃতি, ভুল ও অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য।

'তাহকীকু দীনিল হক' বা 'সত্য ধর্মের সন্ধান' নামক গ্রন্থের লেখক[১] দাবি করেছেন যে, যীশুর এই কথাটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যৎ-বাণী ছিল। তিনি ১৮৪৬ সালে মুদ্রিত তাঁর পুস্তকের ৩৯৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "সম্রাট জুলিয়ান (Julian the Aopstate)[২] খৃষ্টের ৩০০ বছর পরে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন। তিনি যীশুর এই ভবিষ্যৎ-বাণী বাতিল করার জন্য যিরূশালেমের মন্দির বা ধর্মধামকে পুনরায় নির্মাণের চেষ্টা করেন। যখন তিনি নির্মাণ কাজ শুরু করেন তখন মন্দিরের ভিত্তির মধ্য থেকে আগুন নির্গত হয়। এতে রাজমিস্ত্রিগণ ভয়ে পালিয়ে যায়। এরপর আর কেউ যীশুর কথাকে প্রত্যাখ্যান করতে সাহস পায়নি, যিনি বলেছেন: 'আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না'।"

পাদ্রী ড. কীথ খৃষ্ট ধর্মের বিরোধীদের বিরুদ্ধে ইংরেজি ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পাদ্রী ম্রীক গ্রন্থটিকে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তিনি গ্রন্থটির নামকরণ করেছে: "কাশফুল আছার ফী কাসাসি আনবিয়াই বানী ইসরাঈল" (ইস্রায়েল সন্তানদের ভাববাদিগণের কাহিনী)। ১৮৪৬ সালে বইটি (স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী) এডিনবার্গে মুদ্রিত হয়েছে। আমি এখানে তাঁর কথার অনুবাদ উদ্ধৃত করছি। তিনি ৭০ পৃষ্ঠায় বলেন: "রাজাধিরাজ জুলিয়ান ইহূদীদেরকে অনুমতি ও দায়িত্ব প্রদান করেন যিরূশালেমের ও ধর্মধাম নির্মাণের জন্য। তিনি তাদেরকে তাদের পিতৃভূমিতে বসবাসের সুযোগ দিবেন বলে ওয়াদা করেন। আর এ বিষয়ে ইহূদীদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা রাজাধিরাজের চেয়ে মোটেও কম ছিল না। কিন্তু যেহেতু বিষয়টি ছিল যীশুর বচনের বিপরীত সেহেতু তা সম্ভব হয়নি। যদিও ইহূদীরা অত্যন্ত আগ্রহী ও সচেষ্ট ছিল এবং সম্রাট তাদের প্রতি মনোযোগী ছিলেন এবং সহায়তা করছিলেন, তবুও যীশুর বাক্যের বিরোধিতা সম্ভব হয়নি। পৌত্তলিক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, এই স্থান থেকে ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখা বের হয়ে রাজমিস্ত্রিদেরকে পুড়িয়ে দেয়। তখন তারা কাজ বন্ধ করে দেয়।"

এ কথাটি ভুল। তেমনিভাবে নিম্নের তথ্যটিও ভুল।

টমাস নিউটন বাইবেলের মধ্যে উল্লিখিত ভবিষ্যৎ-বাণীগুলির ব্যাখ্যায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৮০৩ সালে লন্ডনে মুদ্রিত হয়েছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৩-৬৪ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন; "উমার ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা। তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজয়ী

---

১. পাদরী মি. স্মিথ। তিনি ড. ফানডারের সমসাময়িক একজন প্রচারক পাদরী।

২. রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন (৩২৩-৩৩৭) খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং একে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেন। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রায় ২৫ বছর রোমান সাম্রাজ্য অস্থিরতা ও ক্ষমতার কোন্দলের মধ্যে থাকে। এরপর তাঁরই বংশধর জুলিয়ান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি ৩৩১ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ৩৬১ থেকে ৩৬৩ তিন বছর রাজত্ব করেন। তিনি খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় প্রাচীন রোমান পৌত্তলিক ধর্ম গ্রহণ করেন এবং রোমান ধর্মের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন এবং প্রাচীন রোমান মন্দিরগুলি পুনর্নির্মাণ করেন।

ছিলেন। তিনি সমগ্র ভূপৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়ে ছিলেন।[১] তাঁর খেলাফত-কাল ছিল মাত্র সাড়ে দশ বছর। এই সময়ের মধ্যে তিনি সমগ্র আরব, সিরিয়া, পারস্য ও মিসর অধিকার করেন। তাঁর সেনাবাহিনীর যিরূশালেম অবরোধ করে। তিনি নিজে সেখানে আগমন করেন। দীর্ঘ অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে যিরূশালেমের খৃষ্টানগণ আত্মসমর্পণ করেন। তারা শহরটি সমর্পণ করেন। খলীফা তাদেরকে সম্মানজনক শর্ত প্রদান করেন। তিনি তাদের একটি গীর্জাও ছিনিয়ে নেননি বরং বিশপের নিকট মসজিদ তৈরির একটি স্থানের বিষয়ে জানতে চান। বিশপ তাঁকে যাকোবের প্রস্তর[২] এবং শলোমনের ধর্মধামের স্থান প্রদর্শন করেন। ইহূদীদের বিরোধিতার জন্য খৃষ্টানগণ সেই স্থানটিকে মল, গোবর ইত্যাদি দিয়ে ভরে রেখেছিল। তখন উমার নিজেই সেই স্থান পরিষ্কার করতে শুরু করেন। তখন তাঁর সেনাবাহিনীর বড় বড় কর্মকর্তা পরিষ্কার করার কাজে তাঁর অনুসরণ করেন যা ছিল আল্লাহর ইবাদত। এরপর উমার সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি ছিল সেই মসজিদ যা যিরূশালেমে প্রথম নির্মিত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন যে, জনৈক ক্রীতদাস উমারকে এই মসজিদের মধ্যে হত্যা করে।[৩] দ্বাদশ খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান এই মসজিদকে প্রশস্ত করেন।"

এই ব্যাখ্যাকারের কথার মধ্যে যদিও অনেক ভুল রয়েছে, তবে সেখান থেকে আমরা জানতে পারছি যে, উমার (রা) প্রথমে শলোমনের ধর্মধামের স্থানেই মাসজিদুল আকসা নির্মাণ করেন। পরে আবদুল মালিক তা প্রশস্ত করেন। এই মসজিদটি এখনো বিদ্যমান। এর নির্মাণের পরে ১২০০ বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এভাবে তাদের কথামতই যীশুর কথা লোপ পেয়েছে, কিন্তু আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হয় নি।

১. খৃষ্টান পণ্ডিতের নিরপেক্ষতার নমুনা দেখুন। তিনি এখানেই উল্লেখ করছেন যে, খৃষ্টানগণ ইহূদীদের উপর অত্যাচার করত এবং ইহূদীদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য ধর্মধামের স্থানে ঘৃণিত নোংরা ময়লা আবর্জনা রাখত। পক্ষান্তরে উমার পরাজিত খৃষ্টানদেরকে উপযুক্ত সম্মান প্রদান করে যিরূশালেম দখল করেন। তিনি তাদের একটি গীর্জাও দখল করেন নি বা অসম্মান করেন নি। সাথে সাথে তিনি ইহূদীদেরকেও সম্মান করেন এবং নিজে হাতে ধর্মধামের স্থান পরিষ্কার করেন। এত কিছুর পরেও তাঁর সম্পর্কে এই লেখক বলছেন যে, তিনি সমগ্র পৃথিবীতে অশান্তি ছড়িয়েছেন! তাঁর অপরাধ ছিল একটিই। তিনি অত্যাচারী খৃষ্টান পাদরী ও বর্বর রোমান সম্রাটদেরকে ইচ্ছামত শান্তিতে অত্যাচার ও শোষণ করার সুযোগ দেন নি।

২. যাকোবের প্রস্তরের বিষয়ে দেখুন: আদি পুস্তক ২৮/১০-২২, ৩৫/৩-১৫।

৩. প্রাচ্যবিদের সততা ও পাণ্ডিত্যের নমুনা দেখুন। সকলেই জানেন যে, উমার (রা) মদীনায় মসজিদে নববীর মধ্যে আহত হন। কিন্তু পণ্ডিত নিউটন তাঁকে যিরূশালেমে নিয়ে গেলেন। সম্ভবত তিনি এই মিথ্যাচারের মাধ্যমে ইঙ্গিত করতে চাচ্ছেন যে, যিশুর বচন লঙ্ঘন করে উমার ধর্মধামকে নির্মাণ করার ফলে সেখানেই শাস্তি পেয়েছিলেন!

মথি ২৪ অধ্যায়ের ২ আয়াতে ধর্মধামের ধ্বংস হওয়ার বিষয়ে উপরে উদ্ধৃত যীশুর যে বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন, একই বক্তব্য মার্ক তাঁর সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ের ২ আয়াতে এবং লূক তাঁর সুসমাচারের ২১ অধ্যায়ের ৬ আয়াতে উদ্ধৃত করেছেন। আর কথাটি যেহেতু অসত্য বলে প্রমাণিত হলো, সেহেতু এখানে তিন সুসমাচারে তিনটি ভুল পাওয়া গেল।

ভুল-৮২

মথি তাঁর সুসমাচারের ১৯ অধ্যায়ের ২৮ আয়াতে লিখেছেন: "যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যত জন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছ, পুনঃসৃষ্টিকালে, যখন মনুষ্যপুত্র আপন প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে।"

এখানে যীশু তাঁর ১২ জন শিষ্যের মুক্তি ও সফলতার সাক্ষ্য প্রদান করলেন এবং তারা ১২ জন যে ১২টি সিংহাসনে বসবেন তার সাক্ষ্য প্রদান করলেন।

এই কথাটি ভুল। কারণ, এই ১২ জনের একজন ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা। খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে তিনি ধর্মত্যাগ করেন এবং ধর্মত্যাগী ও নরকবাসীরূপেই মৃত্যু বরণ করেন। কাজেই তার পক্ষে তো আর ১২শ সিংহাসনে বসা সম্ভব হবে না।

ভুল-৮৩

যোহনলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ৫১ আয়াতটি নিম্নরূপ: "আর তিনি (যীশু) তাঁহাকে (নথনেলকে) কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, {এখন হইতে}[1] তোমরা দেখিবে, স্বর্গ খুলিয়া গিয়াছে, এবং ঈশ্বরের দূতগণ মনুষ্যপুত্রের উপর দিয়া উঠিতেছেন ও নামিতেছেন।"

এই কথাটি ভুল। যোহন বাপ্তাইজকের নিকট বাপ্তাইজের ঘটনার সময়ে যীশুর উপর পবিত্র আত্মার নামিয়া আসার ঘটনার পরে যীশু এই কথাটি বলেছিলেন। আর এই কথা বলার পরে কেউই কখনো দেখেন নি যে, "স্বর্গ খুলিয়া গিয়াছে, এবং ঈশ্বরের দূতগণ যীশুর উপর দিয়া উঠিতেছেন ও নামিতেছেন।" আমি একথা বলছি না যে, কেউ কখনো ঈশ্বরের দূত বা ফিরিশতার অবতরণ করতে দেখেননি। তবে আমি এ কথা বলছি যে, এখানে উল্লিখিত দুইটি বিষয় একত্রে কেউই কখনো দেখেন নি। যীশু কর্তৃক এই কথা বলার পরে কেউ দেখেন নি যে, স্বর্গ বা আকাশ খুলে রয়েছে এবং ঈশ্বরের দূতগণ বা ফিরিশতাগণ যীশুর উপরে উঠছেন ও নামছেন।

ভুল-৮৪

যোহনের সুসমাচারের ৩য় অধ্যায়ের ১৩ আয়াত নিম্নরূপ: "আর স্বর্গে কেহ উঠে নাই; কেবল যিনি স্বর্গ হইতে নামিয়াছেন, সেই মনুষ্যপুত্র, যিনি স্বর্গে থাকেন।"

---

১. আরবী ও ইংরেজি বাইবেলে 'এখন হইতে' বাক্যাংশটি রয়েছে। বাংলা অনুবাদে তা নেই।

এই কথাটিও ভুল। কারণ হনোক (Enoch: ইদরীস আ.) এবং ইলিয় (Eli'jah: আল-ইয়াসাআ.) উভয়ে স্বর্গে উত্থিত হয়েছেন এবং স্বর্গে গমন করেছেন বলে আদিপুস্তকের ৫ম অধ্যায়ে এবং ২ রাজাবলির দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

ভুল-৮৫

মার্কলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ের ২৩ আয়াতটি নিম্নরূপ : "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ পর্বতকে বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে।"

মার্কের সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ে রয়েছে: "আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্তী হইবে; তাহারা আমার নামে ভুত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে, তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।"

যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ের ১২ আয়াতটি নিম্নরূপ: "সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে , আমি যে সকল কার্য করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এ সকল হইতেও বড় বড় কার্য করিবে; কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি ..।"

প্রথম উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে: "যে কেহ এই পর্বতকে বলিবে .." এই কথাটি উন্মুক্ত ও সাধারণ এবং সকল যুগের সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমনকি এই কার্য সাধন করবার জন্য যীশুর প্রতি বিশ্বাসী হওয়াও শর্ত নয়।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে "যাহারা বিশ্বাস করে..: ।" এখানেও এই কথাটিকে যীশুর শিষ্যগণ বা প্রথম যুগের খৃস্টানদের জন্য বিশেষভাবে বলা হয়নি বরং সকল যুগের সকল 'বিশ্বাসীর' জন্যই বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে তৃতীয় উদ্ধৃতিতে "যে আমাতে বিশ্বাস করে" বলা হয়েছে, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ যুগকে নির্ধারণ করা হয়নি। এই ভবিষ্যৎবাণী বা বচনগুলিকে বিশেষ কোন যুগের মানুষদের জন্য বা প্রথম যুগের মানুষদের জন্য কথিত বলে মনে করা ভিত্তিহীন ও প্রমাণহীন কল্পনা বৈ কিছুই নয়।

অতএব এই বচনগুলি সত্য হলে যে কোন ব্যক্তি যদি পর্বতকে বলে, "উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়, এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে।" অনুরূপভাবে এই বচনগুলি সত্য হলে বর্তমান যুগেও যদি যীশু খৃস্টের প্রতি কারো বিশ্বাস থাকে তবে সে উপর্যুক্ত

১. আদিপুস্তক ৫/২৩-২৪; ২ রাজাবলি ২/১-১১।

অলৌকিক কার্যগুলি সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। শুধু তাই নয়, বর্তমান যুগেও যদি কেউ যীশুর প্রতি বিশ্বাসী হয় তবে সে যীশু যে সকল অলৌকিক কার্য করেছেন তদ্রূপ অলৌকিক কার্য এবং তার চেয়েও বড় বড় অলৌকিক কার্য করতে সক্ষম হবে।

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কখনোই সেই রূপ নয়। আমরা কখনোই শুনি নি যে, কোন একজন খৃস্টান যীশু খৃস্টের চেয়ে বড় কোন অলৌকিক কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথম প্রজন্মের খৃস্টানগণের মধ্য থেকেও কেউ এরূপ করতে সক্ষম হননি এবং পরবর্তীকালেও কেউ তা করতে পারেননি। কাজেই 'এমন কি, এ সকল হইতেও বড় বড় কার্য করিবে' এই বাক্যাংশটি নিঃসন্দেহে ভুল। কোন যুগের কোন খৃস্টানের মধ্যেই এর বাস্তবায়ন পাওয়া যায়নি। প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন যে, প্রথম প্রজন্মের খৃস্টানগণের পরে আর কারো থেকে কোন প্রকারের অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করার কোন সংবাদ কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হয়নি।

ভারতে আমরা দেখেছি যে, ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ধর্মগুরুগণ আমাদের উর্দু ভাষা শেখার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করছেন; তা সত্ত্বেও তারা এই ভাষায় শুদ্ধভাবে কথা বলতে পারেন না। তারা স্ত্রীলিঙ্গের স্থলে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করেন। এ হলো নূতন ভাষায় কথা বলার অবস্থা। আর ভূত ছাড়ানো, সাপ বহন করা, প্রণনাশক বিষ পান করা বা হস্তস্পর্শ দ্বারা পীড়িতদের সুস্থ করা তো অনেক দূরের কথা।

প্রকৃত সত্য কথা হলো, আমাদের সমসাময়িক 'খৃস্টানগণ' প্রকৃতপক্ষে 'যীশু খৃস্টের' প্রতি বিশ্বাসী নন। আর এ জন্যই এ সকল কর্ম করতে তারা সক্ষম নন। কোন কোন খৃস্টান ধর্মগুরু ও নেতা কখনো কখনো কিছু অলৌকিক কার্য সম্পাদনের বা অলৌকিক ক্ষমতার দাবি করেছেন বটে, কিন্তু বাস্তবে তারা তাদের দাবিতে মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হয়েছেন। আমি এখানে 'মিরআতুস-সিদ্‌ক' বা 'সত্যের দর্পণ' নামক বইটি থেকে প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের দুই ধর্মগুরুর অলৌকিক কার্য সম্পর্কে দুইটি ঘটনা উল্লেখ করছি। এই বইটিকে ক্যাথলিক পণ্ডিত পাদ্রী টমাস এঙ্গেলস ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫১ খৃস্টাব্দে বইটি মুদ্রিত হয়েছে। এই বইয়ের ১০৫, ১০৬ ও ১০৭ পৃষ্ঠায় লেখক লিখেছেন :

প্রথম ঘটনা : ১৬৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লুথার ইচ্ছা করেন যে, তিনি মেসিনার সন্তানদের ভূত ছাড়াবেন। কিন্তু ইহূদীরা ভূত ছাড়াতে চাইলে তাদের যে অবস্থা হয়েছিল বলে প্রেরিতদের কার্য বিবরণের ১৯ অধ্যায়ের ১৬ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, লুথারেরও সেই অবস্থা হলো। শয়তানটি (দুষ্ট আত্মাটি) লুথার ও তার সঙ্গীদের উপর লাফ দিয়ে পড়ে এবং তাদেরকে আহত ও ক্ষত-বিক্ষত করে। যখন স্টাফিলস দেখলেন যে, শয়তান তার গুরু লুথারের গলা টিপে ধরেছে এবং তাকে শ্বাসরুদ্ধ করতে চাচ্ছে, তখন তিনি পালাতে চাইলেন। কিন্তু ভয়ে হতবিহবল হওয়ার কারণে তিনি ঘরের তালা খুলতে অক্ষম হন। তখন তার খাদেম তাকে ঘুলঘুলি দিয়ে একটি

কুঠার এগিয়ে দেয়। তিনি কুঠারটি নিয়ে তা দিয়ে দরজা ভেঙ্গে পলায়ন করেন। এই ঘটনাটি 'স্টাফিলস-এর পূর্ণ ওজরখাহি' নামক গ্রন্থের ৪০৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনা : এই ঘটনাটির ঐতিহাসিক ব্রেসিক ওয়ায়েল সোরেস ক্যালভিনের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। লুথারের ন্যায় ক্যালভিনও ছিলেন প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের আরেক প্রধান নেতা। এই ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, ক্যালভিন ব্রোমিস নামক এক ব্যক্তিকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে তাকে বলেন যে, তুমি শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে মৃতের মত শুয়ে থাকবে। এরপর আমি এসে যখন বলব, হে মৃত ব্রোমিস! তুমি উঠ ও জীবিত হও, তখন তুমি নড়ে চড়ে উঠবে এবং উঠে দাঁড়াবে। মনে হবে যেন তুমি মৃত্যুবরণ করেছিলে এবং মৃত্যুর পরে পুনরায় বেঁচে উঠলে। ক্যালভিন ব্রোমিসের স্ত্রীকে বলেন যে, যখন আপনার স্বামী মৃতের ন্যায় শুয়ে পড়বে, তখন আপনি চিৎকার করে কাঁদাকাটি করবেন।

ব্রোমিস ও তার স্ত্রী এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করেন। তখন অনেক মহিলা ব্রোমিসের স্ত্রীর নিকট এসে কাঁদতে থাকে। তখন ক্যালভিন এসে ব্রোমিসের স্ত্রীকে বলেন, আপনি কাঁদবেন না, আমি তাকে জীবিত করে দিচ্ছি। এ কথা বলে তিনি কিছু প্রার্থনা ও মন্ত্র পাঠ করেন। এরপর ব্রোমিসের হাত ধরে ডেকে বলেন, আমাদের প্রভুর নামে উঠে পড়। কিন্তু তার এই কৌশল কোন কাজে লাগল না। কারণ ইতোমধ্যেই ব্রোমিস প্রকৃতপক্ষেই মৃত্যুবরণ করেছিল। তিনি তার এই ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে সত্যবাদীর সত্য অলৌকিক কর্মকে অপমানিত করতে চেয়েছিলেন। এজন্য ঈশ্বর ক্রোধান্বিত হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ক্যালভিনের প্রার্থনা ও মন্ত্রাদি কোনই কাজে আসল না। যখন ব্রোমিসের স্ত্রী এই অবস্থা দেখেন, তখন তিনি প্রবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং চিৎকার করে বলতে থাকেন যে, ক্যালভিনের সাথে চুক্তি ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার সময়ে আমার স্বামী জীবিত ছিলেন। আর এখন তিনি জড় পাথরের মত মৃত ও ঠাণ্ডা।

এখন পাঠক দেখুন, এই হলো এদের শ্রেষ্ঠতম নেতাদের অলৌকিক কর্মাদির অবস্থা। এই দুই নেতা তাদের যুগে সেইরূপই পবিত্র-পুরুষ বলে গণ্য ছিলেন যেরূপভাবে পৌল তাঁর নিজের যুগে পবিত্র-পুরুষ বলে গণ্য ছিলেন। তাদের অবস্থাই যদি এইরূপ হয় তাহলে তাদের অনুসারিগণের অবস্থা আর কিরূপ হতে পারে?

ভ্যাটিকানের পোপ সমগ্র ক্যাথলিক জগতের ধর্মগুরু। ক্যাথলিকগণ বিশ্বাস করেন যে, তিনি পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ক্যাথলিক জগতের গুরু ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি পোপ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার (১৫০৩ খৃ)[১] অন্যের জন্য প্রস্তুতকৃত বিষপান করে

১. ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৯২ সালে পোপ নির্বাচিত হন। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। নিষ্ঠুর ও দুর্নীতিগ্রস্থ বলে দুর্নাম অর্জন করেছিলেন। Thomas Bokenkotter, A Concise History of the Catholic Church (1977, Doubleday & Company, INC. Carden City, New York), pages 198-199; Geoffrey Barraclousgh, The Medieval Papacy (Thames and Hudson, London, 1975), pages 191, 196.

নিজেই মৃত্যুবরণ করেন।[১] এই যদি হয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধির অবস্থা, তবে তাঁর প্রজাগণের অবস্থা আর কি হবে?

এভাবে আমরা দেখছি যে, ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়ই উপর্যুক্ত অলৌকিক চিহ্নসমূহ থেকে বঞ্চিত।[২]

ভুল-৮৬

যীশুর বংশাবলি-পত্রে লূক তাঁর সুসমাচারের ৩য় অধ্যায়ের ২৭ আয়াতে লিখেছেন: "ইনি যোহানার পুত্র, ইনি রীষার পুত্র, ইনি সরুব্বাবিলের পুত্র, ইনি শল্টীয়েলের পুত্র, ইনি নেরির পুত্র।"

এই পংক্তিটির মধ্যে ৩টি ভুল রয়েছে।

প্রথম ভুল: ১ বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ে সরুব্বাবিলের পুত্রগণের নাম স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে রীষা নামে তার কোন পুত্রের নাম উল্লেখ করা হয়নি। উপরন্তু এই কথাটি মথির বক্তব্যেরও বিপরীত[৩]।

দ্বিতীয় ভুল : সরুব্বাবিল শল্টীয়েলের পুত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন পদায়ের পুত্র। হ্যাঁ, তিনি শল্টীয়েলের ভাতিজা ছিলেন।[৪]

তৃতীয় ভুল: শল্টীয়েলের পিতার নামে নেরি ছিল না. তার পিতার নাম ছিল যিকনিয় (যিহোয়াখীন)। মথি তা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন।[৫]

ভুল-৮৭

লূক তাঁর সুসমাচারের ৩য় অধ্যায়ে লিখেছেন: "ইনি শেলহের পুত্র, ইনি কৈননের পুত্র, ইনি অর্ফকষদের পুত্র"[৬]

এই কথাটি ভুল। কারণ, আদিপুস্তকের ১১ অধ্যায়ে এবং ১ বংশাবলির ১ম অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শেলহ নিজেই অর্ফকষদের পুত্র ছিলেন, তিনি অর্ফকষদের পৌত্র ছিলেন না।[৭]

---

১. 'প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না' যীশুর এই বচনটি যখন পোপের ক্ষেত্রেও খাটলো না, তাহলে আর কার জন্য খাটবে?

২. বাইবেলে উল্লিখিত যীশুর বচন সত্য হলে এদের বিশ্বাসের দাবি মিথ্যা। আর এদের বিশ্বাসের দাবি সত্য হলে বাইবেলের কথাটি মিথ্যা।

৩. মথি তাঁর বংশ তালিকায় উল্লেখ করেছেন যে, সরুব্বাবিলের পুত্রের নাম ছিল অবীহূদ। লূক লিখছেন যে, তার নাম ছিল রীষা। ১ বংশাবলি ৩/১৯-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরুব্বাবিলের ৫টি পুত্র ছিল, তাদের মধ্যে (রীষা) বা (অবীহূদ) নামে কোন পুত্র ছিল না।

৪. ১ বংশাবলি ৩/১৭-১৮।

৫. ১ বংশাবলি ৩/১৭ ও মথি ১/১২।

৬. লূক ৩/৩৬।

৭. আদিপুস্তক ১০/২৪: "আর অর্ফক্ষদ শেলহের জন্ম দিলেন।" আদিপুস্তক ১১/১২-১৪: "অর্ফক্ষদ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে শেলহের জন্ম দিলেন।" ১ বংশাবলি ১/১৮: "আর অর্ফক্ষদ শেলহের জন্ম দিলেন... ।"

তোরাহ ও পুরাতন নিয়মের গ্রন্থাবলির ক্ষেত্রে গ্রীক বা অন্য ভাষায় অনুদিত কোন সংস্করণে মধ্যে যদি মূল হিব্রু সংস্করণের বিপরীতে কোন তথ্য পাওয়া যায় তাহলে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অধিকাংশ প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত এ বিষয়ে একমত। কাজেই আদিপুস্তক ও বংশাবলির এ সকল স্পষ্ট বিবরণের বিপরীতে যদি কোন গ্রীক অনুবাদের মধ্যে শেলহের পিতা হিসাবে "কৈননের" নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে তাহলে তা এ সকল প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরুদের নিকটে যেমন গ্রহণযোগ্য হবে না, তেমনি তা মুসলমানদের নিকটও গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং আমরা বলব যে, খৃস্টানগণ নিজেদের সুসমাচারের বর্ণনাকে সঠিক বলে প্রমাণ করার জন্য অনুবাদের মধ্যে বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন।

ভুল-৮৮

লূকলিখিত সুসমাচারের ২য় অধ্যায়ে রয়েছে: "১ সেই সময়ে[১] আগস্ত কৈসরের (Caesar Augustus) এই আদেশ বাহির হইল যে, সমুদয় পৃথিবীর লোক নাম লিখিয়া দিবে। ২ সুরিয়ার শাসনকর্তা কুরীণিয়ের (Cyre'ni-us) সময়ে এই প্রথম নাম লেখান হয়।"

এই কথাটি ভুল। কারণ এখানে 'সমুদয় পৃথিবী' বলতে বাহ্যত সমুদয় রোমান সাম্রাজ্য বুঝানো হয়েছে। নইলে অন্তত সমুদয় যিহূদা রাজ্য বুঝানো হয়েছে। লূকের সমসাময়িক বা তাঁর সময়ের অব্যবহিত পূর্বের কোন রোমান ঐতিহাসিক তাঁর ইতিহাসে যীশুর জন্মের পূর্বের এই গণ-নামলিখন বা লোকগণনার কথা উল্লেখ করেন নি। লূকের অনেক পরে এসে যদি কোন ঐতিহাসিক এই ঘটনা উল্লেখ করেন, তবে তা স্বভাবতই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ ছাড়াই লূকের কথার উপর নির্ভর করে লিখেছেন।

এ সকল বিষয় বাদ দিলেও বড় কথা হলো, কুরণিয় (Cyre'ni-us) সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন যীশুর জন্মের ১৫ বছর পরে। তাহলে কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, যীশুর জন্মের পূর্বে তাঁর যুগে গণ-নামলিখন হয়েছিল?

লূক স্বীকার করেছেন যে, যিহূদিয়ার রাজা হেরোদের সময় সখরিয় (যাকারিয়া আ.)-এর স্ত্রী গর্ভবতী হন এবং এর ৬ মাস পরেই মরিয়ম গর্ভধারণ করেন। তাহলে কি মরিয়মের গর্ভ ১৫ বছর স্থায়ী হয়েছিল? এখানে সমন্বয় সাধন করতে না পেরে কোন কোন খৃস্টান পণ্ডিত বলেন যে, লূকের ২ অধ্যায়ের ২য় আয়াতটি লূকের লেখা নয়, পরবর্তী সময়ে কেউ তা বাড়িয়েছে।

ভুল-৮৯

লূকলিখিত সুসমাচারের ৩য় অধ্যায়ের ১ম আয়াতটি নিম্নরূপ : "তিবিরিয় কৈসরের (Tibe'ri-us Caesar) রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরে যখন পন্তীয় পীলাত (Pontius Pilate)

১. যীশুর জন্মের পূর্বে, যোহন বাপ্তাইজকের জন্মের সময়ে।

যিহূদিয়ার অধ্যক্ষ (governor), হেরোদ গালীলের রাজা, তাঁহার ভ্রাতা ফিলিপ যিতুরিয়া ও ত্রাখোনীতিয়া প্রদেশের রাজা, এবং লুষণিয় (Lysa'ni-as) অবিলীনীর (Abile'ne) রাজা... ।'

কোন কোন অনুবাদে 'আবিলীনী'-র পরিবর্তে 'আবিলীয়া' বলা হয়েছে। তবে উভয় অবস্থাতেই এই কথাটি ঐতিহাসিকগণের নিকট ভুল। পীলাত ও হেরোদের সমসাময়িক লুষণিয় নামক কোন ব্যক্তি কখনো অবিলীনীর বা অবিলীয়ার রাজা ছিলেন বলে কোন তথ্য তাদের কাছে প্রমাণিত হয়নি।

ভুল-৯০

লূকের সুসমাচারের ৩য় অধ্যায়ের ১৯ আয়াতটি নিম্নরূপ: "কিন্তু হেরোদ রাজা আপন ভ্রাতা ফিলিপের[১] স্ত্রী হেরোদিয়ার বিষয়ে ...তাঁহা কর্তৃক দোষীকৃত হইলে... ।"

এই কথাটি ভুল। ইতোপূর্বে ৫৬ নং ভুলের আলোচনায় পাঠক জানতে পেরেছেন যে, হেরোদিয়ার স্বামীর নামও ছিল 'হেরোডাস', তার নাম 'ফিলিপ' ছিল না।[২]

ভুল-৯১

মার্কলিখিত সুসমাচারের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১৭ আয়াতটি নিম্নরূপ: "কারণ হেরোদ আপন ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার নিমিত্ত আপনি লোক পাঠাইয়া যোহনকে ধরিয়া কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলেন... ।"

পাঠক পূর্বের আলোচনা থেকে জানতে পেরেছেন যে, এই কথাটিও ভুল। কারণ হেরোদের ভাইয়ের নাম ফিলিপ ছিল না। এখানে তিন সুসমাচার লেখকই এই ভুলটি করেছেন।[৩] এতে এই ভুলে ত্রিত্বের সংখ্যা পূর্ণ হয়েছে। বাইবেলের আরবী অনুবাদকগণ ১৮২১ সাল ও ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত সংস্করণে এখানে 'ফিলিপ' শব্দটি ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য অনুবাদকগণ তাদের পথ অনুসরণ করেননি। যেহেতু ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণের অভ্যাসই হলো নিজেদের সুবিধামত পবিত্র গ্রন্থের মধ্যে রদবদল করা, সেহেতু এই সামান্য পরিবর্তনের জন্য আমরা তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করছি না।[৪]

---

১. (ফিলিপ) শব্দটি বাংলা বাইবেলে উল্লেখ করা হয়নি। ইংরেজী পাঠ দেখুন: But Herod the tetrarch, being reproved by him for Hero'dias his brother philip's wife। আর বাংলা অনুবাদ: "কিন্তু হেরোদ রাজা আপন ভ্রাতার স্ত্রী হেরোদিয়ার বিষয়ে... ।"

২. ৫৬ নং ভুল ৯০ নং ভুল মূলত একই। দুইটি ভুল দুই সুসমাচারে রয়েছে বলে লেখক তাকে দুই স্থানে উল্লেখ করেছেন। প্রথমে তিনি মথির ভুলগুলি উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি লূকের ভুলগুলি উল্লেখ করছেন।

৩. মথি ১৪/৩; মার্ক ৬/১৭; লূক ৩/১৯।

৪. তাঁরা দাবি করেন যে, কোন কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে 'ফিলিপ' কথাটি নেই, এজন্য এ সকল অনুবাদে তাঁরা তা ফেলে দিয়েছেন। এই ওজরখাহি দ্বারা সমস্যা দূর হচ্ছে না। কারণ এতে জানা গেল যে, অনেক পাণ্ডুলিপিতে 'ফিলিপ' শব্দটি রয়েছে এবং অনেক পাণ্ডুলিপিতে তা নেই। এতে প্রমাণিত হলো যে, পবিত্র গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে নিজেদের ইচ্ছামত শব্দ যোগ করা বা ফেলে দেওয়া তাঁদের প্রাচীন রীতি।

ভুল-৯২, ৯৩, ৯৪

মার্কলিখিত সুসমাচারের ২ অধ্যায়ে রয়েছে: "২৫ তিনি (যীশু) তাহাদিগকে (ইহুদী ফরীশীগণকে) কহিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধিত হইলে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা কখনো পাঠ কর নাই? ২৬ তিনি ত অবিয়াথর মহাযাজকের সময়ে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে দর্শন-রুটী যাজকবর্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও ভোজন করা বিধেয় নয়, তাহাই ভোজন করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গিগণকেও দিয়াছিলেন।"

এই কথাটি ভুল। কারণ 'দর্শন-রুটী' ভোজন করার সময় দায়ূদ 'একা' ছিলেন, তাঁর সাথে অন্য কেউ ছিল না। কাজেই 'ও তাঁহার সঙ্গীরা' এবং 'সঙ্গিগণকেও দিয়াছিলেন' বাক্যাংশ দুইটি ভুল। এছাড়া এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট মহাযাজকের নাম ছিল 'অহীমেলক'। 'অবিয়াথর' এ সময়ে যাজক ছিলেন না। অবিয়াথর ছিলেন অহীমেলকের পুত্র। কাজেই 'তিনি ত অবিয়াথর মহাযাজকের সময়ে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া' বাক্যাংশটিও ভুল।

এভাবে আমরা দেখছি যে, মার্কের দুইটি পংক্তির মধ্যে ৩টি ভুল বিদ্যমান। খৃস্টান পণ্ডিতগণও তৃতীয় ভুলটিকে ভুল বলে স্বীকার করেছেন।[১]

এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আলোচ্যের ২৯ প্রমাণের আলোচনার মধ্যে পাঠক তা দেখতে পারবেন। এই তিনটি কথা যে ভুল তা জানা যায় ১ শমূয়েল-এর ২১ ও ২২ অধ্যায় থেকে।

ভুল-৯৫, ৯৬

লূকের সুসমাচারের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যীশুর এই বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেখানেও 'ও তাঁহার সঙ্গীরা' এবং 'সঙ্গিগণকেও দিয়াছিলেন' বাক্যাংশ দুইটি রয়েছে। পাঠক জানতে পেরেছেন যে, এই কথা দুইটি ভুল।

ভুল-৯৭

(যীশুর কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়ে শিষ্যদেরকে দেখা দেওয়ার বিষয়ে) করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্রের ১৫শ অধ্যায়ের ৫ম আয়াতটি নিম্নরূপ: "আর তিনি কৈফাকে, পরে সেই বারো জনকে দেখা দিলেন।"

'সেই বারো জনকে দেখা দিলেন' কথাটি ভুল। কারণ এই ঘটনার, অর্থাৎ যীশুর কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়ে শিষ্যদেরকে দেখা দেয়ার আগেই 'সেই বারো জনের একজন[২] ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা মৃত্যু বরণ করেছিল।[৩] কাজেই যীশুর ১১ জন শিষ্য তখন

---

১. প্রথম ও দ্বিতীয় ভুলের বিষয়ে তাঁদের কিছু ব্যাখ্যা ও ওজর আছে। কিন্তু তৃতীয় ভুলটি যে ব্যাখ্যার অযোগ্য ভুল তা তাঁরা স্বীকার করেছেন।

২. লূক ২২/৩।

৩. যীশুকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করার কিছু পরেই ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা মৃত্যুমুখে পতিত হয় বলে মথি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন। দেখুন মথি ২৭/১-১০।

অবশিষ্ট ছিলেন। আর এজন্য মার্ক তাঁর সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ে লিখেছেন [illegible] 'সেই এগার জন' -এর নিকট প্রকাশিত হন।[১]

ভুল-৯৮, ৯৯, ১০০

মথির সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে যীশুর কথা নিম্নরূপে উদ্ধৃত করা হয়েছে: [illegible] কিন্তু যখন লোকে তোমাদিগকে সমর্পণ করিবে, তখন তোমরা কিরূপে কি বলিবে, [illegible] বিষয়ে ভাবিত হইও না: কারণ তোমাদের যাহা বলিবার, তাহা সেই দণ্ডেই তোমাদিগকে দান করা যাইবে। ২০ কেননা তোমরা কথা বলিবে, এমন নয়, কিন্তু তোমাদের পিতার যে আত্মা তোমাদের অন্তরে কথা কহেন, তিনিই বলিবেন।"

লূকের সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "১১ আর লোকে যখন তোমাদিগকে সমাজগৃহে এবং শাসনকর্তাদের ও কর্তৃপক্ষদের সম্মুখে লইয়া যাইবে, তখন কিরূপে কি উত্তর দিবে, অথবা কি বলিবে, সে বিষয়ে ভাবিত হইও না; ১২ 'কেননা কি কি বলা উচিত, তাহা পবিত্র আত্মা সেই দণ্ডে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন।"

মার্কের সুসমাচারে ১৩ অধ্যায়েও এই কথাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।[২]

এইভাবে তিন সুসমাচার লেখক, যাঁদের সংখ্যা ত্রিত্ববাদীদের পবিত্র সংখ্যার সাথে মিলে গেল, সকলেই লিখছেন, যীশু তাঁর অনুসারীদেরকে ওয়াদা করেছেন যে, বিচারক বা শাসনকর্তাগণের নিকট তারা যা কিছু বলবেন তা তাদের বক্তব্য হবে না, বরং তা হবে পবিত্র আত্মার বক্তব্য।

এই কথাটি ভুল। প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ-এর ২৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "আর পৌল মহাসভার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, অদ্য পর্যন্ত আমি সর্ব বিষয়ে সৎসংবেদে ঈশ্বরের প্রজারূপে আচরণ করিয়া আসিতেছি। ২ তখন অননিয় মহাযাজক, তাহারা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগকে আজ্ঞা দিলেন, যেন তাঁহার মুখে আঘাত করে। ৩ তখন পৌল তাঁহাকে কহিলেন, হে শুক্লীকৃত ভিত্তি, ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করিবেন; তুমি ব্যবস্থা অনুসারে আমার বিচার করিতে বসিয়াছ, আর ব্যবস্থার বিপরীতে আমাকে আঘাত করিতে আজ্ঞা দিতেছ। ৪ তাহাতে যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা কহিল, তুমি কি ঈশ্বরের মহাযাজককে কটুবাক্য কহিতেছ? ৫ পৌল কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, আমি জানিতাম না যে, উনি মহাযাজক; কেননা লিখিত আছে, 'তুমি স্বজাতীয় লোকদের অধ্যক্ষকে দুর্বাক্য বলিও না'।"

সুসমাচার লেখকত্রয়ের উপরের উদ্ধৃতিগুলি যদি সত্য হতো তাহলে খৃস্টানদের পবিত্র পুরুষ পৌল ভুল করতেন না। সকল খৃস্টানই বিশ্বাস করেন যে, যীশুর সাথে আধ্যাত্মিক সাহচর্যের মধ্য দিয়ে পৌল যীশুর প্রেরিত শিষ্যগণের (Apostles) মর্যাদা লাভ করেন। পৌল নিজেই দাবি করেছেন যে, তিনি প্রেরিত-চূড়ামণি পিতরের চেয়ে কোন

১. মার্ক ১৬/১৪।
২. মার্ক ১৩/১১।

অংশে কম নন।[১] প্রটেস্ট্যান্টগণ বিশ্বাস করেন যে, পিতরকে কোনভাবে পৌলের উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। সেই 'প্রেরিত-চূড়ামণি' পবিত্র-ব্যক্তির এই ভুল প্রমাণ করে যে, উপরের কথাগুলি সঠিক নয়। পবিত্র-আত্মা কি ভুল করেন?

অচিরেই চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে পাঠক জানতে পারবেন যে, খৃষ্টান পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন যে, এই স্থানে ভুল হয়েছে। যেহেতু তিন সুসমাচারেই কথাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেহেতু ত্রিত্বের সংখ্যা অনুসারে এখানে তিনটি ভুল গণনা করা হলো।

ভুল-১০১, ১০২

লূকের সুসমাচারের ৪র্থ অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে এবং যাকোবের পত্রের ৫ম অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এলিয় ভাববাদীর সময়ে তিন বছর ছয় মাস কোন বৃষ্টিপাত হয় নি।

এই কথাটি ভুল। ১ রাজাবলির ১৮ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, তৃতীয় বছরেই বৃষ্টিপাত হয়েছিল।[২] যেহেতু এই কথাটি লূকের সুসমাচারে যীশুর বক্তব্য হিসাবে উদ্ধৃত এবং যাকোবের পত্রে যাকোবের বক্তব্য হিসাবে উদ্ধৃত সেহেতু তা দু'টি ভুল হিসাবে গণ্য।

ভুল-১০৩

লূকের সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, গাব্রিয়েল দূত (জিবরাঈল আ.) মরিয়মকে (আ.) যীশুর বিষয়ে বলেন: "আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন, তিনি যাকোব-কুলের উপরে যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন, ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না।"[৩]

এই কথাটি দু'টি কারণে ভুল:

প্রথম কারণ: মথির সুসমাচারে প্রদত্ত বংশতালিকা অনুসারে যীশু যিহোয়াকীমের বংশধর। আর যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকের ৩৬ অধ্যায়ে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিহোয়াকীমের বংশের কেউ দায়ূদের সিংহাসনে উপবেশন করতে পারবে না।[৪]

দ্বিতীয় কারণ: যীশু এক মুহূর্তের জন্যও দায়ূদের সিংহাসনে বসেন নি। যাকোব-কুলের উপর কখনোই তিনি রাজত্ব করেননি বরং যাকোব কুলের মানুষেরা তাঁর বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে তাঁকে বন্দি করে পীলাতের সিংহাসনের সামনে উপস্থিত করে। পীলাত তাঁকে আঘাত করেন, অপমানিত করেন এবং যাকোব-কুলের হাতে তাঁকে সমর্পণ করেন। তখন যাকোব-কুলের মানুষেরা তাঁকে ক্রুসে হত্যা করে।

১. ২ করিন্থীয় ১১/৫; ১২/১১।
২. ১ রাজাবলি ১৮/১, ৪৫।
৩. লূক ১/৩২-৩৩।
৪. যিরমিয় ৩৬/৩০।

শুধু তাই নয়, যোহনের সুসমাচারের ৬ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, যীশু রাজত্ব গ্রহণ বা রাজা হওয়ার ভয়ে পলায়ন করেছিলেন।[১] গাব্রিয়েল দূত যীশুর মতাকে তাঁর জন্মের পূর্বে যে সুসংবাদ প্রদান করলেন, তদনুসারে যে দায়িত্বের জন্য ঈশ্বর তাঁকে প্রেরণ করেছেন, সেই দায়িত্ব গ্রহণের ভয়ে তিনি পলায়ন করবেন তা কল্পনা করা যায় না।

ভুল-১০৪

মার্কের সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে রয়েছে : "যীশু বলিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এমন কেহ নাই, যে আমার নিমিত্ত ও সুসমাচারে নিমিত্ত বাটী কি ভ্রাতৃগণ কি ভগিনী কি মাতা কি পিতা কি {স্ত্রী}[২] কি সন্তানসন্ততি কি ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এখন ইহকাল তাহার শতগুণ না পাইবে; সে বাটী, ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা, সন্তান ও ক্ষেত্র, তাড়নার সহিত এই সকল পাইবে, এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন পাইবে।"[৩]

এ বিষয়ে লূকের সুসমাচারের ১৮ অধ্যায়ে রয়েছে: "আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, এমন কেহ নাই, যে ঈশ্বরের রাজ্যের নিমিত্ত বাটী কি স্ত্রী কি ভ্রাতৃগণ কি পিতামাতা সন্তানসন্ততি ত্যাগ করিলে ইহকাল তাহার বহুগুণ এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন না পাইবে।"

এই কথাটি ভুল। কারণ কোন কোন মানুষ ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য বা যীশুর জন্য বা সুসমাচারের জন্য তার একটি স্ত্রী ত্যাগ করলে সে কখনোই ইহকালে ১০০ স্ত্রী পেতে পারে না: কেননা তারা একজন স্ত্রীর অধিক বিবাহই বৈধ করেন না। আর যদি একথার অর্থ হয় যে, কেউ এই উদ্দেশ্যে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করলে বিবাহ ছাড়াই ইহকালে যীশুর প্রতি বিশ্বাসী ১০০ নারীকে লাভ করবে, তবে সে অর্থ আরো বেশি অশ্লীল ও বাতিল বলে গণ্য হবে।

এ ছাড়া প্রথম উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে, তাড়না বা অত্যাচারের সাথে সাথে তারা ইহকালে এইরূপ শতগুণ বাটী, স্ত্রী, সন্তানসন্ততি ও ক্ষেত্র লাভ করবেন। এখানে উদ্দেশ্য হলো, ঈশ্বরের জন্য ত্যাগের মহান পুরস্কার বর্ণনা করা। এখানে অত্যাচার ও বিপদাপদের উল্লেখের উদ্দেশ্য কি?

---

১. "তখন যীশু বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা আসিয়া রাজা করিবার জন্য তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত হইয়াছে, তাই আবার নিজে একাকী পর্বতে চলিয়া গেলেন"। যোহন ৬/১৫।

২. এখানে বাংলা বাইবেলে বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলা অনুবাদে 'স্ত্রী' কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। ইংরেজি পাঠ: no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife,, or children or land.. । বাংলা অনুবাদে সবই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু 'স্ত্রী' কথাটি উল্লেখ করা হয়নি। বাংলায় বলা হয়েছে; "বাটী কি ভ্রাতৃগণ কি ভগিনী কি মাতা কি পিতা কি সন্তানসন্ততি কি ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছে..।"

৩. মার্ক ১০/২৯-৩০।

ভুল-১০৫

যীশু কর্তৃক এক পাগল ব্যক্তি থেকে অশুচি-আত্মাগণকে (শয়তানদেরকে) বের করার ঘটনায় মার্কের সুসমাচারের ৫ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ "(সেই স্থানে পর্বতের পার্শ্বে এক বৃহৎ শূকর পাল চরিতেছিল।) সেই শয়তানগুলি (অশুচি আত্মাগুলি) সকলেই বিনতি করিয়া কহিল, (And all the devils besought him)[১] ঐ শূকরগুলির মধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগকে পাঠাইয়া দিউন। তিনি তাহাদিগকে অনুমতি দিলেন। তখন সেই অশুচি আত্মারা বাহির হইয়া শূকরদের মধ্যে প্রবেশ করিল: তাহাতে সেই শূকর-পাল, কমবেশ দুই হাজার শূকর, মহাবেগে দৌড়িয়া ঢালু পাড় দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িল এবং সমুদ্রে ডুবিয়া মরিল।"

এই কথাটি ভুল। প্রথমত, ইহুদী ধর্মে শূকর পালন করা হারাম ও নিষিদ্ধ। শূকর-ভোজী খৃস্টানগণের মধ্যেও সেই সময়ে এত বিশাল শূকর পালের মালিক কেউ ছিল না।[২] তাহলে এই বিশাল শূকর পালের মালিকগণ কারা ছিলেন এবং কোন্ জাতের মানুষ ছিলেন?

দ্বিতীয়ত, যীশুর পক্ষে তো সম্ভব ছিল যে, খৃস্টানগণের নিকট ছাগল বকরীর মতই পবিত্র এই বিপুল সংখ্যক শূকরকে বিনষ্ট না করে তিনি উক্ত উন্মাদ ব্যক্তির মধ্য থেকে অশুচি-আত্মাগুলিকে বের করে সমুদ্রে পাঠিয়ে দেবেন, অথবা সেই অশুচি আত্মাগুলি যেমন এক জন মানুষের মধ্যে ছিল, তেমনি তিনি তাদেরকে একটি শূকরের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। তাহলে তিনি শূকরের মালিকদেরকে এই বিশাল ক্ষতির মধ্যে ফেললেন কেন?

ভুল-১০৬

মথির সুসমাচারের ২৬ অধ্যায়ে ইহূদীদের প্রতি যীশুর বক্তব্য নিম্নরূপে উদ্ধৃত করা হয়েছে: "এখন অবধি তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘরথে আসিতে দেখিবে।"[৩]

এই কথাটি ভুল। কারণ ইহূদীগণ কখনোই যীশুকে পরাক্রমের (ঈশ্বরের) দক্ষিণ পার্শ্বে বসে থাকতে দেখে নি এবং কখনোই তাঁকে আকাশের মেঘরথে আসতে দেখে নি। যীশুর মৃত্যুর পূর্বেও নয় এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও নয়।

---

১. এখানে বাংলা বাইবেলে সংক্ষেপে করে 'শয়তানগুলি সকলে'র পরিবর্তে সংক্ষেপে 'তাহারা' বলা হয়েছে।

২. সে সময়ে যীশুর অনুসারিগণ ইহূদী শরীয়তের অনুসরণ করতেন এবং শূকর নিষিদ্ধ মানতেন।

৩. মথি ২৬/৬৪।

ভুল-১০৭

লূকের সুসমাচারের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে: "শিষ্য গুরু হইতে বড় নয়, কিন্তু যে কেহ পরিপক্ক হয়, সে আপন গুরুর তুল্য হইবে।"[১]

এই কথাটি বাহ্যত ভুল। কারণ, আমরা দেখতে পাই যে, মানব ইতিহাসে হাজার হাজার শিষ্য পরিপক্কতা লাভ করে নিজ গুরুর চেয়ে বড় হয়েছেন।

ভুল-১০৮

লূকের সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ে যীশুর নিম্নের বচনটি উদ্ধৃত করা হয়েছে: "যদি কেহ আমার নিকটে আইসে, আর আপন পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তানসন্ততি, ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীগণকে এমনকি, নিজ প্রাণকেও ঘৃণা না করে[২] তবে সে আমার শিষ্য হইতে পারে না।"

নিজ পিতামাতা ও আপনজনদেরকে ঘৃণা করতে শেখানোর এই নিয়মনীতিটি খুবই আশ্চর্যজনক। যীশুর মর্যাদার সাথে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তিনি নিজেই ইহূদীদেরকে নিন্দা করে বলেছেন: "কারণ ঈশ্বর বলিয়াছেন, 'তুমি আপন পিতাকে ও আপন মাতাকে সমাদর করিও; আর 'যে কেহ পিতার কি মাতার নিন্দা করে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে'।" তাহলে তিনি কিভাবে আপন পিতা ও মাতাকে ঘৃণা করতে বা অপ্রিয় জ্ঞান করতে শেখাবেন।

ভুল-১০৯

যোহনলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে; "৪৯ কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক জন কায়াফা[৩] সেই বছরের মহাযাজক, তাহাদিগকে কহিলেন, ৫০ তোমরা কিছুই বুঝ না, আর বিবেচনাও কর না যে, তোমাদের পক্ষে এটা ভাল, যেন প্রজাগণের জন্য এক ব্যক্তি মরে, আর সমস্ত জাতি বিনষ্ট না হয়। ৫১ এই কথা যে তিনি আপনা হইতে বলিলেন, তাহা নয়, কিন্তু সেই বৎসরের মহাযাজক হওয়াতে তিনি এই ভাববাণী বলিলেন যে, জাতির জন্য যীশু মরিবেন। ৫২ আর কেবল সেই জাতির জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের যে সকল সন্তান ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল, সেই সকলকে যেন একত্র করিয়া এক করেন, এই জন্য।"

---

১. লূক ৬/৪০।

২. ইংরেজি বাইবেলে hate not, বাংলা বাইবেলে 'অপ্রিয় জ্ঞান না করে।'

৩. কায়াফা ২৭ থেকে ৩৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ইহূদীদের মহাযাজক ও প্রধান ধর্মগুরু ছিলেন। এই পদটি মূলত আমৃত্যু হতো। তবে রোমান শাসকগণ ইহূদীদের মহাযাজক নিয়োগে ও অপসারণে হস্তক্ষেপ করত। যীশুকে বন্দি করা হলে কায়াফার নেতৃত্বে ইহূদী যাজকগণ একবাক্যে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের বিচার করেন। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। এজন্য যিরূশালেম ও যিহূদার রাজ্যের রোমান গভর্নর পীলাতের নিকট তাঁকে নিয়ে যান, যেন তিনি তাঁকে ক্রুসবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড প্রদানে সম্মত হন। এই মহাযাজক কায়াফাই পরবর্তী কালে যীশু শিষ্য যোহন ও পিতরের বিচার করেছিলেন ও শাস্তি প্রদান করেছিলেন।

বিভিন্ন কারণে এই কথাটি ভুল।

প্রথমত, যোহনের এই কথা থেকে বুঝা যায় যে, ইহূদীদের মহাযাজক হলেই তিনি ভাববাদী বা নবী হবেন। এই কথাটি সন্দেহাতীতভাবে বাতিল।

দ্বিতীয়ত, যদি কায়াফার এই কথাটি ভাববাণী হয় তাহলে বুঝা যাবে যে, যীশুর মৃত্যু হয়েছিল শুধু ইহূদীদের পাপ মোচনের জন্য, সমগ্র বিশ্বের পাপ মোচনের জন্য নয়। আর ত্রিতত্ত্ববাদী খৃষ্টানগণের বিশ্বাস এর বিপরীত। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, সুসমাচার লেখক কায়াফার কথার সাথে সংযুক্ত করেছেন যে, 'আর কেবল সেই জাতির জন্য নয়'..., কিন্তু তাঁর এই কথাটি ভাববাণীর অংশ নয়, বরং ভাববাণীর বিপরীত ও বাতিল বলে গণ্য।

তৃতীয়ত, যোহন স্বীকার করে নিলেন যে, কায়াফা একজন নবী বা ভাববাদী ছিলেন। যীশুকে যখন বন্দি করা হয় এবং ক্রুসবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়, তখন যোহন-স্বীকৃত এই ভাববাদীই মহাযাজক ছিলেন। তিনিই যীশুকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন, তাঁকে মিথ্যাবাদী ও ঈশ্বরের অবমাননাকারী অবিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁকে প্রহার করতে ও লাঞ্ছিত করতে রাজি হন।

মথিলিখিত সুসমাচারের ২৬ অধ্যায়ে রয়েছে : "৫৭ আর যাহারা যীশুকে ধরিয়াছিল তাহারা তাঁহাকে মহাযাজক কায়াফার কাছে লইয়া গেল... ৬৩ কিন্তু যীশু নীরব রহিলেন। মহাযাজক তাঁহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে জীবন্ত ঈশ্বরের নামে দিব্য দিতেছি, আমাদিগকে বল দেখি, তুমি কি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র? ৬৪ যীশু উত্তর করিলেন, তুমিই বলিলে; আরও আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এখন অবধি তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘরথে আসিতে দেখিবে। ৬৫ তখন মহাযাজক আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিলেন, এ ঈশ্বর-নিন্দা করিল, আর সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন? দেখ, এখন তোমরা ঈশ্বর নিন্দা শুনিলে: তোমাদের কি বিবেচনা হয়? ৬৬ তাহারা উত্তর করিয়া কহিল, এ মরিবার যোগ্য। ৬৭ তখন তাহারা তাঁহার মুখে থুথু দিল ও তাঁহাকে ঘুষি মারিল; আর কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার করিয়া কহিল..."

চতুর্থ সুসমাচার লেখক যোহন নিজেই তাঁর সুসমাচারের ১৮ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বলেছেন: "এবং (যীশুকে বন্দি করার পরে সৈন্যগণ) প্রথমে হাননের কাছে লইয়া গেল; কারণ যে কায়াফা সেই বছর মহাযাজক ছিলেন, ঐ হানন তাঁহার শ্বশুর। এ সেই কায়াফা, যিনি যিহূদিগণকে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, প্রজালোকদের (ইহুদীদের) জন্য এক জনের মরণ ভাল।"[১]

এখন আমার কথা হলো, যদি কায়াফার এই কথাটি ভাববাণী হয় এবং যোহন এ কথার যে অর্থ বুঝেছেন, তাই যদি সত্যিকার অর্থ হয় তাহলে কিভাবে কায়াফা যীশুকে

১. যোহন ১৮/১২-১৪।

হত্যা করার সিদ্ধান্ত প্রদান করলেন? কিভাবে তিনি তাঁকে মিথ্যাবাদী ও ঈশ্বরের নিন্দাকারী বলে ঘোষণা করলেন? তাঁর মুখে থুথু দেওয়া, তাঁকে ঘুষি মারা ও তাঁকে প্রহার করার বিষয়ে তিনি কিভাবে সন্তুষ্ট থাকলেন? কোন ভাববাদী কি তাঁর প্রভু ঈশ্বরের হত্যার নির্দেশ দিতে পারেন? যখন সেই ঈশ্বর তার ঈশ্বরত্বের দাবি করেন, তখন কি সেই ভাববাদী তাঁকে মিথ্যাবাদী ও ঈশ্বরের নিন্দাকারী বলতে পারেন? তিনি কি তাঁকে অপমান করতে পারেন?

নবী বা ভাববাদী যদি এ সকল ঘৃণিত কাজ করতে পারেন তবে সেই ভাববাদী ও ভাববাদিত্ব আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কোন নবী বা ভাববাদীর জন্য যদি এত জঘন্য কর্ম করা সম্ভব হয়, তবে একথাও তো হতে পারে যে, যীশুও একজন ভাববাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ধর্মের শিক্ষা পরিত্যাগ করে নিজের জন্য ঈশ্বরত্বের দাবি করেন (নাউযু বিল্লাহ!) এবং ঈশ্বরের নামে মিথ্যা কথা বলেন! এ কথা তো দাবি করার উপায় নেই যে, কায়াফা ভাববাদীর জন্য বিভিন্ন পাপ করা সম্ভব ছিল, অথচ যীশু সকল পাপের উর্ধ্বে ছিলেন। এখানে সত্য কথা হলো, এই ধরনের ফালতু ও ভিত্তিহীন কথা বলা যোহনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি ছিলেন এর উর্ধ্বে। যেমন যীশুর পক্ষে সম্ভব ছিল না যে, তিনি নিজের জন্য ঈশ্বরত্ব দাবি করবেন। তিনি এই ধরনের দাবির উর্ধ্বে ছিলেন। এগুলি সবই ত্রিত্ববাদীদের ভিত্তিহীন গালগল্প।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কায়াফা সত্যিই এই কথাটি বলেছিলেন, তাহলে তাঁর এই কথার সঠিক অর্থ হলো, যেহেতু যীশুর অনুসারিগণ যীশুকেই প্রতিশ্রুত মসীহ বা খৃষ্ট বলে মনে করছেন, এবং মানুষের বিশ্বাস হলো প্রতিশ্রুত মসীহ অবশ্যই ইহূদীদের এজন মহান রাজা হবেন, সেহেতু মহাযাজক ও ইহূদী জাতির নেতৃবর্গ ভয় পাচ্ছিলেন যে, এই কথাগুলি রোমান সম্রাটের নিকট পৌছলে তিনি ক্রোধান্বিত হবেন। ইহূদীরা নিজেদের জন্য স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করছে ভেবে তিনি তাদেরকে কঠিনভাবে পীড়ন ও দমন করবেন। এতে পুরো ইহূদী জাতি বিপদগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১] এমতাবস্থায় ইহূদীরা নিজেরাই যদি এই ব্যক্তিকে হত্যা করে এ সকল কথাবার্তা থামিয়ে দিতে পারে তবে এই এক ব্যক্তির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইহূদী জাতির সাধারণ মানুষেরা ধ্বংস ও অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবে।[২]

---

১. এর কিছুদিন পূর্বেই বাবিল রাজ নেবুকাদনেযার ও গ্রীক শাসক এন্টিয়ক কর্তৃক তারা চরমভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন। কাজেই এই ধরনের অত্যাচারের ভয়ে তারা খুবই ভীত ছিলেন।

২. গ্রন্থকার কায়াফার বক্তব্যের যে অর্থ বুঝেছেন এইটিই যে সঠিক অর্থ তার প্রমাণ রয়েছে যোহনের এই অধ্যায়ে কায়াফার এই বক্তব্যের পূর্বে প্রধান যাজকগণ ও ফরীশীগণের বক্তব্যে। তারা বলেন : "আমরা কি করি? এ ব্যক্তি ত অনেক চিহ্ন-কার্য করিতেছে। আমরা যদি ইহাকে এই রূপ চলিতে দিই, তবে সকলে ইহাতে বিশ্বাস করিবে; আর রোমীয়রা আসিয়া আমাদের স্থান ও জাতি উভয়ই কাড়িয়া লইবে।" যোহন ১১/৪৭-৪৮। তাদের এই কথার প্রেক্ষাপটে কায়াফা উপরের কথাটি বলেন।

তাহলে কায়াফার কথার অর্থ হলো, এভাবে এক ব্যক্তির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমগ্র ইহূদী জাতি রোমানদের অত্যাচার ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। কায়াফার কথার অর্থ এই নয় যে, এই ব্যক্তির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমগ্র ইহূদী জাতি আদি পাপ, অর্থাৎ যীশুর মৃত্যুর হাজার হাজার বছর পূর্বে আদম কর্তৃক নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণের পাপ থেকে বিমুক্ত হবে।

এই দ্বিতীয় অর্থ (যোহন যে অর্থ গ্রহণ করেছেন) একটি ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। ইহূদীরা কখনোই বিশ্বাস করত না যে, কোন একজন মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্য কোন মানুষ পাপমুক্ত হতে পারে (যে কথা ইহূদীরা কখনো বিশ্বাস করেনি বা কল্পনাও করেনি সে কথা ইহূদী মহাযাজক কিভাবে বলবেন?)।

সম্ভবত সুসমাচার লেখক তাঁর এই ভুলের বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন। এজন্যই পরবর্তী ১৮ অধ্যায়ে তিনি কায়াফার এই বক্তব্যকে 'ভাববাণী' না বলে 'পরামর্শ' বলেছেন। আর 'ভাববাণী' ও 'পরামর্শ'-এর মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। কায়াফার বক্তব্যকে 'পরামর্শ' বলে অভিহিত করে সুসমাচার লেখক ভাল কাজই করেছেন, তবে তিনি স্ববিরোধিতায় নিপতিত হয়েছেন।

ভুল-১১০

ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ৯ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "১৯ কারণ প্রজাসমূহের কাছে মোশি দ্বারা ব্যবস্থানুসারে সকল আজ্ঞার প্রস্তাব সাঙ্গ হইলে পর, তিনি জল ও সিন্দুরবর্ণ মেষলোম ও এসোবের সহিত গোবৎসদের ও ছাগদের রক্ত লইয়া পুস্তকখানিতে ও সমস্ত প্রজাবৃন্দের গাত্রে ছিটাইয়া দিলেন, ২০ কহিলেন, 'এ সেই নিয়মের রক্ত, যে নিয়ম ঈশ্বর তোমাদের উদ্দেশে আদেশ করিলেন। ২১ আর তিনি তাম্বুতে ও সেবাকার্যের সমস্ত সামগ্রীতেও সেইরূপে রক্ত ছিটাইয়া দিলেন।"

এই কথাটি তিন দিক থেকে ভুল:

প্রথম, এখানে 'গোবৎসদের ও ছাগদের রক্ত' ছিল না, শুধু 'বৃষদের' রক্ত ছিল।

দ্বিতীয়ত, এই সময়ে রক্ত ছিটানোর সময়ে রক্তের সাথে 'জল ও সিন্দুরবর্ণ মেষলোম ও এসোব' ছিল না বরং এ সময়ে মোশি শুধু রক্ত ছিটিয়ে দেন।

তৃতীয়ত, মোশি সেই রক্ত কখনোই 'পুস্তকখানিতে ও সেবাকার্যের সমস্ত সামগ্রীতে' ছিটিয়ে দেননি বরং তিনি অর্ধেক রক্ত বেদির উপরে ছিটিয়ে দেন এবং বাকি অর্ধেক লোকদের উপর ছিটিয়ে দেন।

এই সব কথাই যাত্রাপুস্তকের ২৪ অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে: "তখন মোশি আসিয়া লোকদিগকে সদাপ্রভুর সকল বাক্য ও সকল শাসন কহিলেন, তাহাতে সমস্ত লোক একস্বরে উত্তর করিল, সদাপ্রভু যে যে কথা কহিলেন, আমরা সমস্তই পালন করিব। ৪. পরে মোশি সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য লিখিলেন, এবং প্রত্যূষে উঠিয়া পর্বতের তলে এক যজ্ঞবেদি ও ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশানুসারে দ্বাদশ স্তম্ভ নির্মাণ করিলেন। ৫ আর তিনি ইস্রায়েল-সন্তানগণের যুবকদিগকে পাঠাইলে তারা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে হোমার্থক ও মঙ্গলার্থক বলিরূপে বৃষদিগকে বলিদান করিল। ৬ তখন মোশি তাহার

অর্ধেক রক্ত লইয়া থালে রাখিলেন, এবং অর্ধেক রক্ত বেদির উপরে প্রক্ষেপ করিলেন। ৭ আর তিনি নিয়মপুস্তকখানি লইয়া লোকদের কর্ণগোচরে পাঠ করিলেন; তাহাতে তাহারা কহিল, সদাপ্রভু যাহা যাহা কহিলেন, আমরা সমস্তই পালন করিব ও আজ্ঞাবহ হইব।৮ পরে মোশি সেই রক্ত লইয়া লোকদের উপরে প্রক্ষেপ করিয়া কহিলেন, দেখ, এ সেই নিয়মের রক্ত, যাহা সদাপ্রভু তোমাদের সহিত এই সকল বাক্য সম্বন্ধে স্থির করিয়াছেন।"

আমার ধারণা, এই পরিচ্ছেদের আলোচনা থেকে পাঠক যে সকল ভুল, অসত্য বা বিকৃত তথ্য ও বৈপরীত্যের কথা জানতে পারলেন, সেগুলির কারণেই রোমান ক্যাথলিক চার্চ সাধারণ খৃস্টানদেরকে 'পবিত্রপুস্তকগুলি' পাঠ করতে নিষেধ করত। রোমান ক্যাথলিক চার্চ বলত যে, এ সকল 'পবিত্রপুস্তক' পাঠ করলে যে কল্যাণ লাভ হবে, তার চেয়ে অকল্যাণ হবে বেশি। এ ক্ষেত্রে তাদের মতামত খুবই সঠিক। 'বাইবেল' বা 'পবিত্র পুস্তক' সাধারণের ব্যবহারের বাইরে থাকার ফলে বিরোধীদের কাছে এর দোষত্রুটিগুলি গোপন ছিল। প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের উদ্ভবের পরে তারা এ সকল গ্রন্থ জনসাধারণের পাঠের জন্য উন্মুক্ত ও প্রকাশ করে দিলেন, ফলে ইউরোপের দেশগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের ধর্মবিরোধী মতামত প্রকাশ পেতে লাগল।

খৃস্টান পণ্ডিতগণের 'পুস্তিকা এয়োদশ' নামে একটি সংকলন ১৮৪৯ সালে বৈরুতে প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের ৪১৭ ও ৪১৮ পৃষ্ঠায় ১৩ নং পুস্তিকাতে বলা হয়েছে; "এখন আমাদেরকে একটি আইন দেখতে হবে, যে আইনটি ট্রেন্ট-এর যাজকীয় মহাসমাবেশে (Council of Trent or Tridentine Council)[১] গৃহীত হয় এবং এই সমাবেশ শেষে পোপ কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়। এই আইনে বলা হয়েছে: "অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, যদি সকলেই তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় বাইবেল পাঠ করে তাহলে এর শুভফলের চেয়ে অশুভফল বেশি। এজন্য বিশপ ও অথবা ধর্মবিশ্বাস-পরিদর্শন কেন্দ্রের বিচারককে ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। তিনি পাদরী বা স্বীকারোক্তি-শিক্ষকের পরামর্শের ভিত্তিতে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন এবং যাদের সম্পর্কে তার ধারণা হবে যে, মাতৃভাষায় বাইবেল পাঠ করলে এরা লাভবান হবে, শুধু তাদেরকেই তিনি অনুমতি প্রদান করবেন। এই অনুমতি একজন ক্যাথলিক শিক্ষাগুরুর মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে এবং তা হাতে লেখা হতে হবে। কেউ যদি এইরূপ অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে বাইবেল পাঠ করার দুঃসাহস দেখায় তাহলে বাইবেলটি শাসনকর্তার নিকট ফিরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত কোনভাবেই তাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না।"

---

১. ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে মার্টিন লুথার খৃষ্টান ধর্মগুরু পোপের দুর্নীতি ও ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেন। ক্যাথলিক চার্চকে বাঁচানের জন্য পোপ তাঁর পক্ষের বিশপদের সম্মেলন আহবান করেন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে এই ইটালীর ট্রেন্ড নামক শহরে এই সম্মেলন শুরু হয়। কয়েক দফায় ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে এই সম্মেলন শেষ হয়। এই সম্মেলনে ক্যাথলিক চার্চকে রক্ষা করার জন্য অনেক সংস্কারমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেগুলি Tridentine Reformation নামে পরিচিত। বিস্তারিত দেখুন Thomas Bokenkotter, A concise History of the Catholic Church. pages 10, 222-236, 241-242, 349-350.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নতুন ও পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তকের সকল কথা ঐশ্বরিক প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ দ্বারা লিখিত হয়েছে বলে দাবি করার কোন সুযোগ ইহূদী -খৃস্টানগণের নেই

এই পুস্তকগুলি বা এগুলির সকল তথ্য ঐশী বাণী, ঈশ্বরিক প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ (ওহী, ইলহাম, Divine Inspiration, Revelation) বলে দাবি করলে তা নিঃসন্দেহে বাতিল বলে প্রমাণিত হবে। অগণিত বিষয় এই দাবির অসারতা প্রমাণ করে। আমি এখানে শুধু ১৭টি বিষয় উল্লেখ করছি।

১ম বিষয়

নতুন ও পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলিতে উল্লিখিত তথ্য ও বিবরণের মধ্যে অগণিত অর্থগত বৈপরীত্য রয়েছে। ইহূদী-খৃস্টান গবেষক, পণ্ডিত ও ভাষ্যকারগণ এ সকল বৈপরীত্যের কোন কোনটির ক্ষেত্রে স্বীকার করতে ব্যাধ্য হয়েছেন যে, দুই বা ততোধিক পরস্পর-বিরোধী বিবরণের একটি সত্য ও অন্যটি বা অন্যগুলি মিথ্যা। ইচ্ছাকৃত বিকৃতি অথবা অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে এই মিথ্যা তথ্যটি পরিবেশিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা এ সকল বৈপরীত্য ও পরস্পরবিরোধিতা সমন্বয়ের জন্য এমনসব অবাস্তব ও ফালতু কথা বলেছেন যা কোন স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেক গ্রহণ করতে পারে না। তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম অংশে পাঠক এইরূপ শতাধিক বৈপরীত্যের কথা জানতে পেরেছেন।

২য় বিষয়

এ সকল পুস্তকের মধ্যে অনেক ভুল ও অসত্য কথা রয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে পাঠক এইরূপ শতাধিক ভুল দেখেছেন। 'ঐশ্বরিক প্রেরণা' বা প্রত্যাদেশ (Divine Inspiration/ Revelation)-লব্ধ কথায় কখনো এইরূপ অর্থগত বৈপরীত্য ও ভুল থাকতে পারে না। ঐশী কথা ভুলের থেকে শত যোজন দূরে থাকবে।

৩য় বিষয়

এ সকল পুস্তকের অসংখ্য স্থানে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত বিকৃতি সাধিত হয়েছে। খৃস্টানদের জন্য কোন সুযোগ নেই এ সকল বিকৃতির কথা অস্বীকার করার[১]। একথা স্পষ্ট যে, এই বিকৃত তথ্যগুলিকে তারাও ঐশ্বরিক বা ঐশী বলে বিশ্বাস করেন না। ইনশাল্লাহ, পাঠক এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সকল বিকৃতির মধ্য থেকে ১০০টি বিকৃতির কথা বিস্তারিত জানতে পারবেন।

১. গ্রন্থকারের সাথে প্রকাশ্যে বিতর্কের সময় মাননীয় পাদ্রী ফান্ডার স্বীকার করেন যে, পুরাতন ও নতুন নিয়মের গ্রন্থগুলিতে ৪০ হাজার স্থানে বিকৃতি আছে। অনেক পণ্ডিত বলেছেন যে, বিকৃতির সংখ্যা দেড় লক্ষেরও বেশি। ১১০০ পৃষ্ঠার একটি বইয়ে দেড় লক্ষ বিকৃতি!!

৪র্থ বিষয়

নিম্নের পুস্তকগুলি ও অধ্যায়গুলিকে ক্যাথলিকগণ পুরাতন নিয়মের অংশ বলে বিশ্বাস করেন:

১০. বারুখের পুস্তক (The Book of Baruch)

১১. তোবিয়াসের পুস্তক (The Book of Tobias/ tobit)

১২. যুডিথের পুস্তক (The Book of Judith)

১৩. উইসডম বা জ্ঞান পুস্তক (The Book of Wisdom/ Wisdim of Solomon)

১৪. যাজকগণ বা Ecclesiasticus

১৫. ম্যাকাবিজের প্রথম পুস্তক (The First Book of Maccabees)

১৬. ম্যাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক (The Second Book of maccabees)

১৭. ইস্টেরের বিবরণের (The Book of Esther) দশম অধ্যায়ের দশ আয়াত এবং ১১ থেকে ১৬ পর্যন্ত ৬টি অধ্যায়।

১৮. দানিয়েলের 'পুস্তকের' (The Book of Daniel) তৃতীয় অধ্যায়ের তিন শিশুর সংগীত এবং ১৩ ও ১৪ অধ্যায়।

পক্ষান্তরে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ বিস্তারিত গবেষণার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, এগুলি ঐশ্বরিক প্রেরণা-লব্ধ কথা নয় এবং এগুলিকে ঐশ্বরিক বলে মেনে নেওয়া যায় না। এজন্য পুরাতন নিয়মের এই পুস্তকগুলি যে ঐশ্বরিক প্রেরণায় লিখা নয় তা প্রমাণের জন্য আমাদের কোন কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। কারো ইচ্ছা হলে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের বইপত্র পড়লেই তা জানতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, ইহুদীগণও এগুলিকে ঐশ্বরিক বলে মানেন না।

গ্রীক অর্থোডক্স খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, ইয্রার তৃতীয় পুস্তক পুরাতন নিয়মের অংশ। পক্ষান্তরে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, এই পুস্তকটি ঐশ্বরিক নয়। কেউ চাইলে এই দুই সম্প্রদায়ের পুস্তকাদি পাঠ করতে পারেন।

বিচারকর্তৃগণের বিবরণ (The Book of Judges) নামক পুস্তকটির লেখকের বিষয়ে ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যাঁরা বলেছেন যে, এর রচয়িতা পীনহস, তাঁদের মতে গ্রন্থটি ঐশ্বরিক প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ (Divine Inspiration)-এর ভিত্তিতে লেখা হয়নি, কারণ তিনি ভাববাদী বা নবী ছিলেন না। অনুরূপভাবে যারা বলেন যে, এই পুস্তকটির রচয়িতা যিহূদার রাজা হিষ্কিয় (Hezekiah), তাদের মতেও গ্রন্থটি ঐশ্বরিক প্রেরণায় লিখিত নয়, কারণ তিনিও ভাববাদী বা নবী ছিলেন না।

রূতের বিবরণ (The Book of Ruth) নামক পুস্তকটি সম্পর্কে যারা বলেন যে, পুস্তকটির রচয়িতা রাজা হিষ্কিয় (Hezekiah), তাঁদের মতে গ্রন্থটি ঐশ্বরিক বা আসমানী গ্রন্থ নয় (কারণ হিষ্কিয় রাজা ছিলেন, ভাববাদী বা নবী ছিলেন না)। অনুরূপভাবে ১৮১৯

খৃষ্টাব্দে স্টারবুর্গ-এ মুদ্রিত বাইবেলের সম্পাদকদের মতেও এই পুস্তকটি ঐশ্বরিক প্রেরণায় লিখা নয় (এই সংস্করণের ভূমিকায় লেখা আছে যে, রূতের বিবরণটি একটি ঘরোয়া গল্প, অর্থাৎ এগুলি অনির্ভরযোগ্য গল্প ও অসত্য কাহিনী)।

নহিমিয়ের পুস্তকের (The Book of Nehemiah) বিষয়েও খৃস্টানগণের জোরালো মত হলো যে, পুস্তকটি ঐশ্বরিক প্রেরণা-লব্ধ নয়, বিশেষত এই পুস্তকের ১২শ অধ্যায়ের শুরু থেকে ২৬ আয়াত (নহিমিয় গভর্নর ছিলেন, ভাববাদী ছিলেন না)।

ইহূদীদের প্রখ্যাত ধর্মগুরু পণ্ডিত রাব্বী মমানীডিয, মিকাইলস, স্মলার স্টক, থিয়োডর ও প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগুরু মার্টিন লুথারের মতে ইয়োবের (আইউব আ.) বিবরণ (The Book of Job) নামক পুস্তকটি ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ নয়। অনুরূপভাবে যারা বলেন যে, এই পুস্তকটির রচয়িতা আলিহো নামক একব্যক্তি, বা তার বংশের এক ব্যক্তি বা অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি তাদের মতানুসারেও পুস্তকটি ঐশ্বরিক প্রেরণা বা প্রত্যাদেশলব্ধ নয়।

শলোমনের হিতোপদেশ (The Proverbs) পুস্তকটি শেষ দুই অধ্যায়: ৩০ অধ্যায় ও ৩১ অধ্যায় ঐশ্বরিক প্রেরণা-লব্ধ নয় (এই দুই অধ্যায়ের ১ম আয়াত প্রমাণ করে যে, গ্রন্থটি শলোমনের কথা নয়)।

উপদেশক (Ecclesiastes or, the Preacher) নামক পুস্তকটি ইহূদীদের তালমূদ বিশেষজ্ঞগণের মতে ঐশ্বরিক প্রেরণায় লিখা গ্রন্থ নয়। খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের প্রসিদ্ধ খৃস্টান পাদরী থিয়োডর, পণ্ডিত সিমন, লী ক্লার্ক, ওয়াস্টন, স্মিলর, ক্যাসটিলো প্রমুখ পণ্ডিতের মতে শলোমনের পরমগীত (The song of solomon) নামক পুস্তকটি ঐশ্বরিক প্রেরণায় লিখা গ্রন্থ নয়।

জার্মান পণ্ডিত স্টাহেলন-এর মতে যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক (The Book of the Prophet Isaiah) -এর ২৭টি অধ্যায় (৪০-৬৬ অধ্যায়) ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা নির্ভর নয়।

সকল প্রাচীন খৃস্টান ধর্মবেত্তা পণ্ডিত ও অগণিত আধুনিক খৃস্টান পণ্ডিত একমত যে, মথিলিখিত সুসমাচারটি মূলত হিব্রু ভাষায় লেখা ছিল। সেই মূল হিব্রু গ্রন্থটি হারিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে শুধু সেই মূল গ্রন্থটির গ্রীক অনুবাদ গ্রন্থটির প্রাচীনতম সূত্র হিসেবে বিদ্যমান। এদের এই মত অনুসারে প্রচলিত মথিলিখিত সুসমাচারটি ঐশ্বরিক প্রেরণায় লিখা হয়নি। (কারণ মথির লেখা ঐশ্বরিক প্রেরণায় হলেও তা হারিয়ে গিয়েছে। অনুবাদকের ভাববাদীত্ব তো দূরের কথা, তাঁর পরিচয়ই জানা যায়নি। কাজেই এই অনুবাদটি কখনোই ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ বলে মনে করা যায় না।)

পণ্ডিত স্টাডলিন ও গবেষক ব্রিটশনিডারের মতে যোহনলিখিত সুসমাচারটি ঐশ্বরিক বা ঐশী গ্রন্থ নয়। পণ্ডিত ক্রোটিস-এর মতে এই পুস্তকটির শেষ অধ্যায় ঐশ্বরিক বা ঐশী নয়।

গবেষক ব্রিটশনিডারের মতে যোহনের পত্রাবলির কোনটিই ঐশ্বরিক নয় (কোনটিই শিষ্য যোহনের লিখা নয়)। এলোগিন সম্প্রদায়ের মানুষেরাও এই মত পোষণ করেন। পাঠক এই পুস্তকের এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে জানতে পেরেছেন যে, অধিকাংশ খৃষ্টান পণ্ডিতের মতে পিতরের দ্বিতীয় পত্র, যিহূদার পত্র, যাকোবের পত্র, যোহনের দ্বিতীয় পত্র ও যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য ঐশ্বরিক বা ঐশী পুস্তক নয়।

৫ম বিষয়

হর্ন তাঁর বাইবেলের ব্যাখ্যাগ্রন্থের ১৮২২ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত সংস্করণের প্রথম খণ্ডের ১৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "আমরা যদি স্বীকার করে নিই যে, কোন কোন ভাববাদীর পুস্তক হারিয়ে গিয়েছে, তবে আমরা বলব যে, সেই পুস্তকগুলি ঐশ্বরিক প্রেরণায় লিখিত ছিল না। অগাস্টিন শক্তিশালী প্রমাণের দ্বারা একথা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেন, যিহূদা ও ইস্রায়েলের রাজাদের ঐতিহাসিক বিবরণের মধ্যে (বিশেষত রাজাবলি ও বংশাবলির চারিটি পুস্তকে) অনেক বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেগুলির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান না করে বিভিন্ন ভাববাদীর গ্রন্থের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। কোন কোন স্থানে এ সকল ভাববাদীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ঈশ্বরের মণ্ডলী (চার্চ) যে বাইবেলকে অবশ্য স্বীকার্য ঐশ্বরিক গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করেন সেই বাইবেলের মধ্যে এ সকল গ্রন্থের কোন অস্তিত্ব নেই।

"অগাস্টিন এই বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রদান করতে সক্ষম হন নি। তবে যে সকল ভাববাদীকে পবিত্র-আত্মা ধর্মের মহান বিষয়াবলি প্রেরণার মাধ্যমে অবগত করান তাঁদের লিখিত পুস্তকাদি দুই প্রকারের : প্রথম প্রকারের লিখনী ধার্মিক ঐতিহাসিকগণের পদ্ধতিতে লেখা (অর্থাৎ ঐশ্বরিক প্রেরণায় লিখিত নয়) এবং দ্বিতীয় প্রকারের লিখনী ঐশ্বরিক প্রেরণার ভিত্তিতে লিখিত। এই দুই প্রকার লিখনীর মধ্যে পার্থক্য হলো, প্রথম প্রকারের পুস্তক তাঁদের নিজেদের সাথে সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় প্রকারের পুস্তক ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত। প্রথম প্রকারের পুস্তকের উদ্দেশ্য হলো আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারে সংযোজন করা। আর দ্বিতীয় প্রকারের পুস্তকের উদ্দেশ্য হলো ধর্ম ও ধর্মীয় বিধিবিধানের উৎস ও সূত্র প্রদান করা।"

(মোশির তোরাহ-এর ৪র্থ পুস্তক) গণনা পুস্তকের ২১ অধ্যায়ের ১৪ আয়াতে 'সদাপ্রভুর যুদ্ধপুস্তক' (The Book of Wars of the LORD) নামক একটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে (এবং উক্ত গ্রন্থ থেকে সেখানে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে), কিন্তু এই গ্রন্থটির অস্তিত্ব 'বাইবেলের' মধ্যে বা অন্য কোথাও নেই। এই গ্রন্থটির হারিয়ে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে ভাষ্যকার হর্ন তাঁর ভাষ্যগ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৩২ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন : "এই গ্রন্থটি হারিয়ে গিয়েছে বলেই মনে করা হয়। মহান গবেষক ড. লাইটফিট এর গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, অমালেকদের ধ্বংস করার পরে যিহোশূয়ের জন্য উপদেশ হিসাবে মোশি এই পুস্তকটি রচনা করেছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, এই

পুস্তকে এই বিজয়ের কাহিনী বিধৃত ছিল এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধ-বিগ্রহের নিয়ম কানুন এতে উল্লেখ করা ছিল। অতএব এই পুস্তকটি কোন ঐশ্বরিক প্রেরণাভিত্তিক গ্রন্থ ছিল না এবং তা বাইবেলের পুস্তকসমুহের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।"

অতঃপর তিনি প্রথম খণ্ডের শেষে ১নং সংযোজনে বলেছেন: "যখন বলা হয় যে, পবিত্র পুস্তক বা বাইবেলের পুস্তকসমূহ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে ঐশ্বরিক প্রেরণা বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত তখন একথা বুঝানো হয় না যে, এ সকল পুস্তকের সকল শব্দ বা সকল বাক্য ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের মাধ্যমে লিখা হয়েছে বরং বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকের রচয়িতাদের রচনাভঙ্গির বিভিন্নতা ও তাঁদের বর্ণনার বৈপরীত্য থেকে জানা যায় যে, তাঁদের প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রকৃতি, অভ্যাস ও জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে লিখার অনুমতি ছিল। ঐশ্বরিক প্রত্যোদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে তাঁরা প্রচলিত জ্ঞানের ন্যায় ব্যবহার করতেন। একথা কল্পনা করা যায় না যে, তাঁরা যে সকল বিষয় লিখেছেন বা যে সকল বিধিবিধান প্রদান করেছেন সেগুলি সবই তাঁরা ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ বা প্রেরণার মাধ্যমে লাভ করেছিলেন।" এ হলো হর্নের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ।

এরপর তিনি বলেন: "একথা সত্য যে, পুরাতন নিয়মের ঐতিহাসিক বিবরণের সংকলকগণ কখনো কখনো ঐশ্বরিক প্রেরণা লাভ করতেন।"

৬ষ্ঠ বিষয়

হেনরী ও স্কট-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ তাঁদের ভাষ্যগ্রন্থের শেষ খণ্ডে (আলেকযাণ্ডার ক্যানন) বা মৌলিক ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে আলেকযাণ্ডারের নীতিমালা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: "এ কথা মোটেও জরুরী নয় যে, একজন ভাববাদী (তাঁর পুস্তকে) যা কিছু লিখেছেন তা সবই ঐশী প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ হবে বা বাইবেলের (canonical text) অংশ হবে। শলোমনের কিছু পুস্তক ঐশ্বরিক প্রেরণা বা প্রত্যাদেশলব্ধ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, শলোমন যা কিছু লিখেছেন সবই ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ। একথা মনে রাখতে হবে যে, ভাববাদিগণ ও প্রেরিতগণ বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে ও বিশেষ বিশেষ স্থানে ঐশ্বরিক প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ লাভ করতেন।"

আলেকযাণ্ডার ক্যানন-এর গ্রন্থটি প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতদের নিকট একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। বাইবেলের সুসমাচারসমূহের বিশুদ্ধতার বিষয়ে বিতর্কে ক্যাথলিক কার্কর্ণ-এর বিরুদ্ধে প্রটেস্ট্যান্ট ওয়ারেন এই পুস্তকের বক্তব্যকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের নিকট উপরের এই ব্যাখ্যাটির গ্রহণযোগ্যতা বুঝানোর জন্য বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

৭ম বিষয়

'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা' গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা সর্বজনবিদিত। ইংল্যাণ্ডের অগণিত পণ্ডিতের সমবেত শ্রমের ফসল এই গ্রন্থটি। এই গ্রন্থের ১১ শ খণ্ডের ২৭৪

পৃষ্ঠায় ইলহাম বা ঐশ্বরিক প্রেরণার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: 'পবিত্র পুস্তকসমূহের বা বাইবেলের পুস্তকসমূহের মধ্যে লিখিত সকল কথাই কি Inspiration বা ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ? অনুরূপভাবে এ সকল পুস্তকে উল্লিখিত (ভাববাদিগণের) সকল ঘটনা ও অবস্থাই কি Inspiration বা ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ? এ বিষয়ে বিতর্ক ও মতভেদ রয়েছে। জিরোম, ক্রোটিস, এরাসমাস (Erasmus, Desiderius), প্রোকোবিস ও অন্য অনেক পণ্ডিতের মতে বাইবেলের পুস্তকাবলির সকল কথা Inspiration বা ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ নয়।

এরপর তাঁরা এই বিশ্বকোষের ১৯ খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "যারা বলেন যে, বাইবেলের পুস্তকাবলির মধ্যে উল্লিখিত সকল কথা ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ, তাদের জন্য এই দাবি প্রমাণ করা সহজ হবে না।"

এরপর তাঁরা বলেন : "যদি কেউ নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রশ্ন করেন যে, নতুন নিয়মের কোন্ অংশকে আপনারা ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ বলে স্বীকার করেন? তবে আমরা উত্তরে বলব যে, ধর্মীয় নির্দেশাবলি, বিধিবিধান ও ভবিষ্যৎবাণীগুলি হচ্ছে খৃষ্ট ধর্মের মূল। এগুলি সর্বদা ঐশ্বরিক প্রেরণার সাথে সংযুক্ত। অন্য সকল অবস্থার বর্ণনার জন্য প্রেরিতদের মানবীয় স্মৃতিই যথেষ্ট ছিল।"

৮ম বিষয়

রীস নামক এক ব্যক্তি অনেক গবেষক পণ্ডিতের সমন্বয়ে একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। বিশ্বকোষটি 'এনসাইক্লোপীডিয়া রীস' নামে পরিচিত। এই বিশ্বকোষের ১৯ খণ্ডে বলা হয়েছে: "বাইবেলের পুস্তকাবলি ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ বা ঐশী কি না সে বিষয়ে মানুষেরা অনেক কথা বলেছেন। তারা বলেছেন, এ সকল পুস্তকাবলির রচয়িতাদের কর্মে ও কথায় অনেক ভুলভ্রান্তি ও বৈপরীত্য রয়েছে। যেমন মথিলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ের ১৯ ও ২০ আয়াত ও মার্ক লিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ের ১১ আয়াতের সাথে যদি প্রেরিতদের কার্য-বিবরণের ২৩ অধ্যায়ের প্রথম ৬ আয়াতের তুলনা করা হয় তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

"এ বিষয়ে আরো বলা হয়েছে যে, প্রেরিতগণ একজন অন্যজনকে প্রত্যাদেশ (Inspiration/ Revelation) প্রাপ্ত মানুষ বলে মনে করতেন না। যিরূশালেমের সমাবেশে তাঁদের আলোচনা ও পৌল কর্তৃক পিতরকে অভিযোগ করার ঘটনা থেকে তা জানা যায়।

"আরো বলা হয়েছে যে, প্রাচীন খৃষ্টানগণও তাঁদেরকে ভুলভ্রান্তির উর্ধে বা ঐশ্বরিক প্রেরণায় ভুলভ্রান্তি থেকে সংরক্ষিত বলে বিশ্বাস করতেন না: কারণ, কখনো কখনো তাঁরা তাঁদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছেন (প্রেরিত ১১/২-৩; ২১/২০-২৪)।

আরো বলা হয়েছে যে, পবিত্র-পুরুষ পৌল, যিনি নিজেকে প্রেরিতদের চেয়ে কম মর্যাদার বলে মনে করতেন না (২ করিন্থীয় ১১/২, ১২/১১), তিনিও নিজের অবস্থার যে

বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট হয় যে, তিনিও নিজেকে সর্বসময়ে প্রেরণা (Inspiration) প্রাপ্ত বলে মনে করতেন না (১ করিন্থীয় ৭/১০, ১২, ১৫, ৪০; ২ করিন্থীয় ১১/১৭)। আর আমরা এও দেখি না যে, প্রেরিতগণ তাঁদের কথাবার্তা শুরু করার সময় এমন কিছু বলছেন যাতে প্রকাশ পাচ্ছে যে, তাঁরা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কথা বলছেন।

"এরপর এই গ্রন্থ বলা হয়েছে: মিকাইলস উভয় পক্ষের প্রমাণাদির মধ্যে তুলনা করেছেন। এইরূপ মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে যতটুকু চিন্তা-ভাবনা প্রয়োজন ততটুকু চিন্তাভাবনা দিয়েই তিনি তা বিচার করেছেন। এরপর তিনি উভয় মতের মধ্যে ফয়সালা দিয়ে বলেছেন, পত্রাবলির মধ্যে অবশ্যই প্রেরণা পাওয়া যায়। আর সুসমাচার চতুষ্টয় ও প্রেরিতদের কার্য-বিবরণের মত ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক পুস্তকগুলিতে কোন প্রকারের ঐশ্বরিক প্রেরণা নেই বললে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না বরং আমাদের কিছু লাভই হবে।

"আমরা যদি স্বীকার করে নিই যে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বর্ণনায় প্রেরিতগণের সাক্ষ্য অন্য সকল মানুষের সাক্ষ্যের মতই (মানবীয়, ঐশ্বরিক নয়) তাহলেও আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। যীশু নিজেই বলেছেন: "আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ তোমরা প্রথম হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।" যোহন তাঁর সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ের ২৭ আয়াতে বচনটি উদ্ধৃত করেছেন।

"যারা খৃষ্টধর্মকে অস্বীকার করেন তাদের বিরুদ্ধে খৃস্টধর্মের সত্যতা প্রমাণের জন্য এ সকল পুস্তকের ঐশ্বরিক হওয়ার দাবি কোন সহায়তা করে না। যীশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান ও অলৌকিক চিহ্নগুলিকে প্রমাণ করতে হলে সুসমাচার লেখকদের লেখনিকে ঐতিহাসিক বর্ণনা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। যিনি নিজের বিশ্বাস ওজন করতে চান তিনি যেন এ সকল বিষয়ে সুসমাচার লেখকদের সাক্ষ্যকে অন্য সাধারণ মানুষদের সাক্ষ্যের মতই গণ্য করেন। কারণ সুসমাচারগুলির মধ্যে উল্লিখিত বিবরণগুলির সত্যতা প্রমাণের জন্য সুসমাচারগুলির ঐশীগ্রন্থ হওয়ার বা প্রেরণালব্ধ হওয়ার দাবি অন্তহীন দাবিমালার সৃষ্টি হবে। কারণ উপরের বিষয়গুলি (যীশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান ও অলৌকিক চিহ্নগুলি) প্রমাণিত হলেই তো কেবল এই পুস্তকগুলির ঐশ্বরত্ব বা ঐশীবাণী-ভিত্তিক হওয়া প্রমাণিত হবে। এ জন্য অবশ্যই এদের সাক্ষ্যকে অন্য সাধারণ মানুষদের সাক্ষ্যের মতই মনে করতে হবে।

"ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিবরণগুলিকে একান্তই মানবীয় মনে করলে খৃস্টধর্মের জন্য কোন নিন্দনীয় বা খারাপ কিছু হবে না। যিশুর শিষ্যগণ নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে সকল ঘটনাবলি জেনেছেন এবং লূক তাঁর নিজের গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে যে সকল ঘটনাবলি জেনেছেন সেগুলি যে তাঁরা ঐশ্বরিক প্রেরণার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেছেন, সে কথা আমরা কোথাও স্পষ্টরূপে লিখিত দেখতে পাচ্ছি না বরং আমাদেরকে যদি একথা বলতে অনুমতি দেওয়া হয় যে, কোন কোন সুসমাচার লেখক

কিছু কিছু ভুল করেছেন এবং পরবর্তীতে যোহন সেগুলি সংশোধন করেছেন, তবে এতে সুসমাচারগুলির মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা দূর করে সমন্বয় সাধন করার ক্ষেত্রে অনেক বড় উপকার লাভ করা যাবে।

"মিকাইলস যে কথা বলেছেন ঠিক সেকথাই বলেছেন মিস্টার কিডল ঐশ্বরিক প্রেরণা (Inspiration) বিষয়ক তাঁর পুস্তিকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে। যীশুর প্রেরিত শিষ্যগণের ছাত্ররা সে সকল পুস্তক লিখেছেন, যেমন লূকলিখিত সুসমাচার, মার্ক লিখিত সুসমাচার ও প্রেরিতদের কার্যবিবরণ, মিকাইলস সেগুলির প্রেরণালব্ধ হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান থেকে বিরত থেকেছেন।"

এ হলো রীসের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ।

৯ম বিষয়

ড. বেনসনের বাইবেল-ব্যাখ্যাগ্রন্থের উপর নির্ভর করে ওয়াটসন ঐশ্বরিক প্রেরণা (Inspiration) বা ইলহাম বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে তিনি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন যে, লূকের লেখনি যে ঐশ্বরিক প্রেরণা বা ইলহাম ভিত্তিক নয় তা তাঁর ভূমিকা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি তাঁর সুসমাচারের ভূমিকায় লিখেছেন: "১ প্রথম অবধি যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এবং বাক্যের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে যেমন সমর্পণ করিয়াছেন, ২ তদনুসারে অনেকেই আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত বিষয়াবলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ৩ সেই জন্য আমিও প্রথম হইতে সকল বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি বলিয়া, হে মহামহিম থিয়ফিল, আপনাকে অনুপূর্বক বিবরণ লেখা বিহিত বুঝিলাম; ৪ যেন, আপনি যে সকল বিষয় শিক্ষা পাইয়াছেন সেই সকল বিষয়ের নিশ্চয়তা জ্ঞাত হইতে পারেন।"

প্রাচীন খৃস্টান ধর্মগুরু পণ্ডিতগণও একই কথা বলেছেন (যে, লূকের লেখনি ঐশ্বরিক প্রেরণাভিত্তিক নয়, সাধারণ মানবীয় গবেষণা ভিত্তিক)। আরিনূস বলেছেন: 'যীশুর প্রেরিত শিষ্যগণ থেকে লূক যা কিছু শিক্ষা করেছিলেন তা আমাদেরকে জানিয়ে গিয়েছেন।' জিরোম বলেছেন: 'লূক শুধু পৌল থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। পৌল তো যীশুখৃস্টের দৈহিক সাহচর্য লাভ করেন নি। উপরন্তু লূক অন্যান্য প্রেরিত শিষ্য থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।'

অতঃপর এই পুস্তকে তিনি বলেছেন, "প্রেরিতগণ যখন ধর্মের বিষয়ে কথা বলতেন অথবা লিখতেন তখন ঐশ্বরিক প্রেরণার যে ভাণ্ডার তাঁরা লাভ করেছিলেন তা তাঁদেরকে সংরক্ষণ করতো। কিন্তু তাঁরা ছিলেন মানুষ ও মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন। ঐশ্বরিক প্রেরণা বা ইলহামও তাঁরা লাভ করতেন। বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনায় অন্যান্য সাধারণ মানুষেরা যেরূপভাবে কোন প্রেরণা ছাড়াই তাদের জ্ঞানবুদ্ধির ভিত্তিতে কথা বলেন বা লিখেন, সাধারণ অবস্থাগুলিতে প্রেরিতগণও তেমনিভাবে লিখতেন।

"এভাবে পৌলের জন্য সম্ভব ছিল যে, তিনি ঐশ্বরিক প্রেরণা ছাড়াই তীমথিয়কে লিখবেন, "কিন্তু তোমার উদরের জন্যও তোমার বার বার অসুখ হয় বলিয়া কিঞ্চিত মদ[১] ব্যবহার করিও"। পৌলের এই নির্দেশটি তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত তাঁর প্রথম পত্রের ৫ম অধ্যায়ের ২৩ আয়াতে রয়েছে।

"অথবা তিনি এভাবে তাঁকে লিখবেন যে, "ত্রোয়াতে কার্পের কাছে যে শালখানি রাখিয়া আসিয়াছি, তুমি আসিবার সময় সেখানি এবং পুস্তকগুলি বিশেষত চর্মের পুস্তক কয়খানি, সঙ্গে করিয়া আনিও।" তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতে এই কথাটি রয়েছে।

"অথবা এভাবে তিনি ফিলীমনকে লিখবেন: "কিন্তু আবার আমার জন্য বাসাও প্রস্তুত করিয়া রাখিও"। ফিলীমনের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ২২ আয়াতে কথাটি রয়েছে।

"অথবা এভাবে তিনি তীমথিয়কে লিখবেন: "ইরাস্ত করিন্থে রহিয়াছেন, এবং ত্রফিম পীড়িত হওয়াতে আমি তাঁহাকে মিলীতে রাখিয়া আসিয়াছি।" তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে কথাটি রয়েছে।

"এই অবস্থাগুলি কখনোই মানসিক অবস্থা নয়। এগুলি সব পবিত্র পুরুষ পৌলের অবস্থা। তিনি করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত তাঁর প্রথম পত্রের ৭ম অধ্যায়ের ১০ আয়াতে লিখেছেন: "আর বিবাহিত লোকদিগকে এই আজ্ঞা দিতেছি, আমি দিতেছি তাহাই নয়, কিন্তু প্রভুই দিতেছেন..।" এরপর ১২ আয়াতে তিনি লিখেছেন: "কিন্তু আর সকলকে আমি বলি, প্রভু নয়.."। অতঃপর ২৫ আয়াতে তিনি লিখেছেন: "আর কুমারীদের বিষয়ে আমি প্রভুর কোন আজ্ঞা পাই নাই, কিন্তু.. আমার মত প্রকাশ করিতেছি"।

"প্রেরিতদের কার্য-বিবরণের ১৬ অধ্যায়ের ৬ আয়াতটি নিম্নরূপ: "তাহারা ফরুগিয়া ও গালাতিয়া দেশ দিয়া গমন করিলেন, কেননা এশিয়া দেশে বাক্য প্রচার করিতে পবিত্র আত্মা কর্তৃক নিধারিত হইয়াছিলেন"।

"আর সপ্তম আয়াতটি নিম্নরূপ: "আর মুশিয়া দেশের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা বিথুনিয়ায় যাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যীশুর আত্মা তাঁহাদিগকে যাইতে দিলেন না"।

"তাহলে প্রেরিতদের কর্মকাণ্ডের দুইটি ভিত্তি রয়েছে: মানবীয় বুদ্ধি ও ঐশ্বরিক প্রেরণা। সাধারণত বিষয়গুলিতে তারা প্রথম ভিত্তির উপর নির্ভর করার সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। আর খৃস্টান ধর্মমতের বিষয়ে তারা দ্বিতীয় ভিত্তির উপর নির্ভর করতেন। আর এজন্যই প্রেরিতগণ তাঁদের সাংসারিক ও প্রশাসনিক কাজকর্মে ভুলভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হতেন। প্রেরিতদের কার্য বিবরণের ২৩ অধ্যায়ের ৩ ও ৫ আয়াতে,

১. এখানে ইংরেজী বাইবেলে wine ও আরবী বাইবেলে خمر বলা হয়েছে। উভয়ের অর্থই মদ। বাংলা অনুবাদে দ্রাক্ষারস বা আঙুর-রস বলা হয়েছে। সম্ভবত ধর্মগুরু কর্তৃক মদ খাওয়ার নির্দেশটি বেমানান হওয়াই এরূপ অনুবাদ করা হয়েছে।

রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ১৫ অধ্যায়ের ২৪ ও ২৮ আয়াতে, করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্রের ১৬ অধ্যায়ের ৫, ৬, ও ৮ আয়াতে, করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত দ্বিতীয় পত্রের ১১ অধ্যায়ের ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ আয়াতে এই প্রকারের ভুলভ্রান্তির বিবরণ রয়েছে।" ড. বেনসনের প্রেরণা বিষয়ক যে বক্তব্য ওয়াটসন উদ্ধৃত করেছেন তা এখানেই শেষ।

'এনসাইক্লোপীডিয়া রীস'-এর ১৯ খণ্ডে ড. বেনসনের বিষয়ে বলা হয়েছে: "ঐশ্বরিক প্রেরণার বিষয়ে তিনি যা লিখেছেন, তা বাহ্যত সহজ, যুক্তিগ্রাহ্য ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে অতুলনীয়।"

১০ম বিষয়

পাসোবার ও লিয়াফান বলেছেন : "যে পবিত্র-আত্মার প্রেরণা ও সাহায্যে সুসমাচার লেখকগণ তাঁদের সুসমাচারগুলি লিখেছেন, তিনি তাদেরকে কোন নির্দিষ্ট ভাষা বা প্রকাশভঙ্গি নির্ধারণ করে দেননি বরং তিনি তাদের অন্তরে মূল বিষয়টি উপস্থাপিত করেছেন এবং তাদেরকে ভুলের মধ্যে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।[১] এবং প্রত্যেককে স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, তারা তাদের অন্তরে প্রদত্ত অর্থকে নিজের ভাষায় ও নিজের প্রকাশভঙ্গিতে লিখবেন। আমরা যেমন পুরাতন নিয়মের লেখক পবিত্র ভাববাদীদের লিখার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাই; তেমনি মূলভাষায় যিনি অভিজ্ঞ তিনি মথি, লূক, পৌল ও যোহনের ভাষার মধ্যে পার্থক্য দেখতে পারবেন। যদি পবিত্র-আত্মা যীশুর প্রেরিত শিষ্যদের অন্তরে ভাষার প্রেরণা দান করতেন, তাহলে কখনোই পার্থক্য দেখা যেত না বরং সেক্ষেত্রে বাইবেলের সকল পুস্তকের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি একই রকমের হতো।

"এক্ষেত্রে আরো লক্ষণীয় যে, কিছু বিষয় লিখার জন্য কোন প্রকারের ঐশ্বরিক প্রেরণার প্রয়োজন নেই। যেমন, যে সকল বিষয় তারা স্বচক্ষে দেখে লিখেছেন, অথবা নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর মুখ থেকে শুনে লিখেছেন সেগুলির জন্য কোন প্রেরণার প্রয়োজন নেই। লূক যখন তাঁর সুসমাচার লেখার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তিনি বললেন: প্রথম থেকে যারা স্বচক্ষে দেখেছেন, তাদের বর্ণনা অনুসারে তিনি তা লিখেছেন। তিনি যেহেতু অনুসন্ধান করে জেনেছিলেন, সেহেতু তিনি পরবর্তী প্রজন্মদের জন্য তা লিখে প্রচার করাকে ভাল মনে করেছেন (এতে বুঝা যায় যে, তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন, পবিত্র-আত্মার প্রেরণায় নয়)। কারণ, কোন লেখক যদি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে কোন বিষয় জেনে তা লিখেন তাহলে স্বাভাবিক নিয়ম হলো যে, তিনি এক্ষেত্রে বলবেন: 'পবিত্র-আত্মা আমাকে যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই আমি এই বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করলাম'।

---

১. পণ্ডিতদ্বয়ের এই দাবি যে সঠিক নয় তা আমরা ইতোমধ্যেই দেখতে পেয়েছি। পবিত্র আত্মা সুসমাচার লেখকদেরকে ভুলের মধ্যে নিপতিত হওয়া থেকে মোটেও রক্ষা করেন নি। ফলে তাঁরা অগণিত ভুল ও বৈপরীত্যের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। এ সকল বৈপরীত্য শুধু শব্দগত নয়; বরং অর্থ ও তথ্যগতও।

"পবিত্র পৌলের যীশুর প্রতি বিশ্বাস গ্রহণের বিষয়টি যদিও একটি অলৌকিক বিষয় ছিল এবং ঈশ্বরের পক্ষ থেকে ছিল তবুও এই ঘটনার বর্ণনায় লূকের জন্য পৌলের নিজের বা তাঁর সঙ্গীদের সাক্ষ্য ছাড়া অন্য কোন কিছুর (ঐশ্বরিক প্রেরণার) প্রয়োজন ছিল না। আর এজন্য এই বর্ণনার মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে, তবে কোন বৈপরীত্য নেই।"[১]

পাসোবার ও লিয়াফান-এর বক্তব্য এখানেই শেষ। এরা দুইজন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং এদের গ্রন্থ তাদের নিকট অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। হর্ন ও ওয়াটসন তা উল্লেখ করেছেন।

১১শ বিষয়

হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৭৯৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন: "একহার্ন ঐ সকল জার্মান পণ্ডিতের একজন যারা মোশি কোন ঐশ্বরিক প্রেরণা লাভ করেছিলেন বলে বিশ্বাস করেন না (মোশির ভাববাদীত্ব স্বীকার করেন না)।"

এরপর ৮১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "শোলয, ডাতেহ, রোযেনমিলার ও ড. গিডস বলেছেন: মোশি কোন প্রেরণা লাভ করেননি বরং তাওরাতের (Torah or Pentateuch) পাঁচটি পুস্তকই তৎকালীন প্রচলিত গল্প-কাহিনীর ভিত্তিতে লিখিত হয়েছে। জার্মান পণ্ডিতদের মধ্যে এই মতটি খুবই প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত।"

এরপর তিনি আরো বলেন: "যূসীবিস ও তাঁর পরের আরো অনেক প্রসিদ্ধ গবেষক বলেছেন যে, মোশি যখন মিদিয়ন দেশে তাঁর শ্বশুরের বাড়িতে মেষপাল চরাতেন, তখনই তিনি 'আদিপুস্তক'টি রচনা করেছিলেন।"

গ্রন্থকার বলেন, যদি মোশি আদিপুস্তক তাঁর নবুওয়ত বা ভাববাণী প্রাপ্তির পূর্বে রচনা করে থাকেন তাহলে মহান খৃস্টান গবেষকদের মতানুসারে তা কখনোই ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে না বরং তা 'প্রচলিত প্রসিদ্ধ কাহিনীসমূহের সংকলন' বলে গণ্য হবে। কারণ, পাঠক ইতোপূর্বে দেখেছেন যে, গবেষক পণ্ডিত হর্ন ও অন্যান্য খৃস্টান গবেষক পণ্ডিত স্বীকার করেছেন যে, নবুওয়ত বা ভাববাণী প্রাপ্তির ও ভাববাদী হওয়ার পরেও নবী বা ভাববাদীর সকল রচনা যখন ঐশ্বরিক বা প্রেরণা-নির্ভর বলে গণ্য হবে না, তাহলে নবুওয়ত বা ভাববাণী প্রাপ্তির পূর্বের রচনা কিভাবে ঐশ্বরিক প্রেরণানির্ভর বলে গণ্য হবে?

ক্যাথলিক ওয়ার্ড ১৮৪১ সালে মুদ্রিত তাঁর পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: লুথার তাঁর পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের ৪০ ও ৪১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "আমরা মোশির কোন কথাই শুনব না এবং তাঁর দিকে ভ্রুক্ষেপও করব না: কারণ তিনি ছিলেন শুধু ইহুদীদের জন্য।" অন্য এক পুস্তকে তিনি লিখেছেন: "আমরা মোশিকেও মানি না এবং তাঁর তোরাহও

১. পণ্ডিতদ্বয়ের এই দাবিটি মিথ্যা। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, পৌলের বিশ্বাসের ঘটনার বিবরণের মধ্যে স্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। দুইটি বর্ণনার যে কোন একটি অসত্য।

মানি না। কারণ তিনি ছিলেন যীশুর শত্রু।" অতঃপর তিনি বলেন: "মোশি ছিলেন হত্যাকারি জল্লাদদের গুরু।" অতঃপর তিনি বলেন: "দশ আজ্ঞার (ten commandments)[৪৪৬] সাথে খৃষ্টানদের কোন সম্পর্ক নেই।" অতঃপর তিনি বলেন: "এই দশ আজ্ঞাকে বের করে দেওয়া হোক; তাহলে সকল কুসংস্কার ও অন্যায় দূরীভূত হবে। কারণ এই দশ আজ্ঞাই সকল অন্যায় কুসংস্কারের মূল উৎস।" তাঁর ছাত্র এসলিবীস বলেন: "চার্চগুলিতে এই দশ আজ্ঞা পড়ানো চলবে না।"

এই ব্যক্তি (এসলিবীস) থেকেই এন্টি নোমিনস সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হলো, তোরাহ (Torah or Pentateuch)- কে আল্লাহর বাণী হিসেবে বিশ্বাস করা যায় না। তারা আরো বলতেন, যদি কেউ ব্যভিচার করে, অশ্লীল অপরাধে লিপ্ত হয় বা অন্য কোন ভয়ঙ্কর পাপাচারে লিপ্ত হয় তবে সে অবশ্যই মুক্তির পথে চলেছে। যে ব্যক্তি ভয়ঙ্কর পাপাচার ও ঈশ্বর বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে বরং যে সকল পাপের জঘন্যতম পর্যায়ে রয়েছে কিন্তু তার বিশ্বাস রয়েছে, সে ব্যক্তি আনন্দ ও মুক্তির মধ্যে রয়েছে। যারা এই দশ আজ্ঞার পিছনে (প্রতিমা-পূজা, মদপান, ব্যভিচার ইত্যাদি বর্জন করে মুক্তি লাভের চেষ্টা করছে) তাদের সম্পর্ক হলো শয়তানের সাথে। এরা সবাই মোশির সাথে ক্রুশবিদ্ধ হোক!

পাঠক! এখন দেখুন, প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের নেতা ও তাঁর শিষ্য মোশি ও তাওরাতের বিষয়ে কি মন্তব্য করছেন।

"মোশি যীশুর শত্রু", "হত্যাকারী জল্লাদদের গুরু" এবং "শুধুমাত্র ইহূদীদের জন্য", "তাওরাত ঈশ্বরের বাণী নয়", "মোশি, তার তোরাহ এবং দশ আজ্ঞার কোন সম্পর্ক নেই খৃষ্টানদের সাথে", "এই দশ আজ্ঞা বের করে দেওয়া উচিত এবং এগুলি সকল কুসংস্কার ও পাপাচারের উৎস", "যারা এগুলি মেনে চলে তাদের সম্পর্ক শয়তানের সাথে"... যদি এই সকল কথা ঠিক হয় তাহলে একথা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, এই ধর্মগুরু ও তাঁর অনুসারিগণ (প্রটেস্ট্যান্টগণ) মোশি ও তোরাহ অস্বীকার করেন। আর যেহেতু দশ আজ্ঞা সকল পাপের উৎস সেহেতু জানা গেল যে, দশ আজ্ঞার বিপরীতে প্রতিমা-পূজা, বহু-ঈশ্বরের পূজা, পিতামাতার অবাধ্যতা, প্রতিবেশিকে কষ্ট প্রদান, চুরি করা, ব্যভিচার করা, নরহত্যা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা এই কর্মগুলিই হলো প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের মূল ভিত্তি ও সকল পূণ্যের উৎস।

এই প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের একজন আমাকে (গ্রন্থকার আল্লামা রাহমাতুল্লাহকে) বলেন: "আমাদের মতে মোশি ভাববাদী ছিলেন না, বরং তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এবং আইন-কানুন প্রণেতা ও সংকলক ছিলেন।"

---

১. ইহূদী ও খৃষ্ট ধর্মের মূল দশটি নির্দেশ: সদাপ্রভু করুণাময় আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। মূর্তি-প্রতিমা নির্মাণ করবে না। আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করবে না। আল্লাহর নাম অনর্থক নেবে না। শনিবারের বিশ্রাম পালন করবে। পিতামাতাকে সমাদর করিও। নরহত্যা করিও না। ব্যভিচার করিও না। চুরি করিও না। প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না ও তার গৃহে লোভ করিও না।.. যাত্রাপুস্তক ২০/১-১৭; দ্বিতীয় বিবরণ ৫/১-২১।

এদের অন্য এক ব্যক্তি বলেন: "আমাদের মতে মোশি ছিলেন চোর ও দস্যু।" আমি তাকে বললাম, সাবধান! আল্লাহকে ভয় করুন। তিনি বললেন, কেন? যীশু তো নিজেই বলেছেন: "যাহারা আমার পূর্বে আসিয়াছিল, তাহারা সকলে চোর ও দস্যু, কিন্তু মেষেরা তাহাদের রব শুনে নাই।" যোহনলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ের ৮ আয়াতে এই কথাটি রয়েছে। যীশু এখানে "যাহারা আমার পূর্বে আসিয়াছিল" বলতে মোশি এবং অন্য ইস্রায়েলীয় ভাববাদিগণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

গ্রন্থকার বলেন, সম্ভবত যীশুর এই বচনের উপর নির্ভর করেই প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের গুরু লুথার ও তার প্রাজ্ঞ শিষ্য মোশি ও তাঁর তোরাহ-এর বিরুদ্ধে এত নিন্দা ও ঘৃণ্য বক্তব্য পেশ করেছেন।

১২শ বিষয়

প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের গুরু মি. লুথার যাকোবের পত্রের বিষয়ে বলেছেন: এই পত্রটি কিছুই নয়। অর্থাৎ এর কোনরূপ গ্রহণযোগ্যতা নেই।

যীশু শিষ্য প্রেরিত যাকোব তাঁর পত্রের ৫ম অধ্যায়ে নির্দেশ দিয়েছেন: "তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্ত? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহবান করুক; এবং তাঁহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা করুন।"[১]

এ বিষয়ে আপত্তি করে এই মহান গুরু তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন: "এই পত্রটি যদিও যাকোবের রচিত হয়, তবুও আমি এর প্রতিবাদে বলব যে, কোন প্রেরিতের অধিকার নেই যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোন ধর্মীয় বিধান প্রদান করবেন। এই যোগ্যতা ও অধিকার শুধু যীশুর।"

তাহলে এই মহান গুরু লুথারের মতে যাকোবের পত্রটি ঐশ্বরিক প্রেরণা-নির্ভর নয়। অনুরূপভাবে "এ যোগ্যতা ও অধিকার একমাত্র যীশুর" এই কথা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রেরিতগণের দেওয়া বিধিবিধান ও নির্দেশাবলিও ঐশ্বরিক প্রেরণা-নির্ভর নয়। ঐশ্বরিক বিধান শুধু যীশুই প্রদান করতে পারেন।

ওয়ার্ড ক্যাথলিক ১৮৪১ সালে মুদ্রিত তাঁর পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন; বোর্ন, যিনি প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের অন্যতম মহান ধর্মগুরু এবং লুথারের ছাত্র ছিলেন, বলেছেন: যাকোব তার পত্রটিকে অনির্ভরযোগ্য বাতুল কথাবার্তা দিয়ে অনাথ বানিয়ে ফেলেছেন। তিনি বিভিন্ন পুস্তক থেকে এমনভাবে উদ্ধৃত করেছেন যাতে পবিত্র-আত্মার উপস্থিতির কোন সম্ভাবনা নেই। কাজেই এই পত্রটিকে ঐশ্বরিক পুস্তকাদির অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করা যাবে না।"

প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী ওয়াইটস থিওডোরাস নুরেমবুর্গে একজন প্রচারক ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা ইচ্ছাপূর্বক যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য এবং যাকোবের পত্র

১. যাকোব ৫/১৪।

পরিত্যাগ করেছি। যাকোবের পত্রটি সকল স্থানে নিন্দনীয় নয়, যে সকল স্থানে বিশ্বাসের চেয়ে কর্মকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ; বরং এই পত্রটির মধ্যে বিপরীতমুখি পরস্পর-বিরোধী কথাবার্তা পাওয়া যায়।

মীকডিব্রাজেন স্নিটিওরিন্টস বলেন : যাকোবের পত্রটি একটি স্থানে প্রেরিতদের সিদ্ধান্তাবলির বাইরে একক একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে, যাতে তিনি বলেছেন: শুধু বিশ্বাস দ্বারা মুক্তি অর্জিত হবে না, বরং বিশ্বাসের সাথে কর্মেরও প্রয়োজন।[১] দ্বিতীয় অতিরিক্ত যে মতটি তিনি প্রকাশ করেছেন তা হলো, তিনি বলেছেন: "তোমার স্বাধীনতার (মুক্তির) বিধান।"[২]

উপরের আলোচনা থেকে জানা গেল যে, এ সকল পণ্ডিতও তাঁদের গুরুর ন্যায় যাকোবের পত্রটিকে ঐশ্বরিক প্রেরণা-নির্ভর বলে বিশ্বাস করতেন না।

১৩শ বিষয়

ক্রেশিস আমাকে বলেছেন, "মথি ও মার্কের বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। যখন তাঁরা উভয়ে একই রূপ বর্ণনা প্রদান করেন তখন তাঁদের যৌথ বর্ণনাকে লূকের বর্ণনার উপরে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।"

এই কথা থেকে দুইটি বিষয় জানা গেল :

প্রথমত, মথি ও মার্কের লেখনির মধ্যে কিছু কিছু স্থানে অর্থগত বৈপরীত্য রয়েছে। কারণ শব্দগত বৈপরীত্য তো সর্বত্রই রয়েছে। কোন ঘটনার বর্ণনাতেই দুইটি সুসমাচারের বর্ণনার ভাষা এক হয় না।

দ্বিতীয়ত,

এই তিনটি সুসমাচার ঐশ্বরিক প্রেরণা-নির্ভর নয়। যদি এগুলি সবই ঐশী পুস্তক হতো বা ঈশ্বরের বাণী হতো তাহলে তো তৃতীয়টির উপরে প্রথম দুইটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কোন অবকাশ থাকে না।

১৪শ বিষয়

গবেষক বেলি প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের একজন নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত। তিনি বাইবেলের সূত্র সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনা করেছেন যা ১৮৫০ সালে মুদ্রিত হয়েছে। এই পুস্তকের ৩২৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন:

"প্রাচীন খৃস্টানগণ দ্বিতীয় যে ভুলটি করেছিলেন বলে বলা হয় তা হলো, তারা আশা করতেন যে, কেয়ামত বা প্রলয় ও পুনরুত্থান অতি সন্নিকট। আপত্তির আগেই আমি অন্য একটি নমুনা পেশ করছি। আমাদের প্রভু যোহনের বিষয়ে পিতরকে বলেন: "আমি যদি ইচ্ছা করি, এ আমার আগমন পর্যন্ত থাকে, তাহাতে তোমার কি?"[৩] এই কথাটি

---

১. যাকোব ২/১৪-২৬।

২. যাকোব ২/১২।

৩. যোহন ২১/২২।

থেকে এর উদ্দেশ্যের বিপরীতে বুঝা হয় যে, যোহন মরবেন না। এভাবে ভ্রাতৃগণের মধ্যে একথা রটে গেল। এখন দেখুন, এই কথাটি যদি জনমতে পরিণত হওয়ার পরে এবং এই ভুলটির উৎপত্তির কারণ হারিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের কাছে এসে পৌঁছাত তাহলে আজ হয়ত কেউ এই কথাটি দ্বারা খৃষ্ট ধর্মকে অস্বীকার করতে প্রস্তুত হতো। এমতাবস্থায় আমাদের দৃষ্টিতে কথাটি অত্যন্ত অসুবিধাজনক হতো। যারা বলেন যে, সুসমাচারগুলি থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, যীশুর প্রেরিত শিষ্যগণ এবং প্রাচীন খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করতেন যে, তাঁদের জীবদ্দশাতেই মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান (কেয়ামত) সংঘটিত হবে, তাদের উচিত উপরের স্বল্পস্থায়ী ভুলটির বিষয়ে আমরা যা বললাম তা অনুধাবন করা। এই ভুলটি তাদেরকে ধোঁকাগ্রস্থ হতে নিষেধ করেছে।[১]

"তবে এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, তা হলো, আমরা যদি স্বীকার করি যে, প্রেরিতগণের মতামতে ভুল হতো বা তাঁদের মতামত ভুলের উর্ধ্বে ছিল না, তবে আমরা কিভাবে তাঁদের কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করব? এক্ষেত্রে খৃষ্ট ধর্মের রক্ষকগণের পক্ষ থেকে খৃষ্ট ধর্মের বিরোধীদেরকে এই উত্তরটি দিলেই যথেষ্ট হবে: আমাদের জন্য প্রয়োজন হলো, প্রেরিতদের সাক্ষ্য; তাঁদের মতামতের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। মূল বিষয়টিই হলো উদ্দেশ্য এবং এই বিষয়টি ফলাফলের দিক থেকে নিরাপদ। তবে এই উত্তরের ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সকল ভীতি অপসারিত হয়:

---

১. যীশুর প্রেরিত শিষ্যগণ ও প্রথম প্রজন্মের খৃষ্টানগণ যেমন যোহনের বিষয়ে ও কেয়ামতের বিষয়ে যীশুর ভবিষ্যৎবাণীকে ভুল বুঝেছিলেন, তেমনি আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তারা ভুল বুঝেছিলেন। তা হলো, 'সহায়' (Comforter) ও 'সত্যের আত্মা' (Spirit of Truth) সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণা। যীশু প্রস্থানের পূর্বে বলেন: "আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন" (যোহন ১৪/১৬।) তিনি আরো বলেন, "আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব ... তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন .."যোহন ১৬/৭-১৫। প্রেরিতগণ ও খৃষ্টানগণ মনে করলেন, তিনি এখানে 'পবিত্র-আত্মার' কথা বলছেন। অথচ তিনি স্পষ্ট বলছেন যে, তিনি না গেলে সেই সহায় আসবেন না। আর 'পবিত্র-আত্মা'র আগমনের জন্য যীশুর প্রস্থানের কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁর উপস্থিতিতেই তিনি বারংবার এসেছেন। এখানে যীশু সত্যের আত্মা ও সহায় বলতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগমনের কথা জানাচ্ছেন। উপরের বৈশিষ্ট্যগুলি একমাত্র তাঁর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এখানে লক্ষণীয় যে, সহায় বা Comforter শব্দটি মূল গ্রীক বাইবেলের Periclytos শব্দের অনুবাদ। এই শব্দটির মূল অর্থ 'প্রশংসিত' বা 'মুহাম্মাদ'। পরবর্তী গ্রীক সংস্করণে শব্দটি বিকৃত করে Paracletos লেখা হয়েছে। যার অর্থ এডভোকেট, দয়ালু বন্ধু। এই মহা ভুলটি খৃষ্টান সম্প্রদায়কে চিরতরে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করে।

"প্রথমত, প্রেরিতগণের প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ও তাঁদের প্রকাশিত হওয়ার দ্বারা যা প্রমাণিত হয়েছে তার থেকে অপ্রাসঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক যে সকল বিষয় তাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে তা পৃথক করতে হবে। অপ্রাসঙ্গিক সে সকল বিষয় তাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, যেগুলি ধর্মের সাথে মোটেও জড়িত নয় সেগুলির বিষয়ে আমাদের কিছুই বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যে বিষয়গুলি প্রসঙ্গত তাদের সাথে জড়িত ছিল সেগুলির বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। এগুলির মধ্যে রয়েছে ভুতে ধরা ও ভুত খেদানো। বুদ্ধিমান মানুষেরা বুঝতে পারেন যে, (মানুষকে ভুতে ধরতে পারে বা ভুত খেদানো যেতে পারে) এই ভুল ধারণাটি সেই যুগে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এজন্য সুসমাচার লেখকগণ এবং তৎকালীন ইহূদীগণ এই মিথ্যা বা ভুল ধারণাটির মধ্যে নিপতিত হয়েছেন।[১] কাজেই এই বিষয়টি মেনে নিতে হবে এবং এজন্য খৃষ্টধর্মের কোন ভয়ের কারণ নেই। কারণ, যীশু যে বিধানাবলি নিয়ে এসেছিলেন, এই বিষয়টি তার অন্তর্ভুক্ত নয়[২], বরং সেই যুগের জনমত হওয়ার কারণে বিষয়টি খৃষ্টধর্মের সাথে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছে। ভুতপ্রেত বিষয়ক মানুষদের ভুল ধারণা সংশোধন করা যীশুর মিশনের মূল দায়িত্বের অংশ নয়। যীশুর প্রতি বিশ্বাসের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

"দ্বিতীয়ত, প্রেরিতদের বিধান ও তাঁদের প্রমাণাদির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। তাঁদের দেওয়া বিধানাবলি ঐশ্বরিক প্রেরণা-নির্ভর। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বিধানগুলি প্রমাণ করার জন্য অনেক প্রকারের যুক্তিতর্ক ও প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। যেমন একটি বিধান হলো: "অ-ইহূদী কোন ব্যক্তি খৃস্টান হলে তার জন্য মোশির বিধানের আনুগত্য করা জরুরী নয়।" এই বিধানটি ঐশ্বরিক প্রেরণা-নির্ভর। অলৌকিক চিহ্ন দ্বারা এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। পৌল এই বিধান উল্লেখ করার সময় এর সপক্ষে অনেক বিষয় উল্লেখ করেছেন। মূল বিধানটি অবশ্য গ্রহণীয়। কিন্তু এর পক্ষে প্রেরিত পৌল যত কথা বলেছেন সেগুলি সবকিছুর বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা বা সমর্থন করা বা তার তুলনা ও নমুনাগুলির সত্যতা প্রমাণ করা খৃস্টধর্মের সংরক্ষণের জন্য জরুরী নয়।

---

১. শুধু প্রেরিতগণ ও ইহূদীগণই নয়, স্বয়ং যীশুও ভুত তাড়ানোর কাজই করতেন। বাইবেল পড়লে যে কোন পাঠকের মনে হবে, যীশু খৃষ্ট একজন ভুত তাড়ানো কবিরাজ ছিলেন, তাঁর শিষ্যদেরকে এই কবিরাজিই শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং জিন ভুত তাড়ানো ও তেল-পানি পড়াই খৃষ্ট ধর্মের মূল কর্ম। এছাড়া মানবতা, ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয় এখানে অনুপস্থিত। যীশু যদিও ইহূদী বিধান পালন করতে বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রেরিতগণ সেগুলি সবই বাতিল করে দেন।

২. কথাটি ঠিক নয়। ভূত-প্রেত তাড়ানোর মিশন নিয়েই যীশু এসেছিলেন। তিনি তাঁর প্রেরিতগণকে এই ক্ষমতা দিয়েই প্রেরণ করেন। শুধু তাই নয়, প্রকৃত খৃষ্টানের সঠিক বিশ্বাসের চিহ্নই হলো যে, তারা ভুত তাড়াবেন, বিষপান করবেন, সাপ খেলাবেন ইত্যাদি। মানব সেবা, সততা ইত্যাদি কোন কিছুই প্রকৃত খৃষ্টানের আলামত নয়। দেখুন মার্ক-১৬ অধ্যায় ও পূর্ববর্তী ৮৫নং ভুলের আলোচনা।

"আরো একটি বিষয়ে আমার নিকট এই কথাটি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো, যদি পবিত্র ব্যক্তিগণ কোন বিষয় সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করেন তাহলে তাঁদের ভূমিকাসমূহের ফলাফলটি অবশ্য-গ্রহণীয়। তবে তাঁদের ভূমিকাগুলি সব ব্যাখ্যা করা বা মেনে নেওয়া আমাদের জন্য জরুরী নয়। তবে যদি তাঁরা ফলাফলের ন্যায় ভূমিকাগুলির বিষয়েও ঐকমত্য পোষণ করেন তবে ভিন্ন কথা।"

গ্রন্থকার বলেন, পণ্ডিত বেলির এই বক্তব্য থেকে আমি চারিটি বিষয় বুঝতে পারছি:

প্রথম বিষয় : প্রেরিতগণ এবং প্রাচীন খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করতেন যে, তাদের যুগেই কেয়ামত বা মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান সংঘটিত হবে এবং কেয়ামতের আগে যোহনের মৃত্যু হবে না।

গ্রন্থকার বলেন, এই কথাটি সত্য। পাঠক ইতোপূর্বে ২য় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে ভুলভ্রান্তির আলোচনায় (৬৫-৭৫ নং ভুল) জানতে পেরেছেন যে, তাদের বক্তব্যগুলি এ বিষয়ে খুবই স্পষ্ট যে, তারা তাদেরই যুগে কেয়ামত ঘটবে বলে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। যোহনের সুসমাচারের ২১ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বাইবেল ব্যাখ্যাকার বার্নস লিখেছেন: "(যোহন মরবেন না) এই ভুল ধারণাটির উৎপত্তি হয়েছিল যীশুর কথাবার্তা থেকেই, যে সকল কথাবার্তা সহজেই ভুল বুঝা হতো।[১] আর দ্বিতীয় যে কারণে এই ধারণাটি আরো জোরালো হয়েছিল তা হলো, সকল প্রেরিতের মৃত্যুর পরেও যোহন জীবিত ছিলেন।"[২]

হেনরী ও স্কটের বাইবেল ব্যাখ্যার সংকলকগণ বলেন : "সম্ভবত যীশুর একথার অর্থ ছিল ইহূদীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। কিন্তু প্রেরিতগণ ভুল বুঝেছিলেন যে, যোহন কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন, অথবা তিনি জীবিত অবস্থাতেই স্বর্গে উত্থিত হবেন।"

অতঃপর তাঁরা বলেন: "একজন মানুষের বর্ণনা বিচার-বিবেচনাবিহীন হতে পারে। আর এইরূপ বর্ণনার উপর বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করা আহাম্মকী ও বোকামি। কারণ এই বর্ণনা ছিল প্রেরিতদের বর্ণনা এবং তা ভ্রাতৃগণের মধ্যে অতি প্রচলিত সাধারণ বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল। তা ছিল মৌলিক, প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। এত কিছু সত্ত্বেও তা ছিল মিথ্যা। তাহলে এখন অলিখিত মৌখিক বর্ণনাগুলির উপর নির্ভর করা কোন পর্যায়ের হবে তা অনুমান করা যায়। এই ব্যাখ্যাটি ছিল লিখিত বর্ণনা নির্ভর, যীশুর কোন নতুন মৌখিক কথা ছিল না, তা সত্ত্বেও তা ভুল ছিল।"

এরপর তাঁরা টীকায় বলেছেন, প্রেরিতগণ যীশুর কথাগুলিকে ভুল বুঝেছিলেন। সুসমাচার লেখক সে কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ তাঁরা কল্পনা করতেন যে, প্রভু শুধু ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করবেন।

১. যে গুরুর কথাবার্তা তাঁর নিকটতম শিষ্যরাই ভুল বুঝে সে গুরুর শিক্ষার মূল্য কোথায়?
২. ৯৮ খৃষ্টাব্দে যোহন মৃত্যু বরণ করেন।

এ সকল ভাষ্যকারের আলোচনা থেকে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি প্রেরিতগণ ভুল বুঝেছিলেন। কেয়ামতের আগে যোহন মরবেন না বলে তাঁরা যেমন বিশ্বাস করতেন, তেমনি তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, তাঁদের যুগেই কেয়ামত ও পুনরুত্থান ও শেষ বিচার অনুষ্ঠিত হবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে, তাঁদের যুগে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে তাঁদের যে সকল বক্তব্য বাইবেলে রয়েছে সেগুলি সবই বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। কারণ তাঁরা যা বিশ্বাস করতেন তাই বলেছেন। এভাবে তাঁদের বিশ্বাসের মত তাঁদের এ সকল বক্তব্যও ভুল ও অসত্য বলে গণ্য হবে। এ সকল বক্তব্যের ব্যাখ্যা করা বা এগুলির কোন গোপন বা গূঢ় অর্থ বের করা নিন্দনীয় কাজ বলে গণ্য হবে। কারণ এগুলির ব্যাখ্যা করার অর্থ হলো, বক্তব্যদাতা যে অর্থ মানতে রাজি নন, সেই অর্থ দ্বারা বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করা। আর এ কথাগুলি যেহেতু ভুল, সেহেতু সেগুলি ঐশ্বরিক প্রেরণার নির্ভর হতে পারে না।

দ্বিতীয় বিষয় : পণ্ডিত বেলি স্বীকার করেছেন যে, যে সকল কাজকর্ম ধর্মবিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বা সে সকল বিষয় দৈবক্রমে ধর্ম বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেগুলির মধ্যে ভুলভ্রান্তি থাকলে তাতে খৃস্ট ধর্মের কোন ক্ষতি হবেনা।

তৃতীয় বিষয় : তিনি স্বীকার করেছেন যে, প্রেরিতগণের উদাহরণ, উপমা ও দলিল-প্রমাণাদির মধ্যে ভুলত্রুটি থাকলে তাতে খৃস্ট ধর্মের কোন ক্ষতি হয় না।

চতুর্থ বিষয় : তিনি স্বীকার করেছেন যে, ভূতপ্রেতের আছর বা ভূতে ধরার বিষয়টি একটি অবাস্তব মিথ্যা কল্পনা মাত্র। এই ভুলটি প্রেরিতদের কথায় এবং যীশুর কথায় রয়েছে। এর কারণ হলো, এই কুসংস্কার বা ভুল ধারণাটি সেই যুগে ও সেই এলাকার সকলের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

এই চারিটি বিষয় যদি আমরা মেনে নিই তাহলে বাইবেলের নতুন নিয়মের অর্ধেকেরও বেশি অংশ ভুল ও মানবীয় কথাবার্তা বলে গণ্য হবে এবং সেগুলি ঐশ্বরিক প্রেরণা নির্ভর নয় বলে প্রমাণিত হবে, বাকি ধর্মীয় বিধিবিধান ও নির্দেশনাগুলি কেবল ঐশ্বরিক বলে গণ্য হবে। কিন্তু মি. বেলির এই মতটি তাঁর গুরু মার্টিন লুথারের মতের বিপরীত। কাজেই বেলির এই মতটিও গ্রহণযোগ্য হবে না। মি. লুথার দাবি করেছেন যে, ধর্মীয় বিধিবিধান ও নির্দেশাবলি প্রদানের একমাত্র অধিকার যীশুর। কাজেই কোন প্রেরিতের অধিকার নেই যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোন বিধান প্রদান করবেন। তাঁর এই মত অনুসারে প্রেরিতগণের দেওয়া বিধিবিধান ও নির্দেশাবলিও ঐশ্বরিক প্রেরণা নির্ভর নয়।

১৫শ বিষয়

ক্যাথলিক ওয়ার্ড ১৮৪১ সালে মুদ্রিত তাঁর পুস্তকে প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের নির্ভরযোগ্য ধর্মগুরু পণ্ডিতগণের বিভিন্ন বচন ও বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। যে সকল গ্রন্থ থেকে তিনি এসব বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন সে সকল গ্রন্থের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন। আমি এখানে তাঁর পুস্তকটি থেকে খ্যাতনামা প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতদের ৯টি বক্তব্য উদ্ধৃত করছি।

১. জন ক্লীস[১] ও প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের অন্যান্য পণ্ডিত বলেন: "পৌলের পত্রাবলির অন্তর্ভুক্ত সকল কথাই পবিত্র বা ঐশ্বরিক নয়। কিছু কিছু বিষয়ে তিনি ভুল করেছেন।"

২. মিস্টার ফুল্ক বলেন, প্রেরিত পিতর ভুল করেছেন এবং তিনি সুসমাচার সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন।

৩. প্রটেস্ট্যান্ট ড. কোড এবং ক্যাথলিক ফ্যাডরকীম-এর মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই বিতর্ক বিষয়ক পুস্তকে ড. কোড লিখেছেন, পবিত্র আত্মার অবতরণের পরেও পিতর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভুল করেন।

৪. প্রিনশাস, যাঁকে গোয়েল 'মহাত্মা ও পথপ্রদর্শক' বলে অভিহিত করেছেন, তিনি বলেছেন: প্রেরিতগণের নেতা পিতর এবং বার্নাবাস পবিত্র আত্মার আগমনের পরেও ভুল করেছিলেন। অনুরূপভাবে যিরুশালেমের চার্চমণ্ডলীও ভুল করেছিলেন।

৫. জন ক্যালভিন বলেন, "পিতর চার্চের মধ্যে নব-উদ্ভাবিত নিয়ম প্রচলিত করেন এবং খৃস্টীয় স্বাধীনতাকে ভীতির মধ্যে নিক্ষেপ করেন এবং তিনি খৃস্টীয় সমন্বয়কে দূরে নিক্ষেপ করেন।

৬. মীকডি ব্রজেন্স বলেন, প্রেরিতগণ, বিশেষ করে পৌল ভুল করতেন।

৭. ওয়াই টিকার বলেন, যীশুর স্বর্গারোহণের পরে এবং পবিত্র আত্মার অবতরণের পরে সবগুলি চার্চ-মণ্ডলীই ভুলের মধ্যে নিপতিত হয়েছিল। শুধু সাধারণ মানুষেরা নয়, বরং বিশেষ বিশেষ মানুষেরাও এভাবে ভুলের মধ্যে নিপতিত হয়েছিলেন। এমনকি প্রেরিতগণও অ-ইস্রায়েলীয় মানুষদেরকে খৃস্ট ধর্মের দিকে আহবান করার ক্ষেত্রে ভুল করেছিলেন। নিয়মকানুনের ক্ষেত্রেও পিতর ভুল করেছিলেন। এ সকল কঠিন কঠিন ভুল করেছিলেন প্রেরিতগণ পবিত্র আত্মার অবতরণের পরে।

৮. যেনকিন্স তাঁর চিঠিতে জন ক্যালভিনের কিছু অনুসারী সম্পর্কে লিখেন, তাঁরা বলেন যে, এখন যদি পৌল জেনেভায় এসে জন ক্যালভিনের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তাহলে আমরা পৌলকে বাদ দেব এবং জন ক্যালভিনের কথাই শুনব।

৯. লোয়াথরোস উল্লেখ করেছেন যে, লুথারের অনুসারী খ্যাতনামা কিছু ধর্মগুরু পণ্ডিত বলতেন, পৌলের বিধান ও নির্দেশে আমরা সন্দেহ করতে পারি, কিন্তু লুথারের বিধান ও নির্দেশ এবং ইসপার্ক চার্চের ধর্ম বিশ্বাসের গ্রন্থে আমরা কোন সন্দেহ পোষণ করতে পারি না।

ক্যাথলিক ওয়ার্ড-এর উদ্ধৃতি এখানেই শেষ।

উপরে উল্লিখিত এ সকল পণ্ডিত সকলেই প্রটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু। এরা সকলেই স্বীকার করলেন যে, নতুন নিয়মের সকল কথা ঐশ্বরিক প্রেরণা-নির্ভর নয়। অনুরূপভাবে তাঁরা প্রেরিতদের ভুলভ্রান্তির কথাও স্বীকার করলেন।

১. জন ক্লীস জুরিখ চার্চের দায়িত্বশীল ছিলেন। পোপের অনাচারের বিরোধিতা করে তিনি প্রটেস্ট্যান্ট মত গ্রহণ করেন। ১৫৩১ খৃস্টাব্দে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

১৬শ বিষয়

মহাত্মা নরটন বাইবেলের পুস্তকাবলির সূত্র ও পাণ্ডুলিপিসমূহের বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পুস্তকটি ১৮৩৭ সালে বোস্টনে মুদ্রিত হয়েছে। উক্ত পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: "একহার্ন তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন: খৃষ্ট ধর্মের প্রথম অবস্থায় যীশুর অবস্থাদি বর্ণনার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা ছিল। একথা বলা যায় যে, এই পুস্তিকাটিই ছিল 'মূল সুসমাচার'। যে সকল নতুন খৃষ্টান খৃষ্টের কথাবার্তা নিজের কানে শুনেন নি এবং তাঁর অবস্থাদি স্বচক্ষে দেখেননি, সম্ভবত তাদের জন্য এই পুস্তিকাটি রচনা করা হয়েছিল। এই সুসমাচারটি একটি অতি সাধারণ সংকলনের আকৃতিতে ছিল। এতে যীশুর ঘটনাবলি সুশৃঙ্খল পরম্পরায় লিখিত ছিল না।[১]

{একহার্নের বক্তব্য অনুসারে এই মূল সুসমাচারটি প্রচলিত সুসমাচারগুলি থেকে সম্পূর্ণ অন্য রকমের ছিল। প্রচলিত সুসমাচারগুলি মূলটির মত অসংলগ্ন সংকলন নয়; বরং এগুলিকে অত্যন্ত যত্নসহকারে পরিশ্রম করে সাজিয়ে লেখা হয়েছে। মূল সুসমাচারে ছিল না এরূপ অনেক ঘটনা প্রচলিত সুসমাচারগুলিতে লিখা হয়েছে।}[২]

এই সুসমাচারটিই ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত সকল 'সুসমাচারের' মূল উৎস। মথি, মার্ক ও লূকের উৎসও ছিল এই সুসমাচারটি। এই সুসমাচারত্রয় প্রচলিত অন্য সকল সুসমাচারের উপরে উঠে যায় এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। কারণ এই সুসমাচারত্রয়ের মধ্যেও মূল সুসমাচার থেকে কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল, কিন্তু এগুলি এমন কিছু মানুষের হাতে পড়ে যায় যারা এর অসম্পূর্ণতা দূর করেন। যে সকল সুসমাচারের মধ্যে যীশুর নবুওয়ত পরবর্তী অবস্থাগুলি আলোচনা করা হয়েছিল সেগুলিকে তারা বাদ দেন। যেমন মারসিয়নের সুসমাচার (Gospel of Marcion), টিশেন সুসমাচার[৩] ও অন্যান্য সুসমাচার। এরপর তাঁরা এই সুসমাচারত্রয়ের মধ্যে আরো কিছু বিষয় যোগ

---

১. খৃষ্টান গবেষকগণ প্রায় সকলেই একমত যে, মথি, মার্ক ও লূকের সুসমাচারের উৎস মূল একটি সংক্ষিপ্ত 'সুসমাচার' যাতে বিস্তারিত ঘটনাবলি কিছুই ছিল না, শুধু যীশুর বক্তব্যসমূহ তাতে সংকলিত ছিল। হারিয়ে যাওয়া এই মূল সুসমাচারটিকে খৃষ্টান গবেষকগণ 'কিউ' (Q) বলে অভিহিত করেন। জার্মান Quelle শব্দ থেকে এই 'কিউ' অক্ষরটি নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ source বা উৎস। এতে ইস্টার, প্যাশন ইত্যাদি কিছুই ছিল না। যেহেতু এতে শুধু যীশুর বচন সংকলন করা হয়েছিল, এজন্য গবেষকগণ একে Logia বলে অভিহিত করেন। দেখুন : The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition, Vol-10, Jesus Christ, p 146.

২. বন্ধনীর মধ্যের কথাটুকু গ্রন্থকারের সংযোজন, একহার্নের বক্তব্যের অংশ নয়।

৩. এখানে কোন গসপেল বুঝানো হচ্ছে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারিনি। প্রচলিত চার গসপেলের অতিরিক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত অন্যান্য গসপেলের মধ্যে রয়েছে: Gospel of perfection, gospel of Truth, Gospel of Judas, Gospel of Peter, Gospel of Philip, gospel of Thomas, Infancy Gospel, Protevangelium of James, Gospel of Eve, Gospel of Mary, Gospel of Ebionites, Gospel of Egyptians, Gospel of Hebrews, Gospel of Nazarenes. সম্ভবত এখানে Gospel of Perfection বুঝানো হয়েছে। দেখুন; The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition, Vol-2, Biblical Literature, p 973.

করেন। যেমন বংশ তালিকা, জন্মের ঘটনা, বয়ঃপ্রাপ্তির ঘটনা ইত্যাদি। এ সকল ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় 'স্মৃতি' নামে প্রসিদ্ধ 'সুসমাচারটিতে।[১] জাস্টিন এই গ্রন্থটি এবং সার্নথিস-এর সুসমাচার থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ সকল সুসমাচারের যে অংশ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলির তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন সুসমাচারে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি ও সংযোজন ঘটেছে। যেমন (যীশুর বাপ্তাইজিত হওয়ার পরে) স্বর্গ (আকাশ) হতে যে কথাটি শুনতে পাওয়া যায় তা ছিল: "তুমি আমার পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি।" জাস্টিন দুই স্থানে এইরূপই উদ্ধৃত করেছেন। ক্লিমেন্ট অজ্ঞাত পরিচয় একটি 'সুসমাচার' থেকে এই বাক্যটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন নিম্নরূপ: "তুমি আমার প্রিয় পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি।" আর প্রচলিত সুসমাচারগুলিতে এই বাক্যটি নিম্নরূপে লেখা হয়েছে: "তুমিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।" মার্ক তাঁর সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১১ পংক্তিতে এভাবেই লিখেছেন। এবিয়নীয় সুসমাচারে (Gospel of Ebionites) উভয় বাক্যকে একত্রিত করে বলা হয়েছে: "তুমিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি।" আবিভ্যান্স এই উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করেছেন।

এভাবে খৃষ্টীয় ইতিহাসের আবর্তনের সাথে সাথে অসংখ্য সংযোজন ও বৃদ্ধি মূল উৎসের বক্তব্যের সাথে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যায় যে, মুল থেকে সংযোজনকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার কোন উপায় থাকে না। এই সংযোজন ও সংমিশ্রণ সম্পর্কে যিনি নিশ্চিত হতে চান তিনি বিভিন্ন সুসমাচারে বর্ণিত যীশুর বাপ্তাইজ হওয়ার ঘটনাটি পর্যালোচনা করুন। ঘটনাটি তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন সুসমাচার থেকে সংকলন করা হয়েছে (ফলে বিভিন্ন অসংলগ্নতা ও বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে)।[২]

অতঃপর দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে অথবা তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে খৃষ্টীয় চার্চ সত্য সুসমাচার সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হয়। চার্চ চেষ্টা করে যে, তার সাধ্য মত যীশুর সঠিক তথ্য পরবর্তী প্রজন্মদের কাছে পৌঁছে দেবে। তখন সে তৎকালে প্রচলিত সুসমাচারগুলির মধ্য থেকে এই চারিটি সুসমাচার বেঁছে নেয়। কারণ চার্চ মনে করেছিল যে, এগুলি গ্রহণযোগ্য এবং পূর্ণাঙ্গ।

মথি, মার্ক ও লূকের সুসমাচারের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষে অথবা তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে। এর পূর্বে এই সুসমাচারত্রয়ের কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না।

সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি এই পুস্তকত্রয়ের উল্লেখ করেন তিনি হলেন আরিনাউস (Irenaus)। আনুমানিক ২০০ খৃষ্টাব্দের দিকে তিনিই সর্বপ্রথম এই পুস্তকগুলির উল্লেখ করেন এবং এদের সংখ্যার বিষয়ে কিছু প্রমাণ পেশ করেন। এরপর এ বিষয়ে অত্যন্ত পরিশ্রম ও সাধনা করেন আলেকজান্ড্রিয়ার ক্লিমেন্ট (Clement of Alexandira) ২১৬

১. সম্ভবত এখানে Protevangelium of James বুঝানো হচ্ছে।

২. ৭৮ নং বৈপরীত্য দেখুন।

খৃস্টাব্দে। তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন যে, এই সুসমাচার চতুষ্টয় অবশ্য মান্য। এ থেকে প্রকাশ পেল যে, খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষে বা তৃতীয় শতকের শুরুতে খৃস্টীয় চার্চ সাধারণভাবে এই সুসমাচার চতুষ্টয়কে মেনে নেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়। এগুলির অস্তিত্ব এর পূর্ব থেকেই ছিল, যদিও সামগ্রিকভাবে বর্তমানের অবস্থায় ছিল না।

খৃস্টীয় চার্চ চায় যে, মানুষ অন্য সকল প্রচলিত সুসমাচার বাদ দিয়ে শুধু এই চারিটিই মেনে চলে। প্রাচীন প্রচারকদের প্রচারকার্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য যে মূল সুসমাচারটি সংকলন করা হয়েছিল, যদি চার্চ সেই মূল সুসমাচারটি সকল সংযোজন ও বৃদ্ধি থেকে মুক্ত করে প্রকাশ করত এবং এর সাথে যোহনের সুসমাচারটি সংযুক্ত করত, তবে পরবর্তী প্রজন্মগুলি তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকতো। কিন্তু এই কাজটি তাদের জন্য সম্ভব ছিল না। কারণ একটি পাণ্ডুলিপিও এইরূপ বৃদ্ধি ও সংযোজন থেকে মুক্ত ছিল না। আর মূল সুসমাচারটিকে সংযোজন ও বৃদ্ধি থেকে পৃথক করার কারণাদিও ছিল অতি অল্প।

এরপর একহার্ন টীকায় বলেন: প্রাচীন যুগের অনেক ধর্মবেত্তা পণ্ডিতই আমাদের মধ্যে প্রচলিত এই সুসমাচার চতুষ্টয়ের অনেক অংশ সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু তাঁরা তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারেন নি।

এরপর একহার্ন বলেন: বর্তমান যুগে মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে কারো পক্ষে একটি বই বিকৃত করা সম্ভব নয়। সে জন্য বর্তমান যুগে এরূপ কিছু শোনা যায় না। কিন্তু অতীত কালে যখন মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি তখনকার অবস্থা ছিল ভিন্ন। একটি পাণ্ডুলিপি একজন মানুষের মালিকানাধীন। তার জন্য কিছু কথা সংযোজন করা খুবই সম্ভব ছিল। এরপর যখন এই পাণ্ডুলিপি থেকে অনেক কপি করা হতো, তখন এই কপিগুলি শুধু মূল লেখকের কথাই কপি করছে, না সংযোজিত বাক্যগুলিও কপি করছে তা খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা হতো না। অজ্ঞতার কারণে এ সকল কপি প্রচারিত হয়ে যেত। মধ্য যুগে লিখিত অনেক পাণ্ডুলিপি এখনো রয়েছে, যেগুলিতে কমবেশি এ সকল সংযোজন রয়েছে। অনেক ধর্মগুরু পণ্ডিতকে আমরা দেখেছি, তাঁরা কঠিনভাবে অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদের লেখা বইগুলি কিছুদিনের মধ্যেই লিপিকার ও পাণ্ডুলিপির মালিকেরা বিকৃত করে ফেলেছে। (প্রথম শতকের প্রসিদ্ধ গ্রীক খৃস্টান পণ্ডিত) ডিওনিসিয়াসের (Dionysius) বইপুস্তক প্রসিদ্ধি লাভের পূর্বেই বিকৃত করা হয়েছে। প্রাচীন খৃস্টানগণ অভিযোগ করতেন যে, শয়তানের (দিয়াবলের) শিষ্যরা এগুলির মধ্যে অপবিত্র কথা সংযোজন করেছে, কিছু বিষয় বের করে দিয়েছে এবং তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় সংযোজন করেছে।

এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারি যে, বাইবেলের পুস্তকাবলি সংরক্ষিত ছিল না। যদি তৎকালীন মানুষদের মধ্যে এইরূপ সংযোজন ও বিকৃতির অভ্যাস না থাকত তাহলে সেই যুগের লেখকগণ কেউ যেন তাদের লিখনির মধ্যে কোন বিকৃতি না করে সে বিষয়ে কঠিন প্রতিজ্ঞা ও অভিশাপের ঘোষণা দিতেন না।

যীশুর ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি অবশ্যই ঘটেছে। নইলে কেন সেলসাস অভিযোগ করবেন যে, তারা তিনবার বা চারবার বা তারও বেশি বার তাদের সুসমাচারগুলিকে পরিবর্তন করেছে। এছাড়া যদি যীশুর ইতিহাস রচনায় সংযোজন ও বিকৃতি নাই হবে তাহলে যীশুর জীবনের কোন কোন ঘটনা কোন কোন সুসমাচারে বিক্ষিপ্ত রয়েছে, আবার কোন কোন সুসমাচারে একত্রিত করা হয়েছে কিভাবে? যেমন, যীশুর বাপ্তাইজ হওয়ার ঘটনাটি প্রথম তিন সুসমাচারে এবং 'স্মৃতি' নামক যে গ্রন্থটি থেকে জাস্টিন উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। এবিভাগ বিষয়টি লিখেছেন। পক্ষান্তরে এবিয়নিয় সুসমাচারে (Gospel of Ebionites) সমস্ত ঘটনা একত্রিত করে লিখা হয়েছে।

এরপর একহার্ন অন্য স্থানে বলেন ঃ যে সকল মানুষের গভীর গবেষণার কোন প্রস্তুতি ছিল না, তারা এ সকল সুসমাচারের প্রকাশিত হওয়ার দিন থেকেই এগুলির মধ্যে সংযোজন, বিয়োজন, এক শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ স্থাপন ইত্যাদি বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করে চলেছেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ খৃস্টীয় ইতিহাসের শুরু থেকেই মানুষেরা তাদের কাছে সংরক্ষিত ওয়াজ-উপদেশের বাক্যাবলি এবং যীশুর বিভিন্ন ঘটনাবলি নিজেদের জ্ঞানানুসারে পরিবর্তন পরিবর্ধন করতো। প্রথম প্রজন্মের খৃষ্টানগণই এই অভ্যাস চালু করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মেও তা অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই অভ্যাস অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। ফলে খৃস্টধর্মের বিরোধীরাও বিষয়টি অবগত ছিলেন।। (দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের পৌত্তলিক পণ্ডিত) সেলসাস (Celsus Epicurean) খৃস্টানদের সম্পর্কে আপত্তি করে বলেন, তারা তাদের সুসমাচারগুলিকে তিন বার অথবা চার বার অথবা তারও বেশি বার পরিবর্তন করেছে। তারা এমনভাবে পরিবর্তন করেছে যে, সেগুলির বিষয়গুলিও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় শতকের শেষে ক্লিমেন্স উল্লেখ করেছেন যে, কিছু মানুষ সুসমাচারগুলি বিকৃত করতো। মথির সুসমাচারের ৫ম অধ্যায়ের ১০ আয়াতেও এইরূপ বিকৃতি ঘটেছিল বলে বলা হতো। বাক্যটি: "কারণ স্বর্গ রাজ্য তাহাদেরই"। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে বাক্যটি নিম্নরূপ: "তাহারাই পূর্ণ হবেন।" কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে বাক্যটি নিম্নরূপ: "তাহারা এমন স্থান পাইবে যেখানে ব্যথিত হইবে না।"

নর্টনের উদ্ধৃতি অনুসারে একহার্নের বক্তব্য এখানেই শেষ।

এরপর নর্টন বলেন, "কেউ যেন মনে না করে যে, এই মতটি একহার্নের একার মত। কারণ জার্মানদের মধ্যে একহার্নের এই বইটির চেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা আর কোন বই লাভ করতে পারে নি। সুসমাচারগুলির বিষয়ে অনেক সমসাময়িক জার্মান গবেষকই একহার্নের সাথে একমত। অনুরূপভাবে যে সকল বিষয়ের কারণে সুসমাচারগুলির সত্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয় সেগুলির ব্যাপারেও তারা একহার্নের সাথে একমত।"

নর্টন বাইবেলের বিশুদ্ধতা সমর্থন করেন। এজন্য তিনি একহার্নের উপরোক্ত মতামত খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যে, তিনি উল্লেখযোগ্য

কোন কিছুই বলতে পারেন নি। সর্বোপরি, তিনি বাইবেলের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করতে যেয়েও নিম্নলিখিত ৭টি স্থানে বিকৃতি ও সংযোজনের কথা স্বীকার করেছেন।

১. তাঁর পুস্তকের ৫৩ পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মথির সুসমাচারের ১ম ও ২য় অধ্যায় মথির নিজের লেখা নয়।

২. ৬৩ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, ঈষ্কারিয়োতীয় যিহূদার কাহিনী বর্ণনায় মথির সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ের ৩ আয়াত থেকে ১০ আয়াত পর্যন্ত কথাগুলি মিথ্যা এবং সংযোজিত।

৩. অনুরূপভাবে এই অধ্যায়ের ৫২ ও ৫৩ নং আয়াতদ্বয়ও সংযোজিত।

৪. ৭০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মার্কের সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ের ৯ থেকে ২০ পর্যন্ত ১২টি আয়াত সংযোজিত।

৫. ৭৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: লূকলিখিত সুসমাচারের ২২ অধ্যায়ের ৪৩ ও ৪৪ আয়াতদ্বয় সংযোজিত।

৬. ৮৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: যোহনলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ের ৩ ও ৪ আয়াতে নিম্নের কথাটি সংযোজিত: "তাহারা জলসঞ্চালনের অপেক্ষায় থাকিত। কেননা বিশেষ বিশেষ সময়ে ঐ পুষ্করিনীতে প্রভুর এক দূত নামিয়া আসিতেন ও জল কম্পন করিতেন; সেই জলকম্পের পরে যে কেহ প্রথমে জলে নামিত, তাহার যে কোন রোগ হউক, সে তাহা হইতে মুক্তি পাইত।"

৭. ৮৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে: যোহনের সুসমাচারের ২১ অধ্যায়ের ২৪ ও ২৫ আয়াতদ্বয় সংযোজিত।

তাহলে এই সাতটি স্থান সংযোজিত, যেগুলি ঈশ্বরিক প্রেরণা-লব্ধ নয়।

৬১ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, "লূক যে সকল অলৌকিক চিহ্নসমূহ উল্লেখ করেছেন সেগুলির সাথে ঔপন্যাসিক মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে। লেখক (লূক) কাব্যিক উচ্ছাস ও বাড়াবাড়ি সহকারে তা মিশ্রিত করে ফেলেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে সত্য থেকে মিথ্যাকে পৃথক করা কঠিন।"

তাহলে, মিথ্যা ও কাব্যিক উচ্ছাসের সাথে মিশ্রিত বর্ণনা কিভাবে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা বা ঐশী প্রত্যাদেশ বলে গণ্য হবে?

গ্রন্থকার বলেন, একহার্নের বক্তব্য, সমসাময়িক অধিকাংশ জার্মান পণ্ডিত যে মত গ্রহণ করেছেন, থেকে আমরা চারটি বিষয় জানতে পারছি:

প্রথমত, মূল সুসমাচারটি হারিয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, প্রচলিত সুসমাচারগুলিতে সত্য ও মিথ্যা উভয় প্রকারের বিবরণ রয়েছে।

তৃতীয়ত, এগুলিতে বিকৃতিও ঘটেছে। সেলসাস (Celsus Epicurean) ছিলেন একজন্য পৌত্তলিক পণ্ডিত। তিনি খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকেই চিৎকার করে ঘোষণা করেছেন যে, খৃস্টানগণ তাদের সুসমাচারগুলিকে তিনবার অথবা চারবার অথবা তার

বেশি বার পরিবর্তন করেছে। তারা এমনভাবে পরিবর্তন করেছে যে, সেগুলির বিষয়বস্তু পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।

চতুর্থত, দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ বা তৃতীয় শতাব্দীর শুরুর আগে এই সুসমাচার চতুষ্টয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

লীক্লার্ক, কোপ, মিকাইলস, লিসনেক, ইয়েনমার, মার্শ প্রমুখ পণ্ডিতের মতও একহার্নের মতের কাছাকাছি। এরা বলেছেন, সম্ভবত মথি, মার্ক ও লূকের কাছে হিব্রু ভাষায় লেখা একটি পুস্তিকা ছিল। এই পুস্তিকায় খৃস্টের ঘটনাবলি লিখিত ছিল। তাঁরা এই পুস্তিকা থেকে তাঁদের তথ্যগুলি উদ্ধৃত করেছেন। মথি বেশি বেশি উদ্ধৃত করেছেন আর মার্ক ও লূক কম উদ্ধৃত করেছেন। হর্ন ১৮২২ সালে মুদ্রিত তাঁর বাইবেল-ব্যাখ্যা গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ২৯৫ পৃষ্ঠায় এদের এই মতটি উদ্ধৃত করেছেন। হর্ন এদের মত মেনে নেননি। তবে তাঁর না মানাতে আমাদের কিছু আসে যায় না।

১৭শ বিষয়

ইহূদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই বলেন যে, ইয্রা ভাববাদী হগয় ভাববাদী ও ইদ্দোর পুত্র সখরিয়, এই দুইজন ভাববাদীর সহায়তায় 'বংশাবলির' (The Chronicles) দুইটি খণ্ড রচনা করেন। এই গ্রন্থদু'টি মূলত এই তিন ভাববাদীর লেখা। অথচ তাঁরা তিনজনে বংশাবলির প্রথম খণ্ডে ভুল করেছেন। এই ভুলের কারণ হিসাবে ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ বলেছেন যে, লেখক (তিন ভাববাদী) এখানে পুত্র ও পৌত্রের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেননি বলে ভুল করেছেন।

ইহূদী খৃস্টান পণ্ডিতগণ আরো বলেন যে, এই পুস্তকের রচিয়তা ইয্রা ভাববাদীর জানা ছিল না যে, এদের কেউ কেউ পুত্র এবং কেউ কেউ পৌত্র। আর ইয্রা বংশতালিকার যে কাগজগুলি হাতে পেয়েছিলেন সেগুলি ছিল অসম্পূর্ণ; এজন্য তিনি ভুল তথ্য ও সঠিক তথ্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন নি। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়ে পাঠক তা জানতে পারবেন।

এ থেকে জানা গেল যে, এই তিন ভাববাদী এই পুস্তকটি ঐশ্বরিক প্রেরণা বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে লিখেন নি। যদি তাই লিখতেন তাহলে তাঁদেরকে অসম্পূর্ণ কাগজপত্রের উপর নির্ভর করতে হতো না এবং তাঁদের ভুলও হতো না। ইহূদী-খৃস্টানগণের নিকট এই পুস্তকটি এবং বাইবেলের অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সবগুলিই একই মর্যাদার। এতে প্রমাণিত হলো যে, ইহূদী-খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে ভাববাদিগণ যেমন পাপের উর্ধ্বে ছিলেন না, তেমনি লিখনির ক্ষেত্রের তাঁরা ভুলের উর্ধ্বে ছিলেন না। এতে স্পষ্ট হলো যে, বাইবেলের পুস্তকাবলি ঐশ্বরিক প্রেরণার মাধ্যমে লিখিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত নয়।

এই পরিচ্ছেদে যা কিছু আলোচনা করা হলো, তা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের সকল পুস্তক বা এ সকল পুস্তকে উল্লিখিত সকল

কথা ঐশ্বরিক প্রেরণার (ওহী, ইলহাম, Divine Inspiration, Revelation) মাধ্যমে লিখা হয়েছে বলে দাবি করার কোন সুযোগ ইহূদী-খৃষ্টানদের কারো নেই।

তওরাত ও ইঞ্জিল বনাম বাইবেল: মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা

যীশুর ইঞ্জিল হারিয়ে গিয়েছে

উপরের চারিটি পরিচ্ছেদ শেষ করার পরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাকে বলতে হবে। তা হলো মূল তাওরাত এবং মূল ইঞ্জিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালামের আগমনের পূর্বেই হারিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের নামে প্রচলিত বই দুইটি মূলত কোন ঐশ্বরিক গ্রন্থ নয় বরং এই বই দুইটি হচ্ছে জীবনী ও ইতিহাসমূলক দুইটি সংকলন, যাতে সত্য ও মিথ্যা সকল প্রকার কথা ও কাহিনী সংকলন করা হয়েছে।

আমরা কখনোই বলি না যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগে তাওরাত ও ইঞ্জিল সঠিকরূপে বিদ্যমান ছিল এবং তারপরে তা বিকৃত করা হয়েছে। আমরা কখনোই তা বলি না।

পৌল ভাক্ত ভাববাদী, তাঁর বক্তব্য ও মতামত গ্রহণযোগ্য নয়

পৌলের বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস হলো, খৃষ্ট ধর্মের প্রথম প্রজন্মে যে সকল মিথ্যাবাদী ভাক্ত ভাববাদীর আবির্ভাব ঘটেছিল, পৌল ছিলেন তাদের অন্যতম। কাজেই নতুন নিয়মে সংকলিত পৌলের পত্রাবলি ও বক্তব্যসমূহ যদি প্রকৃতপক্ষে তাঁর বলে প্রমাণিত হয় তাহলেও আমাদের নিকট সেগুলির কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। যদিও ত্রিত্ববাদিগণ তাঁকে পবিত্র-পুরুষ বলে বিশ্বাস করেন, কিন্তু আমরা একটি কানা পয়সা দিয়েও তার কথা ক্রয় করতে ইচ্ছুক নই।

প্রেরিতগণ সৎ ও ধার্মিক ছিলেন, ভাববাদী ছিলেন না

অবশিষ্ট প্রেরিত শিষ্যগণের সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস হলো যে, তাঁরা যীশুর ঊর্ধ্বারোহণের পরে সততা ও ধার্মিকতার মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। তবে আমরা তাঁদেরকে ভাববাদী বা নবী বলে বিশ্বাস করি না। আমাদের দৃষ্টিতে তাঁদের বক্তব্য ও মতামত অন্যান্য সাধারণ সৎ ও ধার্মিক ধর্মবিদ পণ্ডিতের মতামতের মতই, ভুলের ঊর্ধ্বে নয়।

যীশু ও তাঁর শিষ্যদের যুগ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত নতুন নিয়মের কোন পুস্তক বা পত্রের কোন অবিচ্ছিন্ন সূত্র-পরম্পরা পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে মথির লেখা মূল হিব্রু সুসমাচারটিও হারিয়ে গিয়েছে। এর যে গ্রীক অনুবাদটি প্রচলিত আছে, এখন পর্যন্ত কেউ সেই অনুবাদকের নামটিও নিশ্চিতরূপে বলতে পারেন না। এরপর সেগুলির মধ্যে বিকৃতির প্রবেশ করার কারণে তার নির্ভরযোগ্যতা আরো নষ্ট হয়েছে।

এখানে তৃতীয় একটি কারণ বিদ্যমান। তা হলো, এ সকল মানুষ (যীশুর শিষ্যগণ ও প্রথম যুগের খৃষ্টানগণ) অনেক সময় যীশুর কথার মর্মও সঠিকভাবে বুঝতে পারতেন না। পরবর্তীতে পাঠক তা বিস্তারিত জানতে পারবেন। লূক ও মার্ক যীশুর প্রেরিত শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাঁরা ঐশ্বরিক প্রেরণা লাভ করেছিলেন বলে কোন প্রমাণ নেই।

তাওরাত ও ইঞ্জিলের পরিচয়

আমাদের বিশ্বাস অনুসারে মোশি (মূসা আ.) -কে প্রত্যাদেশের (Revelation) মাধ্যমে যা প্রদান করা হয়েছে তাই হলো তাওরাত। আর যীশুকে (ঈসা আ.) প্রত্যাদেশের (Revelation) মাধ্যমে যা প্রদান করা হয়েছে তাই হলো ইঞ্জিল।

সূরা বাকারায় বলা হয়েছে: "এবং আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করেছি।"[১] ঈসা (আ) (যীশু) সম্পর্কে সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে: " এবং আমি তাকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি।"[২] সূরা মরিয়মে ঈসা (আ)-এর যবানীতে বলা হয়েছে: "আমাকে তিনি গ্রন্থ প্রদান করেছেন।"[৩] অর্থাৎ 'ইঞ্জিল' প্রদান করেছেন। সূরা বাকারা এবং সূরা আল-ইমরানে বলা হয়েছে: "এবং মূসা ও ঈসাকে যা প্রদান করা হয়েছে।"[৪]

কাজেই নতুন ও পুরাতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত এ সকল ঐতিহাসিক পুস্তক এবং পত্রাবলি কুরআনে উল্লিখিত তাওরাত ও ইঞ্জিল নয়। কাজেই এগুলি বিশ্বাস বা মান্য করা জরুরী নয়। এ সকল পুস্তক, পত্রাবলি এবং নতুন ও পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তকের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বাস নিম্নরূপ: এ সকল পুস্তকের যে সকল কথা ও কাহিনীকে কুরআন সত্য বলেছে সেগুলি সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য। যেগুলিকে কুরআন মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছে সেগুলি নিঃসন্দেহে মিথ্যা ও প্রত্যাখ্যাত। আর যেগুলির বিষয়ে কুরআন সত্য ও মিথ্যা কোন প্রকারের কিছু না বলে চুপ থেকেছে, সেগুলির বিষয়ে আমরাও চুপ থাকব। আমরা সেগুলিকে সত্য বলেও গ্রহণ করব না, আবার সরাসরি মিথ্যাও বলব না।

মহিমাময় আল্লাহ্ সূরা মায়েদায় তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন : "এবং আপনার উপর সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, তার পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে।"[৫]

---

১. সূরা ২: বাকারা, আয়াত ৮৭।

২. সূরা ৫: মায়েদা, আয়াত ৪৬।

৩. সূরা ১৯: মরিয়ম, আয়াত ৩০।

৪. সূরা ২ : বাকারা, আয়াত ১৩৬; সূরা ৩ : আল-ইমরান, আয়াত ৮৪।

৫. সূরা ৫: মায়েদা, আয়াত ৪৮। And unto thee have We revealed the Scripture with the truth, confirming whatever Scripture was before it, and a watcher over it.

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা বাগাবী (১১২২খৃ) তাঁর 'মা'আলিমুত তানযীল' নামক তাফসীর গ্রন্থে বলেন: "কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির পর্যবেক্ষক বা সংরক্ষক' এই কথাটির ব্যাখ্যায় ইবনু জুরায়জ (৭৬৭ খৃ) বলেছেন: কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের পর্যবেক্ষক। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের অনুসারিগণ তাদের গ্রন্থাবলি সম্পর্কে যা কিছু বলবেন কুরআন যদি তার সত্যতা নিশ্চিত করে তাহলেই তাকে তোমরা সত্য বলে গ্রহণ করবে। আর তা না হলে তাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করবে। এর ব্যাখ্যায় সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (৭১৩ খৃ) এবং দাহ্হাক ইবনু মুযাহিম (৭২৩ খৃ) বলেন : সংরক্ষক অর্থ বিচারক। খালীল ইবনু আহমদ (৭৮৬ খৃ) বলেন, এর অর্থ নিয়ন্ত্রক ও পর্যবেক্ষক। এ সকল ব্যাখ্যার অর্থ একই। তা হলো, কুরআন যে পুস্তকের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে সেই পুস্তকই আসমানী (ঐশ্বরিক) পুস্তক বলে গণ্য হবে, অন্যথায় নয়।

তাফসীরে মাযহারীতে[১] বলা হয়েছে: "যদি কুরআনে এর সত্যতার সাক্ষ্য থাকে তাহলে তাকে তোমরা সত্য বলে মানবে। আর কুরআনে যদি এর অশুদ্ধতার কথা থাকে তাহলে তাকে মিথ্যা ও অশুদ্ধ বলে প্রত্যাখ্যান করবে। আর কুরআন যদি সে বিষয়ে নীরব থাকে, তবে তোমরাও নীরব থাকবে; কারণ তা সত্যও হতে পারে, আবার মিথ্যাও হতে পারে।"

ইমাম বুখারী (৮৭০ খৃ) তাঁর হাদীস সংকলন গ্রন্থের 'সাক্ষ্য অধ্যায়ে' মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসিদ্ধ শিষ্য (সাহাবী) আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের (৬৮৭ খৃ) একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এরপর তিনি কুরআন সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে ধারণ বিষয়ক অধ্যায়ে দ্বিতীয় আরেকটি সূত্রে বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন। পুনরায় 'জাহমীয়দের প্রতিবাদ' অধ্যায়ে তৃতীয় একটি সূত্রে তিনি বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন। আমি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের উক্তিটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান থেকে উদ্ধৃত করছি। উদ্ধৃতির সাথে সাথে ব্যাখ্যাকার আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-কাসতাল্লানীর (১৫১৮ খৃ) ব্যাখ্যাও উল্লেখ করছি।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, "কিভাবে তোমরা ইহূদী খৃস্টানদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর? (এখানে ইবনু আব্বাস তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করার নিন্দা জ্ঞাপন করার জন্য প্রশ্ন করেছেন। কোন বিষয় বলতে ধর্ম, ধর্মীয় বিধান ইত্যাদি বিষয় বুঝিয়েছেন) অথচ তোমাদের পুস্তক (অর্থাৎ কুরআন) যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে অবতীর্ণ হয়েছে তা নবীনতর? (অর্থাৎ সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছে এবং অবতরণের দিক থেকে তোমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী। তাহলে নতুনত্ব অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের দিক থেকে: যদিও আল্লাহর বাণী সবই অনাদি)। তোমরা তা বিশুদ্ধ অবস্থায় পাঠ করছ, যার মধ্যে কোনরূপ বিকৃতি প্রবেশ করতে পারেনি" (তাওরাত

১. প্রখ্যাত ভারতীয় আলেম ছানাউল্লাহ পানিপথি (১৮০১ খৃ) প্রণীত।

ও ইঞ্জিল যেমন বিকৃত হয়েছে সেভাবে কোন বিকৃতি, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন কুরআনকে স্পর্শ করতে পারিনি)। এই গ্রন্থে সদাপ্রভু আল্লাহ তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের অনুসারিগণ (ইহূদী, খৃস্টান ও অন্যান্য জাতি) আল্লাহর পুস্তককে (তাওরাত-ইঞ্জিল ইত্যাদি) পরিবর্তন করেছে এবং বিকৃত করেছে। তারা স্বহস্তে পুস্তক রচনা করে বলেছে যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। পার্থিব সামান্য স্বার্থ লাভের জন্য তারা এরূপ করেছে। তোমাদের নিকট যে জ্ঞান আগমন করেছে (কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান) তা কি তোমাদেরকে তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না? আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা কখনোই দেখিনি যে, তাদের একজনও কখনো তোমাদের কাছে এসে তোমাদের উপরে যে গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে সে বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে" (তোমাদের জন্য উচিত ছিল যে, তোমরাও তাদেরকে এ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করবে না)।

'জাহমিয়াদের প্রতিবাদ' অধ্যায়ে উদ্ধৃত ইবনু আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যটি নিম্নরূপ: "হে মুসলিমগণ! কিভাবে তোমরা ইহূদী খৃস্টানদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর? অথচ তোমাদের পুস্তক যা আল্লাহ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপরে অবতীর্ণ করেছেন তা আল্লাহর নবীনতম সংবাদ (সর্বশেষ অবতীর্ণ বা সর্বশেষ সংবাদ), তা বিশুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে, যার মধ্যে কোনরূপ বিকৃতি প্রবেশ করতে পারেনি (তার সাথে অন্য কিছু সংমিশ্রিত হয় নি)। সদাপ্রভু আল্লাহ তাঁর গ্রন্থে তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের অনুসারিগণ আল্লাহর পুস্তককে বিকৃত করেছে এবং পরিবর্তিত করেছে। তারা স্বহস্তে পুস্তক রচনা করেছে এবং বলেছে যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। পার্থিব সামান্য স্বার্থ লাভের জন্য তারা এরূপ করেছে (এখানে তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত বাণীর দিকে ইঙ্গিত করছেন: তারা স্বহস্তে পুস্তক লিখে এবং বলে যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে যেন তারা তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য লাভ করতে পারে। তারা যা স্বহস্তে লিখেছে তার জন্য তাদের জন্য ধ্বংস এবং তারা যা উপার্জন করছে তার জন্যও ধ্বংস[১])। তোমাদের নিকট যে জ্ঞান আগমন করেছে তা কি তোমাদেরকে তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না? আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা কখনোই দেখিনি যে, তাদের একজনও কখনো তোমাদের কাছে এসে তোমাদের উপরে যে গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে সে বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে (তাহলে কেন তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছ, অথচ তোমরা জান যে, তাদের পুস্তকগুলি বিকৃত?)।"

ইমাম বুখারী 'কুরআন-সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে ধারণ বিষয়ক অধ্যায়ে' মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রসিদ্ধ শিষ্য (সাহাবী) মু'আবিয়া (রা)-র একটি বক্তব্য উদ্ধৃত

১. সূরা ২ : বাকারা, আয়াত ৭৯।

করেছেন। প্রসিদ্ধ ইহূদী পণ্ডিত কা'ব আল-আহবার (৬৫২ খৃ) যিনি উমার (রা)-এর শাসনামলে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুসলিম সমাজে তৎকালীন প্রচলিত তাওরাতের কাহিনী বর্ণনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁর বিষয়ে মু'আবিয়া (রা) বলেন, "যে সকল পণ্ডিত ইহূদী-খৃস্টানদের কাহিনী আমাদেরকে বলেন, তাদের মধ্যে কাবই সবচেয়ে সত্যবাদী; কিন্তু তারপরও আমরা তাঁর কথার মধ্যে মিথ্যা দেখতে পাই।"

অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করে মিথ্যা না বললেও, যেহেতু তিনি বিকৃত ও মিথ্যা তথ্য মিশ্রিত গ্রন্থাবলির উপর নির্ভর করে কথা বলেন, সেহেতু তাঁর বলা কাহিনী ও তথ্যের মধ্যে মিথ্যা পাওয়া যায়। তা না হলে ব্যক্তিগতভাবে তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন না এবং সাহাবীগণ তাঁকে সৎ ও ধার্মিক পণ্ডিত বলেই জানতেন।

'তবুও আমরা তাঁর কথার মধ্যে মিথ্যা দেখতে পাই' কথাটি থেকে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারি যে, সাহাবীগণ বিশ্বাস করতেন যে, ইহূদী খৃস্টানদের পুস্তকাবলি বিকৃত। যে সকল মুসলিম পণ্ডিত প্রচলিত এই তাওরাত ও এই ইঞ্জিল অধ্যয়ন করেছেন এবং এগুলির সম্পর্কে লিখেছেন তাঁরা সকলেই এগুলির বিকৃতির বিষয়ে কথা বলেছেন। এ সকল পণ্ডিতের লেখা বইপুস্তক অধিকাংশই এখনো বিদ্যমান, কেউ ইচ্ছা করলে সেগুলি পাঠ করে দেখতে পারেন।

'তাখজীল মান হার্‌রাফাল ইনজীল' (ইঞ্জিল বিকৃতকারীর মুখোশ উন্মোচন) নামক গ্রন্থের প্রণেতা (আবুল বাকা সালিহ ইবনু হুসায়ন জা'ফরী) তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রচলিত সুসমাচারগুলির বিষয়ে বলেন: "মহান রাসূল (ভাববাদী) ঈসা (আ) যে সত্য ইঞ্জিল বা সুসমাচার আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হন, এই প্রচলিত সুসমাচারগুলি কখনোই সেই ইঞ্জিল বা সুসমাচার নয়।"

অতঃপর তিনি এই অধ্যায়েই বলেন: "সত্য সুসমাচার বা ইঞ্জিল তো সেটিই যা স্বয়ং ঈসা (আ)-এর মুখে উচ্চারিত হয়েছে।"

অতঃপর নবম অধ্যায়ে খৃস্টানদের কলঙ্ক প্রকাশ করে বলেন: "পৌল তার সূক্ষ্ম ধোঁকার মাধ্যমে খৃস্টানদের নিকট থেকে তাদের ধর্মকে ছিনিয়ে নেন। কারণ তিনি দেখেন যে, যা কিছু বলা হয় সবই মেনে নেওয়ার মানসিকতা খৃস্টানদের রয়েছে। এভাবে এই পাপাত্মা তোরাহ-এর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেন।"

তাহলে দেখুন কিভাবে তিনি এ সকল সুসমাচারের বিশুদ্ধতা অস্বীকার করলেন এবং পৌলের অন্যায়ের কঠোর প্রতিবাদ করলেন।

আমার লিখনী ও মীযানুল হক গ্রন্থ প্রণেতার (ড. ফান্‌ডারের) লিখনীর তুলনামূলক সমালোচনা ও বিচার করে একটি পুস্তিকা লিখেন জনৈক ভারতীয় পণ্ডিত (মাহমূদ জান)। আমার ও ড. ফানডারের মাঝে অনুষ্ঠিত বিতর্কের যে বিবরণী পুস্তিকাকারে ১২৭০ হিজরী সালে (১৮৫৪ খৃ) দিল্লী থেকে ফারসী ভাষায় প্রকাশিত হয় সেই পুস্তিকার শেষে তিনি এই সমালোচনা ও বিচারটি লিপিবদ্ধ করেন। এই সমালোচক যখন দেখলেন যে,

কতিপয় প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য অথবা নিজেদের ভুল বুঝার কারণে দাবি করছেন যে, মুসলমানগণ প্রচলিত তাওরাত ও ইঞ্জিল অস্বীকার করেন না, তখন তিনি দিল্লীর আলেমগণের নিকট এ বিষয়ে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করাকে ভাল মনে করেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে দিল্লীর আলেমগণ সকলেই লিখেন: "নতুন নিয়ম নামে প্রসিদ্ধ এই সংকলনটি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআনে যে ইঞ্জিলের কথা বলা হয়েছে এই সংকলনটি সেই ইঞ্জিল নয়। আমাদের মতে ইঞ্জিল হলো সেই বাক্যের নাম যা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঈসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।"

ফতওয়াটি লাভ করার পরে উক্ত সমালোচক এই ফতোয়াটিকে তাঁর পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত করেন এবং 'বিতর্কের' পুস্তিকার সাথে একে সংযুক্ত করে দেন যেন সাধারণ জনগণ বিষয়টি জানতে পারেন।

সমগ্র ভারতের সকল আলেম এই ফতওয়ার সাথে একমত। যে সকল সুন্নী আলেম ও শীআ আলেম পাদ্রীদের পুস্তিকাসমূহের প্রতিবাদ লিখেছেন তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লিখেছেন এবং 'নতুন নিয়ম' নামে প্রচলিত এই সংকলনটিকে কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী তাঁর 'আল-মাতালিবুল আলিয়া' নামক গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে নবুওয়াত বা ভাববাণী বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন: "আর ঈসা (আ)-এর প্রচার সম্পর্কে মনে হয় তাঁর প্রচার খুব বেশি মানুষকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কারণ আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, এইসব খৃস্টান যে ধর্মের কথা বলে, তিনি কখনোই সেই ধর্মের প্রচার করেন নি। কারণ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার কথা বলা ও ত্রিতত্ত্বে বিশ্বাস করা হলো জঘন্যতম অবিশ্বাস ও ঘৃণ্যতম মূর্খতা। এই ধরনের কথা বলা একজন মহান পবিত্র ও সু-সংরক্ষিত ভাববাদী বা রাসূলের পক্ষে তো দূরের কথা-সবচেয়ে মূর্খ মানুষটির জন্যও শোভনীয় নয়। কাজেই আমরা নিশ্চিত জানি যে, ঈসা (আ) কখনোই এই ঘৃণ্য বিশ্বাস প্রচার করেন নি বরং তিনি একেশ্বরবাদ, একমাত্র আল্লাহর উপাসনা ও আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপনের বিশ্বাস প্রচার করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রচারিত এই সত্য ও সঠিক বিশ্বাস প্রচার ও প্রসার লাভ করে নি বরং তা অপ্রচারিত ও আবৃত হয়ে পড়ে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর প্রচারিত সত্য ও বিশুদ্ধ বিশ্বাস মানুষের মধ্যে প্রভাব ছড়াতে পারে নি।"

ইমাম (মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ) কুরতুবী (১২৭৩ খৃ) তাঁর 'আল-ই'লাম বিমা ফী দীনিন নাসারা মিনাল ফাসাদি ওয়াল আওহাম' (খৃস্টধর্মের অন্তর্ভুক্ত বিভ্রান্তি ও কল্পকাহিনীর বিবরণ) নামক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন: বর্তমানে খৃস্টানদের হাতে যে গ্রন্থটি রয়েছে, যাকে তারা 'ইঞ্জিল' নামে অভিহিত করে, এই গ্রন্থটি সেই ইঞ্জিল নয়, যে ইঞ্জিলের বিষয়ে কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি

ওয়া সাল্লামের যবানীতে বলেছেন, 'এবং তিনি ইতোপূর্বে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেছেন।'[১]

এরপর তিনি তাঁর এই দাবির সপক্ষে প্রমাণাদি পেশ করেন। তিনি আরো প্রমাণ করেছেন যে, যীশুর প্রেরিত শিষ্যগণ বা হাওয়ারীগণ নবী বা ভাববাদী ছিলেন না এবং ভুলের উর্ধ্বে ছিলেন না। খৃস্টানগণ তাঁদের বিষয়ে যে সকল অলৌকিক চিহ্নের দাবি করেন সেগুলির কোন কিছুই সেই যুগে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে নি। কোন কোন একক সূত্রে যা বর্ণিত হয়েছে সেগুলির সত্যতা ও বিশুদ্ধতা প্রমাণিত নয়। আর এ সকল অলৌকিকতার খবরগুলি বিশুদ্ধ বলে মেনে নিলেও এতে প্রেরিতদের সকল কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় না এবং তাঁদের ভাববাদিত্বও প্রমাণিত হয় না।[২] কারণ তাঁরা নিজেরা কখনোই নিজেদেরকে ভাববাদী বলে দাবি করেন নি। তাঁরা শুধু দাবি করেছেন যে, তাঁরা যীশুর পক্ষ থেকে প্রচার করছেন।

এ সকল বিষয় আলোচনার পরে কুরতুবী বলেন, "এই আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, খৃস্টানগণ যাকে 'ইঞ্জিল' বলে দাবি করছেন এই 'সংকলনটি' যীশু খৃষ্ট থেকে বা তাঁর শিষ্যগণ থেকে অগণিত বিশুদ্ধ সূত্রে প্রচারিত হয়নি। এর সংকলক বা লেখকদের ভাববাদিত্ব বা নির্ভুলতা প্রমাণিত হয়নি। আর যেহেতু এগুলির বর্ণনায় ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে সেহেতু এ সকল গ্রন্থ থেকে কোন বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান অর্জিত হয় না, এমনকি তা থেকে কোন সুদৃঢ় ধারণাও পাওয়া যায় না। এ কারণে এগুলি দৃকপাতেরও যোগ্য নয় এবং প্রমাণ হিসাবেও গ্রহণযোগ্য নয়। এই 'সংকলনটির' অগ্রহণযোগ্যতা ও বিকৃতি প্রমাণ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট (যেহেতু কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে তা বর্ণিত হয়নি, কাজেই তা যীশুর বাণী বলে গ্রহণযোগ্য নয়)। তদুপরি আমরা এই 'ইঞ্জিলের' কতিপয় স্থানের বিবরণ প্রদান করব যা এই গ্রন্থটির ভুলভ্রান্তি ও বর্ণনাকারীদের অযোগ্যতা প্রমাণ করবে।"

অতঃপর তিনি 'নতুন নিয়মের' কিছু ভুলভ্রান্তি উল্লেখ করার পরে বলেন: "এই বিশুদ্ধ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, প্রচলিত তাওরাত ও প্রচলিত ইঞ্জিলের উপর নির্ভর করার কোন উপায় নেই। সেগুলিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করারও সুযোগ নেই। কারণ তা নিশ্চিতরূপে নির্ভর করার মত অগণিত সূত্রে বর্ণিত হয় নি এবং তার মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়েছে। কিছু কিছু পরিবর্তন ও বিকৃতির আমরা প্রমাণ করেছি।

"এই দুইটি পুস্তকই ইহূদী-খৃস্টানগণের নিকট সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য পুস্তক। এতদুভয়ের উপরেই তাদের ধর্মের মূল ভিত্তি। এই দুই পুস্তকেরই যখন এই অবস্থা, তাহলে তাদের মধ্যে প্রচলিত অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কম প্রসিদ্ধ পুস্তক,

১. সূরা ৩: আল-ইমরান, আয়াত ৩০৪।

২. কোনো অলৌকিক চিহ্নই কোন সত্যতার প্রমাণ নয়। যীশু নিজেও বারংবার বলেছেন যে, ভাক্ত ও ভণ্ড ভাববাদিগণ ঈশ্বরের নামে ও যীশুর নামে অনেক অলৌকিক কর্ম ঘটাবে।

যেগুলিকে তারা প্রমাণ হিসেবে পেশ করে, সেগুলির অবস্থা কী হতে পারে তা পাঠক সহজেই কল্পনা করতে পারবেন। সেগুলির যেমন কোন প্রসিদ্ধ সূত্র সংরক্ষিত নেই, তেমনি সেগুলির মধ্যে বিকৃতির আশংকা এতদুভয়ের চেয়ে বেশি।"

কুরতুবীর বক্তব্য এখানেই শেষ। তাঁর এই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলের কোপরুলী লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে।[১]

হিজরী অষ্টম শতকের প্রখ্যাত পণ্ডিত আল্লামা মাকরিযী (১৪৪১ খৃ.) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে মিসরীয় কপ্টিকদের ইতিহাসের পূর্বে অন্যান্য জাতির ইতিহাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন: "ইহূদীরা দাবি করেন যে, তাদের 'তাওরাত (তাওরাতের হিব্রু সংস্করণ[২]) ত্রুটিমুক্ত। আর খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, তাদের নিকট সংরক্ষিত (গ্রীক ভাষায় অনূদিত) তাওরাত[৩], যাকে ৭০ জন পণ্ডিত অনুবাদ করেছিলেন, তাতে কোনরূপ বিকৃতি বা পরিবর্তন প্রবেশ করেনি। আর ইহূদীগণ এই গ্রীক সংস্করণ সম্পর্কে ঠিক তার উল্টো কথা বলেন। অপরদিকে শমরীয় ইহূদীগণ (Samaritans)[৪] বলেন যে, তাদের তাওরাতই[৫] সত্য এবং এছাড়া সবই বাতিল। তাদের এই মতবিরোধের মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে এই গ্রন্থগুলির বিষয়ে সন্দেহ দূরীভূত হবে বরং এতে এগুলির বিষয়ে সন্দেহ আরো বেশি ঘনীভূত হয়।

---

১. ১৯৮০ খৃস্টাব্দে পুস্তকটি মিসরের প্রকাশনা সংস্থা 'দারুত তুরাছ আল-আরাবী' কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

২. ইহূদীগণ ও প্রটেস্ট্যান্ট খৃস্টানগণ তাওরাতের বা পুরাতন নিয়মের এই সংস্করণকে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মনে করেন।

৩. ক্যাথলিকগণ তাওরাত বা পুরাতন নিয়মের এই সংস্করণকে বিশুদ্ধ মনে করেন।

৪. শলোমনের মৃত্যুর পরে প্যালেস্টাইনে ইহূদীদের রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায়। ইহূদীদের ১২ গোত্রের মধ্যে শুধু দুইটি গোত্র: যিহূদা ও বিন্যামীন-এর বংশধর দায়ূদ-বংশের অধীনে প্যালেস্টাইনের দক্ষিণ অংশে রাজত্ব করতে থাকে। এই রাজ্যকে 'যিহূদা রাজ্য' বলা হতো। রাজধানী ছিল যিরুশালেম। বাকি ১০ গোত্র বিদ্রোহ করে প্যালেস্টাইনের উত্তর অংশে পৃথক রাজ্য স্থাপন করে। একে শামেরা (Samaria) বা ইস্রাইল রাজ্য বলা হতো। এর রাজধানী ছিল নাবলুস। এই রাজ্যের অধিবাসিগণ মোশির অনুসারী ও 'ইহূদী' ধর্মাবলম্বী হলেও তারা যাকোবের পুত্র ইয়াহূদার (যিহূদার) বংশধর ছিল না। তারা যিহূদীয় ইহূদীদের ঘৃণা করত এবং যিহূদীয় ইহূদীগণও শমরীয় ইহূদীদের ঘৃণা করত। বাইবেলের প্রায় অর্ধেক জুড়ে রয়েছে এই দুই রাজ্য এবং দুই 'ইহূদী' সম্প্রদায়ের পারস্পরিক ঘৃণা, হানাহানি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা। যীশু খৃষ্ট নিজে 'যিহূদীয় ইহূদী' ছিলেন। শমরীয়দের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ তাঁর আচরণেও দেখতে পাওয়া যায়। যখন তিনি তাঁর ১২ জন শিষ্যকে প্রেরিত পদে নিযুক্ত করেন, তখন তিনি তাদেরকে শমরীয়দের মধ্যে প্রচার করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন: "তোমরা পরজাতিদের (অ-ইহূদীদের) পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না...।" মথি ১০/৬।

৫. শমরীয় ইহূদীদের তাওরাত মাত্র ৭টি পুস্তকের সমষ্টি: মোশির গ্রন্থ বলে কথিত ৫টি গ্রন্থ, যিহোশূয়ের পুস্তক ও বিচারকর্তৃগণের বিবরণ। শমরীয়দের মধ্যে প্রচলিত 'তাওরাত' ইহূদীদের মধ্যে প্রচলিত তাওরাত থেকে ভিন্ন।

"ইঞ্জিল সম্পর্কে খৃস্টানদের মতভেদও ঠিক একইরূপ। খৃস্টানদের নিকট একই গ্রন্থের মধ্যে চারটি ইঞ্জিল বা সুসমাচার সংকলিত রয়েছে। প্রথমটি লিখেছেন মথি, দ্বিতীয়টি লিখেছেন মার্ক, তৃতীয়টি লিখেছেন লূক ও চতুর্থটি লিখেছেন যোহন। এই চারি ব্যক্তির প্রত্যেকেই নিজ এলাকায় প্রচারের জন্য 'ইঞ্জিল' রচনা করেছেন। এই ইঞ্জিল চতুষ্টয়ের মধ্যে অনেক বৈপরীত্য রয়েছে। এমন কি যীশুর অবস্থা বর্ণনায়, তাঁর প্রচারের সময়, তাদের ধারণা অনুসারে তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিবরণ ইত্যাদিতেও বৈপরীত্য ও পার্থক্য রয়েছে। এই বৈপরীত্য এমন পর্যায়ের যে তা ব্যাখ্যা করে দূর করা যায় না।

"এগুলি বাদ দিলেও, মারসিওনের (Marcion) অনুসারীদের নিকট পৃথক একটি ইঞ্জিল বা সুসমাচার রয়েছে, বিন দিসান-এর অনুসারীদের নিকট পৃথক একটি ইঞ্জিল রয়েছে। প্রচলিত ইঞ্জিল চতুষ্টয়ের সাথে এগুলির কিছু পার্থক্য রয়েছে। মানীর (Manes/Mani) অনুসারীদের নিকট সম্পূর্ণ পৃথক আরেকটি ইঞ্জিল রয়েছে, যা আগাগোড়া খৃস্টানদের ইঞ্জিল থেকে ভিন্ন। তারা দাবি করেন যে, তাদের ইঞ্জিলই সঠিক এবং অন্য সকল ইঞ্জিল বাতিল। ৭০ জনের ইঞ্জিল' নামে তাদের আরেকটি ইঞ্জিল আছে যা টমাস-এর রচিত বলে মনে করা হয়। খৃস্টানগণ এবং অন্যান্য সম্প্রদায় এই ইঞ্জিল অস্বীকার করেন।

"এভাবে পাঠক দেখছেন যে, ইহূদী-খৃস্টানগণ নিজেরাই নিজেদের ঐশী গ্রন্থ বা ধর্মগ্রন্থের বিষয়ে কিভাবে মতভেদ করেছেন। এদের মধ্যে কার দাবি সঠিক এবং কার মত বাতিল তা কোন প্রকারের যুক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিচারের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কাজেই তাদের এ সকল পরস্পরবিরোধী মতামতের মধ্য থেকে সঠিক তথ্য বের করা অসম্ভব এবং তাদের কারো কোন কথার উপরেই নির্ভর করা সম্ভব নয়।"

'কাশফুয যুনূন' নামক পুস্তক-পরিচিতি গ্রন্থের প্রণেতা মুসতাফা ইবনু আবদুল্লাহ হাজ্জী খলীফা (১৬৫৭ খৃ) 'ইঞ্জিল'-এর পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন : "মহিমাময় পরাক্রান্ত আল্লাহর পুস্তক যা তিনি মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন।" প্রচলিত ইঞ্জিল (সুসমাচার) চতুষ্টয় যে প্রকৃত ইঞ্জিল নয় সে বিষয়ে তিনি এরপর দীর্ঘ আলোচনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, "ঈসা (আ) একটিই মাত্র ইঞ্জিল (সুসমাচার) নিয়ে এসেছিলেন, যাতে কোন পরস্পরবিরোধিতা এবং বৈপরীত্য ছিল না। এরা মহিমাময় আল্লাহ ও তাঁর নবী ঈসার (আ) নামে মিথ্যা বলেছে।"

'হেদায়াতুল হায়ারা ফী আজয়িবাতিল ইয়াহূদ ওয়ান নাসারা' (ইহূদী ও খৃস্টানগণের প্রতিউত্তরে দ্বিধাগ্রস্তদের পথ-নির্দেশনা) নামক গ্রন্থের প্রণেতা (ইবনু কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, মৃ. ১৩৫০ খৃ) বলেন: "ইহূদীদের হাতে যে তাওরাত রয়েছে তার মধ্যে যে বিকৃতি, সংযোজন ও বিয়োজন রয়েছে তা কোন অভিজ্ঞ মানুষের কাছেই গোপন নয়। স্বয়ং ইহূদীরাও নিশ্চিতরূপে জানে যে, এই গ্রন্থগুলি মোশির উপর অবতীর্ণ তাওরাত নয়। খৃস্টানদের হাতে যে ইঞ্জিলগুলি রয়েছে তার মধ্যে যে বিকৃতি, সংযোজন

ও বিয়োজন রয়েছে তাও কোন অভিজ্ঞ মানুষের কাছে গোপন নয়। খৃস্টানগণও নিশ্চিতরূপে জানেন যে, এগুলি যীশুর উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিল নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে মোশির উপর অবতীর্ণ তাওরাতের মধ্যে কিভাবে মোশির মোয়াব দেশে মৃত্যুর ঘটনা ও তাকে কবর দেওয়ার ঘটনা থাকতে পারে।[১] আর যীশুর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর বাণী ইঞ্জিলের মধ্যে কিভাবে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কথা, তাঁর নির্যাতনের কথা, তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার দিন-তারিখ, তিনদিন পর তাঁর কবর থেকে উত্থিত হওয়ার কথা ও খৃস্টান ধর্মগুরুদের অন্যান্য কথা থাকতে পারে?"

অতঃপর তিনি বলেন, "প্রচলিত তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে বিদ্যমান বৈপরীত্য, অসামঞ্জস্য, বিকৃতি, সংযোজন ও বিয়োজন সম্পর্কে অনেক মুসলিম আলিম আলোচনা করেছেন। কেউ ইচ্ছা করলে সেগুলি অধ্যয়ন করতে পারেন। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির ভয় এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য আলোচ্য বিষয় না থাকলে আমি এই জাতীয় অনেক উদাহরণ উল্লেখ করতাম।"

দুইটি বিভ্রান্তিকর দাবি ও তার আলোচনা

আমার এই পুস্তকের এই প্রথম অধ্যায়টি যিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করবেন তাঁর কাছে বাইবেলের অপৌরুষতার বা অনির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গির সত্যতা দ্বিপ্রহরের সূর্যের মতই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই এই অধ্যায়ের আলোচনা আর দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই। তবে আমি বিভিন্ন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে খৃস্টান প্রচারকগণের আরো দুইটি বিভ্রান্তিমূলক কথার আলোচনা করতে চাই।

প্রথম বিভ্রান্তি

সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরুগণ কখনো কখনো দাবি করেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই সুসমাচার চতুষ্টয়ের অস্তিত্বের প্রমাণ ও সূত্র বা সনদ (Chain of authorities/ source) রয়েছে। কারণ রোমের বিশপ ক্লিমেন্ট (Clement),[২] ইগনাটিয়াস (Ignatiuss)[৩] ও প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্যান্য ধর্মগুরু এই সুসমাচারগুলির পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিভ্রান্তি

তাঁরা দাবি করেন যে, মার্ক তাঁর সুসমাচার রচনা করেন পিতরের সহায়তায় এবং লূক তাঁর সুসমাচার রচনা করেন পৌলের সহায়তায়। পিতর ও পৌল উভয়ে প্রেরিত ও প্রেরণাপ্রাপ্ত ছিলেন। কাজেই এই দুইটি সুসমাচারও ঐশ্বরিক প্রেরণার মাধ্যমে লিখিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

---

১. দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪/৫-৭।

২. রোমের তৃতীয় বিশপ। ইয়ূসিবিস-এর বিবরণ অনুসারে ৯৪/৯৫ খৃস্টাব্দের দিকে রোমের বিশপের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ৯ বছর দায়িত্ব পালনের পরে ১০৩/১০৪ খৃস্টাব্দের দিকে মৃত্যু বরণ করেন। Eusebius Pamphilus, The Ecclesiasiastical History, page 100, 120.

৩. এন্টিয়কের (Antioch) দ্বিতীয় বিশপ। ১০৭ খৃস্টাব্দে নিহত হন। Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, page 104, 476.

প্রথম বিভ্রান্তির অপনোদন

প্রথম বিভ্রান্তির অপনোদনে আমার প্রথম কথা হলো, যে সূত্রের অস্তিত্ব নিয়ে আমরা বিতর্ক করছি সে হলো অবিচ্ছিন্ন পরিপূর্ণ সূত্র-পরম্পরা (uninterupted chain of authorities/ sources)। অর্থাৎ একজন নির্ভরযোগ্য সৎ ব্যক্তি অন্য এক বা একাধিক নির্ভরযোগ্য ও সৎ ব্যক্তির সূত্রে বলবেন যে, অমুক পুস্তকটি অমুক শিষ্য বা অমুক ভাববাদীর নিজের রচিত। আমি এই পুস্তকটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের মুখে শুনেছি, অথবা আমি পুস্তকটি তাঁর নিকট পড়ে তাকে শুনিয়েছি, অথবা তিনি আমাকে বলেছেন যে, এই পুস্তকটি তাঁর রচিত। এই সূত্র পরম্পরায় উল্লিখিত সকল ব্যক্তি সৎ ও নির্ভরযোগ্য হবেন, যাঁদের বর্ণনা বা সাক্ষ্য বিচারালয়ে বা সমাজে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত।

এই প্রকারের কোন অবিচ্ছিন্ন সূত্র নতুন নিয়মের কোন পুস্তক বা পত্রের নেই। দ্বিতীয় শতকের শেষ বা তৃতীয় শতকের শুরু থেকে প্রথম খৃষ্টীয় শতকে এই পুস্তক ও পত্রগুলির লেখকগণ পর্যন্ত এই প্রকারের কোন সূত্র (Chain of authorities) তাঁদের নেই।[১] আমরা অনেকবার এইরূপ সূত্র-পরম্পরা জানতে চেয়েছি। আমরা তাঁদের সূত্র

১. এমন একজন ব্যক্তির অস্তিত্বও পাওয়া যায় না যিনি বলেছেন যে, মথি, মার্ক, লূক, যোহন, পিতর, যাকোব বা অমুক ... এই সুসমাচারটি বা পত্রটি লিখেছেন, অমুক ব্যক্তি তাঁর নিকট থেকে পূর্ণ সুসমাচারটি বা পত্রটি শুনেছিলেন বা পড়ে নিয়েছিলেন, তাঁর নিকট থেকে অমুক ব্যক্তি তা পড়েছিলেন, শুনেছিলেন বা অনুলিপি তৈরি করেছিলেন ... তাঁর নিকট থেকে আমি তা শুনেছি বা অনুলিপি তৈরি করেছি। প্রায় ২০০ বছর পর্যন্ত এরূপ কোন সূত্র-পরম্পরা নতুন নিয়মের কোন একটি পুস্তক বা পত্রেরও নেই। প্রায় দুই শতাব্দী পরে এসে বলা হচ্ছে যে, এই সুসমাচারটি মথির লেখা, এই সুসমাচারটি মার্কের লেখা.. ইত্যাদি। তিনি আদৌ লিখেছেন কিনা, লিখলে কতটুকু লিখেছিলেন তা কিছুই জানা যাচ্ছে না। বড় অবাক লাগে যে, প্রথম যুগের খৃষ্টানগণ সবচেয়ে অবহেলা করেছেন তাদের ধর্মগ্রন্থের প্রতি। প্রথম দুই শতাব্দীতে প্রথম দুই তিন প্রজন্মের খৃষ্টানগণ অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে বিভিন্ন দেশে যীশুর বাণী ও বিশ্বাস প্রচার করেছেন, কিন্তু কেউই যীশুর শিক্ষা বা সুসমাচারের কোন লিখিত রূপ সংরক্ষণ করেন নি বা সাথে রাখেন নি। সবাই যা শুনেছেন বা বুঝেছেন তাই নিজের মনমত প্রচার করেছেন। প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই যিরুশালেম, রোম, আলেকজান্দ্রিয়া, এন্টিয়ক ইত্যাদি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে খৃস্টান চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিশপ নিযুক্ত হয়েছেন। স্বভাবতই প্রত্যেক চার্চে অন্তত কয়েক কপি 'সুসমাচার' থাকার কথা ছিল, প্রত্যেক খৃস্টানের নিকট না হলেও হাজার হাজার খৃস্টানের মধ্যে অনেকের কাছেই ধর্ম গ্রন্থ থাকার কথা ছিল। কিন্তু প্রকৃত বিষয় ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সকল বিশপের অনেকের অনেক চিঠি বা বই এখনো সংরক্ষিত আছে। তাতে অনেক উপদেশ রয়েছে। কিন্তু তাতে এ সকল সুসমাচারের কোন উল্লেখ নেই। ২০০ বছর পর্যন্ত কোন চার্চে কোন সুসমাচার সংরক্ষিত রাখা বা পঠিত হওয়া তো দূরের কথা, এগুলির কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। এ সময়ের মধ্যে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, অনেক কথা লিখেছেন, সবই ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছিল। কেউই তাকে ঐশ্বরিক প্রেরণা-নির্ভর বলে মনে করেননি। নইলে প্রথম শতকের শেষভাগে মথি, মার্ক, লূক বা যোহন তাঁর সুসমাচার লিখে সকল বিশপের নিকট পাঠিয়ে দিতে পারতেন এই বলে যে, ঈশ্বরের প্রেরণায় আমি এই সুসমাচার লিখলাম। একে মান্য করতে হবে। ... কখনোই তাঁরা তা করেন নি। ৩০০ বছর পরে এ সব অগণিত পুস্তকের মধ্য থেকে তৎকালীন ধর্মগুরুগণ নিজেদের মর্জি মাফিক কিছু পুস্তক পছন্দ করে তাকে বিশুদ্ধ বা 'ক্যাননিক্যাল' বলে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

বিষয়ক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে দেখেছি। কোথাও তা নেই বরং প্রকাশ্য বিতর্কের মজলিসে পাদ্রী ফ্রেঞ্চ স্বীকার করেন যে, এরূপ কোন সূত্র-পরম্পরা আমাদের নিকট নেই। ৩১৩ খৃস্টাব্দে পর্যন্ত প্রথম খৃস্টীয় শতকগুলিতে যে কঠিন বিপদাপদ সংঘটিত হয়েছিল সেগুলির কারণে এই প্রকারের সূত্র সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি।

উপরে উল্লিখিত এরূপ কোন সূত্র (chain of authorities) রোমের বিশপ ক্লিমেন্ট বা ইগনাটিয়াস বা দ্বিতীয় শতকের শেষ পর্যন্ত কোন পণ্ডিতের কোন কথার মধ্যে পাওয়া যায় না (তাঁদের কেউই বলেন নি যে, মথি, মার্ক, লূক বা যোহন একটি সুসমাচার লিখেছেন এবং আমি অমুকের মাধ্যমে সেই পুস্তকটি আদ্যপান্ত পড়েছি ... বা তার বিবরণ এই ...)।

ধারণা বা অনুমানকে আমরা অস্বীকার করছি না। আমরা একথাও বলছি না যে, ধারণা, অনুমান বা প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে তারা কোন পুস্তকের লেখকের নাম নির্ধারণ করতে পারবেন না। আমরা শুধু একথাই বলছি যে, ধারণা, অনুমান বা প্রাসঙ্গিক যুক্তি-প্রমাণকে সূত্র (chain of authorities) বলা যায় না। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাঠক তা জানতে পেরেছেন।

আমরা একথাও অস্বীকার করি না যে, এই সুসমাচারগুলি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে সীমিত পরিচিতি ও প্রসার লাভ করে। কিন্তু সেই সময়েও এগুলির পরিচিতি এত সীমিত ছিল যে, তখনো এগুলির মধ্যে বিকৃতি ও পরিবর্তন সম্ভব ছিল।

এখন আমি পাঠককে ক্লিমেন্ট ও ইগনাটিয়াসের অবস্থা জানাব যেন তিনি প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারেন। ক্লিমেন্টের বিষয়টি হলো, রোমের বিশপ ক্লিমেন্টের নামে একটি পত্র প্রচলিত আছে (The Epistle of Clement[১])। পত্রটি তিনি রোমের চার্চের পক্ষ থেকে করিন্থের (Corinth) চার্চকে লিখেছিলেন। চিঠিটি তিনি কত সালে লিখেছিলেন সে বিষয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। আপ ক্যান্টারবারী বলেছেন, ৬৪ থেকে ৭০ খৃস্টাব্দের মধ্যে পত্রটি লেখা হয়েছে। ক্লার্ক বলেন : পত্রটি ৬৯ সালে লেখা হয়েছে। ডিবেন ও টেলিমেন্ট বলেন : ৯১ বা ৯৩ খৃস্টাব্দের আগে ক্লিমেন্ট বিশপ নিযুক্ত হননি। তাহলে পত্রটির তারিখ সম্পর্কে প্রথম ও দ্বিতীয় মতটি সত্য হয় কিভাবে?[২] ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূর বলেন যে, পত্রটি ৯৫ খৃস্টাব্দে লেখা হয়েছিল। বাইবেল ব্যাখ্যাকার লর্ডনার বলেন, পত্রটি ৯৬ খৃস্টাব্দে লেখা হয়েছিল। আমি তাঁদের মতবিরোধ এড়িয়ে ধরে নিলাম যে, পত্রটি ৯৬ সালের পূর্বেই লেখা হয়েছিল।

১. Eusebius pamphilus, The Ecclesiastical History. page 100-101.

২. ইউসেবিয়াস স্পষ্টভাবেই লিখেছেন যে,রোমান সম্রাট ডোমিশিয়ানের রাজত্বের দ্বাদশ বছরে, অর্থাৎ ৯৩/৯৪ খৃস্টাব্দে ক্লিমেন্ট রোমের বিশপ নিযুক্ত হন। Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, page 100.

ঘটনাক্রমে এই পত্রের কয়েকটি অনুচ্ছেদের বক্তব্যের অর্থ প্রচলিত সুসমাচারগুলির কোন কোন সুসমাচারের কয়েকটি বাক্যের অর্থের সাথে মিলে যায়। আর এজন্য খৃষ্টান প্রচারকগণ আন্দাযে দাবি করেন যে, ক্লিমেন্ট এই বক্তব্যটি এই সুসমাচার থেকেই উদ্ধৃত করেছেন। বিভিন্ন কারণে তাঁদের এই দাবি সঠিক নয়:

প্রথমত, দুই ব্যক্তির দুইটি বক্তব্যের অর্থের মিল থেকে কখনোই প্রমাণিত হয় না যে, একজন আরেকজন থেকে বক্তব্যটি গ্রহণ করেছেন। তা না হলে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ যাদেরকে নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহী বলে অভিহিত করেন তাদের কথাই ঠিক বলে প্রমাণিত হবে। কারণ তারা দাবি করেন যে, সুসমাচারগুলির মধ্যে যে সকল সুন্দর আচরণ ও কল্যাণমূলক নীতিবাক্য রয়েছে তা সবই প্রাচীন যুগের দার্শনিক ও পৌত্তলিকদের থেকে গ্রহণ করা।

একসীহোমো পুস্তকের প্রণেতা বলেন: নতুন নিয়ম বা সুসমাচারের মধ্যে যে সকল উত্তম নীতিকথা দেখতে পাওয়া যায় এবং যেগুলি নিয়ে খৃষ্টানগণ গৌরব করে থাকেন সেগুলি সবই আক্ষরিকভাবে কনফুসিয়াসের 'নীতি-পুস্তক' থেকে গ্রহণ করা। কনফুসিয়াস খৃষ্টের ৬০০ বছর পূর্বে সেগুলি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

যেমন তাঁর নীতিগ্রন্থের ২৪ নং নীতিটি নিম্নরূপ: "তোমরা যা যা ইচ্ছা কর, যে লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাদের প্রতি সেইরূপ কর। এই সৃষ্টির কাছেই তোমাদের প্রয়োজন রয়েছে। এই হলো সকল নীতি গ্রন্থের সার।"[১]

৫১ নং নীতিতে রয়েছে: "তোমার শত্রুর মৃত্যু কামনা করবে না; কারণ এই কামনা অর্থহীন এবং তার জীবন আল্লাহর ক্ষমতার মধ্যে।"

৫৩ নং নীতিতে রয়েছে: " যে ব্যক্তি তোমাদের উপকার করেছে তোমরা তার উপকার করবে; আর যে তোমাদের অকল্যাণ করেছে তোমরা তার অকল্যাণ করবে না।"

৬৩ নং নীতিতে রয়েছে: "শত্রুর প্রতিশোধ না নিয়েই আমরা শত্রুর থেকে নিবৃত্ত হতে পারি, আর প্রকৃতিগত কল্পনার পাপ স্থায়িত্ব পায় না।"

এইরূপ অনেক সুন্দর সুন্দর নীতিবাক্য প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীক দার্শনিক ও পণ্ডিতদের গ্রন্থাবলিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, ক্লিমেন্ট যদি প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত সুসমাচারগুলি থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করতেন তাহলে তার উদ্ধৃতির সাথে সুসমাচারের আয়াতগুলির পূর্ণ মিল পাওয়া যেত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেরূপ কোন মিল পাওয়া যায় না বরং অর্থগত ও বিষয়গত পার্থক্য পাওয়া যায়। এই পার্থক্য হলো সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, তিনি প্রচলিত এই সুসমাচারগুলি থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেন নি। তিনি যদি তাঁর এ সকল কথা কোন

১. মথিলিখিত সুসমাচারের ৭ম অধ্যায়ের ১২ আয়াতে যীশু অবিকল একই কথা বলেছেন। মিল থাকলেই যদি উদ্ধৃতি প্রমাণিত হয়, তবে যীশু কনফুসিয়াস থেকে ধার করেছেন অথবা শিষ্যরা কনফুসিয়াসের বাণী যীশুর মুখে তুলে দিয়েছেন।

'সুসমাচার' থেকে নিয়েই থাকেন তাহলে তা এই সুসমাচার চতুষ্টয় ছাড়া তৎকালে প্রচলিত অন্য সুসমাচারগুলি থেকে নিয়েছেন। যেমন একহার্ন স্বীকার করেছেন যে, যীশুর বাপ্তাইজ হওয়ার পরে স্বর্গ থেকে শ্রুত কথাটির বিষয়ে এই ক্লিমেন্ট অজ্ঞাত পরিচয় একটি 'সুসমাচার' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন (তাহলে এই বাক্যগুলিও তিনি এইরূপ কোন সুসমাচার থেকে উদ্ধৃত করেছেন, যে কারণে প্রচলিত সুসমাচারগুলির বাক্যের সাথে তা পুরোপুরি মিলে না)।

তৃতীয়ত, এই ক্লিমেন্ট যীশুর শিষ্যদের শিষ্য বা দ্বিতীয় প্রজন্মের খৃস্টান। মার্ক ও লূকের ন্যায় তিনিও যীশুর শিষ্যদের থেকে মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে যীশুর বচন, শিক্ষা ও জীবনী জানতে পেরেছেন। কাজেই স্বভাবতই বুঝা যায় যে, মার্ক ও লূক যেমন নিজেদের নিকট সংগৃহীত বর্ণনা ও তথ্যাদির ভিত্তিতে 'সুসমাচার লিখেছেন, ক্লিমেন্টও তেমনি নিজের নিকট সংগৃহীত বর্ণনা ও তথ্যাদির ভিত্তিতে তাঁর পত্রটি লিখেছেন, অন্য কোন সুসমাচারের' উপরে তিনি নির্ভর করেন নি। হ্যাঁ, যদি ক্লিমেন্টের বক্তব্যের মধ্যে তার নির্ভরতা বা উদ্ধৃতির বিষয়ে কিছু থাকত, তবে খৃস্টান প্রচারকদের এই দাবিটি সঠিক বলে প্রমাণিত হতো। কিন্তু তাঁর চিঠিতে এরূপ কোন কিছুই নেই। কাজেই এই দাবিটি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক ও ভিত্তিহীন।

ত্রিত্ববাদীদের সংখ্যার ভিত্তিতে আমি এখানে ক্লিমেন্টের প্রত্রের তিনটি বক্তব্য আলোচনা করছি।

ক্লিমেন্টের পত্রের প্রথম বক্তব্য

ক্লিমেন্ট লিখেছেন : "যে যীশুকে ভালবাসে সে যেন তাঁর আজ্ঞা অনুসারে কর্ম করে।"

মিস্টার জোনস দাবি করেছেন যে, ক্লিমেন্ট এই কথাটি যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ের ১৫ আয়াত থেকে উদ্ধৃত করেছেন। যোহনের এই আয়াতটি নিম্নরূপ : "তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে।"

এই ভাবগত মিলের কারণে এই পণ্ডিত দাবি করলেন যে, ক্লিমেন্ট কথাটি এখান থেকে উদ্ধৃত করেছেন। অথচ তিনি এই দুই বাক্যের মধ্যে পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করলেন না। উপরের তিনটি বিষয় থেকে পাঠক জানতে পেরেছেন যে, মি. জোনসের এই দাবি ভিত্তিহীন দাবি ছাড়া কিছুই নয়। শুধু তাই নয়, তাঁর এই মতটি সুস্পষ্ট ভুল। কারণ, পাঠক দেখেছেন যে, খৃস্টান পণ্ডিতদের সকলের মতানুসারে এই পত্রটি ৯৬ খৃস্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছে। আর এই পণ্ডিত মি. জোনসের মতানুসারে যোহনের সুসমাচারটি লিখিত হয়েছে ৯৮ খৃস্টাব্দে। তাহলে কিভাবে তিনি দাবি করলেন যে, ক্লিমেন্ট যোহনের সুসমাচার থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন? আসলে নতুন নিয়মের সূত্র ও উৎস প্রমাণের আগ্রহ তাঁকে এই বাতুল ধারণার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।

১৮২২ সালে মুদ্রিত তাঁর বাইবেল ব্যাখ্যা গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৩০৭ পৃষ্ঠায় হর্ন লিখেছেন, "প্রাচীনদের মধ্য থেকে ক্রীযাস্টিম ও এবিভ্যান্স এবং সমকালীনদের মধ্যে ড. মিল, ফেব্রীশিস, লীক্লার্ক ও বিশপ টমলাইন মনে করেন যে, যোহনের সুসমাচারটি ৯৭ সালে লেখা হয়েছে। আর মি. জোনসের মতে তা ৯৮ খৃষ্টাব্দে লেখা হয়েছে।

এ ছাড়াও এ কথা স্পষ্ট যে, এই বক্তব্যটির জন্য কোন উদ্ধৃতি বা রেফারেন্সের প্রয়োজন হয় না। কারণ একটি স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, সত্যিকার প্রেমিক অবশ্যই তার প্রেমাস্পদের আজ্ঞা অনুসারে কর্ম করবেন। আর যে তা করবে না সে তার প্রেমের দাবিতে মিথ্যাবাদী। এজন্য লর্ডনার এক্ষেত্রে ইনসাফভিত্তিক একটি কথা বলেছেন। ১৮২৭ সালে মুদ্রিত তাঁর ভাষ্যগ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪০ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, আমার মনে হয়, এই উদ্ধৃতির বিষয়টি একটি ধারণা বা সন্দেহ মাত্র। কারণ প্রেরিতগণের সাহচর্য এবং তাঁদের উপদেশাবলির মাধ্যমে ক্লিমেন্ট অত্যন্ত ভালভাবে জানতেন যে, যীশুর প্রেমের স্বীকারোক্তির দাবিই হলো যে, মানুষ যীশুর আজ্ঞা অনুসারে কর্ম করবে।

ক্লিমেন্টের পত্রের দ্বিতীয় বক্তব্য

ক্লিমেন্ট তাঁর পত্রের ১৩ অধ্যায়ে লিখেছেন : "যেরূপ লিখিত রয়েছে সেইরূপ আমরা করব। কারণ পবিত্র আত্মা এইরূপ বলেছেন : জ্ঞানী ব্যক্তি তার জ্ঞানের জন্য অহংকার করেন না। প্রভু যীশু যখন ধৈর্য ও অধ্যবসায় শিক্ষা দিয়েছিলেন তখন যে শব্দগুলি বলেছিলেন তা স্মরণ করতে হবে : তোমরা দয়া করো যেন তোমাদের উপরে দয়া করা হয়। তোমরা ক্ষমা করো যেন তোমাদেরকে ক্ষমা করা হয়। তোমরা যেরূপ করবে, তোমাদের সাথেও সেইরূপ করা হবে। তোমরা যেরূপ প্রদান করবে তোমাদেরকেও সেইরূপ প্রদান করা হবে। তোমরা যেরূপ বিচার করবে, তোমাদেরকেও সেইরূপ বিচার করা হবে। তোমরা যেরূপ দয়া করবে, তোমাদের প্রতিও সেইরূপ দয়া করা হবে। তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ করবে তোমাদেরকেও সেই পরিমাণে পরিমাণ করা হবে।"

খৃস্টান পণ্ডিতগণ দাবি করেন যে, ক্লিমেন্ট এই কথাগুলি লূকের সুসমাচারের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৬, ৩৭, ও ৩৮ আয়াত থেকে এবং মথির সুসমাচারের ৭ম অধ্যায়ের ১, ২ ও ১২ আয়াত থেকে গ্রহণ করেছেন।

লুকের পাঠ নিম্নরূপ : "৩৬ তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও। ৩৭ আর তোমরা বিচার করিও না, তাহাতে বিচারিত হইবে না। আর দোষ করিও না, তাহাতে দোষকৃত হইবে না। তোমরা ছাড়িয়া দিও, তাহাতে তোমাদেরকেও ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। ৩৮ দেও, তাহাতে তোমাদিগকেও দেওয়া যাইবে; লোকে বিলক্ষণ পরিমাণে চাপিয়া ঝাঁকরিয়া উপচিয়া তোমাদের কোলে দিবে; কারণ তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর তোমাদের নিমিত্ত সেই পরিমাণ পরিমাণ করা যাইবে।"

মথির পাঠ নিম্নরূপ : "১ তোমরা বিচার করিও না, যেন বিচারিত না হও। ২ কেননা যেরূপ বিচারে তোমরা বিচার কর, সেইরূপ বিচারে তোমরাও বিচারিত হইবে; এবং যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের নিমিত্ত পরিমাণ করা যাইবে।... ১২ অতএব সর্ব বিষয়ে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও; কেননা ইহাই ব্যবস্থার ও ভাববাদী-গ্রন্থের সার।"[১]

ক্লিমেন্টের পত্রের তৃতীয় বক্তব্য

ক্লিমেন্ট তাঁর পত্রের ৪৬ অধ্যায়ে লিখেছেন : "প্রভু খৃস্টের বাক্যগুলি স্মরণ কর। কারণ তিনি বলেছেন, 'ধিক মানুষের জন্য (অর্থাৎ যে মানুষ দ্বারা পাপ সংঘটিত হয়); আমি যাদেরকে নির্বাচন করেছি তাদের কাউকে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে তার জন্য ভাল ছিল এই যে, সে জন্ম গ্রহণ না করত। আর আমার ক্ষুদ্র সন্তানদেরকে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে তার জন্য ভাল ছিল এই যে, সে তার গলায় যাঁতার পাথর বাঁধত এবং সমুদ্রের অগাধ জলে ডুবে যেত।"

তারা দাবি করেন যে, ক্লিমেন্ট এই বাক্যগুলি মথির সুসমাচারের ২৬ অধ্যায়ের ২৪ আয়াত, ১৮ অধ্যায়ের ৬ আয়াত, মার্কের সুসমাচারের ৯ অধ্যায়ের ৪২ আয়াত ও লূকের সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ের ২ আয়াত থেকে গ্রহণ করেছেন। এই আয়াতগুলি নিম্নরূপ :

মথির ২৬/২৪ : "মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যেমন লিখিত আছে তেমনি তিনি যাইতেছেন; কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যাহার দ্বারা মনুষ্যপুত্র সমর্পিত হন; সেই মানুষের জন্ম না হইলে তাহার পক্ষে ভাল ছিল।"

মথি ১৮/৬ : "কিন্তু যে ক্ষুদ্রগণ আমাতে বিশ্বাস করে, যে কেহ তাহাদের মধ্যে এক জনেরও বিঘ্ন জন্মায়, তাহার গলায় বৃহৎ যাঁতা বাঁধিয়া তাহাকে সমুদ্রের অগাধ জলে ডুবাইয়া দেওয়া বরং তাহার পক্ষে ভাল।"

মার্ক ৯/৪২ : "আর এই যে ক্ষুদ্রগণ আমাতে বিশ্বাস করে, যে কেহ তাহাদের এক জনের বিঘ্ন জন্মায়, বরং তাহার গলায় বৃহৎ যাঁতা বাঁধিয়া তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেও তাহার পক্ষে ভাল।"

লূক ১৭/২ : "সে যে এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এক জনের বিঘ্ন জন্মায়, ইহা অপেক্ষা বরং তাহার গলায় যাঁতা বাঁধিয়া তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে তাহার পক্ষে ভাল।"

১৮২৭ সালে মুদ্রিত তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩৭ পৃষ্ঠায় লার্ডনার ক্লিমেন্ট-এর উপর্যুক্ত বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেন এবং তারপর নতুন নিয়মের উপরের আয়াতগুলি উদ্ধৃত

১. পাঠক লক্ষ্য করবেন, ক্লিমেন্টের লেখা বক্তব্যের সাথে লূক বা মথির পুরো বক্তব্য তো দূরের কথা একটি আয়াতও পুরোপুরি মিলে না।

করেন। এরপর তিনি বলেন : "বিভিন্ন সুসমাচার থেকে উক্তিগুলি আমি বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করলাম যেন প্রত্যেক পাঠক ভালভাবে তা বুঝতে পারেন। তবে সাধারণ জনমত হলো, ক্লিমেন্টের বক্তব্যের শেষ অংশটি লূকের সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আয়াত থেকে গ্রহণ করা।"

যে সকল খৃস্টান পণ্ডিত প্রথম ও দ্বিতীয় শতকেই প্রচলিত সুসমাচারের সূত্র আছে বলে দাবি করেন তাদের জন্য ক্লিমেন্টের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বক্তব্যই সবচেয়ে বড় দলিল।[১] এজন্য বেলি শুধু এই দুইটি উদ্ধৃতিই উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু তাঁদের এই দাবি বাতিল ও ভিত্তিহীন। কারণ এই কথাগুলি যদি ক্লিমেন্ট কোন 'সুসমাচার' থেকে গ্রহণ করতেন তবে নিশ্চয় তিনি সেই সুসমাচারটির নাম উল্লেখ করতেন, না হলে অন্তত তিনি কোন একটি সুসমাচার থেকে যীশুর বক্তব্য হুবহু উদ্ধৃত করতেন, নাহলে অন্তত তাঁর লিখিত বক্তব্যটি কোন একটি সুসমাচারের বক্তব্যের সাথে অর্থগতভাবে পুরো মিলে যেত। এই তিন পর্যায়ের কোন পর্যায়ই এখানে পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে কিভাবে দাবি করা যায় যে, তিনি তা কোন একটি গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন?

ক্লিমেন্ট লূক থেকে গ্রহণ করেছেন একথা কিভাবে বলা যায়? কারণ তাঁরা দুজনই তো যীশুর শিষ্যদের শিষ্য। দুজনেই একইভাবে শিষ্যদের নিকট থেকে শুনে শুনে যীশুর শিক্ষা ও জীবনী জেনেছেন।

যদি এ কথা বলতেই হয় যে, ক্লিমেন্ট অন্য কোন লিখিত 'সূত্র' থেকে তাঁর এই কথাটি গ্রহণ করেছেন, তাহলে বলতে হবে যে, এই দুইটি স্থানে উদ্ধৃত যীশুর বাণীগুলি তিনি প্রচলিত সুসমাচার চতুষ্টয়ের বাইরে তৎকালে প্রচলিত অন্য কোন 'সুসমাচার' থেকে গ্রহণ করেছেন (যে জন্য প্রচলিত সুসমাচারগুলির সাথে তাঁর উদ্ধৃত কথাগুলি পুরোপুরি মিলছে না), যেরূপভাবে তিনি যীশুর বাপ্তাইজ হওয়ার ঘটনা অন্য একটি অজ্ঞাতনামা 'সুসমাচার' থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ইতোপূর্বে একহার্নের বক্তব্যে আমরা তা জানতে পেরেছি। বিশপ বাইরাস এক্ষেত্রে একট পক্ষপাতহীন কথা বলেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, ক্লিমেন্ট এই কথাগুলি এ সকল সুসমাচারের কোন সুসমাচার থেকে গ্রহণ করেন নি।

---

১. ক্লিমেন্টের উপরের কথাগুলিকে সুসমাচারের এ সকল কথার উদ্ধৃতি বলে দাবি করা দেখে মনে হয় খৃস্টান পণ্ডিতদের অবস্থা হলো সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টা করার মত। দুই শত বছর পর্যন্ত এত প্রচারক, এত বিশপ, এত শহীদ, এত চার্চ, কেউই সরাসরি এই পুস্তকগুলির কথা উল্লেখ করছেন না বা এগুলি থেকে সুস্পষ্ট কোনো উদ্ধৃতি দিচ্ছেন না; এগুলির সংরক্ষণ, পাঠ ও প্রচার তো অনেক দূরের কথা। ফলে বাধ্য হয়ে পণ্ডিতগণকে এইরূপ অস্পষ্ট কথাকে উদ্ধৃতি বলে চালানোর চেষ্টা করতে হচ্ছে।

লর্ডনার তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ক্লিমেন্টের এই দুইটি বক্তব্যের বিষয়ে বলেন : "যারা আমাদের প্রভুর (যীশুর) প্রেরিতগণ বা তাঁর অন্যান্য শিষ্যের সাহচর্য লাভ করেছেন, তারা প্রভুর শিক্ষা ও জীবনী ঠিক তেমনি জানতেন যেমন জানতেন সুসমাচার লেখকগণ। আমরা যখন তাঁদের লেখনী দেখি তখন উদ্ধৃতির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নির্ধারণ করা অসুবিধাজনক।

"এই স্থানেই অসুবিধা বা সমস্যা নিম্নরূপ ঃ ক্লিমেন্ট এই দুইটি স্থানে যীশুর কিছু বাণী বা শিক্ষা উল্লেখ করেছেন। হয় তিনি সেগুলি কোন লিখিত উৎস থেকে গ্রহণ করেছেন অথবা যেহেতু তিনি এবং করিন্থবাসিগণ সকলেই এই উক্তিগুলি প্রেরিতগণ বা যীশুর অন্য শিষ্যগণের মুখ থেকে আগেই শুনেছেন, সে জন্য তিনি করিন্থবাসীদেরকে সেই শোনা কথাগুলি মনে করিয়ে দিচ্ছেন। লীক্লার্ক প্রথম সম্ভাবনাটি গ্রহণ করেছেন। বিশপ বাইরাস দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি গ্রহণ করেছেন।

"আমি এ কথা মেনে নিচ্ছি যে, প্রথম তিনটি সুসমাচার এই পত্রটি লেখার পূর্বেই লিখিত হয়েছিল। কাজেই ক্লিমেন্টের জন্য এই বাণীগুলি এ সকল সুসমাচার থেকে গ্রহণ করা অসম্ভব নয়, যদিও অর্থ ও ভাষায় পূর্ণ মিল পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এই বিষয়টি, অর্থাৎ ক্লিমেন্ট সুসমাচার থেকেই কথাগুলি গ্রহণ করেছেন, একথা প্রমাণ করা সহজ নয়। কারণ এই সুসমাচারগুলি লিখিত হওয়ার আগে থেকেই ক্লিমেন্ট যীশুর এসকল বাণী ও শিক্ষার সাথে খুব ভালভাবে পরিচিত ছিলেন। কাজেই এ সকল সুসমাচার লিখিত হওয়ার পরেও তিনি এগুলির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়াই পূর্বের অভ্যাস মতই নিজের জ্ঞান ও স্মৃতি থেকে এ সকল কথা লিখতে পারেন।

"তবে উভয় অবস্থাতেই এ থেকে প্রচলিত সুসমাচারগুলির সত্যতা প্রমাণিত হয়। যদি ক্লিমেন্ট এ সকল সুসমাচার থেকে তাঁর এসকল কথা গ্রহণ করে থাকেন, তবে এগুলির বিশুদ্ধতা তো স্পষ্টতই বুঝা যায়। আর যদি তিনি এগুলি অধ্যয়ন ছাড়াই নিজের জ্ঞান থেকেও এ সকল কথা লিখে থাকেন তাহলেও সুসমাচারগুলির সত্যতা প্রমাণিত হয়। কারণ তাঁর কথার সাথে সুসমাচারের কথার মিল রয়েছে। জানা যাচ্ছে যে, এ সকল কথা প্রসিদ্ধ ছিল এবং তিনি ও করিন্থবাসিগণ তা জানতেন। এ থেকে জানা যায় যে, ধৈর্য ও অধ্যবসায় শিক্ষা দানের সময় আমাদের প্রভু যে কথাগুলি বলেছিলেন, সুসমাচার লেখকগণ সেগুলিকে সত্য ও সঠিকভাবেই উপস্থাপন করেছেন। আর এই বচনগুলি পূর্ণ ভক্তিসহকারে মুখস্থ রাখারই যোগ্য।

"বিষয়টি যদিও এভাবে জটিল ও অসুবিধাজনক, তবুও আমি মনে করি অধিকাংশ পণ্ডিত লীক্লার্ক-এর সাথে একমত হবেন। তবে হ্যাঁ, প্রেরিতদের কার্য-বিবরণের ২০ অধ্যায়ের ৩৫ আয়াতে পৌল উপদেশ প্রদান করে বলেছেন : "প্রভু যীশুর বাক্য স্মরণ

করা উচিত, কেননা তিনি আপনি বলিয়াছেন, গ্রহণ করা অপেক্ষা বরং দান করা ধন্য হইবার বিষয়।" আমি নিশ্চিত, সকলেই একমত হবেন যে, পৌল এই বচনটি কোন লিখিত পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করেন নি বরং তিনি ও তাঁর শ্রোতাগণ যীশুর যে বাক্যগুলি জানতেন সেগুলিই তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়েছেন। কিন্তু এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, তাঁরা সবসময়েই এভাবে কোন লিখিত পুস্তক ছাড়াই শুধু শ্রুতি ও স্মৃতির ভিত্তিতেই যীশুর বাণী উদ্ধৃত করতেন। আমরা দেখতে পাই যে, পোলিকার্প (St. Polycarp) (স্মরণ করানোর) এই পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। সম্ভবত বরং নিশ্চিত যে, এক্ষেত্রে তিনি লিখিত সুসমাচার থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করতেন।"

লর্ডনার-এর উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হলো যে, ক্লিমেন্ট তাঁর কথাগুলি কোন পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করেছেন বলে খৃস্টান পণ্ডিতগণও নিশ্চিতরূপে বলতে পারেন না। যিনি তা দাবি করেছেন একান্তই অনুমান ও ধারণার উপর নির্ভর করেই দাবিটি করেছেন।

আমরা দেখেছি যে, লর্ডনার বলেছেন : "উভয় অবস্থাতেই এ থেকে প্রচলিত সুসমাচারগুলির সত্যতা প্রমাণিত হয়।" তাঁর এই কথাটি ঠিক নয় বরং এ থেকে সুসমাচারগুলির বিশুদ্ধতায় সন্দেহ উদ্রেক হয়। কারণ এখানে যেমন তাঁরা যীশুর (প্রসিদ্ধ ও পূর্ণ ভক্তিসহকারে মুখস্থ রাখার মত) বাণী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে উদ্ধৃত করেছেন, তেমনি হয়ত সকল স্থানেই তাঁরা এভাবেই করেছেন।

এই সন্দেহ একেবারে বাদ দিলেও আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, ক্লিমেন্টের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো, সুসমাচারসমূহে উদ্ধৃত এই বাণীগুলি যীশুর বাণী। কিন্তু এ থেকে সুসমাচারগুলির মধ্যে উল্লিখিত ও উদ্ধৃত অন্য সকল বিষয়ের বিশুদ্ধতা কোনভাবেই প্রমাণিত হয় না। কিছু কথা প্রসিদ্ধ হওয়ার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, সব কথাই এইরূপ প্রসিদ্ধ ছিল। তা না হলে খৃস্টানগণ যেসকল 'সুসমাচারকে' মিথ্যা বলে বিশ্বাস করেন, ক্লিমেন্টের পত্র দ্বারা সেগুলিরও সত্যতা প্রমাণিত হবে। কারণ তাঁর পত্রের কিছু কথা সন্দেহাতীতভাবে সেগুলির কিছু কথার সাথে মিলে যায়।

লর্ডনার আরো বলেছেন : "আমরা দেখতে পাই যে, পোলিকার্প (St. Polycarp) এই পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। সম্ভবত, বরং নিশ্চিত যে, এক্ষেত্রে তিনি লিখিত সুসমাচার থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করতেন।" তাঁর এই কথাটি একেবারেই বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত। কারণ ক্লিমেন্টের মত পোলিকার্পও যীশুর শিষ্যদের শিষ্য ছিলেন। তাঁর অবস্থাও ক্লিমেন্টের মতই হবে। কাজেই তিনি প্রেরিতগণ ও যীশুর শিষ্যগণ থেকে আহরিত জ্ঞান বাদ দিয়ে অন্যদের লিখিত সুসমাচার থেকে গ্রহণ করবেন একথা নিশ্চিত হওয়া তো দূরের কথা, এর সম্ভাবনাও খুবই কম বরং এই প্রকারের 'স্মরণ করানোর' ক্ষেত্রে তাঁর রীতিও ছিল 'পবিত্রপুরুষ' পৌলেরই মত।

ইগনাটিয়াসের লিখনী বিষয়ক আলোচনা

প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে সুসমাচারগুলির অস্তিত্ব প্রমাণের সবচেয়ে বড় সাক্ষী ক্লিমেন্টের অবস্থা পাঠক উপরের আলোচনা থেকে জানতে পেরেছেন। এখন আমরা দ্বিতীয় সাক্ষী ইগনাটিয়াসের বিষয়ে আলোচনা করব। তিনিও প্রেরিতদের শিষ্য ছিলেন এবং এন্টিয়কের বিশপ ছিলেন।

লর্ডনার তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলেছেন: "ইউসেবিয়াস ও জিরোম ইগনাটিয়াসের ৭টি পত্রের (epistles) কথা উল্লেখ করেছেন। এই ৭টি পত্র ছাড়া তাঁর নামে আরো কিছু পত্র প্রচলিত রয়েছে, যেগুলিকে অধিকাংশ ধর্মবেত্তা পণ্ডিত বানোয়াট ও জাল বলে বিশ্বাস করেন। আমার নিকটও অতিরিক্ত পত্রগুলির বানোয়াট হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। এই ৭টি পত্রের দুইটি সংস্করণ বা কপি রয়েছে : একটি ছোট আকারের ও অন্যটি বড় আকারের। মি. ওয়াটসন ও তাঁর দুই চারজন অনুসারী ছাড়া সবাই বিশ্বাস করেন যে, বৃহদাকারের পত্রগুলির মধ্যে অতিরিক্ত অনেক কথা পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে। ক্ষুদ্রাকৃতির পত্র ৭টিকে তাঁর লেখা বলে বলা যেতে পারে। আমি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় প্রকারের পত্রগুলির মধ্যে গভীর মনোযোগ সহকারে তুলনামূলক অধ্যয়ন করে দেখেছি। তাতে আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, ক্ষুদ্রাকৃতির পত্রগুলির মধ্যে পরবর্তীকালে সংযোজন ও পরিবর্ধন করে সেগুলিকে বৃহদাকৃতির করা হয়েছে। এমনটি নয় যে, বৃহদাকৃতির পত্রগুলিকে কাটছাট করে ক্ষুদ্রাকৃতির করা হয়েছে। পূর্ববর্তী যুগের ধর্মগুরু পণ্ডিতগণ এ সকল পত্রের যে সকল অংশ উদ্ধৃত করেছেন সে সকল উদ্ধৃতিও বৃহদাকৃতির পত্রগুলির চেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতির পত্রগুলির সাথে অনেক বেশি পরিমাণে মিলে যায়।

এরপরও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তা হলো ইগনাটিয়াসের নামে প্রচারিত ও প্রচলিত এই ৭টি পত্রের ক্ষুদ্র সংস্করণের পত্রগুলি কি সত্যই ইগনাটিয়াসের লেখা? না অন্য কারো? এ বিষয়ে কঠিন বিতর্ক রয়েছে। মহান গবেষকগণ এ বিষয়ে তাঁদের কলম ধরেছেন। উভয় পক্ষের আলোচনা পর্যবেক্ষণ করার পরে এই প্রশ্নটির উত্তর প্রদান আমার নিকট সমস্যাসঙ্কুল ও কঠিন বলে বোধ হয়।

আমার নিকট শুধু এতটুকুই প্রমাণিত হয়েছে যে, এই পত্রগুলি ইউসেবিয়াস (Eusebius) পাঠ করেছেন এবং অরিগন (Origen)-এর সময়ে সেগুলি বিদ্যমান ছিল (অর্থাৎ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে বা তৃতীয় শতাব্দীতে এই পত্রগুলির অস্তিত্ব ছিল)। এ সকল পত্রের কিছু কিছু বিষয় ইগনাটিয়াসের যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ কারণে এই বিষয়গুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত বলে বিশ্বাস করাই উচিত। কিন্তু তাই বলে এই সংযোজিত বিষয়গুলির কারণে পুরো পত্রগুলিকেই বাতিল বা জাল বলা উচিত নয়, বিশেষ করে আমরা যখন পাণ্ডুলিপির স্বল্পতাই ভুগছি। যেরূপভাবে আরিয়ান

(Arians)[১] সম্প্রদায়ের কেউ বৃহৎ সংস্করণের মধ্যে সংযোজন ঘটিয়েছেন, অনুরূপভাবে একথাও সম্ভব যে, আরিয়ান সম্প্রদায়ের কেউ, অথবা ধার্মিকদের কেউ[২] অথবা উভয় সম্পদায়েরই কেউ কেউ ক্ষুদ্রতর সংস্করণের মধ্যেও কারসাজি বা কমবেশি করেছেন। তবে আমার মতে এই কারসাজি বা কমবেশিতে খুব বেশি ক্ষতি হয়নি।

বেলির গ্রন্থের টীকাকার লিখেছেন, "পূর্ববর্তী যুগে সিরিয় ভাষায় ইগনাটিয়াসের পত্রাবলির তিনটি অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছিল। কিউরিথিন সেগুলি মুদ্রণ করেছেন। এই নতুন পত্রাবলী থেকে একথা আরো প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে গেল যে, এই পত্রগুলির ক্ষুদ্রতর সংস্করণ, যেগুলিকে আবার সংশোধন করেছেন, সেগুলির মধ্যেও পরবর্তী যুগে সংযোজিত বিষয়াদি রয়েছে।"

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছে :

প্রথম বিষয় : ৭টি পত্র ছাড়া ইগনাটিয়াসের নামে প্রচারিত সকল পত্র অধিকাংশ খৃস্টান ধর্মগুরুর মতে জাল ও বানোয়াট। কাজেই এ সকল পত্র বিবেচনার অযোগ্য।

দ্বিতীয় বিষয় : ৭ পত্রের যে বৃহৎ সংস্করণ সেটিও শুধু মি. ওয়াটসন ও তাঁর কতিপয় অনুসারী বাদে বাকি সকলের নিকটেই জাল ও বিকৃত। কাজেই সেগুলিও বিবেচনার অযোগ্য।

তৃতীয় বিষয় : ৭ পত্রের ক্ষুদ্র সংস্করণের বিশুদ্ধতার বিষয়ে কঠিন বিতর্ক রয়েছে। উভয় পক্ষেই রয়েছেন মহান গবেষকবৃন্দ। যাঁরা এই ক্ষুদ্র সংস্করণকেও জাল বলে বিশ্বাস করেন তাঁদের মতানুসারে ৭ পত্রের ক্ষুদ্র সংস্করণও বিবেচনার অযোগ্য। পক্ষান্তরে যাঁরা এগুলিকে ইগনাটিয়াসের লেখা বলে মনে করেন, তাঁদের মতেও এগুলির মধ্যে কিছু বিকৃতি রয়েছে বলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। বিকৃতিকারী আরিয়ান সম্প্রদায়ের হোন, অথবা ধার্মিক সম্প্রদায়ের হোন অথবা উভয় সম্প্রদায়ের হোন, সর্বাবস্থায় এদের মতানুসারেও এই পত্রগুলি বিবেচনার অযোগ্য।

বাহ্যত বুঝা যায় যে, এই ক্ষুদ্র সংস্করণের ৭টি পত্রও জাল। তৃতীয় শতকে কেউ এগুলিকে বানিয়ে ইগনাটিয়াসের নামে প্রচার করেছেন, যেমনভাবে অন্য পত্রগুলি বানিয়ে প্রচার করা হয়েছে। এই জালিয়াতির জন্য অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ এইরূপ বিকৃতি ও জালিয়াতি খৃস্ট ধর্মের প্রথম শতাব্দীগুলিতে শুধু বৈধই ছিল না; বরং তা মুসতাহাব বা পছন্দনীয় কর্ম বলে গণ্য হতো। তারা প্রায় ৭৫টি 'ইঞ্জিল' বা সুসমাচার এবং পত্রাবলি এভাবে জালিয়াতি করে বানিয়েছেন এবং যীশু, মরিয়ম ও

---

১. আলেকজান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু আরিয়ুস-এর অনুসারিগণ, যারা যীশু খৃস্টকে ঈশ্বরের সত্তার অংশ নয় বরং তাঁর সৃষ্ট 'পুত্র' বলে বিশ্বাস করত। সাধারণভাবে এরা একেশ্বরবাদী খৃস্টান বলে পরিচিত।

২. সাধারণ খৃস্টানগণ একেশ্বরবাদীদেরকে ধর্মবিরোধী ও ত্রিত্ববাদীদেরকে ধার্মিক বলে দাবি করেন।

প্রেরিতগণের নামে চালিয়েছেন। তাহলে ইগনাটিয়াসের নামে ৭টি পত্র জালিয়াতি করার মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার মত কী আছে? বরং যুক্তির দিক থেকে এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। অন্য পত্রগুলির মত এগুলির জাল হওয়াও খুবই স্বাভাবিক। যেমন তারা একটি 'ব্যাখ্যাগ্রন্থ' বানিয়ে তা 'তীশান'-এর নামে চালিয়ে দিয়েছেন।

এডাম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : "তীশানের নামে প্রচারিত মূল ব্যাখ্যাগ্রন্থটি হারিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে তাঁর নামে যে ব্যাখ্যাগ্রন্থটি প্রচলিত পণ্ডিতগণ তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। তাঁদের এই সন্দেহ সঠিক।"

এই পত্রগুলিকে যদি ইগনাটিয়াসের লেখা বলে মেনেও নেয়া হয়, তবুও তা থেকে কোন কিছু প্রমাণ করা যায় না। কারণ এগুলির মধ্যে পরবর্তী যুগে যে কিছু কথা বাড়ানো হয়েছে তা সকলেই স্বীকার করছেন। কাজেই তাঁর কোন কথাকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায় না। তাঁরা যেমন স্বীকার করছেন যে, এই পত্রগুলির কিছু অনুচ্ছেদ পরবর্তীতে সংযোজিত। তেমনি যে অনুচ্ছেদগুলির বিষয়ে তাঁরা দাবি করছেন যে, সেগুলি পাঠ করলে সেগুলি কোন সুসমাচার থেকে গৃহীত বলে মনে হয়, সেগুলিও পরবর্তীকালে সংযোজিত হতে পারে। এ সকল মানুষের অভ্যাস ও রীতির সাথে যারা পরিচিত তারা জানেন যে, এইরূপ করা তাদের জন্য মোটেও অসম্ভব নয়।

ধর্মগ্রন্থাদির বিকৃতি ও জালিয়াতির বিষয়ে খৃস্টান পণ্ডিতদের সাক্ষ্য

যুসিবিস (ইউসেবিয়াস) তাঁর ইতিহাসের (Eusebius' Ecclesiastical History) চতুর্থ পুস্তকের ২৩ অধ্যায়ে লিখেছেন : "করিন্থের বিশপ ডিওনিসিয়াস (Dionysius)[১] বলেন, 'ভ্রাতৃগণের ইচ্ছা অনুসারে আমি অনেকগুলি পত্র লিখেছিলাম। আর এই সব দিয়াবলের (শয়তানের) শিষ্যগণ সেগুলিকে নোংরা ও অপবিত্র কথা দিয়ে ভরে দিয়েছে। কিছু বিষয় তারা পরিবর্তন করেছে এবং কিছু বিষয় তারা সংযোজন করেছে। সে কারণে বহুগুণ কষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই, এতে কোন অবাক হওয়ার কারণ নেই যে, কেউ কেউ আমাদের প্রভুর পবিত্র লিখনীগুলিকে বিকৃত করার চেষ্টা করবে। কারণ, তারা সেগুলির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকাদি এভাবে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে।"[২]

এডাম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "(তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু) অরিগনের বড় বড় পুস্তক সব হারিয়ে গিয়েছে। তাঁর লেখা 'ব্যাখ্যাগ্রন্থের' অনেক কিছু এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। কিন্তু সেগুলির মধ্যে প্রচুর কাল্পনিক, নাটকীয় ও

---

১. খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খৃস্টান ধর্মগুরু ও প্রচারক। তিনি করিন্থের বিশপ ছিলেন। বিভিন্ন চার্চে অনেকগুলি যাজকীয় পত্র (epistles) লিখেছিলেন। Eusebius, The Ecclesiastical History, page 158, 475.

২. Eusebius, The Ecclesiastical History, page 160.

অবাস্তব ব্যাখ্যা রয়েছে, যেগুলি অত্যন্ত শক্তভাবে প্রমাণ করে যে, অরিগনের পরে তাঁর ব্যাখ্যার মধ্যে বিকৃতি প্রবেশ করেছে।"

মীখাঈল মাশাকা লেবাননের একজন প্রসিদ্ধ আরব প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত। তাঁর লেখা একটি আরবী পুস্তক হলো : "আজয়িবাতুল-ইনজীলিয়্যীন 'আলা আবাতিলিত-তাকলীদিয়্যীন" (প্রাচীনপন্থিদের বাতিলসমূহের প্রতিবাদে ইঞ্জিলপন্থিদের উত্তর)। এই পুস্তকের প্রথম অংশের ১০ অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন :

"এ সকল প্রাচীনপন্থি খৃস্টানগণ কর্তৃক প্রাচীন ফাদারদের বচনগুলির বিকৃতির বিষয়ে আমি অবশ্যই প্রমাণাদি উপস্থাপন করব যেন আমাদের কথাও আমাদের বিরোধীদের কথার মত প্রমাণবিহীন বাগাড়ম্বরে পরিণত না হয়। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হলো, স্বর্ণমুখি যোহনের নামে প্রচলিত 'অপশন' পুস্তক, যা 'আফখারিস্তিয়' সার্ভিসের[১] সময় সকল চার্চে পড়া হয়। সেই পুস্তকটির ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে, এক সম্প্রদায়ের ভার্সনের সাথে অন্য সম্প্রদায়ের ভার্সনের কোন মিল নেই। রোমানদের নিকট রক্ষিত এই পুস্তকের পাঠে স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করা হয়, তিনি যেন তাঁর পবিত্র আত্মাকে মদ ও রুটির মধ্যে প্রেরণ করেন এবং রুটি ও মদকে মাংস ও রক্তে পরিণত করেন।

"আর রোমান ক্যাথলিকদের ভার্সনে বলা হয় : তিনি যেন তাঁকে রুটি ও মদের মধ্যে প্রেরণ করেন, যেন রুটি ও মদ মাংস ও রক্তে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কিন্তু মি. ম্যাক্সিমাস-এর নেতৃত্বের সময়ে তারা প্রার্থনার এই বাক্যটি পরিবর্তিত করে পড়তে থাকেন : "পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত রুটি ও রক্ত"। কারণ রোমান খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে রূপান্তর ঘটে। আর ক্যাথলিকগণ দাবি করেন যে, স্বয়ং রুটি ও মদই মাংস ও রক্তে রূপান্তরিত হয়। রোমানদের দাবির অসারতা প্রমাণ করার জন্য ক্যাথলিকগণ প্রার্থনার ভাষায় পরিবর্তন করেন।

"পক্ষান্তরে সিরীয় ক্যাথলিকগণ (য্যাকোবাইট খৃস্টানগণ) তাদের প্রার্থনায় বলেন : "আপনার পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করুন এই রুটি ও মদের মধ্যে, যে রুটি ও মদ আপনার খৃস্টের দেহের রহস্য।" এদের ভার্সনে পরিবর্তন বা রূপান্তরের কোন কথা নেই। সম্ভবত এটিই হলো স্বর্ণমুখি যোহনের মূল বক্তব্যের সঠিক রূপ; কারণ তাঁর যুগে রূপান্তরের বিষয়টি খৃস্টীয় চার্চের শিক্ষার মধ্যে প্রবেশ করেনি।

"সাইদার বিশপ মি. বাবিতা, যিনি প্রথম রোমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেন এবং ক্যাথলিক মত গ্রহণ করেন, ১৭২২ খৃস্টাব্দে রোমের বিশপীয় সম্মেলনে

১. ডিভাইন সাপার বা ঐশ্বরিক নৈশভোজের সময় রুটি ও মদের মধ্যে যীশুর দেহ, রক্ত, ঐশ্বরিক সত্তার উপস্থিতি।

এই বিষয়ে বলেন : "আমাদের পূর্ববর্তী ধর্মগুরুদের আচার-অনুষ্ঠানের বিষয়ে আমার নিকট আরবী, গ্রীক ও সিরীয় ভাষায় অনেক পুস্তক রয়েছে। এ বিষয়ে ব্যাসিলীয় সন্ন্যাসীদের জন্য রোম থেকে যে পুস্তকটি মুদ্রণ করা হয়েছে তার সাথে উক্ত পুস্তকগুলি আমি তুলনা করে অধ্যয়ন করেছি। এ সকল পুস্তকের কোন কিছুতেই রূপান্তর ও পরিবর্তন বিষয়ক কোন কথা নেই। প্রকৃত পক্ষে রোমানদের প্রধান ধর্মগুরু কনস্ট্যান্টিনোপলের প্রধান বিশপ (Patriarch) নিকোফোরাসই এই বিষয়টির উদ্ভাবন করেন। যে কেউ চিন্তা করলে দেখবেন যে, বিষয়টি হাস্যকর।

"এত প্রসিদ্ধ একজন মহাসাধু যাজক, যিনি সকল যাজক ও ফাদারের নিকট সুপরিচিত এবং যাঁর পুস্তক সকল সম্প্রদায়ের সকল চার্চে সকাল সন্ধ্যায় পড়া হয়, তাঁর পুস্তকের মধ্যে যারা কারসাজি করতে পারেন, নিজেদের পছন্দমত পরিবর্তন করতে পারেন এবং পরিবর্তনের পরেও কথাগুলিকে সেই সাধু-যাজকের নামে চালাতে মোটেও লজ্জা বোধ করেন না, আমরা কিভাবে তাদের উপর নির্ভর করতে পারি বা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে, তারা অন্যান্য ফাদার ও যাজকদের বক্তব্যও অনুরূপভাবে নিজেদের মন-মর্জি অনুসারে পরিবর্তন করেননি এবং বিকৃতির পরেও সেগুলিকে সেই সব ফাদার ও যাজকদের নামে চালান নি?

"শুধু তাই নয়, আমাদের চোখের সামনে, কয়েক বছর আগে যা ঘটল তা দেখুন। স্বর্ণমুখি যোহন রচিত যোহনলিখিত সুসমাচারের ব্যাখ্যাগ্রন্থটি মিসরীয় ক্যাথলিক কপ্টিক পণ্ডিত ধর্মগুরু শাম্মাস গাবরীল মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেন। এজন্য তিনি অনেক শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেন। রোমান পণ্ডিতগণ, যাঁরা গ্রীক ও আরবী উভয় ভাষা ভালভাবে জানেন, তাঁরা দামেশ্‌কে তাঁর এই সম্পাদনা পুনরায় রিভিউ করেন এবং তার বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাঁরা খুব যত্নের সাথে এর একটি অনুলিপি তৈরি করেন। কিন্তু ক্যাথলিক ধর্মগুরু মি. ম্যাক্সিমোস দীর আল-শুআইর থেকে তা প্রকাশ করতে বাধা দেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, পাদরী আলেক্সাস ইসপানিউলি এবং ম্যারোনাইট পাদরী যোশেফ জাজা উভয়ে পাণ্ডুলিপিটি দেখে সংশোধন না করে দিলে তা প্রকাশ করা যাবে না। এদের দুজনের একজনও গ্রীক ভাষার কিছুই জানতেন না। তাঁরা উভয়ে পোপের ধর্মমতের সাথে মিল রাখার জন্য পাণ্ডুলিপিটির মধ্যে তাদের ইচ্ছামত সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তন করেন। এভাবে পাণ্ডুলিপিটির 'পরিদূষণ' সমাপ্ত করার পরে তাতে তাঁদের 'সংশোধনের' সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন। এরপর মহান গুরু ম্যাক্সিমোস পুস্তকটি প্রকাশ করে নিজেকে গৌরবান্বিত করেন। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হওয়ার পরে রোমান পণ্ডিতগণ নিজেদের নিকট সংরক্ষিত অনুলিপির সাথে তা মিলিয়ে দেখেন। ফলে বিকৃতি ধরা পড়ে এবং তাঁদের কলঙ্ক প্রকাশিত হয়ে যায়। এমনকি এর ফলে মনোকষ্টে পণ্ডিত শাম্মাস গাবরীল মৃত্যুবরণ করেন।"

"এরপর তিনি বলেন : "তাদের জন্য আমি এখানে একটি প্রমাণ উপস্থাপন করছি। তাদের সামাজিক নেতৃবৃন্দের সাক্ষ্যসহ এমন একটি আরবী বই থেকে আমি প্রমাণ উপস্থাপন করছি যা মুদ্রিতরূপে তাঁদের নিকট বিদ্যমান। বইটি লেবাননীয় সংস্করণ, রোমান চার্চের পক্ষ থেকে তা তার সকল সদস্যের জন্য প্রচারিত ও প্রবর্তিত। ম্যারোনাইট খৃস্টান সম্প্রদায়ের সকল বিশপ, প্রধান বিশপ (প্রেট্রিয়ার্ক) ও ধর্মগুরু পণ্ডিতগণ বইটি রচনা করেন। রোমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত মশিয়ে সাম'আনীর তত্ত্বাবধানে বইটি রচিত হয়। দীর আল-শুআইর থেকে ক্যাথলিক নেতাদের অনুমতিক্রমে তা প্রকাশিত হয়।

"এই পুস্তকে চার্চের সার্ভিস সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'আমাদের চার্চের মধ্যে অনেক প্রাচীন উৎস বা পুস্তিকা রয়েছে। সেগুলি ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত। কিন্তু সেগুলি এমন সব ধর্মগুরু ও যাজকদের নামে লেখা হয়েছে, যাঁরা এগুলি লিখেন নি এবং এগুলি কখনোই তাঁদের রচিত নয়। এগুলির মধ্যে কিছু আবার কাল্পনিক বিশপদের নামে লেখা হয়েছে। অনুলিপিকারগণ খারাপ উদ্দেশ্যে এগুলিকে প্রবেশ করিয়েছে।' তাহলে তাঁরা সকলে মিলে নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, "তাদের চার্চে জাল পুস্তকাদি রয়েছে।" মীখাঈল মাশাকার কথা তাঁর নিজের ভাষায় এ পর্যন্ত উদ্ধৃত করা হলো।

"এরপর তিনি বলেন : "আমাদের এই যুগে কি ঘটছে তা আমরা দেখছি। এ যুগে ইচ্ছামত সব কিছু বিকৃত করা কষ্টকর। কারণ সবাই ভয় পান যে, বিকৃতির দোষে তাকে দুষ্ট করা হবে। তারা জানেন যে, সুসমাচারের চক্ষু তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছে। কিন্তু সেই অন্ধকার যুগগুলিতে কি হয়েছে তা সঠিকভাবে আমরা জানতে পারি না। ৭ম প্রজন্ম থেকে ১৫ প্রজন্ম পর্যন্ত, যে শতাব্দীগুলিতে পোপ এবং বিশপ অর্থ ছিল একটি বর্বর রাজ্য। যে সকল পোপ ও বিশপদের অনেকেই ছিল নিরক্ষর মূর্খ। পূর্বাঞ্চলীয় খৃস্টানগণ ছিলেন অন্যান্য জাতির আধিপত্যের অধীনে সঙ্কুচিত। তারা ছিলেন তাদের নিজেদের অস্তিত্ব সংরক্ষণে ব্যস্ত। এই যুগে কি (বিকৃতি) ঘটেছিল তা নিশ্চিতরূপে আমরা জানতে পারি না। কিন্তু আমরা যখন এই সকল যুগের ইতিহাস পাঠ করি, তখন খৃস্টের চার্চের জন্য ক্রন্দন ও বিলাপ উদ্রেককারী তথ্য ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না। এই যুগগুলিতে খৃস্টের চার্চ আপাদমস্তক চূর্ণবিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।" তাঁর নিজের ভাষায় তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হলো।

হে জ্ঞানী পাঠক! আপনি পণ্ডিত মীখাঈলের উপরে উদ্ধৃত বক্তব্যত্রয় ভাল করে লক্ষ্য করুন। আমি যা কিছু বলেছি (জালিয়াতির বিষয়ে) সে বিষয়ে কি এরপর আর কোন সন্দেহ থাকে?

নিকীয়া যাজকীয় মহাসম্মেলনে (ecumenical council of Nicaea) গৃহীত সিদ্ধান্তাবলি ছিল ২০ টি মাত্র। সেগুলির মধ্যে বিকৃতি ও সংযোজন করে তার সংখ্যা অনেক

বাড়ানো হয়। ক্যাথলিক সম্প্রদায় এরই ৩৭ ও ৪৪তম সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তাদের পোপের কর্তৃত্ব প্রমাণ করেন।

১৮৪৯ সালে মুদ্রিত খৃস্টান সম্প্রদায়ের আরবী সংকলন '১৩টি পুস্তিকা' গ্রন্থের ২য় পুস্তিকার ৬৮ ও ৬৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : "নিকীয়ান সম্মেলনের ২০টির বেশি সিদ্ধান্ত ছিল না। থিওডোরাসের ইতিহাস, গিলাসিওসের গ্রন্থাবলি ও অন্যান্য সূত্র থেকে তা জানা যায়। এছাড়া (৪৫১ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত) চতুর্থ যাজকীয় মহাসম্মেলনেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিকীয়ান সম্মেলনের বিধানাবলি ছিল ২০টি মাত্র।"

অনুরূপভাবে অনেক গ্রন্থ জালিয়াতি করে লিখে বিভিন্ন পোপের নামে প্রচার করেছেন, যেমন ক্যালিটিওস, সিরসিওস, নিক্লিটস, আলেকজান্ডার ও মারিসিলিওস।

উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় পুস্তিকার ৮০ পৃষ্ঠায় রয়েছে : "পোপ লাওন এবং আপনাদের রোমান চার্চের অধিকাংশ ধর্মগুরু পণ্ডিত একথা স্বীকার করেন যে, এ সকল পোপের নামে প্রচলিত পুস্তিকাগুলি সব জাল; এগুলির কোনরূপ ভিত্তি নেই।"

দ্বিতীয় বিভ্রান্তির অপনোদন

মার্ক ও লূক পিতর ও পৌলের সহায়তায় সুসমাচার লিখেছেন বলে খৃস্টান প্রচারকদের দ্বিতীয় বিভ্রান্তিমূলক দাবির উত্তরে আমি বলব যে, কথাটি একেবারে নির্ভেজাল বিভ্রান্তিকর কথা। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত খৃস্টান ধর্মগুরু ও নেতা আরিনাউস (Irenaeus) বলেন : "পিতরের শিষ্য ও তাঁর অনুবাদক মার্ক পিতর ও পৌলের মৃত্যুর পরে পিতর যে সকল বিষয় উপদেশ প্রদান করতেন সে বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করেন।"

লর্ডনার তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন : "আমার ধারণা, মার্ক ৬৩ বা ৬৪ খৃস্টাব্দের আগে তাঁর সুসমাচার লিখেন নি। কারণ এই তারিখের আগে পিতর রোমে উপস্থিত হয়েছেন বলে কল্পনা করার কোন যৌক্তিক কারণ নেই। প্রাচীন লেখক আরিনাউসের কথাও এই তারিখের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন : 'পিতর ও পৌলের মৃত্যুর পরে মার্ক তাঁর সুসমাচার লিখেছেন।' বাসিনও আরিনাউসের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন : 'পৌল ও পিতরের মৃত্যুর পরে ৬৬ খৃস্টাব্দে মার্ক তাঁর সুসমাচার রচনা করেন।' তাঁর মতে পৌল ও পিতর ৬৫ সালে নিহত হন।"

আরিনাউস ও বাসিন-এর কথা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, পৌল ও পিতরের মৃত্যুর পরেই মার্ক তাঁর সুসমাচার রচনা করেছেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, পিতর কখনো মার্কের লিখিত সুসমাচার স্বচক্ষে দেখেন নি। পিতর মার্কের সুসমাচারটি দেখেছেন বলে যে বিবরণটি রয়েছে তা দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য। আর এজন্যই 'মুরশিদুত তালিবীন' গ্রন্থের লেখক তাঁর গোঁড়ামি সত্ত্বেও ১৮৪০ সালে মুদ্রিত তাঁর পুস্তকের ১৭০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "ধারণা করা হয় যে, সেন্ট মার্ক তাঁর সুসমাচারটি রচনা করেছিলেন সেন্ট পিতরের পরিচালনায়।"

এখানে "ধারণা করা হয়" কথাটির দিকে লক্ষ্য করুন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, বিষয়টি একটি ভিত্তিহীন বাতুল ধারণা মাত্র। এর কোন ভিত্তি বা প্রমাণ নেই।[১]

পিতর যেমন মার্কের সুসমাচার দেখেন নি, তেমনি পৌলও লূকের সুসমাচার দেখেন নি। এর দুইটি প্রমাণ রয়েছে।

প্রথম প্রমাণ : প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো যে, লূক ৬৩ খৃস্টাব্দে তাঁর সুসমাচার লিখেছেন এবং তিনি গ্রীসের আখায়া প্রদেশে (করিন্থে) তা লিখেছিলেন। আর পৌলের বিষয়ে এ কথা খৃস্টান গবেষকগণ বলেন, ৬৩ সালে তিনি কারাগার হতে মুক্তি পান।[২] মুক্তির পরে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর আর কোন খবর সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। তবে সম্ভবত তিনি মুক্তি পাওয়ার পরে স্পেন এবং পশ্চিম ইউরোপে গমন করেন। তিনি পূর্বাঞ্চলীয় চার্চগুলির দিকে আর ফিরে আসেন নি। আখায়া বা করিন্থও পূর্বাঞ্চলীয় চার্চের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে যতটুকু বুঝা যায়, লূক তাঁর সুসমাচারটির রচনা সমাপ্ত করার পরেই তা থিয়ফিলের নিকট পাঠিয়ে দেন; কারণ তাঁর জন্যই তিনি সুসমাচারটি রচনা করেছিলেন।

মুরশিদুত তালিবীন গ্রন্থের লেখক ১৮৪০ সালে মুদ্রিত তাঁর পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬১ পৃষ্ঠায় লূকের অবস্থা বর্ণনায় লিখেছেন : "তিনি ৬৩ সালে আখায়া প্রদেশে তাঁর সুসমাচার রচনা করেন।"

কোনরূপ প্রমাণ নেই যে, থিয়ফিল পৌলের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। কাজেই পৌল লূকের সুসমাচারটি দেখেছিলেন বলে কোন প্রমাণ নেই।

১৮২২ সালে মুদ্রিত 'ব্যাখ্যাগ্রন্থের' চতুর্থ খণ্ডের ৩৩৮ পৃষ্ঠায় হর্ন বলেন : "বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে পৌলের অবস্থা সম্পর্কে লূক কিছুই লিখেন নি।

---

১. খুবই সহজ বিষয় এই যে, মার্ক যদি তাঁর রচনায় পিতরের কোনরূপ নির্দেশনা বা সহযোগিতা গ্রহণ করতেন তাহলে অবশ্যই তিনি ভূমিকায় তা লিখতেন। মার্ক কোনোভাবেই দাবি করেন নি যে, তিনি পিতরের নির্দেশে তা রচনা করেছেন।

২. পৌলের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত নয়। ৫৯/৬০ খৃস্টাব্দের দিকে জিরূশালেমে পৌল বন্দী হন। প্রায় দুই বছর পরে বিচারের জন্য তাঁকে রোমে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি দুই বছরকাল বিচারের অপেক্ষায় গৃহবন্দি থাকেন। এই পর্যন্ত তথ্য লূক তাঁর 'প্রেরিতদের কার্যবিবরণী' পুস্তকে লিখেছেন। কিন্তু এরপর পৌলের কি হলো সে বিষয়ে লূক কোনরূপ কোন ইঙ্গিত করেন নি। ইউসেবিয়াস বিভিন্ন সূত্র থেকে নিশ্চিতরূপে উল্লেখ করেছেন যে, রোমান সম্রাট নিরো ৬৩ খৃস্টাব্দের দিকে পিতর ও পৌল উভয়কে রোমেই হত্যা করেন। কাজেই তিনি বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন সে কথাটিও নিশ্চিত নয়। অধিকাংশ গবেষকই মনে করেন যে, ৬৩/৬৪ সালের দিকেই তাঁকে রোমে হত্যা করা হয়। দেখুন : Eusebius, The Ecclesiastical History, page 79-80; Thomas Bokenkotter, A Concise History of the Catholic Church, pages 30-31.

এজন্য ৬৩ সালে মুক্তি পাওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পৌলের যাত্রা, ভ্রমণ ইত্যাদি অবস্থা সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানা যায় না।"

১৮২৭ সালে মুদ্রিত তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৫৩০ পৃষ্ঠায় লর্ডনার বলেন : "এখন আমরা মুক্তি প্রাপ্তির পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই প্রেরিতের (পৌলের) অবস্থা আলোচনা করতে চাই। কিন্তু এ বিষয়ে লূকের বর্ণনা থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। নতুন নিয়মের অন্যান্য পুস্তক থেকে অতি সামান্য সাহায্য পাওয়া যায়। প্রাচীন পণ্ডিতগণের বক্তব্য থেকে এর বেশি কিছু সাহায্য পাওয়া যায় না। মুক্তি পাওয়ার পরে পৌল কোথায় গিয়েছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।"

এভাবে এই দুই ব্যাখ্যাকারের বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারছি যে, মুক্তি পাওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পৌলের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানা যায় না। কাজেই আধুনিক কোন কোন ব্যক্তি যদি কল্পনা বা অনুমান করে দাবি করেন যে, পৌল মুক্তির পরে পূর্বাঞ্চলীয় চার্চগুলিতে ফিরে এসেছিলেন তবে তা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ১৫ অধ্যায়ে পৌল বলেছেন : "২৩ কিন্তু এখন এই সকল অঞ্চলে আমার আর স্থান নাই। এবং অনেক বৎসর ধরিয়া আকাঙ্খা করিয়া আসিতেছি যে, স্পেন দেশে যাইবার সময়ে তোমাদের ওখানে যাইব; ২৪ কারণ আশা করি যে, যাইবার সময়ে তোমাদিগকে দেখিব, এবং প্রথমে তোমাদের সহবাসে কতক পরিমাণে তৃপ্ত হইলে তোমরা আমাকে সেখানে আগাইয়া দিবে।"

এভাবে পৌল স্পষ্টভাবে উল্লেখ করছেন যে, তিনি স্পেনে যেতে চান। কোন শক্তিশালী দলিল বা সঠিক সংবাদ দ্বারা প্রমাণিত হয় নি যে, তিনি বন্দিত্বের আগে স্পেনে যেতে পেরেছিলেন। কাজেই বুঝা যায় যে, তিনি মুক্তি পাওয়ার পরে তথায় গমন করেছিলেন। কারণ তাঁর এই ইচ্ছাটি তিনি বাতিল করেছিলেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণের ২০ অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে পৌল বলেছেন : "আর এখন দেখ, আমি জানি যে, যাহাদের মধ্যে আমি সেই রাজ্য প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছি, সেই তোমরা সকলে আমার মুখ আর দেখিতে পাইবে না... ।" একথা থেকে বুঝা যায় যে, পুনরায় পূর্বাঞ্চলীয় চার্চগুলিতে ফিরে যাওয়ার কোন ইচ্ছা পৌলের ছিল না।

রোমের বিশপ ক্লিমেন্ট তাঁর পত্রে বলেন : "পৌল সর্ব পশ্চিমে পৌঁছে যান সারা বিশ্বকে সত্যের শিক্ষা প্রদানের জন্য এবং শহীদ হওয়ার পরে পবিত্র স্থানে (স্বর্গে) চলে যান।" একথাটিও প্রমাণ করে যে, তিনি পূর্বাঞ্চলীয় চার্চে ফিরে যান নি, বরং পশ্চিম ইউরোপে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় প্রমাণ : লর্ডনার প্রথমে আরিনাউসের নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন : "পৌলের অনুগামী লূক একটি পুস্তকে পৌল যে সুসমাচারের ওয়াজ করতেন তা লিপিবদ্ধ করেন।"

এরপর তিনি বলেন : "কথার প্রসঙ্গ থেকে বুঝা যায় যে, এই কার্যটি (অর্থাৎ লূক কর্তৃক সুসমাচার রচনা) মার্কের সুসমাচার লেখার পরে ঘটে। আর তা ছিল পৌল ও পিতরের মৃত্যুর পরে।"

এ কথাও প্রমাণ করে যে, পৌল লূকের সুসমাচার দেখেন নি।[১] আর যদি একথা ধরে নেওয়া হয় যে, পৌল এই সুসমাচারটি দেখেছেন তবে তাঁর এই দেখার কোন মূল্য আমাদের কাছে নেই। কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, পৌল ঐশ্বরিক প্রেরণা-প্রাপ্ত ছিলেন না। কাজেই লূকের মত একজন প্রেরণাবিহীন মানুষের কথা বা লিখনী পৌলের মত একজন প্রেরণাবিহীন মানুষ দেখলে কিভাবে তা ঐশ্বরিক প্রেরণা-নির্ভর গ্রন্থে পরিণত হবে?

---

১. সবচেয়ে সহজ কথা হলো, লূক তাঁর সুসমাচারের ভূমিকায় স্পষ্ট লিখেছেন যে, তিনি গবেষণা করে এর তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। পৌলের সকল কথা তিনি প্রেরিতদের কার্য বিবরণে লিখেছেন। কিন্তু কোথাও লিখেন নি যে, পৌলের নির্দেশে বা সহযোগিতায় তিনি তাঁর সুসমাচার রচনা করেছেন। এরপর এই ধরনের দাবি হাস্যকর।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিকৃতির প্রমাণ

পূর্বকথা : বিকৃতির প্রকারভেদ

বিকৃতি বা পরিবর্তন (alteration, distortion, perversion) দুই প্রকারের হতে পারে : শাব্দিক ও অর্থগত। দ্বিতীয় প্রকারের বিকৃতির বিষয়ে আমাদের ও খৃস্টানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। কারণ খৃস্টানগণ সকলেই স্বীকার করেন যে, তাঁদের মতে প্রাচীন নিয়মের পুস্তকাবলির যে সকল আয়াতে যীশু খৃস্টের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, ইহূদীগণ সেগুলির অর্থগত বিকৃতি সাধন করেন। এছাড়া পুরাতন নিয়মে উল্লিখিত বিধিবিধানগুলি, যেগুলিকে ইহূদীগণ চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল বলে বিশ্বাস করেন সেগুলির ব্যাখ্যাতেও তারা অর্থগত বিকৃতি সাধন করেন বলে খৃস্টানগণ স্বীকার করেন। অনুরূপভাবে প্রটেস্ট্যান্টগণ স্বীকার করেন যে, পোপের অনুসারিগণ (ক্যাথলিকগণ) পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মের বিভিন্ন অর্থের বিকৃত ব্যাখ্যা করেন। পক্ষান্তরে পোপের অনুসারিগণ প্রটেস্ট্যান্টগণকে কঠিনভাবে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। কাজেই বাইবেলের পুস্তকাবলির বিভিন্ন বক্তব্যের অর্থ বিকৃত করা হয়েছে বলে প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

বাকি থাকল প্রথম প্রকার (শাব্দিক) বিকৃতি। বাইবেলের মধ্যে কোনরূপ শাব্দিক বিকৃতি ঘটার বিষয়টি প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ প্রকাশ্যে অত্যন্ত কঠিনভাবে অস্বীকার করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো সাধারণ অজ্ঞ মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করা। পাঠকদেরকে সন্দেহের মধ্যে নিপতিত করার জন্য তাঁরা তাঁদের পুস্তকাদিতে এ বিষয়ে কিছু ঘোরানো, প্যাঁচানো, দ্ব্যর্থবোধক ও জালিয়াতিমূলক দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করেন। এ কারণে এই বিষয়টি প্রমাণ করার প্রয়োজন। আমি আসমান-যমিনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সাহায্যে এই পুস্তকে তা প্রমাণ করতে চাই।

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হলো, শাব্দিক বিকৃতির বিভিন্ন প্রকার রয়েছে : (১) এক শব্দকে অন্য শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করা, (২) বাক্য বা বক্তব্যের মধ্যে অতিরিক্ত শব্দ সংযোজন করা ও (৩) বাক্য থেকে কিছু শব্দ বিয়োজন করা। এই তিন প্রকারের বিকৃতি সবই বাইবেলের পুস্তকাবলির মধ্যে রয়েছে। আমি উপযুক্ত ক্রম অনুসারে তিনটি পরিচ্ছেদে এই তিন প্রকার বিকৃতির আলোচনা করব।

প্রথম পরিচ্ছেদ
পরিবর্তনের মাধ্যমে শাব্দিক বিকৃতির প্রমাণ

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ আপনাকে সুপথে পরিচালিত করুন। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ইহূদী-খৃষ্টানগণের নিকট সংরক্ষিত পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলির তিনটি মূল সংস্করণ ও পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

প্রথম : হিব্রু সংস্করণ বা হিব্রু পাণ্ডুলিপি। ইহূদীগণ ও অধিকাংশ প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান এই সংস্করণকেই সঠিক বলে মনে করেন।

দ্বিতীয় : গ্রীক সংস্করণ বা গ্রীক পাণ্ডুলিপি। ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত খৃষ্টানগণ এই সংস্করণকেই গ্রহণযোগ্য ও সঠিক বলে মনে করতেন। এই সুদীর্ঘ ১৫শত বছর যাবৎ তারা বিশ্বাস করতেন যে, হিব্রু সংস্করণ বিকৃত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত গ্রীক অর্থোডক্স সম্প্রদায় এবং প্রাচ্যদেশীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় এই গ্রীক সংস্করণকেই নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন।[১]

তৃতীয় : শমরীয় (Samaritan) সংস্করণ। শমরীয় ইহূদীগণের নিকট এই সংস্করণই নির্ভরযোগ্য। হিব্রু সংস্করণ ও শমরীয় সংস্করণ মূলত একই। পার্থক্য হলো, এই সংস্করণে পুরাতন নিয়মের শুধু ৭টি পুস্তক রয়েছে। মোশির ৫টি পুস্তক, যিহোশূয়ের পুস্তক ও বিচারকর্তৃগণের বিবরণ। শমরীয় ইহূদীগণ (Samaritan) এই পুস্তক ৭টি ছাড়া পুরাতন নিয়মের বাকি পুস্তকগুলিকে ঐশ্বরিক বলে স্বীকার করেন না। এই সংস্করণের

---

১. ইহূদীগণের ধর্মীয় ও ব্যবহারিক ভাষা হিব্রু ভাষা। এই ভাষাতেই তাদের সকল ধর্মগ্রন্থ লিখিত হয়। স্বভাবতই পুরাতন নিয়মের সকল গ্রন্থই হিব্রু ভাষায় লিখিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব ৩৩২ সালে আলেকজান্ডার প্যালেস্টাইন, দখল করেন এবং তা গ্রীক সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ইহূদীগণ গ্রীক নাগরিকে পরিণত হয় এবং তাদের মধ্যে গ্রীক ভাষার কিছু প্রচলন ক্রমান্বয়ে শুরু হয়। প্রায় এক শতাব্দী পরে, খৃষ্টপূর্ব ২৮৫-২৪৫ সালের দিকে বাইবেলের পুরাতন নিয়ম নামে পরিচিত ইহূদী ধর্মগ্রন্থগুলি গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়। কথিত আছে যে, মিসরের শাসক ২য় টলেমি : টলেমি ফিলাডেলফাস (Prolemy Philadelphus)-এর রাজত্বকালে (খৃ. ২৮৫-২৪৬) তাঁর নির্দেশে ৭০/৭২ জন পণ্ডিত তা 'আলেকজান্ড্রীয় গ্রীক ভাষায়' অনুবাদ করেন। এই গ্রীক অনুবাদটিই the Septuagint (LXX) বা 'সত্তরের' অনুবাদ বলে প্রসিদ্ধ। যীশুখৃষ্টের সময়ে এই অনুবাদটি প্রচলিত ছিল। ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত খৃষ্টানগণ গ্রীক অনুবাদকেই পুরাতন নিয়মের বিশুদ্ধ সংস্করণ বলে দাবি করতেন। গ্রীক অনুবাদ থেকে তারা ল্যাটিন অনুবাদ করেন। তারা দাবি করেন যে, গ্রীক অনুবাদের অশুদ্ধতা প্রমাণ করার জন্য ১৩০ খৃষ্টাব্দের দিকে ইহূদীগণ হিব্রু বাইবেলের মধ্যে ইচ্ছাপূর্বক বিকৃতি সাধন করে। প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের খৃষ্টানগণ দাবি করেন যে, মূল হিব্রু বাইবেলই বিশুদ্ধ এবং গ্রীক অনুবাদ অসংখ্য ভুলে ভরা। হিব্রু বাইবেলের পুস্তকের সংখ্যা ৩৯ ঃ মোশির ৫টি পুস্তক ও অন্যান্য ভাববাদিগণের ৩৪টি পুস্তক। গ্রীক বাইবেলের পুস্তকের সংখ্যা ৪৬। উপরে ৩৪টি পুস্তক ছাড়াও এতে অতিরিক্ত ১২টি পুস্তক রয়েছে, যেগুলিকে প্রটেস্ট্যান্টগণ 'সন্দেহজনক' বলে বাদ দিয়েছেন।

পুস্তকগুলির মধ্যে অনেক বাক্য ও অনুচ্ছেদ বেশি রয়েছে যা বর্তমানে প্রচলিত হিব্রু সংস্করণে নেই। কেনিকট (Benjamin Kennicott), হীলস, কিউবিকেন্ট ও আরো অনেক প্রটেস্ট্যান্ট গবেষক হিব্রু সংস্করণের পরিবর্তে এই শমরীয় সংস্করণকেই নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, ইহুদীরা হিব্রু সংস্করণের মধ্যে বিকৃতি সাধন করেছে। এরা ছাড়াও অন্যান্য খৃস্টান গবেষক কোন কোন স্থানে শমরীয় সংস্করণের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হন। এ সকল স্থানে তারা হিব্রু সংস্করণের বিপরীতে শমরীয় সংস্করণকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। পরবর্তী আলোচনা থেকে পাঠক তা জানতে পারবেন ইনশা আল্লাহ।

উপরের বিষয়গুলির আলোকে আমি এখন বাইবেলের মধ্যে শাব্দিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃতি সংঘটিত হওয়ার প্রমাণগুলি পাঠকের সামনে উপস্থিত করছি।

প্রথম প্রমাণ : আদমের সৃষ্টি থেকে নোহ-এর প্লাবন পর্যন্ত সময়কাল বাইবেলের তিন সংস্করণে তিন প্রকার লেখা হয়েছে। হিব্রু সংস্করণে আদম থেকে নোহের প্লাবন পর্যন্ত সময়কাল এক হাজার ছয়শত ছাপান্ন (১৬৫৬) বছর, গ্রীক সংস্করণ অনুসারে এই সময় দুই হাজার দুই শত বাষট্টি (২২৬২) বছর। আর শমরীয় সংস্করণ অনুসারে এই সময় এক হাজার তিনশত সাত (১৩০৭) বছর।

হেনরী ও স্কট (M. Henry and T. Scoot) লিখিত বাইবেলের ব্যাখ্যাগ্রন্থে (A Commentary upon the Holy Bible) একটি তালিকা রয়েছে যাতে নোহ পর্যন্ত সকল ব্যক্তির (প্রথম) সন্তান জন্মগ্রহণ পর্যন্ত বয়স লেখা হয়েছে। আর নোহের বয়স লেখা হয়েছে প্লাবন পর্যন্ত।

তালিকাটি নিম্নরূপ[১] :

নাম	হিব্রু সংস্করণ	গ্রীক সংস্করণ	শমরীয় সংস্করণ
আদম (আ)	১৩০	২৩০	১৩০
শেথ (শীছ)	১০৫	২০৫	১০৫
ইনোশ	৯০	১৯০	৯০
কৈনন	৭০	১৭০	৭০
মহললেল	৬৫	১৬৫	৬৫
যেরদ	১৬২	১৬২	৬২
হনোক (ইদরীস)	৬৫	১৬৫	৬৫
মথূশেলহ	১৮৭	১৮৭	৬৭
লেমক	১৮২	১৮৮	৫৩
নোহ	৬০০	৬০০	৬০০
মোট	১৬৫৬	২২৬২	১৩০৭

১. এ বিষয়ে দেখুন আদিপুস্তক ৫/১-৩২। উল্লেখ্য যে, কিং জেমস ভারসন ও প্রচলিত অনুবাদগুলিতে প্রটেস্ট্যান্ট মতানুসারে হিব্রু সংস্করণের অনুসরণ করা হয়েছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, এই তিনটি সংস্করণের মধ্যে এই সময়ের বিবরণে বিরাট পার্থক্য ও বিশ্রী বৈপরীত্য রয়েছে। এই বৈপরীত্য ও পার্থক্য সমন্বয় করা সম্ভব নয় (নিঃসন্দেহে দুইটি বা সবগুলি সংস্করণে পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে)।

বাইবেলের তিনটি সংস্করণেই বলা হয়েছে যে, প্লাবনের সময় নোহের বয়স ছিল ৬০০ বছর।[১] আর আদম (আ.) ৯৩০ বছর জীবিত ছিলেন।[২] এতে শমরীয় সংস্করণের বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, আদমের মৃত্যুর সময় নোহের বয়স ছিল ২২৩ বছর। ঐতিহাসিকগণ একমত যে, এ কথাটি বাতিল। হিব্রু ও গ্রীক বাইবেল তা মিথ্যা প্রমাণ করে। হিব্রু বাইবেলের তথ্য অনুযায়ী আদমের মৃত্যুর ১২৬ বছর পরে নোহের জন্ম। আর গ্রীক বাইবেলের তথ্য অনুসারে আদমের মৃত্যুর ৭৩২ বছর পরে নোহের জন্ম।

প্রথম খৃস্টীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধতম ইহূদী ঐতিহাসিক জোসেফাস (Flavius Jesephus) খৃস্টানদের নিকটও নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য। এই বিশ্রী বৈপরীত্য ও পার্থক্যের কারণে তিনি 'পুরাতন নিয়মের' এই তিন সংস্করণের কোনটির বিবরণই গ্রহণ করেন নি। তিনি লিখেছেন যে, আদমের সৃষ্টি থেকে নোহের প্লাবন পর্যন্ত সময়কাল ছিল দুইহাজার দুইশত ছাপ্পান্ন (২২৫৬) বছর।

দ্বিতীয় প্রমাণ : নোহের প্লাবন থেকে আবরাহামের (ইবরাহীম আ.) জন্ম পর্যন্ত সময়কাল হিব্রু অনুসারে দুইশত বিরানব্বই (২৯২) বছর, গ্রীক সংস্করণ অনুসারে এক হাজার বাহাত্তর (১০৭২) বছর এবং শমরীয় সংস্করণ অনুসারে নয়শত বিয়াল্লিশ (৯৪২) বছর। হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এখানেও একটি তালিকা দেওয়া আছে। এই তালিকায় শেম ছাড়া বাকি সবার নামের পাশে তার সন্তান জন্মগ্রহণ পর্যন্ত বয়স লেখা হয়েছে, আর শেমের ক্ষেত্রে প্লাবনের কত বছর পরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তা লেখা হয়েছে।

তালিকাটি নিম্নরূপ[৩] :

নাম	হিব্রু সংস্করণ	গ্রীক সংস্করণ	শমরীয় সংস্করণ
শেম	২	২	২
অর্ফকষদ	১৩৫	১৩৫	৩৫
কৈনন	১৩০	**	**
শেলহ	১৩০	১৩০	৩০

১. আদিপুস্তক ৭/৬

২. আদিপুস্তক ৫/৫

৩. আদিপুস্তক ১১/১০-২৬ প্রচলিত বাইবেলে হিব্রু সংস্করণের অনুসরণ করা হয়েছে।

নাম	হিব্রু সংস্করণ	গ্রীক সংস্করণ	শমরীয় সংস্করণ
এবর	১৩৪	১৩৪	৩৪
পেলগ	১৩০	১৩০	৩০
রিয়ু	১৩২	১৩২	৩২
সরূগ	১৩০	১৩০	৩০
নাহোর	৭৯	৭৯	২৯
তেরহ (আযর)	৭০	৭০	৭০
মোট	১০৭২	৯৪২	২৯২

এখানেও তিন সংস্করণের মধ্যে বিশ্রী রকমের, যার মধ্যে সমন্বয় সম্ভব নয় (যা সবগুলি বা দুইটি সংস্করণের পরিবর্তন ও বিকৃতি প্রমাণ করে)। হিব্রু বাইবেল অনুসারে অবরাহামের (আ) জন্ম হয়েছে প্লাবনের দুইশত বিরানব্বই (২৯২) বছর পরে। আর প্লাবনের পরে নোহ তিনশত পঞ্চাশ (৩৫০) বছর জীবিত ছিলেন। আদিপুস্তকের ৯ম অধ্যায়ের ২৮ আয়াতে তা স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, নোহের মৃত্যুর সময় অবরাহামের বয়স ছি ৫৮ বছর। ঐতিহাসিকগণ একমত যে, কথাটি বাতিল। গ্রীক ও শমরীয় সংস্করণও তা মিথ্যে প্রমাণিত করে। গ্রীক সংস্করণের ভাষ্য অনুযায়ী অবরাহামের জন্ম নোহের মৃত্যুর সাতশত বাইশ (৭২২) বছর পরে। আর শমরীয় সংস্করণের ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর জন্ম নোহের মৃত্যুর পাঁচশত বিরানব্বই (৫৯২) বছর পরে।

গ্রীক ও শমরীয় সংস্করণের অর্ফকষদ ও শেলহের মাঝে কৈনন নামে একজনের নাম অতিরিক্ত বলা হয়েছে যার নাম হিব্রু সংস্করণে নেই। লূক তাঁর সুসমাচার লিখতে গ্রীক সংস্করণের উপর নির্ভর করেছেন। এজন্য যীশুর বংশতালিকায় কৈননের নাম বৃদ্ধি করেছেন।[১]

বাইবেলের তিন সংস্করণের মধ্যকার এই বিরাট ও বিশ্রী বৈপরীত্যের কারণে খৃষ্টানগণ নিজেদের মধ্যে মতভেদ করেছেন। ঐতিহাসিকগণ এই তিন বিবরণই বাতিল করে দিয়ে বলেছেন যে, নোহ থেকে আবরাহামের জন্ম পর্যন্ত সময় হলো তিনশত বাহান্ন (৩৫২) বছর।

১ম খৃষ্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ ইহূদী ঐতিহাসিক জোসেফাস (Flavius Josephus) এ সকল বিবরণের কোনটিই গ্রহণ করেন নি, বরং তিনি বলেছেন; এই সময়কাল ছিল নয়শত তিরানব্বই (৯৯৩) বছর। হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে জোসেফাসের মতটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

১. প্রচলিত বাইবেলে হিব্রু সংস্করণ অনুসারে শেলহকে অর্ফকষদের পুত্র বলা হয়েছে। অর্ফকষদ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে শেলহের জন্ম দিলেন। আদিপুস্তক ১১/১২। অথচ লূকের বর্ণনায় : শেলহ পুত্র এবং কৈনন অর্ফকষদের পুত্র : লূক ৩/৩৬

চতুর্থ শতকের শ্রেষ্ঠ খৃস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরু (যাজক) সেন্ট অগাস্টিন (St. Augustine, Bishop of Hippo : 354 430) এবং অন্যান্য প্রাচীন খৃস্টান ধর্মজ্ঞ পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন যে, গ্রীক সংস্করণই সঠিক ও বিশুদ্ধ। আদিপুস্তকের ১১ অধ্যায়ের ১১ আয়াতের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকার হার্সলীও এই মত গ্রহণ করেছেন। আর হেলস মতপ্রকাশ করেছেন যে, শমরীয় সংস্করণই বিশুদ্ধ। প্রসিদ্ধ খৃস্টান গবেষক হর্নও এই মতটিই পছন্দ করতেন বলে বুঝা যায়।

হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে : "অগাস্টিন বলতেন; জলপ্লাবনের আগের যুগের মানুষদের বর্ণনায় এবং প্লাবনের পরে মোশির যুগ পর্যন্ত মানুষদের বর্ণনার ক্ষেত্রে ইহূদীরা হিব্রু সংস্করণ বিকৃত করেছে। গ্রীক সংস্করণ যাতে অনির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয় সেজন্য এবং খৃস্টধর্মের বিরোধিতার জন্য তারা এই বিকৃতি করেছে। জানা যায় যে, প্রাচীন খৃস্টানগণ অগাস্টিনের মত একই মত পোষণ করতেন। তাঁরা বলতেন যে, ১৩০ খৃস্টাব্দে ইহূদীরা এই বিকৃতি সাধন করে।"

হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলেছেন : "গবেষক হেলস শক্তিশালী প্রমাণাদির দ্বারা শমরীয় সংস্করণের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন। তাঁর দলিল-প্রমাণাদির সার-সংক্ষেপ এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না। আগ্রহী পাঠক তাঁর পুস্তকের ৮০ পৃষ্ঠা থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখতে পারেন। এছাড়া কেনিকট বলেছেন, আমরা যদি তোরাহ-এর বিষয়ে শমরীয়দের ভক্তি ও আদবের দিকে লক্ষ্য করি, তাদের রীতিনীতির দিকে লক্ষ্য করি, যীশুখৃস্টের সাথে শমরীয় নারীর প্রসিদ্ধ কথোপকথনের সময় যীশুর নীরবতার দিকে লক্ষ্য করি এবং অন্যান্য আরো কিছু বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করি তবে এ সকল বিষয় সবই প্রমাণ করবে যে, ইহূদীগণই ইচ্ছাকৃতভাবে তোরাহকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করেছিল। পুরাতন ও নতুন নিয়মের ভাষ্যকারগণ অভিযোগ করে থাকেন যে, শমরীয়গণ ইচ্ছাকৃতভাবে তোরাহকে বিকৃত করেছে। উপরের বিষয়গুলি প্রমাণ করে যে, তাদের এই অভিযোগ ভিত্তিহীন।"

শমরীয় নারীর সাথে যীশুর কথোপকথন যোহনলিখিত সুসমাচারের ৪র্থ অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত। কথোপকথনের ঘটনাটি নিম্নরূপ : "১৯ স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে বলিল, মহাশয়, আমি দেখিতেছি যে, আপনি ভাববাদী। ২০ আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই পর্বতে (অর্থাৎ গরিযীমে) ভজনা করিতেন, আর আপনারা (অর্থাৎ ইহূদীগণ) বলিয়া থাকেন, যে স্থানে ভজনা করা উচিত সে স্থানটি যিরূশালেমেই আছে।"

শমরীয় নারী যখন যীশুকে ভাববাদী বলে জানতে পারলেন তখন তিনি তাঁকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন। ইহূদী ও শমরীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিতর্কিত বিষয় ছিল এইটি। প্রত্যেক সম্প্রদায় দাবি করত যে, অন্য সম্প্রদায় এ বিষয়ে বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে। শমরীয় নারী যীশুকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন যেন বিষয়টি তার কাছে স্পষ্ট

হয়। যদি সত্যই শমরীয়গণ তোরাহ বিকৃত করে থাকতেন তবে এ সময়ে যীশুর দায়িত্ব ছিল প্রশ্নের উত্তরে বিষয়টি তাকে বলে দেওয়া। কিন্তু তিনি তা না বলে এ বিষয়ে নীরবতা পালন করেন। তাঁর নীরবতা প্রমাণ করে যে, শমরীয়দের মতই সঠিক।"

হর্নের উদ্ধৃতি এখানেই শেষ হলো। বিবেকবান পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন যে, এ সকল খৃস্টান গবেষক কিভাবে বিকৃতির কথা স্বীকার করছেন। কারণ স্বীকার না করে তাঁদের কোন উপায় নেই।

তৃতীয় প্রমাণ : দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ২৭ অধ্যায়ের ৪র্থ আয়াতটি নিম্নরূপ : "আর আমি অদ্য যে প্রস্তরগুলির বিষয়ে তোমাদিগকে আদেশ করিলাম, তোমরা যর্দন পার হইলে পর এবল পর্বতে সেই সকল প্রস্তর স্থাপন করিবে ও তাহা চুন দিয়া লেপন করিবে।"

এই আয়াতটি শমরীয় সংস্করণে নিম্নরূপ : "আর আমি অদ্য যে প্রস্তরগুলির বিষয়ে তোমাদিগকে আদেশ করিলাম....গরিযীম পর্বতে সেই সকল প্রস্তর স্থাপন করিবে, ও তাহা চুন দিয়া লেপন করিবে।"

এই অধ্যায়ের ১২ ও ১৩ আয়াত থেকে এবং দুই পুস্তকের ১১ অধ্যায়ের ২৯ আয়াত থেকে জানা যায় যে, এবল ও গরিযীম[১] দুটি পাশপাশি পাহাড়। হিব্রু সংস্করণ থেকে জানা যায় যে, মোশি এবল পাহাড়ে ধর্মধাম বা মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। আর শমরীয় সংস্করণ থেকে জানা যায় যে, মোশি গরিযীম পাহাড়ে ধর্মধাম নির্মাণের নির্দেশ দেন। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ইহূদী ও শমরীয়দের মধ্যে এই বিষয়ে বিতর্ক খুবই প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক সম্প্রদায় দাবি করেন যে, অন্য সম্প্রদায় এই স্থলে তোরাহের বক্তব্য বিকৃত করেছে।

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের মধ্যেও এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৮১৭ পৃষ্ঠায় বলেন : "গবেষক কেনিকট শমরীয় সংস্করণকে বিশুদ্ধ বলে দাবি করেছেন। অপরপক্ষে গবেষক পারী ও ভ্রেসিয়র হিব্রু সংস্করণের বিশুদ্ধতার দাবি করেছেন। কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে, কেনিকটের দলিল-প্রমাণের কোন জবাব নেই। তারা নিশ্চিত যে, শমরীয়দের সাথে শত্রুতার কারণে ইহূদীরা এখানে তোরাহ এর বক্তব্য বিকৃত করেছে। আর একথা তো

১. এবল ও গরিযীম (Mount Ebal & Mount Ger'izim) নাবলুস শহরের দক্ষিণ প্রান্তে দুইটি পাহাড়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০০০ ফুট উঁচু। বর্তমানে প্রথমটি সালামিয়া পাহাড় ও দ্বিতীয়টি তূর পাহাড় নামে পরিচিত। শমরীয় ইহূদীগণ গরিযীম পাহাড়কে পবিত্রস্থান হিসেবে ভক্তি করে। ব্যাবিলনের নির্বাসন থেকে ফেরার পরে খৃস্টপূর্ব ৪৩২ অব্দের দিকে শমরীয়গণ এই পাহাড়ের উপরে তাদের ধর্মধাম বা মন্দির নির্মাণ করে। খৃস্টপূর্ব ১২৮ সালে তা শত্রুদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। এরপরও শমরীয়গণ গরিযীম পাহাড়েই তাদের পূজা উপাসনার কাজ করত। পক্ষান্তরে যিহূদীয় ইহূদীগণ যিরুশালেমের ধর্মধামে পূজা উপাসনার কাজ করত।

সকলেই জানেন যে, গরিযীম পাহাড়টি অনেক ঝর্ণা, বাগিচা ও বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে এবল একটি শুষ্ক পাহাড়। তাতে এসব কিছুই নেই। এমতাবস্থায় স্বভাবতই প্রথম পাহাড়টি দোয়া ও বরকতের জন্য এবং দ্বিতীয় পাহাড়টি অভিশাপ প্রদানের জন্য শোভনীয়।"

আদম ক্লার্কের বক্তব্য শেষ। তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কেনিকট ও অন্য অনেক মানুষই মনে করেন যে, হিব্রু তোরাহ-এ এই বিকৃতি ঘটেছে। আরো জানা যায় যে, হিব্রু তোরাহ-এ বিকৃতি প্রমাণ করার পক্ষে কেনিকটের দলিল-প্রমাণাদি খুবই শক্তিশালী।

চতুর্থ প্রমাণ : আদিপুস্তকের ২৯ অধ্যায়ে রয়েছে :"২ (যাকোব) তথায় দেখিলেন, মাঠের মধ্যে এক কূপ আছে, আর দেখ, তাহার নিকট মেষের তিনটি পাল শয়ন করিয়া রহিয়াছে; কারণ লোকে মেষপাল সকলকে সেই কূপের জল পান করাইত; আর সেই কূপের মুখে এক বৃহৎ প্রস্তর ছিল। ৩ সেই স্থানে পাল সকল একত্র করা হইলে...৮. তাহারা কহিল, যতক্ষণ পাল সকল একত্র না হয় ততক্ষণ আমরা তাহা করিতে পারি না...।"

এখানে ২য় আয়াতে ও ৮ম আয়াতে 'তিনটি পাল' ও 'পাল সকল' শব্দ দুইটি রয়েছে। এই শব্দ দুইটি পরিবর্তিত ও বিকৃত। এখানে মূলত 'রাখালগণ' শব্দটি ছিল। শমরীয় সংস্করণে, গ্রীক সংস্করণে ও ওয়ালটন প্রকাশিত আরবী অনুবাদে এইরূপই আছে।[১]

ব্যাখ্যাকার হার্সলী তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৭৪ পৃষ্ঠায় উপরের ২য় আয়াতের টীকায় বলেন : "সম্ভবত এখানে 'তিনজন রাখাল' ছিল। কেনিকট দেখুন।"

এরপর তিনি ৮ম আয়াতের টীকায় বলেন : "এখানে যদি 'যতক্ষণ রাখালগণ একত্র না হয়' বলা হতো তাহলে তা সুন্দর হতো। শমরীয় সংস্করণ, গ্রীক সংস্করণ, কেনিকট এবং হিউবি কেন্ট-এর আরবী অনুবাদ দেখুন।"

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলেন :""হিউবি কেন্ট অত্যন্ত দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার সাথে দাবি করেছেন যে, এখানে শমরীয় সংস্করণই বিশুদ্ধ।"

---

১. (2...there were three flocks of sheep lying by it...4. And Jacob said unto them...8. And they said, We connot, until All the foocks be gathered together, and till they fall the stone from the well' mouth...) সেখানে মেষের তিনটি পাল শয়ন করিয়া রহিয়াছে...৪. যাকোব তাহাদিগকে বলিলেন : ৮. তাহারা কহিল, আমরা তাহা করিতে পারি না, যতক্ষণ না পাল সকল একত্র হয় এবং তাহারা কূপের মুখ হইতে প্রস্তরখানা সরায়....। স্বভাবতই মেষের পালের সাথে কথা বলা যায় না এবং মেষ পালেরা একত্রিত হয়ে পাথর সরায় না। এ জন্য পাঠকের কাছে সহজেই বিকৃতি ধরা পড়ে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই বিকৃতি চাপা দেওয়ার জন্য বাংলা বাইবেলে ৮ম আয়াতের অনুবাদে চতুরতা ও বিকৃতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

হর্ন তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কেনিকট ও হিউবি কেন্ট-এর সাথে সুর মিলিয়ে বলেন : "এখানে লিপিকারের ভুলে 'রাখাল'-এর পরিবর্তে 'মেষপাল' শব্দটি লেখা হয়েছে।"[১]

পঞ্চম প্রমাণ : ২ শমূয়েলের ২৪ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতে 'সাত বৎসর' কথাটি এসেছে[২]। পক্ষান্তরে একই বিষয়ে ১ বংশাবলির ২১ অধ্যায়ের ১২ আয়াতে 'তিন বৎসর' কথাটি এসেছে।[৩] উভয় তথ্যের একটি নিঃসন্দেহে ভুল ও বিকৃত।

আদম ক্লার্ক শমূয়েলের বাক্যের টীকায় লিখেছেন : "বংশাবলিতে 'তিন বৎসর' বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে গ্রীক সংস্করণে এই স্থলেও বংশাবলির ন্যায় 'তিন বৎসর' বলা হয়েছে। নিঃসন্দেহে 'তিন বৎসর' কথাটিই সঠিক।"

ষষ্ঠ প্রমাণ : ১ বংশাবলির ৯ম অধ্যায়ের ৩৪ আয়াতে হিব্রু সংস্করণে বলা হয়েছে : "তাহার ভগ্নির নাম রাখা।" 'ভগ্নি' কথাটি বিকৃত। সঠিক কথা হলো, এখানে 'ভগ্নি'-র পরিবর্তে 'স্ত্রী' হবে। আদম ক্লার্ক বলেন : "এখানে হিব্রু সংস্করণে 'ভগ্নি' লেখা হয়েছে। গ্রীক, ল্যাটিন ও সিরীয় অনুবাদে 'স্ত্রী' লেখা হয়েছে। অনুবাদকগণ এ সকল অনুবাদের অনুসরণ করেছেন।"

---

১. খৃস্টান গবেষকগণ সাধ্যমত চেষ্টা করেন সকল বিকৃতিকে অস্বীকার করার। কোন বিকৃতি অস্বীকার করতে না পারলে, যদি বিকৃতিটির কোন ভাল ব্যাখ্যা থাকে তবে তা কোন একজন ভাববাদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। আর তা না হলে তা 'লিপিকার-এর ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। এখানে প্রশ্ন হলো, এ সকল পবিত্র গ্রন্থ তো আর সাধারণ মানুষেরা লিখত না, বড় বড় ধর্মগুরুগণই লিখতেন। তাঁরা কি তাহলে নিজেদের মর্জি মাফিক লিখতেন? নবীগণের মুখ থেকে বা পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের মুখ থেকে পুরোপুরি শুনে বুঝে পড়ে তারপর লিখেন নি? লিপিকারগণ কি না বুঝেই লিখতেন? স্ত্রীর স্থলে বোন লিখবেন? চার বছর বয়সের স্থলে চল্লিশ বছর লিখবেন? একজন লিপিকার না হয় ভুল করলেন, কিন্তু সকল লিপিকারই কি ভুল করবেন? তাঁরা তো দাবি করেন যে, তোরাহ বা বাইবেলের অগণিত কপি ইহূদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাহলে একজন লিপিকার বা অনুলিপিকার ভুল করলে অন্য সকলে কেন প্রতিবাদ করল না বা ধরিয়ে দিল না? লিপিকার ভুল করলে তাদের আলেম, পণ্ডিত ও ধার্মিক মানুষেরা তা ধরতে পারলেন না কেন? একটি পাণ্ডুলিপিতে না হয় ভুল থাকল, কিন্তু সকল পাণ্ডুলিপিতে ভুল থাকবে কেন?

২. "সদাপ্রভু-র এই বাক্য উপস্থিত হইল...আমি তোমার সম্মুখে তিনটি দণ্ড রাখি, তাহার মধ্য হইতে তুমি একটি মনোনীত কর...গাদ দায়ূদের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন, কহিলেন, আপনার দেশে সাত বৎসর ব্যাপিয়া কি দুর্ভিক্ষ হইবে? না আপনার বিপক্ষগণ যাবৎ আপনার পশ্চাতে তাড়া করে তাবৎ আপনি তিন মাস পর্যন্ত তাহাদের অগ্রে অগ্রে পলায়ন করিবেন? না তিন দিবস পর্যন্ত আপনার দেশে মহামারী হইবে,..."২ শমূয়েল ২৪/১২-১৩।

৩. "সদাপ্রভু-র এই বাক্য উপস্থিত হইল...আমি তোমার সম্মুখে তিনটি দণ্ড রাখিলাম, তাহার মধ্য হইতে তুমি একটি মনোনীত কর....গাদ দায়ূদের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন...হয় তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ, নয় তিন মাস পর্যন্ত শত্রুদের খড়্গ...।"১ বংশাবলি ২১/১০-১২।

অধিকাংশ প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত এই স্থলে হিব্রু বাইবেল পরিত্যাগ করে উল্লিখিত অনুবাদগুলির অনুসরণ করেছেন। এ থেকে জানা যায় যে, তারা সকলেই বিশ্বাস করেন যে, এই স্থলে হিব্রু বাইবেলের বিকৃতিটি নিশ্চিত।

৭ম প্রমাণ : হিব্রু বাইবেলে ২ বংশাবলির ২২ অধ্যায়ের ২ আয়াতে বলা হয়েছে : "অহসিয় বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন..."। সন্দেহাতীতভাবে সুনিশ্চিত যে, এই কথাটি ভুল ও বিকৃত। কারণ অহসিয়ের পিতা যিহোরামে ৪০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। যিহোরামের মৃত্যুর পরপরই পুত্র অহসিয় রাজত্ব লাভ করেন। কাজেই রাজত্ব লাভের সময় তার বয়স বেয়াল্লিশ হওয়ার কথা সঠিক হলে বুঝতে হবে যে, তিনি তার পিতার চেয়ে দুই বৎসরের বড় ছিলেন!

২ রাজাবলির ৮ম অধ্যায়ের ২৬ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'অহসিয় ২২ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন'।

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২য় খণ্ডে বংশাবলির বক্তব্যের টীকায় লিখেছেন : "আরবী ও সিরীয় অনুবাদে '২২' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন গ্রীক পাণ্ডুলিপিতে '২০' লেখা রয়েছে। সম্ভবত হিব্রু সংস্করণেও এইরূপই ছিল। কিন্তু তাঁরা সংখ্যাগুলি কথায় লিখতেন। এজন্য লিপিকারের ভুলে কাফ বদলে মীম হয়ে গিয়েছে (ফলে 'বাইশ' উল্টে 'বেয়াল্লিশ' হয়ে গিয়েছে।)

অতঃপর তিনি বলেন : "২ রাজাবলির কথাই সঠিক। দুইটি বক্তব্য মিলে না। যে বক্তব্য থেকে পিতার চেয়ে পুত্রকে দুই বছরের বড় বলে বুঝা যায় সে বক্তব্য কিভাবে সঠিক বলে গণ্য করা যায়?"

হর্নের ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এবং হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে স্বীকার করা হয়েছে যে, 'লিপিকারের ভুলে এখানে বিকৃতি ঘটেছে।'

অষ্টম প্রমাণ : হিব্রু বাইবেলে ২ বংশাবলির ২৮ অধ্যায়ের ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে : "কেননা ইস্রায়েল রাজ আহসের জন্য সদাপ্রভু যিহূদাকে নত করিলেন...।"

এখানে 'ইস্রায়েল' কথাটি নিশ্চিতরূপে বিকৃত ও ভুল; কারণ আহস কখনোই 'ইস্রায়েল' রাজ্যের রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন 'যিহূদা' রাজ্যের রাজা। গ্রীক ও ল্যাটিন অনুবাদে 'যিহূদা' শব্দ রয়েছে। কাজেই বিকৃতিটি ঘটেছে হিব্রু সংস্করণের মধ্যে।

নবম প্রমাণ : গীতসংহিতার ৪০ নং গীতের ৬ আয়াতে বলা হয়েছে : "তুমি আমার কর্ণযুগল ছিদ্রিত করিয়াছ...।" ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ১০ অধ্যায়ের ৫ম আয়াতে পৌল এই বাক্যটির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন:"কিন্তু আমার জন্য দেহ রচনা করিয়াছ...।"

নিঃসন্দেহে উভয় বাক্যের একটি নিশ্চিতরূপে বিকৃত ও পরিবর্তিত। খৃস্টান পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেছেন। হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ বলেন : "লিপিকারের ভুলে এই বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে। উভয় বাক্যের যে কোন একটি শুদ্ধ।"

এখানে সংকলকগণ বিকৃতির কথা স্বীকার করলেন। তবে তাঁরা উভয় বাক্যের মধ্যে কোনটি বিকৃত তা স্পষ্ট করে বললেন না।

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৩য় খণ্ডে গীতসংহিতার বাক্যের টীকায় লিখেছেন : "প্রচলিত হিব্রু পাঠটি (text) বিকৃত।" এভাবে তিনি গীতসংহিতার বাক্যটি বিকৃত বলে উল্লেখ করলেন।

ডাওয়ালি ও রজার্ডমেন্ট-এর ভাষ্যগ্রন্থে বলা হয়েছে : "আশ্চর্যের বিষয় হলো, গ্রীক অনুবাদে এবং ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ১০ অধ্যায়ের ৫ম আয়াতে এই বাক্যটির পরিবর্তে লেখা হয়েছে : "কিন্তু আমার জন্য দেহ রচনা করিয়াছ...।'

এখানে আমরা দেখছি যে, এই দুই ভাষ্যকার গীতসংহিতার বক্তব্যকেই সঠিক বলে গ্রহণ করলেন এবং নতুন নিয়মের বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

১০ম প্রমাণ : গীত সংহিতার ১০৫ নং গীতের ২৮ আয়াতে হিব্রু সংস্করণে বলা হয়েছে : "তাঁহারা তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না।" এখানে গ্রীক সংস্করণে বলা হয়েছে : "তাঁহারা তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন।" হিব্রু বাইবেলে বাক্যটি না-বাচক, কিন্তু গ্রীক বাইবেলে বাক্যটি হাঁ-বাচক। দুইটি বাক্যের একটি নিঃসন্দেহে বিকৃত ও ভুল।

এখানেও খৃস্টান পণ্ডিতগণ দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছেন। হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে : "এই দুই সংস্করণের মধ্যে বিরাজমান এই পার্থক্যের কারণে অনেক দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। বাহ্যত কোন একটি সংস্করণে 'না' কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে, অথবা বাড়ানো হয়েছে।" এভাবে এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ এখানে বিকৃতির কথা স্বীকার করলেন, কিন্তু তাঁরা কোন সংস্করণে বিকৃতিটি ঘটেছে তা নির্ধারণ করতে পারলেন না।

১১শ প্রমাণ : (দায়ূদের লোকগণনার ফলাফল সম্পর্কে) ২ শমূয়েল-এর ২৪ অধ্যায়ের ৯ম আয়াতে রয়েছে : "ইস্রায়েলে খড়্গধারী আট লক্ষ বলবান লোক ছিল : আর যিহূদার পাঁচ লক্ষ লোক ছিল।' একই বিষয়ে ১ বংশাবলি[১] ২১ অধ্যায়ের ৫ম আয়াতে বলা হয়েছে : "সমস্ত ইস্রায়েলের এগার লক্ষ খড়্গধারী লোক ও যিহূদার চারি লক্ষ সত্তর সহস্র খড়্গধারী লোক ছিল।"

নিঃসন্দেহে উভয় তথ্যের একটি বিকৃত ও পরিবর্তিত।

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে শমূয়েলের বক্তব্যের টীকায় লিখেছেন : "দুইটি বক্তব্য কোনক্রমেই সঠিক হতে পারে না। এই দুইটির মধ্যে কোনটি যে সঠিক তা নির্ধারণ করাও কঠিন। তবে সম্ভবত প্রথম বক্তব্যটিই সঠিক। পুরাতন নিয়মের

১. মূল আরবীতে রয়েছে '১ রাজাবলি' উদ্ধৃত আয়াতটি ১ বংশাবলিতে রয়েছে, ১ রাজাবলিতে নেই। মূল আরবীতে সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে।

ঐতিহাসিক পুস্তকগুলিতে অন্যান্য অনেক স্থানে অনেক বিকৃতি ঘটেছে। এ সকল বিকৃতির ক্ষেত্রে সমন্বয়ের চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। যে কথা অস্বীকার করে পার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই সেকথা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া উত্তম। পুরাতন নিয়মের লেখকগণ যদিও অনুপ্রেরণা-প্রাপ্ত ছিলেন, কিন্তু প্রচারক বা অনুলিপিকারগণ অনুরূপ ছিলেন না।"

এভাবে এই ভাষ্যকার বিকৃতির কথা স্বীকার করলেন; তবে তিনি কোন বাক্যটি বিকৃত তা নির্ধারণ করতে পারলেন না। অনুরূপভাবে তিনি স্বীকার করলেন যে, পুরাতন নিয়মের ঐতিহাসিক পুস্তকগুলিতে অনেক বিকৃতি ঘটেছে। তিনি ন্যায়পরায়ণতার সাথে স্বীকার করলেন যে, এ সকল বিকৃতির কথা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া উত্তম।

১২শ প্রমাণ : বিচারকর্তৃগণের বিবরণের ১২শ অধ্যায়ের ৪র্থ আয়াত সম্পর্কে ব্যাখ্যাকার হার্সলি তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৯১ পৃষ্ঠায় বলেছেন : "কোন সন্দেহ নেই যে, এই আয়াতটি বিকৃত।"

১৩শ প্রমাণ : ২ শমূয়েলের ১৫ অধ্যায়ের ৮ম আয়াতে 'অরাম' শব্দটি রয়েছে। নিঃসন্দেহে শব্দটি বিকৃত ও ভুল। এখানে 'আডোম' শব্দ বসালে বাক্যটি শুদ্ধ হবে। আদম ক্লার্ক প্রথমে বলেছেন যে, এই শব্দটি নিশ্চিতভাবেই ভুল। এরপর তিনি বলেন যে, সম্ভবত তা লিপিকারের ভুলের কারণে হয়েছে।[১]

১৪শ প্রমাণ : এই অধ্যায়েরই ৭ম আয়াতে বলা হয়েছে : "পরে চল্লিশ[২] বৎসর অতীত হইলে (and it came to pass after forty years)...অবশালোম রাজাকে কহিল।"

নিঃসন্দেহে ও নিশ্চিতরূপে এখানে 'চল্লিশ' কথাটি বিকৃত ও ভুল। সঠিক শব্দ হলো 'চার'। আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলেন : "নিঃসন্দেহে এই বক্তব্যটি বিকৃত।" অতঃপর তিনি বলেন : "অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে, লিপিকারের ভুলে 'চারের' স্থলে 'চল্লিশ' লেখা হয়ে গিয়েছে।"

১৫শ প্রমাণ : আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২য় খণ্ডে ২ শমূয়েলের ২৩ অধ্যায়ের ৮ম আয়াতের টীকায় লিখেছেন : "কেনিকট বলেছেন, এই আয়াতে হিব্রু সংস্করণে তিনটি মারাত্মক বিকৃতি ঘটেছে।" এখানে তিনি তিনটি মারাত্মক বিকৃতির কথা স্বীকার করলেন।

১৬শ প্রমাণ : ১ বংশাবলির ৭ অধ্যায়ের ৬ আয়াতে রয়েছে, "বিন্যামীনের সন্তান-বেলা, বেখর ও যিদীয়েল, তিন জন।" এই পুস্তকেরই ৮ অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

---

১. 'অরাম' বলতে সিরিয়া ও আরব উপদ্বীপ বুঝানো হয়। আর 'আডোম' হলো জর্ডানের দক্ষিণে আকাবা প্রণালীর পার্শ্ববর্তী এলাকা। এই বাক্যে অবশালোম দায়ূদকে বলেন যে, তিনি 'অরাম' এলাকায় বসবাস করতেন। আসলে তিনি কখনোই অরামে বসবাস করেন নি বরং তিনি আডোমে বসবাস করেছেন। এজন্য এখানে 'অরাম' শব্দটি ভুল।

২. বাংলা বাইবেলে এখানে চল্লিশকে চার করা হয়েছে, যদিও ইংরেজিতে চল্লিশই রয়েছে।

"১ বিন্যামীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বেলা, দ্বিতীয় পুত্র অসবেল, ও তৃতীয় অহর্হ, চতুর্থ নোহা ও পঞ্চম রাফা।" আদিপুস্তকের ৪৬ অধ্যায়ের ২১ আয়াতে বলা হয়েছে : "বিন্যামীনের পুত্র বেলা, বেখর, অসবেল, গেরা, নামন, এহী, রোশ, মুপ্পীম, হুপ্পীম ও অর্দ।"

এভাবে এই তিনটি বক্তব্যের মধ্যে দুই প্রকারের বৈপরীত্য রয়েছে : প্রথমত নামের মধ্যে[১], দ্বিতীয়ত সংখ্যার মধ্যে। প্রথম বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, বিন্যামীনের সন্তান তিন জন। দ্বিতীয় বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, তাঁদের সংখ্যা পাঁচ জন। আর তৃতীয় বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, তাঁদের সংখ্যা দশ জন।

প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তব্য একই পুস্তকের। এতে প্রমাণিত হলো যে, এই 'বংশাবলি' পুস্তকের লেখক, ইহূদী-খৃস্টানগণের মতে ইয্রা ভাববাদী, দুই স্থানে দুই প্রকার পরস্পরবিরোধী তথ্য প্রদান করেছেন। নিঃসন্দেহে উপরের তিনটি বক্তব্যের মধ্যে একটি বক্তব্য সঠিক হবে এবং বাকি দুইটি বক্তব্য নিশ্চিতরূপে মিথ্যা ও বিকৃত। ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন এবং বাধ্য হয়ে তাঁরা ইয্রা ভাববাদীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছেন।

প্রথম বক্তব্যের টীকায় আদম ক্লার্ক বলেন : "এখানে এভাবে লেখা হয়েছে তার কারণ, লেখক পুত্র ও পৌত্রের মধ্যে পার্থক্য জানতেন না। কে পুত্র ও কে পৌত্র তা তিনি বুঝতে পারেন নি। এ সকল বৈপরীত্যের সমন্বয়ের চেষ্টা অর্থহীন। ইহূদী পণ্ডিতগণ বলেন : ইয্রা, যিনি এই পুস্তকটি রচনা করেন, তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না যে, এদের কেউ কেউ পুত্র, না পৌত্র। ইহূদী পণ্ডিতগণ আরো বলেন যে, বংশ বিষয়ক যে সকল কাগজ-পত্র থেকে ইয্রা তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলির অধিকাংশই ছিল অসম্পূর্ণ। আমাদের জন্য জরুরী হলো এই জাতীয় বিষয়গুলি পরিত্যাগ করা।"

বিজ্ঞ পাঠক! লক্ষ্য করুন, কিভাবে ইহূদী ও খৃস্টান সকলেই এখানে বিকৃতির কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। ইয্রা ভুল লিখেছেন, একথা স্বীকার করা ছাড়া তাঁদের কোন উপায় নেই। তাঁরা স্বীকার করছেন যে, কে পুত্র এবং কে পৌত্র তাও তিনি বুঝতে পারেন নি। এজন্য তিনি এ সকল কথা লিখেছেন। ভাষ্যকার আদম ক্লার্ক বৈপরীত্যের সমন্বয়ের বিষয়ে নিরাশ হয়ে বললেন : "এ সকল বৈপরীত্যের সমন্বয়ের চেষ্টা অর্থহীন"। এরপর আবার বললেন : "আমাদের জন্য জরুরী হলো এই জাতীয় বিষয়গুলি পরিত্যাগ করা।"

পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলি ও ইয্রার ভূমিকা

সম্মানিত পাঠক! এখানে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাকে সচেতন করা প্রয়োজন। ইহূদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই বলেন যে, বংশাবলি প্রথম ও

১. প্রথম স্থানে তিনজনের মধ্যে যিদীয়েলের নাম রয়েছে; কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ৫ ও ১০ জনের মধ্যে তার নাম নেই। দ্বিতীয় স্থানে অহর্হ, নোহা ও রাফার নাম রয়েছে। কিন্তু তৃতীয় স্থানে দশ জনের মধ্যে এদের নাম নেই।

দ্বিতীয় খণ্ড রচনা করেছেন ইয্রা ভাববাদী। তিনি হেগয় ভাববাদী ও ইদ্দোর পুত্র সখরিয় ভাববাদী, এই দুইজন ভাববাদীর (নবীর) সহায়তায় এই পুস্তক দুইটি রচনা করেন। ইহূদী-খৃস্টানগণের এই মতানুসারে এই পুস্তকটি মূলত এই তিন ভাববাদীর যৌথ ও সমন্বিত প্রচেষ্টায় লেখা।

ইতিহাসের গ্রন্থাবলি এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, (খৃস্টপূর্ব ৫৮৮ বা ৫৮৬ সালে) নেবুকাদনেযার (Nebuchadnezzar বা বুখ্‌ত নসর) কর্তৃক যিরূশালেম নগরী বিনাশের পূর্বে পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলির নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। প্রায় এক শতাব্দী পরে ইয্রা পুনরায় পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলি নিজের পক্ষ থেকে রচনা করেন। ইয্রা যদি পুস্তকগুলি আবার না লিখতেন তাহলে তাঁর যুগেও তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলির কোন অস্তিত্ব থাকত না, তার পরের যুগে তো দূরের কথা। এই বিষয়টি ইহূদী-খৃস্টান সম্প্রদায়ের নিকটেও স্বীকৃত সত্য।

ইয্রার নামে একটি পুস্তক প্রচারিত হয়েছে। প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় পুস্তকটিকে ঐশ্বরিক বা আসমানী পুস্তক বলে স্বীকার করেন না। কিন্তু তাদের মতেও পস্তকটি খৃস্টান ঐতিহাসিকগণের লেখা ইতিহাসগ্রন্থগুলির চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন নয়। এই পুস্তকে লেখা হয়েছে : "তোরাহ পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। কেউ তোরাহ চিনত না। কথিত আছে যে, পবিত্র আত্মার সহায়তায় ইয্রা তা পুনরায় সংকলিত করেন।"

আলেকজান্দ্রীয় ক্লিমেন্ট বলেন : "আসমানী গ্রন্থাবলি হারিয়ে গিয়েছিল। তখন পুনরায় তা লেখার জন্য ইয্রাকে অনুপ্রেরণা প্রদান করা হয়।"

টর্টলীন বলেছেন : "প্রসিদ্ধি আছে যে, যিরূশালেমের উপর ব্যবিলনীয়দের আক্রমণের পরে ইয্রা পুস্তকগুলি সব লিখেন।"

থিয়ফ্লিক্ট বলেন : "পবিত্র গ্রন্থাবলি সবই একেবারে হারিয়ে যায়। তখন ইয্রা ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণার মাধ্যমে পুনরায় সেগুলিকে অস্তিত্ব প্রদান করেন।"

১৮৪৩ খৃস্টাব্দে ডারবিতে মুদ্রিত পুস্তকের ১১৫ পৃষ্ঠায় ক্যাথলিক জন মিলার বলেন : "পণ্ডিতগণ একমত যে, তোরাহ-এর মূল কপি এবং পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকাবলির কপিগুলি নেবুকাদনেযারের সেনাবাহিনীর হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপর ইয্রার মাধ্যমে এ সকল পুস্তকের বিশুদ্ধ উদ্ধৃতি প্রকাশ পায়। এন্টিয়ক (Antiochus Epiphanes)-এর ঘটনায় (খৃস্টপূর্ব ১৬৮ অব্দের দিকে) সেগুলিও আবার নিশ্চিহ্ন ও বিলুপ্ত হয়ে যায়।"

এ সকল বক্তব্য অনুধাবন করার পরে আমরা আবার বাইবেল ব্যাখ্যাকার আদম ক্লার্কের কথার দিকে ফিরে যাচ্ছি। আমি মনে করি, জ্ঞানী পাঠকের কাছে এখানে নিম্নের ৭টি বিষয় প্রকাশিত ও স্পষ্ট হচ্ছে :

প্রথম বিষয় : বর্তমানে তোরাহ নামে পরিচিত ও প্রচলিত এই পুস্তকগুলি, যেগুলি বাইবেলের প্রথমেই সংকলিত রয়েছে, এগুলি কখনোই মোশির তোরাহ বা ইয্রার

পুনর্লিখিত তোরাহ নয়। মোশি ঐশ্বরিক প্রেরণা বা ইলহামের মাধ্যমে যে তোরাহ লাভ করেছিলেন এবং তা বিলুপ্ত হওয়ার পরে ইয্রা ঐশ্বরিক প্রেরণার মাধ্যমে পুনরায় যে তোরাহ লিখেছিলেন এই প্রচলিত তোরাহ যদি সেই তোরাহ-ই হতো তবে নিশ্চয় ইয্রা তার উপর নির্ভর করেই লিখতেন এবং ইয্রার বক্তব্য তোরাহ-এর বক্তব্যের বিরোধী হতো না। যদি এই তোরাহ মোশি বা ইয্রা লিখিত তোরাহই হতো তবে ইয্রা বংশাবলিও সেই তোরাহ-এর ভিত্তিতেই রচনা করতেন এবং তাঁকে অসম্পূর্ণ কাগজপত্রের উপর নির্ভর করে কিছু লিখতে হতো না, কাগজগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক তথ্য এবং কোনটি ভুল তথ্য তাও তিনি বুঝতে পারেন নি।[১]

এখন ইহূদী ও খৃস্টানগণ দাবি করতে পারেন যে, বর্তমানে প্রচলিত তোরাহ-ই মোশির তোরাহ, যা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরে ইয্রা পুনরায় লিখেছিলেন। ইয্রা যে সকল অসম্পূর্ণ কাগজপত্র ও বিক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন সেগুলি থেকেই তিনি এই তোরাহ অনুলিপি করেছিলেন। ফলে তিনি তোরাহ-এর অনুলিপির ক্ষেত্রেও কোন্‌টি সঠিক তথ্য এবং কোন্‌টি ভুল তথ্য তা বুঝতে পারেন নি, যেমনভাবে তিনি বংশাবলি লেখার সময় ভুল-শুদ্ধ বিচার করতে পারেন নি (ফলে তাঁরই লেখা তোরাহ-এর তথ্যের সাথে তাঁরই লেখা বংশাবলির তথ্যের এই অমিল ও বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে)।

যদি ইহূদী খৃস্টানগণ এরূপ দাবি করেন, তবে প্রমাণিত হবে যে, বর্তমান প্রচলিত তোরাহ যদি ইয্রা লিখিত সেই তোরাহও হয় তবুও তা ঐশ্বরিক নয় ও নির্ভরযোগ্য নয়। (কারণ ইয্রা এই তোরাহ অসম্পূর্ণ কাগজপত্রের উপর নির্ভর করে না বুঝে লিখেছেন, ঐশ্বরিক প্রেরণার মাধ্যমে লিখেন নি)।

দ্বিতীয় বিষয় : ইয্রা ভাববাদী অপর দুইজন ভাববাদীর সহযোগিতায় যে পুস্তক রচনা করলেন সেই পুস্তকেই যদি তিনি এভাবে ভুল করতে পারেন, তবে তাঁর রচিত বা পুনর্লিখিত অন্যান্য পুস্তকেও অনুরূপ ভুলভ্রান্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক। কাজেই এ সকল পুস্তকের কোন বিষয় যদি কেউ অস্বীকার করেন তাহলে তা আপত্তিকর হবে না। বিশেষত এ সকল পুস্তকের মধ্যে যদি এমন কোন বিষয় থাকে যা নিশ্চিত প্রমাণাদির বিপরীত বা স্বাভাবিক জ্ঞান ও বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিক তবে যে কেউ তা অস্বীকার করতে পারেন।

যেমন আদিপুস্তকের ১৯ অধ্যায়ে রয়েছে যে, লোট (লূত আ.) নিজ কন্যাদ্বয়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন (নাউযু বিল্লাহ) এবং এই ব্যভিচারের ফলে কন্যাদ্বয় তাদের পিতার সন্তানধারণ করেন ও সন্তান জন্মদান করেন। তাদের দুই সন্তানই হলো মোয়াবীয় অম্মোন-সন্তানদের আদি পিতা।

---

১. মোশির তোরাহ-এ বিন্যামীনের ১০ জন সন্তানের নাম লেখা থাকবে, ইয্রা ঐশ্বরিক প্রেরণার মাধ্যমে পুনরায় নিজেই সেই তোরাহ লিখবেনএবং এরপর তিনি নিজের পুস্তকে তার বিপরীত তথ্য লিখবেন তা কখনোই হতে পারে না।

২ শমূয়েল-এর ১১শ অধ্যায়ে রয়েছে যে, দায়ূদ (আ) উরিয়র স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন এবং এই ব্যভিচারের ফলে স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হন। তখন দায়ূদ সেনাপতিকে পরামর্শ দেন কৌশলে যুদ্ধের মাঠে উরিয়কে বধ করার জন্য। এভাবে উরিয় নিহত হয় এবং দায়ূদ তার স্ত্রীকে ভোগ করেন।

অনুরূপভাবে ১ রাজাবলি ১১ অধ্যায়ে রয়েছে যে, শলোমন (সুলায়মান আ.) শেষ বয়সে স্ত্রীদের প্ররোচনায় ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যান। তিনি মূর্তিপূজা করেন এবং মূর্তির জন্য উপাসনালয় তৈরি করেন এবং সদাপ্রভুর দৃষ্টি থেকে দূরে সরে যান।

এই প্রকারের গল্পগুলি শুনলে বিশ্বাসীদের শরীর শিউরে উঠে এবং স্বাভাবিক বিবেক ও যুক্তি এগুলিকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করে।

তৃতীয় বিষয় : কোন কিছু যখন বিকৃত হয়ে যায়, তখন পরবর্তী ভাববাদীর নির্দেশনার মাধ্যমে তা সংশোধিত হওয়া আবশ্যক নয়। এরূপ ঘটনা কখনো ঘটে নি যে, পরবর্তী ভাববাদী এসে পূর্ববর্তী ঐশ্বরিক পুস্তকের বিকৃত স্থানগুলি সংশোধন করে দিয়েছেন অথবা সদাপ্রভু তাঁকে ওহী বা ঐশ্বরিক প্রেরণার মাধ্যমে বিকৃতির স্থানগুলি চিহ্নিত করে দিয়েছেন।[১]

চতুর্থ বিষয় : প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরু পণ্ডিতগণ দাবি করেন যে, নবীগণ ও প্রেরিত শিষ্যগণ পাপ, ভুল ও বিস্মৃতির ঊর্ধ্বে নন বা পাপ ও ভুলভ্রান্তি থেকে সংরক্ষিত নন। তবে তাঁরা ঈশ্বরের বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে বা ঈশ্বরের বাণী লিখন বা সংকলনের ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি থেকে সংরক্ষিত। কাজেই তাঁরা যা কিছু লিখেছেন বা প্রচার করেছেন সেগুলি সঠিক এবং ভুলত্রুটি ও বিস্মৃতি থেকে মুক্ত।

আমার বক্তব্য হলো, তাঁদের এই দাবির কোনরূপ ভিত্তি তাঁদের 'পবিত্র পুস্তকসমূহে' পাওয়া যায় না। যদি ভাববাদিগণ লিখনি ও প্রচারের ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি থেকে বিমুক্ত হবেন তবে দুইজন ভাববাদীর সহায়তায় তৃতীয় ভাববাদী ইস্রার লেখা কেন ভুল থেকে মুক্ত হলো না?

পঞ্চম বিষয় : আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ঐশ্বরিক প্রেরণা বা ওহী ও ইলহামের বিশেষ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় ভাববাদীকে তা প্রদান করা হয় না। যেমন এখানে ইস্রার বিশেষ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ইস্রাকে এ বিষয়ে কোন প্রেরণা বা ওহী প্রদান করা হয় নি।

ষষ্ঠ বিষয় : এই বিষয়টি মুসলমানদের দাবির সত্যতা প্রমাণ করে। আমরা মুসলমানগণ বাইবেল বা তোরাহ ও ইঞ্জিল নামে প্রচারিত এই পুস্তকগুলির সকল কথা

১. বরং এইরূপ ঘটেছে যে, পরবর্তী ভাববাদিগণ এসে পূর্ববর্তী বিকৃতির বিষয়ে সাধারণভাবে সতর্ক করেছেন ও নতুন করে সঠিক বিধিবিধান প্রদান করেছেন। এ জন্য আমরা দেখতে পাই যে, যীশু খৃষ্ট ও অন্যান্য ভাববাদী ইহূদীদেরকে তাদের বিকৃতি ও অন্যান্য অপরাধের জন্য তিরস্কার করেছেন ও সতর্ক করেছেন।

ও সকল তথ্য ঐশ্বরিক ও আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে স্বীকার করি না। কারণ ভুল কখনো ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ হতে পারে না বা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হতে পারে না। আর এ সকল পুস্তকের মধ্যে যে ভুল আছে তাতে কোনরূপ সন্দেহ নেই, পূর্ববর্তী প্রমাণগুলি থেকে তা স্পষ্ট হয়েছে। ইনশা আল্লাহ্, পরবর্তী প্রমাণগুলি থেকেও পাঠক তা জানতে পারবেন।

৭ম বিষয় : যদি লিখনি ও প্রচারের ক্ষেত্রে ইস্রা ভাববাদী ভুল থেকে মুক্ত না হন, তবে সুসমাচার লেখক মার্ক ও লূক, যাঁরা ভাববাদী বা প্রেরিত ছিলেন না, তাঁরা কিভাবে ভুল থেকে মুক্ত হবেন? ইহূদী ও খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে ইস্রা একজন ঐশ্বরিক প্রেরণা বা ওহীপ্রাপ্ত ভাববাদী ছিলেন। অন্য দুইজন ঐশ্বরিক প্রেরণাপ্রাপ্ত ভাববাদী তাঁকে এই পুস্তক লিখতে সহায়তা করেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা ভুল থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। পক্ষান্তরে মার্ক ও লূক কখনোই ভাববাদী বা ঐশ্বরিক প্রেরণাপ্রাপ্ত ছিলেন না। তাঁরা যীশুর প্রেরিত শিষ্যদের অন্তর্ভুক্তও ছিলেন না, যদিও খৃস্টানগণ মথি ও যোহনকে প্রেরণাপ্রাপ্ত বলে বিশ্বাস করেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, মথি ও যোহনও ঐশ্বরিক প্রেরণা-প্রাপ্ত ছিলেন না। আর এজন্য এই চার সুসমাচার লেখকের কথাবার্তা অগণিত ভুল ও বিশ্রী বৈপরীত্যে ভরা।

১৭শ প্রমাণ : আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২য় খণ্ডে ১ বংশাবলির ৮ম অধ্যায়ের ২৯ আয়াতের টীকায় লিখেছেন : "এই অধ্যায়ে এই আয়াত থেকে ৩৮ আয়াত পর্যন্ত এবং ৯ম অধ্যায়ে ৩৫ আয়াত থেকে ৪৪ আয়াত পর্যন্ত পরস্পরবিরোধী নামের উল্লেখ রয়েছে।[১] ইহূদী পণ্ডিতগণ বলেন, ইস্রা দুইটি পুস্তক পেয়েছিলেন। পুস্তক দুইটিতে এই দুইটি অনুচ্ছেদ ছিল। অনুচ্ছেদ দুইটিতে প্রদত্ত কিছু নাম পরস্পরবিরোধী। এগুলির মধ্যে কোনটি যে সঠিক তা ইস্রা বুঝতে পারেন নি। এজন্য তিনি দুইটি অনুচ্ছেদই হুবহু উদ্ধৃত করেছেন।[২]"

১৬শ প্রমাণের ক্ষেত্রে যে মন্তব্যগুলি উল্লেখ করেছি এখানেও পাঠক সেই মন্তব্যগুলি করতে পারেন।

১৮শ প্রমাণ : যিহূদা রাজ্যের রাজা অবিয় এবং ইস্রায়েল রাজ্যের রাজা যারবিয়ামের মধ্যে যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ২ বংশাবলির ১৩ অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে ৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অবিয় রাজার সৈন্য সংখ্যা ছিল 'চারি লক্ষ' এবং যারবিয়াম রাজার সৈন্য সংখ্যা ছিল 'আট লক্ষ'। এরপর ১৭ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই যুদ্ধে যারবিয়াম রাজার 'পাঁচ লক্ষ' সৈন্য মারা যায়।

১. উভয় স্থানেই একই বংশের মানুষদের নাম ইত্যাদি তথ্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রদত্ত নামগুলির মধ্যে কিছু নাম পরস্পরবিরোধী।

২. ইহূদী-খৃস্টানগণ প্রয়োজন হলে ভাববাদীদের মর্যাদা দাবি করেন। আর প্রয়োজন হলে তাঁদেরকে 'মাছি মারা কেরানী'র পর্যায়ে নিয়ে যান।

সেই যুগের ছোট্ট দুইটি 'গোত্র রাজ্য' যিহূদা ও ইস্রায়েলের জন্য [illegible] সংখ্যাগুলি অস্বাভাবিক ও অবাস্তব। এ কারণে ল্যাটিন অনুবাদের অধিকাংশ কথিত 'লক্ষ'-কে হাজারে নামিয়ে আনা হয়েছে, অর্থাৎ প্রথম স্থানে 'চারি লক্ষ' পাল্টিয়ে 'চল্লিশ হাজার', দ্বিতীয় স্থানে 'আট লক্ষ' পাল্টিয়ে 'আশি হাজার' ও তৃতীয় স্থানে 'পাঁচ লক্ষ' পাল্টিয়ে '৫০ হাজার' করা হয়েছে। বাইবেলের ব্যাখ্যাকারগণ এই বিকৃতি ও পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছেন।

হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন : "যতদূর বুঝা যায় এ সকল সংস্করণে (ল্যাটিন অনুবাদে) প্রদত্ত সংখ্যাগুলি সঠিক।"

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলেন : "জানা যায় যে, ছোট সংখ্যাগুলি অর্থাৎ ল্যাটিন অনুবাদে প্রদত্ত সংখ্যাগুলি বিশুদ্ধতার শীর্ষে রয়েছে। এ সকল পরিবর্তিত সংখ্যার সঠিকত্ব প্রমাণের একটি দিক হলো যে, পুরাতন নিয়মের ঐতিহাসিক পুস্তকগুলিতে সংখ্যার ক্ষেত্রে অনেক বিকৃতি ঘটেছে।"

এভাবে এই ব্যাখ্যাকার স্বীকার করলেন যে, পুরাতন নিয়মের পুস্তকে (বংশাবলিতে) এই স্থানে বিকৃতি ঘটেছে। তিনি আরো স্বীকার করলেন যে, এই প্রকারের বিকৃতি এ সকল পুস্তকে অনেক।

১৯শ প্রমাণ : ২ বংশাবলি ৩৬ অধ্যায়ের ৯ আয়াতে রয়েছে : "যিহোয়াখীন আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন।"

এখানে 'আট বৎসর' কথাটি বিকৃত ও ভুল। এই কথাটি ২ রাজাবলির ২৪ অধ্যায়ের ৮ম আয়াতে প্রদত্ত তথ্যের বিরোধী। সেখানে বলা হয়েছে : "যিহোয়াখীন আঠার বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন।"

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে রাজাবলির বক্তব্যের টীকায় বলেন : "২ বংশাবলি ৩৬ অধ্যায়ের ৯ আয়াতে 'আট বৎসর' রয়েছে। এই কথাটি নিঃসন্দেহে ভুল। কারণ যিহোয়াখীন মাত্র তিন মাস রাজত্ব করেন। এরপর ব্যাবিলনে বন্দিরূপে নীত হন। বন্দিত্বের সময়ে তার সাথে তার স্ত্রীগণও ছিলেন। স্বভাবতই ৮ বা ৯ বৎসরের কোন মানুষের অনেকগুলি স্ত্রী থাকে না। আর এইরূপ ৮ বা ৯ বৎসরের একজন শিশুর ক্ষেত্রে একথাও বলা মুশকিল যে, সে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা মন্দ ও পাপ তা করেছিল। কাজেই এই পুস্তকের এই স্থানটি বিকৃত ও পরিবর্তিত।

২০শ প্রমাণ : গীতসংহিতায় ২২ গীতের ১৬ আয়াতে (কোন কোন সংস্করণে ২১ গীতের ১৬ আয়াতে) হিব্রু বাইবেলে (ইহূদীগণের নিকট সংরক্ষিত পুরাতন নিয়মে) রয়েছে : "এবং আমার উভয় হস্ত সিংহের মত।" কিন্তু ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়ের খৃস্টানগণ এখানে নিম্নরূপ অনুবাদ করেছেন : "তাহারা আমার হস্তপদ বিদ্ধ করিয়াছে।"

এখানে এরা সকলেই একমত যে, ইহূদীদের নিকট সংরক্ষিত হিব্রু বাইবেলে এখানে বিকৃত করা হয়েছে।

Contents

২১শ প্রমাণ : আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে যিশাইয়র পুস্তকের ৬৪ অধ্যায়ে ২য় আয়াতের টীকায় লিখেছেন : "মূল হিব্রু পাঠে এখানে অনেক বিকৃতি রয়েছে। সঠিক কথাটি নিম্নরূপ হবে : "যেমন মোম অগ্নিতে গলিয়া যায়... ।"[১]

২২শ প্রমাণ : উপর্যুক্ত অধ্যায়েরই ৪র্থ আয়াতটি নিম্নরূপ : "কারণ পুরাকাল অবধি লোকে শুনে নাই, কর্ণে অনুভব করে নাই, চক্ষুতে দেখে নাই যে, তোমা ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর আছেন, যিনি তাঁহার অপেক্ষাকারীদের পক্ষে কার্য সাধন করেন।"

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত প্রথম পত্রের ২য় অধ্যায়ের ৯ম আয়াতে পৌল উপরের আয়াতটি উদ্ধৃত করে বলেন : "কিন্তু যেমন লেখা আছে : 'চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই, যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।"

লক্ষ্য করুন, উভয় বক্তব্যের মধ্যে কত বড় পার্থক্য! নিঃসন্দেহে উভয় আয়াতের একটি বিকৃত। হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে : "গ্রহণযোগ্য কথা হলো, এখানে হিব্রু বাইবেলের (যিশাইয়র পুস্তকের) বক্তব্যটি বিকৃত।"

যিশাইয়র পুস্তকের আয়াতটির টীকায় আদম ক্লার্ক প্রথমে এ বিষয়ে অনেক মতামত উদ্ধৃত করেছেন এবং সবগুলিকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং সেগুলির ত্রুটি উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন : "এসকল জটিল সমস্যার বিষয়ে আমি কি বলব তা ভেবে পাচ্ছি না। তবে আমি পাঠকের সামনে দুইটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করছি। প্রথম সম্ভাবনা হলো, মনে করতে হবে যে, এই স্থানে ইহুদীগণ মূল হিব্রু বাইবেলে ও গ্রীক অনুবাদে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করেছে। এইরূপ আরো অনেক স্থানে, যেখানে বাইবেলের নতুন নিয়মে পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সে সকল স্থানে ইহুদীগণ এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃতি করেছে বলে জোরালোভাবে ধারণা পোষণ করা হয়। এ বিষয়ে উভিন-এর পুস্তকের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে ৯ম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত গ্রীক অনুবাদের বিষয়ে আলোচনাটি দেখুন।

"দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো, মনে করতে হবে যে, পৌল এখানে যিশাইয়র পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেন নি বরং তিনি এই বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন একটি বা দুইটি জাল পুস্তক থেকে। যিশাইয়র উর্ধারোহণ (The Ascension of Isaiah) ও এলিয়র নিকট প্রকাশিত বাক্য (The Revelation of Eli'jah) নামক দুইটি জাল ও বানোয়াট পুস্তকে পৌলের উদ্ধৃত এই বক্তব্যটি হুবহু পাওয়া যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রেরিত পৌল উক্ত জাল ও বানোয়াট পুস্তক থেকে এই বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন।

"সম্ভবত মানুষদের জন্য প্রথম সম্ভাবনাটি মেনে নেওয়া সহজ হবে না। তবে আমি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পাঠকগণকে স্মরণ করাতে চাই যে, দ্বিতীয়

১. প্রচলিত বাইবেলে আয়াতটি নিম্নরূপ : "যেমন অগ্নি ঝোপ প্রজ্বলিত করে, যেমন অগ্নি জল ফুটায়..."।

সম্ভাবনাটিকে জিরোম ধর্মত্যাগ ও অবিশ্বাসের চেয়েও ভয়ঙ্কর বলে গণ্য করেছেন।" আদম ক্লার্কের বক্তব্য এখানেই শেষ।

২৩শ প্রমাণ থেকে ২৮শ প্রমাণ

হর্ন তাঁর ভাষ্যগ্রন্থের ২য় খণ্ডে লিখেছেন : "নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে মূল হিব্রু পাঠ (text) বিকৃত :

১. মালাখি ভাববাদীর পুস্তকের ৩য় অধ্যায়ের প্রথম আয়াত।
২. মীখা ভাববাদীর পুস্তকের ৫ম অধ্যায়ের ২য় আয়াত।
৩. গীতসংহিতার ১৬ গীতের ৮ম থেকে ১১শ আয়াত।
৪. আমোষ ভাববাদীর পুস্তকের ৯ম অধ্যায়ের ১১শ ও ১২শ আয়াত।
৫. গীতসংহিতার ৪০ গীতের ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম আয়াত।
৬. গীতসংহিতার ১১০ গীতের ৪র্থ আয়াত।

এখানে এই খৃষ্টান গবেষক এ সকল স্থানে বিকৃতির কথা স্বীকার করলেন। বাধ্য হয়েই তাঁরা এইরূপ স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। কারণ প্রথম আয়াতটি (মালাখি ৩/১) মথি তাঁর সুসমাচারের ১১শ অধ্যায়ের ১০ আয়াতে উদ্ধৃত করেছেন। মূল হিব্রু বাইবেলে ও প্রাচীন অনুবাদগুলিতে মালাখির বক্তব্য যেভাবে রয়েছে তার সাথে মথির উদ্ধৃতির দ্বিবিধ বৈপরীত্য রয়েছে :

প্রথমত, মথির উদ্ধৃতিতে লিখেছেন "দেখ, আমি আপন দূতকে তোমার সম্মুখে প্রেরণ করি..."। কিন্তু মালাখি বলেছেন : "দেখ, আমি আপন দূতকে প্রেরণ করিব"। এখানে 'তোমার সম্মুখে' কথাটি নেই।

দ্বিতীয়ত, মথি লিখেছেন : "সে তোমার অগ্রে তোমার পথ প্রস্তুত করিবে।" অথচ মালাখি লিখেছেন : "সে আমার অগ্রে পথ প্রস্তুত করিবে।"

হর্ন টীকায় লিখেছেন : "এই বৈপরীত্যের কারণ চিহ্নিত করা সহজ নয়। এখানে একটি কথাই বলা যায় যে, প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলিতে কোন প্রকারের বিকৃতি ঘটেছিল।"

দ্বিতীয় আয়াতটি (মীখা ৫/২) মথি তাঁর সুসমাচারের ২য় অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ আয়াতে উদ্ধৃত করেছেন। উভয় স্থানের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে।

তৃতীয় বিকৃতির ক্ষেত্রে উল্লিখিত আয়াতগুলি (গীতসংহিতা ১৬/৮-১১) লূক তাঁর 'প্রেরিতদের কার্যবিবরণের' ২য় অধ্যায়ের ২৫-২৮ আয়াতে উদ্ধৃত করেছেন। উভয় স্থানের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে।

চতুর্থ বিকৃতিতে উল্লিখিত আয়াতটি (আমোষ ৯/১১-১২) লূক তাঁর 'প্রেরিতদের কার্যবিবরণের' ১৫ অধ্যায়ের ১৬-১৭ আয়াতে উদ্ধৃত করেছেন। উভয় স্থানের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে।

পঞ্চম বিকৃতিতে উল্লিখিত আয়াতগুলি (গীতসংহিতার ৪০/৬-৮) উদ্ধৃত করেছেন পৌল 'ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ১০ অধ্যায়ের ৫-৭ আয়াতে। উভয় স্থানের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে।

হূর্ন ৬ষ্ঠ যে স্থানে বিকৃতির কথা স্বীকার করেছেন (গীতসংহিতা ১১০/৪) এখানে বিকৃতির কারণ কি তা আমার নিকট পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। তবে খৃষ্টানগণের নিকট হূর্ন একজন গবেষক ধর্মগুরু পণ্ডিত। কাজেই বাইবেলের বিকৃতির প্রমাণ হিসাবে তাঁর স্বীকৃতিই যথেষ্ট।

২৯শ প্রমাণ : কেউ যদি নিজ কন্যাকে ক্রীতদাসীরূপে বিক্রয় করে তবে ক্রেতা মালিক তাকে পুনরায় বিক্রয় করতে পারবে কি না সে বিষয়ে বিধান দেওয়া হয়েছে যাত্রাপুস্তকের ২১ অধ্যায়ের ৮ম আয়াতে। মূল হিব্রু তোরাহ-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে তাকে অন্য জাতির কাছে বিক্রয় করতে পারবে না। কিন্তু হিব্রু তোরাহ-এর টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে তাকে অন্য জাতির নিকট বিক্রয় করতে পারবে। এভাবে মূলে 'না' ও টীকায় 'হ্যাঁ' বলা হয়েছে।

৩০শ প্রমাণ : লেবীয় পুস্তকের ১১শ অধ্যায়ের ২১ আয়াতে ভূমিতে বিচরণশীল পক্ষীদের বৈধতার ও শুচিতার বিষয়ে বিধান দেওয়া হয়েছে। মূল হিব্রু পাঠে তা ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে; কিন্তু টীকার বক্তব্যে তা ভক্ষণ করতে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এভাবে মূলে 'না' ও টীকায় 'হ্যাঁ' বলা হয়েছে।

৩১শ প্রমাণ : লেবীয় পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ের ৩০ আয়াতে শহরের মধ্যে বাড়ি বিক্রয়ের পর তা পুনরায় ফেরত নেওয়ার বিধান প্রদান করা হয়েছে। মূল হিব্রু পাঠে বলা হয়েছে যে, এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে বিক্রেতা আর তার বাড়িটি ফেরত নেওয়ার অধিকার পাবেনা। কিন্তু টীকার পাঠে বলা হয়েছে যে, সে সেই অধিকার পাবে। এভাবে মূলে 'না' ও টীকায় 'হ্যা' বলা হয়েছে।

প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরুগণ এই তিন স্থানে অনুবাদের ক্ষেত্রে টীকার ভাষ্যকেই গ্রহণ করেছেন এবং মূল হিব্রু পাঠকে বর্জন করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, তাঁদের মতে মূল হিব্রু পাঠ বিকৃত।

এক্ষেত্রে আরো লক্ষণীয় যে, এই স্থান তিনটিতে বিকৃতি ঘটার কারণে বৈধতা ও অবৈধতা বিষয়ক বিধানের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা দেখা দিয়েছে। বিষয়গুলি বৈধ না অবৈধ তা নিশ্চিতভাবে জানার আর উপায় নেই। ইহূদী-খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, বাইবেলের মধ্যে এমন কোন বিকৃতি ঘটে নি যাতে ঐশ্বরিক কোন বিধান পালনের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়েছে। এই তিনটি বিকৃতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের এই দাবিও সঠিক নয়।

৩২শ প্রমাণ : প্রেরিতদের কার্যবিবরণ পুস্তকের ২০ অধ্যায়ে ২৮ আয়াতে বলা হয়েছে : "ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন কর, যাহাকে তিনি নিজ রক্ত দ্বারা ক্রয় করিয়াছেন।"

ক্রীসবাখ বলেছেন : "এখানে 'ঈশ্বর' শব্দটি ভুল। এখানে 'ঈশ্বর'-এর পরিবর্তে 'প্রভু' শব্দটির ব্যবহারই সঠিক।. এভাবে আমরা দেখছি যে, ক্রীসবাখের মতে এখানে বিকৃতি ঘটেছে এবং 'প্রভু' শব্দকে পরিবর্তন করে 'ঈশ্বর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৩৩শ প্রমাণ : তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্রের ৩য় অধ্যায়ের ১৬ আয়াতে রয়েছে : "ঈশ্বর মাংসে প্রকাশিত হইলেন (God Was manifest in the flesh)"। ক্রীসবাখ বলেছেন : এখানে 'ঈশ্বর' শব্দটি ভুল। এখানে 'ঈশ্বর' শব্দটির পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহার করলে-অর্থাৎ 'তিনি' শব্দটি ব্যবহার করলে পাঠটি বিশুদ্ধ হবে।[১]

৩৪শ প্রমাণ : যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্যের ৮ম অধ্যায়ের ১৩ আয়াতে রয়েছে : "পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, আর আকাশের মধ্যপথে উড়িয়া যাইতেছে এমন একজন স্বর্গদূতের (ফিরিশতার) বাণী শুনিলাম (And I beheld, and heard an angel flying through the midst of heaven)... ।"

ক্রীসবাখ ও শোলয বলেন : "এখানে 'স্বর্গদূত' (angel) শব্দটি ভুল। এখানে সঠিক শব্দ হলো : "ঈগল (eagle)" ।[২]

৩৫শ প্রমাণ : ইফিষীয়দের প্রতি পৌলের পত্রের ৫ম অধ্যায়ের ২১ আয়াতে বলা হয়েছে : "ঈশ্বরের ভয়ে এক জন অন্য জনের বশীভূত হও" (Submitting yourselves one to another in the fear of God.)

ক্রীসবাখ ও শোলয বলেন : "এখানে 'ঈশ্বর (God) শব্দটি ভুল। এখানে সঠিক শব্দ হলো : "খৃষ্ট" ।[৩]

প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃতির কিছু প্রমাণ পেশ করলাম। আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে এই ভয়ে এ বিষয়ে অন্যান্য প্রমাণাদি উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম।

---

১. এখানে বাইবেলের বাংলা অনুবাদে মূল ইংরেজির পাঠ পরিত্যাগ করে ক্রীসবাখের মতানুসারে সংশোধন করে বলা হয়েছে : "যিনি মাংসে প্রকাশিত হইলেন"।

২. এখানেও বাইবেলের বাংলা অনুবাদে মূল ইংরেজির পাঠ পরিত্যাগ করে ক্রীসবাখ ও শোলযের মতানুসারে সংশোধন করে 'স্বর্গদূতের' পরিবর্তে 'ঈগল পক্ষী' বলা হয়েছে।

৩. এখানেও বাইবেলের বাংলা অনুবাদে মূল ইংরেজির পাঠ পরিত্যাগ করে ক্রীসবাখ ও শোলযের মতানুসারে সংশোধন করে 'ঈশ্বরের' পরিবর্তে 'খ্রীষ্টের ভয়ে' বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধি ও সংযোজনের মাধ্যমে শাব্দিক বিকৃতির প্রমাণ

১ম প্রমাণ : পুরাতন নিয়মের নিম্নলিখিত ৮টি পুস্তক ৩২৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত খৃস্টান সম্প্রদায়ের নিকট অগ্রহণযোগ্য ও সন্দেহজনক পুস্তক (Apocrypha) বলে গণ্য ছিল : (১) ইস্টেরের বিবরণ (The Book of Esther), (২) বারুখের পুস্তক (The Book of Baruch), (৩) তোবিয়াসের পুস্তক (The Book of Tobias/Tobit), (৪) যুডিথের পুস্তক (The Book of Judith), (৫) উইস্ডম বা জ্ঞান পুস্তক (The Book of Wisdom/Wisdom of Solomon), (৬) যাজকগণ (Ecclesiasticus), (৭) ম্যাকাবিজের প্রথম পুস্তক (The First Book of Maccabees) ও (৮) ম্যাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক (The Second Book of Maccabees)।

৩২৫ খৃস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পৌত্তলিক সম্রাট কন্সটান্সটাইনের নির্দেশে নিকীয়া (Nicaea) শহরে খৃস্টান বিশপ-যাজক-পণ্ডিতগণের প্রথম সাধারণ মহা সম্মেলন (ecumenical council) অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সন্দেহজনক গ্রন্থাবলী সম্পর্কে পরামর্শ, মতবিনিময়, গবেষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য তাঁরা এই সম্মেলনে সমবেত হন। পরামর্শ ও মতবিনিময়ের পরে উপস্থিত (তিন শতাধিক) বিশপ ও মহাযাজকগণ এ সকল গ্রন্থের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, 'যুডিথের পুস্তক' (The Book of Judith) বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি 'সন্দেহজনক' (Apocrypha) হিসাবেই পরিত্যক্ত থাকবে। (St. Jerome) সেন্ট জিরোম (৩৪২-৪২০ খৃ) এই গ্রন্থের যে ভূমিকা লিখেছেন তা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

এরপর ৩৬৪ খৃস্টাব্দে লোডেসিয়ায় আরেকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ধর্মগুরুগণ 'যুডিথের পুস্তক' সম্পর্কে পূর্ববর্তী মহাসম্মেলনের সিদ্ধান্ত মেনে নেন। উপরন্তু তাঁরা উপরে উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্য থেকে ইস্টেরের বিবরণ (The Book of Esther) পুস্তকটিকেও বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বলে মেনে নেন। তাঁরা একটি সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে তাঁদের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করেন।

অতঃপর ৩৯৭ খৃস্টাব্দে কার্থেজ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১২৭ জন প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন খৃস্টধর্মের প্রসিদ্ধ ও সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিত্ব সেন্ট অগাস্টিন। এই সম্মেলনের সদস্যগণ উপরের দুই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন। উপরন্তু তাঁরা উপরে উল্লিখিত সন্দেহজনক বাকি ৬টি পুস্তককেও নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করেন। তবে তাঁরা 'বারুখের পুস্তক'টিকে 'যিরমিয়

ভাববাদীর পুস্তক'-এর অংশ হিসাবে গণ্য করেন; কারণ বারুখ (আ) যিরমিয় (আ)-এর প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। এজন্য বাইবেলের সূচীপত্রে তাঁরা 'বারুখের পুস্তকের' নাম পৃথকভাবে লিখেন নি।

এরপর 'টরলো সম্মেলন', 'ফ্লোরেন্স সম্মেলন' ও 'ট্রেন্ট সম্মেলন' নামে তিনটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই তিন সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ধর্মগুরুগণ পূর্ববর্তী তিনটি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন। এ সকল সম্মেলনের পরে উপরোল্লিখিত ৮টি সন্দেহজনক পুস্তক (Apocrypha) সাধারণ সকল খৃষ্টানের নিকট নির্ভরযোগ্য বলে গৃহীত হয়। এভাবেই (খৃস্টীয় ৪র্থ থেকে ১৬শ শতক পর্যন্ত) প্রায় ১২০০ বছর এই গ্রন্থগুলি বাইবেলের অংশ হিসাবে স্বীকৃত থাকে। ১৬শ শতকে প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হলে তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তসমূহ প্রত্যাখ্যান করে উপরে উল্লিখিত ৮টি পুস্তকের মধ্য থেকে ৭টি পুস্তককে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেন :

(১) বারুখের পুস্তক (The Book of Baruch), (২) তোবিয়াসের পুস্তক (The Book of Tobias/Tobit), (৩) যুডিথের পুস্তক (The Book of Judith), (৪) উইসডম বা জ্ঞান পুস্তক (The Book of Wisdom/Wisdom of Solomon), (৫) যাজকগণ (Ecclesiasticus), (৬) ম্যাকাবিজের প্রথম পুস্তক (The First Book of Maccabees) ও (৭) ম্যাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক (The Second Book of Maccabees)।

অবশিষ্ট পুস্তকটি, অর্থাৎ ইস্টেরের বিবরণ (The Book of Esther)-এর কিছু অংশ তাঁরা বাতিল বলে গণ্য করেন এবং কিছু অংশ গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থে ১৬টি অধ্যায় ছিল। তাঁরা বলেন যে, প্রথম ৯টি অধ্যায় এবং দশম অধ্যায়ের তিনটি আয়াত সঠিক বলে স্বীকৃত। দশম অধ্যায়ের অবশিষ্ট ১০ আয়াত ও বাকী ৬টি অধ্যায় বাতিল হিসাবে প্রত্যাখ্যাত। উপরের গ্রন্থগুলি বাতিল ও বানোয়াট বলে গণ্য করার ক্ষেত্রে তাঁরা বিভিন্ন প্রকারের প্রমাণ ও যুক্তি পেশ করেন। সেগুলির মধ্যে একটি প্রমাণ হলো, যুসীবিস বা ইউসেবিয়াস (Eusebius Pamphilus) চতুর্থ পুস্তকের ২২শ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই গ্রন্থগুলি, বিশেষ করে ম্যাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁদের অন্য একটি প্রমাণ হলো, ইহূদীগণ এ সকল গ্রন্থকে ঐশী বা ঐশ্বরিক বলে মানেন না।

রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের খৃষ্টানগণ সংখ্যায় প্রটেস্ট্যান্টদের চেয়ে বেশি। এই সম্প্রদায়ের অনুসারিগণ এখন পর্যন্ত উপর্যুক্ত ৮টি পুস্তককে ঐশ্বরিক ও বিশুদ্ধ পুস্তক হিসাবে স্বীকার করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, এই পুস্তকগুলি ঐশ্বরিক প্রেরণার মাধ্যমে লিখিত এবং এগুলি মেনে নেওয়া অত্যাবশ্যক। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ল্যাটিন অনুবাদ বাইবেলের (Vulgate) মধ্যে এই ৮টি পুস্তক রয়েছে। ক্যাথলিকদের

ধর্মমতে এই ল্যাটিন বাইবেল বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য এবং তাঁদের ধর্ম ও ধার্মিকতার মূল ভিত্তি এই ল্যাটিন বাইবেলের উপর।

সম্মানিত পাঠক!

আশা করি উপরের বিষয়টি আপনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। তাহলে এবার বলুন, এর চেয়ে বড় বিকৃতি ও সংযোজন আর কি হতে পারে? ইহূদী ও প্রটেস্ট্যান্টগণের মতানুসারে আমরা দেখেছি যে, বাইবেলের পুরাতন নিয়মের মধ্যে পুরো ৮টি পুস্তক বা সাড়ে সাতটি পুস্তক বৃদ্ধি ও সংযোজন করা হয়েছে!

যে পুস্তকগুলি ৩২৪ বছর পর্যন্ত অগ্রহণযোগ্য, বিকৃত ও জাল বলে গণ্য ছিল, এই দীর্ঘ সময় যেগুলিকে ঐশ্বরিক পুস্তক বলে গণ্য করা হয় নি, সেই পুস্তকগুলি পূর্ববর্তী খৃস্টান ধর্মগুরুগণ উপর্যুক্ত সম্মেলনগুলিতে সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ঐশ্বরিক ও অবশ্য গ্রহণীয় বলে গণ্য করলেন, হাজার হাজার খৃস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিত এগুলির বিশ্বস্ততা, বিশুদ্ধতা ও ঐশ্বরিকতার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করলেন। রোমান ক্যাথলিক চার্চ এখন পর্যন্ত এগুলির বিশুদ্ধতা ও ঐশ্বরিকতার বিষয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাসী।

এ থেকে বুঝা গেল যে, খৃস্টানদের ধর্মবিষয়ক ঐকমত্যের কোন ধর্মীয় মূল্য নেই। পূর্ববর্তী খৃস্টানগণ যদি কোন বিষয়ে একমত হন তবে তা সেই বিষয়ের সঠিকত্ব বা বিশুদ্ধতার কোন প্রমাণ বলে গণ্য হবে না। পূর্ববর্তী সকল খৃস্টান যদি কোন বিষয়ে একমত হন এবং পরবর্তী কোন ব্যক্তি যদি সেই ঐকমত্যের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করে তবে উক্ত ঐকমত্যকে উক্ত একক মতের বিরুদ্ধে একটি দুর্বল প্রমাণ হিসেবেও পেশ করা যাবে না, শক্তিশালী প্রমাণ হওয়া তো দূরের কথা।

আমরা দেখতে পেলাম যে, উপর্যুক্ত ৮টি জাল ও বিকৃত পুস্তকের বিশুদ্ধতা, নির্ভযোগ্যতা ও ঐশ্বরিকতার বিষয়ে পূর্ববর্তী খৃস্টানগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং তাঁদের এই ঐকমত্যের কারণে উক্ত পুস্তকগুলির নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হয় নি, বরং তাঁদের ঐকমত্যের ভিত্তিহীনতাই প্রমাণিত হয়েছে। প্রচলিত সুসমাচারাবলি বা নতুন নিয়মের পুস্তকগুলির বিশুদ্ধতার বিষয়ে তাঁদের ঐকমত্যও অনুরূপভাবে ভিত্তিহীন হতে পারে। খুবই সম্ভব যে, নতুন নিয়মের এ সকল পুস্তক বা সুসমাচার ঐশ্বরিক পুস্তক নয় বা সেগুলি বিকৃত ও পরিবর্তিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা এগুলিকে সঠিক ও বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করার বিষয়ে একমত হয়েছেন।

তাঁদের ঐকমত্যের মূল্যই বা কী? পূর্ববর্তী খৃস্টানগণ সকলেই একমত ছিলেন যে, বাইবেলের গ্রীক অনুবাদ বা গ্রীক পাণ্ডুলিপিই একমাত্র বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি এবং প্রাচীন হিব্রু পাণ্ডুলিপি বিকৃত ও পরিবর্তিত। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, ইহূদীগণ ১৩০ খৃস্টাব্দে হিব্রু বাইবেলকে বিকৃত করেছে। প্রথম পরিচ্ছেদের ২য় প্রমাণের আলোচনায় পাঠক তা দেখতে পেয়েছেন। রোমান ক্যাথলিক চার্চ ও পূর্বাঞ্চলীয় চার্চসমূহ (গ্রীক অর্থোডক্স, সিরীয়ান, ম্যারনাইট প্রমুখ সম্প্রদায়) এখন পর্যন্ত

পূর্ববর্তিগণের এই বিশ্বাসের সাথে একমত এবং তাঁরাও অনুরূপ বিশ্বাস করেন। কিন্তু প্রটেস্ট্যান্টগণ প্রমাণ করেছেন যে, পূর্ববর্তিগণ ও তাঁদের অনুসারী পরবর্তিগণের বিশ্বাস ও ঐকমত্য ছিল ভুল। তাঁরা এই বিশ্বাসটি সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছেন। পূর্ববর্তী খৃস্টানগণ গ্রীক অনুবাদের বিষয়ে যা বলেছিলেন, প্রটেস্ট্যান্টগণ হিব্রু সংস্করণের বিষয়ে তাই বলছেন।

অনুরূপভাবে রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানগণ একমত যে, বাইবেলের ল্যাটিন অনুবাদটি বিশুদ্ধ। প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মগুরুগণ প্রমাণ করেছেন যে, ল্যাটিন অনুবাদ বিকৃত। শুধু তাই নয়, তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, ল্যাটিন অনুবাদটিতে যত বিকৃতি ঘটেছে এত বিকৃতি অন্য কোন অনুবাদে পাওয়া যায় না।

হর্ন ১৮২২ সালে মুদ্রিত তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৪৬৩ পৃষ্ঠায় বলেন : "পঞ্চম শতাব্দী থেকে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত সময়পর্বে অনেক বিকৃতি ও সংযোজন ঘটেছে এই (ল্যাটিন) অনুবাদের মধ্যে।"

এরপর তিনি ৪৬৭ পৃষ্ঠায় বলেন : "একটি বিষয় আপনাকে অবশ্যই খেয়ালে রাখতে হবে তা হলো, ল্যাটিন অনুবাদের ন্যায় এত বিকৃতি আর কোন অনুবাদের ক্ষেত্রে ঘটে নি। এই অনুবাদের সংকলনকারী ও বর্ণনাকারিগণ বেপরোয়াভাবে নতুন নিয়মের এক পুস্তকের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ বা আয়াত অন্য পুস্তকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তাঁরা টীকার বক্তব্যগুলি মূল পাঠের (text) মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।"

তাঁদের মধ্যে সর্বজনস্বীকৃত ও বহুল প্রচলিত এই অনুবাদটির ক্ষেত্রে যদি তাঁদের কর্ম এইরূপ হয় তাহলে কিভাবে আমরা আশা করতে পারি যে, অল্প প্রচলিত মূল পাঠ তারা বিকৃত করেন নি? আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, মূল গ্রীক বা হিব্রু বাইবেল তাদের মধ্যে ল্যাটিন অনুবাদের মত এত প্রচলিত ছিল না। প্রচলিত পুস্তকের চেয়ে অপ্রচলিত পুস্তক বিকৃত করা নিঃসন্দেহে সহজ। এজন্য বাহ্যত বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি অনুবাদে বিকৃতি করতেন, তিনি মূল পাঠও বিকৃত করতেন যেন তার ধর্মের মানুষদের কাছে তার বিকৃতি ধরা না পড়ে।

অবাক বিষয় হলো, প্রটেস্ট্যান্টগণ উপর্যুক্ত ৮টি পুস্তকের ৭টি পুস্তক পুরোপুরি বাতিল বলে ঘোষণা করলেন, কিন্তু ইস্টেরের বিবরণ পুস্তকটিকে পুরোপুরি বাতিল করলেন না কেন? এই পুস্তকটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মহান স্রষ্টা ঈশ্বরের একটি নাম নেই, তাঁর প্রশংসা, গুণকীর্তন বা তাঁর কোন বিধিবিধান তো দূরের কথা।

সর্বোপরি এই পুস্তকের লেখক কে তাও জানা যায় না। পুরাতন নিয়মের ব্যাখ্যাকারগণ নিশ্চিতরূপে বলতে পারেন না যে, এই পুস্তকটির লেখক কে। কোন দলিল-প্রমাণ দিয়ে এর লেখকের পরিচয় তাঁরা প্রমাণ করতে পারেন না। তবে আন্দাজে ও অনুমানের উপর নির্ভর করে তারা অন্ধকারে ঢিল ছুড়ে কিছু কথা বলেন। কেউ বলেন, ইয্রার যুগ থেকে শীমোনের যুগ পর্যন্ত মন্দিরের পুরোহিত-পণ্ডিতগণ গ্রন্থটি রচনা করেন। প্রথম খৃস্টীয় শতকের প্রখ্যাত ইহূদী পণ্ডিত ও দার্শনিক যিহূদীয় ফ্লোন বলেন :

ব্যবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভের পরে যাজক যেশূয়ের পুত্র যোয়াকীম[১] গ্রন্থটি রচনা করেন। সেন্ট অগাস্টিন বলেন : গ্রন্থটি ইয্রার রচিত। কেউ কেউ বলেন : গ্রন্থটি যায়ীরের পুত্র মর্দখয় নামক জনৈক ইহূদী ব্যক্তির রচিত।[২] কেউ বলেন : গ্রন্থটি মর্দখয় ও (তার চাচাতো বোন) ইস্টেরের রচিত।

ক্যাথলিক হেরাল্ড পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : মহাত্মা মেলিটো (Melito)[৩] বাইবেলের নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ পুস্তকাবলির যে তালিকা লিখেছেন সেই তালিকায় তিনি এই পুস্তকটির নাম লিখেন নি, ইউসেবিয়াস (Eusebius Pamphilus) তাঁর যাজকীয় ইতিহাসে (The Ecclesiastical History) ৪র্থ পুস্তকের ২৭তম অধ্যায়ে তা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন। গ্রীনাযিনযেন কবিতায় বাইবেলের নির্ভরযোগ্য পুস্তকগুলির নাম উল্লেখ করেছেন। সেই তালিকাতেও তিনি এই পুস্তকটির নাম লিখেন নি। এমফিলোকাস যে কবিতাগুলি লিখে স্লিওকাসের নিকট প্রেরণ করেন সেই কবিতাগুলিতে তিনি এই পুস্তকটি সম্পর্কে তাঁর সন্দেহের কথা উল্লেখ করেছেন। এথানিসিয়াস তাঁর ৩৯তম পত্রে এই পুস্তকটির গ্রহণযোগ্যতা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং পুস্তকটির নিন্দা করেছেন।"

দ্বিতীয় প্রমাণ : আদিপুস্তকের ৩৬ অধ্যায়ের ৩১ আয়াতটি নিম্নরূপ : "ইস্রায়েল-সন্তানদের উপরে কোন রাজা রাজত্ব করিবার পূর্বে ইঁহারা ইদোম দেশের রাজা ছিলেন।"

মোশির লিখিত বলে প্রচারিত তোরাহ্-এর ৫টি পুস্তকের প্রথম পুস্তক 'আদিপুস্তক'-এর এই কথাটি কখনোই মোশির কথা হতে পারে না। একথা স্পষ্ট যে এই কথাটি যিনি লিখেছেন তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদের নিজেদের রাজ্য ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরের যুগের মানুষ। ইস্রায়েল সন্তানদের প্রথম রাজা ছিলেন শৌল (তালুত)। মোশির তিন শত ছাপ্পান্ন (৩৫৬) বছর পরে শৌলের রাজত্ব গ্রহণের মাধ্যমে ইস্রায়েল সন্তানদের প্রথম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪]

---

১. ইহূদীদের একজন পুরোহিত। দেখুন নহিমিয় ১২/১০।

২. নেবুকাদনেযার কর্তৃক বন্দিকৃত একজন ইহূদী। তিনি ব্যবিলন রাজার সাথে নিজের চাচাতো বোন ইস্টেরকে বিবাহ দেন এবং ইহূদীদের মুক্তির ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। ইস্টেরের বিবরণ পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় দেখুন।

৩. প্রথম খৃষ্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু ও যাজক। সার্ডিস, এপোলিনারিস ও হিয়েরাপেলিসের বিশপ ছিলেন। দেখুন : Eusebius Pamphilus. The Ecclesiastical History. p. 162-164.

৪. মোশির মৃত্যুর পরে দীর্ঘ প্রায় তিন শতাব্দী যাবৎ ইস্রায়েল সন্তানগণের মধ্যে কোন রাজা বা রাজত্ব ছিল না। নবী (ভাববাদী) বা বিচারকর্তৃগণ তাদেরকে পরিচালনা করতেন। সর্বশেষ বিচারকর্তা শমূয়েল ভাববাদীর সময়ে ইস্রায়েলীয়গণ তাঁর নিকট একজন রাজা নিয়োগের জন্য আবেদন করেন। তখন কীশের পুত্র শৌল (তালুত) নামক এক ব্যক্তি রাজা মনোনিত হন।

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উপর্যুক্ত আয়াতটির টীকায় লিখেছেন: "আমার দৃঢ় ধারণা হলো, এই আয়াতটি এবং ৩৯ আয়াত পর্যন্ত পরবর্তী আয়াতগুলি মোশি লিখেন নি বরং এই আয়াতগুলি বংশাবলি প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের কিছু আয়াত।[১] আমি অত্যন্ত শক্তভাবে ধারণা করি, বরং বিশ্বাস করি যে, এই আয়াতগুলি তোরাহ্-এর কোন একটি বিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপির পাদটীকায় লেখা ছিল। অনুলিপিকার এগুলিকে মূল পাঠের অংশ মনে করে মূল পাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়।"

এভাবে এই ব্যাখ্যাকার এই ৯টি আয়াতের সংযোজনের কথা স্বীকার করলেন। তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে বুঝা যায় যে, তাঁদের ধর্মগুলি বিকৃতিযোগ্য ও বিকৃতির ঊর্ধ্বে নয়। কারণ এই নয়টি আয়াত তোরাহ্-এর অংশ না হওয়া সত্ত্বেও তা তোরাহের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং এরপর সকল পাণ্ডুলিপিতে তা প্রচারিত হয়েছে।

তৃতীয় প্রমাণ ঃ দ্বিতীয় বিবরণের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪ আয়াতটি নিম্নরূপ : "মনঃশির সন্তান যায়ীর গশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের সীমা পর্যন্ত অর্গোবের সমস্ত অঞ্চল লইয়া আপন নামানুসারে বাশন দেশের সেই সকল স্থানের নাম হব্বোৎ-যায়ীর রাখিল; অদ্য পর্যন্ত (সেই নাম চলিত আছে)।"

মোশির লিখিত বলে প্রচারিত তোরাহ্-এর ৫টি পুস্তকের ৫ম পুস্তক 'দ্বিতীয় বিবরণের'-এর এই কথাটি কখনোই মোশির কথা হতে পারে না (যদিও তা মোশির বক্তব্যের মধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে)। উপরের আয়াতটিতে 'অদ্য পর্যন্ত' কথাটি থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এই কথাটি যিনি বলেছেন বা লিখেছেন তিনি অবশ্যই মনঃশির সন্তান যায়ীরের যুগের অনেক পরের মানুষ। ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ বিস্তারিত গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, অনেক পরের মানুষেরা ছাড়া কেউ এই প্রকারের শব্দাবলি ব্যবহার করে না। অচিরেই পাঠক এ বিষয়ে জানতে পারবেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রমাণে উল্লিখিত এই দুইটি অনুচ্ছেদের বিষয়ে প্রসিদ্ধ গবেষক পণ্ডিত হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলেন : এই দুইটি বক্তব্য বা অনুচ্ছেদ কোন প্রকারেই মোশির কথা হতে পারে না। কারণ প্রথম বক্তব্য প্রমাণ করে যে, এই পুস্তকের লেখক ইস্রায়েল-সন্তানগণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরের যুগের মানুষ ছিলেন। আর দ্বিতীয় বক্তব্য প্রমাণ করে যে, এই পুস্তকের লেখক ইহূদীদের প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপনের পরের যুগের মানুষ ছিলেন। তবে এই দুইটি বক্তব্য ও অনুচ্ছেদকে অতিরিক্ত সংযোজন বলে ধরে নিলেও এই পুস্তকের বিশুদ্ধতায় কোন ত্রুটি দেখা যায় না।

সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টিতে দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবেন যে, এই দুইটি অনুচ্ছেদ শুধু অর্থহীনই নয়; বরং মূল পাঠের মধ্যে বিরক্তিকর সংযোজন বলে গণ্য। বিশেষত দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি। কারণ এটি মোশিই লিখুন আর অন্য যেই লিখুন তিনি 'অদ্য পর্যন্ত'

১. আদিপুস্তকের ৩৬ অধ্যায়ের ৩১-৩৯ আয়াতগুলি বংশাবলি ১ম অধ্যায়ের ৪৩-৫০ আয়াতের অবিকল অনুলিপি মাত্র।

কথাটি বলবেন না। এজন্য যতদূর মনে হয়, এই কথাটি ছিল নিম্নরূপ : "মনঃশির সন্তান যায়ীর গশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের সীমা পর্যন্ত অর্গোবের সমস্ত অঞ্চল লইয়া আপন নামানুসারে বাশন দেশের সেই সকল স্থানের নাম হব্বোৎ-যায়ীর রাখিল।" এরপর অনেক শতাব্দী পরে 'অদ্য পর্যন্ত' কথাটি পাদটীকায় লেখা হয়, যেন জানা যায় যে, যায়ীর যে নাম রেখেছিলেন তা অদ্যাবধি চালু রয়েছে। এরপর এই কথাটি পরবর্তী কপিগুলিতে পাদটীকা থেকে মূল বক্তব্যের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। যদি কারো এ বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে গ্রীক কপিগুলি দেখতে পারেন। তিনি দেখবেন যে, কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে কিছু কথা মূল পাঠের মধ্যে সংযোজিত রয়েছে : আর কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে তা পাদটীকায় রয়েছে।"

এখানে এই গবেষক পণ্ডিত স্বীকার করলেন যে, এই দুইটি অনুচ্ছেদ মোশির কথা হতে পারে না। তিনি বলেছেন : "যতদূর মনে হয়..."। এথেকে জানা যায় যে, তাঁর এই কথার পক্ষে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ বা সূত্র নেই। শুধু অনুমান ও আন্দাজের উপর নির্ভর করেই তিনি এই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এছাড়া তাঁর এই কথা প্রমাণ করে যে, এই পবিত্র ও ঐশ্বরিক পুস্তকগুলি লিখিত হওয়ার শত শত বছর পরেও এগুলিতে সংযোজন, বিয়োজন বা বিকৃতির সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল। কারণ তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, পুস্তকটি লিখিত হওয়ার অনেক শতাব্দী পরে এই কথাটিকে সংযোজন করা হয়েছে। এত পরে সংযোজিত কথাটিও পবিত্র পুস্তকের অংশে পরিণত হয়েছে এবং পরবর্তী সকল কপি ও সংস্করণে প্রচারিত হয়েছে![1]

এখানে পণ্ডিত হর্ন বলেছেন : "এই দুইটি বক্তব্য ও অনুচ্ছেদকে অতিরিক্ত সংযোজন বলে ধরে নিলেও এই পুস্তকের বিশুদ্ধতায় কোন ত্রুটি দেখা যায় না।" এই কথাটি তাঁর অযৌক্তিক গোঁড়ামি প্রমাণ করে। বিষয়টি খুবই স্পষ্ট।

হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের টীকায় লিখেছেন : "শেষ বাক্যটি (অদ্য পর্যন্ত) অতিরিক্ত সংযোজন। মোশির পরের যুগে কেউ কথাটি সংযোজন করেছেন। কথাটিকে বাদ দিলে অর্থের মধ্যে কোন ত্রুটি দেখা দেয় না।"

এখানে আমার কথা হলো, শুধু 'শেষ বাক্যটিকে' অতিরিক্ত সংযোজন বলে চিহ্নিত করা অর্থহীন। এই অনুচ্ছেদটির পুরোটিই সংযোজিত। আমরা দেখেছি, হর্ন স্বীকার করেছেন যে, এই অনুচ্ছেদটি কোনভাবেই মোশির কথা হতে পারে না।

১. বড় অবাক কথা! লক্ষ লক্ষ ধার্মিক মানুষের একটি বিশাল জাতির ধর্মগ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হওয়ার শত শত বছর পরে একজন ধর্মগুরু প্রাজ্ঞ যাজক অনুলিপিকার (!) তার মধ্যে অর্থহীন ও বিরক্তিকর কথা সংযোজন করবেন। এরপর অগণিত প্রাজ্ঞ ধর্মগুরু পাঠক ও অনুলিপিকার কেউ তার প্রতিবাদ করবেন না বরং সকলেই নির্বিচারে তা গ্রহণ করবেন এবং সকল কপিতে তা উল্লেখ করবেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এই অনুচ্ছেদের তথ্যের মধ্যে আরো একটি ভুল রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, "মনঃশির সন্তান যায়ীর'। কথাটি ভুল। যায়ীরের পিতার নাম 'সগূব'। ১ বংশাবলির ২য় অধ্যায়ের ২২ আয়াতে তা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

চতুর্থ প্রমাণ : গণনাপুস্তকের ৩২ অধ্যায়ের ৪১ আয়াত (কোন কোন মুদ্রণে ৪০ আয়াত) নিম্নরূপ : "আর মনঃশির সন্তান যায়ীর গিয়া তথাকার গ্রাম সকল হস্তগত করিল এবং তাহাদের নাম হব্বোৎ-যায়ীর (যায়ীরের গ্রামসমূহ) রাখিল।"

এই আয়াতটির অবস্থাও উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় বিবরণের আয়াতটির মতই। তৃতীয় প্রমাণে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

'বাইবেল ডিক্সনারী' গ্রন্থটি আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ভারতে মুদ্রিত হয়েছে। কালমেন্ট পুস্তকটির রচনা শুরু করেন এবং যাবিট ও টিলার পুস্তকটি সমাপ্ত করেন। পুস্তকটিতে বলা হয়েছে : "মোশির পুস্তকে এমন কিছু কথা পাওয়া যায় যা স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, তা মোশির কথা নয়। যেমন গণনাপুস্তকের ৩২ অধ্যায়ের ৪০ আয়াত, দ্বিতীয় বিবরণের ৩ অধ্যায়ের ১৪ আয়াত। অনুরূপভাবে কিছু কিছু বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, সেগুলি মোশির বাচনভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কোন্ ব্যক্তি এই সকল বাক্য ও অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছেন তা আমরা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি না। কিন্তু জোরালো ধারণা হিসাবে আমরা বলি যে, সম্ভবত ইস্রা ভাববাদী এগুলিকে সংযোজন করেছেন। তাঁর পুস্তকের ৯ম ও ১০ অধ্যায় এবং নহিমিয়ের পুস্তকের ৮ম অধ্যায় থেকে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।"

এভাবে এ সকল পণ্ডিত নিশ্চিত যে, তোরাহ-এর কিছু বক্তব্য ও অনুচ্ছেদ মোশির কথা নয়। তবে এগুলি কে সংযোজন করেছেন সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত ও নির্ধারিত কিছু বলতে পারলেন না; বরং ধারণার ভিত্তিতে বললেন যে, হয়ত ইস্রা এ সকল সংযোজন করেছেন। তাঁদের এই ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন ও বাতুল। ইস্রার পুস্তকের ও নহিমিয়ের পুস্তকের যে অধ্যায়গুলির কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন সেই অধ্যায়গুলি থেকে কখনোই বুঝা যায় না যে, ইস্রা তোরাহ-এর মধ্যে কোনরূপ সংযোজন করেছেন। ইস্রার পুস্তকের ৯ম ও ১০ম অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, তিনি

---

১. ১ বংশাবলির ২য় ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে প্রদত্ত তথ্য থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে, যায়ীর নামক এই ব্যক্তি মোশির পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক মানুষ ছিলেন না বরং তিনি মোশির পরের প্রজন্মের মানুষ ছিলেন। যাকোবের পুত্র লেবি, তাঁর পুত্র কহাৎ, তাঁর পুত্র অম্রান, তাঁর পুত্র মোশি। আর যাকোবের অন্য পুত্র যিহূদা, তাঁর পুত্র পেরস, তাঁর পুত্র হিষ্রোণ, তাঁর পুত্র সগূব, তাঁর পুত্র যায়ীর। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, সগূব ছিলেন মোশির সমসাময়িক এবং তাঁর পুত্র যায়ীর মোশির পরের প্রজন্মের মানুষ। কাজেই একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এই বক্তব্যটির পুরোটিই অনেক পরের সংযোজন। সংযোজনকারী যায়ীরের নাম ও তাঁর মালিকানাধীন গ্রামগুলির নামের বিষয়ে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে কথাটি লিখেছেন। এজন্য তিনি যায়ীরের পিতার নামও ঠিকমত লিখতে পারেন নি। দেখুন ১বংশাবলি ২/১-২৩ও ৬/১-৩।

ইস্রায়েল সন্তানগণের কর্মের জন্য অনুতাপ ও বেদনা প্রকাশ করেছেন এবং পাপের স্বীকারোক্তি করেছেন। নহিমিয়ের পুস্তকের ১০ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, ইস্রা ইস্রায়েল সন্তানগণের সম্মুখে প্রকাশ্যে মোশির তোরাহ বা ব্যবস্থা-পুস্তক পাঠ করেন।

পঞ্চম প্রমাণ : আদিপুস্তকের ২২ অধ্যায়ের ১৪ আয়াতে বলা হয়েছে : "এই জন্য অদ্যাপি লোক বলে, সদাপ্রভুর পর্বতে মানুষদের দেখা পাওয়া আবশ্যক[১] (as it is said this day, In the mount of the LORD it shall be seen.)"

মোশির মৃত্যুর ৪৫০ বছর পরে শলোমন তাঁর প্রসিদ্ধ 'ধর্মধাম' বা মন্দির (মসজিদে আকসা) নির্মাণ করেন। তাঁর মন্দির নির্মাণের পরেই এই পাহাড়টি 'সদাপ্রভুর পর্বত' নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। এর আগে কখনো 'সদাপ্রভুর পবর্ত' কথাটি পরিচিত ছিল না। এজন্য আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইস্রার পুস্তকের ব্যাখ্যার ভূমিকায় এই বাক্যটিকে পরবর্তীকালে সংযোজিত বলে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন : "এই পবর্তটির উপরে ধর্মধাম নির্মাণের পূর্বে তাকে 'সদাপ্রভুর পবর্ত' নামে অভিহিত করা হয় নি।"

৬ষ্ঠ প্রমাণ : দ্বিতীয় বিবরণের ২য় অধ্যায়ের ১২ আয়াতে বলা হয়েছে : "আর পূর্বে হোরীয়েরাও সেয়ীরে বাস করিত, কিন্তু এষৌর সন্তানগণ তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত ও আপনাদের সম্মুখ হইতে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের স্থানে বাস করিল; যেমন ইস্রায়েল সদাপ্রভুর দত্ত আপন অধিকার-ভূমিতে করিল।"

আদম ক্লার্ক ইস্রার পুস্তকের ব্যাখ্যার ভূমিকায় এই বাক্যটিকে পরবর্তীকালে সংযোজিত বলে উল্লেখ করেছেন। "যেমন ইস্রায়েল সদাপ্রভুর দত্ত আপন অধিকার-ভূমিতে করিল" এই কথাটিকে তিনি পরবর্তী সংযোজনের প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

৭ম প্রমাণ : দ্বিতীয় বিবরণের ৩ অধ্যায়ের ১১ আয়াত নিম্নরূপ : "অবশিষ্ট রাফায়ীয়দের মধ্যে কেবল বাশনের রাজা ওগ মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন; দেখ, তাহার খট্টা লৌহময়; তাহা কি অম্মোন সন্তানগণের রব্বা নগরে নাই? মনুষ্যের হস্তের পরিমাণানুসারে তাহা দীর্ঘে নয় হস্ত ও প্রস্থে চারি হস্ত।"

আদম ক্লার্ক ইস্রার পুস্তকের ব্যাখ্যার ভূমিকায় বলেন : এই বাচনভঙ্গি এবং বিশেষ করে শেষ কথাটি প্রমাণ করে যে, রাজা ওগ-এর মৃত্যুর অনেক পরে এই কথাগুলি লেখা হয়েছে এবং মোশি এই কথাগুলি লিখেন নি। কারণ মোশি ৫ মাসের মধ্যে মৃত্যু বরণ করেন।

৮ম প্রমাণ : গণনাপুস্তকের ২১ অধ্যায়ের ৩ আয়াত নিম্নরূপ : "তখন সদাপ্রভু ইস্রায়েলের রবে কর্ণপাত করিয়া সেই কনানীয়দিগকে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে ইস্রায়েল তাহাদিগকে ও তাহাদের সমস্ত নগর নিঃশেষে বিনষ্ট করিল এবং সেই স্থানের নাম হর্মা (বিনষ্ট) রাখিল।"

১. ইংরেজী ও আরবী পাঠের অনুবাদ। বাংলা বাইবেলে এখানে অর্থ পরিবর্তন করা হয়েছে।

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৬৯৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন : "আমি নিশ্চিতরূপে জানি যে, এই আয়াতটি যিহোশূয়ের মৃত্যুর পরে সংযোজন করা হয়েছে, কারণ মোশির জীবদ্দশায় সকল কনানীয় বিনষ্ট হয় নি, বরং তাঁর মৃত্যুর পরে তারা বিনষ্ট হয়েছে।"

৯ম প্রমাণ : যাত্রাপুস্তকের ১৬ অধ্যায়ের ৩৫ আয়াত নিম্নরূপ : "ইস্রায়েল সন্তানেরা চল্লিশ বৎসর, যাবৎ নিবাস-দেশে উপস্থিত না হইল, তাবৎ সেই মান্না ভোজন করিল; কনান দেশের সীমাতে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তাহারা মান্না খাইত।"

এই আয়াতটি মোশির কথা নয়। কারণ মোশির জীবদ্দশায় মান্না ভোজন বন্ধ হয় নি এবং তাঁর জীবদ্দশায় ইস্রায়েল-সন্তানেরা কনান দেশের সীমাতে উপস্থিতও হয় নি।

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩৯৯ পৃষ্ঠায় বলেন : "এই আয়াতের কারণ মানুষেরা মনে করেন যে, ঈশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য মান্না প্রেরণ বন্ধ করার পরে 'যাত্রাপুস্তক' লেখা হয়েছে। কিন্তু হতে পারে যে, ইষ্রা এই কথাগুলি সংযোজন করেছেন।"

আমার কথা হলো, এখানে 'মানুষদের ধারণা' সঠিক। আর আদম ক্লার্ক যে সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন তা প্রমাণহীন ও ভিত্তিহীন একটি সম্ভাবনা। এই স্থলে এইরূপ প্রমাণবিহীন সম্ভাবনা গ্রহণযোগ্য নয়। সঠিক কথা হলো, মোশির নামে প্রচারিত এই ৫টি পুস্তক মোশির রচিত নয়। প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রমাণসহ আমি বিষয়টি আলোচনা করেছি।

১০ম প্রমাণ : গণনাপুস্তকের ২১ অধ্যায়ের ১৪ আয়াতটি নিম্নরূপ : "এই জন্য সদাপ্রভুর যুদ্ধপুস্তকে উক্ত আছে; শূফাতে রাহেব, আর অর্ণোনের উপত্যকা সকল।"

এই আয়াতটি কখনোই মোশির কথা হতে পারে না। উপরন্তু এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, মোশি গণনাপুস্তকের লেখক বা রচয়িতা নন। কারণ গণনাপুস্তকের লেখক এখানে 'সদাপ্রভুর যুদ্ধ পুস্তক' নামক অন্য একটি পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এই পুস্তকটি কে লিখেছেন? কোন যুগে? কোথায়? আজ পর্যন্ত এ সকল বিষয়ে কোন কিছুই নিশ্চিতরূপে জানা যায় নি। ইহূদী– খৃস্টানগণের নিকট এই পুস্তকটি হলো কাল্পনিক 'আনকা' পক্ষীর ন্যায়, যার নাম শোনা যায়, কিন্তু দেখা যায় না। ইহূদী-খৃস্টানগণ 'সদাপ্রভুর যুদ্ধপুস্তক' নামক এই পুস্তকের নামই শুনেছিল, কিন্তু কেউ কোনদিন তা চোখে দেখেন নি এবং এর কোন অস্তিত্বও তাঁদের নিকট নেই।

আদম ক্লার্ক আদিপুস্তকের ব্যাখ্যার ভূমিকায় এই আয়াতটিকে পরবর্তীকালে সংযোজিত বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি বলেন : "সম্ভবত 'সদাপ্রভুর যুদ্ধপুস্তক' কথাটি টীকায় লেখা ছিল, এরপর তা মূল পাঠে প্রবেশ করেছে।"

এভাবে তিনি স্বীকার করলেন যে, তাঁদের ধর্মগ্রন্থগুলিতে এইরূপ বিকৃতি ও সংযোজন করা সম্ভব ছিল। তিনি নিজেই স্বীকার করলেন যে, টীকার কথা মূল পাঠে প্রবেশ করল এবং এরপর সকল পাণ্ডুলিপিতে তা প্রচারিত হয়ে গেল।

১১শ প্রমাণ : আদিপুস্তকের ১৩ অধ্যায়ের ১৮ আয়াতে, ৩৫ অধ্যায়ের ২৭ আয়াতে এবং অধ্যায়ের ১৪ আয়াতে 'হিব্রোণ' নামক স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে। হিব্রোণ প্যালেস্টাইনের একটি গ্রাম। পূর্বযুগে এই গ্রামটির নাম ছিল 'কিরিয়ৎ-অর্ব'। মোশির মৃত্যুর পরে যিহোশূয়ের নেতৃত্বে ইস্রায়েল সন্তানগণ প্যালেস্টাইন দখল করে 'কিরিয়ৎ-অর্ব' নাম পরিবর্তন করে গ্রামটির নাম রাখেন 'হিব্রোণ'। যিহোশূয়ের পুস্তকের ১৪ অধ্যায়ে বিষয়টি উল্লখ করা হয়েছে।

এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই আয়াতগুলি মোশির কথা নয়; বরং ইহূদীগণ প্যালেস্টাইন দখল করার পরে এবং এই গ্রামের নাম পরিবর্তন করার পরে কোন ব্যক্তি এই কথাগুলি বলেছেন বা লিখেছেন।

অনুরূপভাবে আদিপুস্তকের ১৪ অধ্যায়ের ১৪ আয়াতে 'দান' নামক একটি স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে। এই দান শহরের অস্তিত্বও মোশির যুগে ছিল না। বিচারকর্তৃগণের যুগে এই 'দান' শহরটির পত্তন ও আবাদ হয়। বিচারকর্তৃগণের নেতৃত্বে ইস্রায়েল-সন্তানগণ 'লয়িশ' নামক শহর জবরদখল করেন। তারা সেই শহরের সকল বাসিন্দাকে হত্যা করেন এবং শহরটি পুড়িয়ে বিনষ্ট করেন। এরপর তারা 'লয়িশের' পরিবর্তে নতুন শহরের পত্তন করেন এবং তা নাম রাখেন 'দান'। 'বিচারকর্তৃগণের বিবরণ'-এর ১৮ অধ্যায়ে এ কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আদিপুস্তকের ১৪ অধ্যায়ের ১৪ আয়াতটি মোশির কথা হতে পারে না।

হর্ন তাঁর ব্যাখ্যায় বলেন : "হতে পারে যে, মোশি লিখেছিলেন : 'কিরিয়ৎ-অর্ব' এবং 'লয়িশ'। কিন্তু পরবর্তীকালে কোন একজন অনুলিপিকার শব্দ দুইটিকে পরিবর্তন করে 'হিব্রোণ' ও 'দান' লিখে দিয়েছে।"

প্রাজ্ঞ পাঠক, একটু লক্ষ্য করুন! এ সকল মহাজ্ঞানী ও ক্ষমতাধর পণ্ডিতের ওজর-আপত্তি ও ব্যাখ্যাগুলি দেখুন! কিভাবে তাঁরা এ সকল দুর্বল ওজরগুলি পেশ করেছেন এবং সাথে সাথে বিকৃতির স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। তাঁদের কথাই প্রমাণ করে যে, তাঁদের ধর্মগ্রন্থগুলি বা বাইবেলের পুস্তকগুলি বিকৃত করা ছিল খুবই সহজ।

১২শ প্রমাণ : আদিপুস্তকের ১৩ অধ্যায়ের ৭ আয়াতে রয়েছে ঃ "তৎকালে সেই দেশে কনানীয়েরা ও পরিষীয়েরা বসতি করিত।"

আর আদিপুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ৬ আয়াতে রয়েছে : "তৎকালে কনানীয়েরা সেই দেশে বাস করিত।"

এই দুইটি বাক্য প্রমাণ করে যে, এই আয়াতদ্বয় মোশির কথা নয়, বরং পরবর্তীকালে সংযোজিত। খৃস্টান ব্যাখ্যাকারগণ এই সংযোজনের কথা স্বীকার করেছেন। হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে: "এই বাক্যটি 'তৎকালে কনানীয়েরা সেই দেশে বাস করিত' এবং অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে অনেক বাক্য পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে সমন্বয় সাধনের জন্য। ইস্রা অথবা অন্য কোন

ঐশ্বরিক প্রেরণা-প্রাপ্ত ব্যক্তি পবিত্র পুস্তক বা বাইবেল সংকলনের সময় এগুলি সংযোজন করেছেন।"

এখানে তাঁরা স্বীকার করলেন যে, বাক্যগুলি সংযোজিত। তাঁরা দাবি করেছেন যে, 'ইয্রা অথবা অন্য কোন ঐশ্বরিক প্রেরণা-প্রাপ্ত ব্যক্তি তা সংযোজন করেছেন'। তাঁদের এই দাবির পক্ষে কোন দুর্বলতম প্রমাণও তাঁরা পেশ করতে পারেন নি। তাঁদের এই 'ধারণাটুকুই' তাঁদের একমাত্র অবলম্বন।[১]

১৩শ প্রমাণ : আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৭৪৯ পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয় বিবরণের প্রথম অধ্যায়ের ব্যাখ্যার শুরুতে বলেন : "এই অধ্যায়ের শুরুতে প্রথম ৫টি আয়াত এই পুস্তকের ভূমিকাস্বরূপ। এই আয়াতগুলি মোশির কথা নয়। সম্ভবত যিহোশূয় অথবা ইয্রা এই আয়াতগুলি সংযোজন করেছিলেন।"

এখানে তিনি স্বীকার করলেন যে, এই আয়াতগুলি মোশির কথা নয়, বরং পরবর্তীকালে সংযোজিত। তিনি কোনরূপ দলিল-প্রমাণ ছাড়াই একান্ত অনুমানের উপর ভিত্তি করে বললেন যে, যিহোশূয় অথবা ইয্রা এই সংযোজন করেছেন। তাঁর এই প্রমাণহীন ও ভিত্তিহীন অনুমান এক্ষেত্রে মূল্যহীন।

১৪শ প্রমাণ : দ্বিতীয় বিবরণের ৩৪ অধ্যায়টি মোশির কথা নয়।[২] আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলেন : "পূর্ববর্তী অধ্যায়েই মোশির কথা শেষ হয়েছে। এই অধ্যায়টি মোশির কথা নয়। এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, মোশি ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা লাভ করে এই অধ্যায়টিও লিখেছেন। কারণ এই সম্ভাবনা সত্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা থেকে

---

১. সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, তাঁরা যদি কোন সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তনের কোনরূপ ওজর বা ব্যাখ্যা পেশ করতে না পারেন, তবে তাকে বিকৃতি বলে স্বীকার করে ভুলটি "অনুলিপিকারের" ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। আর যেখানে এইরূপ সংযোজন, বিয়োজন বা বিকৃতির মধ্যে সুস্পষ্ট কোন ভুল ধরা পড়ে না সেখানে তারা এই সংযোজনের দায়িত্ব নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট ভাববাদী বা কোন একজন 'ঐশ্বরিক প্রেরণাপ্রাপ্ত' ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। এর উল্টো কেন হলো না তা আমরা বুঝি না। কেউ যদি দাবি করেন যে, সবগুলিই লিপিকারদের বা সবগুলিই ভাববাদিগণের কর্ম, তবে তা ভুল প্রমাণ করা হবে কিভাবে? আর ভাববাদিগণের বা 'ঐশ্বরিক প্রেরণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের' নির্ভুলতারই বা প্রমাণ কোথায়? যে ইয্রার নাম তাঁরা বারংবার বলেন তিনি আরো দুইজন ভাববাদীর সহযোগিতায় যে 'বংশাবলি' পুস্তক রচনা করেছেন তার মধ্যে অনেক ভুল রয়েছে বলে আমরা দেখেছি। এছাড়া তোরাহ বা পবিত্র পুস্তকগুলি ভাববাদিগণ বা যাজকগণ ছাড়া কেউ লিখতেন বা অনুলিপি করতেন? আর কোন অনুলিপিকার যদি ভুল করেই ফেলেন তাহলে পরবর্তী ভাববাদিগণ ও যাজকগণ তা সংশোধন করলেন না কেন? ভাববাদিগণ পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপুস্তকের মধ্যে এভাবে বিভিন্ন কথা সংযোজন করতে পারলেন, কিন্তু পবিত্র পুস্তকের মধ্যে অনুলিপিকারদের এত বিকৃতি সংশোধন করতে পারলেন না?

২. এই অধ্যায়ে মোশির মৃত্যু, মৃত্যুর পরে ত্রিশ দিন যাবৎ ইহুদীদের শোকপালন, যুগের আবর্তনে মোশির কবর হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

অনেক দূরে। এইরূপ কথা দাবি করলে পুরো বিষয়টিই অর্থহীন হয়ে যাবে। কারণ পবিত্র আত্মা পরবর্তী পুস্তক যে ব্যক্তিকে অনুপ্রেরণার মাধ্যমে প্রদান করবেন তাকেই এই অধ্যায়ও অনুপ্রেণার মাধ্যমে প্রদান করবেন। আমি নিশ্চিত যে, এই অধ্যায়টি যিহোশূয়ের পুস্তকের প্রথম অধ্যায় ছিল। জনৈক বিচক্ষণ ইহুদী পণ্ডিত এই স্থানে যে টীকা লিখেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন : "অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার বলেছেন : ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ যে আশীর্বাদ মোশি করেছেন ইস্রায়েল সন্তানদের দ্বাদশ গোত্রের জন্য সেই আশীর্বাদেই দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকটি শেষ হয়েছে। এই আশীর্বাদের শেষে তিনি বলেছেন : "হে ইস্রায়েল, ধন্য তুমি; তোমার তুল্য কে? তুমি সদাপ্রভু কর্তৃক নিস্তারপ্রাপ্ত জাতি..."[১] এই আয়াতই দ্বিতীয় বিবরণের শেষ। পরবর্তীকালে মোশির মৃত্যুর অনেক পরে '৭০ গোত্রপতি'[২] এই ৩৪ অধ্যায়টি রচনা করেন। তখন এই অধ্যায়টি যিহোশূয়ের পুস্তকের প্রথম অধ্যায় ছিল।[৩] কিন্তু তা স্থানান্তরিত হয়ে এই স্থানে চলে এসেছে।"[৪]

এভাবে ইহুদী ও খৃস্টানগণ একমত যে, মোশির নামে প্রচারিত তোরাহ-এর এই অধ্যায়টি মোশির রচিত নয়, বরং পরবর্তীকালে সংযোজিত। আদম ক্লার্ক বলেছেন : "আমি নিশ্চিত যে, এই অধ্যায়টি যিহোশূয়ের পুস্তকের প্রথম অধ্যায় ছিল।" অনুরূপভাবে তিনি জনৈক বিচক্ষণ ইহুদী পণ্ডিতের মতামত উদ্ধৃত করেছেন যে, "৭০ গোত্রপতি এই অধ্যায়টি রচনা করেন। তখন এই অধ্যায়টি যিহোশূয়ের পুস্তকের প্রথম অধ্যায় ছিল।" উভয় দাবিই ভিত্তিহীন ও প্রমাণ-বিহীন অনুমান ও কল্পনা মাত্র।

---

১. দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩/২৯।

২. মোশি ৭০ গোত্রপতির একটি 'কাউন্সিল' গঠন করেন বিচারকর্তৃগণকে সাহায্য করার জন্য। পরবর্তীকালে সকল যুগে ইস্রায়েলীদের মধ্যে এইরূপ 'কাউন্সিল' ছিল।

৩. আদম ক্লার্ক, জনৈক ইহুদী পণ্ডিত ও অন্যান্যদের এই দাবি একেবারেই ভিত্তিহীন। দ্বিতীয় বিবরণের ৩৪ অধ্যায়ের ৫-৬ আয়াত প্রমাণ করে যে, এই অধ্যায়টি যিহোশূয়ের অনেক শতাব্দী পরে লেখা হয়েছে। এই আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে : "তখন সদাপ্রভুর দাস মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে মরিলেন। আর তিনি মোয়াব দেশে বৈৎপিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাঁহাকে কবর দিলেন। কিন্তু তাঁহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না (but no man knoweth of his sepulchre unto this day.)। মোশির মৃত্যুর মাত্র ১৫/১৬ বছর পরে যিহোশূয় মৃত্যুবরণ করেন। গণনা পুস্তকের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৭ লক্ষাধিক ইস্রায়েল সন্তান মোশির সাথে মিসর থেকে আগমন করেন। একথা কি কল্পনা করা সম্ভব যে, ১৫/১৬ বছরের মধ্যে এই ৭ লক্ষ ইস্রায়েল সন্তান তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা, ভাববাদী ও মুক্তিদাতার কবরের স্থানটি ভুলে গেলেন? এমনকি মোশির নিকটতম পরিচারক যিহোশূয়ও কবরটির স্থান পর্যন্ত ভুলে গেলেন! শুধু তাই নয়, উপরন্তু তিনি তাঁর পুস্তকে নির্বিকার চিত্তে কথাটি লিপিবদ্ধ করলেন!

৪. কত সহজ বিষয়! একটি ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় ইচ্ছামত এক পুস্তক থেকে অন্য পুস্তকে ঢুকে পড়ে!

তাঁদের এই দাবি যে প্রমাণহীন অনুমান মাত্র যা বুঝা যায় হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণের বক্তব্য থেকে। তাঁরা বলেন : "মোশির কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই শেষ হয়েছে। এই অধ্যায়টি পরবর্তীকালে সংযোজিত। সংযোজনকারী সম্ভবত যিহোশূয়, অথবা শমূয়েল অথবা ইয্রা, অথবা তাঁদের পরের যুগের অন্য কোন ভাববাদী (নবী)।[১] এ বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছুই জানা যায় না। শেষ আয়াতগুলি সম্ভবত ইস্রায়েল-সন্তানদের ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে সংযোজন করা হয়েছে।"

ডাওয়ালি ও রজার্ডমেন্ট-এর ভাষ্যগ্রন্থেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। পাঠক এখানে এ সকল পণ্ডিতের কথাগুলি একটু চিন্তা করুন! তাঁরা বললেন : "সংযোজনকারী সম্ভবত যিহোশূয়, অথবা...অথবা...অথবা..."। এভাবে আমরা দেখছি যে, তাঁরা কোন সম্ভাবনাই নিশ্চিতরূপে বলতে পারছেন না, বরং তাঁদের সন্দেহ ও ধারণা প্রকাশ করছেন। কাজেই আদম ক্লার্ক বা ইহূদী পণ্ডিতের নিশ্চিত কথার ভিত্তি কোথায়?

এখানে পণ্ডিতগণ বলেছেন : "অথবা তাঁদের পরের যুগের অন্য কোন ভাববাদী।" এই কথাটিও ভিত্তিহীন প্রমাণ বিহীন কল্পনা মাত্র।

সুপ্রিয় পাঠক! এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাইবেলের পুস্তকগুলির মধ্যে সংযোজন ও বৃদ্ধির প্রমাণ হিসাবে দ্বিতীয় প্রমাণ থেকে ১৩শ প্রমাণ পর্যন্ত যা কিছু আমি উল্লেখ করেছি তা ইহূদী-খৃস্টানগণের প্রচলিত দাবির ভিত্তিতে। তাঁরা দাবি করেন যে, পুরাতন নিয়মের প্রথম ৫টি পুস্তক মোশির লেখা। তাঁদের দাবির ভিত্তিতে আমরা প্রমাণ করলাম যে, মোশির পরে এ সকল পুস্তকের মধ্যে অনেক কিছু সংযোজন করা হয়েছে।

ইহূদী-খৃস্টানদের দাবি বাদ দিলে এ সকল বিষয়-প্রমাণ করে যে, প্রচলিত এই পুস্তক ৫টি মোশির রচিত নয়। এই পুস্তকগুলিকে মোশির লেখা বলে দাবি করা ভিত্তিহীন বিভ্রান্তি মাত্র। মুসলিম পণ্ডিতগণ এই মতটিকেই সঠিক বলে গ্রহণ করেন। ৯ম প্রমাণের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, এ সকল আয়াত ও অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে কোন কোন ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতও মুসলিম পণ্ডিতদের এই মতের অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

---

১. ... অথবা কোন লিপিকার, অথবা কোন ধর্মত্যাগী মূর্তিপূজক রাজা, অথবা কোন শয়তান...। এই কথাগুলি পড়ে মনে পড়ে মোল্লা দোপেয়াজী ও বাদশাহ আকবরের মধ্যকার সংলাপ। বাদশাহ বললেন, এদেশে মোট কাকের সংখ্যা কত? মোল্লা দোপেয়াজী একটি কাল্পনিক সংখ্যা বললেন : এক লক্ষ... এত হাজার...এত...। আপনার সন্দেহ হলে গুণে দেখুন। যদি বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে বাইরের কোন কাক এদেশে বেড়াতে এসেছে। আর যদি কম হয় তাহলে বুঝতে হবে এদেশের কোন কাক বাইরে বেড়াতে গিয়েছে। এ সকল পণ্ডিতের ভিত্তিহীন কাল্পনিক সম্ভাবনাগুলির সাথে মোল্লা দোপেয়াজীর কথার কি কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়?

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ দাবি করেন যে, কোন একজন নবী সম্ভবত এগুলি সংযোজন করেছেন। যতক্ষণ না তাঁরা এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পেশ করতে পারছেন ততক্ষণ তাঁদের এই দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। তাঁদেরকে বিশুদ্ধ সূত্র দিয়ে নির্দিষ্ট কোন ভাববাদীর নাম উল্লেখ করে প্রমাণ করতে হবে যে, অমুক ভাববাদী অমুক সময়ে এই কথাটি সংযোজন করেছিলেন। একথা তাঁরা কখনোই প্রমাণ করতে পারবেন না।

১৫শ প্রমাণ : আদম ক্লাক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৭৭৯ ও ৭৮০ পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয় বিবরণের ১০ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় কেনিকটের একটি সুদীর্ঘ পর্যালোচনা উদ্ধৃত করেছেন। এই দীর্ঘ আলোচনার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ : এই অধ্যায়ের ক্ষেত্রে শমরীয় সংস্করণের পাঠ বিশুদ্ধ আর হিব্রু বাইবেলের পাঠ ভুল। এই অধ্যায়ের ৫ম আয়াত ও ১০ আয়াতের মধ্যবর্তী চারিটি আয়াত, অর্থাৎ ৬-৯ আয়াত নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে সংযোজিত। এই আয়াত চারিটি ফেলে দিলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বক্তব্যের মধ্যে সুন্দর ধারাবাহিকতা ও সমন্বয় সাধিত হয়। লিপিকারের ভুলে[১] এই আয়াতগুলি এখানে লিখিত হয়েছে। এই আয়াতগুলি ছিল দ্বিতীয় বিবরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে।"

আদম ক্লার্ক কেনিকটের এই আলোচনা উদ্ধৃত করে তাঁর মতামতটির বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন : "এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যানের জন্য ব্যস্ত হবেন না।"

১৬শ প্রমাণ : দ্বিতীয় বিবরণের ২৩ অধ্যায়ের ২য় আয়াতটি নিম্নরূপ : "জারজ ব্যক্তি সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিবে না; তাহার দশম পুরুষ পর্যন্তও সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

এই বিধানটি কখনোই ঈশ্বরের পক্ষ থেকে হতে পারে না[২] এবং মোশিও তা লিখেন নি। এ কথাটি ঈশ্বর প্রদত্ত বা মোশি লিখিত হলে প্রমাণিত হবে যে, ইহুদী খৃষ্টানগণের মূল গৌরব দায়ূদ সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করতে পারবেন না। কারণ, মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, দায়ূদ পেরসের দশম পুরুষ। আর আদি পুস্তকের ৩৮ অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পেরস যিহূদার অবৈধ ও জারজ সন্তান ছিলেন।[৩]

বাইবেল ভাষ্যকার হার্সলি উল্লেখ করেছেন যে, "তাঁহার দশম পুরুষ পর্যন্তও সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পারিবে না" এই কথাটুকু পরবর্তীকালের অতিরিক্ত সংযোজন।[৪]

১৭শ প্রমাণ : যিহোশূয়ের পুস্তকের ৪র্থ অধ্যায়ের ৯ম আয়াতের[৫] টীকায় হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ বলেন : "সে সকল অদ্যাপি সে স্থানে আছে" এই

১. অথবা কোন ভাববাদী কর্তৃক! অথবা কোন ধর্মত্যাগী রাজা কর্তৃক...!!

২. একজনের অপরাধে অন্যকে শাস্তি দেওয়া কখনো ঐশ্বরিক বিধান হতে পারে না।

৩. দেখুন আদিপুস্তক ৩৮/১২-৩০ ; মথি ১/৩/-৬।

৪. "জারজ ব্যক্তি সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিবে না" এই কথাটুকু ঐশ্বরিক বিধান হতে পারে না। জারজ ব্যক্তি তার জন্মের জন্য পাপী নয়। জারজ ব্যক্তিকে পাপী বলে গণ্য করা পিতা-মাতার অপরাধে সন্তানকে শাস্তি প্রদানের মত অনৈতিক কর্ম।

৫. সেই স্থানে যিহোশূয় বারোখানি প্রস্তর স্থাপন করিলেন; সে সকল অদ্যাপি সে স্থানে আছে।

বাক্যটি এবং এইরূপ বাক্যাবালি পুরাতন নিয়মের অধিকাংশ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। যতদূর বুঝা যায়, এগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত।"

এখানে এসকল পণ্ডিত স্বীকার করলেন যে, এই বাক্যটি পরবর্তীকালে সংযোজিত। তাঁরা আরো স্বীকার করলেন যে, পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত এই প্রকারের বাক্যগুলি সবই পরবর্তীকালে সংযোজিত। এছাড়া তাঁরা স্বীকার করলেন যে, এইরূপ সংযোজন পুরাতন নিয়মের অনেক স্থানে ঘটেছে।

এইরূপ সংযোজন দেখা যায় যিহোশূয়ের পুস্তকের ৫ম অধ্যায়ের ৯ম আয়াতে, ৮ম অধ্যায়ের ২৮ ও ২৯ আয়াতে, ১০ম অধ্যায়ের ২৭ আয়াতে, ১৩শ অধ্যায়ের ১৩শ আয়াতে, ১৪শ অধ্যায়ের ১৪শ আয়াতে, ১৫শ অধ্যায়ের ৬৩ আয়াতে ও ১৬শ অধ্যায়ের ১৯ম আয়াতে।

এভাবে তাঁদের স্বীকৃতি অনুসারে শুধু 'যিহোশূয়ের পুস্তকের' মধ্যেই আরো ৮টি স্থানে পরবর্তী যুগে এইরূপ বাক্যাদি সংযোজনের মাধ্যমে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। যদি পুরাতন নিয়মের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ সংযোজন ও বিকৃতির কথা উল্লেখ করি তাহলে তালিকা অত্যন্ত লম্বা হয়ে যাবে।

১৮শ প্রমাণ : যিহোশূয়ের পুস্তকের ১০ম অধ্যায়ের ১৩ আয়াতটি নিম্নরূপ ; "তখন সূর্য স্থগিত হইল, ও চন্দ্র স্থির থাকিল, যাবৎ সেই জাতি শত্রুদিগের প্রতিশোধ না লইল। এই কথা কি 'যাশের গ্রন্থে' (Book of Jasher) লিখিত হয় নাই?"

এই গ্রন্থের নাম বাইবেলের বিভিন্ন আরবী অনুবাদে বিভিন্নভাবে লেখা হয়েছে। কোথাও 'আল-ইয়াসির-এর পুস্তক' কোথাও 'ইয়াসার-এর পুস্তক' এবং কোথাও 'ইয়াশির-এর পুস্তক' লেখা হয়েছে (কোন অনুবাদে 'পূণ্যবানদের পুস্তক' এবং কোন অনুবাদে 'সুপথের পুস্তক' বলা হয়েছে)। সর্বাবস্থায় এই কথাটি যিহোশূয়ের কথা হতে পারে না; কারণ এই আয়াতটির লেখক যিহোশূয়ের জীবনের এই ঘটনাটি উপরোল্লিখিত পুস্তকটি থেকে উদ্ধৃত করেছেন।[১]

এই পুস্তকটির লেখক কে? কোন যুগে তিনি পুস্তকটি রচনা করেছিলেন? এ সকল বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। তবে শমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ১৮ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, এই অজ্ঞাত পরিচয় গ্রন্থের লেখক 'যাশের' দায়ূদ-এর (আ) সমসাময়িক ছিলেন বা তাঁর পরের যুগের ছিলেন।[২] এ থেকে বুঝা যায় যে, যিহোশূয়ের গ্রন্থের লেখক দায়ূদের পরবর্তী যুগের মানুষ ছিলেন।

---

১. স্বভাবতই যিহোশূয় নিজের জীবনের ঘটনা অন্য কোন পুস্তকের বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করবেন না।

২. "পরে দায়ূদ শৌলের ও তাঁহার যোনাথনের বিষয়ে এই বিলাপ-গাথায় বিলাপ করিলেন; এবং যিহূদার সন্তানদিগকে এই ধনুর্গীত শিখাইতে আজ্ঞা দিলেন; দেখ তাহা যাশের গ্রন্থে লিখিত আছে।" এ থেকে বুঝা যায় যে, দায়ূদের এই কর্ম ও শিক্ষার কথাটি যাশের তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি দায়ূদের সমসাময়িক বা তাঁর পরের যুগের মানুষ না হলে দায়ূদের ঘটনা কিভাবে লিখবেন?

যিহোশূয়ের পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের ৬৩ আয়াতের টীকায় হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ স্বীকারোক্তি প্রদান করে বলেন : "এই অনুচ্ছেদ থেকে জানা যায় যে, দায়ূদের রাজত্বলাভের ৭ম বছরের পূর্বে যিহোশূয়ের পুস্তকটি লেখা হয়েছিল।" প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের লেখা ইতিহাস বিষয়ক পুস্তকগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিহোশূয়ের মৃত্যুর ৩৫৮ বছর পরে দায়ূদের জন্ম।

এখানে উল্লেখ্য যে, যিহোশূয়ের পুস্তকের ১০ম অধ্যায়ের ১৫ নং আয়াতটিও খৃষ্টান গবেষক পণ্ডিতগণের স্বীকারোক্তি অনুসারে পরবর্তী যুগের সংযোজন ও বিকৃতি। হিব্রু সংস্করণে এই আয়াতটিকে সংযোজন করা হয়েছে। গ্রীক অনুবাদে এই আয়াতটি নেই। বাইবেল ব্যাখ্যাকার হার্সলি তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২৬০ পৃষ্ঠায় বলেন : "কাজেই গ্রীক অনুবাদ অনুসারে বাইবেল থেকে এই আয়াতটি ফেলে দেওয়া দরকার।"

১৯শ প্রমাণ : বাইবেল ব্যাখ্যাকার হার্সলি বলেন : "যিহোশূয়ের পুস্তকের ১৩শ অধ্যায়ের ৭ম ও ৮ম আয়াতদ্বয় ভুল।

২০শ প্রমাণ : গাদ সন্তানগণের অধিকারের বিষয়ে যিহোশূয়ের পুস্তকের ১৩ অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে বলা হয়েছে : "এবং রব্বার সম্মুখস্থ অরোয়ের পর্যন্ত অম্মোন-সন্তানদের অর্ধ দেশ তাহাদের অঞ্চল হইল।"

এই কথাটি ভুল ও বিকৃত। মোশি গাদ সন্তানগণকে কখনোই অম্মোন-সন্তানদের দেশের কোন অংশ প্রদান করেন নি। কারণ ঈশ্বর তাঁকে অম্মোন-সন্তানদের দেশের কোন অংশ অধিকার করতে বা বন্টন করতে নিষেধ করেছিলেন। দ্বিতীয় বিবরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ক ঈশ্বরের নির্দেশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

যিহোশূয়ের পুস্তকের এই আয়াতটি বিকৃত ও ভুল হওয়ার কারণে বাইবেল ব্যাখ্যাকার হার্সলি অনন্যোপায় হয়ে বলেছেন : "এই স্থানে হিব্রু পাঠটি বিকৃত।"

২১শ প্রমাণ : যিহোশূয়ের পুস্তকের ১৯ অধ্যায়ের ৩৪ আয়াতে নপ্তালি-সন্তানগণের এলাকার সীমা বর্ণনায় বলা হয়েছে; "ও সূর্যোদয়ের দিকে যর্দন সমীপস্থ যিহূদা পর্যন্ত গেল।"

এই কথাটি ভুল। কারণ যিহূদা রাজ্যের সীমা দক্ষিণ দিকে আরো অনেক দূরে ছিল। এজন্য আদম ক্লার্ক বলেছেন; "যতদূর মনে হয়, মূল পাঠের শব্দের মধ্যে কোন বিকৃতি ঘটেছে।"

২২শ প্রমাণ : যিহোশূয়ের পুস্তকের শেষ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ বলেন : "এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শেষ ৫টি আয়াত যিহোশূয়ের কথা নয় বরং পীনহস অথবা শমূয়েল এগুলিকে পরে সংযোজন করেছেন। এই প্রকারের সংযোজন প্রাচীনকালের মানুষদের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল।"

---

১. "যখন তুমি অম্মোন-সন্তানদের সম্মুখে উপস্থিত হও, তখন তাহাদিগকে ক্লেশ দিও না, তাহাদের সহিত বিরোধ করিও না; কারণ আমি তোমাকে অধিকারার্থে অম্মোন-সন্তানদের দেশের অংশ দিব না, কেননা আমি লোটের সন্তানদেরকে তাহা অধিকার করিতে দিয়াছি।" দ্বিতীয় বিবরণ ২/১৯।

তাহলে তাঁরা নিশ্চিত যে, এই আয়াত ৫টি পরবর্তীকালে সংযোজিত। তাঁরা দাবি করেছেন যে, পীনহস বা শমূয়েল সেগুলি সংযোজন করেছেন। তাঁদের এই দাবি ভিত্তিহীন কল্পনা ও অনুমান মাত্র, এর পক্ষে কোন সূত্র বা প্রমাণ নেই।

তাঁরা আরো বলেছেন যে, এইরূপ সংযোজন প্রাচীনকালে খুবই প্রচলিত ছিল। আমি তাঁদের এই কথার সাথে যোগ করতে চাই যে, এই প্রচলনই তাঁদের ধর্মগ্রন্থগুলির বিকৃতির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। একজনের রচিত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে অন্যের সংযোজন যেহেতু দূষণীয় মনে করা হতো না, সেহেতু যে যা ইচ্ছা করেছেন সংযোজন করেছেন। এভাবে অগণিত বিকৃতি প্রবেশ করেছে এসকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে। আর অধিকাংশ বিকৃতি সকল কপি ও পাণ্ডুলিপিতেই ছড়িয়ে পড়েছে।

২৩শ প্রমাণ : বাইবেল ব্যাখ্যাকার হার্সলি তাঁর ব্যখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৮৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন : "বিচারকর্তৃগণের বিবরণ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ১০ থেকে ১৫ পর্যন্ত ৬টি আয়াত পরবর্তীকালে সংযোজিত।"

২৪শ প্রমাণ : বিচারকর্তৃগণের বিবরণ-এর ১৭ অধ্যায়ের ৭ আয়াতে একজন যিহূদীয় ব্যক্তির বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, যে যিহূদা-গোষ্ঠীর লোক ছিল এবং সে লেবীয় ছিল (of the family of Judah, who was a Lavite)।

'সে লেবীয়' এই কথাটি অতিরিক্ত সংযোজন ও ভুল। কারণ যিহূদা ও লেবী দুই ভাই। একজন মানুষ একই সাথে দুই ভাইয়ের সন্তান হতে পারে না। যেহেতু কথাটি ভুল, সেহেতু বাইবেল ভাষ্যকার হার্সলী বলেন; "এই কথাটি ভুল। কারণ একজন মানুষ কখনো যিহূদার বংশধর ও লেবীয় হতে পারেন না। এই কথাটি ভুল বুঝতে পেরে হিউবি কেন্ট তাঁর সম্পাদিত বাইবেলের পাঠ (text) থেকে এই কথাটুকু ফেলে দিয়েছেন।"

২৫শ প্রমাণ : শমূয়েল ভাববাদীর প্রথম পুস্তকের ৪-৬ অধ্যায়ে ইস্রায়েল সন্তানদের নিয়ম-সিন্দুক বা ঈশ্বরীয় সিন্দুক পলেষ্টীয়দের হস্তগত হওয়া ও তা পুনরূদ্ধারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সদাপ্রভুর-সিন্দুক ফেরত আনার সময়ে বৈৎশেমশ গ্রামের বাসিন্দারা মাঠে গম কাটছিল। তারা চোখ তুলে সিন্দুকটি দেখতে পান এবং আনন্দিত হন। এজন্য সদাপ্রভু ঈশ্বর তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। শাস্তির বিবরণে ১ শমূয়েলের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে; "পরে তিনি বৈৎ-শেমশের লোকদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে আঘাত করিলেন, কারণ তাহারা সদাপ্রভর সিন্দুকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, ফলত: তিনি লোকদের মধ্যে সত্তর জনকে এবং পঞ্চাশ সহস্র জনকে আঘাত করিলেন (he smote of the People fifty thousand and three score and ten men)।"

এই কথাটি ভুল ও বিকৃত। আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২য় খণ্ডে এই কথাগুলির ত্রুটি বর্ণনা করার পরে বলেন : "বাহ্যত বুঝা যায় যে, হিব্রু পাঠ এখানে বিকৃত। সম্ভবত এখানে মূল পাঠ থেকে কিছু শব্দ ছুটে গিয়েছে, অথবা অজ্ঞতার কারণে বা

ইচ্ছাকৃতভাবে[১] এর মধ্যে কিছু শব্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কারণ, একথা জ্ঞানত অসম্ভব যে, সেই ছোট্ট একটি গ্রামে এত পরিমাণ মানুষ বসবাস করবে অথবা এত অধিক সংখ্যক মানুষ একত্রে মাঠের মধ্যে গম কাটায় রত থাকবে। সবচেয়ে অসম্ভব বিষয় হলো যে, উটের পিঠে রাখা একটি ছোট্ট সিন্দুকের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার সত্তর জন মানুষ একত্রে বা একসাথে দৃষ্টিপাত করবেন।"

অতঃপর তিনি বলেন : "ল্যাটিন অনুবাদে রয়েছে : 'সত্তর জন নেতা ও ৫০ হাজার সাধারণ মানুষ', সিরীয়ান অনুবাদে রয়েছে: 'পাঁচ হাজার ৭০ জন মানুষ', অনুরূপভাবে প্রাচীন আরবী অনুবাদে রয়েছে : 'পাঁচ হাজার ৭০ জন মানুষ'। ঐতিহাসিক জোসেফাস (Falvius Josephus) শুধু '৭০ জন মানুষ' লিখেছেন। ইহূদী পণ্ডিত শলোমন গার্গি ও অন্যান্য রাব্বি বিভিন্ন সংখ্যা লিখেছেন। এ সকল পরস্পরবিরোধী তথ্য এবং বাইবেলের পাঠে উল্লিখিত সংখ্যার অবাস্তবতার ভিত্তিতে আমরা নিশ্চিত যে, নিঃসন্দেহে এই স্থানে বিকৃতি সাধিত হয়েছে, হয়তবা কিছু বৃদ্ধি করা হয়েছে অথবা কিছু কথা পড়ে গিয়েছে।"

হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে : "মূল হিব্রু বাইবেলে নিহতদের সংখ্যা ৫০.০৭০ বলা হয়েছে উল্টাভাবে ৭০ও ৫০ হাজার। এ ছাড়াও একটি ছোট্ট গ্রামের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক মানুষের পাপে লিপ্ত হওয়া ও নিহত হওয়ার বিষয়টি অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য। কাজেই এই ঘটনার সত্যতার বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। জোসেফাস নিহতদের সংখ্যা '৭০' লিখেছেন।

তাহলে দেখুন, কিভাবে এ সকল পণ্ডিত এই কথাগুলি অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিলেন, প্রত্যাখ্যান করলেন এবং এখানে বিকৃতি ঘটেছে বলে স্বীকার করলেন।

২৬শ প্রমাণ : ১ শমূয়েলের ১৭ অধ্যায়ের ১২ আয়াতের ব্যাখ্যায় আদম ক্লার্ক বলেন : "এই অধ্যায়ের এই আয়াত থেকে ৩১ আয়াত পর্যন্ত, ৪১ আয়াত, ৫৪ আয়াত থেকে শেষ (৫৮ আয়াত) পর্যন্ত, ১৮ অধ্যায়ের প্রথম ৫টি আয়াত, ৯ম, ১১শ, ১৭শ ও ১৯শ আয়াত (দুই অধ্যায়ে মোট ৩৭ টি আয়াত) গ্রীক অনুবাদে পাওয়া যায় না। আলেকজান্ড্রীয় পাণ্ডুলিপিতে (Codex Alexandrinus) এগুলি রয়েছে।" এই অধ্যায়ের শেষে দেখবেন, কেনিকট প্রমাণ করেছেন যে, এই আয়াতগুলি মূল বাইবেলের অংশ নয়।

এরপর তিনি উক্ত অধ্যায়ের শেষে কেনিকটের সুদীর্ঘ আলোচনা উদ্ধৃত করেছেন। এই আলোচনা থেকে প্রকাশ পায় যে, এই আয়াতগুলি পরবর্তী যুগে সংযোজিত। আমি এখানে তাঁর আলোচনা থেকে কিছু বাক্য উদ্ধৃত করছি : "যদি আপনি বলেন যে, কখন এই বাক্যগুলি সংযোজিত হলো? তবে আমি বলব যে, জোসেফাসের যুগে (খৃষ্টীয় প্রথম শতকে) ইহূদীগণ তাদের ধর্মগ্রন্থগুলিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে আগ্রহী ছিল। এজন্য তারা বিভিন্ন প্রার্থনা ও গীত উদ্ভাবন করতেন। এছাড়া নতুন নতুন বিভিন্ন

১. অথবা কোন ভাববাদী দ্বারা...।

কথার্বাতা উদ্ভাবন করতেন। এভাবে তাদের ধর্মগ্রন্থগুলির কলেবর বাড়াতেন। ইস্টেরের পুস্তকের মধ্যে সংযোজিত বিপুল কাহিনী ভাণ্ডার দেখুন। অনুরূপভাবে ইস্রা ও নহিমিয়ের পুস্তকে মদ, নারী, সত্যবাদিতা ইত্যাদি বিষয়ক যে সকল কাহিনী সংযোজন করা হয়েছে সেগুলি দেখুন, যেগুলিকে এখন 'ইস্রার প্রথম পুস্তক' বলা হয়। দানিয়েলের পুস্তকের মধ্যে সংযোজিত তিন শিশুর গীতের বিষয়টিও দেখুন। এছাড়া জোসেফাসের পুস্তকের বিপুল সংযোজন লক্ষ্য করুন। এমনও হতে পারে যে, এই আয়াতগুলি টীকায় লেখা ছিল, বেপরোয়া লিপিকারগণ তা মূল পাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

ব্যাখ্যাকার হার্সলি তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ "শমূয়েলের পুস্তকের ১৭ অধ্যায়ের ১২ আয়াত থেকে ৩১ আয়াত পর্যন্ত ২০ টি আয়াত অতিরিক্ত সংযোজন ও বাতিলযোগ্য বলে কেনিকট চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন : পুনর্বার আমাদের অনুবাদ সংশোধন করা হলে এই আয়াতগুলিকে আর ঢুকানো যাবে না।"

আমার কথা হলো, কেনিকট স্বীকার করলেন যে, জোসেফাসের যুগ থেকে ইহূদীদের অভ্যাস হলো বানোয়াট প্রার্থনা, গীত, কথার্বাতা ইত্যাদি সংযোজন করে 'ধর্মগ্রন্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা'। তাঁদের বিকৃতির একটি বড় অংশ তিনি নিজের এখানে উল্লেখ করেছেন। বিকৃতির বিষয়ে তাঁর আরো কিছু কথা এই গ্রন্থের পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরবর্তী আলোচনাতে উল্লেখ করা হবে। যদি ইহূদীদের অবস্থা এই হয়, তবে এ সকল ধর্মগ্রন্থের বিশুদ্ধতার বিষয়ে তাঁদের সততা ও ধার্মিকতার উপর কিভাবে নির্ভর করা যাবে?

আমরা দেখছি যে, এই ধরনের বিকৃতি, পরিবর্তন বা সংযোজন তাদের নিকট কোন অন্যায় বা দূষণীয় কর্ম ছিল না, বরং তা ছিল 'ধর্মগ্রন্থকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার' একটি প্রশংসনীয় কর্ম। কাজেই তাঁরা তাঁদের যা করণীয় তা করতেন। আর লিপিকারগণও ছিলেন বেপরোয়া। তাঁদের অবহেলার কারণে অগণিত বিকৃতি ছড়িয়ে পড়েছে এ সকল পুস্তকের পাণ্ডুলিপিগুলিতে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ তাঁদের লিখনি ও বক্তব্যে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ সকল ধর্মগ্রন্থের বিশুদ্ধতার বিষয়ে যা কিছু বলেন তা সবই ভিত্তিহীন। তাঁরা দাবি করেন যে, ইহূদীদের দ্বারা এ সকল পুস্তকে কোন বিকৃতি ঘটে নি; কারণ তাঁরা ধার্মিক জাতি ছিলেন এবং তাঁরা পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলিকে 'ঈশ্বরের বাণী' বলে বিশ্বাস করতেন। আমরা দেখছি যে, তাঁদের এই দাবিগুলি ভিত্তিহীন, অর্থহীন ও মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৭শ প্রমাণ : মথিলিখিত সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ের ৩ আয়াতটি নিম্নরূপ : "কারণ হেরোদ আপন ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্য যোহনকে ধরিয়া বাঁধিয়া কারাগারে রাখিয়াছিলেন।"

মার্কলিখিত সুসমাচারের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১৭ আয়াতটি নিম্নরূপ : "কারণ হেরোদ আপন ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার নিমিত্ত আপনি লোক পাঠাইয়া যোহনকে ধরিয়া কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলেন... ।"

লূকের সুসমাচারের ৩য় অধ্যায়ের ১৯ আয়াতটি নিম্নরূপ : "কিন্তু হেরোদ রাজা আপন ভ্রাতা ফিলিপের [১] স্ত্রী হেরোদিয়ার বিষয়ে...তাঁহা কর্তৃক দোষীকৃত হইলে... ।

তিনটি সুসমাচারেই (ফিলিপ) শব্দটি নিশ্চিত ও সন্দেহাতীতভাবে ভুল।

যেহেতু এই তিন স্থানে 'ফিলিপ' শব্দটির উল্লেখ ভুল, সেহেতু হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৬৩২ পৃষ্ঠায় বলেন : "সম্ভবত লিপিকারের ভুলের কারণে মূল পাঠের মধ্যে 'ফিলিপ' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য এই শব্দটি ফেলে দেওয়া উচিত। ক্রীসবাখ এই শব্দটি ফেলে দিয়েছেন।"

আমাদের মতে সুসমাচার লেখকগণই অজ্ঞতাবশত এই শব্দটি উল্লেখ করেছেন। লিপিকারের ভুলে শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে বলে হর্ন ও অন্যান্য পণ্ডিতের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এই দাবিটি একটি প্রমাণবিহীন ও ভিত্তিহীন অনুমান ও কল্পনা মাত্র। এছাড়া তিনিটি সুসমাচারেই একই বিষয়ে লিপিকার একই ভুল করবেন কিভাবে? দাবিটি অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক।

পাঠক! এখানে খৃস্টান পণ্ডিতদের দুঃসাহসিকতা লক্ষ্য করুন। কোনরূপ প্রমাণ ছাড়াই অনুমান ও সন্দেহের ভিত্তিতে তাঁরা ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন শব্দ বাদ দেন অথবা ঢুকান। ধর্মগ্রন্থে নিজের বুদ্ধি-বিবেক বা ইচ্ছা মাফিক সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃত করার এই অভ্যাসটি তাঁদের চিরাচরিত। সকল যুগেই তাঁরা এই কর্ম করেছেন ও করছেন।

লক্ষ্যণীয় যে, এখানে প্রমাণ উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো, খৃস্টান পণ্ডিতগণের মতানুসারেই ও সকল গ্রন্থের বিকৃতি প্রমাণ করা। এজন্য (যদিও আমার মতে এই ভুলটি মূলত সুসমাচার লেখকগণের ভুল, তবুও যেহেতু খৃস্টান পণ্ডিতগণ দাবি করেছেন যে, এই ভুলটি লিপিকারের সংযোজন, সেহেতু) তাঁদের দাবির ভিত্তিতেই আমি এই বিষয়টিকে 'সংযোজনের মাধ্যমে বিকৃতি'-র প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করলাম, আর প্রকৃতপক্ষে এই প্রমাণটি বিকৃতির সপক্ষে তিনটি প্রমাণ।

---

১. (ফিলিপের) শব্দটি বাংলা বাইবেলে উল্লেখ করা হয় নি। ইংরেজ পাঠ দেখুন But Herod the tetrarch, being reproved by him for Hero'dias his brother Philip's Wife। আর বাংলা অনুবাদ : "কিন্তু হেরোদ রাজা আপন ভ্রাতার হেরোদিয়ার বিষয়ে... ।" ইতিহাসের কোন পুস্তক থেকে প্রমাণিত হয় নি যে, হেরোদিয়ার স্বামীর নাম ছিল ফিলিপ বরং জোসেফাস ১৮শ পুস্তকের ৫ম অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, হেরোদিয়ার স্বামীর নামও ছিল 'হেরোডাস' বা হেরোদ'।

২৮শ প্রমাণ : লূকলিখিত সুসমাচারের ৭ম অধ্যায়ের ৩১ আয়াতটি নিম্নরূপ : "এবং প্রভু বলিলেন,[১] অতএব আমি কাহার সহিত এই কালের লোকদের তুলনা দিব? তাহারা কিসের তুল্য? (And the Lord said, Whereunto then shall I liken the men of this generation? and to what are they like?)"

'এবং প্রভু বলিলেন' এই বাক্যটি একটি অতিরিক্ত সংযোজন ও বিকৃতি। বাইবেল-ব্যাখ্যাকার আদম ক্লার্ক এই আয়াতের টীকায় বলেন : "এই শব্দগুলি কখনোই মূল পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই বিষয়টি পূর্ণ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত। সকল গবেষকই এই শব্দগুলি প্রত্যাখ্যান করেছেন। বাঙ্গল ও ক্রীসবাখ এগুলিকে মূল পাঠ থেকে ফেলে দিয়েছেন।"

পাঠক লক্ষ্য করুন, কিভাবে এই পণ্ডিত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করলেন। প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের অনুসারী খৃষ্টানগণ তাঁদের অনুবাদগুলি থেকে এই শব্দগুলি বাদ দেন না। এ বড় আশ্চর্য বিষয়! যে শব্দগুলি বাইবেলের অংশ নয় বরং অতিরিক্ত সংযোজন বলে পূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং সকল গবেষক পণ্ডিত যেগুলিকে অতিরিক্ত সংযোজন বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেগুলিকে তাঁরা বাইবেলের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, অথচ তাঁরাই দাবি করছেন যে, বাইবেল ঈশ্বরের বাণী। প্রমাণিত 'মানবীয় সংযোজন'কে 'ঈশ্বরের বাণী'র মধ্যে উল্লেখ করা কি এক প্রকারের বিকৃতি নয়?

২৯শ প্রমাণ : মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ের ৯ আয়াতটি নিম্নরূপ : "তখন যিরমিয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হইল, 'আর তাহার সেই ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা লইল; তাহা তাঁহার মূল্য, যাঁহার মূল্য নিরূপিত হইয়াছিল, ইস্রায়েল সন্তানদের কতক লোক যাঁহার মূল্য নিরূপণ করিয়াছিল;"

এখানে যিরমিয়' কথাটি ভুল। মথির সুসমাচারের অতি প্রসিদ্ধ ভুলগুলির অন্যতম এই ভুলটি। কারণ এই বাক্যটি বা এ অর্থে কোন বাক্য যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকের কোথাও নেই। এমনকি এই শব্দে ও এই অর্থে কোন কথা পুরাতন নিয়মের কোন পুস্তকেই নেই। তবে সখরীয় ভাববাদীর পুস্তকের ১১শ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতের অর্থ মথির উদ্ধৃত এই কথার সাথে আংশিক মিলে। কিন্তু মথির উদ্ধৃত বক্তব্য ও সখরিয়র বক্তব্যের মধ্যে অনেক মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ফলে মথির উদ্ধৃতিকে সখরিয় ভাববাদীর পুস্তক থেকে গৃহীত বলে দাবি করার কোন উপায় নেই।[২] এই অর্থগত দূরত্ব ও পার্থক্য ছাড়াও যে বিষয়টি সর্বোপরি লক্ষ্যণীয় তা হলো, সখরীয়র পুস্তকের বক্তব্যের সাথে মথির লিখিত ঈস্করিয়োতীয় যিহূদা কর্তৃক খৃষ্টকে ধরিয়া দেওয়ার মূল্য গ্রহণের কাহিনীর কোনরূপ সম্পর্ক নেই।

---

১. বাংলা বাইবেলে "এবং প্রভু বলিলেন" কথাটুকু ফেলে দেওয়া হয়েছে। আরবী ও ইংরেজী বাইবেলে বাক্যটি রয়েছে। বাংলা 'ইঞ্জিল শরীফে' বলা হয়েছে : "ঈসা আরও বলিলেন"। বাইবেল-বেত্তাদের মর্জিমাফিক সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তনের এটিও একটি নমুনা।

২. এইরূপ দাবি করলে একথা প্রমাণিত হবে যে, 'ঐশ্বরিক প্রেরণা-প্রাপ্ত' লেখকগণও তাঁদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি প্রদানের সময় মারাত্মক ভুল করতেন এবং শব্দ ও অর্থ সবই পরিবর্তন করে নিজেদের মনগড়া কথা লিখতেন।

এই সুস্পষ্ট ভুলটির ব্যাখ্যায় প্রাচীন ও আধুনিক খৃষ্টান পণ্ডিতগণ বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী কথা বলেছেন। ক্যাথলিক ওয়ার্ড ১৮৪১ সালে মুদ্রিত 'ভুলভ্রান্তির পুস্তক' নামক গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায় বলেন : "মি গৌয়েল লিখেছেন যে, মার্ক ভুল করেছেন এবং 'অহীমেলক'-এর স্থলে 'অবিয়াথর' লিখেছেন। আর মথি ভুল করেছেন, এবং 'সখরিয়'-র স্থলে 'যিরমিয়' লিখেছেন।

হর্ন ১৮২২ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩৮৫ ও ৩৮৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ "এই উদ্ধৃতিতে অত্যন্ত কঠিন সমস্যা রয়েছে। কারণ যিরমিয়র পুস্তকে এই ধরনের কোন কথা নেই। সখরিয়র পুস্তকের ১১ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতে এইরূপ একটি কথা আছে, কিন্তু তাঁর শব্দাবলির সাথে মথির শব্দাবলির মিল নেই। কোন কোন গবেষক বলেছেন যে, মথির পাণ্ডুলিপিতে ভুল হয়েছে এবং অনুলিপিকার 'সখরিয়'র স্থলে 'যিরমিয়' লিখেছেন অথবা এই শব্দটি পরবর্তীকালে সংযোজিত।"

এই শব্দটির সংযোজিত হওয়ার পক্ষে প্রমাণাদি উল্লেখের পরে তিনি বলেন, "যতদূর মনে হয়, মথির কথাটি নিম্নরূপ: 'তখন ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হইল...'। এই ধারণা জোরদার হওয়ার একটি কারণ হলো, মথি ভাববাদিগণ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় তাঁদের নাম বাদ দেন।"

আর তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৬২৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন ঃ "সুসমাচার লেখক তাঁর মূল গ্রন্থে ভাববাদীর নাম লিখেন নি; কিন্তু পরবর্তীকালের কোন অনুলিপিকার তা সংযোজন করেছেন।"

হর্নের এই দুই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, তিনি এই শব্দটিকে অতিরিক্ত সংযোজন বলেই মনে করেন।

ডাওয়ালি ও রজার্ডমেন্ট প্রণীত ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই আয়াতের টীকায় বলা হয়েছে ঃ "এখানে উল্লিখিত কথাগুলি যিরমিয়র পুস্তকে পাওয়া যায় না। তবে সখরিয়র পুস্তকের ১১শ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতে পাওয়া যায়। এই ভুলের অনেক ব্যাখ্যার মধ্যে একটি হলো, প্রথম যুগে অনুলিপিকার সুসমাচারের অনুলিপি লেখার সময় ভুল করে 'সখরিয়'র পরিবর্তে 'যিরমিয়' লিখেছিলেন। এর পর এই ভুলটি মূল পাঠের মধ্যে প্রবেশ করেছে। পেবস অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।"

১৯শ শতকের ইরাকী মুসলিম পণ্ডিত জাওয়াদ ইবনু সাবাত (১৮৩৪ খৃ)[১] তাঁর খৃস্টধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ 'আল-বারাহীন আস-সাবাতিয়া'য় লিখেছেন ঃ "আমি অনেক খৃস্টান

১. তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং ১৭৯৭ সালে কলিকাতায় আগমন করেন। পরের বছর তিনি ঢাকায় আসেন। পরবর্তী কয়েক বছর তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত থাকেন। ১৮০৮ সালে তিনি মাদ্রাজের প্রধান পাদরী ড. কার-এর হাতে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তী কয়েক বছর তিনি শ্রীরামপুর, দানাপুর, লাখনৌ প্রভৃতি স্থানের মিশনারীদের সাথে বাইবেলের অনুবাদ ও খৃস্টধর্ম বিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক রচনায় জড়িত থাকেন। ১৮১২ সালে তিনি কলিকাতায় প্রধান কাজী মৌলবী নাজমুদ্দিন খানের নিকট উপস্থিত হয়ে খৃস্টধর্ম পরিত্যাগ ও ইসলাম ধর্মে ফিরে আসার ঘোষণা দেন। এরপর তিনি খৃস্টধর্মের বিভ্রান্তি অপনোদনে 'আল-বারাহীন আস-সাবাতিয়া' নামক পুস্তকটি রচনা করেন। ইংরেজ শাসকগণের ছত্রছায়ায় খৃস্টান মিশনারিগণ এই পুস্তকটি ছাপাতে বাধা দেয়। অনেক কষ্ট করে ১৮১৪ সালে গোপনে পুস্তকটি ছাপানো হয়। তৎকালীন সময়ে খৃস্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের প্রতিরোধে বইটি অত্যন্ত উপকারী বলে গণ্য হয়েছে।

পাদ্রীকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছি। টমাস[১] বলেছেন ঃ এটি লিপিকারের ভুল। বিওকানান, মার্টিরোস[২] ও কীরাকোস বলেছেন : মথি পুস্তকাদি না দেখে তাঁর স্মৃতির উপর নির্ভর করে এ কথা লিখেছেন, ফলে তিনি ভুল করেছেন। কোন কোন পাদ্রী বলেছেন : হতে পারে যে, 'সখরিয়'র আরেক নাম ছিল 'যিরমিয়'!!"

আমার মতে এক্ষেত্রে সঠিক কথা হলো, সুসমাচার লেখক মথিই এই ভুলটি করেছেন। এই কথাটিই স্পষ্ট। ওয়ার্ড, গোয়েল, বিওকানান, মার্টিরোস ও কীরাকোস তা স্বীকার করেছেন। অবশিষ্ট সম্ভাবনাগুলি খুবই দুর্বল। আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে, সখরিয় ভাববাদীর পুস্তকে যে কথা আছে তা শব্দে, অর্থে ও প্রসঙ্গে এই উদ্ধৃতির সাথে মিলে না। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এ বিষয়ে অন্য যে সকল সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে তা সবই বাতিল। আমরা দেখেছি, হর্ন নিজেই স্বীকার করেছেন যে, 'সখরিয়র শব্দাবলির সাথে মথির উদ্ধৃত শব্দাবলির মিল নেই।' কাজেই এখানে 'যিরমিয়'-এর পরিবর্তে 'সখরিয়' বসালেও সমস্যার সমাধান হবে না বরং সেক্ষেত্রেও মেনে নিতে হবে যে, হয় মথি সখরিয়র বক্তব্য বিকৃত করে উদ্ধৃত করেছেন অথবা মথির উদ্ধৃতির পরে সখরিয়র বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে। উভয় আয়াতের একটিতে বিকৃতি মেনে নিতেই হবে।

যে সকল খৃস্টান পণ্ডিত এই কথাটিকে অনুলিপিকারের সংযোজন বলে দাবি করেন, তাঁদের দাবির ভিত্তিতেই আমি এই বিষয়টিকে 'সংযোজনের মাধ্যমে বিকৃতির' প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করলাম।

উপরের আলোচনায় আমরা মথির ভুলটি আলোচনা করলাম। মিস্টার গোয়েল ও ওয়ার্ড মার্কের ভুলের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি এখানে তা আলোচনা করছি। মার্কলিখিত সুসমাচারের ২ অধ্যায়ে রয়েছে : "২৫ তিনি (যীশু) তাহাদিগকে (ইহুদী ফরীশীগণকে) কহিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধিত হইলে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা কখনো পাঠ কর নাই? ২৬ তিনি ত অবিয়াথর মহাযাজকের সময়ে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে দর্শন-রুটী যাজকবর্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও ভোজন করা বিধেয় নয়, তাহাই ভোজন করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গিগণকেও দিয়াছিলেন।"

উপরের পণ্ডিতদ্বয় স্বীকার করেছেন যে, "অবিয়াথর' কথাটি ভুল। শুধু তাই নয়, এই বাক্যদ্বয়ও ভুল : (১) "দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধিত হইলে..."ও (২) "এবং সঙ্গিগণকেও দিয়াছিলেন"। কারণ 'দর্শন- রুটী' ভোজন করার সময় দায়ূদ 'একা' ছিলেন, তাঁর সাথে অন্য কেউ ছিল না। যদি কেউ শমূয়েল ভাববাদীর প্রথম পুস্তক পাঠ করেন তবে বিষয়টি তার নিকট মোটেও অস্পষ্ট থাকবে না।[৩]

১. সম্ভবত কলিকাতার পাদরী Thomas Thomason.
২. সম্ভবত কলিকাতার পাদরী Henry Martyn.
৩. ১ শমূয়েল এবং ১ ও ২২ অধ্যায় দেখুন।

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মার্কের লিখিত এই বাক্য দুইটি ভুল। এ থেকে বুঝা গেল যে, মথি ও লূকের সুসমাচারে অনুরূপ যে কথাগুলি লেখা হয়েছে সেগুলি ভুল।

মথিলিখিত সুসমাচারে ১২ অধ্যায়ে আছে ঃ "৩ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা ক্ষুধিত হইলে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই? ৪ তিনি ত ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার দর্শন-রুটী ভোজন করিলেন, যাহা তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের ভোজন করা বিধেয় ছিল না; কেবল যাজকবর্গেরই বিধেয় ছিল।"

লূকের সুসমাচারের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যীশুর এই বক্তব্যটি নিম্নরূপে উদ্ধৃত করা হয়েছে : "৩ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা ক্ষুধিত হইলে তিনি কি করিয়াছিলেন, তাহাও কি তোমরা পাঠ কর নাই? ৪ তিনি ত ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে দর্শন রুটী কেবল যাজকবর্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও ভোজন করা বিধেয় নয়, তাহা লইয়া আপনি ভোজন করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গীগণকেও দিয়াছিলেন।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, খৃস্টের এই বক্তব্যটি উদ্ধৃত করতে যেয়ে তিন সুসমাচার লেখক ৭টি ভুল বলে করেছেন। যদি খৃস্টান পণ্ডিতগণ এই ৭টি ভুলকে অনুলিপিকারগণের ভুল গণ্য করেন তবে তাঁদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, এই ৭ স্থানে বাইবেলে বিকৃতি সাধিত হয়েছে। যদিও বাহ্যত বুঝা যায় যে, এই ভুলগুলি লিপিকারদের ভুল নয়, বরং সুসমাচার লেখকদেরই ভুল, তবুও খৃস্টান পণ্ডিতগণ এগুলিকে লিপিকারদের ভুল ও পরবর্তী বিকৃতি বলে স্বীকার করলে আমাদের কোন অসুবিধা নেই।

৩০শ প্রমাণ : মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ের ৩৫ আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ "পরে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিয়া তাঁহার বস্ত্র সকল গুলিবাটপূর্বক অংশ করিয়া লইল, যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত[১] এই বচন পূর্ণ হয়; তাহারা আপনাদের মধ্যে আমার বস্ত্র সকল বিভাগ করিল, এবং আমার পরিচ্ছদের জন্য গুলিবাঁট করিল।"[২]

খৃস্টান গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন যে, "যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয়; তাহারা আপনাদের মধ্যে আমার বস্ত্র সকল বিভাগ করিল, এবং আমার পরিচ্ছদের জন্য গুলিবাঁট করিল" এই বাক্যগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত এবং এগুলিকে বাইবেল থেকে মুছে ফেলা অত্যাবশ্যক। এ কারণেই গ্রীসবাখ এই বাক্যগুলি বাইবেল থেকে ফেলে দিয়েছেন।

---

১. দেখুন; গীতসংহিতা ২২/১৮ যোহন ১৯/২৪।

২. নিম্নরেখা প্রদত্ত (underlined) বাক্যগুলি ইংরেজি ও আরবী বাইবেলে রয়েছে এবং তদানুসারে অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলা বাইবেল ও বাংলা ইঞ্জিল শরীফে এই বাক্যগুলি সম্পূর্ণ ফেলে দেওয়া হয়েছে। বাংলা বাইবেলে বলা হয়েছে ঃ "৩৫ "পরে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিয়া তাঁহার বস্ত্র সকল গুলিবাঁটপূর্বক অংশ করিয়া লইল; ৩৬ এবং সেখানে বসিয়া তাঁহাকে চৌকী দিতে লাগিল।"

হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩৩০ ও ৩৩১ পৃষ্ঠায় অখণ্ডনীয় দলিল ও তথ্যাদি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, এই বাক্যগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত। এরপর তিনি বলেন : "ক্রীসবাখ এই বাক্যগুলি মুছে দিয়ে ভাল কাজ করেছেন; কারণ তাঁর নিকট সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এগুলি মিথ্যা কথা।"

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৫ম খণ্ডে উপরের আয়াতটির টীকায় লিখেছেন : "এই বাক্যগুলি বাদ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ এগুলি মূল পাঠের অংশ নয়। বিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপিগুলি তা বাদ দিয়েছে। অনুরূপভাবে অধিকাংশ অনুবাদ থেকে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অগণিত প্রাচীন পণ্ডিত তা বাদ দিয়েছেন। এই বাক্যগুলি সুস্পষ্টতই অতিরিক্ত সংযোজন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৯ অধ্যায়ের ২৪ আয়াত থেকে তা নেওয়া হয়েছে।"

৩১শ প্রমাণ : যোহনের প্রথম পত্রের ৫ম অধ্যায়ে রয়েছে : "৭ কারণ স্বর্গে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষ্য সংরক্ষণ করেন : পিতা, বাক্য ও পবিত্র আত্মা; এবং তাঁহার তিন একই। ৮. এবং পৃথিবীতে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহার সাক্ষ্য প্রদান করেন : আত্মা, জল ও রক্ত,এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই (For there are three that record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost; and three are one. 8. And there are three that bear witness in earth, the spirit, and the Warer, and the blood; and these three agree in one)।[১]"

খৃস্টান পণ্ডিতগণ উল্লেখ করেছেন যে, উপরের আয়াতদ্বয়ের এতসব কথার মধ্যে মূল বাক্যগুলি ছিল নিম্নরূপ : "বস্তুতঃ তিনে সাক্ষ্য দিতেছেন, আত্মা, ও জল, রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই।"[২] এরপর ত্রিত্বে (ত্রিতত্ত্বে) বিশ্বাসিগণ মূল পাঠের মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজন করেন : "স্বর্গে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষ্য সংরক্ষণ করেন : পিতা, বাক্য ও পবিত্র আত্মা; এবং তাঁহার তিন একই। ৮. এবং পৃথিবীতে তিন জন রহিয়াছেন...।"এই বাক্যগুলি যে অতিরিক্ত সংযোজন সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নেই। ক্রীসবাখ ও শোলয্ এই বাক্যগুলি সংযোজিত হওয়ার বিষয়ে একমত। হর্ন তাঁর গোঁড়ামি সত্ত্বেও বলেছেন : এই বাক্যগুলি অতিরিক্ত সংযোজন এবং এগুলিকে মুছে দেওয়া আবশ্যক। হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ হর্নের এই কথাকে সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন। আদম ক্লার্কও এই বাক্যগুলিকে সংযোজিত বলে গণ্য করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

চতুর্থ-পঞ্চম খৃস্টীয় শতাব্দীর ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন সেন্ট অগাস্টিন (St, Augustine)। এখন পর্যন্ত ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ

১. বাংলা বাইবেলে ও ইঞ্জিল শরীফে এই বাক্যগুলি নেই। ইংরেজি ও আরবী বাইবেলের অনুসরণে অনুবাদ করা হয়েছে।

২. বাংলা বাইবেলে এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

তাঁর মতের উপরেই নির্ভর করেন। তিনি যোহনের প্রথম পত্রের বিষয়ে দশটি পত্র লিখেছেন। এই দশটি পত্রের একটি পত্রে তিনি এই বাক্যগুলির কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি ছিলেন ত্রিত্বে বিশ্বাসী। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু আরিয়ুসের (Arius) অনুসারিগণ যাঁরা ত্রিত্বে (ত্রিতত্ত্বে) বিশ্বাস করতেন না বা একেশ্বরবাদী ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে অগাস্টিন বির্তক করতেন। তাঁর সময়ে যদি উপরের এই আয়াতদ্বয় এভাবে যোহনের পত্রের মধ্যে থাকত তবে নিশ্চয় ত্রিত্ববাদ (trinity) প্রমাণ করার জন্য তিনি সেগুলির উদ্ধৃতি দিতেন ও সেগুলিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করতেন।

শুধু তাই নয়, অগাস্টিন ত্রিত্ববাদ প্রমাণ করার জন্য উপরে উল্লিখিত ৮ম আয়াতটি ঃ "বস্তুতঃ তিনে সাক্ষ্য দিতেছেন, আত্মা,ও জল, ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই" এই কথাটির অদ্ভুত একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এখানে জল দ্বারা পিতাকে বুঝানো হয়েছে, রক্ত দ্বারা পুত্রকে বুঝানো হয়েছে এবং আত্মা দ্বারা পবিত্র-আত্মাকে বুঝানো হয়েছে। এই ব্যাখ্যাটি খুবই দুর্বল ও অবাস্তব ব্যাখ্যা। একথা স্পষ্ট যে, যদি উপরে উল্লিখিত ৭ম আয়াতটি যোহনের পত্রে সত্যিই থাকত তাহলে তিনি এইরূপ অবাস্তব ও দুর্বল ব্যাখ্যার শরণাপন্ন হতেন না। আমার মনে হয়, যখন ত্রিত্ববাদীরা দেখলেন যে, এই ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত দুর্বল যা দিয়ে ত্রিত্ববাদ প্রমাণ করা কঠিন-তখন তারা উপরের বাক্যগুলি তৈরি করে সেগুলিকে এই পত্রের মধ্যে সংযোজন করে দেন যাতে সেগুলি দিয়ে তাঁদের ত্রিত্ববাদ প্রমাণ করা সহজ হয়।

১২৭০ হিজরী সালে (১৮৫৪ খৃস্টাব্দে) আমার সাথে 'মীযানুল হক' গ্রন্থের প্রণেতা ড. ফানডারের (Carl Gottaleb Pfander) যে প্রকাশ্য বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়, সেই বিতর্কের সময় উপস্থিত সকল মানুষের সামনে পাদ্রী ফানডার স্বীকার করেন যে, এই বাক্যগুলি বিকৃত। তাঁর সহযোগী পাদ্রী মি. ফ্রেঞ্চ (T. V French) যখন দেখলেন যে, আরো অনেক বাক্য সেখানে উপস্থিত করা হবে যেগুলিকে বিকৃত বলে স্বীকার করতে তাঁরা বাধ্য হবেন, তখন তিনি অন্যান্য প্রমাণাদি উপস্থিত করার আগেই বলে উঠলেন যে, "আমি ও আমার সঙ্গী স্বীকার করছি যে, ৭ অথবা ৮ স্থলে বিকৃতি ঘটেছে।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, একমাত্র গায়ের জোরে অযৌক্তিক বিতর্ককারী ছাড়া কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, যোহনের পত্রের এই বাক্যগুলি বিকৃত।

এই বাক্যটির আলোচনায় পণ্ডিত হর্ন ১২ পৃষ্ঠা লিখেছেন। এরপর আবার তাঁর আলোচনার সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন। তাঁর সকল কথা অনুবাদ করলে হয়ত পাঠক বিরক্ত হবেন। হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলক হর্নের সার-সংক্ষেপকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। আমি এখানে তাঁদের সার-সংক্ষেপের সার-সংক্ষেপ উদ্ধৃত করছি। হেনরি ও স্কটের পুস্তকের সংকলকগণ বলেন :

"হর্ন উভয় পক্ষের দলিল-প্রমাণাদি আলোচনা করেছেন। এপর তিনি পুনরায় তাঁর আলোচনার সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় আলোচনার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

যাঁরা এই বাক্যগুলিকে মিথ্যা ও জাল বলে প্রমাণ করেন তাঁরা নিম্নের বিষয়গুলির উপর নির্ভর করেন;

প্রথমত, ১৬শ শতাব্দীর পূর্বে লিখিত কোন গ্রীক পাণ্ডুলিপিতে এই বাক্যগুলির অস্তিত্ব নেই।

দ্বিতীয়ত, প্রথম যুগে পরিপূর্ণ যত্ন ও গবেষণা সহকারে যে সকল বাইবেল মুদ্রণ করা হয়েছে সেগুলিতেও এই বাক্যগুলির অস্তিত্ব নেই।

তৃতীয়ত, একমাত্র ল্যাটিন অনুবাদ ছাড়া অন্য কোন প্রাচীন অনুবাদে এই বাক্যগুলির অস্তিত্ব নেই।

চতুর্থত, অধিকাংশ প্রাচীন ল্যাটিন পাণ্ডুলিপিতেও এই কথাগুলি নেই।

পঞ্চমত, কোন প্রাচীন খৃস্টান পণ্ডিত বা চার্চের ঐতিহাসিক এই কথাগুলিকে প্রমাণ হিসেবে উদ্ধৃত করেন নি।

ষষ্ঠত, প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের নেতাগণ ও ধর্মের সংস্কারকগণ এই কথাগুলিকে ফেলে দিয়েছেন অথবা তার উপরে সন্দেহের চিহ্ন দিয়ে রেখেছেন।

অপরপক্ষে যাঁরা এই বাক্যগুলিকে সত্য ও সঠিক বলে মনে করেন তাঁদের দাবিগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত, প্রাচীন ল্যাটিন অনুবাদে এবং ল্যাটিন ভালগেটের অনেক পাণ্ডুলিপিতে এই কথাগুলি রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, গ্রীক ধর্মবিশ্বাস বিষয়ক পুস্তকে, গ্রীক চার্চের প্রার্থনা পুস্তকে এবং ল্যাটিন চার্চের পুরাতন প্রার্থনা পুস্তকে এই কথাগুলি রয়েছে। কোন কোন ল্যাটিন ধর্মগুরু এই কথাগুলিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন।

এই প্রমাণ দুইটি ত্রুটিপূর্ণ। এছাড়া নিম্নের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি এই বাক্যগুলির বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দেয় :

প্রথমত, বাক্যগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক;

দ্বিতীয়ত, ব্যাকরণের নিয়ম;

তৃতীয়ত, ال বা definite article-এর ব্যবহার।

চতুর্থত, যোহনের বাক্যরীতির সাথে এই বাক্যরীতির মিল। বাইবেলের অধিকাংশ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও অনুবাদে এই বাক্যগুলির না থাকার কারণ নিম্নরূপ হতে পারে;

১. সম্ভবত মূল পত্রটির দুইটি কপি ছিল;

২. অথবা প্রাচীন যুগে যখন পাণ্ডুলপির সংখ্যা ছিল কম, তখন অনুলিপিকারের ষড়যন্ত্রের ফলে অথবা তার অসাবধানতায় এই আয়াতগুলি পড়ে যায়;

৩. অথবা আরিয়ূস (Arius)-এর অনুসারিগণ এই বাক্যগুলি ফেলে দেয়;

৪. অথবা যেহেতু বাক্যগুলি 'ত্রিত্ববাদের গুপ্ততথ্য' এজন্য প্রকৃত ধার্মিক 'ঈমানদার' খৃস্টানগণ বাক্যগুলি বাইবেল থেকে মুছে ফেলেন;

৫. অথবা অনুলিপিকারের অসাবধানতায় এই বাক্যগুলি পড়ে গিয়েছিল, যেভাবে আরো অনেক স্থানে অনেক কিছু বাদ পড়ে গিয়েছে অনুলিপিকারদের অসাবধানতার কারণে।

গ্রীক অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুগণ এই স্থলে কিছু অনুচ্ছেদ বাদ দিয়েছেন। হর্ন উপরে উল্লিখিত উভয় পক্ষে দলিল-প্রমাণাদি পুনরায় পর্যালোচনা করেন। অতঃপর তিনি নিরপেক্ষভাবে ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, এই বাক্যগুলি জাল এবং এগুলিকে বাইবেল থেকে মুছে দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, যে সকল প্রাচীন পাণ্ডুলিপির বিশুদ্ধতার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই সে সকল প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে এই বাক্যগুলি না পাওয়া পর্যন্ত এগুলিকে বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। মার্শের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে তিনি বলেন, "অভ্যন্তরীণ প্রমাণগুলি জোরালো হলেও সুস্পষ্ট বাহ্যিক প্রমাণাদির বিপরীতে সেগুলি গ্রহণযোগ্য নয়।"

প্রাজ্ঞ পাঠক! এভাবে আপনি দেখছেন যে, হর্ন এই আয়াত বা এই বাক্যগুলিকে জাল ও বানোয়াট বলে যে মত প্রকাশ করেছেন, এ সকল পণ্ডিত সেই মতটিকে সরাসরি গ্রহণ করলেন না, যদিও তাঁরা হর্নের মতটির প্রশংসায় বলেছেন যে, 'তিনি নিরপেক্ষভাবে ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।'

এ সকল পণ্ডিতের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, এই বাক্যগুলির বিশুদ্ধতার পক্ষে দ্বিতীয় দল যে যুক্তি-প্রমাণগুলি পেশ করেছেন সেগুলি অগ্রহণযোগ্য। অধিকাংশ প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে এই বাক্যগুলি না থাকার যে সকল কারণ তাঁরা উল্লেখ করেছেন সেগুলি থেকে দুইটি বিষয় জানা যায় :

প্রথম বিষয় : মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে বাইবেলের মধ্যে বিকৃতির দরজা উন্মুক্ত ছিল। লিপিকারগণ ও বিভিন্ন দল-উপদলের খৃষ্টানগণ অতি সহজেই সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন করতে পারতেন। তাদের এই বিকৃতি সহজেই প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। এখানে তাঁরা স্বীকার করলেন যে, অনুলিপিকার, আরিয়ান সম্প্রদায় বা ধার্মিক সম্প্রদায়ের বিকৃতি কোনরূপ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ছাড়াই প্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরা ইচ্ছাকৃতভাবে এই বাক্যগুলি ফেলে দিলেন, আর বিনা প্রতিবাদে সকল গ্রীক পাণ্ডুলিপি থেকে, একমাত্র ল্যাটিন অনুবাদ ছাড়া অন্য সকল অনুবাদ থেকে এবং অধিকাংশ ল্যাটিন পাণ্ডুলিপি থেকে এই বাক্যগুলি ফেলে দেওয়া হলো।

দ্বিতীয় বিষয় : তাঁদের কথা থেকে জানা গেল যে, প্রকৃত ধার্মিক, সৎ ও 'ঈমানদার' (Faithful, devoted) খৃষ্টানগণও ইচ্ছাকৃতভাবে বাইবেল বিকৃত করতেন। বিকৃতির মধ্যে কোন কল্যাণ বা উপকার আছে বলে মনে করলে তাঁরা তা করতেন। এজন্য তাঁরা এই বাক্যগুলিকে বাইবেল থেকে মুছে দিয়েছেন। কারণ এগুলি 'ত্রিত্ববাদের গুপ্ত তথ্য' (এগুলি প্রকাশ করে ঈশ্বর, পবিত্র-আত্মা ও যোহন ভুল করেছিলেন, কাজেই তাঁদের ভুল সংশোধনের জন্য তাঁরা তা মুছে দিলেন)।

অনুরূপভাবে গ্রীক অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুগণ এই আলোচনা থেকে কিছু বাক্য ফেলে দিয়েছেন। এথেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃতি সাধন করা প্রকৃত ধার্মিক ও সৎ খৃস্টান ও খৃস্টান ধর্মগুরুগণের একটি 'প্রশংসনীয় সুন্দর অভ্যাস'। কাজেই বিভ্রান্ত সম্প্রদায় বা অনুলিপিকারগণ যদি এই 'সুন্দর' কাজটি করেন তাহলে আপত্তির কি আছে?

এভাবে আমরা জানলাম যে, অনুলিপিকারগণ, আরিয়ান খৃস্টানগণ, ধর্মগুরুগণ ও প্রকৃত ধার্মিক ও সৎ খৃস্টানগণ বাইবেলের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিকৃতি সাধনের কোন স্থান বা সুযোগ বাদ দেন নি। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ বিষয়ে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ বুদ্ধি, মেধা ও ধার্মিকতার পূর্ণ ব্যবহার করেছেন। শুধু কি তাই! মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পরেও তাঁদের এই 'প্রশংসনীয় সুন্দর অভ্যাস' তাঁরা পরিত্যাগ করতে পারেন নি। আমি এখানে একটিমাত্র উদাহরণ পেশ করছি।

প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের প্রথম ও খৃস্টধর্ম সংস্কারের মূল নেতা মি. লুথার যখন এই ধর্মের সংস্কারের জন্য প্রচেষ্টা শুরু করলেন, তখন তিনি জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন যেন তাঁর অনুসারিগণ তা থেকে উপকৃত হতে পারেন। তিনি তাঁর অনূদিত বাইবেলের মধ্যে যোহনের পত্রের এই বাক্যগুলি উল্লেখ করেন নি। তাঁর জীবনদ্দশাতেই কয়েকবার তাঁর অনুবাদ মুদ্রিত হয়। যখন তিনি বৃদ্ধ হলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, তাঁর আয়ু শেষ হয়ে আসছে, তখন তিনি ১৫৪৬ সালে পুনরায় অনুবাদটির মুদ্রণ শুরু করেন। ধর্মগ্রন্থের বিকৃতির বিষয়ে ইহূদী-খৃস্টানগণের অভ্যাস, বিশেষত খৃস্টানগণের অভ্যাসের সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন। এজন্য তিনি এই অনুবাদের ভূমিকায় তাঁর অন্তিম নির্দেশনা প্রদান করেন : "কেউ যেন আমার এই অনুবাদটি বিকৃত না করেন।"

কিন্তু এই অন্তিম নির্দেশনাটি ছিল খৃস্টান সম্প্রদায়ের চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীত, এজন্য তাঁরা তা রক্ষা করেন নি বরং লুথারের মৃত্যুর পরে ত্রিশ বছর পার না হতেই তারা এই জাল ও বানোয়াট বাক্যটিকে তাঁর অনুবাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। লুথারের অনুবাদের এই বিকৃতি সর্বপ্রথম সাধিত হয় ফ্রাঙ্কফুর্টবাসীদের দ্বারা। ১৫৭৪ সালে যখন তারা এই অনুবাদটি মুদ্রণ করেন তখন তারা এই জাল বাক্যটিকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু এরপর তারা আবার ঈশ্বরের ভয়ে বা মানুষের নিন্দার ভয়ে পরবর্তী মুদ্রণগুলিতে এই বাক্যগুলি ফেলে দেন।

ত্রিত্ববাদীদের জন্য এই বাক্যগুলি বাদ দেওয়া খুবই কঠিন ছিল। এজন্য ওটিনবুর্গের বাসিন্দারা ১৫৯৬ ও ১৫৯৯ সালে মুদ্রিত লুথারের এই অনুবাদের মধ্যে এই বাক্যগুলি ঢুকিয়ে দেন। অনুরূপভাবে হামবুর্গবাসিগণ ১৫৯৬ সালে একই কাজ করেন। এরপর ওটিনবুর্গবাসিগণ ফ্রাঙ্কফুর্টবাসিগণের মত মানুষের নিন্দার ভয় পান। ফলে পরবর্তী মুদ্রণের সময় বাক্যগুলি ফেলে দেন।

লুথারের অনুসারী ত্রিত্ববাদী প্রটেস্ট্যান্ট খৃস্টানগণের জন্য এই বাক্যটিকে বাদ দেওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তখন লুথারের নিজের অন্তিম নির্দেশনা লঙ্ঘন করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর এই অনুবাদের মধ্যে এই বাক্যটি উল্লেখ করা হয়।

এই যদি হয় আধুনিক যুগের অবস্থা, তাহলে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে, যখন বাইবেলের কপি ও পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল খুবই কম[১], তখন এ সকল 'প্রশংসনীয় সুন্দর অভ্যাসের' অধিকারিগণ কি করেছেন তা সহজেই অনুমেয়। আমরা বুঝতে পারি যে, নিজেদের মর্জিমাফিক বাইবেলকে 'পরিমার্জিত' ও সংশোধিত' করার কোন সুযোগ তাঁরা বাদ দেন নি।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক আইজ্যাক নিউটন ৫০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা লিখেছেন। এই পুস্তিকাতে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, যোহনের পত্রের উপরের বাক্যগুলি বিকৃত ও সংযোজিত। তিনি আরো প্রমাণ করেছেন যে, তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্রের ৩য় অধ্যায়ের ১৬ আয়াতটিও বিকৃত। আয়াতটি নিম্নরূপ : "আর ভক্তির নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ সর্বসম্মত, ঈশ্বর[২] মাংসে প্রকাশিত হইলেন, আত্মাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হইলেন, দূতগণের নিকট দর্শন দিলেন, জাতিগণের মধ্যে প্রচারিত হইলেন, জগতে বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত হইলেন, সপ্রতাপে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন।"

এই আয়াতটিও ত্রিত্ববাদিগণের জন্য বিশেষ উপকারী ও কার্যকর। তাঁদের ত্রিতত্ত্বীয় বাতিল বিশ্বাস প্রমাণ করার জন্য তাঁরা এই আয়াতটিকে বিকৃত করে সংযোজন করেছেন।

৩২শ প্রমাণ : যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্যের প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে : ১০ আমি প্রভুর দিনে (রবিবারে) আত্মাবিষ্ট হইলাম, এবং আমার পশ্চাৎ তূরীধ্বনিবৎ এক মহারব শুনিলাম। ১১ কেহ কহিলেন : <u>আমিই আলফা ও ওমেগা (প্রথম বর্ণ ও শেষ বর্ণ) এবং প্রথম ও শেষ; অতএব</u>[৩] তুমি যাহা দেখিতেছ তাহা পত্রিকায় লিখ...(I am Alpha and Ome'ga, the first And the last; and, What thou seest, Write...)

ক্রীসবাখ ও শোলয একমত যে, 'প্রথম ও শেষ' এই শব্দদ্বয় অতিরিক্ত সংযোজন। কোন কোন অনুবাদক এই শব্দদ্বয়কে বাদ দিয়েছেন। ১৬৭১ ও ১৮২১ খৃষ্টাব্দে অনূদিত আরবী বাইবেলে 'আমিই আলফা ও ওমেগা' একথাটুকুও ফেলে দেওয়া হয়েছে (বাংলা বাইবেলেও পুরো বাক্য ফেলে দেওয়া হয়েছে)।

---

১. বাইবেলের পঠন ও পাঠন সাধারণ খৃস্টানদের জন্য মূলত নিষিদ্ধ ছিল। এর পাণ্ডুলিপির সংখ্যাও ছিল খুবই কম।

২. বাংলা বাইবেলে "ঈশ্বর" শব্দটি নেই। তৎপরিবর্তে বলা হয়েছে : 'যিনি মাংসে প্রকাশিত হইলেন..." পক্ষান্তরে ইংরেজি : God was menifest in the flesh... । বাংলা বাইবেল থেকে বুঝা যায় যে, এখানে ইংরেজি ও অন্যান্য পাঠে (ঈশ্বর) শব্দটি বিকৃতি ও অতিরিক্ত সংযোজন। এই শব্দটি বাদ দিলে পুরো আয়াতটিতে খৃস্টের প্রশংসা করা হয়, কিন্তু তাঁর ঈশ্বরত্ব (God incarnate) প্রমাণিত হবে না।

৩. নিম্নরেখ (underlined) বাক্যগুলি বাংলা বাইবেল ও বাংলা 'ইঞ্জিল শরীফে' নেই। এগুলিকে অনুবাদে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ইংরেজি ও আরবী বাইবেল অনুসারে অনুবাদ করা হ-

৩৩শ প্রমাণ : প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ৮ম অধ্যায়ের ৩৭ আয়াতটি নিম্নরূপ : "ফিলিপ কহিলেন, সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত যদি বিশ্বাস করেন, তবে হইতে পারেন। তাহাতে তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, যীশু খৃষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র ইহা আমি বিশ্বাস করিতেছি।"[১]

এই বাক্যগুলি পরবর্তীকালে সংযোগিত। কোন একজন ত্রিত্ববাদী 'যীশু খৃষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র ইহা আমি বিশ্বাস করিতেছি' এই কথার দ্বারা খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করার জন্য এই বাক্যটি বাইবেলের মধ্যে সংযোজন করেছেন। ক্রীসবাখ ও শোলয একমত যে, বাক্যটি পরবর্তী সংযোজন।

৩৪শ প্রমাণ : প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ৯ম অধ্যায়ে রয়েছে : "৯ তিনি কহিলেন, প্রভু কে? প্রভু কহিলেন, আমি যীশু যাঁহাকে তুমি তাড়না করিতেছ; তোমার জন্য কঠিন যে, তুমি কাঁটায় পদাঘাত করিবে. ৬. এবং তিনি কম্পনরত ও অবাক অবস্থায় কহিলেন, প্রভু, আপনি আমাকে কী করিতে ইচ্ছা করেন? তখন প্রভু তাহাকে বলিলেন[২] (it is hard for thee to kick against the Pricks. 6.. And he trembling and astonished said, Lord, What wilt thou havc me to do? And the Lord said unto him) তুমি উঠ, নগরে প্রবেশ কর, তোমাকে কি করিতে হইবে তাহা বলা যাইবে।"

ক্রীসবাখ ও শোলয্ বলেন : "তোমার জন্য কঠিন যে, তুমি কাঁটায় পদাঘাত করিবে, ৬, এবং তিনি কম্পনরত ও অবাক অবস্থায় কহিলেন, প্রভু, আপনি আমাকে কী করিতে ইচ্ছা করেন? তখন প্রভু তাহাকে বলিলেন" এই কথাগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত।

৩৫শ প্রমাণ : প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ১০ম অধ্যায়ের ৬ আয়াতটি নিম্নরূপ : "সে শিমোন নামে এক জন কর্মকারের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছে, তাহার গৃহ সমুদ্রের ধারে, "তোমাকে কি করিতে হইবে তাহা সে তোমাকে জানাইবে[৩], (he shall tell thee What thou oughtest to do,)"

ক্রীসবাখ ও শোলয বলেন, "তোমাকে কি করিতে হইবে তাহা সে তোমাকে জানাইবে" এই কথাগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত।

৩৬শ প্রমাণ : করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্রের ১০ম অধ্যায়ের ২৮ আয়াতটি নিম্নরূপ : "কিন্তু যদি কেহ তোমাদিগকে বলে, এ প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট

---

১. ইংরেজি ও আরবী বাইবেলে আয়াতটি মূল পাঠের মধ্যে রয়েছে। বাংলা 'ইঞ্জিল শরীফে' এ কথাগুলি একেবারে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর বাংলা বাইবেলে কথাগুলি পাদটীকায় লেখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে; "কোন কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে এখানে এই কথাগুলি পাওয়া যায়"।

২. নিম্নরেখ (underlined) বাক্যগুলি বাংলা বাইবেল ও বাংলা 'ইঞ্জিল শরীফ' থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ইংরেজি ও আরবী বাইবেলে তা রয়েছে।

৩. নিম্নরেখ (underlined) বাক্যগুলি বাংলা বাইবেল ও বাংলা 'ইঞ্জিল শরীফ' থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ইংরেজি ও আরবী বাইবেলে তা রয়েছে।

বলি, তবে যে জানাইল, তাহার জন্য, এবং সংবেদের (conscience বা বিবেকের) জন্য তাহা ভোজন করিও না : কারণ পৃথিবী প্রভুর নিমিত্ত এবং পূর্ণতা [১] (for the earth is the Lord's, and the fulness thereof.) ।"

'কারণ পৃথিবী প্রভুর নিমিত্ত এবং এর পূর্ণতা' এই কথাগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত। হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩২৭ পৃষ্ঠায় এই কথাগুলির জালিয়াতি ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করার পর বলেন : "ক্রীসবাখ এই কথাগুলি বাইবেলের পাঠ থেকে ফেলে দিয়েছেন। কারণ তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে, এই কথাগুলি ফেলে দেওয়া আবশ্যক। সত্য কথা হলো, এই কথাগুলির কোন ভিত্তি, সূত্র বা প্রমাণ নেই। এছাড়া কথাগুলি অর্থহীন, ফালতু কথা। সম্ভবত ২৬ আয়াত থেকে গ্রহণ করে এখানে (২৮ আয়াত) কথাগুলি সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে।"

আদম ক্লার্ক এই আয়াতের টীকায় লিখেছেন : "ক্রীসবাখ এই কথাগুলিকে ফেলে দিয়েছেন। সত্য কথা হলো, কথাগুলির কোন সূত্র বা ভিত্তি নেই।"

১৬৭১, ১৮২১ও ১৮৩১ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদ থেকেও এই কথাগুলি ফেলে দেওয়া হয়েছে (বাংলা অনুবাদেও তা ফেলে দেওয়া হয়েছে)।

৩৭শ প্রমাণ : মথিলিখিত সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ের ৮ আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ "(for the Son of man is Lord even of the Sabbath day) ; কেননা, মনুষ্যপুত্র এমনকি বিশ্রামবারেরও কর্তা[২] ।"

এখানে 'এমনকি' (even/also) শব্দটি পরবর্তী যুগের সংযোজন। হর্ন বিভিন্ন দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, এই শব্দটি সংযোজিত। এরপর তিনি তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৩০ পৃষ্ঠায় বলেন : "মার্কলিখিত সুসমাচারের ২য় অধ্যায়ের ২৮ আয়াত থেকে অথবা লূকলিখিত সুসমাচারের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৫ম আয়াত থেকে এই শব্দটি নেওয়া হয়েছে এবং এখানে সংযোজন করা হয়েছে। ক্রীসবাখ এই অতিরিক্ত সংযোজিত শব্দটিকে ফেলে দিয়ে একটি ভাল কাজ করেছেন।"

৩৮শ প্রমাণ : মথিলিখিত সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ের ৩৫ আয়াত নিম্নরূপ : "ভাল মানুষ হৃদয়ের[৩] ভাল ভাণ্ডার হইতে (out of the good treasure of the heart) ভাল দ্রব্য বাহির করে।"

এখানে "হৃদয়ের" কথাটি অতিরিক্ত সংযোজন। বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ দিয়ে কথাটির সংযোজন প্রমাণ করার পর হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৩০ পৃষ্ঠায় বলেন : "লূকলিখিত সুসমাচারের ৬ অধ্যায়ের ৪৫ আয়াত থেকে এই কথাটি নেওয়া হয়েছে।"

১. নিম্নরেখ (underlined) বাক্যগুলি বাংলা বাইবেল ও বাংলা 'ইঞ্জিল শরীফ' থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ইংরেজি ও আরবী বাইবেলে তা রয়েছে।

২. বাংলা বাইবেলে সংযোজিত শব্দটি বাদ দিয়ে অনুবাদ করা হয়েছে : "কেননা মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারের কর্তা।"

৩. "হৃদয়ের" কথাটি বাংলা বাইবেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

৩৯শ প্রমাণ : মথিলিখিত সুসমাচারের ৬ অধ্যায়ের ১৩ আয়াত নিম্নরূপ : "আর আমাদিগতে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর; কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন্‌।[১]"

"কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন্‌" এই কথাগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করেন যে, এগুলি জাল বা সংযোজিত। ল্যাটিন অনুবাদে এই কথাগুলির অস্তিত্ব নেই। অনুরূপভাবে ক্যাথলিকগণের কোন ইংরেজি অনুবাদেও এই কথাগুলি নেই। যারা এই কথাগুলি সংযোজন করেছেন ক্যাথলিকগণ তাদের নিন্দা করেন।

ক্যাথলিক ওয়ার্ড ১৮৪১ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত তাঁর "ভুলভ্রান্তির পুস্তক" নামক গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় বলেন : "আরাযিমস এই বাক্যটির নিন্দা করেছেন। বিলিঙ্গার বলেছেন, এই বাক্যটি পরবর্তীকালে সংযোজিত। এখন পর্যন্ত জানা যায় না যে, কে এই বাক্যটি সংযোজন করেছেন। লরেনশিশ বলেছেন : 'এই বাক্যটি প্রভুর কথা থেকে পড়ে গিয়েছিল'। লরেনশিশের এই কথার সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই; বরং তাঁর উচিত ছিল, যারা বেপরোয়াভাবে তাদের এই তামাশাকে প্রভুর কথার অংশ বানিয়েছে, তাদেরকে অভিশাপ দেওয়া ও নিন্দা করা।"

প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু পণ্ডিতগণও এই বাক্যটিকে বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন। আদম ক্লার্ক যদিও এই বাক্যটিকে 'সংযোজিত' বলে স্বীকার করেন নি, কিন্তু তিনিও এতটুকু বলেছেন : "ক্রীসবাখ, ভেটস্টীন ও অন্যান্য গবেষক পণ্ডিত, যাঁরা গবেষণার শীর্ষে ছিলেন, তাঁরা এই বাক্যটিকে বাতিল করেছেন।" এই আয়াতটির টীকাতেই তিনি এ কথা বলেছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করলেন যে, গবেষণার শীর্ষে অবস্থানকারী পণ্ডিতেরা এই বাক্যটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কাজেই এরপর তিনি নিজে যদি একথা নাও মানেন তাতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই।

ক্যাথলিক সম্প্রদায় ও প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতগণের গবেষণা অনুযায়ী আমরা দেখছি যে, জালিয়াতগণ এই বাক্যটিকে স্বয়ং যীশুর প্রার্থনার মধ্যে সংযোজিত করেছেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ কোন প্রার্থনাই এ সকল বিকৃতিকারী বা জালিয়াতের হাত থেকে রক্ষা পায় নি।

৪০শ প্রমাণ : যোহনলিখিত সুসমাচারের ৭ম অধ্যায়ের ৫৩ আয়াত এবং ৮ম অধ্যায়ের ১ম আয়াত থেকে ১১শ আয়াত পর্যন্ত ১১টি আয়াত পরবর্তীকালে সংযোজিত।[২]

---

১. নিম্নরেখ (underlined) বাক্যগুলি ইংরেজি বাইবেলের (KJV) ও আরবী বাইবেলের মূল পাঠে বিদ্যমান। বাংলা 'ইঞ্জিল শরীফ' থেকে সেগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। বাংলা বাইবেলের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

২. আয়াতগুলি আরবী ও ইংরেজী বাইবেলে এভাবেই উল্লিখিত। বাংলা বাইবেলে ৭, অধ্যায়টি ৫২ আয়াতে শেষ হয়েছে। ৭ম অধ্যায়ের ৫৩ নং আয়াতটিকে বাংলা বাইবেলে ৮ম অধ্যায়ের ১ম আয়াতের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর ৮ম অধ্যায়ের ১ম থেকে ১১ আয়াত পর্যন্ত পাঠটুকু বিশেষ বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে একটি ব্যভিচারী মহিলার গল্প উল্লেখ করা হয়েছে। তাকে ব্যভিচারের অপরাধে ধরা হলে যীশু বলেন যে, যে ব্যক্তি নিষ্পাপ সে তাকে পাথর মারুক। তখন সকলেই চলে যায়। পরে যীশু মহিলাকে ছেড়ে দেন।

এই ১২টি আয়াতের জালিয়াতি ও সংযোজনের বিষয়ে হর্ন আলোচনা করেছেন। তিনি নিজে এগুলিকে জাল বলে মেনে না নিলেও তিনি তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৩১০ পৃষ্ঠায় বলেন: "আরাযিমস, ক্যালভিন, পেযা, ক্রোটিশ, লিক্লার্ক, ভেটস্টিন, স্কুলার, শোলয, মোরিস, হেনলিন, পলস, স্মিথ ও অন্যান্য লেখক, যাদের কথা উইনফেনস ও কোগার উল্লেখ করেছেন, তাঁরা এই আয়াতগুলির বিশুদ্ধতা স্বীকার করেন না।"

অতঃপর তিনি বলেন : "ক্রীযাস্টিম, থিয়োফেলিক্ট ও নোন্স এই সুসমাচারটির ব্যাখ্যা লিখেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ এই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা করেন নি। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাঁদের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই আয়াতগুলি উল্লেখই করেন নি। টোর্টলিন ও সাইবার্ন ব্যভিচার ও নৈতিক পবিত্রতার বিষয়ে বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা করেন। তাঁরা এই আয়াতগুলির কোনরূপ উল্লেখ করেন নি। তাঁদের নিকট সংরক্ষিত বাইবেলের পাণ্ডুলিপি বা কপিগুলিতে যদি এই আয়াতগুলি থাকত তবে অবশ্যই তাঁরা তাঁদের পুস্তিকায় সেগুলি উল্লেখ করতেন, সেগুলির প্রমাণ পেশ করতেন।"

ক্যাথলিক ওয়ার্ড বলেন : "কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিত যোহনের সুসমাচারের ৮ম অধ্যায়ের প্রথম অংশের বিষয়ে আপত্তি করেছেন।"

নর্টন উল্লেখ করেছেন যে, নিশ্চিত ও সন্দেহাতীতভাবে এই আয়াতগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত।

৪১শ প্রমাণ : মথিলিখিত সুসমাচারের ৬ অধ্যায়ের ১৮ আয়াতে রয়েছে : "তোমার পিতা, যিনি তোমাকে গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে প্রকাশ্যে[১] (openly) ফল দিবেন।"

এখানে 'প্রকাশ্যে' (openly) কথাটি সংযোজিত। আদম ক্লার্ক এই আয়াতের ব্যাখ্যায় শব্দটিকে পরবর্তীকালের সংযোজন বলে প্রমাণ করার পরে বলেন : "এই শব্দটির কোন সূত্র বা ভিত্তি না থাকাতে ক্রীসবাখ, ভেটস্টিন ও পিঙ্গল তা বাইবেল থেকে ফেলে দিয়েছেন।"

৪২শ প্রমাণ : মার্কলিখিত সুসমাচারের ২য় অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে যীশুর নিম্নলিখিত কথাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে : "আমি ধার্মিকদিগকে নয়, কিন্তু পাপীদিগকে অনুশোচনার দিকে[২] (Sinners to repentance) ডাকিতে আসিয়াছি।"

এখানে 'অনুশোচনার দিকে (to repentance)' কথাটি সংযোজিত। আদম ক্লার্ক এই আয়াতের টীকায় এই কথাটির সংযোজন প্রমাণ করার পরে বলেন : "ক্রীসবাখ এই শব্দটিকে পাঠ থেকে ফেলে দিয়েছেন। ক্রোটিস, মিল ও পিঙ্গল তাঁর অনুসরণ করেছেন।"

৪৩শ প্রমাণ : মথির সুসমাচারের ৯ম অধ্যায়ের ১৩ আয়াতেরও একইভাবে বলা হয়েছে : "কেননা আমি ধার্মিকদিগকে নয়, কিন্তু পাপীদিগকেই অনুশোচনার দিকে[৩] (sinners to repentance) ডাকিতে আসিয়াছি।"

১. "প্রকাশ্যে" শব্দটি ইংরেজি ও আরবী পাঠে রয়েছে, কিন্তু বাংলা বাইবেলে ও বাংলা 'ইঞ্জিল শরীফ' থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

২. 'অনুশোচনার দিকে' বাক্যাংশটি বাংলা বাইবেল ও বাংলা ইঞ্জিল শরীফ থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে, যদিও ইংরেজি ও আরবী বাইবেলে তা রয়েছে।

৩. এখানেও বাংলা বাইবেলে ও বাংলা ইঞ্জিল শরীফে 'অনুশোচনার দিকে' কথাটি নেই।

এখানেও 'অনুশোচনার দিকে (to repentance)' কথাটি সংযোজিত। আদম ক্লার্ক এই আয়াতর টীকার এই কথাটির সংযোজন প্রমাণ করার পরে বলেন : "মিল ও গ্রিসবাখ এই কথাটি ফেলে দেওয়াকে উত্তম মনে করেছেন। ক্রীসবাখ কথাটি বাদ দিয়েছেন।"

৪৪শ প্রমাণ : মথিলিখিত সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ে রয়েছে : "২২ কিন্তু যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, তোমরা কি যাচ্ঞা করিতেছ, তাহা বুঝ না; আমি যে পাত্রে পান করিতে যাইতেছি, তাহাতে কি তোমার পান করিতে পার? এবং যে বাপ্তাইজে আমি বাপ্তাইজিত হইয়াছি, তোমরা কি সেই বাপ্তাইজে বাপ্তাইজিত হইতে পার? ('are you able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized With the baptism that I am baptized With). তাঁহারা বলিলেন, পারি। ২৩ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আমার পাত্রে পান করিবে বটে, এবং যে বাপ্তাইজে আমি বাপ্তাইজিত হইয়াছি, তোমরা সেই বাপ্তাইজে বাপ্তাইজিত হইবে বটে,[1] (ye shall drink indeed of my cup and be baptized with the baptism that I am baptized With). কিন্তু যাহাদের জন্য আমার পিতা কর্তৃক স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাদের ভিন্ন আর কাহাকেও আমার দক্ষিণ পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বে বসিতে দিতে আমার অধিকার নাই।" এখানে 'এবং যে বাপ্তাইজে আমি বাপ্তাইজিত হইয়াছি, তোমরা কি সেই বাপ্তাইজে বাপ্তাইজিত হইতে পার?' কথাগুলি পরবর্তী কালের সংযোজন। অনুরূপভাবে পরবর্তী আয়াতে 'এবং যে বাপ্তাইজে আমি বাপ্তাইজিত হইয়াছি, তোমরা সেই বাপ্তাইজে বাপ্তাইজিত হইবে বটে' কথাগুলিও পরবর্তীকালে সংযোজিত। ক্রীসবাখ যে দুইবার বাইবেল মুদ্রণ করেছেন, সেই দুই বারেই উপরের উভয় স্থানের বাক্যগুলি বাইবেল থেকে ফেলে দিয়েছেন। আদম ক্লার্ক এই দুই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই দুই স্থানের বাক্যগুলির সংযোজিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করার পর বলেন : "বস্তুনিষ্ঠ গবেষকগণ বিশুদ্ধ পাঠকে অশুদ্ধ পাঠ থেকে পৃথক করার যে সকল নিয়মনীতি উল্লেখ করেছেন, সেগুলির ভিত্তিতে এই কথাগুলিকে মূল পাঠের অংশ বলে জানা যায় না।"

৪৫শ প্রমাণ : লূকলিখিত সুসমাচারের ৯ম অধ্যায়ে রয়েছে : "৫৫ কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া তাঁহাদিগকে ধমক দিলেন, আর কহিলেন, তোমরা কি প্রকার আত্মার লোক, তাহা জান না। ৫৬ কারণ মনুষ্যপুত্র প্রাণনাশ করিতে আইসেন নাই, কিন্তু রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। পরে তাঁহারা অন্য গ্রামে চলিয়া গেলেন।"

এখানে 'কারণ মনুষ্যপুত্র প্রাণনাশ করিতে আইসেন নাই, কিন্তু রক্ষা করিতে আসিয়াছেন' এই কথাগুলি পরবর্তীকালের সংযোজন। আদম ক্লার্ক এই দুইটি আয়াতের ব্যাখ্যার শেষে বলেন ঃ "ক্রীসবাখ এই কথাগুলি বাইবেলের মূল পাঠ থেকে ফেলে দিয়েছেন। যতদূর জানা যায়, অত্যন্ত প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলিতে এই আয়াতদ্বয় নিম্নরূপ ছিল ঃ কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া তাঁহাদিগকে ধমক দিলেন, আর কহিলেন, তোমরা কি প্রকার আত্মার লোক, তাহা জান না। পরে তাঁহারা অন্য গ্রামে চলিয়া গেলেন।"

---

১. নিম্নরেখ (underlined) বাক্যগুলি বাংলা বাইবেল ও বাংলা 'ইঞ্জিল শরীফ' থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ইংরেজি ও আরবী বাইবেলে তা বিদ্যমান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিয়োজনের মাধ্যমে শাব্দিক বিকৃতির প্রমাণ

প্রথম প্রমাণ : আদিপুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের ১৩ আয়াত : "তখন তিনি অব্রামকে কহিলেন, নিশ্চয় জানিও, তোমার সন্তানগণ পরদেশে প্রবাসী থাকিবে, এবং বিদেশী লোকদের দাস্যকর্ম করিবে, ও লোকে তাহাদিগকে দুঃখ দিবে-চারি শত বৎসর পর্যন্ত।"

এখানে 'পরদেশী...বিদেশী, অব্রামের সন্তানদের দাস্যকর্মে নিয়োগকারী ও দুঃখদানকারী' বলতে মিসরকে বুঝানো হচ্ছে। পরবর্তী ১৪ আয়াত থেকেও তা বুঝা যায়। ১৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "আবার তাহার যে জাতির দাস হইবে আমিই তাহার বিচার করিব; তৎপরে তাহারা যথেষ্ট সম্পত্তি লইয়া বাহির হইবে।" স্বভাবতই এখানে উভয় আয়াতে ইস্রায়েল সন্তানদের মিসরে অবস্থান ও মিসর থেকে বেরিয়ে যাওয়া বুঝনো হয়েছে। কারণ একমাত্র মিসরবাসীরাই সেই জাতি যারা ইস্রায়েল সন্তানগণকে দাস্যকর্মে নিয়োজিত করেছে, দুঃখ দিয়েছে, এরপর সদাপ্রভু ঈশ্বর তাদের বিচার করেছেন এবং ইস্রায়েল সন্তানগণ সেখানে থেকে যথেষ্ট সম্পত্তি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। এ সকল বিষয়ের একত্র ঘটনা অন্য কোথাও ঘটে নি।

যাত্রা পুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ৪০ আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ "ইস্রায়েল-সন্তানেরা চারি শত ত্রিশ বৎসর কাল মিসরে প্রবাস করিয়াছিল।"

এখানে উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। প্রথম আয়াতে ৪০০ বছর ও পরের আয়াত ৪৩০ বছর প্রবাস করার কথা বলা হয়েছে। হয় প্রথম আয়াত থেকে 'ত্রিশ' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে নতুবা দ্বিতীয় আয়াতে 'ত্রিশ' শব্দটি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এই সংযোজন বা বিয়োজন বা বিকৃতির কথা বাদ দিলেও এখানে অন্য ভুল রয়েছে। উভয় আয়াতে প্রদত্ত তথ্যই সন্দেহাতীতভাবে ভুল। নিম্নের বিষয়গুলি প্রমাণ করে যে, উভয় তথ্যই ভুল।

প্রথম বিষয় : মায়ের দিক থেকে মোশি হলেন লেবির দৌহিত্র আর পিতার দিক থেকে লেবির প্র-পৌত্র। মোশির মাতা যোকেবদ। তাঁর পিতা লেবি[১]। আর মোশির পিতা হলেন অম্রম (ইমরান)। অম্রমের পিতা কহাৎ। কহাতের পিতা লেবি।

১. লেবি ইয়াকুব (আ)-এর ১২ পুত্রের একজন এবং ইউসুফ (আ)-এর ভাই। এরাই মিসরে আগমন করেন।

যাত্রাপুস্তকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ও গণনাপুস্তকের ২৬ অধ্যায়ে স্পষ্টতই বলা হয়েছে : "অম্রম আপন পিসি (ফুফু) যোকেবদকে বিবাহ করিলেন"[১]।

ইস্রায়েল (যাকোব) ও তাঁর সন্তানগণের মিসরে আগমনের পূর্বেই মোশির দাদা কহাৎ-এর জন্ম হয়। যাত্রাপুস্তকের ৪৬ অধ্যায়ের ১১ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইস্রায়েল সন্তানগণ যখন মিসরে আগমন করেন তখন লেবির পুত্র কহাৎ তাদের মধ্যে ছিলেন। এতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মিসরে ইস্রায়েল সন্তানগণের অবস্থানের সময়কাল কখনোই ২১৫ বছরের বেশি হতে পারে না।[২]

দ্বিতীয় বিষয় : ইহূদী-খৃস্টান ঐতিহাসিকগণ এবং বাইবেল ব্যাখ্যাকারগণ একমত যে, ইস্রায়েল সন্তানগণ মিসরে ২১৫ বছর অবস্থান করেছিল। প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে যে সকল পুস্তক রচনা করেছেন সেগুলির মধ্যে রয়েছে একটি আরবী পুস্তক। পুস্তকটির নাম 'মুরশিদুত-তালিবীন ইলাল কিতাবিল মুকাদ্দাসিস সামীন' (মহামূল্য পবিত্র পুস্তকের প্রতি শিক্ষার্থিগণের পথনির্দেশক)। পুস্তকটি বৃটিশ চার্চের বিশপীয় মুদ্রণালয়ে ১৮৪০ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত বলে পুস্তকটির উপরে লেখা রয়েছে। পুস্তকটির দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭শ অধ্যায়ে বিশ্ব সৃষ্টির শুরু থেকে খৃস্টের জন্ম পর্যন্ত বিশ্বের ঘটনাবলির তারিখ লেখা হয়েছে। প্রত্যেক ঘটনার দুই পার্শে সন-তারিখ লেখা হয়েছে। ডানে লেখা হয়েছে বিশ্বসৃষ্টির শুরু থেকে সেই ঘটনা পর্যন্ত সময়। আর বামে লেখা হয়েছে সেই ঘটনা থেকে খৃস্টের জন্ম পর্যন্ত সময়। এই পুস্তকের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে :

২২৯৮ যোষেফের পিতা ও ভ্রাতাগণের মিসরে অবস্থান (শুরু) ১৭০৬খৃ.পূ

এরপর ৩৪৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে :

২৫১৩ ইস্রায়েলীয়গণ লোহিত সাগর অতিক্রম করল এবং
ফেরাউন সাগরে ডুবে মৃত্যুবরণ করল ১৪৯১খৃ.পূ

বড় সংখ্যাটি থেকে ছোট সংখ্যাটি বাদ দিলে ২১৫ বছর থাকে। বিয়োগটি নিম্নরূপঃ বিশ্ব সৃষ্টির শুরু থেকে হিসাব করলে: ২৫১৩-২২৯৮ ঃ ২১৫। আর খৃস্টপূর্ব সাল হিসাব করলে : ১৭৯৬-১৪৯১=২১৫।

---

১. যাত্রাপুস্তক ৬/২০ ও গণানাপুস্তক ২৬/৫৯।

২. মোশির দাদা ও নানার সময়ে ইস্রায়েল সন্তানগণ মিসরে আগমন করে এবং মোশির সময়ে তারা মিসর পরিত্যাগ করে। এই তিন পুরুষের সময়কাল ২০০ বছর হওয়াই কঠিন। কহাৎ জন্মের পরে মিসরে আগমন করেন। স্বাভাবিকভাবে আমরা মনে করতে পারি যে, কহাৎ ৩০/৪০ বছর বয়সে অম্রমের জন্ম দেন আর অম্রম ৪০/৫০ বছরে মোশিকে জন্ম দেন। মোশি ৬৫/৭০ বছর বয়সে ইস্রায়েলীয়দের নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন। এতে মনে হয় মিসরে ইস্রায়েলীদের অবস্থান ছিল কমবেশি দেড়শ বছর।

ঐতিহাসিকগণ এই সংখ্যাকেই সঠিক বলে মনে করেন। একটু পরেই আদম ক্লার্কের বক্তব্য অনুবাদ করা হবে। সেই বক্তব্যের মধ্যে পাঠক এ বিষয়ে বাইবেল ভাষ্যকারদের মতামত জানতে পারবেন।

তৃতীয় বিষয় : গালাতীয়দের প্রতি পৌলের পত্রের ৩য় অধ্যায়ে পৌল বলেন : "১৬ ভাল, অব্রাহামের প্রতি ও তাঁহার বংশের প্রতি প্রতিজ্ঞা সকল উক্ত হইয়াছিল। তিনি বহুবচনে 'আর বংশ সকলের প্রতি' না বলিয়া, একবচনে বলেন, 'আর তোমার বংশের প্রতি'। সেই বংশ খ্রীষ্ট। আমি এই বলি, যে নিয়ম ঈশ্বর-কর্তৃক পূর্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল, চারি শত ত্রিশ বৎসর পরে উৎপন্ন ব্যবস্থা সেই নিয়মকে উঠাইয়া দিতে পারে না, যাহাতে প্রতিজ্ঞাকে বিফল করিবে।"

পাঠক পরে জানতে পারবেন যে, পৌলের এই কথার মধ্যে ভুল রয়েছে। তবে এখানে প্রথম লক্ষ্যণীয় যে, তাঁর এই কথাটি আদিপুস্তকের বক্তব্যের সুস্পষ্ট বিপরীত। কারণ তিনি এই ৪৩০ বছর সময়কাল বলতে অবরাহামের কাছে প্রদত্ত ওয়াদা মোশির প্রতি তোরাহ অবতীর্ণ হওয়ার সময় বুঝিয়েছেন। অবরাহামের প্রতি প্রদত্ত এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল ইস্রায়েল সন্তানদের মিসরে প্রবেশের বেশ আগে। আর মোশিকে তোরাহ বা ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছিল তাঁদের মিসর ত্যাগের পরে।[1]

যাত্রাপুস্তকের উপর্যুক্ত তথ্যটি ভুল হওয়ার কারণে শমরীয় ও গ্রীক সংস্করণে তথ্যটি 'সংশোধন' করে বলা হয়েছে : "ইস্রায়েল-সন্তানেরা, তাহাদের পিতাগণ ও পিতামহগণ চারি শত ত্রিশ বৎসর কাল কনান দেশে ও মিসরে প্রবাস করিয়াছিল।" এভাবে মূল বক্তব্যের মধ্যে 'তাহাদের পিতাগণ ও পিতামহগণ' এবং 'কনান দেশে' এই কথাগুলি সংযোজন করা হয়েছে।

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৬৯ পৃষ্ঠায় উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "সকলেই একমত যে, এই আয়াতের অর্থ অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল।"

আমার কথা হলো, এই আয়াতের অর্থ সমস্যাসঙ্কুল নয়, বরং নিশ্চিতরূপে তা ভুল। আদম ক্লার্ক নিজেও তা স্বীকার করেছেন। অতঃপর তিনি শমরীয় তোরাহ-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন : "আলেকজান্ড্রীয় পাণ্ডুলিপির (Codex Alexandronus) পাঠও

১. এতেও সময়কাল ৪৩০ বছর হওয়া কষ্টকর। কারণ পৌল যে প্রতিজ্ঞার কথা বলেছেন, ইসহাকের জন্মের সময় এই প্রতিজ্ঞা করা হয়। ইসহাকের ৬০ বছর বয়সে যাকোবের জন্ম (আদি ২৫/২৬)। ১৩০ বছর বয়সে যাকোব (ইসরায়েল) তাঁর বংশধরদের নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেন। (আদি ৪৭/৯)। এতে বুঝা যায় যে, অবরাহামের সাথে প্রতিজ্ঞা স্থাপনের ১৯০/১৯১ বছর মধ্যে ইস্রায়েলীয়গণ মিসরে প্রবেশ করে। মিসরে তাঁরা বড়জোর দেড়শ বছর অবস্থান করেন। সর্বমোট সময় ৩৫০/৩৬০ বছর হতে পারে। গ্রন্থকার মিসরে তাঁদের অবস্থান ২১৫ ধরেও প্রমাণ করেছেন যে, এই সময়কাল ৪৩০ বছর হতে পারে না।

শমরীয় তোরাহ-এর পাঠের অনুরূপ। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, গ্রীক তোরাহ-এর বিষয়ে শমরীয় পাণ্ডুলিপিই অধিকতর বিশুদ্ধ। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, গ্রীক অনুবাদের ক্ষেত্রে আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ। সকল গ্রীক পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই পাণ্ডুলিপিটিই সবচেয়ে প্রাচীন। এছাড়া পৌলের বিশ্বস্ততায় কারো সন্দেহ নেই। এভাবে এই তিনটি বিষয় একই প্রমাণ করছে। ইতিহাসও এই তিনের কথাই প্রমাণিত করছে। কারণ অবরাহাম কনান দেশে প্রবেশ করেন ইসহাকের জন্মের ২৫ বছর পূর্বে। ৬০ বছর বয়সে ইসহাকের পুত্র যাকোবের জন্ম। ১৩০ বছর বয়সে যাকোব মিসরে প্রবেশ করেন। আর ইস্রায়েলীয়গণ মিসরে অবস্থান করেন ২১৫ বছর। উভয় সময়কাল মিলে সর্বমোট ৪৩০ বছর।"

হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ স্বীকার করেছেন যে, মিসরে ইস্রায়েলীয়গণের অবস্থান ছিল ২১৫ বছর। এরপর তাঁরা শমরীয় তোরাহ্-এর উদ্ধৃত করেন এবং বলেন : "কোন সন্দেহ নেই যে, শমরীয় তোরাহ-এর এই বক্তব্যই সত্য। এর দ্বারা হিব্রু তোরাহ-এর পাঠে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীভূত হয়।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, মূল হিব্রু তোরাহ-এ যাত্রাপুস্তকের এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় সকল খৃস্টান পণ্ডিত ও ভাষ্যকার একটি কথাই বলতে বাধ্য হচ্ছেন, তা হলো, এই পাঠটি ভুল বা বিয়োজন ঘটিত বিকৃতি।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, পৌল যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতেও ভুল রয়েছে। কারণ তিনি এই ৪৩০ বছরের শুরু ধরেছেন অবরাহামের প্রতি প্রদত্ত ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার সময় থেকে। আদিপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ে সুস্পষ্টত বলা হয়েছে যে, ইসহাকের জন্মের এক বছর পূর্বে এই প্রতিজ্ঞা স্থাপিত হয়।[১] এই অধ্যায়ের ২১ আয়াতটি নিম্নরূপ : "কিন্তু আগামী বৎসরের এই ঋতুতে সারা তোমার নিমিত্তে যাহাকে প্রসব করিবে, সেই ইসহাকের সহিত আমি আপন নিয়ম স্থাপন করিব।"

আর মোশিকে তোরাহ প্রদান করা হয়েছিল মিসর থেকে বের হওয়ার তৃতীয় মাসে, যাত্রাপুস্তকের ১৯ অধ্যায়ে তা বলা হয়েছে। আদম ক্লার্ক যে হিসাব দিয়েছেন সেই হিসাব অনুসার যদি ইসহাকের জন্মের এক বছর পূর্ব থেকে তোরাহ প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত হিসাব করা হয় তবে মোট সময়কাল ৪০৭ বছর[২] হয়, ৪৩০ বছর হয় না। প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের ইতিহাস বিষয়ক পুস্তকাদিতেও এ কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত মুরশিদুত তালিবীন পুস্তকের ৪৩৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে :

১. আদিপুস্তক ১৭/১৫-১৯।

২. ইসহাকের জন্মের আগে এক বছর, ইসহাকের ৬০ বছর, যাকোবের ১৩০ বছর, মিসরে ২১৫ বছর ও বের হওয়ার পরের বছরের ৩ মাস।

সৃষ্টির শুরু ২১০৭	অব্রামের সাথে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, তাঁর নাম পরিবর্তন করে "অব্রাহাম' রাখা, ত্বক্‌ছেদের (খতনার) বিধান প্রদান, লোটের উদ্ধার, অশ্লীলতা ও অন্যায়ের কারণে অগ্নি দ্বারা সদোম, ঘমোরা, আদমা ও সাবূয়ীমের বিনাশ	খৃস্টপূর্ব ১৮৯৭

এরপর ৩৪৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে :

২৫১৪	সিনাই পর্বতে ব্যবস্থা প্রদান	১৪৯০খৃ.পূ

বড় সংখ্যাটি থেকে ছোট সংখ্যাটি বাদ দিলে ২০৭ বছর থাকে। বিয়োগটি নিম্নরূপ ঃ বিশ্ব সৃষ্টির শুরু থেকে হিসাব করলে ঃ ২৫১৪-২১০৭ ঃ ৪০৭। আর খৃস্টপূর্ব সাল হিসাব করলে; ১৮৯৭-১৪৯০ = ৪০৭

বিশেষ জ্ঞাতব্য : মোশি পিতার আপন ফুফুকে বিবাহ বিষয়ে

উপরে উল্লেখ করেছি যে, মোশির পিতা অম্রম বা অম্রাম (ইমরান) আপন ফুফু যোকেবদকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি মোশি, হারোণ ও মরিয়মের মাতা। বাইবেলে বিষয়টি খুবই স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে। যাত্রাপুস্তকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "অম্রম আপন পিসি (ফুফু) যোকেবদকে বিবাহ করিলেন"[১]। এই আয়াতের ইংরেজি, আরবী, ফারসী, উর্দু বিভিন্ন ভাষার অনুবাদেও স্পষ্টত তা উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড হলো, ১৬২৫ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে এই আয়াতটি নিম্নরূপ লেখা হয়েছে: "অম্রম আপন <u>পিসির কন্যা</u> যোকেবদকে বিবাহ করিলেন।" এখানে "পিসি" বা "ফুফু" শব্দটিকে বিকৃত করে "পিসির কন্যা" (ফুফুতো বোন) বানানো হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ভ্যাটিকানের পোপ অষ্টম আর্বান (Urban)[২]-এর সময়ে অত্যন্ত যত্ন সহকারে এই আরবী অনুবাদটির অনুবাদকর্ম সম্পাদন করা হয় এবং প্রকাশ করা হয়। এই অনুবাদ ও সম্পাদনা কর্মে অংশগ্রহণ করেন বিপুল সংখ্যক পাদ্রী, যাজক ও পণ্ডিত, যাঁরা হিব্রু, আরবী, গ্রীক ও অন্যান্য ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা এই সংস্করণের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। এই অনুবাদের ভূমিকা থেকে এই বিষয়গুলি জানা যায়।

---

১. এছাড়া গণনাপুস্তকের ২৬ অধ্যায়ের ৫৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "ঐ কহাতের পুত্র অম্রাম। অম্রামের স্ত্রীর নাম যোকেবদ, তিনি লেবির কন্যা, মিসরে লেবির ঔরসে তাহার জন্ম।" এখানে অতি স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, যোকেবদ লেবির ঔরসজাত কন্যা। আর কহাৎ লেবির পুত্র। কাজেই তিনি অম্রামের আপন ফুফু।

২. ১৫৬৫ সালে ইটালিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬২৩ সালে পোপের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ১৬৪৩ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর সময়ে ইউরোপব্যাপী ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হয়। ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশের রাজাগণ প্রটেস্ট্যান্টদের সাহায্যে বড় বড় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। দেখুন, মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, ১৭২-১৭৫।

এ থেকে বুঝা যায় যে, সম্ভবত ইচ্ছাপূর্বক তাঁরা এই বিকৃতিটি ঘটিয়েছিলেন। মোশির বংশধারাকে দুর্নাম ও নিন্দা থেকে মুক্ত রাখার জন্যই তাঁরা একাজ করেছিলেন বলে মনে হয়। কারণ তোরাহ-এর বিধান অনুসারে ফুফু বা পিসিকে বিবাহ করা হারাম বা নিষিদ্ধ। লেবীয় পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের ১২ আয়াতে ও ২০ অধ্যায়ের ১৯ আয়াতে স্পষ্টরূপে এই নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত আরবী অনুবাদেও এই বিকৃতি বিরাজমান।

২য় প্রমাণ : আদিপুস্তকের ৪র্থ অধ্যায়ের ৮ম আয়াতটি নিম্নরূপ: "আর কয়িন (কাবিল) আপন ভ্রাতা হেবলকে (হাবিল) কহিল[১]। পরে তাহারা ক্ষেত্রে গেলে কয়িন আপন ভ্রাতা হেবলের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাকে বধ করিল।"

শমরীয় তোরাহ-এর পাঠ এখানে নিম্নরূপ ঃ "আর কয়িন আপন ভ্রাতা হেবলকে কহিল, আইস আমরা ক্ষেত্রে গমন করি। পরে তাহারা ক্ষেত্রে গেলে কয়িন আপন ভ্রাতা হেবলের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাকে বধ করিল।"

এখানে "আইস আমরা ক্ষেত্রে গমন করি" এই বাক্যটি হিব্রু তোরাহ থেকে বাদ পড়েছে। হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯৩ পৃষ্ঠায় বলেন : "এই বাক্যটি শমরীয়, গ্রীক ও আরামীয় সংস্করণে রয়েছে। অনুরূপভাবে পানিক্লাট ওয়াল্টনে যে ল্যাটিন অনুবাদটি মুদ্রিত হয়েছে তাতেও এই বাক্যটি রয়েছে। কেনিকট বাক্যটি হিব্রু তোরাহ-এর মধ্যে ঢুকানোর নির্দেশ দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে বাক্যটি উপযোগী।"

অতঃপর উক্ত খণ্ডের ৩৩৮ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন ; "গ্রীক অনুবাদের পাঠটি সঠিক হতে পারে। যদিও বর্তমানে প্রচলিত হিব্রু তোরাহ-এর কোন পাণ্ডুলিপি বা কপিতে এই বাক্যটি নেই। হিব্রু তোরাহ-এর মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সবগুলিই এখানে অপূর্ণ। এখানে বক্তব্যের অপূর্ণতা সুস্পষ্ট। ইংল্যান্ডের রাজা জেমসের রাজকীয় মোহরাঙ্কিত নির্ভরযোগ্য ইংরেজি অনুবাদের (King James Version/Authorised Version) অনুবাদক এই স্থানে বাক্যের অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি। এজন্য তিনি এখানে অনুবাদ করেছেন ঃ Cain talked with Abel his brother : 'কয়িন আপন ভ্রাতা হেবলের সহিত কথোপকথন করিল।'

"গ্রীক অনুবাদে এই অপূর্ণতা দূর করা হয়েছে। গ্রীক অনুবাদের সাথে শমরীয় তোরাহ-এর পাঠ মিলে যায়। অনুরূপভাবে ল্যাটিন অনুবাদ, আরামীয় অনুবাদ, ইকোইলার অনুবাদ, ক্যালপিয় ভাষায় লিখিত দুইটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং ইহূদী ফ্লোর উদ্ধৃত অনুচ্ছেদও এর সাথে মিলে যায়।"

হর্ন এখানে যা বললেন, আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠায় অনুরূপ কথা বলেছেন। এই বাক্যটি ১৮৩১ ও ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত আরবী অনুবাদের মধ্যে ঢুকানো হয়েছে।

---

১. গ্রন্থকার প্রদত্ত পাঠের অনুবাদ। প্রচলিত বাইবেলে বাক্যটি নিম্নরূপ : "আপন ভ্রাতা হেবলের সহিত কথোপকথন করিল।" গ্রন্থকার একটু পরেই উল্লেখ করবেন যে, 'কহিল' শব্দটিকে 'কথোপকথন করিল' করা হয়েছে বাক্যটির সংশোধনের জন্য।

৩য় প্রমাণ : আদিপুস্তকের ৭ম আয়াতে হিব্রু তোরাহ-এ বলা হয়েছে : "আর চল্লিশ দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইল (And the flood was forty days upon the earth.)।"

অনেক ল্যাটিন কপিতে ও গ্রীক অনুবাদে এই বাক্যটি নিম্নরূপ: "আর চল্লিশ দিবস ও রাত্রি পর্যন্ত পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইল।"

হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলেন : "অতএব হিব্রু পাঠের মধ্যে 'রাত্রি' শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।"

চতুর্থ প্রমাণ : আদিপুস্তকের ৩৫ অধ্যায়ের ২২ আয়াতটি হিব্রু সংস্করণে নিম্নরূপ: "সেই দেশে ইস্রায়েলের (যাকোবের) অবস্থিতি কালে রূবেন (যাকোবের প্রথম পুত্র) গিয়া আপন পিতার বিল্‌হা নাম্নী উপপত্নীর সহিত শয়ন করিল, এবং ইস্রায়েল (যাকোব) তাহা শুনিতে পাইলেন।"

হেনরি ও স্কটের ভাষ্যগ্রন্থের সংকলকগণ বলেন ঃ "ইহূদীগণ স্বীকার করেন যে, এই আয়াত থেকে কিছু কথা বাদ পড়ে গিয়েছে। গ্রীক অনুবাদে এই অপূর্ণতা নিম্নরূপে পূরণ করা হয়েছে : "এবং তাঁহার দৃষ্টিতে তা অন্যায় হইল"।"

তাহলে ইহূদীরাও স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, কিছু কথা বাদ পড়েছে। হিব্রু তোরাহ থেকে একটি পূর্ণ বাক্য বাদ পড়ে যাওয়া বা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াও ইহূদী-খৃস্টানগণের নিকট কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। তাহলে দুই একটি শব্দের বিষয়ে আর কি কথা থাকতে পারে !

পঞ্চম প্রমাণ : বাইবেল ব্যাখ্যাকার হার্সলি তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৮২ পৃষ্ঠায়, আদিপুস্তকের ৪৪ অধ্যায়ের ৫ম আয়াতের টীকায় বলেন : "এই আয়াতের শুরুতে নিম্নের বাক্যটি সংযোজিত করতে হবে : "তোমরা কেন আমার বাটি চুরি করিলে?"[১] গ্রীক অনুবাদ থেকে এই বাক্যটি নিয়ে হিব্রু পাঠে যোগ করতে হবে।"

তাহলে তিনি স্বীকার করলেন যে, হিব্রু তোরাহ থেকে এই বাক্যটি বাদ পড়ে গিয়েছে।

৬ষ্ঠ প্রমাণ : আদিপুস্তকের ৫০ অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে রয়েছে : "আর তোমরা এ স্থান হইতে আমার অস্থি লইয়া যাইবে।"

শমরীয় তোরাহ, গ্রীক অনুবাদ, ল্যাটিন অনুবাদ ও অন্য কিছু প্রাচীন অনুবাদে এখানে রয়েছে : "তোমরা এ স্থান হইতে আমার অস্থি তোমাদের সহিত লইয়া যাইবে।"

তাহলে "তোমাদের সহিত" কথাটুকু হিব্রু তোরাহ থেকে বাদ পড়েছে। হর্ন বলেন : "মি. পেট্রায়েড তাঁর প্রণীত বাইবেলের নতুন অনুবাদের মধ্যে এখানে এই পরিত্যক্ত বাক্যাংশটুকুকে সংযোজন করেছেন। তাঁর কাজটি সঠিক হয়েছে।"

১. এখানে যোষেফ (ইউসূফ আ.)-এর ভাইয়ের ছালার মধ্যে তাঁর বাটি রাখা ও পরে তা বের করার ঘটনা বলা হয়েছে। উপরের বাক্যটি যোগ না করলে কথা অপূর্ণ থাকে।

৭ম প্রমাণ : যাত্রাপুস্তকের ২য় অধ্যায়ের ২২ আয়াতটি নিম্নরূপ : "পরে ঐ স্ত্রী পুত্র প্রসব করিলেন, আর মোশি তাহার নাম গোর্শোম (তত্রপ্রবাসী) রাখিলেন, কেননা তিনি কহিলেন, আমি বিদেশে প্রবাসী হইয়াছি।"

গ্রীক অনুবাদ ও অন্যান্য কোন কোন প্রাচীন অনুবাদে এই আয়াতের শেষে নিম্নের কথাগুলি রয়েছে : "এবং ঐ স্ত্রী দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করিলেন। মোশি তাহার নাম আলিয়াসর রাখিলেন কেননা তিনি কহিলেন, আমার পিতার ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং আমাকে ফরৌণের হস্ত হইতে মুক্তি দিয়াছেন।"

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩১০ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন অনুবাদ থেকে উপর্যুক্ত বাক্যটিকে উদ্ধৃত করে বলেন : "হিউবি কেন্ট এই কথাগুলিকে তাঁর ল্যাটিন অনুবাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে, এই কথাটির জন্য এটিই সঠিক স্থান। এই কথাগুলি হিব্রু তোরাহ-এর কোন লিখিত বা মুদ্রিত কপিতে নেই, যদিও গ্রহণযোগ্য অনুবাদের মধ্যে তা পাওয়া যায়।"

তাহলে তাঁরা স্বীকার করলেন যে, এই কথাগুলি হিব্রু তোরাহ থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে।

৮ম প্রমাণ : যাত্রাপুস্তকের ৬ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে রয়েছে : "অম্রম আপন পিসি যোকেবদ্‌কে বিবাহ করিলেন, আর উনি তাঁহার জন্য হারোণকে ও মোশিকে প্রসব করিলেন।"

শমরীয় সংস্করণে এবং গ্রীক অনুবাদে রয়েছে :"আর ইনি তাঁহার জন্য হারোণকে, মোশিকে ও তাঁহাদের ভগিনী মরিয়মকে প্রসব করিলেন।"

তাহলে "ও তাঁহাদের ভগিনী মরিয়মকে" কথাগুলি হিব্রু তোরাহ থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে। আদম ক্লার্ক শমরীয় ও গ্রীক সংস্করণ থেকে উপর্যুক্ত কথাগুলি উদ্ধৃত করার পরে বলেন : "কোন কোন শীর্ষস্থানীয় গবেষক পণ্ডিত মনে করেন যে, হিব্রু পাঠেও এই কথাগুলি ছিল।"

৯ম প্রমাণ : গণনাপুস্তকের ১০ অধ্যায়ের ৬ আয়াতটি নিম্নরূপ : "তোমরা দ্বিতীয়বার রণবাদ্য বাজাইলে দক্ষিণদিক্‌স্থিত শিবিরের লোকেরা শিবির উঠাইবে।"

গ্রীক অনুবাদে এই কথাগুলির পরে নিম্নের অতিরিক্ত কথাগুলি রয়েছে : "এবং তোমরা তৃতীয়বার রণবাদ্য বাজাইলে পশ্চিম দিক্‌স্থিত শিবিরের লোকেরা শিবির উঠাইবে। এবং তোমরা চতুর্থবার রণবাদ্য বাজাইলে উত্তরদিক্‌স্থিত শিবিরের লোকের শিবির উঠাইবে।"

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৬৬৩ পৃষ্ঠায় বলেন : "এখানে (হিব্রু তোরাহ-এ) পশ্চিম ও উত্তর শিবিরের কথা বলা হয়নি। তবে একথা পরিজ্ঞাত যে, পশ্চিম ও উত্তর শিবিরের প্রস্থানের জন্যও রণবাদ্য বাজানো হতো। এতে বুঝা যায় যে, পশ্চিম ও উত্তর শিবিরের জন্য রণবাদ্য বাজানোর নির্দেশনা ছিল, কিন্তু তা হিব্রু

তোরাহ-এর পাঠ থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে। গ্রীক অনুবাদে তা পূরণ করে বলা হয়েছে : "এবং তোমরা তৃতীয়বার রণবাদ্য বাজাইলে পশ্চিমদিকস্থিত শিবিরের লোকের শিবির উঠাইবে। এবং তোমরা চতুর্থবার রণবাদ্য বাজাইলে উত্তরদিকস্থিত শিবিরের লোকের শিবির উঠাইবে।"

১০ম প্রমাণ : বাইবেল-ভাষ্যকার হার্সলি বলেন : "বিচারকর্তৃগণের বিবরণ-এর ১৬ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতের শেষ ও ১৪ আয়াতের শুরু থেকে কিছু কথা বাদ পড়ে গিয়েছে। গ্রীক অনুবাদ থেকে তা গ্রহণ করতে হবে এবং এখানে নিম্নের কথাগুলি সংযোজন করতে হবে : "তুমি যদি আমার মাথার সাত গুচ্ছ চুল তানার সহিত বুন, এবং দেওয়ালের মধ্যে গোঁজের সহিত বাঁধ তবে আমি দুর্বল হইয়া অন্য লোকের সমান হইব। তখন সে তাঁহাকে নিদ্রাগত করাইল এবং তাঁহার মাথার ৭ গুচ্ছ চুল লইল, এবং সেগুলিকে তানার সহিত বুনিল, এবং তাঁতের গোঁজের সহিত তাহা বদ্ধ করিয়া... ।"[১]

১১শ প্রমাণ : [২] আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৬৭৬ পৃষ্ঠায় বলেন : "গ্রীক অনুবাদ থেকে ৩য় আয়াতটি সম্পূর্ণই বাদ পড়ে গিয়েছে। শুধু 'শখনিয়' (Shechani'ah,)[৩] শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর ৪, ৫, ৬, ৩৭, ৩৯, ৪০ ও ৪১ আয়াত সবই বাদ দেওয়া হয়েছে। আর প্রাচীন আরবী অনুবাদে উক্ত অধ্যায়ের ১ম আয়াত থেকে ২৬ আয়াত এবং ২৯শ আয়াত বাদ দেওয়া হয়েছে।

---

১. এখানে ইস্রায়েলীর বীর শিম্‌শোনে-এর কল্প-কাহিনী বলা হয়েছে। তিনি এমন মহাবীর ছিলেন যে, পাহাড়-পর্বত উপড়ে ফেলতে পারতেন! প্রাসাদ নগর ভেঙ্গে কাঁধে করে নিয়ে যেতেন!! তাঁর প্রেমিকা 'দলীলা'-র মাধ্যমে শত্রুরা তাঁর শক্তির গোপন সূত্র জানতে চেষ্টা করে। ১৩ ও ১৪ আয়াতদ্বয় নিম্নরূপ : "১৩ পরে দলীলা শিম্‌শোনকে কহিল, এ যাবৎ তুমি আমাকে উপহাস করিলে, আমাকে মিথ্যা কথা কহিলে : কিসে তোমাকে বাঁধিতে পারা যায়, আমাকে বল না। তিনি কহিলেন, তুমি যদি আমার মাথার সাত গুচ্ছ চুল তানার সহিত বুন, (তবে হইতে পারে)৮৪। ১৪ তাহাতে সে তাঁতের গোঁজের সহিত তাহা বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে শিম্‌শোন! পলেষ্টীয়রা তোমাকে ধরিল। তখন তিনি নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া তানা শুদ্ধ তাঁতের গোঁজ উপড়াইয়া ফেলিলেন।" হার্সলি যে কথাগুলি উল্লেখ করেছেন সেগুলি না থাকলে এই আয়াতদ্বয়ের অর্থ অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ থাকে।

২. ১১শ প্রমাণের আলোচনাটি মূল আরবী বইয়ে অস্পষ্ট ও অবোধ্য হয়ে গিয়েছে। কারণ সেখানে আয়াত সংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হলেও পুস্তক ও অধ্যায়ের কোন প্রকারের উল্লেখ নেই। অনেক অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার পরে আমার কাছে মনে হয়েছে, লেখক এখানে নহিমিয়ের পুস্তকের ১২শ অধ্যায়টির কথা বলেছেন। লেখকের অসাবধানতায় বা মুদ্রকের অবহেলায় পুস্তক ও অধ্যায়ের কথা অনুল্লিখিত রয়ে গিয়েছে।

৩. আরবীতে শকনিয়াহ (شكنياه) লেখা আছে। আমি আমার অনুসন্ধানের ভিত্তিতে বাংলা ও ইংরেজী উচ্চারণ লিখেছি। নহিমিয় ১২/৩ নিম্নরূপ : Shechani'ah, Rehum, Mer'emoth) : শখনিয়, রহূম, মরেমোৎ..। এতে বুঝা যায় যে, গ্রীক অনুবাদে ৩য় আয়াতের প্রথম শব্দটির পর থেকে ৬ষ্ঠ আয়াত পর্যন্ত সব বাদ দেওয়া হয়েছে।

১২শ প্রমাণ : ইয়োবের পুস্তকের ৪২ অধ্যায়ের ১৭ আয়াতটি নিম্নরূপ : "... ইয়োব (আইউব আ.) বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।"

হিব্রু বাইবেল এখানেই ইয়োবের পুস্তকের সমাপ্তি। গ্রীক অনুবাদে এর পরে ... হয়েছে : "ঈশ্বর যাহাদেরকে পুনরুত্থিত করিবেন তিনি তাহাদের সহিত পুনরুত্থিত হইবেন।" এছাড়া ইয়োবের বংশাবলি ও তাঁর অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ক্যামেট ও হার্ডার বলেন : "এই অতিরিক্ত সংযোজিত কথাগুলি ঐশ্বরিক প্রত্যাদিষ্ট পুস্তকের অংশ। ইহূদী ফ্লো এবং পোলিহেচারও তা স্বীকার করেছেন। ওরিগনের (Origen) যুগেও–অর্থাৎ খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেও মানুষেরা এগুলিকে ঈশ্বরের বাণী হিসাবে গণ্য করতো। থিওডোশান (Theodotian Ephesus) তাঁর গ্রীক অনুবাদে এগুলি লিখেছেন।"

এ থেকে জানা গেল যে, এ সকল প্রাচীন খৃস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতের মতে এখানে ঈশ্বরের বাণী বাদ দিয়ে হিব্রু বাইবেলকে বিকৃত করা হয়েছে। আর প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গবেষক ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণের মতে এই অতিরিক্ত কথাগুলি জাল ও বানোয়াট। এদের মতানুসারে প্রমাণিত হলো যে, ঈশ্বরের বাণীর মধ্যে জাল কথা সংযোজন করে গ্রীক অনুবাদ বিকৃত করা হয়েছে।

হর্ন বলেন : "বাহ্যত বুঝা যায় যে, (গ্রীক অনুবাদে সংযোজিত) এই কথাগুলি জাল ও বানোয়াট, যদিও খৃষ্টের পূর্বেই এগুলি লিখিত হয়েছে।"

এখানে আমার কথা হলো, যেহেতু প্রমাণিত হলো যে, এই জাল কথাগুলি খৃষ্টের পূর্বেই লিখা হয়েছে, সেহেতু প্রমাণিত হলো যে, যীশুশিষ্য প্রেরিতগণের যুগ থেকে ১৫০০ বছর পর্যন্ত প্রাচীন যুগে সকল খৃস্টান এই বিকৃত, জাল ও বানোয়াট কথাগুলিকে ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করেছেন। কারণ এই দীর্ঘ সময় ধরে তাঁরা সুদৃঢ়ভাবে গ্রীক অনুবাদকে ঈশ্বরের বাণী বলে মেনে চলেছেন। তাঁরা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করতেন যে, গ্রীক অনুবাদটিই সঠিক এবং হিব্রু বাইবেল বিকৃত।

১৩শ প্রমাণ : গীতসংহিতার ১৪ গীতের ৩য় আয়াতের পরে ল্যাটিন অনুবাদে, ইথিওপিয় অনুবাদে, আরবী অনুবাদে এবং গ্রীক অনুবাদের ভ্যাটিকানের পাণ্ডুলিপিতে নিম্নের বাক্যগুলি রয়েছে : "তাহাদের কণ্ঠ অনাবৃত কবরস্বরূপ; তাহারা জিহ্বাতে ছলনা করিতেছে; তাহাদের ওষ্ঠধরের নিম্নে কালসর্পের বিষ থাকে; তাহাদের মুখে অভিশাপ ও কটুকাটব্যে পূর্ণ; তাহাদের চরণ রক্তপাতের জন্য ত্বরান্বিত। তাহাদের পথে পথে ধ্বংস ও বিনাশ; এবং শান্তির পথে তাহারা জানে নাই; ঈশ্বর-ভয় তাহাদের চক্ষুর অগোচর।"

এই বাক্যগুলি হিব্রু বাইবেলে নেই। কিন্তু এই কথাগুলি রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রে রয়েছে[১]। এখানে দুইটি বিষয়ের একটি অবশ্যই ঘটেছে। হয়তবা ইহূদীরা মূল হিব্রু বাইবেল (গীতসংহিতা) থেকে এই আয়াতগুলি ফেলে দিয়েছে, নতুবা খৃষ্টানগণ তাঁদের মহাপুরুষ পৌলের বক্তব্যকে প্রমাণিত করার জন্য তাঁদের অনুবাদের মধ্যে এই কথাগুলি সংযোজন করেছে। প্রথম সম্ভাবনা স্বীকার করলে বাইবেলে বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃতি প্রমাণিত হয়। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনা স্বীকার করলে বাইবেলে সংযোজন ও বৃদ্ধির মাধ্যমে জালিয়াতি প্রমাণিত হয়। সর্বাবস্থায় এখানে দুই প্রকারের জালিয়াতির এক প্রকার মানতেই হবে।

আদম ক্লার্ক গীতসংহিতার উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : এই আয়াতের শেষে গ্রীক অনুবাদের ভ্যাটিকান-পাণ্ডুলিপিতে এবং ল্যাটিন অনুবাদ, ইথিওপীয় অনুবাদ ও আরবী অনুবাদে ৬টি আয়াত অতিরিক্ত উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ১৩-১৮ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।"

১৪শ প্রমাণ : যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৪০ অধ্যায়ের ৫ আয়াতে বলা হয়েছে : "আর সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রকাশ পাইবে, আর সমস্ত মর্ত্য (সমস্ত মানুষ- (All-flesh) এক সঙ্গে তাহা দেখিবে, কারণ সদাপ্রভুর মুখ ইহা বলিয়াছে।"

গ্রীক অনুবাদে আয়াতটি নিম্নরূপ : "আর সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রকাশ পাইবে, আর সমস্ত মর্ত্য একসঙ্গে আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখিবে, কারণ সদাপ্রভুর মুখ ইহা বলিয়াছে।"

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ২৭৮৫ পৃষ্ঠায় গ্রীক অনুবাদের পাঠটি উদ্ধৃত করে বলেন : "আমার ধারণা হলো, এইটি মূল পাঠ"।

এরপর তিনি বলেন : "অতি প্রাচীনকাল থেকেই মূল হিব্রু বাইবেল থেকে এই কথাটুকু ফেলে দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন ক্যালিডীয় অনুবাদ ও সিরীয় অনুবাদের আগেই এই কথাগুলি ফেলে দেওয়া হয়েছে।[২] গ্রীক অনুবাদের সকল কপিতেই এই কথাগুলি পাওয়া যায়। লূক তাঁর সুসমাচারের ৩য় অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ আয়াতে তা স্বীকার করে নিয়েছেন। আমার নিকট একটি অতি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি রয়েছে, তাতে এই আয়াতটি সম্পূর্ণই ফেলে দেওয়া হয়েছে।"

---

১. পৌল পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন : "১০ যেমন লিখিত আছে ধার্মিক কেহই নাই, একজনও নাই..." এরপর উপরের বাক্যগুলি লিখেছেন। রোমীয় ৩/১০-১৮।

২. অর্থাৎ প্রাচীন ক্যালিডীয় ও সিরীয় অনুবাদেও এই কথাগুলি নেই। এতে বরং প্রমাণিত হয় যে, এই কথাগুলি গ্রীক অনুবাদে বাড়ানো হয়েছে। কারণ তা অন্যান্য প্রাচীন অনুবাদে নেই, শুধু গ্রীক অনুবাদে রয়েছে। কিন্তু যেহেতু গ্রীক অনুবাদের উপর নির্ভর করে লূক তা লিখেছেন, এজন্য খৃস্টান পণ্ডিতগণ অযৌক্তিকভাবে কথাটিকে সঠিক বলে দাবি করেছেন। কিন্তু তাতেও হিব্রু বাইবেলের বিকৃতি প্রমাণিত হচ্ছে।

হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পর্বের ৮ম অধ্যায়ে বলেন : "লুক তাঁর সুসমাচারের ৩য় অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ আয়াতে এই কথাটিকে গ্রীক অনুবাদের অনুরূপই উদ্ধৃত করেছেন। লোথা গ্রীক পাঠকেই সঠিক মনে করেছেন। এজন্য তিনি যিশাইয়র পুস্তকের অনুবাদের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত করেছেন।"

হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ বলেন : এখানে (যিশাইয়র পুস্তকে) 'দেখিবে' কথাটির পরে 'আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ' কথাগুলি সংযোজন করতে হবে। ৫২ অধ্যায়ের ১০ আয়াত ও গ্রীক অনুবাদ দেখুন।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, এ সকল প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের স্বীকৃতি অনুসারে এই স্থানে হিব্রু বাইবেল বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃত করা হয়েছে। আর আদম ক্লার্ক স্বীকার করেছেন যে, এই বিকৃতি অতি প্রাচীন।

১৫শ প্রমাণ : যিশাইয়র পুস্তকের ৬৪ অধ্যায়ের ৫ম আয়াতের ব্যাখ্যায় আদম ক্লার্ক বলেন : "আমার বিশ্বাস হলো, এখানে লিপিকারের ভুলে কিছু কথা বাদ পড়ে গিয়েছে। এই বিকৃতি অতি প্রাচীন। কারণ প্রাচীন অনুবাদকগণ এই আয়াতের কোন অর্থ ভালভাবে বলতে পারেন নি। অনুরূপভাবে পরবর্তী অনুবাদকগণও এর কোন স্পষ্ট অর্থ করতে পারেন নি।"

১৬শ প্রমাণ : হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৪৭৮ পৃষ্ঠায় বলেন : "লূকলিখিত সুসমাচারের ২১ অধ্যায়ের ৩৩ ও ৩৪ আয়াতের মাঝখানে একটি পূর্ণ আয়াত পড়ে গিয়েছে। মথিলিখিত সুসমাচারের ২৪ অধ্যায়ের ৩৬ আয়াত অথবা মার্ক লিখিত সুসমাচারের ১৩ আয়াত থেকে কথাটি নিয়ে লূকের সুসমাচারের উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয়ের মাঝে সংযোজন করতে হবে।"

এরপর টীকায় বলেন : "এখানে যে বড় রকমের বিয়োজন ও বিকৃতি ঘটেছে সে বিষয়টি সকল গবেষক ও ব্যাখ্যাকার এড়িয়ে গিয়েছেন। সর্বপ্রথম হেলস-ই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।"

তাহলে তাঁর স্বীকৃতি অনুযায়ী লূকের সুসমাচার থেকে একটি পূর্ণ আয়াত বাদ পড়ে গিয়েছে, যে আয়াতটি পুনঃসংযোজন অত্যাবশ্যক। মথির সুসমাচারে আয়াতটি নিম্নরূপ : "কিন্তু সেই দিনের ও সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গের দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।"[১]

১৭শ প্রমাণ : প্রেরিতগণের কার্যবিবরণ পুস্তকের ১৬ অধ্যায়ের ৭ আয়াতে রয়েছে: "কিন্তু আত্মা[২] (পবিত্র-আত্মা) তাঁহাদিগকে যাইতে দিলেন না (but the spirit suffered them not)।"

১. এই কথাটি 'ত্রিত্ববাদ' ও খৃস্টের 'ঈশ্বরত্বের' দাবির পরিপন্থী। সম্ভবত একারণেই ধার্মিক খৃস্টানগণ এই কথাটিকে লূকের এই স্থান থেকে ফেলে দিয়েছেন। পাঠক পরবর্তী আলোচনা থেকে জানতে পারবেন যে, মথির আয়াতেও এ কারণে জালিয়াতি করা হয়েছে।

২. বাংলা বাইবেলে এখানে সংশোধন করে "যীশুর আত্মা" লেখা হয়েছে।

ক্রীসবাখ ও শোলয বলেন : "সঠিক বাক্যটি নিম্নরূপ হবে : কিন্তু যীশুর আত্মা তাঁহাদিগকে যাইতে দিলেন না।"

এভাবে তাঁরা স্বীকার করলেন যে, এখানে বাইবেলের পাঠ থেকে 'যীশু' কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। ১৬৭১ও ১৮২১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে এই শব্দটি সংযোজন করা হয়েছে। এই দুই সংস্করণে বাক্যটি নিম্নরূপ ঃ "কিন্তু যীশুর আত্মা তাঁহাদিগকে ছাড়িলেন না।"

১৮শ প্রমাণ : বর্তমানে মথির নামে যে সুসমাচারটি প্রচলিত এটিই খৃষ্টানগণের নিকট প্রথম এবং প্রাচীনতম সুসমাচার। সুনিশ্চিত যে, বর্তমানে প্রচলিত এই সুসমাচারটি কখনোই মথির লিখিত নয়।[১] মথির লেখা মূল সুসমাচারটিকে খৃষ্টানগণ বিকৃত করেন। এরপর তাঁরা সেটিকে নষ্ট করে ফেলেন। সকল প্রাচীন খৃষ্টান ধর্মগুরু এবং অগণিত আধুনিক পণ্ডিত একমত যে, মথি তাঁর সুসমাচারটি হিব্রু ভাষায় রচনা করেন। প্রাচীন কিছু খৃষ্টান সম্প্রদায় সুসমাচারটিকে বিকৃত করে ফেলেন। ফলে সুসমাচারটি নষ্ট হয়ে যায় ও হারিয়ে যায়।

বর্তমানে 'মথিলিখিত সুসমাচার' নামে যে পুস্তকটি প্রচলিত তা মথির মূল সুসমাচারের গ্রীক অনুবাদ বলে মনে করা হয়। এই অনুবদাটিরও কোন সূত্র তাঁদের নিকট নেই। এমনকি, এই অনুবাদটির অনুবাদকের নামও এখন পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে জানা যায় নি। পঞ্চম খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধতম খৃষ্টান ধর্মগুরু সেন্ট জিরোম (St. Jerome) এ কথা স্বীকার করেছেন। অনুবাদকের নামই যখন জানা যায় নি, তখন তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা বা যোগ্যতা জানার আর উপায় কি?

হ্যাঁ, খৃষ্টান পণ্ডিতগণ আন্দাজে ঢিল ছুড়ে বলেন, সম্ভবত অমুক অথবা অমুক... পুস্তকটির অনুবাদ করেছিলেন। এই ভিত্তিহীন আনুমানিক কথাকে প্রতিপক্ষের কাছে দলিল হিসেবে পেশ করা যায় না। তেমনি আন্দাজ, অনুমান ও কল্পনা দিয়ে কোন পুস্তকের লেখকের নাম প্রমাণ করা যায় না।

আধুনিক কোন কোন প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত কোনরূপ প্রমাণ ও সূত্র ছাড়াই সম্পূর্ণ আন্দাজ ও কল্পনার উপরে ভিত্তি করে দাবি করেন যে, সম্ভবত মথি নিজেই পুস্তকটির অনুবাদ করেছিলেন। আমরা দেখলাম যে, সকল প্রাচীন ও অগণিত আধুনিক খৃষ্টান ধর্মগুরু একমত যে, মূল পুস্তকটি হারিয়ে গিয়েছে এবং প্রচলিত অনুবাদের অনুবাদকের কোন নাম বা পরিচয় জানা যায় না। এদের ঐকমত্যের বিপরীতে এ সকল প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতের আনুমানিক দাবি মূল্যহীন।

১. আধুনিক খৃষ্টান গবেষকগণ মনে করেন যে, মার্কের সুসমাচার মথির পূর্বে লেখা এবং মার্কের সুসমাচার দেখে এবং তা থেকে বিভিন্ন তথ্য নিয়েই মথির সুসমাচার রচনা করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এই সুসমাচারটি কখনোই শিষ্য মথির লেখা নয়। কারণ মার্ক খৃষ্টের শিষ্য ছিলেন না। 'মথির' সুসমাচারটি যদি শিষ্য মথির লেখা হতো, তবে কখনোই তিনি অ-শিষ্য একজনের বই থেকে তথ্য ধার করতেন না। বিস্তারিত দেখুন : Encyclopaedia Britannica, article; Gospel accordiong to Matthew; Gospel according to Mark; synopic gospels.

এখানে আমি উপর্যুক্ত বিষয়গুলির দলিল-প্রমাণাদি উপস্থাপন করছি :

১. এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ১৯ খণ্ডে বলা হয়েছে : "নতুন নিয়মের সকল পুস্তকই গ্রীক ভাষায় লিখিত হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম মথিলিখিত সুসমাচার ও ইব্রীয়দের প্রতি পত্র। বিভিন্ন দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে একথা সুনিশ্চিত যে, এই দুইটি পুস্তক হিব্রু ভাষায় লিখিত হয়েছিল।"

২. লর্ডনার তাঁর পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৯ পৃষ্ঠায় 'মুলনীতিসমূহ' আলোচনায় বলেন : "বেবিস লিখেছেন যে, মথি তাঁর সুসমাচারটি হিব্রু ভাষায় লিখেছিলেন। এরপর প্রত্যেকে নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে তার অনুবাদ করেছেন।"

(প্রত্যেকে নিজ নিজযোগ্যতানুসারে তার অনুবাদ করেছেন) এই কথা থেকে জানা যায় যে, অনেকেই এই সুসমাচারটির অনুবাদ করেছিলেন। পূর্ণ সূত্র বা তথ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় নি যে, বর্তমানে প্রচলিত অনুবাদটির অনুবাদক কোন্ ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি ঐশ্বরিক প্রেরণাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন কি না। কাজেই কিভাবে এই পুস্তকটিকে ঐশ্বরিক বলে গ্রহণ করা যেতে পারে?

৩. এরপর লর্ডনার উক্ত খণ্ডেরই ১৭০ পৃষ্ঠায় বলেন : "(২য়-৩য় শতকের ধর্মগুরু) আরিনাউস (Irenaus) লিখেছেন, যখন পৌল ও পিতর রোমে ধর্মপ্রচার করছিলেন, তখন মথি তাঁর সুসমাচারটি ইহূদীদের ভাষায় রচনা করেন।"

৪. অতঃপর উক্ত খণ্ডের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন : "(তৃতীয় শতাব্দীর ধর্মগুরু) ওরিগনের (Origen) তিনটি বক্তব্য রয়েছে। একটি বক্তব্য ইউসেবিয়াস (Eusebius Pamphilus) উদ্ধৃত করেছেন। এই বক্তব্যে তিনি বলেন : 'ইহূদীদের মধ্য থেকে যারা বিশ্বাস গ্রহণ করেছিলেন (খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন) তাঁদের জন্য মথি তাঁর এই সুসমাচারটি হিব্রু ভাষায় রচনা করেন।' দ্বিতীয় বক্তব্যে তিনি বলেন : 'মথি প্রথমে তাঁর সুসমাচারটি হিব্রু ভাষায় রচনা করেন এবং হিব্রুগণকে (ইহূদীগণকে) তা প্রদান করেন।' তৃতীয় বক্তব্যে তিনি বলেছেন : 'যে সকল ইব্রীয় (ইহূদী) অবরাহাম ও দায়ূদের বংশের একজন প্রতিশ্রুত ব্যক্তির অপেক্ষা করতেন মথি তাদের জন্য তাঁর সুসমাচারটি রচনা করেন'।"

৫. অতঃপর চতুর্থ খণ্ডের ৯৫ পৃষ্ঠায় লর্ডনার বলেন : "ইউসেবিয়াস (Eusebius Pamphilus) লিখেছেন যে, মথি হিব্রুগণের (ইহূদীগণের) মধ্যে ধর্মপ্রচারের পরে যখন অন্যান্য দেশে গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তিনি তাদের ভাষায় তাঁর সুসমাচারটি রচনা করে তাদেরকে প্রদান করেন।"

৬. অতঃপর তিনি উক্ত ৪র্থ খণ্ডেরই ১৭৪ পৃষ্ঠায় বলেন : "সার্ল বলেন, মথি তাঁর সুসমাচারটি হিব্রু ভাষায় রচনা করেন।"

৭. অতঃপর লর্ডনার উক্ত চতুর্থ খণ্ডের ১৮৭ পৃষ্ঠায় বলেন : "এপিফানিস লিখেছেন যে, মথি তাঁর সুসমাচার হিব্রু ভাষায় লিখেছিলেন। নতুন নিয়মের পুস্তকাবলি রচনায় একমাত্র তিনিই এই ভাষাটির ব্যবহার করেছিলেন।"

৮. অতঃপর ৪র্থ খণ্ডের ৪৩৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন : "মথি তাঁর সুসমাচার রচনা করেছিলেন ইহূদীদের দেশে অবস্থানকালে হিব্রু ভাষায়। ইহূদী বিশ্বাসীদের জন্য তিনি তা রচনা করেছিলেন। মোশির ব্যবস্থার ছায়াকে সুসমাচারের সত্যতার সাথে মিশ্রিত করেন নি।"

৯. এই খণ্ডেরই ৪৪১ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন ঃ (৫ম শতকের ধর্মগুরু) সেন্ট জিরোম ঐতিহাসিকদের নির্ঘন্টে লিখেছেন যে, মথি ইহূদীদের দেশে হিব্রু ভাষায় এবং হিব্রু অক্ষরে ইহূদী বিশ্বাসিগণের জন্য সুসমাচার রচনা করেন। তিনি পুস্তকটি গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন বলে প্রমাণিত হয় নি। এমনকি কে পুস্তকটি অনুবাদ করেছেন তাও জানা যায় নি। তবে উল্লেখ্য যে, তাঁর লিখিত হিব্রু সুসমাচারের একটি পাণ্ডুলিপি সিরীয় পুস্তকভাণ্ডারে রয়েছে। শহীদ পেমফ্লীস অত্যন্ত কষ্ট করে তা সংকলন করেন। সিরিয়ার অন্তর্গত বারিয়া শহরের নসরতীয় খৃস্টানগণের (Nazarenes) অনুমতিক্রমে আমি তা অনুলিপি করতে শুরু করেছি। তাঁরা এই হিব্রু সুসমাচারটি ব্যবহার করতেন।"

১০. অতঃপর ৪র্থ খণ্ডের ৫০১ পৃষ্ঠায় বলেন : "সেন্ট অগাস্টিন লিখেছেন, বলা হয় যে, চার সুসমাচার লেখকের মধ্যে একমাত্র মথিই হিব্রু ভাষায় পুস্তক রচনা করেন। অন্য তিনজন গ্রীক ভাষায় লিখেন।"

১১. অতপর তিনি ৪র্থ খণ্ডের ৫৩৮ পৃষ্ঠায় বলেন : "ক্রীযাস্টম (John Chrysostom : 347) লিখেছেন : বলা হয় যে, ইহূদী বিশ্বাসিগণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের জন্য মথি হিব্রু ভাষায় সুসমাচার লিখেন।"

১২. অতঃপর লর্ডনার তাঁর পুস্তকের ৫ম খণ্ডের ১৩৭ পৃষ্ঠায় বলেন : "এসীডোন লিখেছেন, চার সুসমাচার লেখকের মধ্যে একমাত্র মথিই হিব্রু ভাষায় সুসমাচার লিখেন। বাকি তিন জন গ্রীক ভাষায় লিখেন।"

১৩. হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে লিখেছেন : "নিম্নলিখিত প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মগুরু পণ্ডিতবর্গ পিবেস-এর মতকে সঠিক বলে গ্রহণ করে তাঁর সাথে একমত হয়েছেন যে, এই সুসমাচারটি হিব্রু ভাষায় লিখিত হয়েছিল : ১. ব্লার্মান, ২. ক্রোটিস, ৩. কিসাবেন, ৪. ওয়ালটন, ৫. টমলাইন, ৬. কিও, ৭. হেমন্ড, ৮. মিল, ৯. হ্যারড, ১০. ওডেন, ১১. কেনবিল, ১২. এ ক্লার্ক, ১৩. সাইমন, ১৪. টেলিমেন্ট, ১৫. প্রিটেস, ১৬. ডোবিন, ১৭. ক্যামিট, ১৮.

মিকাইলস, ১৯. আরিনাউস, ২০. ওরিগন, ২১. সার্ল, ২২. এপিফান্স, ২৩. ক্রিযাস্টম, ২৪. জিরোম। এছাড়া আরো অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিত এই মত গ্রহণ করেছেন।

হর্ন 'আরো অন্যান্য' বলতে যাদের বুঝিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ক্রি ক্রি নাযিয়ানযিন, ইডেগণ্ড, থিওফ্লিষ্ট, লোথিমিস, ইউসেবিয়াস, এথানিসিয়াস, অগাস্টিন, এসিডোর ও অন্যান্য ধর্মগুরু পণ্ডিত যাঁদের নাম লর্ডনার ওয়াটসন ও অন্যান্য পণ্ডিত তাঁদের পুস্তকাদিতে উল্লেখ করেছেন।

১৪. ডাওয়ালি ও রজার্ডমেন্ট-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে রয়েছে : "মথির সুসমাচারটি কোন্ ভাষায় লেখা হয়েছিল সে বিষয়ে আধুনিক যুগে বড় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তবে অনেক প্রাচীন ধর্মগুরু পণ্ডিত স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন যে, মথি তাঁর সুসমাচারটি হিব্রু ভাষায় লিখেছিলেন। এই ভাষাই ছিল তৎকালে প্যালেস্টাইনবাসীদের ভাষা। প্রাচীন ধর্মগুরু পণ্ডিতগণের এই ঐকমত্যটিই এ বিষয়ে চূড়ান্ত মত বলে গণ্য করতে হবে।

১৫. হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ বলেন : "মথির সুসমাচারের হিব্রু পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যাওয়ার কারণ হলো, খৃস্টধর্ম গ্রহণকারী ইহূদী এবোনাইট সম্প্রদায় (Ebionites) যীশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করত। তারা এই সুসমাচারটিকে বিকৃত করে। যিরুশালেমের যুদ্ধবিগ্রহের পরে তা হারিয়ে যায়। কেউ কেউ বলেন : নসরতীয়গণ বা ইহূদীগণ যারা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা এই হিব্রু সুসমাচারটিকে বিকৃত করেছিল। এছাড়া এবোনাইট সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই সুসমাচার থেকে অনেক অনুচ্ছেদ বাদ দিয়েছিল।[১] ইউসেবিয়াস তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে, মথি তাঁর সুসমাচারটি হিব্রু ভাষায় লিখেছিলেন।"

১৬. রিও তাঁর 'সুসমাচারের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন : "যারা বলেন যে, মথি তাঁর সুসমাচারটি গ্রীক ভাষায় লিখেছিলেন তাঁদের কথা ভুল। কারণ ইউসেবিয়াস তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এবং খৃস্টধর্মের অগণিত গুরু ও নেতা স্পষ্টত বলেছেন যে, মথি তাঁর সুসমাচারটি হিব্রু ভাষায় লিখেছিলেন।"

১৭. নর্টন একটি বৃহদাকার পুস্তক রচনা করেছেন। এই পুস্তকে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, প্রচলিত তোরাহ নিঃসন্দেহে ও নিশ্চিতরূপে জাল ও বানোয়াট। এগুলি কখনোই মোশির রচনা নয়। তিনি নতুন নিয়ম বা সুসমাচারের

১. এ সকল আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, মথির লেখা মূল হিব্রু সুসমাচারটি ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদেরও মনোপুত ছিল না। এজন্য তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই পুস্তকটিকে বর্জন করেছে এবং জাল একটি পুস্তক তাঁর নামে চালিয়েছে। শুধু কতিপয় একত্ববাদী খৃষ্টান সম্প্রদায় তা ব্যবহার করেছে। ক্রমান্বয়ে তা হারিয়ে গিয়েছে।

পুস্তকগুলির মূল অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তবে সেগুলির মধ্যে অনেক অনেক বিকৃতি রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এজন্য ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ তাঁর মতামতকে পছন্দ করেন না। তবে যেহেতু তিনি নিজেকে খৃস্টান বলে দাবি করেছেন এবং খৃস্টান সম্প্রদায়ের অনেক প্রাচীন ধর্মগুরু ও পণ্ডিতের মতামত উদ্ধৃত করেছেন, সেহেতু আমি তাঁর কথা এখানে উদ্ধৃত করা ভাল মনে করছি।

১৮৩৭ খৃস্টাব্দে বোস্টন শহরে মুদ্রিত তাঁর পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৪৫ পৃষ্ঠায়, ভূমিকার শেষে লিখেছেন : "আমরা বিশ্বাস করি যে, মথি তাঁর সুসমাচারটি হিব্রু ভাষায় লিখেছিলেন। কারণ প্রাচীন যে সকল পণ্ডিত বিষয়টি আলোচনা করেছেন তাঁদের সকলেই ঐকমত্যের সাথে এই একই কথা বলেছেন। প্রাচীনগণের মধ্যে যাঁরা প্রসিদ্ধির শীর্ষে নন তাঁদের কথা বাদ দিয়ে শুধু প্রসিদ্ধতম ব্যক্তিবর্গের কথাই বলি। পিবেস, আরিনাউস, ওরিগন, ইউসেবিয়াস ও জিরোম সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, মথি হিব্রু ভাষায় সুসমাচার লিখেন। কোন একজন প্রাচীন পণ্ডিতও তাঁদের বিপরীত কিছু বলেন নি। এটি অত্যন্ত বড় সাক্ষ্য ও শক্তিশালী প্রমাণ। বর্তমান যুগের মানুষদের মধ্যে যেমন গোঁড়ামি ও পারস্পরিক বিরোধিতা বিরাজমান, প্রাচীন যুগেও একইরূপ গোঁড়ামি ও বিরোধিতা বিরাজমান ছিল। তাঁদের এই কথার মধ্যে যদি কোনরূপ সন্দেহ থাকত, তবে গোঁড়ামি ও বিরোধিতার কারণে অবশ্যই তাঁদের মতের বিপরীতে কেউ না কেউ বলতেন যে, এই গ্রীক সুসমাচারটিই মূল পুস্তক; এটি কোন অনুবাদ নয়। কাজেই যেহেতু প্রাচীন যুগের সকল বক্তব্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ একবাক্যে নির্দেশ করছে যে, পুস্তকটি হিব্রু ভাষায় রচিত এবং এই বক্তব্যের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকত্ব নেই, সেহেতু আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, মথি তাঁর সুসমাচার হিব্রু ভাষাতেই লিখেছিলেন। তাঁদের এই সাক্ষ্যের বিপরীতে আমি এখনও পর্যন্ত একটি আপত্তিও পাই নি, যে কারণে আমাদের এ বিষয়ে কোন গবেষণা বা পর্যালোচনার প্রয়োজন হতে পারে। আপত্তি তো দূরের কথা, বরং সুদৃঢ় সমর্থন পা[illegible] যায়। আমি দেখেছি, প্রাচীন ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, মথির লিখি[illegible] হিব্রু সুসমাচারটি ইব্রীয় খৃস্টান বা ইহূদী ধর্ম থেকে আগত খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত হি[illegible] তা বিশুদ্ধ বা বিকৃত যে ভাবেই হোক।"

উপর্যুক্ত বক্তব্যসমূহ থেকে জানা গেল যে, মথি তাঁর সুসমাচারটি হিব্রু ভাষায় [illegible] হিব্রু অক্ষরে লিখেছিলেন। প্রাচীনগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত। তাঁদের মধ্যে কে[illegible] এর বিপরীত কিছু বলেন নি। কাজেই তাঁদের এই কথাই এ বিষয়ে চূড়ান্ত বলে গণ্য। ডাওয়ালি ও রজার্ডমেন্ট তা স্বীকার করেছেন। আমরা আরো জানলাম যে, জিরোমের যুগ (৫ম শতাব্দী) পর্যন্ত এই হিব্রু সুসমাচার বিদ্যমান ও ব্যবহৃত ছিল। অনুরূপভা[illegible] জানা গেল যে, হিব্রু থেকে সুসমাচারটি গ্রীক ভাষায় কে অনুবাদ করেছেন নিশ্চিতরূপে জানা যায় নি।

হর্ন উপরের বিষয়গুলি সব স্বীকার করার পরেও বলেছেন : "সম্ভবত মথি সুসমাচারটি হিব্রু ও গ্রীক উভয় ভাষাতেই লিখেছিলেন।" উপরে উল্লিখিত পণ্ডিতগণের মতামত ও আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারি যে, হর্নের এই কথাটি ভিত্তিহীন ও প্রমাণবিহীন একটি কল্পনা ও ধারণা মাত্র। কাজেই তা অগ্রহণযোগ্য।

প্রচলিত মথিলিখিত সুসমাচারের বর্ণনাভঙ্গি ও উপস্থাপনা প্রাচীন পণ্ডিতগণের বক্তব্য প্রমাণ করে। পুস্তকটির উপস্থাপনা ও বর্ণনা পদ্ধতি থেকে বুঝা যায় যে, পুস্তকটি মথির নিজের রচিত নয়। কারণ মথি যীশুর প্রেরিত ১২ শিষ্যের একজন ছিলেন। খৃস্টের অধিকাংশ অবস্থা ও ঘটনা তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি নিজে যদি এই সুসমাচারটি লিখতেন তবে পুস্তকটির কোথাও না কোথাও তাঁর উপস্থাপনা থেকে প্রকাশ পেত যে, তিনি তাঁর নিজে দেখা ঘটনাগুলি লিখছেন। এছাড়া তিনি নিজের কথা বলতে অবশ্যই উত্তম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করতেন। প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত লেখকগণ এভাবেই লিখেন।

যীশু-শিষ্যগণের যুগেও এই অভ্যাস সুপরিচিত ও প্রচলিত ছিল। নতুন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত যীশু-শিষ্যগণের লেখা পত্রগুলি পাঠ করলেই পাঠক তা দেখতে পাবেন, যদি এগুলিকে সত্যই যীশুর শিষ্যগণের লেখা বলে মেনে নেওয়া হয়।

সুসমাচার লেখার যুগেও এই রীতির প্রচলন থাকার একটি বড় প্রমাণ হলো লূকের লিখনি। লূক তাঁর সুসমাচারটি এবং প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের প্রথম থেকে ১৯ অধ্যায় পর্যন্ত সম্পূর্ণ শ্রুতির উপর নির্ভর করে লিখেছেন। এজন্য সুসমাচারে এবং প্রেরিত-র এই অংশের বর্ণনায় তাঁর নিজের উপস্থিতি, প্রত্যক্ষ দর্শন বা লেখকের নিজের জন্য উত্তম পুরুষের ব্যবহার নেই। কিন্তু প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের অবশিষ্ট অংশে লূক পৌলের সহযাত্রী ছিলেন। এজন্য এই পুস্তকের ২০ অধ্যায় থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর লেখনিতে প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনাকারীর অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে এবং তিনি নিজের কথা বলতে উত্তম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করেছেন।

কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, মোশির লেখা তোরাহ-এ এবং যোহন লিখিত সুসমাচারে উপরের অবস্থা বা লেখকের নিজস্ব উপস্থিতি অনুভব করা যায় না। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, প্রচলিত তোরাহ মোশির রচিত কিনা এবং প্রচলিত যোহন লিখিত সুসমাচারটি শিষ্য যোহনের লিখিত কি না সে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে পাঠক তা দেখেছেন।

এভাবে বাহ্যিক বর্ণনাভঙ্গি থেকে বুঝা যায় যে, এই সুসমাচারটি মথির রচিত নয়। এই বাহ্যিক ও স্পষ্ট বিষয়কে শক্তিশালী প্রমাণ ছাড়া কিভাবে নাকচ করা যায়? গ্রন্থকার যদি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হন এবং তাঁর লেখনির মধ্যে উপর্যুক্ত অবস্থাটি প্রকাশিত হয় তবে তা বিবেচনাযোগ্য হতে পারে।

হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণের বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, এই সুসমাচারটি প্রথম খৃষ্টীয় শতকে বহুল প্রচলিত বা সুপরিচিত ছিল না। এছাড়া জানা গেল যে, এই প্রথম শতকে খৃষ্টানগণের মধ্যে ধর্মগ্রন্থের বিকৃতি সাধনের রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কারণ যদি এই সুসমাচারটি সেই যুগে প্রচলিত থাকত, তবে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় তা বিকৃত করতে পারত না (একজন বিকৃত করলে অন্য জন ধরে ফেলত)। যদি সত্যিই কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিকৃতি ঘটাতো, তবে সেই বিকৃতির কারণে সুসমাচারটিকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া বা বাতিল করার প্রয়োজন হতো না।

এভাবে আমরা দেখলাম যে, বিকৃতির ব্যাপক প্রচলনের ফলে মথির লেখা মূল হিব্রু সুসমাচারটি বিকৃত ও বাতিল হয়ে গিয়েছে। আমরা কোন প্রমাণিত সূত্রে প্রচলিত অনুবাদটির অনুবাদকের পরিচয় জানতে পারছি না। তাহলে আমরা কিভাবে এই অনুবাদটির বিশুদ্ধতা আশা করতে পারি? বরং সঠিক কথা হলো, এই সুসমাচারটি পুরোপুরিই বিকৃত ও জাল।

১৮. মানিকীয (Manichees) সম্প্রদায়ের চতুর্থ শতাব্দীর অস্ট্রীয় পণ্ডিত ফাস্টিস বলেন, "মথির নামে প্রচলিত সুসমাচারটি তাঁর রচিত নয়।"

১৯. প্রফেসর জার্মান বলেন : "এই সুসমাচারটির আগাগোড়াই মিথ্যা।"

২০. মারসিওনের (Marcion) অনুসারিগণের নিকট এই সুসমাচারটি বিদ্যমান ছিল। তাতে প্রচলিত প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় দু'টো ছিল না। তাঁদের মতে এই অধ্যায় দু'টি জাল ও সংযোজিত। অনুরূপভাবে এবোনাইট (Ebionites) সম্প্রদায়ের মতেও এই দুই অধ্যায় জাল ও সংযোজিত। এছাড়া ইউনিট্যারিয়ান (একত্ববাদী) খৃস্টান সম্প্রদায় এবং পাদ্রী উইলিয়ামসও এই অধ্যায় দু'টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। নর্টন এই দু'টো অধ্যায় এবং এই সুসমাচারের অধিকাংশ বক্তব্য অনির্ভরযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

১৯শ প্রমাণ : মথিলিখিত সুসমাচারের ২য় অধ্যায়ের ২৩ আয়াতটি নিম্নরূপ : "এবং নাসরৎ নামক নগরে গিয়া বসতি করিলেন; যেন ভাববাদিগণের দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয় যে, তিনি নসরতীয় বলিয়া আখ্যাত হইবেন।"

"যেন ভাববাদিগণের দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয় যে, তিনি নসরতীয় বলিয়া আখ্যাত হইবেন" এই কথাগুলি মথির সুসমাচারের অন্যতম ভুল। কারণ ভাববাদিগণের নামে প্রচলিত ও পরিচিত কোন পুস্তকেই এই কথাটি নেই। এখানে ক্যাথলিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই কথাটি ভাববাদিগণের (পুরাতন নিয়মের) পুস্তকে ছিল, কিন্তু খৃস্টধর্মের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে ইহূদীগণ সে সকল পুস্তক নষ্ট করে ফেলেছে। আমি ক্যাথলিক পণ্ডিতগণের এই বক্তব্য মেনে নিয়ে বলছি যে, বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃতির এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে? একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় তাঁদের প্রবৃত্তির তাড়নায় অথবা অন্য একটি ধর্মের বিরোধিতার জন্য ঈশ্বরের বাণী ও

ঐশ্বরিক প্রেরণা-লব্ধ কিছু পুস্তক একেবারে গুম করে দিলেন! এত বড় বিকৃতি কি আর তে পারে?

ক্যাথলিক মেমফোর্ড 'প্রশ্নের প্রশ্ন' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকটি ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে লন্ডনে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকের দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনায় তিনি লেন: "(মথির উদ্ধৃত) এই কথাটি যে সকল পুস্তকে বিদ্যমান ছিল সে সকল পুস্তক ব বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভাববাদিগণের যে সকল পুস্তক বর্তমানে (পুরাতন নিয়মের ধ্যে) বিদ্যমান সেগুলির মধ্যে কোন পুস্তকেই একথা নেই যে, খৃষ্টকে 'নসরতীয়' লে আখ্যায়িত করা হবে।"

"ক্রীযস্টম (John Chrysostom : 347-407) মথির নবম ব্যাখ্যায় বলেন: ভাববাদিগণের অনেক পুস্তক হারিয়ে ও বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। কারণ, ইহূদীগণ তাঁদের বহেলার কারণে বরং তাঁদের ধর্মহীনতা ও অসততার কারণে অনেক পুস্তক হারিয়ে ফলেছে। কিছু পুস্তক তাঁরা ছিড়ে ফেলেছে এবং কিছু পুস্তক তাঁরা পুড়িয়ে ফেলেছে।' ীযস্টমের বক্তব্য এখানেই শেষ। তারা যে অনেক বই ছিড়ে ফেলেছে বা পুড়িয়ে ফলেছে সে কথা অত্যন্ত জোরালো ও শক্তিশালী কথা। কারণ তারা যখন দেখলেন া, যীশুর প্রেরিত শিষ্যগণ এ সকল পুস্তকের কথা দিয়ে খৃষ্টধর্মের বিভিন্ন বিষয় প্রমাণ রছেন, তখন তারা এই কাজ করেন। মথি যে সকল পুস্তক থেকে এই কথাটি উদ্ধৃত রেছেন ইহূদীরা সেই পুস্তকগুলি বিনষ্ট করে ফেলেছে। এ থেকে তাঁদের এই ভ্যাসটি জানা যায়।

"এজন্য ট্রিফোনের (Tryphon) সাথে বিতর্কের সময় জাস্টিন (Justin)[১] বলেন: হূদীরা পুরাতন নিয়ম থেকে অনেক পুস্তক বাদ দিয়েছে, যেন প্রকাশ পায় যে, নতুন য়মের কথাবার্তা পুরাতন নিয়মের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।' এ সকল বক্তব্য আলোচনা থেকে জানা গেল যে, পুরাতন নিয়মের অনেক পুস্তক বিনষ্ট হয়েছে।"

মেমফোর্ড-এর উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে দুইটি বিষয় প্রকাশ পেয়েছে:

প্রথমত, ইহূদীগণ তাদের ধর্মহীনতার কারণে কিছু পুস্তক ছিড়ে ফেলেছে এবং কিছু স্তক পুড়িয়ে ফেলেছে।

দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী যুগে এইরূপ বিকৃতি ছিল খুবই সহজ। পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য রেছেন যে, ইহূদীরা পুস্তকগুলিকে বিনষ্ট করার ফলে কিভাবে সেগুলি পৃথিবীর বুক কে চিরতরে হারিয়ে গেল!

এভাবে ঈশ্বরের বাণী বা ঐশ্বরিক গ্রন্থাদির ব্যাপারে ইহূদী-খৃষ্টানগণের বিশ্বস্ততার মুনা পাঠক দেখতে পেলেন। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী যুগে বিকৃতি যে কত সহজ ছিল

[১] দ্বিতীয় খৃষ্টীয় শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু ও দার্শনিক। ইহূদী ট্রিফোন খৃষ্টান ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন। জাস্টিন তাকে পত্র লিখেন। দেখুন: Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, p 135, 150-155.

তাও জানতে পারলেন। এখন যদি আমরা বলি যে, মুসলমানদের পক্ষে যে সকল পুস্তক বা কথাবার্তা ছিল সেগুলিও তাঁরা এভাবে বিনষ্ট বা বিকৃত করেছেন, তবে সে দাবি কি অবাস্তব হবে? কোন যুক্তি, বিবেক বা লিখিত প্রমাণ কি এই দাবির বিরোধিতায় পেশ করা যাবে?

২০শ প্রমাণ : মথির সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১১ আয়াতটি নিম্নরূপ : "যোশিয়ের সন্তান যিকনিয় ও তাহার ভ্রাতৃগণ, বাবিলে নির্বাসন কালে জাত।"

এ কথা থেকে তিনটি বিষয় জানা গেল : ১. যিকনিয় ও তাঁর ভ্রাতৃগণ যোশিয়ের ঔরসজাত সন্তান, ২. যিকনিয়ের আরো ভাই ছিল এবং ৩. ব্যাবিলনে নির্বাসিত থাকা অবস্থায় তাঁদের জন্ম হয়।

উপরের তিনটি বিষয়ই ভুল। প্রথম বিষয়টি ভুল। তার কারণ, যিকনিয় (যিহোয়াখীন) যোশিয়ের পুত্র নন, তিনি যোশিয়ের পৌত্র। যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম এবং যিহোয়াকীমের পুত্র যিকনিয় (যিহোয়াখীন)।

দ্বিতীয় বিষয়টিও ভুল। কারণ যিকনিয় বা যিহোয়াখীনের কোন ভাই ছিল না, তবে তাঁর পিতা যিহোয়াকীমের তিনজন ভাই ছিল।

তৃতীয়ত বিষয়টিও ভুল। কারণ ব্যাবিলনে যাওয়ার সময় যিকনিয়ের বয়স ছিল ১৮ বছর। কাজেই ব্যাবিলনের নির্বাসনকালে তাঁর জন্মগ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠে না।

আদম ক্লার্ক বলেন : "ক্যামিট বলেছেন, ১১শ আয়াতটি নিম্নরূপে পাঠ করতে হবে : 'যোশিয়ের সন্তান যিহোয়াকীম ও তাহার ভ্রাতৃগণ, এবং যিহোয়াকীমের সন্তান যিকনিয়, বাবিলে নির্বাসন কালে জাত।"

ক্যামিটের এই বক্তব্য, যা আদম ক্লার্ক গ্রহণ করেছেন, এর সারমর্ম হলো, এখানে সুসমাচারের পাঠের মধ্যে 'যিহোয়াকীম' শব্দটি বৃদ্ধি করতে হবে। এতে বুঝা গেল যে, তাঁদের মতে এখানে মূল পাঠ থেকে এই শব্দটি বাদ পড়ে গিয়েছে। এতে এখানে বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃতি ঘটেছে। এর পরেও তৃতীয় সমস্যাটি দূরীভূত হচ্ছে না।[১]

---

১. যোশিয়, যিহোয়াকীম ও যিকনিয় (যিহোয়াখীন) এই তিনজনই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ইহূদী। এরা সকলেই ইহূদী রাষ্ট্রের রাজা ছিলেন। বিশেষত এদের সময়েই যিরূশালেম ধ্বংস হয়, এজন্য ইহূদী জাতির স্মৃতিতে এদের নাম চিরস্থায়ী। যিহোয়াকীমের মৃত্যুর পরে যিকনিয় ১৮ বছর বয়সে যিহূদা রাজ্যের রাজত্ব গ্রহণ করেন। তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করার পরে ব্যাবিলন রাজ নেবুকাদনেযার কর্তৃক বন্দি হয়ে ব্যাবিলনে নীত হন। এদের নাম, পরিচয় ও কর্মকাণ্ডের বিবরণ বাইবেলের পুরাতন নিয়মের একাধিক পুস্তকে বিস্তারিত আলোচিত। এইসব সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের বিষয়েও যদি এত ভুল হয়, যে রাজা কিছুকাল রাজত্ব করার পরে বন্দি হলেন, তাকে যদি 'ব্যাবিলনে-জাত' বলা হয়, তবে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা বা পবিত্র আত্মার উপস্থিতির আর কী মূল্য থাকল?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিভ্রান্তির অপনোদন

বিকৃতি সম্পর্কে ৫টি বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার

সুপ্রিয় পাঠক!

উপরের তিনটি পরিচ্ছেদে আমি বিকৃতির ১০০টি প্রমাণ উল্লেখ করেছি।[১] এ বিষয়ে আরো বেশি আলোচনা করলে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। এজন্য আমি এ বিকৃতির প্রমাণাদির উল্লেখ এখানেই শেষ করছি। বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকগুলিতে বিকৃতি প্রমাণের জন্য এগুলিই যথেষ্ট। অনুরূপভাবে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত ও প্রচারকগণের পক্ষ থেকে যে সকল আপত্তি ও বিভ্রান্তিমূলক কথা এ বিষয়ে প্রচার করা হয় সেগুলির খণ্ডনের জন্যও উপরের ১০০টি প্রমাণই যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও আমি এখানে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের উত্থাপিত ৫টি বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচারের আলোচনা করছি। আমি জানি যে, অভিজ্ঞ পাঠক উপরের আলোচনা থেকেই এ সকল বিভ্রান্তির উত্তর জেনেছেন। তবুও আমি বিষয়গুলিকে আরো স্পষ্টরূপে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাই।

প্রথম বিভ্রান্তি : শুধু মুসলমানরাই বিকৃতির কথা বলে

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের লেখনি বা আলোচনা থেকে অনেক সময় প্রকাশ পায় যে, একমাত্র মুসলমানরাই বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি ঘটেছে বলে দাবি করেন। তাদের আগে কেউ এইরূপ দাবি করেন নি। সাধারণ মুসলিম, বিশেষত খৃস্টান পণ্ডিতদের বই-পুস্তক যারা পাঠ করেন নি তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁরা এ সব কথা বলেন। এই বিভ্রান্তির আলোচনায় তাঁরা সতর্কতা অবলম্বন করেন। এজন্য তাঁদের পুস্তিকাগুলিতে এ বিষয়ক স্বীকারোক্তি দেখা যায় না (সকল বিকৃতি তাঁরা 'পাঠের বিভিন্নতা' বলে চালাতে চেষ্টা করেন)।

এই বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারের উত্তরে আমরা বলব যে, প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত খৃস্টানগণ ও তাঁদের বিরোধিগণ সকলেই সঠিক ও বিশুদ্ধ প্রমাণভিত্তিক দাবি করছেন যে, ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিকৃতি ঘটানো ইহূদী-খৃস্টানদের অভ্যাস এবং তাঁরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে বিকৃতি সাধন করেছেন। এ বিষয়ক প্রমাণাদি উপস্থাপনের আগে আমি দুইটি শব্দের ব্যাখ্যা করতে চাই। বাইবেলের বিশুদ্ধতা ও সূত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে তাঁরা এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করেন। প্রথম শব্দটি "erratum, pl-errata" মুদ্রণ বা লিপিকারের ভুল এবং দ্বিতীয় শব্দটি Various readings বা পাঠের বিভিন্নতা।

১. পরিবর্তনের প্রমাণ ৩৫টি, সংযোজনের প্রমাণ ৪৫টি ও বিয়োজনের প্রমাণ ২০টি।

১৮২২ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩২৫ পৃষ্ঠায় হর্ন বলেন : "errata (sing. erratum) অর্থাৎ লিপিকারের ভুল এবং Various readings বা পাঠের বিভিন্নতার মাঝে সুন্দর পার্থক্য নির্ধারণ করেছেন মিকাইলস। তিনি বলেন : "যদি দুই বা ততোধিক বক্তব্যের মাঝে পার্থক্য দেখা যায় তবে মাত্র একটিই সঠিক বলে গণ্য হবে। বাকি বক্তব্যগুলি ইচ্ছাকৃত বিকৃতি অথবা লিপিকারের অনিচ্ছাকৃত ভুল বলে গণ্য হবে। তবে সাধারণত, বিকৃত বা ভুল বক্তব্য থেকে সঠিক বক্তব্যটি পৃথকরূপে নির্ধারণ করা কঠিন। যদি কোন্‌টি সঠিক বক্তব্য সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায় তবে সবগুলি বক্তব্যকেই Various readings বা পাঠের বিভিন্নতা বলে গণ্য করা হবে। আর যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, লিপিকার এখানে মিথ্যা লিখেছেন তবে বলতে হবে যে, তা লিপিকারের ভুল (erratum)।

তাহলে খৃস্টান গবেষক পণ্ডিতগণের মতানুসারে উভয় শব্দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাঁরা যে বিষয়টিকে 'পাঠের বিভিন্নতা' বলে চালাচ্ছেন, আমাদের পরিভাষায় তা বিকৃতি। কাজেই যদি কোন পণ্ডিত উপরের অর্থে 'পাঠের বিভিন্নতা'র কথা স্বীকার করেন, তবে তিনি প্রকৃতপক্ষে 'বিকৃতি'র কথাই স্বীকার করলেন। মিল গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, বাইবেলের মধ্যে এইরূপ ৩০,০০০ (ত্রিশহাজার) 'পাঠের বিভিন্নতা' (বিকৃতি) রয়েছে। আর ক্রিসবাখ গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, বাইবেলের মধ্যে এইরূপ ১,৫০,০০০ (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) 'পাঠের বিভিন্নতা' (বিকৃতি) রয়েছে। আর সর্বশেষ বাইবেল গবেষক পণ্ডিত শোল্‌য প্রমাণ করেছেন যে, এইরূপ 'বিভিন্নতা (বিকৃতি) বাইবেলের মধ্যে এত বেশি যে তা গণনা করে শেষ করা যায় না।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ১৯ খণ্ডে 'Scripture' (ঐশ্বরিক বা ধর্মীয় পুস্তক)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ওটিসটিন এই প্রকারের ১০ লক্ষেরও বেশি বৈপরীত্য বা বিভিন্নতা সংকলন করেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে পাঠক বুঝতে পারলেন যে, 'পাঠের বিভিন্নতা' জাতীয় বিকৃতি বাইবেলের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বা অগণিত, যেখানে একাধিক তথ্যের মধ্যে যে কোন একটি তথ্য সঠিক ও বাকি তথ্যগুলি নিঃসন্দেহে মিথ্যা। কিন্তু কোন্‌টি সঠিক ও কোনটি মিথ্যা তা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। এইরূপ বিকৃতি ছাড়াও বাইবেলের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে বিকৃতি সাধিত হওয়ার কথা খৃস্টান-অ-খৃস্টান সকলেই প্রাচীন যুগ থেকেই বলছেন। আমি এখানে তিনটি অনুচ্ছেদে তাঁদের মতামত আলোচনা করব। প্রথম অনুচ্ছেদে আমি অ-খৃস্টান পণ্ডিতগণের বক্তব্য উদ্ধৃত করব। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ঐ সব পণ্ডিতের বক্তব্য উল্লেখ করব, যাঁরা নিজেদেরকে খৃস্টান বলে দাবি করলেও ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় তাদেরকে বিভ্রান্ত (heretic) বলে মনে করেন বা ভাল-খৃস্টান বলে মনে করেন না। তৃতীয় অনুচ্ছেদে আমি ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়ের বা অন্তত এক সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য পণ্ডিতগণের মতামত উদ্ধৃত করব।

প্রথম অনুচ্ছেদ
অ-খৃস্টানগণের মতামত

১. ২য় শতাব্দীর পণ্ডিত সেলসাসের মত

দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের একজন পৌত্তলিক পণ্ডিত ছিলেন সেলসাস (Celsus Epicurean)। তিনি খৃস্টধর্মের প্রতিবাদে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রসিদ্ধ জার্মান খৃস্টান-পণ্ডিত একহর্ন এই পৌত্তলিক পণ্ডিতের পুস্তক থেকে তাঁর নিম্নের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন : "খৃস্টানগণ তাদের সুসমাচারগুলি তিনবার বা চারবার বা তারও বেশিবার কঠিনভাবে পরিবর্তন করেছে, এমনকি সেগুলির বিষয়বস্তুও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।"

সম্মানিত পাঠক! তাহলে লক্ষ্য করুন, এই পৌত্তলিক পণ্ডিত জানাচ্ছেন যে, তাঁর যুগেই খৃস্টানগণ চার বারেরও বেশি বিকৃত করেছে তাদের সুসমাচারগুলিকে।

যারা নবুওয়ত বা ভাববাদিত্ব, ধর্ম, স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ, ঐশ্বরিক প্রেরণা ইত্যাদি কিছুই মানেন না তাদেরকে খৃস্টানগণ 'অবিশ্বাসী' বা 'ধর্মদ্রোহী' (Atheist, heretic, infidel) বলে আখ্যায়িত করেন। ইউরোপে এদের সংখ্যা অনেক। বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান বিকৃতি ও জালিয়াতি সম্পর্কে এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মতামত যদি আমি উল্লেখ করি তবে বইয়ের কলেবর অনেক বেড়ে যাবে। আমি এখানে শুধু দুইটি বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। যিনি এ বিষয়ে আরো জানতে চান তিনি এদের বই-পুস্তক পাঠ করতে পারেন। বিশ্বের সর্বত্রই এদের বইপত্র পাওয়া যায়।

২. আধুনিক পণ্ডিত পার্কারের মত

এদের মধ্যে একজন পার্কার[১]। তিনি বলেন : "প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মে বলা হয়, বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে অনাদি অনন্ত অলৌকিক বিষয়াবলিকে এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যে, সামান্য আঘাতও সেখানে পৌঁছাতে পারবে না। কিন্তু ত্রিশ হাজার 'পাঠের বিভিন্নতার' বিশাল সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করে বিষয়টির টিকে থাকার কোন ক্ষমতা নেই।"

এভাবে তিনি উপহাস করে তাঁদের দাবি উড়িয়ে দিলেন। তবে তিনি শুধু মিল-এর গবেষণার উপর নির্ভর করেছেন। নইলে তিনি 'ত্রিশ হাজার' না বলে বলতেন, 'দেড় লক্ষ' বা 'দশ লক্ষ'। পাঠক আগেই এ সকল মতামত জেনেছেন।

৩. 'একসিহোমো' লেখকের মত

এদের আরেকজন পণ্ডিত 'একসিহোমো'। ১৮১৩ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত তাঁর পুস্তকের সম্পূরক অংশের পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি বলেন :

১. সম্ভবত লেখক আমেরিকান পাদ্রী ও সংস্কারক থিয়োডোর পার্কার (Theodore Parker) (১৮১০-১৮৬০) কে বুঝাচ্ছেন। তিনি প্রচলিত বিভিন্ন খৃস্টান বিশ্বাসের প্রতিবাদ করেছেন।

(বাইবেলের নতুন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত পুস্তক ও পত্রাবলি ছাড়াও) প্রাচীন খৃষ্টান ধর্মগুরুগণ যীশুখৃষ্ট বা তাঁর প্রেরিত শিষ্যগণ বা তাদের অনুসারিগণের নামে প্রচারিত যে সকল পুস্তক ও পত্রের নাম উল্লেখ করেছেন সেগুলির সংখ্যা ৭৪। সেগুলির তালিকা নিম্নরূপ :

ক. যীশুর নামে প্রচলিত পুস্তক/পত্রের সংখ্যা ৭

১. এডেসা (Edessa)-র রাজা এগবেরাস (Agbarus/Abgarus/Abgar)-এর প্রতি খৃষ্টের পত্র।
২. পিতর ও পৌলের প্রতি খৃষ্টের পত্র।
৩. দৃষ্টান্ত ও উপদেশের পুস্তক।
৪. খৃষ্টের 'গীত' যা তিনি গোপনে তাঁর প্রেরিতগণ ও শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেন।
৫. ভোজবাজি ও যাদুর পুস্তক।
৬. খৃষ্ট, তাঁর মাতা ও তাঁর ধাত্রীর জন্মস্থানের পুস্তক।
৭. ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে খৃষ্টের যে পত্রটি আকাশ থেকে পড়েছিল।

খ. মরিয়মের নামে প্রচলিত পুস্তক/পত্রের সংখ্যা ৮

১. এগনাশিসের প্রতি তাঁর পত্র।
২. সিসিলিয়ানের প্রতি তাঁর পত্র।
৩. মরিয়মের জন্মস্থানের পুস্তক।
৪. মরিয়ম ও তাঁর ধাত্রীর পুস্তক।
৫. মরিয়মের ইতিহাস ও তাঁর বাণী।
৬. খৃষ্টের অলৌকিক কর্মকাণ্ড।
৭. মরিয়মের প্রতি ছোট ও বড়দের প্রশ্নের পুস্তক।
৮. মরিয়মের বংশাবলি ও শলোমনের আংটির পুস্তক।

গ. প্রেরিত শিষ্য পিতরের নামে প্রচলিত পুস্তক/পত্রের সংখ্যা ১১

১. পিতর লিখিত সুসমাচার।
২. পিতরের কার্যবিবরণ।
৩. পিতরের প্রতি প্রকাশিত বাক্য।
৪. পিতরের প্রতি দ্বিতীয় প্রকাশিত বাক্য।
৫. ক্লিমেন্টের প্রতি পিতরের পত্র।
৬. পিতর ও এবিয়নের বিতর্ক।
৭. পিতরের শিক্ষা।
৮. পিতরের উপদেশাবলি।
৯. পিতরের প্রার্থনা পদ্ধতি।
১০. পিতরের যাত্রা পুস্তক।
১১. পিতরের যুক্তি পুস্তক।

ঘ. প্রেরিত শিষ্য যোহনের নামে প্রচলিত পুস্তক/ পত্রের সংখ্যা ৯
১. যোহনের কার্যবিবরণ।
২. যোহন লিখিত দ্বিতীয় সুসমাচার।
৩. যোহনের যাত্রা পুস্তক।
৪. যোহনের বাণী।
৫. হিগ্রোপিকের প্রতি যোহনের পত্র।
৬. মরিয়মের মৃত্যু পুস্তক।
৭. খৃস্টের স্মরণ ও ক্রুশ থেকে অবতরণ।
৮. যোহনের নিকট প্রকাশিত দ্বিতীয় বাক্য।
৯. যোহনের প্রার্থনা পদ্ধতি।
ঙ. প্রেরিত শিষ্য আন্দ্রিয়র নামে প্রচলিত পুস্তক/পত্রের সংখ্যা ২
১. আন্দ্রিয় লিখিত সুসমাচার।
২. আন্দ্রিয়র কার্যবিবরণ।
চ. প্রেরিত শিষ্য মথির নামে প্রচলিত পুস্তক/পত্রের সংখ্যা ২
১. শিশুকালের সুসমাচার (Infancy Gospel)।
২. মথির প্রার্থনা পদ্ধতি।
ছ. প্রেরিত শিষ্য ফিলিপের নামে প্রচলিত পুস্তক/পত্রের সংখ্যা ২
১. ফিলিপ লিখিত সুসমাচার।
২. ফিলিপের কার্যবিবরণ।
জ. প্রেরিত শিষ্য বর্থলময়ের নামে প্রচলিত পুস্তক/পত্রের সংখ্যা ১
১. বর্থলময় লিখিত সুসমাচার।
ঝ. প্রেরিত শিষ্য থোমার নামে প্রচলিত পুস্তক/পত্রের সংখ্যা ৫
১. থোমা (Thomas) লিখিত সুসমাচার।
২. থোমার কার্যবিবরণ।
৩. খৃস্টের শিশুকালের সুসমাচার।
৪. থোমার নিকট প্রকাশিত বাক্য।
৫. থোমার যাত্রা পুস্তক।
ঞ. প্রেরিত শিষ্য যাকোবের নামে প্রচলিত পুস্তক/পত্রের সংখ্যা ৩
১. যাকোব লিখিত সুসমাচার।
২. যাকোবের প্রার্থনা পদ্ধতি।
৩. মরিয়মের মৃত্যু পুস্তক।
ট. প্রেরিত শিষ্য মত্তথিয়, যিনি খৃস্টের ঊর্ধ্বারোহণের পরে প্রেরিতগণের অন্তর্ভুক্ত হন, তাঁর নামে প্রচলিত পুস্তক/পত্রের সংখ্যা ৩
১. মত্তথিয় লিখিত সুসমাচার।
২. মত্তথিয়ের বাণী।
৩. মত্তথিয়ের কার্যবিবরণ।

ঠ. মার্কের নামে প্রচলিত পুস্তক/পত্রের সংখ্যা ৩

১. মিসরীয়দের সুসমাচার।

২. মার্কের প্রার্থনা পদ্ধতি।

৩. বিশেন পারনিয়ার পুস্তক।

ড. শিষ্য বার্ণাবার নামে প্রচলিত পুস্তক/পত্রের সংখ্যা ২

১. থিওডোশান লিখিত সুসমাচার।

২. বার্নাবার পত্র

ণ. পৌলের নামে প্রচলিত পুস্তক/পত্রের সংখ্যা ১৫

১. পৌলের কার্যবিবরণ।

২. থেকলার কার্যবিবরণ। (Acts of Paul and Thecla)

৩. লাওদিকিয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র।

৪. থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের তৃতীয় পত্র।

৫. করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের তৃতীয় পত্র।

৬. করিন্থীয়দের পত্র পৌলের প্রতি এবং পৌলের উত্তর।

৭. সেনিকা (Seneca)[১]-র প্রতি পৌলের পত্র ও সেনিকার উত্তর।

৮. পৌলের প্রতি প্রকাশিত বাক্য।

৯. পৌলের প্রতি প্রকাশিত দ্বিতীয় বাক্য।

১০. পৌলের দর্শন (Vision)।

১১. পৌলের এনাপিকেশন।

১২. পৌললিখিত সুসমাচার।

১৩. পৌলের উপদেশাবলি।

১৪. সর্প দংশনের ঝাড়ফুঁক।

১৫. পিতর ও পৌলের ওসিয়ত/উপদেশাবলি (precept)

এরপর 'একসিহোমো'র লেখক বলেন, এভাবে আমরা 'সমাচার', 'প্রকাশিত বাক্য' ও 'পত্রাবলি'র এক সুবিশাল ভাণ্ডার দেখতে পাচ্ছি। এখন পর্যন্ত অধিকাংশ খৃস্টান মনে করেন যে, এ সকল পুস্তকের অধিকাংশই সত্যিকারেরই উল্লিখিত লেখকদের রচনা। তাহলে প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় যে পুস্তক বা পত্রগুলিকে মেনে নিয়েছেন সেগুলিই যে সত্যিকারের ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ পুস্তক তা আমরা কিভাবে জানব? এছাড়া আমরা জানি যে, মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার আগে এ সকল 'স্বীকৃত' পুস্তকও বিকৃত, পরিবর্তন ও সংযোজনের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এতে সমস্যা আরো ঘনীভূত হয়।

১. প্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক, রোমান সম্রাট নিরোর শিক্ষক ও পরামর্শদাতা। ৬৫ খৃষ্টাব্দে নিরো কর্তৃক নিহত হন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

অধার্মিক (heretic) খৃস্টানগণের মতামত

১. প্রথম শতাব্দী থেকে এবোনাইট খৃস্টানগণের মত

প্রথম যুগের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ খৃস্টান সম্প্রদায় এবোনাইট সম্প্রদায় (Ebionites)। তারা পৌলের সমসাময়িক ছিলেন এবং পৌলের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা বলতেন যে, পৌল ধর্মত্যাগী।[১] এই সম্প্রদায়ের খৃস্টানগণ মথির সুসমাচারটি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাঁদের নিকট সংরক্ষিত মথিলিখিত সুসমাচারটির সাথে বর্তমানে পৌলের অনুসারী খৃস্টানগণের নিকট প্রচলিত 'মথিলিখিত সুসমাচারের' অনেক স্থানেই মিল নেই। প্রচলিত 'মথি'-র প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়দ্বয় তাঁদের 'মথি'র মধ্যে ছিল না। এবোনাইটদের মতে, এই দুই অধ্যায় ও অন্যান্য অনেক স্থানে অনেক কথা জাল ও বানোয়াট। অপরদিকে পৌলের অনুসারী খৃস্টানগণ এবোনাইটদেরকেই বিকৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত করেন।

বেল তাঁর ইতিহাসে এই সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনায় লিখেছেন : "এই সম্প্রদায় পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলির মধ্য থেকে শুধু তোরাহ-কে মানত। তারা দায়ূদ, যিরমিয় ও যিহিস্কেল-এর নামের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করত। নতুন নিয়মের শুধু 'মথিলিখিত সুসমাচার' তারা মানত। কিন্তু তারা এই সুসমাচারটিকে অনেকস্থানে বিকৃত করে নিয়েছিল। তারা এর প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় বাদ দিয়ে দিয়েছিল।"

২. দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে মারসিওনীয় খৃস্টানগণের মত

দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ অধ্যাত্মবাদী (Gnostic) খৃস্টান সম্প্রদায় 'মারসিওনীয় সম্প্রদায়[২]'। তাঁরা পুরাতন নিয়মের কোন পুস্তকই মানতেন না। তাঁরা বলতেন যে,

---

১. এবোনাইট খৃস্টানগণ যীশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করতেন। তাঁরা যীশুকে অন্য দশজন মানুষের মতই একজন মানুষ ও ভাববাদী বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের মতে, যীশুর নির্দেশ অনুসারে খৃস্টানদের জন্যও 'মোশির ব্যবস্থা' বা মূসার শরীয়ত পালন করা আবশ্যকীয়। পৌলই সর্বপ্রথম মোশির ব্যবস্থা রহিত করে দেন। তিনি দাবি করেন যে, শুধু বিশ্বাসেই মুক্তি; কাজেই ব্যবস্থা বা শরীয়ত পালন করা উচিত নয়। যে শরীয়ত বা ব্যবস্থা পালন করবে সে যীশুর প্রেম বা দয়া লাভ করতে পারবে না...ইত্যাদি। এজন্য এবোনাইট খৃস্টানগণ পৌলকে ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে কর্মহীন ভক্তির মূল্য বেশী। এজন্য শেষ পর্যন্ত পৌলীয় ধর্মই প্রসার লাভ করে।

২. অধ্যাত্মবাদী গুরু মারসিওনের (Marcion) অনুসারী।

এগুলি কোনটিই ঐশ্বরিক প্রেরণা-লব্ধ পুস্তক নয়। অনুরূপভাবে তাঁরা নতুন নিয়মের সকল পুস্তক অস্বীকার করতেন. শুধু লূকলিখিত সুসমাচার এবং পৌলের পত্রাবলি থেকে ১০টি পত্র তাঁরা ঐশ্বরিক বলে মানতেন। আর তাঁদের স্বীকৃত এই সুসমাচার ও পত্রাবলিও বর্তমানে প্রচলিত সুসমাচার ও পত্রাবলি থেকে ভিন্ন। এই সম্প্রদায়ের মতে, বর্তমানে প্রচলিত লূকলিখিত সুসমাচার ও পৌলের পত্রাবলীর মধ্যে জালিয়াতি প্রবেশ করেছে এবং এছাড়া নতুন ও পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তকই জাল। অপরদিকে এদের বিরোধিগণ এদেরকেই জালিয়াতির জন্য অভিযুক্ত করেন।

বেল তাঁর ইতিহাসে এই সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন : "এই সম্প্রদায়ের অনুসারিগণ স্বীকার করতেন না যে, পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলি ঐশ্বরিক প্রেরণা-লব্ধ। আর নতুন নিয়মের শুধু লূকলিখিত সুসমাচারটি মানতেন, তবে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়দ্বয় তাঁরা মানতেন না। তাঁরা পৌলের দশটি পত্র মানতেন। তবে সেগুলির মধ্যে যে সকল কথা তাদের মতের বিরোধী সেগুলিকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করতেন।"

বেলের কথা থেকে মনে হতে পারে যে, লূকের সুসমাচারের ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায় শুধু প্রথম দুইটি অধ্যায়ই অস্বীকার করতেন। প্রকৃত বিষয় তা নয়। লর্ডনার তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৮ম খণ্ডে এই সম্প্রদায় লূকের সুসমাচারে কি ধরনের বিকৃতি ঘটিয়েছিল সে বিষয়ে লিখেছেন। তিনি বলেন : "লূকের সুসমাচারের যে সকল স্থানে তাঁরা পরিবর্তন বা বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃতি ঘটিয়েছিল সে সকল স্থানের মধ্যে রয়েছে :

১. প্রথম দুইটি অধ্যায়।
২. তৃতীয় অধ্যায়ে যোহনের দ্বারা যীশুর বাপ্তাইজ হওয়া এবং যীশুর বংশাবলি-পত্র।
৩. চতুর্থ অধ্যায়ে দিয়াবল কর্তৃক যীশুর পরীক্ষা, যীশুর ধর্মধামে বা সমাজ-গৃহে প্রবেশ এবং যিশাইয়র পুস্তক থেকে পাঠ করা।
৪. ১১শ অধ্যায়ে ৩০, ৩১, ৩২, ৪৯, ৫০, ৫১ এবং ২৯ আয়াতের নিম্নোক্ত কথাটুকু : "কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া" কথাটুকু।
৫. ১২শ অধ্যায়ে ৬ ও ২৮ আয়াত।
৬. ১৩শ অধ্যায়ে ১ থেকে ৬ আয়াত।
৭. ১৫শ অধ্যায়ে ১১ থেকে ৩২ আয়াত।
৮. ১৮শ অধ্যায়ে ৩১, ৩২ ও ৩৩ আয়াত।
৯. ১৯শ অধ্যায়ে ২৮ থেকে ৪৬ আয়াত।
১০. ২০শ অধ্যায়ে ৯ থেকে ১৮ আয়াত।
১১. ২১শ অধ্যায়ে ১৮, ২১, ও ২২ আয়াত।

১২. ২২শ অধ্যায়ে ১৬, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৫০ ও ৫১ আয়াত।

১৩. ২৩শ অধ্যায় ৪৩ আয়াত।

১৪. ২৪শ অধ্যায়ে ২৬ ও ২৭ আয়াত।

এপিফ্যান্স এ সকল বিষয় বিস্তারিত লিখেছেন। ড. মিল বলেছেন : তারা চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৮ ও ৩৯ আয়াতও বাদ দিয়েছিলেন।

৩. তৃতীয়ত-চতুর্থ শতাব্দী থেকে মানিকীয় সম্প্রদায়ের মত

তৃতীয় খৃস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ ধর্ম প্রচারক মানী (Manes/Mani) ও তাঁর অনুসারী মানিকীয় সম্প্রদায় (Manichees/Manichaen/ Manichean) নিজেদেরকে খৃস্টের অনুসারী ও খৃস্টান বলে দাবি করত। এই সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ অস্ট্রীয় পণ্ডিত ফাস্টিস। তিনি চতুর্থ শতাব্দীর মানুষ। লর্ডনার তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৩য় খণ্ডে মানিকীয় সম্প্রদায়ের মতামত আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধতম খৃস্টান পণ্ডিত সেন্ট অগাস্টিনের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন : "ফাস্টিস বলেন : আপনাদের পিতা ও পিতামহগণ ষড়যন্ত্র করে নতুন নিয়মের পুস্তকাবলির মধ্যে যে সকল বিষয় সংযোজন করেছেন আমি সেগুলির নিন্দা করি ও প্রত্যাখ্যান করি। এইরূপ জালিয়াতির মাধ্যমে তাঁরা নতুন নিয়মের সুন্দর অবস্থাকে দূষিত ও ত্রুটিময় করেছেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট করেছেন। আর এ কথা তো সুনিশ্চিত যে, খৃস্ট বা তাঁর প্রেরিত শিষ্যগণের কেউই নতুন নিয়ম রচনা করেন নি বরং একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তা রচনা করে প্রেরিতগণ ও প্রেরিতগণের সঙ্গীদের নামে চালিয়েছে। কারণ এই অজ্ঞাতনামা লেখক ভয় পেয়েছিল যে, সাধারণ মানুষেরা তার লেখা পুস্তক গ্রহণ করবে না। তারা ভাববে যে, এই লেখক যীশুর যে সকল বিবরণ লিখেছেন সেগুলি প্রত্যক্ষ করে বা ভালভাবে জেনে লিখে নি। এই ভয়ে সে বইগুলি লিখে প্রেরিতগণ বা তাঁদের শিষ্যগণের নামে চালিয়েছে। এই অপকর্মের মাধ্যমে লোকটি যীশুর অনুসারী ও প্রেমিকগণকে অত্যন্ত কঠিন কষ্ট দিয়েছে। কারণ সে অগণিত ভুল ও বৈপরীত্যে ভরা কিছু বই লিখেছে।"

এ হলো নতুন নিয়ম সম্পর্কে এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। তাঁদের এই পণ্ডিত তা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করলেন। সেই চতুর্থ শতক থেকেই তিনি চিৎকার করে জানাচ্ছেন যে, ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ নতুন নিয়মের মধ্যে অনেক কিছু সংযোজন ও জালিয়াতি করেছে। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, এই পুস্তকগুলি প্রেরিতগণ বা তাদের সঙ্গীগণের রচিত নয় বরং একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি সেগুলি রচনা করেছে। তিনি আরো বলেন যে, এগুলি অগণিত ভুল ও বৈপরীত্যে পূর্ণ। এই পণ্ডিত যদিও সাধারণ খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে বাতিল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তবুও একথা সুনিশ্চিত যে, এই পণ্ডিতের তিনটি দাবিই সঠিক।

৪. আধুনিক পণ্ডিত নর্টনের মত

আমি ইতোপূর্বে তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১৮ নং প্রমাণের আলোচনায় পণ্ডিত নর্টনের এই বিষয়ক বিশাল বইয়ের কথা উল্লেখ করেছি। এই পুস্তকে তিনি তোরাহ-এর বিশুদ্ধতা অস্বীকার করেছেন। তিনি অনেক দলিল-প্রমাণ দিয়ে প্রমাণিত করেছেন যে, প্রচলিত তোরাহ মোশির রচিত নয়। তিনি সুসমাচারগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে, প্রচলিত 'মথিলিখিত সুসমাচারটি' মথির রচনা নয়; বরং তাঁর অনুবাদ মাত্র। একথা সুনিশ্চিত যে, এর মধ্যে অনেক স্থানে বিকৃত করা হয়েছে। তাঁর এই বক্তব্য প্রমাণ করতে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং অনেক দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। আগ্রহী পাঠক তাঁর বইটি পাঠ করতে পারেন।

উপরের দুইটি অনুচ্ছেদ থেকে একথা প্রমাণিত হলো যে, অ-খৃস্টানগণ এবং খৃস্টানগণের মধ্যে অনেক সম্প্রদায়, যাদেরকে সাধারণ খৃস্টানগণ অ-ধার্মিক বা বিভ্রান্ত বলে মনে করেন তাঁরা সেই প্রথম শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত উচ্চরবে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি ও জালিয়াতি ঘটেছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ
প্রসিদ্ধ ধার্মিক খৃস্টানগণের মতামত

এখন আমি তৃতীয় অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ বাইবেল ব্যাখ্যাকার ও ঐতিহাসিকদের বক্তব্যাদি উদ্ধৃত করব।

প্রথম বক্তব্য : আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৩৬৯ পৃষ্ঠায় বলেন: "প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত রীতি হলো, অনেকেই মহান ব্যক্তিদের ইতিহাস রচনা করেন। প্রভু যীশুর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা ছিল (অনেকেই তাঁর ইতিহাস রচনা করেছেন)। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ বর্ণনা ছিল অসত্য। অনেক বিষয় যা কখনোই ঘটেনি সেগুলি নিশ্চিত ঘটেছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। অন্য অনেক ঘটনা ও অবস্থার বর্ণনায় তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করেছেন। বিশেষত লূক যে দেশে তাঁর সুসমাচার রচনা করেন, সেই দেশে যে সকল ঐতিহাসিক খৃষ্টের ইতিহাস লিখতেন তাঁদের মধ্যে এই প্রকারের অসত্য কথন ছিল ব্যাপক। এজন্য পবিত্র-আত্মা ভাল মনে করেন যে, লূককে সঠিকভাবে সকল ঘটনার জ্ঞান প্রদান করবেন[১] যেন ধার্মিক মানুষেরা সঠিক ঘটনাবলি জানতে পারেন।

এভাবে আদম ক্লার্কের স্বীকারোক্তিতে জানা গেল যে, লূকের সুসমাচার রচনার আগে ভুল ও মিথ্যা পরিপূর্ণ আরো অনেক সুসমাচার প্রচলিত ছিল। তিনি বলেছেন: 'অনেক বিষয় যা কখনোই ঘটেনি..'। এ থেকে জানা গেল যে, এ সকল পুস্তকের লেখকগণ কোন গবেষণা ও অনুসন্ধান ছাড়াই সত্যমিথ্যা সবকথা লিখেছিলেন। তিনি আরো বলেছেন : 'তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করেছেন'। এ কথা থেকে জানা গেল যে, এ সকল পুস্তকের লেখকদের বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতার যথেষ্ট ঘাটতি ছিল।

---

১. আদম ক্লার্কের এই কথাটি লূক ও পবিত্র আত্মার নামে একটি অসত্য কথা। আমরা বাইবেল থেকে দেখতে পাই যে, ভাববাদী বা প্রচারকগণ ঐশ্বরিক প্রেরণা-প্রাপ্ত কথা প্রচারের ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মার কথা উল্লেখ করতেন। তাঁরা বলতেন যে, পবিত্র আত্মার নির্দেশে আমি এ কথা বলছি...। অথচ লূক তাঁর সুসমাচারের কোথাও ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নি যে, তিনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে বা পবিত্র আত্মার নির্দেশনায় সত্য প্রকাশের জন্য সুসমাচারটি রচনা করেছেন। উপরন্তু তিনি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন যে, শ্রুতি, অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে যীশুর তথ্যাবলি সংগ্রহ করে তিনি তা লিখেছেন। কাজেই লূকের লেখনিকে 'পবিত্র আত্মার প্রেরণায় লেখা' বলে দাবি করার কোন ভিত্তি নেই।

দ্বিতীয় বক্তব্য : গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের প্রথম অধ্যায়ে পৌল লিখেছেন : "৬ আমার আশ্চর্য বোধ হইতেছে যে, খৃষ্টের অনুগ্রহে যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তোমরা এত শীঘ্র তাঁহা হইতে অন্যবিধ সুসমাচারের (unto another gospel) দিকে ফিরিয়া যাইতেছ। ৭ তাহা আব কোন সুসমাচার নয়; কেবল এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা তোমাদিগকে অস্থির করে, এবং খৃষ্টের সুসমাচার বিকৃত করিতে চায় (and would pervert the gospel of Christ)।"

খৃষ্টানদের পবিত্রপুরুষ পৌলের বক্তব্য থেকে নিম্নের বিষয়গুলি জানা গেল :

প্রথমত, প্রেরিতগণের যুগে একটি সুসমাচার বা ইঞ্জিল বিদ্যমান ছিল, যে সুসমাচারটির নাম ছিল 'খৃষ্টের সুসমাচার' বা gospel of Christ।

দ্বিতীয়ত, খৃষ্টানদের পবিত্র পুরুষ পৌলের সময়ে উপর্যুক্ত 'খৃষ্টের সুসমাচার'-এর বিপরীত আরো একটি সুসমাচার বিদ্যমান ছিল।

তৃতীয়ত, খৃষ্টানদের পবিত্র পুরুষ পৌলের সময়েই বিকৃতিকারী 'খৃষ্টের সুসমাচারটিকে' বিকৃত করতে সচেষ্ট ছিল। কাজেই তার পরের যুগের তো কোন কথাই নেই। এজন্য পরবর্তী যুগে 'খৃষ্টের সুসমাচার' বিকৃত হয়ে হারিয়ে যায় এবং রূপকথার কাল্পনিক 'আনকা' পক্ষীর মত অস্তিত্ববিহীন কাল্পনিক বিষয়ে পরিণত হয়।

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের পৌলের ৬ষ্ঠ পত্রের এই স্থানের ব্যাখ্যায় বলেন, "এ কথা সুপ্রমাণিত ও সুনিশ্চিত যে, প্রথম খৃষ্টীয় শতাব্দীতে অনেক মিথ্যা সুসমাচার প্রচলিত ছিল। অসত্য ও মিথ্যা 'সুসমাচারের' আধিক্যই লূককে তাঁর সুসমাচার লিখতে উদ্বুদ্ধ করে। সত্তরেরও বেশি এইরূপ মিথ্যা সুসমাচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সকল সুসমাচারের অনেক অংশ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। ফ্যাবারিসিয়াস এসকল মিথ্যা সুসমাচার একত্রে সংকলন করে তিন খণ্ডে মুদ্রণ করেছেন। এগুলির কোন কোন সুসমাচারে 'ইঞ্জিল' বা সুসমাচারের নির্দেশ পালনের সাথে সাথে মোশির ব্যবস্থা বা 'শরীয়ত' পালন করা এবং ত্বক্‌ছেদের (খতনার) নিয়ম পালন করাকে অত্যাবশ্যকীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে পৌল তৎকালে প্রচলিত এ সকল মিথ্যা 'সুসমাচারের' কোন একটির প্রতি ইঙ্গিত করছেন বলে জানা যায়।

আদম ক্লার্কের এই ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, লূকের সুসমাচার রচনার আগে থেকেই এবং গালাতীয়দের প্রতি পৌলের পত্রটি লেখার আগে থেকেই এ সকল মিথ্যা সুসমাচার প্রচলিত ছিল। এজন্য তিনি বলেছেন : "অসত্য ও মিথ্যা সুসমাচারের আধিক্যই লূককে তাঁর সুসমাচার লিখতে উদ্বুদ্ধ করে।"[১] তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৫ম খণ্ডে তিনি যে কথা বলেছেন সেই বক্তব্যের সাথে তাঁর এই কথা মিলে যায়। পাঠক প্রথম বক্তব্যে আদম ক্লার্কের সেই বক্তব্যটি দেখেছেন।

১. লূক সুসমাচারের প্রথমে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

এরপর তিনি বলেছেন : "এখানে পৌল তৎকালে প্রচলিত এ সকল মিথ্যা 'সুসমাচারের' কোন একটির প্রতি ইঙ্গিত করছেন বলে জানা যায়।" এ কথা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, 'সুসমাচার' বলতে পৌল লিখিত ও সংকলিত 'সুসমাচার' বুঝিয়েছেন, অলিখিত শিক্ষা বা নীতিমালা বুঝান নি। কোন কোন প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত বিভ্রান্তিমূলক দাবি করেছেন যে, পৌল এখানে 'সুসমাচার' বলতে লেখকের মনে সংগৃহীত তথ্য বুঝিয়েছেন। আদম ক্লার্কের কথা থেকে জানা গেল যে, এই পণ্ডিতের দাবি ভিত্তহীন ও অসত্য।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : পৌলের বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, প্রেরিতদের যুগে 'খৃষ্টের সুসমাচার' নামে একটি সুসমাচার প্রচলিত ছিল। কথাটি যুক্তিসঙ্গত ও বিবেকগ্রাহ্য। মূলত এটিই হলো সঠিক কথা। পণ্ডিত একহার্ন এবং অধিকাংশ জার্মান পণ্ডিতই এই মত পোষণ করেন। গবেষক লেকার্ক, কোপ, মিকাইলস, লিসনক, মার্শ প্রমুখ এই মত গ্রহণ করেছেন।[১]

তৃতীয় বক্তব্য : করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্রের ১১শ অধ্যায়ে রয়েছে : "কিন্তু যাহা করিতেছি, তাহা আরও করিব; যাহারা সুযোগ পাইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের সুযোগ যেন খণ্ডন করিতে পারি; তাহার যে বিষয়ের শ্লাঘা করে, সেই বিষয়ে যেন আমাদের সমান হইয়া পড়ে। ১৩ কেননা এরূপ লোকেরা ভাক্ত প্রেরিত (false apostles), প্রতারক কর্মকারী, তাহারা খৃষ্টের প্রেরিতদের (apostles of Christ) বেশ ধারণ করে।"

এভাবে খৃস্টানদের মহাপুরুষ পৌল তারস্বরে চিৎকার করে ঘোষণা করলেন যে, তাঁর যুগেই মিথ্যা বা ভাক্ত প্রেরিতগণ প্রকাশিত হয়েছিল যারা খৃস্টের প্রেরিতগণের বেশ ধারণ করে সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই স্থানের ব্যাখ্যায় আদম ক্লার্ক বলেন : "এ সকল ব্যক্তি দাবি করতেন যে, তাঁরা খৃস্টের প্রেরিত। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা খৃস্টের প্রেরিত ছিলেন না। তাঁরা ধর্ম প্রচার করতেন এবং এজন্য কষ্ট করতেন। কিন্তু তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কিছু জাগতিক অর্জন।"

চতুর্থ বক্তব্য : যোহনের প্রথম পত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের প্রথম আয়াতটি নিম্নরূপ : "প্রিয়তমেরা, তোমরা সকল আত্মাকে (spirit) বিশ্বাস করিও না, বরং আত্মাসকলের পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহারা ঈশ্বর হইতে কিনা, কারণ অনেক ভাক্ত ভাববাদী (false prophets) জগতে বাহির হইয়াছে।"

এভাবে পৌলের ন্যায় প্রেরিত যোহনও ঘোষণা করছেন যে, তাঁর যুগে অনেক ভাক্ত বা ভণ্ড ভাববাদী জগতে বের হয়েছিল।

১. আধুনিক খৃস্টান গবেষকগণ প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত। তারা মনে করেন যে একটি মূল সংক্ষিপ্ত সুসমাচারই (Q/Quelle/source) পরবর্তী সকল সুসমাচারের ভিত্তি। এই পুস্তকের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ১৬নং বিষয়টি এবং সেখানে অনুবাদকের টীকা দেখুন।

আদম ক্লার্ক এই স্থানের ব্যাখ্যায় বলেন : "প্রাচীন যুগে প্রত্যেক প্রচারকই দাবি করতেন যে, পবিত্র-আত্মা আমাকে এ সকল কথার প্রত্যাদেশ বা প্রেরণা দিয়েছেন। কারণ সকল ভাববাদীই এভাবে পবিত্র-আত্মার প্রত্যাদেশ নিয়ে আগমন করেছেন। এখানে 'আত্মা' বলতে বুঝানো হয়েছে ঐ মানুষ যিনি দাবি করেছেন : আমার নিকট পবিত্র-আত্মা আগমন করেছেন অথবা আমি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছি এবং তাঁরই বাণী ও নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষাদান করছি। যোহন বলেছেন : 'আত্মা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখ...'। অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী বা ধর্মপ্রচারকগণকে দলিল-প্রমাণ দিয়ে পরীক্ষা কর। তিনি বলেছেন : 'কারণ অনেক ভাক্ত ভাববাদী জগতে বাহির হইয়াছে।' অর্থাৎ ভণ্ড প্রচারক, যাদেরকে পবিত্র-আত্মা কোন প্রেরণা দান করেন নি, বিশেষত ইহূদীদের মধ্য থেকে।"

এখানে আদম ক্লার্কের ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, প্রাচীন যুগে প্রত্যেক প্রচারকই ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ বা প্রেরণা লাভের দাবি করতেন। তাঁর পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গিয়েছে যে, একমাত্র জাগতিক লাভ ও সম্পদ অর্জনের জন্যই তাঁরা খৃস্টের প্রেরিতদের বেশ ধারণ করত, ষড়যন্ত্র করত এবং ধোঁকা দিত। কাজেই প্রেরিতত্ব ও পবিত্র-আত্মায় পূর্ণ হওয়ার দাবিদার মানুষ সে সময়ে ছিল খুবই বেশি।

পঞ্চম বক্তব্য : পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি পুস্তক মোশির রচিত বলে বর্তমানে প্রসিদ্ধ। এছাড়াও আরো ছয়টি পুস্তক তাঁর রচিত বলে প্রচারিত ও পরিচিত ছিল। পুস্তকগুলির নাম নিম্নরূপ :

১. মোশির নিকট প্রকাশিত বাক্য।
২. ক্ষুদ্র আদিপুস্তক (Genesis Apocryphon)।
৩. ঊর্ধ্বারোহণ পুস্তক (The Assumption of Moses)।
৪. রহস্য পুস্তক।
৫. প্রতিজ্ঞা বা নিয়ম পুস্তক (Testament)।
৬. স্বীকৃতি পুস্তক।

এই ছয়টি পুস্তকের মধ্যে দ্বিতীয় পুস্তকটির মূল হিব্রু পাণ্ডুলিপিটি ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। জিরোম পুস্তকটি থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। সিড্রেন্স তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এই পুস্তকটি থেকে অনেক তথ্য গ্রহণ করেছেন। ওরিগন বলেন : 'গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পত্রের ৫ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ আয়াতে এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে পৌল এই পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই পুস্তকের অনুবাদ ১৬শ শতক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এই শতকে ট্রেন্ট-এর যাজকীয় মহাসমাবেশে (Council of Trent of Tedentine Council)[1] এই পুস্তকটিকে জাল ও মিথ্যা বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে পুস্তকটি জাল

১. প্রটেস্ট্যান্ট বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক চার্চকে বাঁচানোর জন্য পোপ তাঁর পক্ষের বিশপদের সম্মেলন আহ্বান করেন। ১৫৪৫ খৃস্টাব্দে ইটালীর ট্রেন্ট নামক শহরে এই সম্মেলন শুরু হয়। কয়েক দফায় ১৫৬৩ খৃস্টাব্দে এই সম্মেলন শেষ হয়। এই সম্মেলনে ক্যাথলিক চার্চকে রক্ষা করার জন্য অনেক সংস্কারমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যেগুলি Tridentine Reformation নামে পরিচিত।

পুস্তকগুলির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আমি তাঁদের সত্য বলে গ্রহণ ও মিথ্যা বলে বর্জনের পদ্ধতি দেখে অবাক হয়ে যাই। ঐশ্বরিক পুস্তক ও স্বর্গীয় রীতিনীতির অবস্থা তাঁদের কাছে একই। যখন তাঁরা কোন স্বার্থ বা প্রয়োজন দেখতে পান তাঁরা তা মেনে নেন। আবার যখন তাঁদের মর্জি হয় তখন তা নিষেধ করে দেন।

উপর্যুক্ত ছয়টি পুস্তকের তৃতীয় পুস্তকটিও প্রাচীন খৃষ্টানদের নিকট নির্ভরযোগ্য ছিল বলে জানা যায়। লর্ডনার তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৫১২ পৃষ্ঠায় বলেন : "ওরিগন বলেছেন : যিহূদা তাঁর পত্রের নবম আয়াতটি এই পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করেছেন।"

এখন এই পুস্তকটি এবং ৬ পুস্তকের বাকি সকল পুস্তকই জাল বলে গণ্য। অথচ এ সকল জাল পুস্তকের যে সকল কথা নতুন নিয়মের বিভিন্ন পুস্তক বা পত্রে ঢুকে গিয়েছে সেগুলি সবই বিশুদ্ধ ও ঐশ্বরিক প্রেরণা–লব্ধ বলে গণ্য।

হর্ন বলেন : "ধারণা করা হয় যে, খৃষ্টধর্মের শুরুর দিকে এ সকল জাল পুস্তকগুলি রচনা করা হয়েছে।" এভাবে এই গবেষক পণ্ডিত উপর্যুক্ত জাল পুস্তকগুলির জালিয়াতির সময় নির্ধারণ করলেন এবং এগুলি ১ম খৃষ্টীয় শতকে রচিত বলে উল্লেখ করলেন।

ষষ্ঠ বক্তব্য : ঐতিহাসিক মোশিম ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত তাঁর ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের ৬৫ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় খৃষ্টীয় শতাব্দীর পণ্ডিতগণের বর্ণনায় বলেন : "প্লেটো ও পিথাগোরাসের (Pythagoras) অনুসারীদের মধ্যে একটি কথা প্রসিদ্ধ ছিল। কথাটি হলো : 'সত্যের বৃদ্ধির জন্য ও ঈশ্বরের উপাসনার জন্য মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনা শুধু বৈধ-ই নয় উপরন্তু তা প্রশংসনীয় বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য'। খৃস্টের আগমনের পূর্বেই এই কথাটি তাঁদের থেকে প্রথমে মিসরের ইহূদীরা শিক্ষালাভ করে। অনেক প্রাচীন পুস্তক থেকে এ কথা নিশ্চিতরূপে জানা যায়। এরপর এই ঘৃণিত মহামারী খৃষ্টানগণের মধ্যে প্রভাব ফেলে। মহান ধর্মগুরুদের নামে জালিয়াতি করে প্রচারিত বিপুল সংখ্যক পুস্তক থেকে এ কথা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।"

তাহলে আমরা জানতে পারছি যে, খৃস্টের পূর্বেই ইহূদীদের নিকট মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা ধর্মীয়ভাবে প্রশংসনীয় কর্মে পরিণত হয়। এরপর দ্বিতীয় খৃষ্টীয় শতাব্দীতে খৃষ্টানদের নিকটেও এভাবে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা প্রশংসনীয় ধর্মীয় কাজে পরিণত হয়। অতএব জালিয়াতি, বিকৃতি ও মিথ্যার কোন সীমারেখা কোথাও ছিল না। তারা যা করার সবই করেছেন।

৭ম বক্তব্য : ইউসেবিয়াস (Eusebius Pamphilus) তাঁর ইতিহাসের (Ecclesisatical History) চতুর্থ পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ে বলেন : "(দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ খৃষ্টান ধর্মগুরু) শহীদ জাস্টিন (Justin the Martyr) ইহূদী ট্রিফোনের (Tryphon) প্রতিবাদে খৃষ্ট সম্পর্কে অনেকগুলি ভাববাণী বা সুসংবাদ উল্লেখ করেন এবং তিনি দাবি করেন যে, ইহূদীরা এ সকল কথা পবিত্র পুস্তকাবলি থেকে বাদ দিয়েছে।"

ওয়াটসন তাঁর পুস্তকের ৩য় খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় বলেন : "এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, ট্রিফোনের সাথে বিতর্কের সময় জাস্টিন যে সকল বক্তব্য উদ্ধৃত করে

ইহূদীদের মত খণ্ডন করেছিলেন সে সকল বক্তব্য জাস্টিনের যুগে ও আরিয়ানুসের (Irenaus) যুগে-২য় ও ৩য় শতাব্দীতে পুরাতন নিয়মের হিব্রু সংস্করণে, গ্রীক অনুবাদে ও বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, যদিও এখন হিব্রু বা গ্রীক কোন সংস্করণেই এগুলি নেই। বিশেষ করে যে কথাগুলির বিষয়ে জাস্টিন বলেছেন যে, সেগুলি যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকে ছিল। জাস্টিনের পত্রের টীকায় সিলভারসেস এবং আরিয়ানুসের টীকায় ড. ক্রীপ লিখেছেন : পিতর তাঁর প্রথম পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ আয়াতটি যখন লিখেন, তখন তাঁর স্মৃতিতে এই সুসমাচারটি বা সুসংবাদটি বিদ্যমান ছিল।"

হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠায় বলেন : "ট্রিফোনের বিরুদ্ধে লিখিত পত্রে জাস্টিন দাবি করেন যে, ইয্রা মানুষদেরকে বলেছিলেন, 'নিস্তারপর্বের খাদ্য আমাদের নিস্তারদাতা সদাপ্রভুর খাদ্য। তোমরা যদি সদাপ্রভুকে এই চিহ্নের চেয়ে অর্থাৎ খাদ্যের চেয়ে উত্তমরূপে অনুধাবন কর এবং তাঁতে বিশ্বাস গ্রহণ কর তবে এই ভূমি কখনোই জনহীন হবেনা। আর যদি তোমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস গ্রহণ না কর এবং তাঁর উপদেশ গ্রহণ না কর তবে তোমরা অন্যান্য জাতিদের উপহাসের পাত্রে পরিণত হবে। ওয়াই টিকার বলেন : সম্ভবত জাস্টিন উদ্ধৃত এই কথাগুলি ইয্রার পুস্তকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২১ ও ২২ আয়াতদ্বয়ের মাঝে বিদ্যমান ছিল। ড. এ. ক্লার্ক জাস্টিনের বক্তব্যকে সঠিক বলে মনে করেছেন।"

উপরের বক্তব্যগুলি থেকে প্রকাশ পেল যে, দ্বিতীয় শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু দাবি করেন যে, ইহূদীরা বাইবেল থেকে (খৃষ্ট বিষয়ক) অনেক সুসংবাদ ফেলে দিয়েছে। জাস্টিনের এই দাবি সত্য বলে মেনে নিয়েছেন সিলভারজিস, ক্রীপ, ওয়াই টিকার, এ. ক্লার্ক ও ওয়াটসন। ওয়াটসন দাবি করেছেন যে, জাস্টিনের উদ্ধৃত এ সকল কথা যদিও বর্তমান যুগে বাইবেলের কোন পাণ্ডুলিপিতেই পাওয়া যায় না, তবে সেগুলি জাস্টিনের যুগে ও আরিয়ানুসের যুগে বাইবেলের হিব্রু ও গ্রীক পাণ্ডুলিপিতে ও বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে বিদ্যমান ছিল।

এ থেকে দুইটি বিষয়ের একটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো। এই মহান খৃস্টান গুরু এবং তাঁর ৫ সমর্থকের দাবি যদি সত্য হয় তবে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হলো যে, ইহূদীরা এই বাক্যগুলি ফেলে দিয়ে বাইবেল বিকৃত করেছে। আর যদি তাঁদের দাবি সত্য না হয় তাহলে প্রমাণিত হলো যে, এই খৃস্টান মহাপুরুষ ও তাঁর অনুসারিগণ এই বাক্যগুলিকে বাইবেলের মধ্যে সংযোজন করে বাইবেলের বিকৃতি সাধন করেছেন, যে কথা বাইবেলের অংশ নয় তাকে বাইবেলের অংশ বলে দাবি করেছেন, যে কথা ঈশ্বরের বাণী নয় সে কথা তাঁরা ঈশ্বরের বাণী হিসেবে পালন করে একটি ঘৃণ্য অন্যায়ের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। উভয় পক্ষের একপক্ষ নিঃসন্দেহে বিকৃতির অপরাধে অপরাধী।

অনুরূপভাবে ওয়াটসনের বক্তব্য অনুসারে আমরা জানতে পারছি যে, জাস্টিন ও আরিয়ানুসের সময়ে এ কথাগুলি বাইবেলের মধ্যে ছিল। তৃতীয় শতকের পরে এ বাক্য বাইবেলের হিব্রু ও গ্রীক পাণ্ডুলিপি থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যদি তাঁর কথা সত্য হয় তবে তৃতীয় শতকের পরেও বাইবেলে বিকৃতি ঘটেছে এবং যারা বাক্যটি ফেলে দিয়েছে তারা অপরাধী। আর যদি তাঁর কথা ভুল হয় তবে জাস্টিন, আরিয়ানুস ও অন্যান্য যারা এই কথাগুলোকে বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন তাঁরা অপরাধী।

অষ্টম বক্তব্য : লর্ডনার তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ১২৪ পৃষ্ঠায় বলেন : "(৬ষ্ঠ শতাব্দীতে) রোমান সম্রাট আনাসথেসিয়াস (Anastasius 1:491-518)-এর যুগে, যখন মিস্‌সালা কনস্ট্যান্টিনোপলের গভর্নর ছিলেন, তখন অজ্ঞাত পরিচয় লেখকের রচিত হওয়ার কারণে পবিত্র সুসমাচারগুলিকে অশুদ্ধ বলে সম্রাটের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়। তখন এগুলিকে পুনরায় সংশোধন করা হয়।"

আমার কথা হলো, সুসমাচারগুলি যদি প্রকৃতই ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ হতো এবং উক্ত সম্রাটের যুগে বিদ্যমান প্রাচীন খৃস্টান পণ্ডিতগণের নিকট বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হতো যে, পুস্তকগুলি অমুক, অমুক প্রেরিত বা তাঁদের অমুক অনুগামীর রচিত, তবে 'অজ্ঞাত পরিচয় লেখকের রচনা' বলে সেগুলিকে অশুদ্ধ ঘোষণা করার কোন অর্থ থাকতো না। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, সে যুগের খৃস্টানগণের নিকট সেগুলির লেখকের বিষয়ে কোন প্রমাণিত তথ্য ছিল না। এ ছাড়া তাঁরা পুস্তকগুলিকে ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ বলেও মনে করতেন না। এজন্য তাঁরা যথাসাধ্য সেগুলির সংশোধন করেছেন এবং ভুলভ্রান্তি ও বৈপরীত্য দূর করেছেন। এভাবে বিকৃতির ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে।

এখানে বাইবেলের বিকৃতি যেমন প্রমাণিত হলো, তেমনি প্রমাণিত হলো যে, সেগুলির গ্রহণযোগ্যতার কোন প্রমাণ বা সূত্র-পরম্পরা নেই। সকল প্রশংসাই আল্লাহ্‌র নিমিত্ত।

কোন কোন প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত দাবি করেন যে, কখনোই কোন সময়ে সম্রাট বা কোন শাসক-প্রশাসক বাইবেলের মধ্যে হস্তক্ষেপ করেন নি। তাঁদের এই দাবি যে একেবারেই মিথ্যা ও বাতিল তা লর্ডনারের এই বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো। এও প্রমাণিত হলো যে, সুসমাচারগুলির বিষয়ে একহার্ন ও অন্যান্য জার্মান পণ্ডিতের মত অত্যন্ত শক্তিশালী।

৯ম বক্তব্য : প্রথম পরচ্ছেদের দ্বিতীয় প্রমাণের আলোচনা থেকে পাঠক জানতে পেরেছেন যে, চতুর্থ শতকের শ্রেষ্ঠ খৃস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরু অগাস্টিন (St. Augustine) এবং অন্যান্য প্রাচীন খৃস্টান ধর্মজ্ঞ পণ্ডিত বলেছেন যে, গ্রীক অনুবাদকে অগ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে ইহূদীরা হিব্রু বাইবেলকে বিকৃত করে। ১৩০ খৃস্টাব্দে ইহূদীরা এই বিকৃতি সাধন করে। পাঠক আরো দেখেছেন যে, গবেষক হেলয ও কেনিকটও প্রাচীন

ধর্মগুরুগণের সাথে একমত পোষণ করেছেন। এছাড়া হেলয বিভিন্ন শক্তিশালী দলিল উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন যে, শমরীয় তোরাহ্-ই বিশুদ্ধ। আর কেনিকট বলেছেন : ইহূদীগণই ইচ্ছাকৃতভাবে তোরাহকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করেছিল। পুরাতন ও নতুন নিয়মের ভাষ্যকারগণ যে অভিযোগ করেন যে, 'শমরীয়গণ ইচ্ছাকৃতভাবে তোরাহকে বিকৃত করেছে' সেই অভিযোগ ভিত্তিহীন।

১০ম বক্তব্য : প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় প্রমাণের আলোচনা থেকে পাঠক জেনেছেন যে, কেনিকট শমরীয় সংস্করণকে বিশুদ্ধ বলে দাবি করেছেন এবং অনেক মানুষই বুঝতে পেরেছেন যে, হিব্রু তোরাহ-এ বিকৃতি প্রমাণ করার পক্ষে কেনিকটের দলিলগুলি খুবই শক্তিশালী, যেগুলির কোন জওয়াব দেওয়া সম্ভব নয়। এটা সুনিশ্চিত যে, শমরীয়দের সাথে শত্রুতার কারণে ইহূদীগণ তাদের তোরাহকে বিকৃত করেছিল।

১১শ বক্তব্য : ১ম পরিচ্ছেদের ১১শ প্রমাণের আলোচনা থেকে পাঠক দেখেছেন যে, আদম ক্লার্ক তোরাহ-এর মধ্যে বিকৃতির কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পুরাতন নিয়মের ঐতিহাসিক পুস্তকগুলিতে অনেকস্থানে অনেক বিকৃতি ঘটেছে। এ সকল বিকৃতির ক্ষেত্রে সমন্বয়ের চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। যে কথা অস্বীকার করে পার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই সেকথা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া উত্তম। এছাড়া ১ম পরিচ্ছেদের ১৮শ প্রমাণের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, পুরাতন নিয়মের ঐতিহাসিক পুস্তকগুলিতে সংখ্যার ক্ষেত্রে অনেক বিকৃতি ঘটেছে বলে আদম ক্লার্ক স্বীকার করেছেন।

১২শ বক্তব্য : ১ম পরিচ্ছেদের ২২শ প্রমাণের আলোচনায় পাঠক জানতে পেরেছেন যে, আদম ক্লার্ক-এর মতে গ্রহণযোগ্য সম্ভাবনা হলো যে, এই স্থানে ইহূদীগণ মূল হিব্রু বাইবেলে ও গ্রীক অনুবাদে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করেছে। এইরূপ আরো অনেক স্থানে, যেখানে বাইবেলের নতুন নিয়মে পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সে সকল স্থানে ইহূদীগণ এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃতি করেছে বলে জোরালোভাবে ধারণা পোষণ করা হয়।

১৩শ বক্তব্য : ১ম পরিচ্ছেদের ২৩শ প্রমাণের আলোচনা থেকে পাঠক দেখেছেন যে, ইহূদীরা ১২টি আয়াত বিকৃত করেছে বলে হর্ন স্বীকার করেছেন।

১৪শ বক্তব্য : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম প্রমাণের আলোচনা থেকে পাঠক জেনেছেন যে, ৮টি পুস্তকের বিষয়ে রোমান ক্যাথলিক চার্চের সর্বসম্মত মত ও সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, বইগুলি বিশুদ্ধ ও ঐশ্বরিক বা আসমানী পুস্তক। অনুরূপভাবে তাঁদের সর্বসম্মত মত ও বিশ্বাস যে, বাইবেলের ল্যাটিন অনুবাদই বিশুদ্ধ। পাঠক আরো জেনেছেন যে, প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় বলেন যে, এই ৮টি পুস্তক সবগুলিই বিকৃত ও জাল। এগুলি বাতিল ও প্রত্যাখ্যান করা জরুরী। তাঁরা আরো বলেন যে, ৫ম শতাব্দী থেকে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে বাইবেলের ল্যাটিন অনুবাদটির মধ্যে অনেক বিকৃতি ও

সংযোজন ঘটেছে। ল্যাটিন অনুবাদে যেরূপ বিকৃতি ঘটেছে এরূপ বিকৃতি অন্য অনুবাদে ঘটেনি। এই অনুবাদের লিপিকারগণ বেপরোয়াভাবে নতুন নিয়মে পুস্তকের বক্তব্য আরেক পুস্তকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তারা কথাগুলি মূল পাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

১৫শ বক্তব্য : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ২৬শ প্রমাণের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, আদম ক্লার্ক কেনিকটের মত গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ইহুদীগণ জোসেফাসের যুগে (খৃস্টীয় প্রথম শতকে) তাঁদের ধর্মগ্রন্থগুলিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে আগ্রহী ছিল। এজন্য তাঁরা বিভিন্ন প্রার্থনা ও গীত উদ্ভাবন করতেন। এছাড়া নতুন নতুন বিভিন্ন কথাবার্তা উদ্ভাবন করতেন। ইস্টেরের পুস্তকের মধ্যে সংযোজিত বিপুল কাহিনী ভাণ্ডার এর প্রমাণ। অনুরূপভাবে ইস্রা ও নহিমিয়ের পুস্তকে মদ, নারী, সত্যবাদিতা ইত্যাদি বিষয়ক যে সকল কাহিনী সংযোজন করা হয়েছে সেগুলিও দ্রষ্টব্য যেগুলিকে এখন 'ইস্রার প্রথম পুস্তক' বলা হয়। দানিয়েলের পুস্তকের মধ্যে সংযোজিত তিন শিশুর গীতের বিষয়টিও এর প্রমাণ। এছাড়া জোসেফাসের পুস্তকের বিপুল সংযোজন লক্ষ্যণীয়।

আমার কথা হলো, যেহেতু এইরূপ বিকৃতি বা জালিয়াতির উদ্দেশ্য ছিল 'ধর্মগ্রন্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা', সেহেতু তাঁদের দৃষ্টিতে তা নিন্দনীয় ছিল না। এজন্য তাঁরা বেপরোয়াভাবে বিকৃতি সাধন করতেন। বিশেষত পাঠক ৬ষ্ঠ বক্তব্য থেকে জেনেছেন যে, 'সত্যের বৃদ্ধির জন্য ও ঈশ্বরের উপাসনার জন্য মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনার বৈধতা ও প্রশংসনীয়তার' বিষয়ে তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ কথাটির ভিত্তিতে তাঁরা কর্ম করতেন। এজন্য বিভিন্ন প্রকারের বিকৃতি তাঁদের মতে ধর্মীয় পুণ্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৬শ বক্তব্য : তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম প্রমাণের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন, আদম ক্লার্কের স্বীকারোক্তি অনুসারে পণ্ডিতগণ একমত যে, মোশির ৫টি পুস্তকের ক্ষেত্রে শমরীয় তোরাহ-ই অধিকতর বিশুদ্ধ (হিব্রু তোরাহ ও গ্রীক অনুবাদ বিকৃত)।

১৭শ বক্তব্য : ৩য় পরিচ্ছেদের ১২শ প্রমাণের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, গ্রীক বাইবেলে ইয়োবের পুস্তকের শেষে যে কথাগুলি রয়েছে সেগুলি প্রটেস্ট্যান্টদের মতে জাল, যদিও এই কথাগুলি খৃস্টের পূর্ব থেকেই রয়েছে। খৃস্টের প্রেরিতগণের যুগে এই কথাগুলি অনুবাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন ধর্মগুরুগণ এগুলিকে ঐশ্বরিক বলে মানতেন।

১৮শ বক্তব্য : ৩য় পরিচ্ছেদের ১৯শ প্রমাণের আলোচনা থেকে পাঠক ক্রীযস্টমের বক্তব্য জেনেছেন। তিনি বলেছেন : "ভাববাদিগণের অনেক পুস্তক হারিয়ে ও বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। কারণ ইহূদীগণ তাঁদের অবহেলার কারণে-বরং তাঁদের ধর্মহীনতা ও অসততার কারণে-অনেক পুস্তক হারিয়ে ফেলেছে। কিছু পুস্তক তাঁরা ছিড়ে ফেলেছে এবং কিছু পুস্তক তাঁরা পুড়িয়ে ফেলেছে।" ক্যাথলিক সম্প্রদায় এই মতে বিশ্বাস করেন।

১৯শ বক্তব্য : হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রীক অনুবাদের বিবরণে বলেন : "এই অনুবাদটি অত্যন্ত প্রাচীন। ইহূদীগণ ও প্রাচীন খৃস্টানগণের মধ্যে এই অনুবাদটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ বলে গণ্য ছিল। উভয় সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে তা পঠিত হতো। খৃস্টান ধর্মগুরুগণ-তাঁরা ল্যাটিন হোন বা গ্রীক হোন-কেউই এই গ্রীক অনুবাদ ছাড়া অন্য কোন সংস্করণ থেকে কোন কিছু উদ্ধৃত করেন নি। একমাত্র সিরীয় অনুবাদ ছাড়া খৃস্টীয় চার্চের কাছে স্বীকৃত সকল অনুবাদই এই অনুবাদ থেকে করা হয়েছে। যেমন আরবী অনুবাদ, আরমেনীয় অনুবাদ, ইথিওপীয় অনুবাদ, প্রাচীন ইটালীয় অনুবাদ এবং ল্যাটিন অনুবাদ যা জিরোমের পূর্বে প্রচলিত ছিল। এখন পর্যন্ত গ্রীক অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের চার্চে ও পূর্বাঞ্চলীয় চার্চগুলিতে শুধু এই অনুবাদটিই পড়া হয়।"

অতঃপর তিনি বলেন : "আমাদের মতে সঠিক কথা হলো, খৃস্টের জন্মের ২৮৫ বা ২৮৬ বছর পূর্বে এই অনুবাদটি করা হয়।"

অতঃপর তিনি বলেন : "এই অনুবাদটির প্রসিদ্ধির জন্য একটি প্রমাণই যথেষ্ট, তা হলো, নতুন নিয়মের লেখকগণ এই অনুবাদ ছাড়া অন্য কোন সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেন নি। ওরিগন ও জিরোম ছাড়া অন্য কোন প্রাচীন ধর্মগুরু হিব্রু ভাষা জানতেন না। এ সকল প্রাচীন ধর্মগুরুগণ গ্রীক অনুবাদের উপর নির্ভর করার ক্ষেত্রে নতুন নিয়মের লেখকগণের অনুসরণ করতেন। কারণ তাঁরা ঐশ্বরিক প্রেরণার মাধ্যমে লিখেছেন (এতে বুঝা গেল যে, স্বয়ং ঈশ্বর বা পবিত্র-আত্মা এই গ্রীক অনুবাদের বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়েছেন)। এ সকল মানুষ যদিও ধর্মের বিষয়ে অত্যন্ত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতেন, তবুও তাঁরা বাইবেলের মূলভাষা হিব্রু ভাষাটি শিখেন নি। তাঁরা মনে করতেন যে, গ্রীক অনুবাদই তাঁদের সকল প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট। গ্রীক চার্চ এই অনুবাদটিকেই পবিত্রগ্রন্থ বলে বিশ্বাস করে, ভক্তি করে।"

এরপর তিনি বলেন : "১৫০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই অনুবাদটি গ্রীক ও ল্যাটিন চার্চে পঠিত হতো। এ থেকেই তথ্য ও উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হতো। ইহূদীদের উপাসনালয়গুলিতেও এই অনুবাদটি খৃস্টীয় যুগের প্রথম সময় পর্যন্ত (দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত) নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য ছিল। এরপর যখন খৃস্টানগণ এই অনুবাদ থেকে ইহূদীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে লাগল তখন তাঁরা এই অনুবাদের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন যে, এই অনুবাদটি মূল হিব্রু পাঠের সাথে মিলে না। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে তাঁরা এই অনুবাদ থেকে অনেক অনুচ্ছেদ ফেলে দিতে লাগলেন। এরপর তাঁরা এই গ্রীক অনুবাদটি পরিত্যাগ করেন এবং (১৩০ খৃস্টাব্দে) আকুইলা (Aquila of Pontus) পুরাতন নিয়মের যে অনুবাদটি করেন তাঁরা সেই অনুবাদকে গ্রহণ করেন। এই গ্রীক অনুবাদটি যেহেতু দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ইহূদীদের উপাসনালয়গুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং

সুদীর্ঘ কাল খৃস্টান উপাসনালয়গুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে, সেহেতু এর উদ্ধৃতি বেশি হয়েছে এবং এর মধ্যে ভুলভ্রান্তি ঢুকে গিয়েছে। কারণ ইহূদীরা ইচ্ছাকৃতভাবে একে বিকৃত করেছে। এছাড়া অনুলিপিকারের ভুলের কারণে এবং ব্যাখ্যা ও টীকার কথা মূল পাঠের মধ্যে প্রবেশ করার কারণেও এ সকল ভুলভ্রান্তি এতে প্রবেশ করেছে।"

ক্যাথলিক পণ্ডিত ওয়ার্ড ১৮৪১ সালে মুদ্রিত তাঁর পুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠায় বলেন: "পূর্বাঞ্চলীয় ধর্মদ্রোহীরা (heretic, infidel) এই গ্রীক অনুবাদটিকে বিকৃত করেছিল।"

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত গবেষক হর্নের স্বীকৃতি থেকে প্রমাণিত হলো যে, ইহূদীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে এই গ্রীক অনুবাদটি বিকৃত করেছিল। কারণ প্রথমে তিনি বলেছেন: "দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে তাঁরা এই অনুবাদ থেকে অনেক অনুচ্ছেদ ফেলে দিতে লাগলেন"। এরপর আবার তিনি বলেছেন: "কারণ ইহূদীরা ইচ্ছাকৃতভাবে একে বিকৃত করেছে"।

গবেষক হর্ন স্বীকার করলেন যে, তাঁরা এই বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছিলেন খৃস্টধর্মের বিরোধিতার কারণে। কাজেই প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের কোন সুযোগ নেই যে, তাঁরা ইহূদীদের দ্বারা সম্পাদিত এই ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ও জালিয়াতির কথা অস্বীকার করবেন। (ওয়ার্ডের কথা থেকে জানা গেল যে) ক্যাথলিক সম্প্রদায়ও গ্রীক অনুবাদের এই ইচ্ছাকৃত বিকৃতির কথা স্বীকার করেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায় একমত যে, গ্রীক বাইবেলকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করা হয়েছে।

প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের বক্তব্য অনুযায়ী আমরা জানতে পারলাম যে, খৃস্টধর্মের বিরোধিতার জন্য ইহূদীরা একটি প্রসিদ্ধ ও বহুল ব্যবহৃত অনুবাদকে বিকৃত করেছিলো। অনুবাদটি (খৃ. পূ. ২৮৫ থেকে ১৩০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত) চারশ' বছরেরও বেশি সময় ইহূদীদের সকল উপাসনালয়ে ব্যবহৃত হয়েছিল। অনুরূপভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের সকল খৃস্টান উপাসনালয়ে তা ব্যবহৃত হয়েছিল। এইরূপ একটি বহুল প্রচলিত ও সুপরিচিত 'ধর্মগ্রন্থ' বা ঈশ্বরের বাণীকে বিকৃত করতে যেয়ে তাঁরা 'ঈশ্বরকে' ভয় করলেন না। এমনকি একটি বহুল প্রচলিত 'ধর্মগ্রন্থ' বিকৃত করতে তাঁরা মানুষের নিন্দারও ভয় পেলেন না। সর্বোপরি এত বহুল প্রচলিত ও ব্যবহৃত পুস্তকটিকে ইহূদীরা নিজেদের ইচ্ছামত বিকৃত করে ফেলতে পারলো, কেউ তা ঠেকাতে পারলো না।[১]

১. তাঁরা যে সকল বিষয় সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন করেছেন তা কার্যকর হয়েছে। এমন ঘটেনি যে, তাঁরা একটি দুইটি পাণ্ডুলিপি বিকৃত করলেন, কিন্তু পূর্বযুগের বা সেই যুগের অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে মূল বিশুদ্ধ পাঠটি থেকে গেল, যেগুলি দিয়ে সেই যুগের বা পরবর্তী যুগের মানুষেরা ইহূদীদের এই জালিয়াতি প্রমাণ করবেন। এজন্য আমরা দেখি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে খৃস্টান পণ্ডিতগণ শুধু দাবি করেন যে, এখানে ইহূদীগণ বিকৃতি সাধন করেছে, কিন্তু তাঁরা কোন পাণ্ডুলিপি এনে প্রমাণ করতে পারেন না যে, অমুক পাণ্ডুলিপিতে বিশুদ্ধ কথাটি পাওয়া যায়...।

আমরা জানি যে, পুরাতন নিয়মের মূল হিব্রু সংস্করণটি এইরূপ বহুল প্রচলিত ও ব্যবহৃত ছিল না। এই সংস্করণটি শুধু ইহূদীদের নিকটেই সংরক্ষিত ছিল, খৃষ্টানদের মধ্যে তা প্রচলিত ছিল না। দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ইহূদী বা খৃস্টান কোন সম্প্রদায়ের মানুষই এই হিব্রু সংস্করণ ব্যবহার করতেন না। যে সম্প্রদায়ের মানুষেরা একটি বহুল ব্যবহৃত ও বিরোধীদের মধ্যে প্রচলিত পুস্তককে এভাবে বিকৃত করতে পারেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের হাতের মধ্যে থাকা একেবারেই অব্যবহৃত ও বিরোধীদের কাছে অজ্ঞাত ও অপরিচিত এই হিব্রু সংস্করণকে ইচ্ছামত বিকৃত করেন নি বলে আমরা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারি? বরং আমরা নিশ্চিতরূপেই বুঝতে পারি যে, ইহূদীগণ হিব্রু বাইবেলও বিকৃত করেছে এবং তাঁদের বিকৃতি কার্যকর হয়েছে।[১]

খৃস্টান পণ্ডিতগণও এ কথা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ইহূদীগণ হিব্রু বাইবেলকেও ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করেছে। পাঠক ইতোপূর্বে দেখেছেন যে, অগাস্টিন ও অন্যান্য প্রাচীন ধর্মগুরুর মতে খৃষ্টধর্মের বিরোধিতার জন্যই তারা বিকৃতির আশ্রয় নেয়। প্রথম পরিচ্ছেদের ২২শ প্রমাণের আলোচনায় এবং এই অনুচ্ছেদের ১২শ বক্তব্যের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, আদম ক্লার্ক এ কথা স্বীকার করেছেন। অনুরূপভাবে প্রথম পরিচ্ছেদের ২৩শ প্রমাণ ও এই অনুচ্ছেদের ১৩শ বক্তব্যের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে,হর্ন তাঁর কঠিন গোঁড়ামি সত্ত্বেও স্বীকার করেছেন যে, ১২টি আয়াতে ৬ স্থানে ইহূদীরা ইচ্ছাকৃতভাবে এইরূপ বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে।

কেনিকট, আদম ক্লার্ক ও অন্য অনেক পণ্ডিতের মতে শমরীয়দের সাথে শত্রুতার কারণে ইহূদীরা তাঁদের হিব্রু বাইবেলকে বিকৃত করেছে। প্রথম পরিচ্ছেদের ৩য় প্রমাণ ও এই অনুচ্ছেদের ১০ম বক্তব্যের আলোচনায় পাঠক তা জেনেছেন। কোন কোন পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন যে, ইহূদীরা নিজেদের মধ্যকার বিরোধিতার কারণেও হিব্রু বাইবেলকে বিকৃত করেছে।

পাঠক পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছেন যে, প্রথম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন খৃস্টান সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যকার বিরোধের কারণে সুসমাচারগুলিকে বিকৃত করত বা জাল সুসমাচার প্রচার করত। ইহূদীরাও অনুরূপ করেছে। এই অনুচ্ছেদের ৩০শ বক্তব্যের আলোচনা থেকে পাঠক জানতে পারবেন যে, এই সকল ইচ্ছাকৃত জালিয়াতি ও বিকৃত সাধিত হতো 'ধার্মিক' মানুষদের দ্বারা এবং সত্যপরায়ণ খৃষ্টানদের দ্বারা, যারা সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরাই সত্যিকার বিশ্বাসী। তাঁদের বিরোধিগণ, যাদেরকে তাঁরা তাঁদের মত সত্যিকার বিশ্বাসী বলে মনে করতেন না, তাদের বিরুদ্ধে তাঁরা এ সকল জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করতেন।

---

১. গ্রীক বাইবেলের ক্ষেত্রে যেরূপ ঘটেছে হিব্রু বাইবেলের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে বিকৃত পাণ্ডুলিপিই প্রচলিত হয়েছে।

এতে অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই। এইরূপ বিকৃতি ও জালিয়াতি তো তাঁদের মতে মুসতাহাব বা ধর্মীয় পুণ্যকর্ম বলে গণ্য ছিল। সত্যিকার ধার্মিকতার তো এটিই দাবি! তাঁদের মধ্যে প্রচলিত প্রসিদ্ধ কথাটি তো এই শিক্ষা দেয়। পাঠক এই অনুচ্ছেদের ৬ষ্ঠ বক্তব্যের আলোচনায় কথাটি জেনেছেন।

এছাড়া আরো অন্যান্য কারণ ও উদ্দেশ্য সেই যুগে বিদ্যমান ছিল, যেগুলির প্রেক্ষাপটে ইহূদীগণ তাঁদের পবিত্র পুস্তকগুলিকে বিকৃত করেছিলেন।

মরহূম তূর্কি সুলতান বায়েযীদ খানের[১] সময়ে একজন ইহূদী ধর্মগুরু ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি 'আবদুস সালাম' নাম গ্রহণ করেন। তিনি ইহূদীদের বিরুদ্ধে 'আর-রিসালা আল-হাদীয়া' (পথনির্দেশক পুস্তিকা) নামে একটি ছোট পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকায় তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইহূদীগণ কর্তৃক পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির কিছু শাব্দিক পরিবর্তন ও বিকৃতির বিষয় আলোচনা করেছেন।

এই পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন : "তোরাহ-এর প্রসিদ্ধতম ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তালমূদের' মধ্যে আমরা পেয়েছি যে, নেবুকাদনেযারের (Bebuchadnezzar II d. 562 b. c.) পরের যুগের একজন রাজা ছিলেন টলেমি (Ptolemy Philadelphus, d. 246 b. c.)। তিনি ইহূদী ধর্মগুরুগণকে নির্দেশ দেন তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলিকে প্রকাশ করতে। তাঁরা তা প্রকাশ করতে ভয় পান। কারণ রাজা টলেমি তোরাহ-এর কিছু কিছু বিষয়ে আপত্তি করতেন। তখন ৭০ জন ইহূদী পণ্ডিত একত্রিত হয়ে টলেমি যে সকল বিষয় আপত্তি করতেন সে সকল বিষয় তাঁদের ইচ্ছামত পরিবর্তন করেন। টলেমির ভয়ে তাঁরা এই কাজ করেন।[২] এভাবে একটি পুরো পুস্তকের ইচ্ছামত বিকৃতি যখন তাঁরা স্বীকার করে নিলেন, তখন দুই একটি আয়াতের বিষয়ে কিভাবে তাঁদের উপর নির্ভর করা যায়?"

আমরা দেখেছি যে, ক্যাথলিক পণ্ডিতগণের মত অনুসারে প্রাচ্যের বা পূর্বাঞ্চলীয় ধর্মদ্রোহীরা এই গ্রীক অনুবাদটিকে বিকৃত করেছিল। তাঁদের কথার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, পণ্ডিত হর্নের বর্ণনা অনুসারে দেড় হাজার বছর পর্যন্ত খৃস্টানদের মধ্যে অতি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, পূর্ব ও পশ্চিমের সকল উপাসনালয়ে ব্যবহৃত ও পঠিত এই

---

১. সম্ভবত গ্রন্থকার সুলতান দ্বিতীয় বায়েযীদ (Bayezid II)-কে বুঝাচ্ছেন। তিনি ১৪৪৭ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮১ থেকে ১৫১২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রতাপশালী শাসক ছিলেন।

২. আমরা ইতোপূর্বে, এই অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করেছি যে, টলেমি ফিলাডেলফাসের নির্দেশেই বাইবেলের গ্রীক অনুবাদ করা হয়। তালমূদের এই বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, the Septuagint (LXX) বা 'সত্তরের অনুবাদ' বলে প্রসিদ্ধ এই মূল গ্রীক অনুবাদটি মূলতই বিকৃত ছিল।

ধর্মগ্রন্থটিকে যদি 'প্রাচ্যের ধর্মদ্রোহীরা' বিকৃত করতে পারে এবং তাদের বিকৃতি এই বহুল ব্যবহৃত ধর্মগ্রন্থের সকল পাণ্ডুলিপি ও কপির মধ্যে কার্যকর করতে পারে, তাহলে শুধু আপনাদের চার্চগুলিতে ব্যবহৃত 'ল্যাটিন' অনুবাদটি বিকৃত করতে অসুবিধা কি ছিল? প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ এই ল্যাটিন অনুবাদের বিকৃতির যে দাবি করেন কিভাবে তা বাতিল করবেন?

২০শ বক্তব্য : এনসাইক্লেপিডিয়া রিস[১] গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে 'বাইবেল'-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে : "ড. কেনিকট বলেন, পুরাতন নিয়মের যে সকল পাণ্ডুলিপি বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে সেগুলি সবই ১০০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত। তিনি এই বিষয়ে প্রমাণ পেশ করেন এবং বলেন : ইহূদীগণের একটি পরামর্শ-সভার নির্দেশে ৭ম ও ৮ম খৃষ্টীয় শতকে লিখিত যে সকল পাণ্ডুলিপিকে 'নির্ভরযোগ্য' বলে গণ্য করতেন ৭ম ও ৮ম শতকে লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলির সাথে সে সকল কপির অনেক অমিল ছিল। এজন্যই ওয়ালটন বলেছেন : ৬০০ বছরের পুরাতন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না বললেই চলে। আর ৭০০ বা ৮০০ বছর পূর্বে লেখা পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাইবেল বিশেষজ্ঞ ড. কেনিকট (Benjamin Kennicott)। বাইবেলের সংশোধন ও পরিমার্জনের বিষয়ে প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ তাঁর মতের উপরেই নির্ভর করেন। তিনি স্বীকার করলেন যে, ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে লেখা কোন পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব তিনি খুঁজে পান নি। ১০০০ থেকে ১৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলিই তিনি দেখতে পেয়েছেন। এর কারণও তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি ইহূদীরা বিনষ্ট করেছে। কারণ তাদের নিকট 'গ্রহণযোগ্য' (!) বা 'নির্ভরযোগ্য (!) পাণ্ডুলিপিগুলির সাথে সেগুলির অনেক অমিল (!) ছিল। ওয়ালটন এইরূপই বললেন।

পাঠক লক্ষ্য করুন, এই 'বিনষ্টকরণ' প্রক্রিয়াটি ঘটেছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগমনের প্রায় ২০০ বছর পরে। এভাবে ইহূদীদের 'নির্ভরযোগ্য' কপির ব্যতিক্রম সকল পাণ্ডুলিপি পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলা হলো এবং তাদের এই 'বিকৃতিকরণ' প্রক্রিয়া সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছালো। ফলে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ও তাদের পছন্দসই কিছু 'কপি' ছাড়া পুরাতন নিয়মের আর কোন কপিই পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকল না। এভাবে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগের পরে এসে তাদের জন্য বিকৃতির একটি বড় সুযোগ ও ক্ষেত্র উন্মোচিত হলো। তারা এই সময়ে তাদের নিকট সংরক্ষিত এ সকল পাণ্ডুলিপিতে বিকৃতি সাধন করেনি বলে মনে করার কোন কারণ নেই।

১. আবরাহাম রীস (Abraham Rees) সংকলিত ও সম্পাদিত 'The New Cyclopaedia' নামক বিশ্বকোষটি ১৯শ শতকের প্রথমে (১৮০২-১৮২০ সাল) প্রকাশিত হয় এবং সে সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্বকোষ বলে পরিচিতি লাভ করে।

বরং সত্য কথা হলো, মুদ্রণ-যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সকল যুগেই ইহূদী-খৃস্টানগণের ধর্মগ্রন্থগুলি বিকৃতির সুযোগ বিদ্যমান ছিল। উপরন্তু মুদ্রণ-যন্ত্র ব্যবহার শুরু হওয়ার পরেও তারা এই কর্ম থেকে বিরত হন নি। ২য় পরিচ্ছেদের ৩১শ প্রমাণের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, লুথারের অনুসারিগণ লুথার সম্পাদিত ও অনূদিত বাইবেলের কি অবস্থা করেছে।

২১শ বক্তব্য : বাইবেল ভাষ্যকার হার্সলি তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ২৮২ পৃষ্ঠায় হোশেয় (Hosea) ভাববাদীর পুস্তকের ব্যাখ্যার ভূমিকায় বলেন : "বাইবেলের পাঠ বিকৃত হয়েছে, এই কথাতে কোনরূপ সন্দেহ নেই। বিভিন্ন সংস্করণ ও পাণ্ডুলিপির বৈপরীত্য থেকেও এ কথা স্পষ্টত জানা যায়। বিভিন্ন সংস্করণ ও পাঠের মধ্যে যখন বৈপরীত্য দেখা যায় তখন একটি মাত্র পাঠই বিশুদ্ধ ও সঠিক বলে গণ্য হবে। একথা ধারণা করা হয় বরং আমি বলব যে, তা সুদৃঢ় বিশ্বাসের কাছাকাছি কোন কোন স্থানে অত্যন্ত আপত্তিকর ও খারাপ কথা বাইবেলের মুদ্রিত পাঠের (text) মধ্যে প্রবেশ করেছে। তবে আমার কাছে প্রমাণিত হয় নি যে, হোশিয়ের পুস্তকের মধ্যে বিকৃতির পরিমাণ পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকের চেয়ে বেশি।"

এরপর তিনি ৩য় খণ্ডের ২৮৫ পৃষ্ঠায় বলেন : "একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, নেবুকাদনেযারের ঘটনার পরে, বরং তার সামান্য কিছু আগে থেকেই মানুষদের নিকট হিব্রু বাইবেলের যে উদ্ধৃতি ও অংশগুলি ছিল তা ছিল বিকৃতির চূড়ান্ত পর্যায়ে। ইয্রার সংশোধন ও পরিমার্জনের পরে অবস্থার উন্নতি হয়।"

ব্যাখ্যাকারের এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

২২শ বক্তব্য : ওয়াটসন তাঁর পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের ২৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন : "অনেক যুগ আগেই ওরিগন এ সকল বৈপরীত্যের বিষয়ে অভিযোগ-আপত্তি প্রকাশ করতেন। তাঁর মতে, এ সকল বৈপরীত্যের বিভিন্ন কারণ ছিল। যেমন লেখকদের অবহেলা ও অমনোযোগ, তাঁদের অসততা ও অসদেচ্ছা, তাদের বেপরোয়া ভাব ইত্যাদি। জিরোম বলেন, আমি যখন নতুন নিয়মের অনুবাদ করার ইচ্ছা করলাম, তখন আমি আমার নিকট সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিটি মিলিয়ে দেখলাম। এতে আমি ভয়ানক বৈপরীত্য দেখতে পেলাম।"

২৩শ বক্তব্য : আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলেন : "জিরোমের (Jerome) যুগের (৫ম শতকের) পূর্ব থেকেই বাইবেলের অনেক ল্যাটিন অনুবাদ প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন অনুবাদক এগুলি লিখেছিলেন। কোন কোন অনুবাদ ছিল বিকৃতির চূড়ান্ত পর্যায়ে। এগুলির একস্থানের বক্তব্য অন্য স্থানের বিপরীত ছিল। জিরোম এ সকল বিষয় উল্লেখ করেছেন।"

২৪শ বক্তব্য : ক্যাথলিক ওয়ার্ড ১৮৪১ সালে মুদ্রিত তাঁর পুস্তকের ১৭ ও ১৮ পৃষ্ঠায় বলেন : "ড. হ্যাক্সে তাঁর পুস্তকের ১৭৮ পৃষ্ঠায় বলেন : 'ইহূদীদের অনুমান-

আন্দাযের কারণে পুরাতন নিয়মের অনেক স্থানে বিকৃতি ঘটেছে যা পাঠক সহজেই ধরতে পারেন।' অতঃপর তিনি বলেন : 'ইহুদী পণ্ডিতগণ খৃস্টের সুসংবাদ বিষয়ক কথাগুলি কঠিনভাবে বিকৃত করেছে।' এরপর তিনি বলেন, 'একজন প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত বলেছেন, প্রাচীন অনুবাদটি পূর্বে এক পদ্ধতিতে পাঠ করা হতো। বর্তমানে ইহুদীগণ তা অন্য পদ্ধতিতে পাঠ করে। আমার মত হলো, পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলির ভুলভ্রান্তির বিষয়টি প্রাচীন অনুবাদকের অজ্ঞতা ও অবহেলার উপর চাপিয়ে না দিয়ে ইহুদী লেখক ও তাঁদের বিশ্বাসের উপর চাপানো উচিত। খৃস্টের পূর্বে ও পরে 'গীতসংহিতার' সংরক্ষণে ইহুদীরা যতটুকু যত্নবান ছিল, তার চেয়ে বেশি যত্নবান ছিল তাদের গীত ও সঙ্গীতগুলির সংরক্ষণের বিষয়ে'।"

২৫শ বক্তব্য : ভারতীয় লেখক আহমদ শরীফ ইবনু যায়নুল আবেদীন ইসপাহানী খৃস্টধর্ম প্রচারকদের ভুলভ্রান্তি ও মিথ্যাচারের প্রতিবাদে একটি বই লিখেন। এই বইটির প্রতিবাদে খৃস্টান সন্যাসী (monk) ফিলিপস কোয়াডনলস 'খায়ালাত' (খেয়ালগুলি) নামে একটি বই লিখেন। ১৬৪৯ খৃস্টাব্দে বইটি (রোমে) মুদ্রিত হয়েছে। এই পুস্তকে তিনি বলেন : "পুরাতন নিয়মের কুসায়ী[১] সংস্করণের মধ্যে বিকৃতির সংখ্যা খুবই বেশি, বিশেষত শলোমনের পুস্তকে। এঙ্গেলস নামে প্রসিদ্ধ রাব্বী আকীলা পুরো তোরাহ অনুলিপি করেছেন। অনুরূপভাবে রাব্বী যোনাথন বেন উযিয়েল (Jonathan ben Uzziel) যিহোশূয়ের পুস্তক, বিচারকর্তৃগণের বিবরণ, রাজাবলি, যিশাইয়র পুস্তক ও অন্যান্য ভাববাদীর পুস্তক অনুলিপি করেন। অন্ধ রাব্বী যোষেফ গীতসংহিতা, ইয়োবের পুস্তক, রূথের পুস্তক, ইস্টেরের বিবরণ ও শলোমনের পুস্তক অনুলিপি করেন। এরা সকলেই বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। ইহুদীদের বিকৃতি প্রমাণ করার জন্যই আমরা খৃস্টানগণ এ সকল পুস্তকের সংরক্ষণ করেছি, আমরা তাদের জালিয়াতির স্বীকৃতি প্রদান করি না।"

এভাবে এই খৃস্টান সন্যাসী ১৭শ শতকে ইহুদীদের বিকৃতি ও জালিয়াতির সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

২৬শ বক্তব্য : হর্ন তাঁর পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৬৮ পৃষ্ঠায় বলেন : "বিকৃতিমূলক সংযোজনের ক্ষেত্রে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তোরাহ-এর মধ্যে অমুক অমুক স্থানে এরূপ সংযোজন করা হয়েছে।"

অতঃপর তিনি দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৪৫ পৃষ্ঠায় বলন : "হিব্রু পাঠের মধ্যে বিকৃত স্থানের সংখ্যা কম, অর্থাৎ মাত্র ৯টি স্থানে এরূপ বিকৃতি পাওয়া যায় যেগুলি আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।"

---

১. শব্দটির অর্থ স্পষ্ট নয়। সম্ভবত এখানে পুরাতন নিয়মের আরামাইক সংস্করণ (the Aramic Targums) বুঝানো হচ্ছে। উল্লিখিত রাব্বী যোনাথন আরামাইক সংস্করণের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। দেখুন : The New Encyclopaedia Britannica 15th Edition, Vol.-2, Biblical Literature, pp 886-887.

২৭শ বক্তব্য : প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমস (James)[১]-এর নিকট এই মর্মে দরখাস্ত পেশ করা হয় যে, "আমাদের প্রার্থনা গ্রন্থের মধ্যে যাবূরের যে পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করা রয়েছে সেগুলির সাথে হিব্রু যাবূরের অনেক পার্থক্য। সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে কমবেশি ২০০ স্থানে এই পার্থক্য করা হয়েছে।"

২৮শ বক্তব্য : মি. টমাস কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১) বলেন : "ইংরেজি অনুবাদকগণ বাইবেলের মূল বক্তব্য নষ্ট করেছেন, সত্য গোপন করেছেন, অজ্ঞদেরকে ধোঁকা দিয়েছেন এবং নতুন নিয়মের পুস্তকাবলির সহজ সরল অর্থকে বক্র করেছেন। তাঁদের কাছে আলোর চেয়ে অন্ধকার এবং সত্যের চেয়ে মিথ্যাই বেশি প্রিয়।"

২৯শ বক্তব্য : নতুন অনুবাদ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মি. প্রোটন বলেন : ইংল্যান্ডে বর্তমানে প্রচলিত অনুবাদটি ভুলভ্রান্তিতে ভরা। তিনি পাদরীদেরকে বলেন : "আপনাদের প্রসিদ্ধ ইংরেজি অনুবাদটিতে পুরাতন নিয়মের বক্তব্য ৮৪৮ স্থানে বিকৃত করা হয়েছে। এই বিকৃতিগুলিই ছিল অনেক মানুষের বাইবেল অস্বীকারের ও নরকে গমনের কারণ।"

২৭শ, ২৮শ ও ২৯শ বক্তব্যের কথাগুলি আমি ক্যাথলিক পণ্ডিত ওয়ার্ডের পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করেছি। এ বিষয়ে আরো অনেক বক্তব্য উল্লেখ করা যেত, কিন্তু বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমি তা করতে চাচ্ছি না। এই অধ্যায়ের তিনটি পরিচ্ছেদে উল্লিখিত প্রমাণাদি পাঠ করলে পাঠকের নিকট এ বিষয়ক আরো অনেক কথা স্পষ্ট হবে। এজন্য মুসলমান ছাড়াও খৃস্টান ও অখৃস্টান সকলেই যে বাইবেলের বিকৃতির কথা বলেছেন সে বিষয়ক বক্তব্যাদির উদ্ধৃতি এখানেই শেষ করছি। শেষে শুধু আর একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি। যেখানে সকল প্রকার বিকৃতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এভাবে এ বিষয়ে উদ্ধৃত বক্তব্যের সংখ্যা হবে ৩০।

৩০শ বক্তব্য : হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২য় খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে Various readings বা পাঠের বিভিন্নতার কারণগুলি উল্লেখ করেছেন। পাঠক এই ১ম বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচারের আলোচনার শুরুতে Various readings বলতে কি বুঝানো হয় তা জানতে পেরেছেন। হর্ন বলেন : Various readings বা পাঠের বিভিন্নতা ঘটার চারিটি কারণ আছে।

---

১. ইংল্যান্ডের প্রটেস্ট্যান্ট রাজা। তাঁর মাতা মেরি ছিলেন স্কটল্যান্ডের রাণী। তাঁর মাতা সিংহাসন ত্যাগ করলে তিনি স্কটল্যান্ডের রাজা হন। এরপর তিনি ইংল্যান্ডের রাজা হন। তাঁর মাতা ক্যাথলিক ছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর মাতাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। তাঁরই সময়ে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের ভিত্তিতে বাইবেলের 'সংশোধিত' ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, যা Authorised Version (AV) বা King James Version (KJV) নামে পরিচিত। জেমস ১৬০৩ থেকে ১৬২৫ সালের মৃত্যু পর্যন্ত ইংল্যান্ডের রাজা ছিলেন।

প্রথম কারণ : লিপিকারের[১] অসতর্কতা ও ভুল

বিভিন্ন ভাবে তা ঘটতে পারে।

প্রথমত, লিপিকারকে যিনি বলেছিলেন তিনি এভাবেই বলেছিলেন অথবা লিপিকার তাঁর কথা ঠিকমত বুঝতে পারেন নি। ফলে ভুল লিখেছেন।

দ্বিতীয়ত, হিব্রু ও গ্রীক বর্ণগুলি অনেকটা একইরূপ ছিল। এজন্য লিপিকার একটির স্থানে আরেকটি লিখেছেন।

তৃতীয়ত, লিপিকার হয়ত ভেবেছেন যে, বিভক্তি-চিহ্ন বা স্বরচিহ্ন জ্ঞাপক আংশিক বর্ণ ব্যবহারে ভুল হয়েছে অথবা তিনি মূল বক্তব্য বুঝতে পারেন নি। ফলে তিনি সংশোধন করার উদ্দেশ্যে ভুলের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন।

চতুর্থত, লেখক লিখতে যেয়ে ভুলে একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলে গিয়েছেন। যখন বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন তখন আর লিখিত কথাগুলি মুছতে রাজি হন নি বরং যা লেখা হয়ে গিয়েছিল তা ঠিক সেভাবেই রেখে দিয়ে যে স্থান থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল সেই স্থান থেকে লিখতে শুরু করেছেন।

পঞ্চমত, লেখক লিখতে লিখতে কিছু কথা বাদ দিয়ে ফেলেন। এরপর অন্য কিছু লেখার পরে পূর্ববর্তী স্থানে বাদ দেওয়ার বিষয়টি তাঁর কাছে ধরা পড়ে। তখন তিনি পরবর্তী যে কথাগুলি লেখা হয়েছে তার পরে বাদ পড়া কথাগুলি লিখেন। এতে এক স্থানের কথা অন্য স্থানে চলে যায়।

ষষ্ঠত, লেখকের দৃষ্টি এক লাইন থেকে অন্য লাইনে সরে যায়, ফলে কিছু কথা বাদ পড়ে যায়।

সপ্তমত, লেখক সংক্ষেপিত শব্দগুলির অর্থ বুঝতে ভুল করেন। ফলে তিনি তাঁর নিজের বুঝ অনুসারে তা পুরোপুরি লিখেন। এভাবে ভুলের মধ্যে নিপতিত হন।

অষ্টমত, লেখক বা লিপিকারের অজ্ঞতা ও অবহেলা ছিল পাঠের বিভিন্নতা (Various readings) সৃষ্টির অন্যতম বড় কারণ। তাঁরা টীকার বক্তব্য বা ব্যাখ্যাকে মূল পুস্তকের অংশ মনে করে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন।

দ্বিতীয় কারণ : মূল কপির অসম্পূর্ণতা

যে কপি থেকে লিপিকার অনুলিপি করেছেন সেই কপির অসম্পূর্ণতার ফলে বিভিন্নভাবে 'পাঠের বিভিন্নতা' ঘটতে পারে বলে বুঝা যায় :

প্রথমত, অক্ষরের বিভক্তি-চিহ্ন বা স্বরচিহ্ন মুছে যাওয়া।

দ্বিতীয়ত, এক পৃষ্ঠার বিভক্তি-চিহ্ন বা স্বরচিহ্ন পৃষ্ঠার উল্টো পিঠে ফুটে উঠেছে এবং উল্টো পৃষ্ঠার অক্ষরের সাথে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে। ফলে এই চিহ্নগুলিকে এই পৃষ্ঠার অংশ মনে করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, পরিত্যক্ত অনুচ্ছেদটি কোনরূপ চিহ্ন ছাড়াই টীকায় লেখা ছিল। লেখক বুঝতে পারেন নি যে, অনুচ্ছেদটি কোথায় লিখতে হবে। এতে তিনি ভুল করেছেন।

১. যে কোন ব্যক্তির জন্য বাইবেল বা পবিত্র পুস্তক লেখার কোন সুযোগ ছিল না। শুধু বিশেষভাবে ধর্মশিক্ষাপ্রাপ্ত ধর্মগুরু পণ্ডিতগণই এগুলি লিখতেন। তাঁদেরকে 'লিপিকারগণ' বা 'scribes' হিব্রুতে 'সোফেরিম' (Soferim) বলা হতো।

তৃতীয় কারণ : কাল্পনিক সংশোধন ও পরিমার্জন

বিভিন্নভাবে এই কাল্পনিক বা আন্দাজ-অনুমান ভিত্তিক সংশোধন ঘটেছে :

প্রথমত, একটি বিশুদ্ধ ও সঠিক বক্তব্যকে লিপিকার অসম্পূর্ণ বলে মনে করেছেন অথবা তার অর্থ হৃদয়ঙ্গমে ভুল করেছেন। অথবা তিনি মনে করেছেন যে, বাক্যটি ভুল, অথচ বাক্যটি মূলত ভুল নয়। এজন্য এই লিপিকারের সংশোধনই মূলত ভুলের সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত, কোন কোন গবেষক পাণ্ডুলিপি সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করেন নি বরং তাঁরা মূল পাণ্ডুলিপির দুর্বল বাক্য মুছে ফেলে দিয়ে সেখানে সবল ও বিশুদ্ধ বাক্য লিখেছেন। অতিরিক্ত কথাগুলি ফেলে দিয়েছেন। একাধিক সমার্থক শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝতে না পারলে অতিরিক্ত শব্দগুলি ফেলে দিয়েছেন।

তৃতীয়ত, পরস্পর সম্পর্কিত বক্তব্যসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন। এক স্থানের বক্তব্যের সাথে অন্য স্থানের বক্তব্যের যেন অমিল না থাকে এজন্য তাঁরা বক্তব্যের কাটছাট করে উভয়ের মধ্যে অর্থগত সমন্বয় সাধন করতেন। পাঠের বিভিন্নতা ঘটার এটিই সবচেয়ে বড় কারণ। নতুন নিয়মের পুস্তকাবলিতে এইরূপ কার্য বেশি সাধিত হয়েছে। এজন্য পৌলের পত্রাবলির মধ্যে পরবর্তী সংযোজন বেশি ঘটেছে। গ্রীক অনুবাদের সাথে পৌলের বক্তব্যের অর্থগত সমন্বয় সৃষ্টির জন্য তাঁরা এইরূপ করেছেন।

চতুর্থত, কোন কোন গবেষক পণ্ডিত নতুন নিয়মকে ল্যাটিন অনুবাদের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন।

চতুর্থ কারণ : ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইচ্ছাকৃত বিকৃতি

নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বাইবেলের বিকৃতি করেছেন। ফলে পাঠের বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। এ সকল ইচ্ছাকৃত বিকৃতিকারীদের অনেকেই ছিলেন বিভ্রান্ত (heretic) সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং কেউ ছিলেন মূলধারার ধর্মপ্রাণ খৃস্টান [বিভ্রান্তদের মধ্য থেকে এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অভিযুক্ত হয়েছেন ২য় শতকের অধ্যাত্মবাদি খৃস্টান নেতা মারসিওন (Marcion)। এই নোংরা ও ঘৃণ্য আন্দোলনের জন্য তার চেয়ে বেশি নিন্দা আর কারো ভাগ্যে জোটে নি।]

পাশাপাশি এ কথাও সুনিশ্চিত যে, মূলধারার অনেক গোঁড়া ধর্মপ্রাণ ও সৎ খৃস্টানও কিছু কিছু ইচ্ছাকৃত বিকৃতি সাধন করেছেন। পরবর্তীকালে অনেকেই এ সকল ধার্মিক খৃস্টানদের ইচ্ছাকৃত বিকৃতিগুলিকে সমর্থন করতেন ও অগ্রাধিকার প্রদান করতেন। কারণ এগুলি দিয়ে কোন সঠিক বিষয়কে সমর্থন করা হতো অথবা সে বিষয়ক কোন আপত্তিকে খণ্ডন করা হতো।"

হর্নের সংক্ষেপিত বক্তব্য এখানেই শেষ।

পণ্ডিত হর্ন তাঁর আলোচনার মধ্যে উপর্যুক্ত চারিটি কারণের প্রত্যেক বিষয়ের অনেক উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। এগুলির বিস্তারিত আলোচনা আমাদের পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করবে বলে আমি সেগুলির উল্লেখ থেকে বিরত থাকলাম। এখানে শুধু ধার্মিক ও সৎ খৃস্টানদের বিকৃতির যে সকল উদাহরণ তিনি উল্লেখ করেছেন সেগুলি উল্লেখ করছি।

ধার্মিক খৃস্টানদের বিকৃতির বিষয়ে ফাফ-এর পুস্তকের বরাত দিয়ে হর্ন নিম্নের বিভিন্ন উদাহরণ উল্লেখ করেছেন :

১. লূকলিখিত সুসমাচারের ২২ অধ্যায়ের ৪৩ আয়াতটি ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে দেওয়া হয়।[১] কারণ কোন কোন ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী খৃস্টান মনে করতেন যে, 'স্বর্গের দূত এসে প্রভু যীশুকে সবল করবে' এই কথাটি যীশু খৃস্টের ঈশ্বরত্বের সাথে সাংঘর্ষিক।

২. মথিলিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ের ১৮ আয়াত থেকে 'তাঁহাদের সহবাসের পূর্বে' কথাটুকু ফেলে দেওয়া হয়[২] এবং ২৫ আয়াত থেকে 'ইনি পুত্র প্রসব না করিলেন (her firstborn son)' কথাটুকু ফেলে দেওয়া হয়।[৩] এইরূপ বিকৃতির উদ্দেশ্য হলো যেন মরিয়মের চিরস্থায়ী কুমারিত্বে কোন সন্দেহ না আসে।

৩. করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের ১ম পত্রের ১৫ অধ্যায়ের ৫ আয়াতে উল্লিখিত 'সেই বারো জনকে' কথাটি পরিবর্তন করে 'এগার জন' লেখা হয়। এই বিকৃতির উদ্দেশ্য ছিল যেন পৌল মিথ্যা বলেছেন বলে প্রমাণিত না হয়। কারণ ১২ শিষ্যের একজন বিশ্বাসঘাতক ঈস্করিয়োতীয় যিহূদা (Judas Iscar'i-ot) ইতোপূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিল।

৪. মার্কলিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ের ৩২ আয়াতের কিছু শব্দ ফেলে দেওয়া হয়। পরবর্তী যুগেও কোন কোন ধর্মগুরু এই কথাগুলি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ফেলে

---

১. লূকের ২২ অধ্যায়ের ৩৯-৪৪ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শত্রুহস্তে সমর্পিত হওয়ার পূর্বরাতে যীশু শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে নিজের শিষ্যদেরকে প্রহরায় নিযুক্ত করেন এবং নিজে মর্মভেদী দুঃখে কাতর হয়ে ঈশ্বরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন। তিনি এত বেশি ব্যথিত ও কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে, 'তাঁর ঘাম যেন রক্তের ঘনীভূত বড়বড় ফোঁটার মত মাটিতে পড়ছিল।' এ সময়ে একজন স্বর্গদূত বা ফিরিশতা এসে তাঁকে শক্তি যোগান। ৪২ আয়াতটি নিম্নরূপ : "তখন স্বর্গ হইতে এক দূত দেখা দিয়া তাঁহাকে সবল করিলেন।"

২. মথি ১/১৮ : "তাঁহার মাতা মরিয়ম যোষেফের প্রতি বাগদত্তা হইলে তাঁহাদের সহবাসের পূর্বে জানা গেল, তাঁহার গর্ভ হইয়াছে পবিত্র আত্মা থেকে।"

৩. মথি ১/২৫ : "আর যে পর্যন্ত ইনি পুত্র প্রসব না করিলেন, সেই পর্যন্ত যোষেফ তাঁহার পরিচয় লইলেন না... ।"

দেওয়াকে সমর্থন করেছেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন যে, এই কথাগুলি আরিয়ান সম্প্রদায় (Arians)[১]-এর মত সমর্থন করে।[২]

৪. লূকলিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ের ৩৫ আয়াতের মধ্যে কিছু কথা বৃদ্ধি করা হয়। সিরীয় অনুবাদ, ফারসী অনুবাদ, ইথিওপীয় অনুবাদ ও অন্যান্য অনেক অনুবাদে এই শব্দগুলি বাড়ানো হয়। অনেক ধর্মগুরুর উদ্ধৃতিতে এই সংযোজনটুকু বিদ্যমান। এই সংযোজনের উদ্দেশ্য ছিল ইউটিকিয়ান (Eutychian) সম্প্রদায়ের[৩] বিরোধিতা করা। কারণ তাঁরা যীশুর মধ্যে দুইটি সত্ত্বা বিদ্যমান বলে মানতেন না।[৪]

---

১. ৩য়-৪র্থ শতকের প্রসিদ্ধ খৃষ্টান ধর্মগুরু আরিয়ুসের (Arius) অনুসারিগণ যারা যীশু খৃষ্টকে ঈশ্বরের সত্তার অংশ নয়, বরং তাঁর সৃষ্ট 'পুত্র' বলে বিশ্বাস করত। সাধারণভাবে এরা একেশ্বরবাদী খৃষ্টান বলে পরিচিত।

২. পুনরুত্থান বা কেয়ামত সম্পর্কে এই আয়াতে যীশু বলেন : "কিন্তু সেই দিনের বা সেই দণ্ডের কথা কেহই জানে না; স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।" এতে প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টের সত্ত্বা ঈশ্বরের সত্ত্বা থেকে পৃথক, এজন্য ঈশ্বর যা জানেন তা খৃষ্ট জানেন না। খৃষ্ট স্বর্গস্থ দূতগণের মতই পৃথক সৃষ্টিমাত্র, ঈশ্বরের সত্ত্বার অংশ নন; আরিয়ান সম্প্রদায় এই মতই পোষণ করত।

৩. ৪র্থ-৫ম শতাব্দীর খৃষ্টান সাধু ইউটিশাস (Eutyches 375-454)-এর অনুসারিগণ। এরা 'একসত্তাবাদী' (Monophysites)। তাঁরা বিশ্বাস করে যে, খৃষ্টের মধ্যে একটিমাত্র ঐশ্বরিক সত্তা বিরাজমান ছিল। তাঁর মধ্যে কোন মানবীয় সত্তার অস্তিত্ব ছিল না। বিস্তারিত দেখুন Encyclopaedia Britannica, articles : Eutychian; Eutyches; Monophysite.

৪. প্রচলিত বাইবেলেও যীশু নিজেকে সরাসরি ঈশ্বর বলে দাবি করেন নি। কোথাও তিনি বলেন নি যে, আমি ঈশ্বরের সত্ত্বার অংশ। তবে তিনি বলেছেন : "যে তোমাদিগকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, আর যে আমাকে গ্রহণ করে সে আমার প্রেরণকর্তাকেই গ্রহণ করে" (মথি ১০/৪০)। এইরূপ কিছু কথায় তিনি তাঁকে মানলেই ঈশ্বরকে মানা হবে বলে উল্লেখ করেছেন। এসকল কথার ভিত্তিতে পৌল-পন্থী খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করে যে, খৃষ্ট ঈশ্বরের সত্তার অংশ এবং তিনিই ঈশ্বর (God Incarnate)। কিন্তু সমস্যা হলো, প্রচলিত বাইবেলেই খৃষ্ট বারংবার বলছেন যে, আমি মানুষ, আমাকে ভাল বলবে না, আমি কিছুই জানি না, ঈশ্বরই ভাল, তিনিই সব জানেন, একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর... ইত্যাদি। তিনি অসময়ে ডুমুর গাছে ফল খুঁজেছেন, কিন্তু জানতে পারেন নি যে, গাছে ফল নেই। তিনি শত্রুদের ভয়ে সন্ত্রস্থ হয়ে বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন... ইত্যাদি অগণিত বিষয় প্রমাণ করে যে, তিনি ঈশ্বর ছিলেন না, বরং একজন মানুষ ছিলেন। এ সকল সুস্পষ্ট প্রমাণকে পাশ কাটানোর জন্য ত্রিতত্ত্ববাদী খৃষ্টানগণ 'দ্বৈত-প্রকৃতির' তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তাঁরা বলেন, যীশু মধ্যে দুইটি পৃথক সত্ত্বা ও প্রকৃতি বিদ্যমান ছিল : মানবীয় ও ঐশ্বরিক। এর ব্যাখ্যায় তাঁদের মধ্যে রয়েছে অনেক মতভেদ ও গোঁজামিল। কোন কোন সম্প্রদায় বিশ্বাস করত যে, তাঁর একটি মাত্র সত্ত্বাই ছিল, তা হলো ঐশ্বরিক সত্ত্বা। লূকের এই আয়াতের মধ্যে দুইটি শব্দ বৃদ্ধি করে তাঁর মানবীয় সত্ত্বা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। লূকের প্রথম অধ্যায়ের ৩৫ আয়াতে বলা হয়েছে : "এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে।" এই আয়াতের মধ্যে 'তোমার থেকে' শব্দ দুইটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইংরেজি বাইবেলে (KJV) শব্দ দুইটি রয়েছে : that holy thing which shall be born of thee shall be called the son of God।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে, পণ্ডিত হর্ন বিকৃতির সম্ভাব্য সকল কারণ ও পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন এবং তিনি স্বীকার করেছেন যে, সকল পদ্ধতিতেই বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে।

তাঁর কথা থেকে প্রমাণিত হলো যে, লিপিকারদের অজ্ঞতা ও অবহেলার কারণে টীকার বক্তব্য মূল পাঠে প্রবেশ করেছে; প্রমাণিত হলো যে, সংশোধনকারিগণ তাঁদের ধারণামত যে সকল কথা ভুল মনে করেছেন সেগুলি সংশোধন করেছেন, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ভুল হোক বা নাই হোক; প্রমাণিত হলো যে, তাঁরা দুর্বল বাক্যগুলি বাদ দিয়ে তদস্থলে বিশুদ্ধ বাক্য লিখেছেন এবং সমার্থক ও অতিরিক্ত কথা ফেলে দিয়েছেন; প্রমাণিত হলো যে, বিশেষত নতুন নিয়মের মধ্যে তাঁরা বিভিন্ন স্থানের বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য পরিবর্তন করেছেন, আর এজন্যই পৌলের পত্রাবলিতে সংযোজন বৃদ্ধি পেয়েছে; প্রমাণিত হলো যে, কোন কোন গবেষক পণ্ডিত নতুন নিয়মকে ল্যাটিন অনুবাদের সাথে মেলানোর জন্য পরিবর্তন করেছেন; প্রমাণিত হলো যে, বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গণ ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃতি সাধন করেছেন; প্রমাণিত হলো যে, ধার্মিক ও সৎ খৃস্টানগণ বিভিন্ন মত সমর্থন বা আপত্তি খণ্ডনের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃতি সাধন করতেন এবং পরবর্তী যুগে তাঁদের এ সকল বিকৃতিকে সমর্থন করা হতো....। এ সব কিছু প্রমাণিত হওয়ার পরে বিকৃতির আর কোন সূক্ষ্ম পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া কি বাকি থাকল?

এখন একথা দাবি করা কি অন্যায় ও অযৌক্তিক হবে যে, ক্রুশের পূজারী খৃস্টানগণ যারা ক্রুশের উপাসনা এবং এর মাধ্যমে অর্জিত মর্যাদা ও ক্ষমতা পরিত্যাগ করতে মোটেও রাজি ছিলেন না, তাঁরা ইসলামের আবির্ভাবের পর ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের সপক্ষে যেতে পারে এরূপ আরো কিছু কথা বিকৃত করেছেন? এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগে তাঁদের এ সকল বিকৃতি সমর্থন করা হয়েছে এবং অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে, যেমনভাবে বিভিন্ন খৃস্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের বিকৃতিকে সমর্থন করা হয়েছে বরং বিভিন্ন খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিরোধের জন্য বিকৃতির চেয়ে ইসলামের প্রতিরোধের জন্য বিকৃতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ছিল অনেক বেশি। কাজেই এই বিকৃতির সমর্থনও অনেক বেশি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় বিভ্রান্তি : খৃস্টের সাক্ষ্য

বিকৃতি অপ্রমাণিত করতে ও বাইবেলের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করতে বলা হয় যে, স্বয়ং যীশু খৃস্ট পুরাতন নিয়মের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন।[১] সেগুলি যদি বিকৃত হতো তবে

১. যীশু বলেন : "কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।" (মথি ৫/১৮) এতে বুঝা যায় যে, পুরাতন নিয়ম মহাপ্রলয় পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে। এছাড়া যীশু বারংবার পুরাতন নিয়মের ঘটনাবলির উল্লেখ করেছেন, বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়েছেন, পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির বক্তব্য দ্বারা তাঁর নিজের মতামত সমর্থন করেছেন। প্রেরিতগণও এভাবে বারংবার পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেদের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন।

নিশ্চয় তিনি তা বলতেন বরং সেক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্ব ছিল ইহূদীদের সামনে বিকৃতি প্রমাণ করে তাদেরকে তা স্বীকারে বাধ্য করা।

নিম্নের বিষয়গুলি এই বিভ্রান্তির অপনোদন করবে :

প্রথমত : খৃস্টের সাক্ষ্য মোটেও প্রমাণিত নয়

প্রথম পর্যায়ে আমরা বলব যে, বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের কোন পুস্তকের লেখকের যুগ থেকে সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রচলিত হওয়ার কথা প্রমাণিত নয়। এগুলির মধ্যে এমন কোন পুস্তক নেই যে পুস্তকটি লেখকের যুগ থেকে বহুল প্রচার লাভ করেছে, যাতে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, সত্যিই উক্ত লেখকই এই প্রচলিত বইটি পুরোপুরি লিখেছেন। অনুরূপভাবে কোন একটি বইয়েরও লেখক পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সূত্র-পরম্পরা সংরক্ষিত নেই। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাঠক তা জানতে পেরেছেন। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম প্রমাণের আলোচনায় ইস্টেরের বিবরণ সম্পর্কে কিছু কথা পাঠক জানতে পেরেছেন। আর তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১৮শ প্রমাণের আলোচনায় মথির সুসমাচার সম্পর্কে কিছু কথা দেখতে পেয়েছেন। শীঘ্রই ইয়োবের পুস্তক ও পরমগীত সম্পর্কে পাঠক জানতে পারবেন। এছাড়া নতুন ও পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তকে সকল প্রকারের বিকৃতি ঘটেছে বলে একটু আগে আমরা জানতে পারলাম। ধার্মিক ও সৎ মানুষেরা বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়কে প্রমাণিত করার জন্য বা সে বিষয়ক আপত্তি দূরীকরণের জন্য বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন বলেও আমরা পূর্বোক্ত ৩০শ বক্তব্য থেকে জানতে পারলাম।

এ সকল কারণে বাইবেলের পুস্তকগুলির গ্রহণযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতার বিষয়ে আমাদের সন্দেহ রয়েছে। কাজেই এ সকল পুস্তকের কোন কথা আমাদের নিকট কোন সুদৃঢ় প্রমাণ নয়। এগুলিকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে আমরা দ্বিধান্বিত। কারণ, এমনও তো হতে পারে যে, যীশু খৃস্ট পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলির বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়েছেন মর্মে যে আয়াতটিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হচ্ছে, সেই আয়াতটি পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে। ধার্মিক ও সৎ খৃস্টানগণ দ্বিতীয় শতকের শেষে বা তৃতীয় শতকে এবোনাইট সম্প্রদায় বা মারসিওনীয় সম্প্রদায় বা মানিকীয় সম্প্রদায়ের বিরোধিতার মানসে আয়াতটিকে বাইবেলের মধ্যে সংযোজন করেছিলেন। খৃস্টধর্মের একটি গ্রহণযোগ্য ও সঠিক বিষয়কে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে তাঁদের এই বিকৃতি পরবর্তী যুগে সমর্থন করা হয়েছে ও মেনে নেওয়া হয়েছে, যেরূপভাবে তাঁরা আরিয়ান সম্প্রদায় ও ইউটিকিয়ান সম্প্রদায়ের বিরোধিতার জন্য বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি সাধন করেন এবং তাঁদের বিকৃতি পরবর্তীকালে সমর্থন করা হয়।

উপরে উল্লিখিত তিনটি সম্প্রদায় পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলি মানতেন না। কেউ কোনটিই মানতেন না। কেউ আবার কিছু মানতেন, কিছু মানতেন না। এবোনাইট সম্প্রদায়ের মতামত পাঠক প্রথম বিভ্রান্তির আলোচনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দেখতে পেয়েছেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায়, মারসিওনীয় সম্প্রদায়ের বিষয়ে বিল তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে

বলেন : "এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা দুইজন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন : একজন কল্যাণের স্রষ্টা ও দ্বিতীয়জন অকল্যাণের স্রষ্টা। এরা বলতেন, তোরাহ এবং পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তক প্রদান করেছেন দ্বিতীয় ঈশ্বর। এগুলি সবই নতুন নিয়মের বিপরীত।"

লর্ডনার তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৮ম খণ্ডের ৪৮৬ পৃষ্ঠায় এই সম্প্রদায়ের বিবরণে বলেন : "এরা বলত, ইহূদীদের সদাপ্রভু ঈশ্বর আর যীশুর পিতা ঈশ্বর এক নন। মোশির ব্যবস্থা তুলে দিতেই যীশু এসেছিলেন; কারণ মোশির ব্যবস্থা সুসমাচারের বা নতুন নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।"

আর তৃতীয় সম্প্রদায় 'মানিকীয়' সম্প্রদায়ের বিষয়ে লর্ডনার তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৩য় খণ্ডে বলেছেন : "ঐতিহাসিকগণ একমত যে, এই সম্প্রদায় পুরাতন নিয়মের কোন পবিত্র পুস্তকই মানত না। আরক্লাসের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ছিল নিম্নরূপ : 'শয়তান ইহূদী-ভাববাদিগণকে ধোঁকা দিয়েছিল। শয়তানই মোশির সাথে এবং ইহূদী ভাববাদিগণের সাথে কথা বলেছিল।' যোহনলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ের ৮ম আয়াতে যীশু বলেন : "যাহারা আমার পূর্বে আসিয়াছিল, তাহারা সকলে চোর ও দস্যু, কিন্তু মেষেরা তাহাদের রব শুনে নাই।" খৃস্টের এই কথার ভিত্তিতেই তারা এভাবে পূর্ববর্তী ভাববাদিগণকে 'চোর ও দস্যু' বা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত বলে বিশ্বাস করত।

দ্বিতীয়ত : খৃস্টের সাক্ষ্য প্রচলিত পুস্তকগুলির জন্য প্রমাণিত নয়

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা বলব যে, যীশু পুরাতন নিয়মের বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়েছেন মর্মে যে সকল কথা উল্লেখ করা হয়, সেগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত হোক বা প্রকৃত পক্ষে যীশুর কথাই হোক, কোন অবস্থাতেই তাঁর এই বক্তব্য দ্বারা পুরাতন নিয়মের প্রচলিত সকল পুস্তকের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় না। কারণ এসকল কথার মধ্যে পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলির নাম বা সংখ্যা উল্লেখ করা নেই। তাহলে আমরা কিভাবে বুঝতে পারব যে, যীশু যেই পুরাতন নিয়মের বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়েছেন সেই পুরাতন নিয়মের মধ্যে ৩৯টি পুস্তক ছিল? (প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই পুস্তকগুলি মানেন), না সেই পুরাতন নিয়মের মধ্যে ৪৬টি পুস্তক ছিল? (ক্যাথলিকগণ এই পুস্তকগুলিকে মানেন)।

পুরাতন নিয়মের এ সকল পুস্তকের মধ্যে দানিয়েল ভাববাদীর পুস্তক রয়েছে। খৃস্টের সমসাময়িক ইহূদীগণ এবং তৎপরবর্তী যুগের ইহূদীগণও দানিয়েলের পুস্তককে ঐশ্বরিক বা আসমানী পুস্তক হিসেবে মানত না। এমনকি দানিয়েল যে ভাববাদী ছিলেন তাও তারা মানত না। শুধু প্রথম খৃস্টীয় শতাব্দীর ইহূদী ধর্মগুরু ও ঐতিহাসিক জোসেফাস (Flavius Josephus) দানিয়েলের পুস্তককে 'ঐশ্বরিক পুস্তক' রূপে গণনা করেছেন।

ঐতিহাসিক জোসেফাস অত্যন্ত গোঁড়া ইহূদী ছিলেন এবং খৃস্টানগণও তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে মান্য করেন। তিনি তাঁর ইতিহাসে শুধু নিম্নের কথাটুকু স্বীকার

করেছেন : "আমাদের নিকট পরস্পর বিরোধী হাজার হাজার পুস্তক নেই বরং আমাদের নিকট মাত্র ২২টি পুস্তক রয়েছে। এ সকল পুস্তকে পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাস সংকলিত রয়েছে। এই পুস্তকগুলি ঐশ্বরিক। এগুলির মধ্যে পাঁচটি পুস্তক মোশির। এগুলিতে সৃষ্টির শুরু থেকে মোশির মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বের বর্ণনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর ১৩টি পুস্তকে পরবর্তী ভাববাদিগণ তাঁদের যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলিতে মোশির মৃত্যু থেকে পারস্য সম্রাট আর্দশের (Artaxerxes রাজত্বকাল : খৃ. পূ. ৪৬৫-৪২৪ সাল)-এর যুগ পর্যন্তসময়কালের (প্রায় ৮ শত বছরের) ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ রয়েছে। অবশিষ্ট ৪টি পুস্তকে ঈশ্বরের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা হয়েছে।"

জোসেফাসের এই সাক্ষ্য থেকে প্রচলিত বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলির সঠিকত্ব বা অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। কারণ তিনি তোরাহ ছাড়া পুরাতন নিয়মের মধ্যে আরও ১৭টি পুস্তক আছে বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ বর্তমানে প্রচলিত 'বাইবেলের' মধ্যে প্রটেস্ট্যান্টদের মতে তোরাহ ছাড়াও ৩৪টি পুস্তক ও ক্যাথলিকদের মতে ৪১টি পুস্তক রয়েছে।

লক্ষ্যণীয় যে, জোসেফাস পুস্তকগুলির সংখ্যা বলেছেন, কিন্তু নাম উল্লেখ করেন নি।[১] কাজেই প্রচলিত ৩৪ বা ৪১টি পুস্তকের মধ্যে কোন্ কোন্ পুস্তক ১৭টি পুস্তকের

---

১. এখানে উল্লেখ্য যে, তৃতীয় খৃষ্টীয় শতকের প্রসিদ্ধতম খৃষ্টান ধর্মগুরু ওরিগন (Origen)-ও পুরাতন নিয়মের মধ্যে ২২টি পুস্তক বিদ্যমান বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি পুস্তকগুলির নামও উল্লেখ করেছেন। নামের বর্ণনায় তিনি প্রচলিত কিছু পুস্তককে একত্রিত করে উল্লেখ করেছেন : তাঁর বর্ণনামতে মোশির পাঁচটি পুস্তক ছাড়া অবশিষ্ট ১৭টি পুস্তক নিম্নরূপ : (১) যিহোশূয়ের পুস্তক, (২) বিচারকর্তৃগণের বিবরণ ও রূতের বিবরণ একত্রে, (৩) শমুয়েলের প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক একত্রে, (৪) রাজাবলির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে, (৫) বংশাবলির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে, (৬) ইস্রার প্রথম ও দ্বিতীয় (নহিমিয়ের) পুস্তক একত্রে, (৭) গীতসংহিতা, (৮) হিতোপদেশ, (৯) উপদেশক, (১০) পরমগীত, (১১) যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক, (১২) যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তক, যিরমিয়ের বিলাপ ও যিরমিয়ের পত্র একত্রে, (১৩) দানিয়েলের পুস্তক, (১৪) যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তক, (১৫) ইয়োবের বিবরণ, (১৬) ইস্টেরের বিবরণ ও (১৭) ম্যাকাবিজের পুস্তক। ১ম খৃষ্টীয় শতকের প্রসিদ্ধতম ইহুদী ধর্মগুরু ও ৩য় শতকের প্রসিদ্ধ খৃষ্টান ধর্মগুরু উভয়ের বিবরণ অনুসারে নিম্নের পুস্তকগুলি জাল, বানোয়াট ও অতিরিক্ত সংযোজিত এবং কোন অবস্থাতেই পুরাতন নিয়মের অংশ নয়। (১) হোশেয় ভাববাদীর পুস্তক (Hosea), (২) যোয়েল ভাববাদীর পুস্তক (Joel), (৩) আমোষ ভাববাদীর পুস্তক (Amos), (৪) ওবদিয় ভাববাদীর পুস্তক (Obadiah), (৫) যোনা ভাববাদীর পুস্তক (Jonah), (৬) মীখা ভাববাদীর পুস্তক (Micah), (৭) নহূম ভাববাদীর পুস্তক (Nahum), (৮) হবক্কূক ভাববাদীর পুস্তক (Habakkuk), (৯) সফনিয় ভাববাদীর পুস্তক (Zephaniah), (১০) হগয় ভাববাদীর পুস্তক (Haggai), (১১) সখরিয় ভাববাদীর পুস্তক (Zechariah), (১২) মালাখি ভাববাদীর পুস্তক (Malachi)। এই ১২টি পুস্তককে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায়ই পুরাতন নিয়মের পুস্তক বলে বিশ্বাস করেন। এছাড়া ক্যাথলিকদের অতিরিক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে ম্যাকাবিজ ছাড়া বাকি ৫টি পুস্তকও জাল বলে জানা যায়। এখানে আরো লক্ষ্যণীয় যে, যিরমিয়ের পত্র (Epistle of Jeremiah) নামে একটি পুস্তকের কথা ওরিগন উল্লেখ করেছেন, যা বর্তমান প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে নেই। দেখুন : Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, Page 97, 224-245.

পরে অতিরিক্ত সংযুক্ত তাও জানার উপায় নেই। একথা বলার কোন উপায় নেই যে, অমুক ১৭টি পুস্তক জোসেফাস উল্লিখিত বিশুদ্ধ পুস্তক। কারণ এই ঐতিহাসিক তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে যিহিস্কেল ভাববাদীর প্রচলিত পুস্তকটি ছাড়াও তাঁর লেখা আরো দুইটি পুস্তকের কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও এই পুস্তক দুইটি প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে নেই, তবে জোসেফাসের কথা থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, তাঁর উল্লিখিত ১৭ পুস্তকের মধ্যে এই দুইটিও ছিল।

এছাড়া তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১৭শ প্রমাণের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, ক্রীযস্টম ও অন্যান্য ক্যাথলিক পণ্ডিত স্বীকার করেছেন যে, ইহূদীগণ তাদের অবহেলার কারণে বরং তাদের ধর্মহীনতা ও অসমতার কারণে অনেক ঐশ্বরিক পুস্তক বা ধর্মগ্রন্থ হারিয়ে ফেলেছে। কিছু পুস্তক তারা ছিড়ে ফেলেছে এবং কিছু পুস্তক তারা পুড়িয়ে ফেলেছে। হয়ত জোসেফাস উল্লিখিত এই ১৭টি পুস্তকের মধ্য থেকে কিছু পুস্তকও এই হারানো, ছেড়া ও পুড়িয়ে ফেলা পুস্তকের মধ্যে চলে গিয়েছে।

সর্বোপরি আমি এখানে কিছু পুস্তকের নাম উল্লেখ করছি। প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায় ও অন্য সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, এই পুস্তকগুলি পুরাতন নিয়ম থেকে হারিয়ে গিয়েছে। হয়ত এগুলি সবই জোসেফাস উল্লিখিত ১৭ পুস্তকের মধ্যে গণিত ছিল। পুস্তকগুলি নিম্নরূপ :

(১) 'সদাপ্রভুর যুদ্ধপুস্তক' (The Book of Wars of the LORD)

গণনা পুস্তকের ২১ অধ্যায়ের ১৪ আয়াতে বইটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১০ম প্রমাণ থেকে পাঠক তা জানতে পেরেছেন। হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে : "সম্ভবত মোশি যিহোশূয়ের শিক্ষা প্রদানের জন্য এই পুস্তকটি রচনা করেছিলেন। এই পুস্তকে মোয়াব দেশের সীমা বর্ণনা করা হয়েছিল।"

(২) 'যাশের পুস্তক (Book of Jasher)

যিহোশূয়ের পুস্তকের ১০ম অধ্যায়ের ১৩ আয়াতে পুস্তকটির উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৮শ প্রমাণের আলোচনায় পাঠক তা দেখেছেন। এছাড়া শমূয়েলের ২য় পুস্তকের ১ম অধ্যায়ের ১৮ আয়াতেও পুস্তকটির উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) শলোমন রচিত 'এক হাজার পাঁচটি গীত'।

(৪) শলোমন রচিত 'প্রাণী জগতের ইতিবৃত্ত'।

(৫) শলোমন রচিত 'তিন হাজার প্রবাদ বাক্য'।

এই তিনটি পুস্তকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ১ রাজাবলির ৪র্থ অধ্যায়ের ৩২ ও ৩৩ আয়াতে।[১]

১. "৩২ তিনি তিন সহস্র প্রবাদ বাক্য বলিতেন, ও তাঁহার এক সহস্র পাঁচটি গীত ছিল। ৩৩ আর তিনি লিবানোনের এরস (cedar) বৃক্ষ হইতে প্রাচীরের গাত্রে উৎপন্ন এসোব (hyssop) তৃণ পর্যন্ত গাছ সকলের বর্ণনা করিতেন, এবং পশু, পক্ষী, উড়োগামী জন্তু ও মৎস্যের বর্ণনা করিতেন।"

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২য় খণ্ডে ১ রাজাবলির ৩২ আয়াতের উল্লিখিত 'তিন হাজার প্রবাদ বাক্য (three thousand proverbs)' ও 'এক হাজার পাঁচটি গীত' (a thousand and five songs)-এর বিষয়ে বলেন : "শলোমনের নামে প্রচারিত যে প্রবাদ বাক্যগুলি প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে ('The Proverbs' বা 'The Proverbs of Solomon', বাংলায় "হিতোপদেশ" নামক পুস্তকে) বিদ্যমান সেগুলির সংখ্যা আনুমানিক ৯০০ অথবা ৯২৩। কেউ কেউ বলেছেন যে, এই পুস্তকটির প্রথম ৯টি অধ্যায় শলোমনের রচিত নয়। এ কথা সঠিক বলে গ্রহণ করলে শলোমন রচিত প্রবাদের সংখ্যা থাকে আনুমানিক ৬৫০।[১]

এই আয়াতে উল্লিখিত ১০০৫টি 'গীত' (song)-এর মধ্যে শুধু 'শলোমনের পরমগীত' (The Song of Solomon) নামক (৮ অধ্যায়ের ছোট্ট) পুস্তকটিই বিদ্যমান আছে, যদি আমরা মেনে নিই যে, গীতসংহিতার ১২৭ নং গীত, যার উপরে শলোমনের নাম লেখা আছে, তা শলোমন রচিত গীতসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। সঠিক কথা হলো, "এই ১২৭ নং গীতটি শলোমনের পিতা দায়ূদ লিখেছিলেন শলোমনের শিক্ষার জন্য।"

অতঃপর তিনি ৩৩ আয়াতে উল্লিখিত 'প্রাণীগণের ইতিবৃত্ত' বিষয়ক শলোমনের রচনা সম্পর্কে বলেন : "প্রাণীজগতের ইতিবৃত্ত বিষয়ক শলোমনের রচিত পুস্তকটি চিরতরে হারিয়ে যাওয়ায় জ্ঞানী-পণ্ডিতগণের হৃদয়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও বেদনার সৃষ্টি হয়েছে।"

(৬) শমূয়েল ভাববাদীর রাজনীতির পুস্তক (Manner of the Kingdom)

১ শমূয়েলের ১০ অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে পুস্তকটির উল্লেখ আছে।

(৭) শমূয়েল দর্শকের পুস্তক (The Book of Samuel the Seer)

(৮) নাথন ভাববাদীর পুস্তক (The Book of Nathan the Prophet)

(৯) গাদ দর্শকের পুস্তক (The Book of Gad the Seer)

১ রাজাবলির ২৯ অধ্যায়ে ২৩ আয়াতে এই পুস্তকগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৫২২ পৃষ্ঠায় বলেন : "এই পুস্তকগুলি সবই হারিয়ে গিয়েছে।"

(১০) শময়িয় ভাববাদীর পুস্তক (The Book of Shemai'ah the Prophet)

(১১) ইদ্দো দর্শকের পুস্তক (The Book of Iddo the Seer)

২ বংশাবলির ১২ অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে পুস্তকদ্বয়ের উল্লেখ রয়েছে।

(১২) অহীয় ভাববাদীর ভাববাণী (The Prophecy of Ahi'jah)

---

১. অর্থাৎ ৩০০০ প্রবাদের মধ্যে মাত্র ৬৫০ প্রবাদ অবশিষ্ট আছে, বাকি ২৩৫০টি প্রবাদ বিনষ্ট হয়েছে। ইহূদী-খৃস্টানগণ তা সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

(১৩) ইদ্দো দর্শকের দর্শন (The Vision of Iddo the Seer)

২ বংশাবলি ৯ম অধ্যায়ের ২৯ আয়াতে এই পুস্তকদ্বয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নাথন ভাববাদীর পুস্তকের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫৩৯ পৃষ্ঠায় বলেন : "এই গ্রন্থগুলি সবই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

(১৪) হনানির পুত্র যেহূর পুস্তক (The Book of Jehu the Son of Hana'ni)

২ বংশাবলির ২০ অধ্যায়ের ৩৪ আয়াতে এই পুস্তকটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১] আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫৬১ পৃষ্ঠায় বলেন : "এই পুস্তকটি যদিও বংশাবলি দ্বিতীয় খণ্ডের রচনার সময় বিদ্যমান ছিল, কিন্তু বর্তমানে পুস্তকটি একেবারেই অস্তিত্বহীন।"

(১৫) যিশাইয় ভাববাদী রচিত উযিয় রাজার আদ্যোপান্ত ইতিহাস (The Acts of Uzziah, First and last, written by Isaiah the Prophet)

২ বংশাবলির ২৬ অধ্যায়ের ২২ আয়াতে পুস্তকটির উল্লেখ রয়েছে। আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৫৭৩ পৃষ্ঠায় বলেন : "এই পুস্তকটিও একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে।"

(১৬) যিশাইয় ভাববাদীর দর্শন-পুস্তক হিষ্কিয় রাজার ইতিহাস সম্বলিত (The Vision of Isaiah the Prophet, containing Acts of Hezeki'ah)

২ বংশাবলির ৩২ অধ্যায়ের ৩২ আয়াতে পুস্তকটির উল্লেখ আছে।[২]

(১৭) যিরমিয় ভাববাদী রচিত যোশিয় রাজার বিলাপগীত (The Lamentations of Jeremiah the Prophet for Josi'ah)

২ বংশাবলির ৩৫ অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে এই পুস্তকটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আদম ক্লার্ক এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : "এই পুস্তকটিও হারিয়ে গিয়েছে"।

ডাওয়ালি ও রজার্ডমেন্ট-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে : "এই বিলাপগীতটি হারিয়ে গিয়েছে। বাইবেলের মধ্যে বর্তমানে বিদ্যমান 'যিরমিয়ের বিলাপ' (The Lamentations of Jeremiah) পুস্তকটি কখনোই এখানে উল্লিখিত 'বিলাপ-গীত' হতে পারে না। কারণ বর্তমানে বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান এই 'বিলাপটি' যিরমিয় রচনা করেছিলেন যিরূশালেমের পতন ও রাজা সিদিকিয়র (Zedekiah) মৃত্যু উপলক্ষে। আর এই আয়াতে উল্লিখিত ও বর্তমানে বিনষ্ট বিলাপটি যিরমিয় রচনা করেছিলেন রাজা যোশিয়ের মৃত্যু উপলক্ষে।"

---

১. এই আয়াতে The Book of the Kings of Israel নামে আরো একটি পুস্তকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই পুস্তকটিও বিনষ্ট পুস্তকাবলির একটি।

২. এই আয়াতে The Book of the Kings of Judah and Israel নামে আরো একটি পুস্তকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই পুস্তকটিও বিনষ্ট পুস্তকাবলির একটি।

(১৮) বংশাবলি পুস্তক (The Book of Chronicles)

নহিমিয়ের পুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ২৩ আয়াতে এই পুস্তকটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১] আদম ক্লার্ক তাঁর পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬৭৬ পৃষ্ঠায় বলেন : "আমাদের নিকট বিদ্যমান বাইবেলের পুস্তকাবলির মধ্যে এই পুস্তকটি নেই। বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান 'বংশাবলি' পুস্তকটি এই আয়াতে উল্লিখিত বংশাবলি পুস্তক নয়; কারণ এখানে উল্লিখিত 'ইলিয়াশরের পুত্র যোহাননের সময় পর্যন্ত লেবীয় বংশজাত পিতৃকুলপতিদের নামের তালিকা' প্রচলিত 'বংশাবলি'র মধ্যে নেই। এ থেকে বুঝা যায় যে, এখানে উল্লিখিত 'বংশাবলি' অন্য একটি পুস্তক যা হারিয়ে গিয়েছে।"

(১৯) মোশির 'নিয়মপুস্তক' (The Book of the Covenant)

যাত্রা পুস্তকের ২৪ অধ্যায়ের ৭ আয়াতে পুস্তকটির উল্লেখ রয়েছে।

(২০) শলোমনের বৃত্তান্ত-পুস্তক (The Book of the Acts of Solomon)

১ রাজাবলির ১১ অধ্যায়ের ৭ম আয়াতে এই পুস্তকটির উল্লেখ আছে।

পাঠক ইতোপূর্বে জেনেছেন যে, জোসেফাস যিহিষ্কেলের প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ পুস্তকটি ছাড়াও আরো দুইটি পুস্তকের কথা উল্লেখ করেছেন (যেগুলি প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে নেই)। খৃস্টান পণ্ডিতগণের নিকট জোসেফাস একজন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক। উপরের ২০টি পুস্তকের সাথে এই দুইটি পুস্তক যোগ করলে সর্বমোট হারানো পুস্তকের সংখ্যা হয় ২২টি। প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ও এগুলির কথা অস্বীকার করতে পারবেন না।

পসিদ্ধ ক্যাথলিক পণ্ডিত টমাস এঙ্গেলস উর্দু ভাষায় রচিত ও ১৮৫১ সালে প্রকাশিত 'মির'আতুস-সিদ্‌ক' (সত্যের দর্পণ) নামক পুস্তকে বলেন : "পণ্ডিতগণ একমত যে, বাইবেলের মধ্য থেকে বিনষ্টকৃত বা হারিয়ে যাওয়া পবিত্র পুস্তকাদির সংখ্যা ২০ এর কম নয়।"

বিশেষ লক্ষ্যণীয় : প্রাচীন ইসলামী পুস্তকাদিতে ইহূদী-খৃস্টানগণের ধর্মগ্রন্থ থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিষয়ক কিছু ভবিষ্যৎ-বাণী ও সুসংবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলির কিছু ভবিষ্যৎ-বাণী প্রচলিত বাইবেলের পুস্তকগুলিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবত এসকল হারিয়ে যাওয়া পুস্তকগুলিতে এসব ভবিষ্যৎ-বাণী বিদ্যমান ছিল।

জোসেফাসের বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, মোশির রচিত পুস্তকের সংখ্যা পাঁচটি। কিন্তু তিনি এই পাঁচটি পুস্তরেক নাম উল্লেখ করেন নি। কাজেই আমরা জানিনা যে, এই পাঁচটি পুস্তক বলতে বর্তমানে প্রচলিত ৫টি পুস্তক বুঝিয়েছেন, না অন্য কোন পুস্তক বুঝিয়েছেন। বাহ্যত বুঝা যায় যে, তিনি এই পাঁচটি পুস্তকের কথা বলেন নি। কারণ তিনি বর্তমানে মোশির নামে প্রচলিত তোরাহ-এর পাঁচটি পুস্তকে প্রদত্ত

১. "লেবীয় বংশজাত পিতৃকুলপতিদের নাম বংশাবলি-পুস্তকে ইলিয়াশরের পুত্র যোহাননের সময় পর্যন্ত লিখিত হইল।"

তথ্যের বিপরীত অনেক কথা বলেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণের আলোচনায় পাঠক তা জানতে পেরেছেন। তিনি অত্যন্ত গোঁড়া ও ধর্মানুসারী ইহুদী ছিলেন। এ কথা তো কল্পনা করা যায় না যে, কোন কথা তোরাহ-এর মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, আর তিনি সেই তোরাহ-কে ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করার পরেও তার বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদান করবেন।

তৃতীয়ত : খৃষ্ট অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন, বিশুদ্ধতার নয়

তৃতীয় পর্যায়ে আমি বলব যে, আমরা যদি অনুমানের উপর ধরে নিই যে, বর্তমানে প্রচলিত পুস্তকগুলির যীশুখৃষ্টের যুগে প্রচলিত ছিল এবং তিনি ও তাঁর প্রেরিতগণ এই পুস্তকগুলিই মেনে নিয়েছেন এবং এগুলির পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন, তবুও তাঁদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রচলিত পুস্তকগুলির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় না, শুধু অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

কারণ এক্ষেত্রে খৃষ্ট ও তাঁর প্রেরিতগণের সাক্ষ্য দ্বারা শুধু এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, এই পুস্তকগুলি তাঁদের যুগে ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলে তাঁরা স্বীকার করেছেন। এই পুস্তকগুলি যাদের নামে প্রচলিত সত্যই সেগুলি তাঁদের রচনা কি না, এগুলির মধ্যে উল্লিখিত সকল বিষয়ই সত্য, না সকল বিষয়ই মিথ্যা, না কিছু সত্য ও কিছু মিথ্যা সেগুলি কিছুই তাঁরা নিশ্চিত করেন নি।

খৃষ্ট ও প্রেরিতগণ কর্তৃক এ সকল পুস্তকের অস্তিত্ব স্বীকার করার অর্থ এই নয় যে, তাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছেন, এগুলি সত্যই কথিত ভাববাদিগণের রচিত অথবা এগুলির মধ্যে উল্লিখিত সকল বিবরণ সন্দেহাতীতভাবে সত্য। উপরন্তু, খৃষ্ট বা প্রেরিতগণ যদি এ সকল পুস্তক থেকে কিছু উদ্ধৃত করেন, তবে তাঁদের উদ্ধৃতি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, যে কথাটি তাঁর উদ্ধৃত করলেন সেই কথাটি সত্য, কাজেই সে বিষয়ে গবেষণা বা অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, যদি উদ্ধৃতির মধ্যে কোথাও যীশু বলেন যে, এই কথাটি ঈশ্বরের পক্ষ থেকে এবং যীশুর এই কথাটি সরাসরি তাঁর নিকট থেকে অনেক মানুষের শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বহুল প্রচলিত হয়ে যায় তবে শুধু সেই কথাটিই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। অবশিষ্ট সব কথাই সন্দেহযুক্ত থাকবে। এগুলির বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য গবেষণা ও অনুসন্ধান করতে হবে।

আমি আমার এই কথাটি আমার নিজস্ব মর্জি ও চিন্তা থেকে বলছি না। প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের গবেষক পণ্ডিতগণও অবশেষে এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। এই কথাটি স্বীকার না করলে ইউরোপে বসবাসরত অগণিত ধর্ম বিরোধী নাস্তিকের হাত থেকে বাঁচার তাঁদের কোন উপায় নেই।

প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের গবেষক পণ্ডিত বেলি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে লন্ডনে মুদ্রিত তাঁর পুস্তকের তৃতীয় অংশের তৃতীয় অধ্যায়ে বলেন : "এতে কোন সন্দেহ নেই যে,

আমাদের ত্রাণকর্তা (খৃস্ট) বলেছেন যে, তোরাহ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রদত্ত। আমি কখনোই মনে করি না যে, তোরাহ্-এর মূল উৎস ও সূত্র ঈশ্বর ছাড়া অন্য কেউ প্রদান করেছেন। বিশেষত, আমরা দেখি যে, ইহূদীগণ ধর্মের বিষয়ে খুবই সজাগ ও সতর্ক মানুষ, কিন্তু যুদ্ধ ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁরা শিশুর মত। এই ধর্মসচেতন জাতি ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। ঈশ্বরের সত্তা ও গুণাবলির বিষয়ে তাঁদের ধর্মবিশ্বাস ছিল সুন্দর। পক্ষান্তরে অন্যান্য মানুষেরা ছিল একাধিক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের ত্রাণকর্তা পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির অধিকাংশ লেখকের ভাববাদিত্ব স্বীকার করেছেন। আমাদের-খৃষ্টানগণের দায়িত্ব হলো এতটুকুই স্বীকার করা ও এখানেই থেমে যাওয়া।

"যদি এর চেয়ে আগে বেড়ে দাবি করা হয় যে, পুরাতন নিয়মের সব কিছু বা সকল কথা ও বাক্য সত্য ও সঠিক অথবা পুরাতন নিয়মের প্রতিটি পুস্তকই বিশুদ্ধ ও সঠিক অথবা প্রতিটি পুস্তকের লেখকের বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান প্রয়োজনীয় এবং এ সকল বিষয়কে যদি খৃষ্টধর্মের বিষয় বানিয়ে দেওয়া হয়, তবে আমি এতটুকুই বলব যে, এতে অপ্রয়োজনে একটি সমস্যার আবর্তে নিপতিত হতে হবে।

"এসকল পুস্তক সাধারণভাবে পাঠ করা হতো। আমাদের ত্রাণকর্তার সমসাময়িক ইহূদীগণ এগুলিকে ঈশ্বরের বাক্য বলে বিশ্বাস করত। প্রেরিতগণ ও ইহূদীগণ এগুলি পাঠ করেছেন এবং এগুলির উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু এই পঠন, ব্যবহার বা নির্ভরতা থেকে শুধু নিম্নের বিষয়টি প্রমাণিত হয় :

"খৃষ্ট যদি কোন ভবিষ্যৎবাণীর বিষয়ে বলেন যে, এই কথাটি ঈশ্বরের পক্ষ থেকে, তবে প্রমাণিত হয় যে, শুধু সেই কথাটুকু ঈশ্বরের বাণী। যদি এরূপ কোন কথা তিনি না বলেন তবে শুধু প্রমাণিত হয় যে, এই পুস্তকগুলি সে সময়ে প্রসিদ্ধ ছিল ও সেগুলিকে ঐশ্বরিক বলে বিশ্বাস করা হতো। এই অবস্থায় বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলির বিষয়ে আমাদের সাক্ষ্য হলো, আমরা এগুলির বিষয়ে ভাল ধারণা পোষণ করি। তবে এই সাক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য ভালভাবে বুঝতে হবে। অনেক সময় মনে করা হয় যে, এর অর্থ হলো, এ সকল পুস্তকের সকল কথা, সকল মত ও সকল বিষয়কেই আমরা সঠিক মনে করি। কথাটি সেইরূপ নয়। প্রত্যেক বিষয়কেই উপরের যুক্তিতে গ্রহণ করতে হবে।

"যাকোব তাঁর পত্রে বলেছেন : "তোমরা ইয়োবের ধৈর্যের কথা শুনিয়াছ; প্রভুর পরিণামও দেখিয়াছ..."[১]। অথচ খৃষ্টান পণ্ডিতগণের মধ্যে ইয়োবের পুস্তকের বিশুদ্ধতার বিষয়ে, বরং ব্যক্তি ইয়োবের অস্তিত্বের বিষয়েই বিতর্ক ও মতভেদ রয়েছে। কাজেই এখানে যীশুর প্রেরিত শিষ্য যাকোব কর্তৃক 'ইয়োবের' এই উদ্ধৃতি থেকে শুধু এতটুকু বুঝতে হবে যে, তাঁর সময়ে 'ইয়োবের পুস্তক' নামে একটি পুস্তক প্রচলিত ছিল এবং ইহূদীগণ এই পুস্তকটিকে ঐশ্বরিক বলে বিশ্বাস করত।

১. যাকোব ৫/১১।

"তিমথীয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্রে পৌল লিখেছেন : "আর যান্নি ও যাম্ব্রি (Jannes and Jambres) যেমন মোশির প্রতিরোধ করিয়াছিল, তদ্রূপ ইহারা সত্যের প্রতিরোধ করিতেছে।"[১]

"এই দুইটি নাম পুরাতন নিয়মের কোথাও নেই। পৌল এই দু'টি নাম কোন জাল পুস্তক থেকে গ্রহণ করেছেন, না মৌখিক বর্ণনা থেকে গ্রহণ করেছেন তা জানা যায় না। কিন্তু কেউ চিন্তা করবেন না যে, এই বিষয়টি কোন পুস্তকে লিখিত ছিল বলেই পৌল তা উদ্ধৃত করেছেন। আর এই উদ্ধৃতির সত্যতা প্রমাণের জন্যও নিজেকে বিপদগ্রস্থ করা নিষ্প্রয়োজন। এই জাতীয় প্রশ্নাবলির পিছনে ছোটাও নিষ্প্রয়োজন। এমন যেন না হয়, যে এই দুই ব্যক্তি প্রকৃতই মোশির বিরোধিতা করেছিলেন কি না তার উপরেই আমাদের সকল গবেষণা ও আলোচনা সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

"আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, ইহূদীদের ইতিহাস-পুস্তকগুলির সবগুলিরই অবস্থা ইয়োব, যান্নি ও যাম্ব্রির মতই, এর চেয়ে বিশুদ্ধ আর কিছুই সেখানে নেই। আমি অন্য দিক থেকে চিন্তা করছি। আমার উদ্দেশ্য হলো, পুরাতন নিয়মের কোন কথা নতুন নিয়মে উদ্ধৃত থাকার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, বিষয়টি সঠিক বা বিষয়টির সঠিকত্ব জানার জন্য অন্যান্য প্রমাণ ও গবেষণার প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে ইহূদীদের ইতিহাস পুস্তকগুলির বিষয়ে এমন কোন মূলনীতি নির্ধারণ করা যাবে না যে, এ সকল পুস্তকে উল্লিখিত সকল তথ্যই সঠিক বা সত্য, তা না হলে তাদের সকল পুস্তকই মিথ্যা বলে গণ্য হবে। কারণ এইরূপ কোন মূলনীতি অন্য কোন পুস্তকের জন্য নির্ধারণ করা হয়নি।

"আমি এই বিষয়গুলি বর্ণনা করা প্রয়োজনীয় মনে করলাম। কারণ বিগত দিনগুলিতে ভল্টেয়ার (Voltaire : 1694-1778) ও তাঁর ছাত্রদের নিয়ম ছিল যে, তাঁরা ইহূদীদের বগলের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং খৃষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালাতেন। তাঁদের কোন কোন আপত্তির কারণ ছিল প্রকৃত অর্থের বিপরীত অর্থ বর্ণনা করা। কোন কোন আপত্তির ভিত্তি অতিরঞ্জন। কিন্তু তাঁদের সকল আপত্তির মূল উৎস এটিই যে, খৃষ্ট এবং প্রাচীন ধর্মগুরুগণ মোশি ও অন্যান্য ভাববাদীর ভাববাদিত্ব স্বীকার করেছেন। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা পুরাতন নিয়মের প্রত্যেক পুস্তক, প্রত্যেক অংশ ও প্রত্যেক কথাকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন। কাজেই পুরাতন নিয়মের সকল বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করার দায়িত্ব খৃষ্টধর্মের উপর।"

পণ্ডিত বেলির বক্তব্য এখানেই শেষ। প্রাজ্ঞ পাঠক এবার বলুন, তাঁর কথাগুলি আমার উপরের বক্তব্যের অনুরূপ কি না?

পণ্ডিত বেলি ইয়োবের পুস্তকর বিষয়ে বলেছেন : "খৃষ্টান পণ্ডিতগণের মধ্যে ইয়োবের পুস্তকের বিশুদ্ধতার বিষয়ে, বরং ব্যক্তি ইয়োবের অস্তিত্বের বিষয়েই বিতর্ক ও মতভেদ রয়েছে।" তিনি এখানে একটি শক্তিশালী বিতর্ক ও মতভেদের প্রতি ইঙ্গিত

১. ২ তিমথীয় ৩/৮।

করেছেন। কারণ প্রসিদ্ধ ইহুদী পণ্ডিত রাব্বী মমানিডিয এবং তাঁর সাথে মিকাইলস, লেক্লার্ক, স্মিলার, স্টক ও অন্যান্য পণ্ডিত বলেছেন যে, 'ইয়োব' একটি কাল্পনিক নাম মাত্র। কোন যুগে কোথাও এই নামের কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না। 'ইয়োবের পুস্তক' নামের পুস্তকটি একটি মিথ্যা ও বাতিল গল্প মাত্র। পক্ষান্তরে ক্যামিট, ভ্যান্টল প্রমুখ পণ্ডিত বলেছেন যে, 'ইয়োব' নামে একজন ব্যক্তি অতীতকালে বিদ্যমান ছিলেন।

যাঁরা তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন তাঁরা তাঁর যুগের বিষয়ে মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের ৭টি মত রয়েছে :

১. কেউ বলেছেন : তিনি মোশির সমসাময়িক ছিলেন।
২. কেউ বলেছেন : তিনি যিহোশূয়ের পরের যুগে বিচারকর্তৃগণের সমসাময়িক ছিলেন।
৩. কেউ বলেছেন : তিনি পারস্য-সম্রাট জর্ক্সি (Xerxes) অথবা আর্দসের (Artaxerxes)-এর সমসাময়িক ছিলেন।
৪. কেউ বলেছেন : তিনি যাকোবের সমসাময়িক ছিলেন।
৫. কেউ বলেছেন : তিনি শলোমনের সমসাময়িক ছিলেন।
৬. কেউ বলেছেন : তিনি নেবুকাদনেযার (Nebuchadnezzar)-এর সমসাময়িক ছিলেন।
৭. কেউ বলেছেন : অবরাহাম যখন কনান দেশে আগমন করেন, তারও পূর্বে তিনি বাস করতেন।

প্রসিদ্ধ প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত ও গবেষক হর্ন বলেন : "এ সকল মতের ওজনহীনতাই প্রমাণ করে যে, এগুলি দুর্বল মত।"

ইয়োবের পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি 'উয' দেশে (Land of Uz) বাস করতেন। এই 'উয' দেশটি কোথায় অবস্থিত সে বিষয়েও তাঁরা মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের তিনটি মত আছে : বোগার্ট, স্পাহম, ক্যামিট প্রমুখ পণ্ডিত বলেন, দেশটি আরবের অন্তর্ভুক্ত। মিকাইলস ও এলিগন বলেন : দেশটি দামেশকের অভ্যন্তরে। লোড, ম্যাগি, হিয়োকোড ও কোন কোন সমসাময়িক গবেষক বলেন, এডোমিকেই 'উয' বলা হয়েছে।

ইয়োবের পুস্তকের লেখকের বিষয়েও তাঁদের মতভেদ রয়েছে। তাঁদের মতে আলিহো, অথবা ইয়োব, অথবা শলোমন, অথবা যিশাইয়, অথবা রাজা মনঃশি (Manasseh)-এর সমসাময়িক কোন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি, অথবা যিকিস্কেল, অথবা ইয্রা অথবা আলিহোর বংশের এক ব্যক্তি, অথবা মোশি... এই পুস্তকটি রচনা করেন। সর্বশেষ মতের পণ্ডিতগণও মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন যে, মোশি হিব্রু ভাষায় পুস্তকটি রচনা করেন। পক্ষান্তরে ওরিগন বলেন : মোশি সিরীয় ভাষা থেকে পুস্তকটি হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

এই পুস্তকের সমাপ্তির বিষয়েও তাঁদের মতভেদ রয়েছে। পাঠক তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১২শ প্রমাণের আলোচনায় তা জানতে পেরেছেন। তাহলে এই পুস্তকটির বিষয়ে ২৪ প্রকারের মতভেদ রয়েছে।

এই বিষয়টিই চূড়ান্ত প্রমাণ যে, ইহূদী-খৃষ্টানগণের নিকট তাঁদের পুস্তকগুলির কোন অবিচ্ছিন্ন সূত্র-পরম্পরা সংরক্ষিত নেই। তাঁরা যা কিছু বলেন সবই অনুমান ও আন্দাজের উপর নির্ভর করে বলেন। ৫ম খৃষ্টীয় শতকের পাদরী থিয়োডর এই গ্রন্থটির অত্যন্ত নিন্দা করেছেন। প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের গুরু মার্টিন লূথার বলেন : "এই গ্রন্থটি নির্ভেজাল গালগল্প মাত্র।"

পাঠক, তাহলে দেখুন! এই পুস্তকটি বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত একটি 'পবিত্র পুস্তক'। (ইহূদীদের সাথে সাথে) ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায় একমত যে, পুস্তকটি ঐশ্বরিক পুস্তক বা ঐশ্বরের বাণী। রাব্বী মমানিডিয, মিকাইলস, লেক্লার্ক, স্মিলার, স্টক ও অন্যান্য পণ্ডিতের মতে পুস্তকটি বাতুল গল্প ও মিথ্যা কাহিনী মাত্র। থিয়োডোরের মতে নিন্দনীয় পুস্তক। আর প্রটেস্ট্যান্টদের ধর্মগুরুর মতে এই পুস্তকটি মোটেও বিবেচনাযোগ্য নয়।

পক্ষান্তরে যাঁরা এই পুস্তককে 'ঈশ্বরের বাণী' বলে মেনে নিচ্ছেন তাঁরাও বলতে পারেন না যে, কে এই 'ঈশ্বরের বাণীটি' গ্রহণ, ধারণ ও লিপিবদ্ধ করলেন। আন্দাজে ঢিল ছুড়ে তাঁরা অনেকের নাম বলেন। আর যদি আমরা ধরে নিই যে, পুস্তকটির রচয়িতা আলিহো অথবা তাঁর বংশের এক ব্যক্তি বা রাজা মনঃশির সমসাময়িক কোন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি, তবে মেনে নিতে হবে যে, পুস্তকটি ঈশ্বরের বাণী বা ঐশ্বরিক পুস্তক নয় (কারণ এরা কেউ ভাববাদী ছিলেন না)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম প্রমাণ থেকে পাঠক জানতে পেরেছেন যে, ৩২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন খৃষ্টানদের নিকট ইস্টেরের পুস্তকটি গ্রহণযোগ্য ছিল না। এই পুস্তকের রচয়িতা কে তা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। মেলিটো, ক্রীনাযিনযেন ও ইথানিসিশ এই পুস্তক প্রত্যাখ্যান করেছেন। এম. ফেলোকিস পুস্তকটির বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন।

অনুরূপভাবে 'পরমগীত' পুস্তকটিরও একই অবস্থা। থিয়োডোর যেমন ইয়োবের পুস্তকটির নিন্দা করেছেন, তদ্রূপ তিনি এই পুস্তকটিরও অত্যন্ত নিন্দা করেছেন। সিমন ও লেক্লার্ক এই পুস্তকটির সত্যতা স্বীকার করেন না।

ওয়াষ্টন এবং কতিপয় সমকালিন পণ্ডিত বলেন যে, এই গ্রন্থটি অশ্লীল গানের সমষ্টি; কাজেই গ্রন্থটিকে পবিত্রগ্রন্থের মধ্য থেকে বাদ দেওয়া জরুরী। স্মিলর বলেন : স্পষ্টত বুঝা যায় যে, গ্রন্থটি জাল ও বানোয়াট। ক্যাথলিক ওয়ার্ড উল্লেখ করেছেন, ক্যাসটিলো বলেন যে, এই পুস্তকটিকে পুরাতন নিয়ম থেকে বের করে দেওয়া অত্যাবশ্যক।

আরো কিছু পুস্তকের অবস্থাও এইরূপ। যদি খৃষ্ট ও তাঁর প্রেরিতগণের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তকের সকল কথা সত্য তবে প্রাচীন ও আধুনিক খৃষ্টান পণ্ডিতগণের মধ্যে এ সকল পুস্তকের বিষয়ে এইরূপ মতভেদের কোন ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ থাকে না। এজন্য সঠিক কথা হলো, বেলি যা বলেছেন তা হলো এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁদের চূড়ান্ত উপায়। এ কথা স্বীকার না করে তাঁদের কোন উপায় নেই।

পাঠক প্রথম পরিচ্ছেদের ১৬শ প্রমাণের আলোচনায় দেখেছেন যে, ইহূদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ একমত যে, বংশাবলি ১ম খণ্ডে ইয্রা ভুল করেছেন। যদি তাঁরা বেলির কথা স্বীকার না করেন, তবে তাঁদের স্বীকার করতেই হবে যে, খৃষ্ট ও তাঁর প্রেরিতগণ এই ভুলকেও সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন।[১]

চতুর্থত : খৃষ্টের পরেও বিকৃতি ঘটেছে

চতুর্থ পর্যায়ে আমি বলব যে, আমরা যদি তর্কের খাতিরে অসম্ভবকে স্বীকার করার পর্যায়ে মেনে নিই যে, খৃষ্ট ও তাঁর প্রেরিতগণ পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তকের সকল অংশের সকল কথার বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়েছেন, তবে এতে বাইবেলের বিকৃতি প্রমাণের ক্ষেত্রে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। কারণ প্রায় সকল খৃষ্টান পণ্ডিত স্বীকার ও দাবি করেছেন যে, খৃষ্টের পরের যুগে ইহূদীগণ পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলিকে বিকৃত করেছে।

অধিকাংশ খৃষ্টান প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে জাস্টিন, অগাস্টিন (St. Augustine) ও ক্রীসস্টম, সকল ক্যাথলিক পণ্ডিত এবং প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের মধ্যে সিলবারগিস, ড. ক্রীপ, ওয়াই. টিকার, এ. ক্লার্ক. হ্যাম্পফ্রে ও ওয়াসটন বলেছেন যে, খৃষ্ট ও তাঁর প্রেরিতগণের পরবর্তী যুগে ইহূদীরা পুরাতন নিয়মের ধর্মগ্রন্থগুলিকে বিকৃত করেছিল, তৃতীয় অনুচ্ছেদে পাঠক তা জানতে পেরেছেন। এছাড়া সকল প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতই বিভিন্ন সময়ে বাধ্য হয়ে স্বীকার করেন বা দাবি করেন যে, ইহূদীগণ ধর্মগ্রন্থগুলিকে বিকৃত করেছে। ৩য় অধ্যায়ের পরিচ্ছেদ তিনটি থেকে পাঠক বিষয়গুলি জানতে পেরেছেন।

এখানে আমরা তাঁদেরকে একটি প্রশ্ন করতে চাই : যে সকল স্থানে বিকৃতি ঘটেছে বলে আপনারা স্বীকার করছেন, এ সকল স্থান কি খৃষ্ট ও তাঁর প্রেরিতগণের যুগেও বিকৃত ছিল? তাঁরা কি এ সকল বিকৃতি ও জালিয়াতি-সহই পুরাতন নিয়মের প্রতিটি পুস্তকের প্রতিটি কথাকে বিশুদ্ধ ও ঈশ্বরের বাণী বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন? না কি এ সকল স্থান তাঁদের সময়ে বিকৃত ছিল না, বরং পরবর্তী যুগে বিকৃত করা হয়েছে?

---

১. সবচেয়ে বড় কথা হলো, পুরাতন নিয়মের মধ্যে মিথ্যা ও অসত্যের উপস্থিতি সর্বজনস্বীকৃত। বিশ্ব সৃষ্টি, বিশ্বের বয়স ইত্যাদি বিষয়ে অগণিত মিথ্যা ও ভুল তথ্য এগুলির মধ্যে রয়েছে। যদি প্রমাণিত হয় যে, যীশু বা তাঁর প্রেরিতগণ পুরাতন নিয়মকে বিশুদ্ধ বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন তবে তাতে পুরাতন নিয়মের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হবে না, বরং তাঁদের সাক্ষ্যের ভিত্তিহীনতা ও মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

কোন ধর্মবিশ্বাসী খৃস্টানই প্রথম সম্ভাবনাটি স্বীকার করতে পারবেন না। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনাটির সাথে বিকৃতির কোন বৈপরীত্য নেই। এই সম্ভাবনা স্বীকার করলে খৃষ্ট ও প্রেরিতগণের সাক্ষ্য দ্বারা একথা প্রমাণ করা যায় না যে, তাঁদের পরে বাইবেলের মধ্যে কোন বিকৃতি ঘটে নি।

পঞ্চমত : খৃস্টের নীরবতা থেকে বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় না

এরা বলেন : "পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলিতে যদি কোন বিকৃতি থাকত তবে নিশ্চয় খৃষ্ট তা বলতেন এবং ইহূদীদের সামনে বিকৃতি প্রমাণ করে তাঁদেরকে তা স্বীকারে বাধ্য করতেন।"

তাঁদের এই বিভ্রান্তির অপনোদনে প্রথমে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, প্রাচীন যুগের খৃস্টান ধর্মগুরুগণের রীতিতে এই কথা বলার সুযোগ নেই। কারণ তাঁরা স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, তাঁদের যুগে বিকৃতি ঘটেছে এবং তাঁরা এ সকল বিকৃতির কারণে ইহূদীদেরকে নিন্দা করেছেন ও আপত্তি করেছেন।

তবে প্রাচীনদের এই রীতি ও অভ্যাসের কথা বাদ দিয়েই আমি এই বিভ্রান্তির বিষয়ে বলব যে, খৃস্টের নীরবতা কিছুই প্রমাণ করে না। তাঁদের মত অনুসারে বিভ্রান্তি ধরে দেওয়া বা বিভ্রান্তি প্রমাণ করে ইহূদীদেরকে তা স্বীকার করতে বাধ্য করার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এর প্রমাণ হলো, তোরাহ-এর হিব্রু সংস্করণ ও শমরীয় সংস্করণের মধ্যে অনেক স্থানে এমন কঠিন বৈপরীত্য রয়েছে যে, উভয় সংস্করণের একটিকে অবশ্যই বিকৃত বলে গণ্য করতে হবে। প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় প্রমাণের আলোচনায় এইরূপ একটি স্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, এই বিষয়টি নিয়ে ইহূদী ও শমরীয়দের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে কঠিন বিতর্ক চলে আসছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় দাবি করেন যে, বিপক্ষ সম্প্রদায়ই জালিয়াত। ড. কেনিকট এবং তাঁর অনুসারিগণের মতে শমরীয়দের দাবিই সঠিক।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতের মধ্যে ইহূদীগণের দাবিই সঠিক। তাঁরা দাবি করেন যে, মোশির মৃত্যুর ৫০০ বছর পরে শমরীয়গণ এই স্থানে বিকৃতি সাধন করে। তাহলে খৃস্টের জন্মের ৯৫১ বছর পূর্বেই শমরীয়গণ এই স্থানে বিকৃতি সাধন করেছিল। কিন্তু খৃষ্ট বা প্রেরিতগণ কেউ ইহূদী বা শমরীয় কোন সম্প্রদায়কেই এই বিকৃতির কথা বলেন নি।

শুধু তাই নয়, একজন শমরীয় নারী যীশুকে বিশেষভাবে এই বিষয়ে প্রশ্ন করে সঠিক বিষয়টি জানতে চেয়েছিলেন। তখনও যীশু শমরীয় সম্প্রদায়ের বিকৃতির কথা উল্লেখ করেন নি (আবার ইহূদীদের বিকৃতির কথাও বলেন নি।) বরং তিনি নীরব থেকেছেন। এখানে তাঁর নীরবতা শমরীয়দের পক্ষ সমর্থন করে। এজন্য কেনিকট এই নীরবতাকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে বলেছেন : শমরীয়গণ তাদের তোরাহ বিকৃত

করেনি বরং ইহুদীরাই তাদের হিব্রু তোরাহকে বিকৃত করেছে। প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রমাণের আলোচনা থেকে পাঠক তা বিস্তারিত জানতে পেরেছেন।

ইহুদী ও শমরীয় তোরাহ-এর মধ্যে বিতর্কিত আরেকটি স্থান উল্লেখ করছি। ইহুদীদের প্রসিদ্ধ 'দশ আজ্ঞা' (the ten commandments) বর্ণনার ক্ষেত্রে উভয় তোরাহ-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। হিব্রু তোরাহ-এ যে আজ্ঞাগুলি রয়েছে, শমরীয় তোরাহ-এ সেগুলি ছাড়াও অতিরিক্ত একটি আজ্ঞা রয়েছে।[১] এ বিষয়েও প্রাচীনকাল থেকে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতর্ক ও বিভেদ রয়েছে। কিন্তু খৃস্ট বা তাঁর প্রেরিতগণ কোন সম্প্রদায়কেই বিকৃতির কথা বলেন নি।

তৃতীয় বিভ্রান্তি : ইহুদী-খৃস্টানগণের ধার্মিকতার দাবি

বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি হতে পারে না তা প্রমাণ করার জন্য তাঁরা বলেন যে, আপনারা মুসলিমগণ নিজেদের সম্পর্কে যেমন ধার্মিকতা ও সততার দাবি করেন, ইহুদী খৃস্টানগণও তেমনি ধর্মপ্রাণ ও সৎ জাতি। আর তাঁদের মত ধর্মপ্রাণ সম্প্রদায় ধর্মগ্রন্থ বিকৃত করার মত একটি জঘন্য কাজের দুঃসাহস করতে পারে না।

এখানে আমার বক্তব্য হলো, এই অধ্যায়ের তিনটি পরিচ্ছেদ এবং প্রথম বিভ্রান্তির আলোচনা থেকে আমরা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে জানতে পেরেছি যে, এই কথাগুলি অসত্য ও ভিত্তিহীন। আমরা জেনেছি যে, নিঃসন্দেহে বাইবেলের পুস্তকগুলির মধ্যে বিকৃতি ঘটেছে এবং অতীত কাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত খৃস্টান পণ্ডিতগণ বিকৃতির কথা স্বীকার করেছেন। কাজেই 'তাঁদের মত মানুষেরা ধর্মগ্রন্থ বিকৃত করার মত একটি জঘন্য কাজের দুঃসাহস করতে পারেন না' এ কথা বলার কোনই অর্থ হয় না বরং এই 'জঘন্য কাজটি' প্রাচীন ইহুদী ও খৃস্টানগণের নিকট একটি ধর্মীয় পুণ্যকর্ম বলে গণ্য ছিল। তাঁদের মধ্যে প্রচলিত প্রসিদ্ধ কথাটির ভিত্তিতে তাঁরা এইরূপ মনে করতেন। প্রথম বিভ্রান্তির আলোচনায় তৃতীয় অনুচ্ছেদের ৬ষ্ঠ বক্তব্যে পাঠক তা জেনেছেন।

চতুর্থ বিভ্রান্তি : বাইবেলের বহুল প্রচারের দাবি

বাইবেলের বিকৃতি অসম্ভব প্রমাণ করার জন্য তাঁরা দাবি করেন যে, বাইবেলের অগণিত কপি বা পাণ্ডুলিপি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। কাজেই কারো জন্যই এতে কোন বিকৃতি সাধন সম্ভব ছিল না। যেমন আপনাদের ধর্ম পুস্তক বহুল প্রচারিত হওয়ার কারণে কারো পক্ষে তাতে বিকৃতি সাধন করা সম্ভব হয় না।

---

১. এই আজ্ঞাগুলি যাত্রাপুস্তক ২০/২-১৭ ও দ্বিতীয় বিবরণ ৫/৬/-২১ এ রয়েছে। যাত্রাপুস্তকের বক্তব্য উভয় সংস্করণে মূলত একই। দ্বিতীয় বিবরণের বক্তব্যে শমরীয় তোরাহ-এ অতিরিক্ত একটি আজ্ঞার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা হিব্রু সংস্করণে নেই। আজ্ঞাটি গরিষীম পর্বতে যজ্ঞবেদি ও মন্দির তৈরি বিষয়ক।

এই দাবিটি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা তা পূর্ববর্তী তিনটি পরিচ্ছেদে ও প্রথম বিভ্রান্তির আলোচনা থেকেই সুস্পষ্ট। ইহুদী-খৃস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণ সকলেই স্বীকার করছেন যে, বিকৃতি সংঘটিত হয়েছে। কাজেই বিকৃতি ঘটানো সম্ভব ছিল না বলে দাবি করা অর্থহীন প্রলাপ মাত্র।

প্রচার, প্রসিদ্ধি ও সংরক্ষণের বিষয়ে পবিত্র কুরআনের সাথে বাইবেলের পুস্তকগুলির বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। এজন্য উভয়ের মধ্যে তুলনা চলে না। মুদ্রণ-যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাইবেলের পুস্তকগুলির মধ্যে বিকৃতির সুযোগ বিদ্যমান ছিল। এগুলির প্রসিদ্ধি ও প্রচলন ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, ফলে বিকৃতি ঠেকানো সম্ভব হতো না। প্রথম বিভ্রান্তির আলোচনায় ১৯শ বক্তব্যের মধ্যে পাঠক দেখেছেন। ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায় এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, বাইবেলের গ্রীক অনুবাদটি মূল হিব্রু বাইবেলের চেয়ে অধিক প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও ইহুদীগণ ও প্রাচ্যের ধর্মদ্রোহিগণ তা বিকৃত করেছে এবং তাদের বিকৃতি কার্যকর হয়েছে। প্রসিদ্ধি বা প্রচলনের কারণে বিকৃতি রোধ করা যায় নি।

কুরআন-এর অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলিম জাতির প্রথম প্রজন্ম থেকে প্রতিটি প্রজন্মে কুরআনের প্রসিদ্ধি, প্রচলন ও ব্যবহার এত ব্যাপক ছিল যে, এর কোনরূপ বিকৃতি সম্ভব ছিল না। প্রতিটি প্রজন্মে ও সকল যুগেই কুরআন যেমন অগণিত পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ ছিল, তেমনি তা অধিকাংশ মুসলিমের হৃদয়ে মুখস্থ ও সংরক্ষিত ছিল। এ বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ হলে এ যুগেও অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন। এই অনুসন্ধানকারী যদি মিসরের অগণিত মসজিদের মধ্যে শুধু 'আল-আযহার' মসজিদ ও বিদ্যালয়ে গমন করেন, তবে শুধু সেখানেই সর্বদা সহস্রাধিক ব্যক্তিকে পাবেন যারা পূর্ণ বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতার সাথে পূর্ণ কুরআন মুখস্থ রেখেছেন। মিসরের কোন একটি ছোট্ট গ্রামও এমন পাবেন না, যেখানে কিছু হাফিয বা পূর্ণ কুরআন মুখস্থকারী নেই।

বাইবেলের বিষয়টি কখনোই এইরূপ ছিল না এবং এখনো নেই। বর্তমান যুগে ইউরোপ মহাদেশে খৃস্টানগণ অত্যন্ত শান্তি ও তৃপ্তির মধ্যে বসবাস করছেন। জ্ঞান, গবেষণা, প্রযুক্তি ইত্যাদির জন্য তাঁরা পূর্ণ সময় ব্যয় করছেন। সংখ্যায়ও তাঁরা মুসলমানদের চেয়ে বেশি। তা সত্ত্বেও শুধু আল-আযহার মসজিদে যতজন কুরআন মুখস্থকারী আছেন পুরো ইউরোপ মহাদেশে তালাশ করলেও ততজন ইঞ্জিল মুখস্থকারী পাওয়া যাবে না, বরং সারা ইউরোপে এমন দশজন ব্যক্তিও পাওয়া যাবে না যারা বাইবেলের নতুন নিয়মটিও পুরোপুরি মুখস্থ করেছেন। পুরাতন নিয়মসহ পুরো বাইবেল তো দূরের কথা, আমরা এখন পর্যন্ত শুনতে পাই নি যে, কোন খৃস্টান শুধু নতুন নিয়মের পুস্তকগুলি পুরোপুরি কণ্ঠস্থ করেছেন।

তাহলে পুরো ইউরোপ মহাদেশ এই বিষয়ে মিসরের একটি ছোট গ্রামেরও সমকক্ষ হতে পারে নি। ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ রাখার বিষয়ে বড় বড় খৃস্টান পাদ্রী ও বিশপ মিসরের সাধারণ মুটে-মজুরদের সমকক্ষ হতে পারেন নি। ইয্রা ভাববাদী তোরাহ মুখস্থ করেছিলেন বলে ইহূদী-খৃস্টানগণ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর এই পর্যায়ের প্রশংসা লাভের যোগ্যতা মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের রয়েছে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ দেশেই মুসলিমগণ দুর্বলতার মধ্যে রয়েছেন। তা সত্ত্বেও এই যুগে সকল মুসলিম দেশে পূর্ণ কুরআন কণ্ঠস্থ করেছেন এরূপ হাফিযের সংখ্যা লক্ষাধিক[১]। বিষয়টি মুসলিম জাতির ও তাঁদের ধর্মগ্রন্থের একটি বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য। উপরন্তু তা মুসলিম জাতির নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের একটি অলৌকিক চিহ্ন যা এ জাতির প্রতিটি জেনারেশনেই প্রকাশিত।

একটি ঘটনা : একদিন একজন ইংরেজ প্রশাসক ভারতের সাহারানপুর শহরের একটি 'মক্তব' দেখতে যান। তিনি দেখেন যে, 'মক্তব'-এর শিশু-কিশোর ছাত্ররা কুরআন পাঠ অনুশীলন ও কুরআন মুখস্থ করায় ব্যস্ত রয়েছে। তখন তিনি শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করেন, এরা কি পাঠ করছে? শিক্ষক উত্তরে জানান : এরা পবিত্র কুরআন পাঠ করছে। ইংরেজ প্রশাসক প্রশ্ন করেন, এদের মধ্যে কেউ কি পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেছে? শিক্ষক কতিপয় ছাত্রের দিকে ইশারা করে বলেন যে, এরা ইতোমধ্যেই পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেছে। উক্ত প্রশাসকের কাছে বিষয়টি অসম্ভব ও অবাস্তব বলে মনে হয়। তিনি বলেন, আমাকে একটি ছাত্র বেছে দিন, আমি তাকে পরীক্ষা করব। শিক্ষক বলেন, আপনিই যে কোন একজনকে বেছে নিন। উক্ত প্রশাসক ১৩/১৪ বৎসর বয়সী এক কিশোরকে বেছে নিয়ে কুরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে পরীক্ষা নেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, সত্যই এই কিশোরটি পুরো কুরআন কণ্ঠস্থ করেছে, তখন তিনি অবাক বিস্ময়ে বলেন, আমি স্বীকার করছি যে, কুরআনের মত এইরূপ বহুল প্রচলন আর কোন পুস্তকের ক্ষেত্রে ঘটে নি। একটি কিশোর তা এমন বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ রেখেছে যে, তার মুখ থেকে শুনে শুনে সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে কুরআন লিখে নেওয়া সম্ভব।

বাইবেল বিকৃতির পটভূমি ব্যাখ্যা

এখানে আমি কতিপয় বিষয় বর্ণনা করছি যেগুলি থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন যে, বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি প্রবেশ কিভাবে এত সহজ হয়েছিল।

প্রথম বিষয় : মোশি তোরাহ লিখে সেই পাণ্ডুলিপিটি ইস্রায়েল সন্তানগণের যাজক ও গোত্রপতিগণের নিকট সমর্পণ করেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাঁরা যেন সেই পাণ্ডুলিপিটিকে সংরক্ষণ করেন এবং 'সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকের' মধ্যে তা রেখে দেন। তিনি তাঁদেরকে প্রতি সাত বছর পর পর সকল ইস্রায়েলের সামনে তা পাঠ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন : "সাত সাত বৎসরের পরে, মোচন বৎসরের কালে,

১. বর্তমানে এ সংখ্যা যে অনেক বেশি তা বলাই বাহুল্য। বর্তমানে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতেও এরূপ বহু হাফিয দেখতে পাওয়া যাবে।– সম্পাদক।

কুটীরোৎসব পর্বে, যখন সমস্ত ইস্রায়েল তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তৎকালে তুমি সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে তাহাদের কর্ণগোচরে এই ব্যবস্থা পাঠ করিবে।"[১]

ইস্রায়েল সন্তানগণের প্রথম প্রজন্ম মোশির এই নির্দেশ মেনে চলে। এই প্রজন্মের গত হওয়ার পরে ইস্রায়েল সন্তানদের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে পাপাচারিতা, অবাধ্যতা ও ধর্মদ্রোহিতা ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ে। কখনো তারা ধর্মত্যাগ করত। আবার কখনো পুনরায় ধর্ম মানতে শুরু করত। দায়ূদ-এর রাজত্বের শুরু পর্যন্ত (প্রায় তিনশত বছর যাবৎ) তাদের অবস্থা এইরূপ ছিল।

দায়ূদের রাজত্বকালে ইস্রায়েল সন্তানগণের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। দায়ূদের রাজত্বকালে ও শলোমনের রাজত্বের প্রথমাংশে ইস্রায়েল সন্তানগণ ধর্মদ্রোহ পরিত্যাগ করে ধর্মীয় অনুশাসনাদি পালন করে চলেন। কিন্তু বিগত শতাব্দীগুলির ধর্মদ্রোহিতা, অস্থিরতা ও অরাজকতার মধ্যে মোশির প্রদত্ত 'সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকে রক্ষিত' তোরাহটি হারিয়ে যায়। কারণ শলোমনের রাজত্বকালে যখন তিনি 'সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক'-টি উন্মোচন করেন তখন তার মধ্যে তোরাহের কোন অস্তিত্ব পান নি। সিন্দুকটির মধ্যে শুধু দুইটি 'তোরাহ-বহির্ভূত' প্রাচীন প্রস্তরফলকই অবশিষ্ট ছিল। ১ রাজাবলির ৮ম অধ্যায়ের ৯ম আয়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে: "সিন্দুকের মধ্যে আর কিছু ছিল না, কেবল সেই দুইখানা প্রস্তরফলক ছিল, যাহা মোশি হোরেবে তাহার মধ্যে রাখিয়াছিলেন: সেই সময়ে, মিসর হইতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের বাহির হইয়া আসিবার পর, সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের সহিত নিয়ম করিয়াছিলেন।"

বাইবেলের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলির বিবরণ অনুসারে শলোমনের রাজত্বের শেষভাগ থেকে ইস্রায়েলীয়গণের মধ্যে জঘন্য বিপর্যয় নেমে আসে। স্বয়ং শলোমন তাঁর শেষ জীবনে ধর্মত্যাগ করেন (নাউযু বিল্লাহ!)। তিনি তাঁর স্ত্রীগণের পরামর্শে মূর্তিপূজা শুরু করেন, মূর্তিপূজার নিমিত্ত মন্দিরাদি নির্মাণ করেন। এভাবে তিনি যখন ধর্মত্যাগী (মুর্তাদ) ও পৌত্তলিকে পরিণত হলেন (নাউযু বিল্লাহ!) তখন তোরাহ-এর প্রতি তাঁর আর কোন আগ্রহ থাকে না।

তাঁর মৃত্যুর পরে আরো কঠিনতর বিপর্যয় শুরু হয়। (দায়ূদ ও শলোমনের অধীনে মাত্র অর্ধ শতাব্দীর সামান্য স্থিতির পরে খৃস্টপূর্ব ৯২২ সালের দিকে) ইস্রায়েল-সন্তানগণ অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও দলাদলির ফলে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ইহুদীগণের একটি রাজ্য দুইটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। ইস্রায়েল-সন্তানগণের ১২ গোত্রের ১০টি গোত্র এক পক্ষে এবং বাকি দুইটি বংশ এক পক্ষে থাকে। নবাটের পুত্র যারবিয়ামের (Jeroboam I) নেতৃত্বে বিদ্রোহী ১০টি গোত্র প্যালেস্টাইনের উত্তর অংশে পৃথক রাজ্য ঘোষণা করে। তাদের রাজ্যের নাম হয় 'ইস্রায়েল' (the northern kingdom of

১. দ্বিতীয় বিবরণ ৩১/১০-১১।

Isarel)।[১] অবশিষ্ট দুইটি গোত্র : যিহূদা ও বিন্যামিন বংশের রাজা হন শলোমনের পুত্র রহবিয়াম (Rehoboam)। এই রাজ্যের নাম হয় ইহূদা বা জুডাহ (Judah) রাজ্য।

উভয় রাজ্যেই ধর্মদ্রোহিতা, মূর্তিপূজা ও অনাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরের ইস্রায়েল বা শমরীয় রাজ্যের রাজা যারবিয়াম রাজ্যভার গ্রহণ করার পরপরই মোশির ধর্ম ত্যাগ করেন। তাঁর সাথে ইস্রায়েলীয়দের ১০টি গোত্রের মানুষেরা মোশির ধর্ম ত্যাগ করে। তারা মূর্তিপূজা শুরু করেন। এদের মধ্যে যাঁরা তোরাহ-এর অনুসারী ছিলেন তাঁরা নিজেদের রাজ্য পরিত্যাগ করে যুডাহ (যিহূদা) রাজ্যে হিজরত করেন।

এভাবে এই রাজ্য বা ইস্রায়েল সন্তানদের বৃহৎ অংশ এই সময় থেকে পরবর্তী ২৫০[২] বছর এভাবে মোশির ধর্ম ত্যাগ করে অবিশ্বাস, মূর্তিপূজা ও অনাচারের মধ্যে অতিবাহিত করে। এরপর আল্লাহ তাঁদেরকে ধ্বংস করেন। অশুরীয়দের (the Neo-Assyrian Empire) আক্রমণে তারা পরাজিত হয়। বিজয়ী অশুরীয়গণ পরাজিত ইস্রায়েলীয়গণকে বন্দি করে অশুরীয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নির্বাসিত করে। এই এলাকায় অল্পসংখ্যক ইস্রায়েলীয় অবশিষ্ট থাকে। অশুরীয়গণ ইস্রায়েলীয়দেরকে এ সকল অঞ্চল থেকে নির্বাসিত করার পরে সেখানে অশুরীয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে পৌত্তলিকগণকে এনে বসতি স্থাপন করায়। সেখানে অবশিষ্ট অল্প সংখ্যক ইস্রায়েলীয় এ সকল পৌত্তলিকদের সাথে সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। তারা পৌত্তলিকগণের পুত্র কন্যাদেরকে বিবাহ করে এবং তাদের সাথে একত্র পরিবার গঠন করে। এ সকল 'ইস্রায়েলীয়' ইহূদীদেরকে 'শমরীয়' বলা হয়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, উত্তর রাজ্যের ইস্রায়েলীয় বা শমরীয় ইহূদীগণ শলোমনের পর থেকেই ধর্মচ্যুত হয় এবং শেষে পৌত্তলিকদের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। মোশির ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের সাথে তাঁদের সম্পর্ক শুধু নামেই অবশিষ্ট থাকে। ফলে এদের মধ্যে মোশির ধর্মগ্রন্থ 'তোরাহ'-এর কোন পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব 'আনকা' পক্ষীর ন্যায় কাল্পনিক বিষয়ে পরিণত হয়।

অপরদিকে শলোমনের মৃত্যু পর থেকে পরবর্তী ৩৭২ বছর[৩] যাবৎ শলোমনের বংশের ২০ জন রাজা যুডাহ বা যিহূদা রাজ্যে রাজত্ব করেন। এ সকল রাজার মধ্যে

---

১. রাজধানীর নাম হিসাবে একে শমরীয় (Samaria) রাজ্যও বলা হতো।

২. সন-তারিখের বিষয়ে বেশ মতভেদ রয়েছে। আধুনিক গবেষকগণের মতে ইস্রায়েল রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল খৃ. পূ. ৯২২ থেকে ৭২২/৭২১ পর্যন্ত কমবেশি ২০০ বছর। এ সময়ে ১৯ জন রাজা এই রাজ্যে রাজত্ব করেন।

৩. আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, মোশি, দায়ূদ, শলোমন প্রমুখ ভাববাদী ও রাজার সময়কালের বিষয়ে পাশ্চাত্য ধর্মবিদ ও ঐতিহাসিকদের প্রদত্ত তারিখগুলির মধ্যে বৈপরীত্য আছে। লেখক তৎকালে খৃস্টান পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত সন তারিখ ব্যবহার করেছেন। মোটামুটি ঐতিহাসিকগণ একমত যে, খৃ. পূ. ৫৮৭ বা ৫৮৬ সালে যিহূদা রাজ্যের পতন হয়। লেখকের প্রদত্ত তারিখ অনুসারে ৫৮৭+৩৭২=খৃ. পূ. ৫৯৫ সালে শলোমনের মৃত্যু হয়। বর্তমানে প্রসিদ্ধ মত হলো, খৃ. পূ. ৯৩১/৯৩০ সালে শলোমন মৃত্যু বরণ করেন।

বিশ্বাসী ও ধর্মপরায়ণ রাজার সংখ্যা ছিল কম। অধিকাংশ রাজাই ছিলেন ধর্মত্যাগী ও মূর্তিপূজক। প্রথম রাজা রহবিয়ামের যুগ থেকেই মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। প্রতিটি বৃক্ষের নিচে মূর্তি স্থাপন করা হয় এবং পূজা করা হয়। রাজা অহসিয় (Ahaziah)-এর সময়ে বা'ল-প্রতিমার পূজা ও তার উদ্দেশ্যে পশু-উৎসর্গ করার জন্য যিরূশালেমের অলিতে গলিতে ও সকল স্থানে বেদি স্থাপন করা হয়। শলোমনের মন্দির বা ধর্মধামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

রাজা অহসিয়র রাজত্বের পূর্বেই দুই বার যিরূশালেম ও যিরূশালেমের ধর্মধাম বা শলোমনের মন্দির লুণ্ঠিত হয়। প্রথমবারে যুডাহ রাজ্যের প্রথম রাজা রহবিয়ামের রাজত্বকালে, খৃষ্ট পূর্ব ৯২৫ অব্দে মিসরের ফিরাউন ১ম শশাঙ্ক বা শীশক (Shashanq I) যুডাহ রাজ্য আক্রমণ করে যিরূশালেম নগর ও ধর্মধাম লুণ্ঠন করেন। তিনি ধর্মধামের সকল আসবাবপত্র ও রাজপ্রাসাদের সকল মালামাল লুণ্ঠন করে নিয়ে যান।[১]

দ্বিতীয় বারে, প্রথমবারের কিছুদিন পরে, ইস্রায়েল রাজ্যের ধর্মত্যাগী ও মূর্তিপূজক রাজা বাশা (Baasha) যিরূশালেম আক্রমণ করে ধর্মধাম ও রাজপ্রাসাদ ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন করেন।

যিহূদা বা যুডাহ রাজ্যে ধর্মদ্রোহ, মূর্তিপূজা ও অনাচারের ব্যাপকতম প্রসার ও প্রতিষ্ঠা ঘটে রাজা মনঃশি (Manasseh)-এর শাসনামলে (খৃ. পূ. ৬৯৩-৬৩৯ অব্দ)। এ সময়ে এই রাজ্যে প্রায় সকল অধিবাসীই মোশির ধর্ম পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিক ধর্ম গ্রহণ করে। শলোমনের ধর্মধাম বা সদাপ্রভুর মন্দিরের মধ্যেই মূর্তিপূজা ও প্রতিমার জন্য পশু-উৎসর্গ করার নিমিত্ত বেদি নির্মাণ করা হয়। রাজা মনঃশি যে প্রতিমার পূজা করতেন তিনি সদাপ্রভুর মন্দিরের মধ্যে সেই প্রতিমা স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র আমোন (Amon)-এর শাসনামলেও (খৃ. পূ. ৬৩৯-৬৩৮ অব্দ) ধর্মত্যাগ ও পৌত্তলিকতার অবস্থা একইরূপ থাকে।

আমোনের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র যোশিয় (Josiah) আট বছর বয়সে (খৃ. পূ. ৬৩৮ সালের দিকে) যিহূদা রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। তিনি ধর্মদ্রোহিতা ও অনাচার থেকে বিশুদ্ধভাবে তওবা করেন। তিনি ও তাঁর রাজ্যের কর্ণধারগণ ধর্মদ্রোহিতা, পৌত্তলিকতা ও অনাচারকে সমূলে বিনাশ করে মোশির ব্যবস্থা বা শরীয়ত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করেন। তা সত্ত্বেও তাঁর রাজত্বের ১৭শ বছর পর্যন্ত কেউ মোশির তোরাহ-এর কোন পাণ্ডুলিপির চিহ্ন দেখে নি বা এর কোন কথাও কেউ শুনে নি।

যোশিয় রাজার রাজত্বের ১৮শ বছরে (খৃ. পূ. ৬২০/৬২১ সালে) হিল্কিয় মহাযাজক (Hilki'ah the high priest) দাবি করেন যে, তিনি 'সদাপ্রভুর গৃহে', অর্থাৎ যিরূশালেমের ধর্মধাম বা শলোমনের মন্দিরের মধ্যে মোশির তোরাহ বা ব্যবস্থা পুস্তকখানি (the book of the law) পেয়েছেন। তিনি পুস্তকটি শাফন লেখককে

১. ১ রাজাবলি ১৫/২৫-২৬; মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৬।

(Shaphan the scribe) প্রদান করেন। শাফন লেখক রাজা যোশিয়কে পুস্তকটি পাঠ করে শোনান। রাজা এই পুস্তকটির বাক্যাদি শুনে এত বেশি বিমোহিত ও উদ্বেলিত হন যে, তিনি নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছিড়ে ফেলেন। ইস্রায়েলীয়দের অবাধ্যতার কথা স্মরণ করে তিনি এভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন। এ সকল বিষয় ২ রাজাবলির ২২ অধ্যায়ে এবং ২ বংশাবলির ৩৪ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।[১]

তোরাহ বা 'ব্যবস্থা পুস্তক' বলে কথিত এই পাণ্ডুলিপিটির নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা স্বীকৃত নয়। যাজক হিল্কিয়ের দাবিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ রাজা অহসিয়ের পূর্বেই 'সদাপ্রভুর গৃহ' বা ধর্মধামটি ইতোপূর্বে দুইবার বিজয়ী শত্রুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছে। এরপর এই গৃহটিকে প্রতিমা পূজার কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। প্রতিমা- পূজারিগণ প্রতিদিন এই গৃহে প্রবেশ করতেন। এরপর যোশিয় রাজার রাজত্বের প্রথম ১৭টি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। এই দীর্ঘ সময়ে রাজা স্বয়ং ও রাজ্যের নেতৃবর্গ ও সাধারণ প্রজাগণ সকলেই মোশির ব্যবস্থার পালন ও পুন-প্রতিষ্ঠায় প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় নিরত ছিলেন। এত কিছু সত্ত্বেও এই দীর্ঘ সময়ে কেউ তোরাহ বা ব্যবস্থাপুস্তকের নামটি পর্যন্ত শুনতে পেলেন না। এই দীর্ঘ সময়ে 'সদাপ্রভুর' গৃহের রক্ষকও যাজকগণ প্রতিদিন এই গৃহের মধ্যে যাতায়াত করতেন। বড় অবাক কথা যে, এই দীর্ঘ সময় পুস্তকটি সদাপ্রভুর গৃহে থাকবে, অথচ এত মানুষ কেউ তার দেখা পাবে না!

প্রকৃত কথা হলো, এই পুস্তকটি বা ' তোরাহ'-এর এই পাণ্ডুলিপিটি পুরোটিই হিল্কিয় মহাযাজকের উদ্ভাবন ও রচনা ছাড়া কিছুই নয়। তিনি যখন দেখলেন যে, রাজা যোশিয় এবং তাঁর অমাত্যবর্গ সকলেই মোশির ব্যবস্থার প্রতিপালন ও পুনপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহী, তখন তিনি তাঁর যুগে লোকমুখে প্রচলিত সত্য ও মিথ্যা সকল প্রকারের মৌখিক বর্ণনা একত্রিত করে এই পুস্তকটি রচনা করেন। এগুলি সঙকলন ও লিপিবদ্ধ করতেই তাঁর এই দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। যখন সংকলনের কাজ তিনি সমাপ্ত করেন, তখন তিনি পুস্তকটিকে সরাসরি মোশির নামেই চালিয়ে দেন। পাঠক ইতোপূর্বে জেনেছেন যে, ধার্মিকতার প্রচার প্রসার ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য এই ধরনের মিথ্যাচার ও জালিয়াতি শেষ শতাব্দীগুলির ইহূদীগণ এবং প্রথম যুগগুলির খৃস্টানগণের নিকট ধর্মীয় পুণ্যকর্ম বলে গণ্য ছিল।

এই প্রকৃত সত্যটিকে পাশ কাটিয়ে প্রচলিত কাহিনীর ভিত্তিতে আমরা ধরে নিচ্ছি যে, হিল্কিয় মহাযাজক তোরাহ-এর পাণ্ডুলিপিটি পেয়েছিলেন। রাজা যোশিয়ের রাজত্বের ১৮শ বছরে পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায়। পরবর্তী ১৩ বছর, যতদিন রাজা যোশিয় জীবিত ছিলেন, ততদিন যিহূদা বা জুডাহ রাজ্যের ইহূদীগণ এই তোরাহ অনুসারে নিজেদের ধর্মকর্ম পরিচালনা করেন।

১. রাজাবলি ২২/৩-১১; বংশাবলি ৩৪/১৪-১৯।

যোশিয়ের মৃত্যুর পরে (খৃ. পূ. ৬০৮/৬০৯ সালে) তদীয় পুত্র যিহোয়াহস (Jeholahaz) রাজত্ব লাভ করেন। তিনি রাজত্ব লাভ করে যোশির ধর্ম পরিত্যাগ করেন এবং রাজ্যে অবিশ্বাস, ধর্মদ্রোহিতা ও পৌত্তলিকতার প্রসার ঘটান। মিসরের সম্রাট ফরৌণ নখো বা নেকু (Neku) যিহোয়াহসকে বন্দি করে নিয়ে যান এবং তার ভ্রাতা ইলিয়াকীমকে যিহোয়াকীম (Jehoiakim/Joakim) নাম প্রদান পূর্বক সিংহাসনে বসান। যিহোয়াকীমও তার ভাইয়ের মত ধর্মদ্রোহী ও পৌত্তলিক ছিলেন।

যিহোয়াকীমের মৃত্যুর পরে (খৃ. পূ. ৫৯৮/৫৯৭ অব্দে) তাঁর পুত্র যিহোয়াখীন (Jehoiachin/Joachin) রাজত্ব লাভ করেন। তিনিও তার পিতা ও চাচার মতই ধর্মত্যাগী ও পৌত্তলিক ছিলেন। এ সময়ে ব্যাবিলনের সম্রাট বখত নসর বা নেবুকাদনেযার (Nebuchadrezzar II) জুডাহ বা যিহূদা রাজ্য দখল করেন। তিনি যিরূশালেম শহর, রাজপ্রাসাদ ও 'সদাপ্রভুর গৃহ' বা ধর্মধামের সমস্ত ধন-সম্পদ ও দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। তিনি রাজা যিহোয়াখীনকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যান এবং তাঁর পরিবর্তে তাঁর চাচা সিদকিয়কে (Zedekiah) রাজত্ব প্রদান করেন। তিনি বিপুল সংখ্যক ইহূদীকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যান।[১(ক)]

উপরের এ সকল বিষয় থেকে পাঠক জানতে পেরেছেন যে, যোশিয় রাজার পূর্বে তোরাহ্-এর প্রচলন ও ব্যবহার বন্দ হয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে তোরাহ্-এর কোন প্রকারের অস্তিত্বের কথাই জানা যায় না। যোশিয়ের সময়ে যে পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায় তা নির্ভরযোগ্য নয়। বিশেষত এই একটিমাত্র পাণ্ডুলিপির দ্বারা ধারাবাহিক বহুল প্রচলন প্রমাণিত হয় না। তোরাহ্-এর এই পুনর্জন্মও ক্ষণস্থায়ী। মাত্র ১৩ বছরের (খৃ. পূ. ৬২০-৬০৮ সাল) বেশি তা ব্যবহৃত হয় নি। এরপর আর তার কোন খবর জানা যায় না। বাহ্যত বুঝা যায় যে, যোশিয়ের পুত্র-পৌত্রগণের মধ্যে ধর্মদ্রোহিতা ও পৌত্তলিকতার পুনরাবির্ভাবের কারণে যোশিয়ের মৃত্যুর পরে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। যোশিয়ের পূর্বের ও পরের দীর্ঘকালের ধর্মদ্রোহিতা ও পৌত্তলিকতার মধ্যবর্তী সময়ে মাত্র কয়েক বছরের জন্য অস্তিত্ব লাভকারী তোরাহ্-এর অবস্থা ছিল দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার মাঝে ক্ষণস্থায়ী সুস্থতার মত।

যদি একথা ধরে নেওয়া হয় যে, যোশিয়ের সময়ে 'পাওয়া' (অথবা সংকলিত!) তোরাহ্-এর এই পাণ্ডুলিপিটি বা তার প্রতিলিপি যোশিয়ের মৃত্যুর পরে তাঁর ধর্মত্যাগী বংশধরদের নিকট বিদ্যমান ছিল, তবে স্বভাবতই নেবুকাদনেযারের আক্রমণ ও লুণ্ঠনে তা বিনষ্ট হয়েছিল বলে বুঝতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, এটি ছিল নেবুকাদনেযারের প্রথম ঘটনা।

---

১. বাইবেলের ভাষায় : তিনি যিরূশালেমের সমস্ত লোক, সমস্ত প্রধান লোক ও সমস্ত বলবান বীর, অর্থাৎ দশ সহস্র বন্দি এবং সমস্ত শিল্পকার ও কর্মকারকে লইয়া গেলেন; দেশের দীন-দরিদ্র লোক ব্যতিরেকে আর কেহ অবশিষ্ট থাকিল না। ২ রাজাবলি ২৪/১৪।

দ্বিতীয় বিষয় : নেবুকাদনেযার প্রথম আক্রমণ ও লুণ্ঠনের এই ঘটনার সময়ে যাকে যিহূদা (Judah) রাজ্যের রাজত্ব প্রদান করেন, সেই রাজা সিদকিয় (Zedokiah) নেবুকাদনেযারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তখন তিনি (প্রথম ঘটনার প্রায় দশ বছর পরে, খৃ. পূ. ৫৮৭/৫৮৬ সালে) দ্বিতীয়বার যিরূশালেম আক্রমণ ও দখল করেন। তিনি রাজা সিদকিয়কে বন্দি করে তাঁরই সামনে তাঁর পুত্রগণকে জবাই করেন। এরপর তিনি সিদকিয়ের চক্ষু উৎপাটন করেন এবং তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ব্যাবিলন প্রেরণ করেন।

নেবুকাদনেযার-এর বাহিনী এবার যিরূশালেমকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। তারা যিরূশালেমের ধর্মধাম বা 'সদাপ্রভুর গৃহ', রাজ-প্রাসাদসমূহ ও যিরূশালেমের সকল বাড়িঘর ও অট্টালিকা অগ্নিসংযোগ করে ভস্মিভূত করে, যিরূশালেম নগরীর চারিদিকের প্রাচীর ভেঙ্গে দেয় এবং যিহূদা (Judah) রাজ্যে অবস্থানকারী অবশিষ্ট ইস্রায়েল সন্তানকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। কিছু দীন-দরিদ্র, কৃষক ও আঙ্গুর বাগানের কর্মী শুধু সেদেশে বসবাস করতে থাকে।[১]

এটি হলো নেবুকাদনেযারের দ্বিতীয় ঘটনা। এই ঘটনায় তোরাহ এবং পুরাতন নিয়মের অন্যান্য সকল পুস্তক যেগুলি এই ঘটনার পূর্বে লিখিত হয়েছিল সবই চিরতরে পৃথিবীর বুক থেকে বিলীন হয়ে যায়। ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণও একথা একবাক্যে স্বীকার করেন। এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের ১৬শ প্রমাণের আলোচনায় পাঠক তা বিস্তারিত জানতে পেরেছেন।

তৃতীয় বিষয় : ইহূদীদের ধারণা অনুযায়ী প্রায় এক শতাব্দী পরে ইয্রা (Ezra) পুনরায় পুরাতন নিয়মের এ সকল গ্রন্থ নিজের পক্ষ থেকে লিখেন। এই পুনর্জন্ম ও পুনর্লিখনের প্রায় তিন শতাব্দী পরে (খৃ. পূ. ১৬৮ সালের দিকে) সিরিয়ার গ্রীক শাসক চতুর্থ এন্টিয়ক (Antiochus IV Epiphanes c. 215-164 BC)-এর হাতে আবার তা বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই ঘটনা সম্পর্কে বাইবেলের 'সন্দেহজনক পুস্তক' (apocrypha) ম্যাকাবিজের প্রথম পুস্তক (The First Book of Maccabees)-এর প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "যখন ফ্রাঙ্কদের (গ্রীক হেলেনিস্টিক) রাজাধিরাজ এন্টিয়কাস যিরূশালেম অধিকার করলেন, তখন তিনি পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির কপি-পাণ্ডুলিপি যেখানে যা পান তা সবই ছিড়ে টুকরো টুকরো করার পরে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেন। তিনি নির্দেশ প্রদান করেন যে, কোন ব্যক্তির নিকট পুরাতন নিয়মের কোন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বা কপি পাওয়া গেলে অথবা কোন ব্যক্তি মোশির ব্যবস্থার (শরীয়তের) কোন বিধান পালন করলে তাকে হত্যা করতে হবে। প্রতি মাসে অনুসন্ধান করা হতো। কারো নিকট পুরাতন নিয়মের কোন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বা কপি পাওয়া গেলে অথবা কেউ মোশির ব্যবস্থার কোন বিধান পালন করলে তাকে হত্যা করা হতো। আর সেই পাণ্ডুলিপি বা কপিটি বিনষ্ট করা হতো।"

১. রাজাবলি ২৪ অধ্যায়ে এ সকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

এই ঘটনা ঘটেছিল খৃষ্টের জন্মের ১৬১ বছর পূর্বে।[১] সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত এই নিধন ও বিনাশের কর্ম অব্যাহত থাকে। খৃস্টান ঐতিহাসিকগণ এবং ইহূদী ঐতিহাসিক জোসেফাস (Flavius Josephus)-এর পুস্তকে এ সকল ঘটনা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ইয্রা যে তোরাহ লিখেছিলেন তার সকল কপি ও পাণ্ডুলিপি এই ঘটনায় বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের ১৬শ প্রমাণের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, ক্যাথলিক পণ্ডিত জন মিলনার বলেছেন : "ইয্রার মাধ্যমে এ সকল পুস্তকের যে বিশুদ্ধ উদ্ধৃতি প্রকাশ পায়, এন্টিয়ক (Antiochus Epiphanes)-এর ঘটনায় সেগুলিও আবার নিশ্চিহ্ন ও বিলুপ্ত হয়ে যায়।"

এর পরে জন মিলনার বলেন : "এর ফলে পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলির সত্যতা বা বিশুদ্ধতার আর কোন প্রমাণই অবশিষ্ট থাকে না। একমাত্র খৃস্ট ও তাঁর প্রেরিতগণের সাক্ষ্যই এগুলির সত্যতার প্রমাণ।"

পাঠক ইতোমধ্যেই দ্বিতীয় বিভ্রান্তির আলোচনা থেকে খৃস্ট ও তাঁর প্রেরিতগণের সাক্ষ্যের অবস্থা জানতে পেরেছেন।

চতুর্থ বিষয় ঃ এই ঘটনার পরেও ইহূদীগণ আরো অনেক কঠিন বিপদ ও রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন,যে সকল ঘটনায় তাদের নিকট বিদ্যমান ইয্রা লিখিত তোরাহ্-এর পাণ্ডুলিপিগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। এসকল হত্যাযজ্ঞের মধ্যে রয়েছে রোমান যুবরাজ টিটাস (Titus)-এর ঘটনা। রোমান সম্রাট ভেসপাসিয়ান (Vespasian) তাঁর পুত্র (পরবর্তী সম্রাট) টিটাসকে ইহূদীদের দমনের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালান এবং 'সদাপ্রভুর গৃহ' বা ধর্মধাম সম্পূর্ণ গুড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেন। এই ঘটনাটি ঘটে খৃস্টের ঊর্ধ্বারোহণের ৩৭ বছর পরে (৭০ খৃস্টাব্দে)। জোসেফাসের ইতিহাসে ও অন্যান্য ইতিহাসে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই ঘটনায় হত্যা, ক্রুশ, অগ্নিসংযোগ ও অনাহারে যিরূশালেম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ১১ লক্ষ ইহূদী মৃত্যুবরণ করে। ৯৭ হাজার ইহূদীকে বন্দি করে বিভিন্ন দেশে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করে দেওয়া হয়। এছাড়া অন্যান্য এলাকাতেও অনেক ইহূদী এই ঘটনার সময়ে নিহত হয় বা মৃত্যু বরণ করে।

পঞ্চম বিষয় ঃ প্রাচীন খৃস্টানগণ পুরাতন নিয়মের হিব্রু সংস্করণের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করতেন না বরং তাঁরা হিব্রু বাইবেলকে বিকৃত বলে বিশ্বাস করতেন। তারা গ্রীক অনুবাদটিকেই নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করতেন। বিশেষত দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কোনো খৃস্টান হিব্রু বাইবেলের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেনি। উপরন্তু ১ম খৃস্টীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সকল ইহূদী উপাসনালয়েও এই গ্রীক অনুবাদই ব্যবহৃত হতো। এ কারণে হিব্রু বাইবেল-এর পাণ্ডুলিপি বা কপির সংখ্যা ছিল খুবই কম।এই সামান্য

১. অনেকে ঘটনাটি খৃ. পূ. ১৬৮-১৬৪ সালে ঘটেছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

সংখ্যক পাণ্ডুলিপিও শুধু ইহূদীদের নিকটেই ছিল। প্রথম বিভ্রান্তির আলোচনায় তৃতীয় অনুচ্ছেদে পাঠক বিষয়টি জানতে পেরেছেন।

ষষ্ঠ বিষয় ঃ ইহূদীরা ৭ম ও ৮ম খৃষ্টীয় শতকে লিখিত সকল পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে দেয়। কারণ তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য পাণ্ডুলিপির সাথে এগুলির অনেক অমিল ও বৈপরীত্য ছিল। এজন্য আধুনিক যুগের বাইবেল-গবেষকগণের নিকট এ সময়ে লিখিত কোন পাণ্ডুলিপি পৌছায় নি। এ সকল পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট করার পরে তাঁদের পছন্দনীয় পাণ্ডুলিপিগুলিই শুধু অবশিষ্ট থাকে। এভাবে বিকৃতির বিশেষ সুযোগ তাদের সামনে উপস্থিত হয়। উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদের ২০শ বক্তব্যের আলোচনায় পাঠক তা জানতে পেরেছেন।

সপ্তম বিষয় ঃ প্রথম প্রজন্মগুলিতে খৃস্টানদের অবস্থাও ছিল শোচনীয়। ফলে তাঁদের মধ্যে বাইবেলের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল খুবই কম এবং বিকৃত-ইচ্ছুকদের জন্য সেগুলির মধ্যে বিকৃতির সুযোগ ছিল অনেক। খৃস্টধর্মের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ৩০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত খৃস্টানগণ কঠিন বিপদাপদ ও রাষ্ট্রীয় অত্যাচার-নিপীড়নের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছে। তারা দশটি রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞের সম্মুখীন হয়।

প্রথমবারঃ রোমান সম্রাট নিরো (Nero)-এর সময়ে ৬৪খৃস্টাব্দে।এ সময়ে খৃষ্টের প্রেরিত শিষ্য পিতর ও তাঁর স্ত্রী নিহত হন।[১]

এ সময়ে রাজধানী রোমে ও অন্যান্য সকল প্রদেশে হত্যাযজ্ঞ চালানে হয়। (৬৮ খৃস্টাব্দে) তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। খৃস্টধর্মের স্বীকৃতিই খৃস্টানগণের জন্য কঠিন অপরাধ বলে গণ্য ছিল।

দ্বিতীয়বার ঃ রোমান সম্রাট ডোমিশিয়ান (Domitian)-এর রাজত্বকালে (৮১-৯৬ খৃ.)। এই সম্রাটও নিরোর ন্যায় খৃস্টধর্মের শত্রু ছিলেন। তিনি খৃস্টানদের হত্যার নির্দেশ দেন। ফলে সর্বত্র খৃস্টানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা শুরু হয়। এমনকি পৃথিবী থেকে সর্বশেষ খৃস্টানকেও নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা হয়। এ সময়ে প্রেরিত যোহনকে নির্বাসিত করা হয় এবং ফ্লাবিয়াস ক্লিমেন্টকে হত্যা করা হয়।

তৃতীয়বারঃ রোমান সম্রাট ট্রাজান (Trajan)-এর রাজত্বকালে ১০১ খৃস্টাব্দে এই হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। পরবর্তী ১৮ বছর যাবত তা অব্যাহত থাকে। এই সময়ে প্রসিদ্ধ যে সকল ব্যক্তিদের হত্যা করা হয় তাদের মধ্যে রয়েছেন করীন্থের (এন্টিয়কের) ২য় বিশপ ইগনাটিয়াস (Ignatius),রোমের ৩য় বিশপ ক্লিমেন্ট (Clement) এবং যিরূশালেমের ২য় বিশপ শীমোন (Symeon)।

চতুর্থবার ঃ রোমান সম্রাট মারকাস অরেলিয়াস এন্টোনিনাস (Marcus Aurelius Antoninus)-এর রাজত্বকালে। ১৬১ খৃস্টাব্দে এই সর্বাত্মক নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। ১০ বছরেরও বেশি সময় তা অব্যাহত থাকে। পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র একভাবে

১. আধুনিক খৃস্টধর্মের প্রবর্তক সাধু পৌলও এ সময়ে নিহত হন।

খৃস্টানদেরকে হত্যা করা হয়। এই সম্রাট দার্শনিক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং পৌত্তলিক রোমান ধর্মের গোঁড়া অনুসারী ছিলেন।

পঞ্চমবার ঃ রোমান সম্রাট সিভেরাস (Septimius Severus)-এর শাসনামলে (১৯৩-২১১ খৃ.)। ২০২ খৃস্টাব্দ থেকে এই হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। এ সময়ে মিসরে, ফ্রান্সে ও কার্থেজে হাজার হাজার খৃস্টানকে হত্যা করা হয়। এই পাইকারী হত্যাযজ্ঞের নির্মমতা ছিল এত ভয়ানক যে, তখনকার খৃস্টানগণ মনে করেন যে, খৃস্টারি (আল-দাজ্জাল) বা পাপ পুরুষ (Antichrist, Man of Sin)-এর যুগ এসে গেছে বা কেয়ামত সন্নিকটে।

ষষ্ঠবার : রোমান সম্রাট ম্যাক্সিমিনের (Maximin)-এর সময়ে। ২৩৭ খৃস্টাব্দে এই হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। সম্রাটের নির্দেশক্রমে অধিকাংশ ধর্মগুরু ও পণ্ডিতকে হত্যা করা হয়। কারণ তাঁর ধারণা ছিল যে, ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণকে হত্যা করলে সাধারণ মানুষেরা অতি সহজেই তাঁর আনুগত্য করবে। এই হত্যাযজ্ঞের সময়ে পোপ (রোমের বিশপ) পন্টিয়ানাস (Pontianus) ও পোপ এন্টিরোস (Anteros)[১]-কে হত্যা করা হয়।

সপ্তমবার : রোমান সম্রাট ডেসিয়াস (Decius)-এর সময়ে। ২৫৩ খৃস্টাব্দে এই পাইকারী হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। এই সম্রাট সিদ্ধান্ত নেন যে, সকল খৃস্টানকে হত্যা করে তিনি খৃস্ট ধর্মকে সমূলে বিনাশ করবেন। এ জন্য তিনি তাঁর রাজ্যের সকল আঞ্চলিক প্রশাসককে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন। এ সময়ে কিছু খৃস্টান ধর্মত্যাগ করে। মিসর, আফ্রিকা, ইটালি, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়া মাইনর ছিল তাঁর এই পাইকারী নিধনযজ্ঞের কেন্দ্রবিন্দু।

অষ্টমবার : রোমান সম্রাট ভ্যালেরিয়ান (Valerian/Valerianus)-এর সময়ে ২৫৭ খৃস্টাব্দে। এ সময়ে হাজার হাজার খৃষ্টানকে হত্যা করা হয়। এরপর তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করেন যে,সকল বিশপ ও ধর্মযাজককে হত্যা করতে হবে, সকল সম্মানীয় খৃস্টানকে লাঞ্ছিত করতে হবে এবং তাঁদের ধন-পম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে। সম্মানীয় মহিলাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং তাঁদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। অন্যান্য সাধারণ খৃষ্টানদেরকে বন্দি করে ক্রীতদাস বানাতে হবে। তাঁদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাষ্ট্রের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

নবমবার : রোমান সম্রাট অরেলিয়ান (Aurelian/ Aurelianus)-এর সময়ে। ২৭৪ খৃস্টাব্দে এই নিধনযজ্ঞ শুরু হয়। সম্রাট এই মর্মে ফরমান জারি করেন। তবে এবারের নিধনযজ্ঞ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ বছরখানেক পরে সম্রাট নিজেই নিহত হন।

দশমবার: রোমান সম্রাট ডিওক্লেশিয়ান (Diocletion/ Diocletianus) ও Maximian/ Maximianus-এর শাসনামলে। ৩০২ খৃস্টাব্দে এই মহা-নিধনযজ্ঞ শুরু হয়। রোমান রাজ্যের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্র পাইকারী হারে খৃস্টানদের হত্যা করা হয়। ফ্রিজিয়া শহরকে একবারে এমনভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হয় যে, সেখানে একজন খৃস্টানও অবশিষ্ট থাকেনি।

১. রোমের ১৭শ বিশপ বা পোপ।

খৃস্টানগণ ঘটনাগুলির যেরূপ বিবরণ দিয়েছেন তা যদি সত্য হয় তবে কখনোই কল্পনা করা যায় না যে, এ সময়ে খৃস্টানদের মধ্যে বাইবেলের অনেক কপি বিদ্যমান বা প্রচলিত ছিল। একথাও চিন্তা করা যায় না যে, তাঁরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে, বিশুদ্ধ রাখতে ও এ বিষয়ে গবেষণা পর্যালোচনা করতে পেরেছেন; বরং এ সময় ছিল বিকৃতিকারীদের জন্য বাইবেল বিকৃত করার সুবর্ণ সুযোগ। তারা ইচ্ছামত বিকৃতি ও জালিয়াতি করার অনেক সুযোগ পেয়েছিল। আর প্রথম বিভ্রান্তির আলোচনায় পাঠক জেনেছেন যে, খৃস্টীয় প্রথম শতকে খৃস্টানদের মধ্যে বিভ্রান্ত দল উপদলের সংখ্যা ছিল অনেক এবং তারা সকলেই বাইবেল বিকৃত করত।

অষ্টম বিষয় : রোমান সম্রাট ডিওক্লেশিয়ান (Diocletian/Diocletianus) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, পৃথিবীর বুক থেকে বাইবেলের অস্তিত্ব মুছে দেবেন। এ জন্য তিনি অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে চেষ্টা করেন। ৩০৩ খৃস্টাব্দে তিনি সকল চার্চ-গীর্জা ভেঙে ফেলার ও সকল ধর্মপুস্তক পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি খৃস্টানদের উপাসনার জন্য একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ করে দেন। তাঁর নির্দেশানুসারে সকল গীর্জা ভেঙে ফেলা হয় এবং ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে যত প্রকারের ধর্মীয় পুস্তক পাওয়া যায় তা সবই পুড়িয়ে ফেলা হয়। যে ব্যক্তি এই নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানায় বা যে ব্যক্তি কোন ধর্মীয় পুস্তক গোপন করে রেখেছে বলে সন্দেহ করা হয় তাকে নির্মমভাবে শাস্তি প্রদান করা হয়। খৃস্টানগণের উপাসনার জন্য সমবেত হওয়া বন্দ করে দেন। এ সকল বিষয় খৃস্টান পণ্ডিতগণের লিখিত ইতিহাসে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

লর্ডনার তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৭ম খণ্ডের ৫২২ পৃষ্ঠায় বলেন : "ডিওক্লেশিয়ানের রাজ্যভার গ্রহণের ১৭শ বছরে (৩০২ খৃস্টাব্দের) মার্চ মাসে তিনি রাজকীয় ফরমান জারী করেন যে, চার্চ ও গীর্জাগুলি ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং বাইবেল বা পবিত্র-পুস্তকগুলি পুড়িয়ে ফেলতে হবে।"

এরপর তিনি বলেন : "ইউসেবিয়াস (Eusebius) অত্যন্ত বেদনার সাথে লিখেছেন যে, তিনি নিজে স্বচক্ষে গীর্জাগুলি ভেঙে ফেলতে এবং বাইবেল বা পবিত্র পুস্তকগুলিকে বাজারের মধ্যে পুড়িয়ে ফেলতে দেখেছেন।"

আমি এ কথা বলছি না যে, এই ধ্বংসযজ্ঞের কারণে বাইবেলের সকল কপি বা পাণ্ডুলিপি পৃথিবীর বুক থেকে বিলীন হয়ে যায়। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই ধ্বংসযজ্ঞের ফলে বাইবেলের খুব কম সংখ্যক পাণ্ডুলিপিই অবশিষ্ট থাকে।[১] অনেক

১. এখানে লক্ষ্যণীয় যে, প্রাচীন খৃস্টানগণ কখনোই 'বাইবেল'-কে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করত না। কখনোই বাইবেল গণ-পুস্তক ছিল না। শুধু পাদ্রী, বিশপ বা ধর্মগুরু ছাড়া সাধারণ খৃস্টানগণ কখনোই বাইবেল পাঠ, অনুধাবন ইত্যাদির চেষ্টা করে নি বরং সর্বদাই বাইবেলকে সাধারণের নাগালের ঊর্ধ্বে রাখা হয়েছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে পাদ্রীরাই শুধু বাইবেল থেকে কিছু সামান্য অংশ পাঠ করে থাকেন। এ জন্য মূলতই 'বাইবেলের' কপি বা পাণ্ডুলিপি খুব কমই ছিল। এ সকল নিধনযজ্ঞের কারণে তা প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। এই অতি নগণ্য সংখ্যক 'বাইবেল' বা পবিত্র পুস্তক ছিল বিভিন্ন দলের নিকট বিভিন্ন প্রকারের।

বিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ, প্রথম তিন শতকে মূলত রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশেই খৃস্টধর্ম প্রচারিত হয়। এজন্য এসকল দেশেই সর্বাধিক খৃস্টান বাস করত। রোমান সাম্রাজ্যের বাইরে বসবাসকারী খৃস্টানের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে এই নিধনযজ্ঞের ফলে বাইবেলের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা অতি নগণ্য হয়ে যায় এবং এতে বিকৃতি খুবই সহজ হয়ে পড়ে।

শুধু তাই নয়, কিছু পুস্তক একেবারে বিলীন ও অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়াও কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। একথা মোটেও অসম্ভব নয় যে, মূল পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট হওয়ার পরে শুধু পুস্তকটির নামই পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে সেই নামে জাল পুস্তক লিখে চালানো হয়েছে। প্রথম বিভ্রান্তির আলোচনায় তৃতীয় অনুচ্ছেদের ২০শ বক্তব্য থেকে পাঠক জানতে পেরেছেন যে, মুদ্রণ-যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে এইরূপ জালিয়াতি ও বিকৃতি খুবই সম্ভব ছিল। সেখানে পাঠক দেখেছেন যে, ইহুদীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে ৮ম শতাব্দীতে লেখা কপিগুলি নষ্ট করে দিয়েছিল; কারণ সেগুলি তাদের পছন্দসই কপিগুলির বিপরীত ছিল।

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : "টিশেনের নামে প্রচলিত ব্যাখ্যাগ্রন্থটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।[১] বর্তমানে তাঁর নামে প্রচলিত ব্যাখ্যাগ্রন্থটির বিশুদ্ধতার বিষয়ে পণ্ডিতগণ সন্দেহ করেন। তাঁদের সন্দেহ সঠিক।"

ওয়াটসন তাঁর পুস্তকের ৩য় খণ্ডে বলেন : "টিশেনের নামে প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলি (চতুর্থ শতাব্দীর ধর্মগুরু) থিওডোর (Theodore of Mopsuestia c. 350 428/429)-এর সময়েও বিদ্যমান ছিল। তখন এই ব্যাখ্যা সকল চার্চ ও গীর্জায় পঠিত হতো। কিন্তু থিওডোর সেগুলি বিনষ্ট করে দেন যেন সুসমাচারসমূহ সেগুলির স্থান দখল করতে পারে।"

পাঠক লক্ষ্য করুন, কিভাবে একটি সুপ্রচলিত ভাষ্যগ্রন্থ থিওডোরের প্রচেষ্টায় একেবারে বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হয়ে গেল। এরপর খৃস্টানগণ বিলুপ্ত গ্রন্থটির বদলে সেই নামে একটি জাল গ্রন্থ তৈরি করে ফেললেন।

নিঃসন্দেহে ইহুদীদের চেয়ে রোমান সাম্রাজ্যের প্রতাপশালী রাজাধিরাজ ডিওক্লেশিয়ানের ক্ষমতা অনেক বেশি ছিল। এছাড়া সময়ের দিক থেকেও সম্রাটের সুযোগ ছিল বেশি। কারণ ইহুদীরা যে সময় বাইবেলের পাণ্ডুলিপিগুলি বিনষ্ট করেছিল, তার চেয়েও আগের সময়ে সম্রাট ডিওক্লেশিয়ান বাইবেলের পাণ্ডুলিপিগুলি বিনষ্ট

১. সম্ভবত লেখক এখানে দ্বিতীয় শতাব্দীর সিরীয় খৃস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরু Tatian/Tatianos (c. 120-173)-এর কথা বলছেন। তাঁর সম্পাদিত The Diatessaron পুস্তকটি প্রচলিত চার সুসমাচারের প্রাচীনতম সংকলন ও সম্পাদন বলে গণ্য। পরবর্তী প্রায় ৩০০ বছর যাবৎ সিরীয় চার্চগুলিতে তা ব্যবহার করা হতো। তাঁর ধর্মমতের সাথে পরবর্তী মূলধারার খৃস্টানদের অমিল হওয়াতে তাঁকে ধর্মত্যাগী (heretic) বলে গণ্য করা হয় এবং তাঁর পুস্তকটিকে বিনষ্ট করা হয়।

করেছিলেন। অনুরূপভাবে পণ্ডিত থিওডোরের চেয়ে সম্রাট ডিওক্লেশিয়ানের ক্ষমতা নিঃসন্দেহে বেশি ছিল। কাজেই এ কথা মোটেও অবাস্তব বা অসম্ভব নয় যে, সম্রাট ডিওক্লেশিয়ান ও তৎপূর্ববর্তী যে সকল মহা-ক্ষমতাধর সম্রাটদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও নির্মম নিধনযজ্ঞের মাধ্যমে নতুন নিয়মের কিছু পুস্তক চিরতরে বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এরপর পরবর্তীকালে সেগুলির নামে জাল ও বানোয়াট পুস্তক রচনা করে প্রচার করা হয়েছে, যেমনটি তাঁরা করেছেন উপর্যুক্ত 'টিশেনের' ব্যাখ্যাগ্রন্থটির ক্ষেত্রে। আর এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটির বিলুপ্তির কারণে এর জাল কপি তৈরির আগ্রহের চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহ ছিল তাদের বিলুপ্ত সুসমাচারের জাল কপি তৈরি করার। আর তাদের মধ্যে প্রচলিত কথার ভিত্তিতে তারা জানতেন যে, এইরূপ জালিয়াতি একটি ভাল কাজ ও নেককর্ম। প্রথম বিভ্রান্তির আলোচনায় তৃতীয় অনুচ্ছেদের ৬ষ্ঠ বক্তব্যে পাঠক তা জানতে পেরেছেন।

উপরে উল্লিখিত আটটি বিষয়ের কারণে ইহুদী-খৃস্টানগণের নিকট থেকে তাদের ধর্মগ্রন্থগুলির অবিচ্ছিন্ন সূত্র-পরম্পরা বা বিশুদ্ধতার প্রমাণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়মের কোন একটি পুস্তকেরও লেখক থেকে কোন অবিচ্ছিন্ন সূত্র-পরম্পরা তাদের নিকট সংরক্ষিত নেই। ইহুদীগণের নিকটেও নেই এবং খৃস্টানগণের নিকটেও নেই। পাঠক ইতোপূর্বে এ বিষয়ে কিছু কথা জেনেছেন। আমরা বারংবার বড় বড় পাদ্রী-বিশপকে এই জাতীয় সূত্র উল্লেখ করতে বলেছি, কিন্তু তাঁরা তা করতে সক্ষম হন নি। আমার সাথে প্রকাশ্যে বিতর্ক সভায় কোন কোন পাদ্রী (মি. ফানডার ও মি. ফ্রেঞ্চ) একথা বলে ওজরখাহি পেশ করেন যে, এ সকল গ্রন্থের সূত্র বা সনদ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। খৃস্টধর্মের শুরু থেকে ৩১৩ বছর পর্যন্ত আমাদের উপর যে জুলুম-অত্যাচার হয়েছিল তার ফলে এই গ্রন্থগুলির সনদ বা সূত্র-পরম্পরার বিবরণ আমাদের নিকট থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

আমরা খৃস্টানদের নিকট সংরক্ষিত সূত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলী গভীরভাবে অনুসন্ধান করে দেখেছি যে, ধারণা ও অনুমান ছাড়া তাদের কোন প্রকার সূত্র (chain of authorities) নেই। এই প্রকারের ধারণা ও অনুমান দ্বারা কোন সূত্র বা বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় না।

৫ম বিভ্রান্তি : মুহাম্মাদ (সা)-এর পূর্বে লেখা পাণ্ডুলিপি

তাঁরা দাবি করেন যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগেরও আগের লেখা বাইবেলের কিছু পাণ্ডুলিপি খৃস্টানদের নিকট সংরক্ষিত রয়েছে। এ সকল প্রাচীন পাণ্ডুলিপি বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলের অনুরূপ।

তাঁদের এই বিভ্রান্তির বিষয়ে আমার বক্তব্য হলো, তাঁরা এখানে দুইটি বিষয় দাবি করেছেন। প্রথমত তাঁরা দাবি করেছেন যে, এ সকল পাণ্ডুলিপি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগের পূর্বের লেখা। দ্বিতীয়ত তাঁরা দাবি করেছেন যে, এ

সকল পাণ্ডুলিপি বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলের অনুরূপ। তাঁদের এই দুইটি দাবিই অসত্য। নিম্নের তাঁদের এই দাবির বিভিন্ন দিক আমরা আলোচনা করছি।

ক. হিব্রু বাইবেলের কোন পাণ্ডুলিপিই ৯/১০ শতকের পূর্বের নয়

তাদের প্রথম দাবিটি সঠিক নয়। কারণ পাঠক ইতোপূর্বেই প্রথম বিভ্রান্তির আলোচনায় তৃতীয় অনুচ্ছেদের ২০শ বক্তব্য থেকে জানতে পেরেছেন যে, পুরাতন নিয়মের হিব্রু সংস্করণের বা মূল হিব্রু বাইবেলের ৭ম বা ৮ম শতকে লেখা কোন পাণ্ডুলিপি বর্তমান কালে বাইবেল গবেষকগণের নিকট নেই বরং পুরাতন নিয়মের মূল হিব্রু সংস্করণের ক্ষেত্রে দশম খৃস্টীয় শতকের পূর্বে লেখা কোন পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি বর্তমান যুগের গবেষকদের নিকট পৌছে নি। কেনিকট (Benjamin Kennicott) প্রাচীন যে পাণ্ডুলিপিটির সন্ধান পান তার নাম কোডেক্স লাডিয়ানুস (Codex Laudianus) বা লাউডের পাণ্ডুলিপি। তিনি বলেছেন যে, এই পাণ্ডুলিপিটি ১০ম শতাব্দীতে লিখিত। মোশিয়ে ডি রোশি (Giovanni Bernado De Rossi) বলেছেন যে, পাণ্ডুলিপিটি ১১শ শতাব্দীতে লিখিত। ওয়াভারহট যখন পূর্ণ সংশোধন-পরিমার্জনের দাবিসহ হিব্রু বাইবেল মুদ্রণ করেন তখন তিনি ১৪,০০০ স্থানে এই পাণ্ডুলিপিটির বিরোধিতা করেন। শুধু তোরাহ-এর মধ্যেই ২,০০০ স্থানে তিনি এই পাণ্ডুলিপিটির বিরোধিতা করেন। তাহলে দেখুন এই পাণ্ডুলিপিটির মধ্যে ভুলের পরিমাণ কত!

খ. গ্রীক অনুবাদের পাণ্ডুলিপিগুলির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত নয়

এতো গেল মূল হিব্রু বাইবেলের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির অবস্থা। আর গ্রীক অনুবাদের পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে ৩টি পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত প্রাচীন বলে ইহুদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ দাবি করে থাকেন। এগুলি হলো : (১) আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপি বা কোডেক্স আলেকজান্দ্রীনাস (Codex Alexandrinus); (২) ভ্যাটিকানের পাণ্ডুলিপি বা কোডেক্স ভ্যাটিকানাস (Codex Vaticanus) ও (৩) সিরীয় ইফ্রিয়ামের পাণ্ডুলিপি (Codex Ephraemi Syrire scriptus)।[১]

প্রথম পাণ্ডুলিপিটি (Codex Alexandrinus) লন্ডনে সংরক্ষিত। বাইবেল-গবেষক ও সংশোধনকারিগণ এই পাণ্ডুলিপিটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেন। এই পাণ্ডুলিপিটি ১নং (A) হিসাবে চিহ্নিত।

দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটি (Codex Vaticanus) ইটালির রোম শহরে (ভ্যাটিকানো লাইব্রেরিতে) সংরক্ষিত। বাইবেল গবেষক ও সংশোধনকারিগণ এই পাণ্ডুলিপিটিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে রেখেছেন। এটিকে ২নং (B) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১. এখানে লক্ষ্যণীয় যে, এ সকল পাণ্ডুলিপির সবগুলিই বর্তমান যুগে বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়েছে। এর সঠিক ইতিহাস কেউই জানেন না। এগুলির বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই গবেষকদের গবেষণা বা আন্দাজ-অনুমান।

তৃতীয় পাণ্ডুলিপিটি (Codex Ephraemi) প্যারিসে সংরক্ষিত রয়েছে। এই পাণ্ডুলিপিটির মধ্যে শুধু নতুন নিয়মের পুস্তকগুলিই রয়েছে। পুরাতন নিয়মের একটি পুস্তকও এই পাণ্ডুলিপিটিতে নেই। এখানে এই 'প্রাচীনতম' পাণ্ডুলিপি-ত্রয়ের অবস্থা বর্ণনা করা আবশ্যক।

১. আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপি (Codex Alexandrinus)

আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলেন: "এই পাণ্ডুলিপিটি ৪টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম তিনটি খণ্ডে পুরাতন নিয়মের সত্য ও মিথ্যা পুস্তকগুলি রয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে নতুন নিয়মের পুস্তকগুলি রয়েছে। এগুলির সাথে আছে করিন্থীয়দের প্রতি ক্লিমেন্টের প্রথম পত্র (I and II Clement) এবং শলোমনের নামে প্রচারিত মিথ্যা গীতসংহিতা।"

অতঃপর তিনি বলেন: "এই মিথ্যা গীতসংহিতাটির পূর্বে চতুর্থ খৃস্টীয় শতকের আলেকজান্দ্রীয় বিশপ এথানাসিয়াস (Athanasius)-এর একটি পত্র বা পুস্তিকা রয়েছে। আর গীতসংহিতাটির পরে দিনে রাতে প্রতি ঘণ্টায় কি প্রার্থনা পাঠ করতে হবে তার তালিকা রয়েছে। আরো রয়েছে ১৪টি ধর্মবিশ্বাসীয় 'গীত', তন্মধ্যে ১১শ গীতে মরিয়মের গুণকীর্তন করা হয়েছে। এগুলির কিছু মিথ্যা ও জাল, আর কিছু সুসমাচারগুলি থেকে নেওয়া। গীতগুলির উপরে ইউসেবিয়াসের প্রমাণপঞ্জি লেখা রয়েছে। আর সুসমাচারগুলির উপরে তার নিয়মকানুনগুলি লেখা রয়েছে।

কেউ কেউ এই পাণ্ডুলিপিটির অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। আবার কেউ কেউ এর খুব নিন্দা করেছেন। এই পাণ্ডুলিপিটির বিশুদ্ধতার যাঁরা বিরোধিতা করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন (১৮শ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ সুইজারল্যাণ্ডীয় বাইবেল বিশেষজ্ঞ ও বাইবেল সম্পাদক) ওয়েটস্টেইন (J.J. Wettstein)।

এই পাণ্ডুলিপিটির প্রাচীনত্বের বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। গ্রীপ ও শোলয বলেন: 'সম্ভবত এই পাণ্ডুলিপিটি ৪র্থ শতকের শেষে লেখা হয়েছে'। মিকাইলস বলেন: 'চতুর্থ শতাব্দীর শেষ প্রান্তই এই পাণ্ডুলিপির প্রাচীনত্বের শেষ সীমা। এর পূর্বে তা লিখিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ এথানাসিয়াসের পত্রটি এর মধ্যে রয়েছে'। এডোন মনে করেন যে, পাণ্ডুলিপিটি ১০ম শতকে লেখা হয়েছে। ওয়েটস্টেইন বলেন: পাণ্ডুলিপিটি ৫ম শতকে লেখা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, 'সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করার জন্য ৬১৫ খৃস্টাব্দে যে সকল পাণ্ডুলিপি জমা করা হয়েছিল, সম্ভবত এই পাণ্ডুলিপিটি সেগুলির একটি'। ড. স্মিলার মনে করেন যে, পাণ্ডুলিপিটি ৭ম শতকে লেখা হয়েছিল।

প্রাচীন গ্রীক লিপি ও পাণ্ডুলিপির অন্যতম বিশেষজ্ঞ ফরাসী পণ্ডিত মন্টফ্যাকন (Montfaucon, Bernard de, c 1655-1741) বলেন: 'আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপি বা অন্য

কোন পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রেই একথা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় যে, তা ৬ষ্ঠ শতকের পূর্বে লেখা হয়েছে'। মিকাইলস বলেন : 'মিসরীয়দের ভাষা আরবীতে রূপান্তরিত হওয়ার পরে এই পাণ্ডুলিপিটি লেখা হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানদের মিসর দখলের ১০০ বা ২০০ বছর পরে পাণ্ডুলিপিটি লেখা হয়েছে। কারণ এই পাণ্ডুলিপিটির লেখক অনেক স্থানে 'বা' কে 'মীম' দ্বারা পরিবর্তন করেছেন এবং এর উল্টোটিও করেছেন। আরবী ভাষাতেও এইরূপ পরিবর্তন ঘটেছে। এতদ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন যে, এই পাণ্ডুলিপিটি ৮ম শতকের পূর্বে লেখা হতে পারে না।

ওয়াইড মনে করেন যে, পাণ্ডুলিপিটি ৪র্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বা শেষ সময়ে লেখা হয়েছে। এই সময়ের পূর্বে পাণ্ডুলিপিটি লেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এ ছাড়া এতে ইউসেবিয়াসের নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ রয়েছে। স্পাইন ওয়াইডের প্রমাণাদির বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেছেন।

যাঁরা পাণ্ডুলিপিটি ৪র্থ বা ৫ম শতকের লিখিত বলে দাবি করেছেন তাঁদের দলিলগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত, এতে পৌলের পত্রগুলিকে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয় নি। ৩৯৬ খৃষ্টাব্দ থেকে এই বিভক্তিকরণ চালু হয়।

দ্বিতীয়ত, এই পাণ্ডুলিপিটির মধ্যে ক্লিমেন্টের পত্রাবলি রয়েছে। লোডেশিয়া সম্মেলন (৩৬৪ খৃ) ও কার্থেজ সম্মেলনে (৩৯৭ খৃ) ক্লিমেন্টের পত্রাবলি পাঠ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এদ্বারা শোলয প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, এই পাণ্ডুলিপিটি ৩৬৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লেখা হয়েছে।

তৃতীয়ত, শোলয অন্য একটি নতুন দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেন, ধর্মবিশ্বাসীয় 'গীত'গুলির মধ্যে ১৪ নং গীতটির মধ্যে কিছু পংক্তি নেই, যেগুলি ৪৪৪ খৃষ্টাব্দে ও ৪৪৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিল। এতে বুঝা যায় যে, এই পাণ্ডুলিপিটি এই সময়ের পূর্বে লেখা হয়েছে।

ওয়েটস্টেইন ধারণা করেছেন যে, পাণ্ডুলিপিটি পঞ্চম শতকে সেন্ট জিরোম (St. Jerome)-এর সময়ে লেখা হয়েছে। কারণ এতে গ্রীক পাঠকে প্রাচীন ইটালীয় ভাষায় পরিবর্তিত করা হয়েছে। এই পাণ্ডুলিপির লেখক জানতেন না যে, আরবদেরকে 'হাক্কারীন' বলা হতো। এজন্য তিনি 'আকারাও'-এর পরিবর্তে 'আকুরাও' লিখেছেন। অন্যান্য গবেষক তাঁর এই প্রমাণটি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, এটি লিপিকারের ভুল ছাড়া কিছুই নয়। কারণ অন্যত্র 'আকারোন' সঠিকভাবেই লেখা হয়েছে।

মিকাইলস বলেন, এ সকল দলিল দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। কারণ বর্তমানে বিদ্যমান এই পাণ্ডুলিপিটি নিঃসন্দেহে অন্য কোন পূর্ববর্তী পাণ্ডুলিপি বা পুস্তক থেকে অনুলিপিকৃত। আমরা যদি ধরে নিই যে, এই পাণ্ডুলিপিটি খুব যত্ন সহকারে লেখা হয়েছিল, তবে বুঝা যাবে যে, এই পাণ্ডুলিপির লেখক যে কপি বা পুস্তকের উপর নির্ভর

করেছিলেন সেই পুস্তকের মধ্যে এই বিষয়গুলি বিদ্যমান ছিল।[১] হ্যাঁ, লিপিপদ্ধতি, বর্ণগুলির আকৃতি, স্বরচিহ্নের বা বিভক্তিচিহ্নের অনুপস্থিতি ইত্যাদির মাধ্যমে কিছু বিষয় প্রমাণ করা যেতে পারে।

যারা পাণ্ডুলিপিটি ৪র্থ শতকের পরে লেখা বলে দাবি করেন তাঁদের দলিল-প্রমাণাদি

৩. স্কিলার-এর মত হলো, "জাল গীতগুলির প্রশংসায় এথানাসিয়াস (Athanasius) -এর লেখা পত্রটি এই পাণ্ডুলিপির মধ্যে রয়েছে। এ কথা কখনোই সম্ভব নয় যে, তাঁর জীবদ্দশায় (চতুর্থ শতকে) এই পত্রটি বাইবেলের মধ্যে ঢোকানো হবে। এ দ্বারা এডোন প্রমাণ করেছেন যে, এই পাণ্ডুলিপিটি ১০ম শতাব্দীতে লেখা হয়েছে। কারণ এই পত্রটিই জাল। এথানাসিয়াসের জীবদ্দশায় তাঁর নামে জাল পত্র লেখা মোটেও সম্ভব নয়। এই প্রকারের জালিয়াতি ১০ম শতকে খুবই জোরদার ছিল।"

২. ভ্যাটিকানীয় পাণ্ডুলিপিটি (Codex Vaticanus)

ভ্যাটিকানীয় পাণ্ডুলিপির বিষয়ে হর্ন তাঁর পুস্তকের একই খণ্ডে বলেন : "১৫৯০ খৃস্টাব্দে যে গ্রীক অনুবাদটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় তার ভূমিকায় লেখা হয়েছে : 'এই পাণ্ডুলিপিটি ৩৮৭ খৃস্টাব্দের পূর্বে লিখিত', অর্থাৎ চতুর্থ শতকের শেষভাবে লিখিত। মন্টফ্যাকন (Montfaucon) ও ব্লিনগেনি বলেন : '৫ম অথবা ৬ষ্ঠ শতকে পাণ্ডুলিপিটি লিখিত।' ডেবিন বলেন : '৭ম শতকে পাণ্ডুলিপিটি লিখিত।' হেগ বলেন : '৪র্থ শতকের প্রথম দিকে পাণ্ডুলিপিটি লিখিত।' মার্শ বলেন : '৫ম শতকের শেষভাগে।' আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপি ও ভ্যাটিকানীয় পাণ্ডুলিপির পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকাবলির মধ্যে যত বৈপরীত্য দেখা যায় এত বৈপরীত্য আর কোন দুইটি কপির মধ্যে দেখা যায় না।"

অতঃপর তিনি বলেন : "কেনিকট (Benjamin Kennicott) প্রমাণ করেছেন যে, এই পাণ্ডুলিপিটি এবং অনুরূপভাবে আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপিটি (তৃতীয় শতকের আলেকজান্দ্রীয় ধর্মগুরু) ওরিগন (origen)-এর পাণ্ডুলিপি থেকে অনুলিপি করা হয় নি। এমনকি ওরিগনের পাণ্ডুলিপি দেখে লেখা কোন পাণ্ডুলিপি থেকেও তা অনুলিপি করা হয় নি বরং যে যুগে ওরিগনের চিহ্নগুলি পরিত্যগ করা হয়, অর্থাৎ ওরিগনের যুগের অনেক পরের যুগে এই পাণ্ডুলিপিটি লেখা হয়।"

---

১. অর্থাৎ 'আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপির' লেখক নিজে অনুবাদ করেন নি বা নিজে থেকে কিছু লিখেন নি। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর যুগে প্রচলিত একটি 'বাইবেল' দেখে বা প্রচলিত পবিত্র পুস্তকগুলি দেখে দেখে তার অনুলিপি করেছিলেন। তাহলে বুঝা গেল যে, 'বা' কে 'মীম' ও 'মীম'-কে 'বা' রূপান্তরিত করা, গ্রীক পাঠকে ইটালীয় ভাষায় রূপান্তরিত করা, ১৪ নং গীতের মধ্যে কিছু পংক্তি বিদ্যমান না থাকা, পুস্তকগুলিকে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা বা না করা ইত্যাদি বিষয়গুলি পূর্ববর্তী সেই কপি বা পুস্তকটিতেই বিদ্যমান ছিল। এই পাণ্ডুলিপির লেখক তা হুবহু কপি করেছেন। কাজেই এ সকল প্রমাণ দ্বারা এই পাণ্ডুলিপির সময়কাল প্রমাণ করা যায় না।

৩. ইফ্রিয়ামের পাণ্ডুলিপি (Codex Ephraemi)

অতঃপর হর্ন তাঁর পুস্তকের একই খণ্ডে ইফ্রিয়ামের পাণ্ডুলিপির বিষয়ে বলেন : "ওয়েটস্টেইন মনে করেন যে, সিরীয় অনুবাদের সংশোধনের জন্য যে সকল পাণ্ডুলিপি জমা করা হয়েছিল, এই পাণ্ডুলিপিটি সেগুলির একটি। কিন্তু এই দাবির কোন প্রমাণ নেই। ইব্রীয়গণের প্রতি পৌলের পত্রের ৮ম অধ্যায়ের ৭ম আয়াতের যে টীকা লেখা রয়েছে, তা দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, পাণ্ডুলিপিটি ৫৪২ খৃস্টাব্দের পূর্বে লেখা। কিন্তু মিকাইলস এই প্রমাণটি জোরালো নয় বলে মনে করেছেন। তিনি বলেন, এই পাণ্ডুলিপিটির ক্ষেত্রে এতটুকুই বলা যায় যে, পাণ্ডুলিপিটি প্রাচীন। মার্শ বলেছেন : পাণ্ডুলিপিটি ৭ম শতকে লেখা হয়েছে।"

উপরের আলোচনা থেকে পাঠকের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, এই পাণ্ডুলিপিগুলির ক্ষেত্রে এমন কোন শক্তিশালী প্রমাণ নেই যার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, পাণ্ডুলিপিটি অমুক শতকে লেখা হয়েছে। মুসলিম লেখকগণ সাধারণত তাঁদের লেখা বই-পুস্তক বা পাণ্ডুলিপির শেষে লিখেন যে, অমুক সালের অমুক তারিখে পুস্তকটির রচনা বা অনুলিপি করা শেষ হলো। অনুলিপির ক্ষেত্রে অনুলিপিকারের নামও তাঁরা লিখেন। এধরনের কোন কথা এ সকল পাণ্ডুলিপির কোথাও লেখা নেই। কে এই অনুলিপি করেছেন, কবে, কখন বা কোথায় তা করেছেন কিছুই তাতে উল্লেখ করা হয় নি। খৃস্টান পণ্ডিতগণ কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ভিত্তিতে অন্ধকারে ঢিল ছুড়ে বলেন যে, সম্ভবত অমুক শতকে বা তমুক শতকে তা লেখা হয়েছিল। এই প্রকারের ধারণা ও অনুমান বিতর্কের ক্ষেত্রে বিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায় না।

পাঠক দেখতে পেলেন যে, আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপিটি ৪র্থ অথবা ৫ম শতকে লেখা হয়েছে বলে যারা দাবি করেন তাঁদের দাবি অত্যন্ত দুর্বল ও বিপরীত প্রমাণ দ্বারা খণ্ডিত। ৮ম শতকে পাণ্ডুলিপিটি লেখা হয়েছে বলে স্মিলার যে ধারণা করেছেন তাও দুর্বল। কারণ অল্প সময়ের মধ্যে একটি জাতির বা দেশের ভাষা পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া স্বভাব বিরুদ্ধ। আরবগণ ৭ম খৃস্টীয় শতকে আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন। বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে ১০ হিজরী সালে (৬৩১ খৃস্টাব্দে) তাঁরা আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করেন। (এর ৬৯ বছর পরেই ৮ম শতক শুরু। এই অল্প সময়ে একটি জাতির ভাষা পরিবর্তিত হওয়ার কথা নয়।) তবে তিনি যদি ৮ম শতক বলতে ৮ম শতকের শেষপ্রান্ত বুঝান তাহলে তা সঠিক হতে পারে।

মিকাইলস-এর দলিল আপত্তি থেকে মুক্ত; কাজেই তা গ্রহণ করতেই হবে। এতে প্রমাণিত হলো যে, এই পাণ্ডুলিপিটি কোন ক্রমেই ৮ম শতকের পূর্বে লেখা হতে পারে না। এ ব্যাপারে এডোনের কথাই সঠিক বলে মনে হয়, অর্থাৎ এই পাণ্ডুলিপিটি ১০ম শতকে লেখা হয়েছে, যে সময়টি ছিল জালিয়াতির স্বর্ণযুগ। এর আরেকটি বড় প্রমাণ হলো, এই পাণ্ডুলিপিটির মধ্যে জাল ও মিথ্যা পুস্তকাদি বিদ্যমান। এতে বুঝা যায় যে,

পাণ্ডুলিপিটি এমন এক সময়ে লেখা হয়েছে যে সময়ে বিশুদ্ধ পুস্তক ও জাল পুস্তকের মধ্যে বাছ-বিচার করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১০ম শতকেই এই অবস্থাটি সবচেয়ে বেশি ছিল। এছাড়া কাগজের ও লিপির স্থায়িত্বও একটি বিবেচ্য বিষয়। ১৪০০ বছর পর্যন্ত কাগজ ও লিপি টিকে থাকা স্বাভাবিকভাবে সম্ভব নয়। বিশেষত যদি আমরা লক্ষ্য করি যে, প্রথম যুগগুলিতে লিপি-পদ্ধতি ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ পদ্ধতি খুব উন্নত ছিল না।

ইফ্রিয়ামের পাণ্ডুলিপির বিষয়ে ওয়েটস্টেইনের বক্তব্য খণ্ডন করেছেন মিকাইলস। এ বিষয়ে মন্টফ্যাকন ও কেনিকটের বক্তব্য পাঠক দেখেছেন। ভ্যাটিকানীয় পাণ্ডুলিপির বিষয়ে পাঠক ডেবিনের মতামত দেখেছেন। ইফ্রিয়মীয় পাণ্ডুলিপির বিষয়ে মার্শের মতামতও পাঠক জেনেছেন। এঁরা বলেছেন যে, এই পাণ্ডুলিপি দুইটি ৭ম শতকে লেখা হয়েছে। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্ম খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের শেষভাগে (৫৭০/৫৭১ খৃষ্টাব্দে)। এতে প্রমাণিত হলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগের পূর্বে লিখিত বাইবেলের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে বলে প্রথম যে দাবিটি তাঁরা করেছেন সেই দাবিটি প্রমাণিত নয়।

গ. এসকল পাণ্ডুলিপি প্রচলিত বাইবেলের অনুরূপ নয়

উপরের আলোচনা থেকে আরো প্রমাণিত হলো যে, আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপির মধ্যে মিথ্যা ও জাল পুস্তকাদি রয়েছে। আমরা দেখেছি যে, কোন কোন খৃষ্টান পণ্ডিত এই পাণ্ডুলিপিটির অত্যন্ত নিন্দা করেছেন। ওয়েটস্টেইন এই পাণ্ডুলিপির অন্যতম নিন্দাকারী ও বিরোধী ছিলেন। আমরা আরো দেখলাম যে, 'আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপি ও ভ্যাটিকানীয় পাণ্ডুলিপির পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকাবলির মধ্যে যত বৈপরীত্য দেখা যায় এত বৈপরীত্য আর কোন দুইটি কপির মধ্যে দেখা যায় না।' এ সকল বিষয় থেকে প্রমাণিত হলো যে, তাঁদের দ্বিতীয় দাবিটিও ভিত্তিহীন। অর্থাৎ এই প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলের অনুরূপ বলে যে দাবি তাঁরা করেন সে দাবিটিও এভাবে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হলো।

ঘ. ৪র্থ শতকের পূর্বেই বাইবেলের বিকৃতি সম্পন্ন হয়েছে

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমার বক্তব্য হলো, আমরা যদি উপরের প্রমাণিত বিষয়গুলিকে পাশ কাটিয়ে ধরে নিই যে, এই পাণ্ডুলিপিগুলি প্রকৃতপক্ষেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূর্বে, অর্থাৎ ৪র্থ-৫ম শতকে লেখা হয়েছে, তাহলেও বাইবেলের বিকৃতি প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হয় না। কারণ আমরা তো এ কথা দাবি করি না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগমন পর্যন্ত বাইবেল বা পবিত্র পুস্তকগুলি অবিকৃত ছিল এবং এরপরে তা বিকৃত করা হয়েছে বরং আমরা দাবি করি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বেও 'বাইবেল' নামের একটি 'গ্রন্থসংকলন' ও তার মধ্যে কিছু পুস্তক সূত্র বিহীনভাবে বিদ্যমান ও প্রচলিত ছিল এবং এ কথাও নিশ্চিত যে, তাঁর আগমনের পূর্বেই বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি সাধন করা হয়েছিল। আবার তাঁর পরেও বাইবেলের মধ্যে কিছু কিছু বিকৃতি সাধন করা হয়েছে।

কাজেই মাত্র তিনটি পাণ্ডুলিপি কেন, যদি ৪র্থ-৫ম শতকে লেখা অনেক পাণ্ডুলিপিও বিদ্যমান থাকে তাতেও বাইবেলের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় না বা বিকৃতির দাবি অপ্রমাণিত হয় না বরং 'আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপি'র মত এক হাজারটি পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান থাকলেও বিকৃতি প্রমাণ করতে আমাদের কোন অসুবিধা হতো না, বরং এতে বিকৃতি প্রমাণ করা আরো সহজ হতো। কারণ এই প্রকারের প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মধ্যে এমন কিছু পুস্তক বিদ্যমান যা নিঃসন্দেহে জাল ও মিথ্যা। এতে প্রমাণিত হয় যে, জালিয়াতি সেই যুগ থেকেই পুরোদমে চলেছে। এছাড়া ভ্যাটিকানীয় পাণ্ডুলিপি ও আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপির মধ্যে যে বৈপরীত্যের ছড়াছড়ি তাও প্রমাণ করে যে, প্রাচীন যুগের খৃস্টানদের মধ্যে বিকৃতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। সর্বোপরি, প্রাচীনত্ব কখনোই বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে না। তাহলে তো আলেকজান্দ্রীয় পাণ্ডুলিপি বিশুদ্ধতার মাপকাঠি হতো। অথচ খৃস্টানগণ একমত যে, এর মধ্যে কিছু মিথ্যা ও জাল পুস্তক রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
রহিতকরণ প্রমাণ

ইসলামী পরিভাষায় রহিতকরণের অর্থ

আরবী 'নসখ' (نسخ) শব্দের অর্থ রহিত করা, সরিয়ে দেওয়া, বাতিল করা, স্থগিত করা, লোপ করা, পরিবর্তন করা (abrogate, abolish, invalidate, repeal, withdraw, annulment)। মুসলমানদের পরিভাষায় 'নসখ' বা 'রহিতকরণ' (abrogation) অর্থ হলো 'সকল শর্ত পূরণ করেছে এমন কোন কর্মবিষয়ক বিধানের পালনীয়তার সময়সীমার সমাপ্তি ঘোষণা করা।'

ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে এই প্রকারের রহিতকরণ বা 'কার্যকারিতার সমাপ্তি ঘোষণা' শুধু 'কর্ম বিষয়ক বিধানের' ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে, কোন স্বতঃসিদ্ধ সত্য, জ্ঞানভিত্তিক তথ্য, গল্প-কাহিনী বা ঘটনার বর্ণনায় এই প্রকারের রহিতকরণ ঘটতে পারে না। যেমন, 'এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন' এই তথ্যটির সত্যতা ও পালনীয়তা চিরন্তন।

অনুরূপভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বিষয়কে 'রহিত' বা 'কার্যকারিতা সমাপ্ত' করা যায় না। যেমন দিনের আলো এবং রাতের আঁধার। অনুরূপভাবে 'প্রার্থনা' বিষয়ক বাক্য রহিত হয় না এবং চিরন্তন সত্যও 'রহিত' হয় না। যেমন 'ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হও এবং ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করিও না'। এই প্রকারের চিরন্তন সত্য রহিত হয় না।

যে সকল বিধান প্রদানের সময়েই তা চিরস্থায়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে সে সকল বিধানও রহিত বা স্থগিত হয় না। যেমন নিরপরাধ নারীদেরকে মিথ্যা অপবাদ প্রদানকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : "এবং কখনোই তোমরা তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।"[১]

আবার যে সকল বিধান প্রদান করার সময়েই তাকে অস্থায়ী বা সাময়িক বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পূর্বে রহিত করা যায় না। যেমন মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্তদের বিষয়ে বলা হয়েছে : "তোমরা ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে চল যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ আনয়ন করেন।"[২]

১. সূরা নূর : ৪ আয়াত।

২. সূরা বাকারা : ১০৯ আয়াত।

ইসলামী পরিভাষায় রহিতকরণ বা স্থগিতকরণ শুধু সে সকল বিধানের বিষয়ে ঘটতে পারে যেগুলি কর্মবিষয়ক, চিরস্থায়ী নয় এবং সাময়িকও নয় এবং যেগুলির বাস্তবায়ন থাকা ও না থাকা উভয়েরই সম্ভাবনা বিরাজমান। এই প্রকারের বিধানগুলিকে 'উন্মুক্ত বিধান' বলা হয়।

এই প্রকারের সাধারণ বা উন্মুক্ত বিধানের রহিত বা স্থগিত করার ক্ষেত্রে শর্ত হলো যে, বিধানের স্থান, কাল ও পাত্র পৃথক হবে। একই স্থানে একই সময়ে একই ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে একটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে তা রহিত করা হয় না। বিধান প্রদান ও বিধান রহিতকরণের মধ্যে স্থান, কাল ও পাত্রের এক বা একাধিক দিকে বা সকল দিকে পার্থক্য থাকতে হবে।

বিভিন্ন ভাবে ইসলামী পরিভাষায় ব্যবহৃত এই 'রহিতকরণ' বা 'স্থগিতকরণ' বিষয়টির অপব্যাখ্যা করা হয়। কেউ মনে করতে পারেন যে, এর অর্থ হলো, ঈশ্বর কোন আদেশ বা নিষেধ প্রদান করেছিলেন এবং তিনি সেই বিধান প্রদানের সময় তার পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারেন নি। ফলে পরবর্তীকালে যখন তিনি তার পরিণতি জানতে পারলেন তখন তা স্থগিত করলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বর অজ্ঞতার মধ্যে ছিলেন। কেউ বলতে পারেন যে, ঈশ্বর এক বিষয়ে একটি নির্দেশ দিয়ে আবার তা রহিত করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বর অযৌক্তিক ও বিবেকবিরোধী কর্ম করেন। যদিও তিনি ফলাফল ও পরিণতি জানতেন বলে দাবী করা হয় তবুও প্রমাণিত হবে যে, কাজটি অযৌক্তিক। মহান আল্লাহ এইরূপ অযৌক্তিক কর্ম থেকে পবিত্র।

ইসলামী পরিভাষায় 'রহিতকরণ' বা 'স্থগিতকরণ' এইরূপ কিছুই বুঝানো হয় না। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ হলো ঃ মহান আল্লাহ জানতেন যে, এই বিধানটি অমুক সময় পর্যন্ত তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত থাকবে এবং এরপর তা স্থগিত হবে। যখন তাঁর জানা সেই সময়টি এসে গেল তখন তিনি নতুন বিধান প্রেরণ করলেন। এই নতুন বিধানের মাধ্যমে সেই পূর্বতন বিধানটির আংশিক বা সামগ্রিক পরিবর্তন সাধন করতেন। প্রকৃত পক্ষে এ হলো পূর্বতন বিধানের কার্যকারিতার সময়সীমা জানিয়ে দেওয়া। তবে যেহেতু পূর্বতন বিধানটি প্রদানের সময় এর সময়সীমা উল্লেখ করা হয় নি, সেহেতু নতুন বিধানটির আগমনকে আমরা আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে বাহ্যত 'পরিবর্তন' বলে মনে করি।

আল্লাহর সাথে কোন সৃষ্টির তুলনা হয় না। তাই, তুলনার জন্য নয়, শুধু অনুধাবনের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করা যায়। আপনি আপনার একজন কর্মচারীকে একটি কর্মের দায়িত্ব প্রদান করলেন। আপনি তার অবস্থা জানেন এবং আপনার মনের মধ্যে সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, এক বছর পর্যন্ত সে উক্ত কর্মে নিয়োজিত থাকবে। এরপর আপনি তাকে অন্য কর্মে নিয়োগ করবেন। কিন্তু আপনি আপনার এই সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছা তার কাছে প্রকাশ করেন নি। যখন নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেল তখন আপনি আপনার পূর্ব

সিদ্ধান্ত অনুসারে তাকে অন্য কর্মে নিয়োজিত করলেন। এই বিষয়টি উক্ত কর্মচারীর নিকট 'পরিবর্তন' বা 'রহিতকরণ' বলে গণ্য। অনুরূপভাবে অন্য সকল মানুষ যাদের নিকট আপনি আপনার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন নি তারাও বিষয়টিকে 'পরিবর্তন' বলে গণ্য করবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এবং আপনার কাছে বিষয়টি 'পরিবর্তন' নয়।

এইরূপ 'রহিতকরণ' যুক্তি বা বিবেকের দৃষ্টিতে অসম্ভব নয়। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও তা তাঁর মহত্ত্ব বা মর্যাদার পরিপন্থী নয়।

আমরা জানি যে, শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ, বসন্ত ইত্যাদি ঋতু পরিবর্তনের মধ্যে মহান ঈশ্বরের বিশেষ কল্যাণময় প্রজ্ঞার নিদর্শন রয়েছে। অনুরূপভাবে মানুষের জীবনে দারিদ্র্য, সচ্ছলতা, সুস্থতা, অসুস্থতা ইত্যাদি অবস্থার পরিবর্তন তাঁর প্রজ্ঞাময় ও কল্যাণময় সিদ্ধান্ত। আমরা কখনো সেই প্রজ্ঞা ও কল্যাণ বুঝতে পারি এবং কখনো তা বুঝতে পারি না। তেমনিভাবে আদেশ নিষেধ ইত্যাদি বিধিবিধানের পরিবর্তনের মধ্যেও রয়েছে স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে মানুষের জন্য কল্যাণ ও ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা।

পাঠক কি দেখেন না যে, অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার ঔষধ ও পথ্যের পরিবর্তন করেন। তিনি সর্বদা রোগীর জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা প্রদানের চেষ্টা করেন। কেউই তাঁর এই পরিবর্তনকে অজ্ঞতা বা মূর্খতা বলে গণ্য করেন না। কাজেই অনাদি-অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী সর্বজ্ঞানী মহান স্রষ্টার এইরূপ প্রজ্ঞাময় পরিবর্তনকে কিভাবে আমরা অজ্ঞতা বলে অপব্যাখ্যা করতে পারি?

কাহিনী ও ঐতিহাসিক বিবরণ রহিত হয় না

উপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে পাঠক বুঝতে পারছেন যে, কোন গল্প, কাহিনী বা ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ 'রহিত' বা 'স্থগিত' হয় না। কাজেই বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের কোন গল্প-কাহিনী আমাদের মতে রহিত নয়। তবে সেগুলির মধ্যে অনেক মিথ্যা কাহিনী আছে। যেমন :

(১) লোট বা লূত (আ) মদ খেয়ে মাতাল হন এবং তাঁর দুই কন্যার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। তাঁর কন্যাদ্বয় এই ব্যভিচারের মাধ্যমে পিতাকর্তৃক গর্ভধারণ করেন। আদিপুস্তকের ১৯ অধ্যায়ে এই 'কাহিনী'টি উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

(২) যাকোব (ইয়াকূব আ)-এর পুত্র যিহূদা তাঁর পুত্রবধু তামর-এর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। ব্যভিচারের ফলে তামর গর্ভবতী হন এবং পেরস ও সেরহ নামে যমজ পুত্রদ্বয় প্রসব করেন। আদিপুস্তকের ৩৮ অধ্যায়ে এই 'কাহিনী' উল্লেখ করা হয়েছে।[২] দায়ূদ, শলোমন ও যীশুখৃষ্ট সকলেই পেরস নামের এই জারজ সন্তানের বংশধর। মথিলিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩]

---

১. আদিপুস্তক ১৯/৩০-৩৮।

২. আদিপুস্তক ৩৮/১২-৩০।

৩. মথি ১/৩-১৬।

(৩) দায়ূদ (আ) উরিয়র স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন এবং এই ব্যভিচারের ফলে স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হয়। তখন দায়ূদ সেনাপতিকে পরামর্শ দেন কৌশলে যুদ্ধের মাঠে উরিয়কে বধ করার জন্য। এভাবে উরিয় নিহত হয় এবং দায়ূদ তার স্ত্রীকে ভোগ করেন। ২ শমূয়েলের ১১শ অধ্যায়ে 'কাহিনীটি' উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

(৪) শলোমন (সুলায়মান আ.) শেষ বয়সে ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যান। তিনি মূর্তিপূজা শুরু করেন এবং মূর্তির জন্য উপাসনালয় তৈরি করেন। ১ রাজাবলির ১১ অধ্যায়ে এই 'কাহিনীটি' উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

(৫) হারোণ (আ) একটি গো-বৎসের মূর্তি তৈরি করেন এবং তার পূজা করেন। উপরন্তু তিনি ইস্রায়েল সন্তানগণকে তা পূজা করতে নির্দেশ দেন। যাত্রাপুস্তকের ৩২ অধ্যায়ে এই 'কাহিনীটি' উল্লেখ করা হয়েছে।[৩]

এই 'কাহিনী' ও ঘটনাগুলি এবং অনুরূপ আরো অনেক কাহিনী আমাদের মতে মিথ্যা ও বাতিল। আমরা বলি না যে, এগুলি রহিত বা স্থগিত।

অন্যান্য যে সকল বিষয় রহিত হয় না

চিরন্তন ও স্বতসিদ্ধ চিরস্থায়ী সত্য, জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যাদি, সর্বজনীন বিধানাদি, চিরস্থায়ী বিধানাদি, সাময়িক বিধানাদির সময়কাল শেষ হওয়ার পূর্বে এবং সাধারণ বা উন্মুক্ত বিধানের স্থান কাল ও পাত্র একই হলে তা রহিত হতে পারে না। কারণ এইরূপ রহিতকরণ আপত্তিকর।

অনুরূপভাবে প্রার্থনার বাক্যাবলিও রহিত হয় না। এজন্য যাবূর বা 'গীত সংহিতা' আমাদের দৃষ্টিতে পারিভাষিকভাবে রহিত বা স্থগিত নয়। আমরা কখনোই বলি না যে, গীতসংহিতা বা যাবূরের দ্বারা তোরাহ রহিত হয়েছে এবং ইঞ্জিল বা নতুন নিয়মের আগমনে 'যাবূর' রহিত হয়েছে। 'মীযানুল-হক' গ্রন্থের প্রণেতা পাদ্রী মি. ফান্ডার (Carl Gottaleb Pfander) তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে, মুসলিমগণ এইরূপ কথা বিশ্বাস করেন। তাঁর এই দাবিটি সম্পূর্ণ মিথ্যাচার। তাঁর মিথ্যাচার ও মূর্খতার সর্বোচ্চ নমুনা হলো, তিনি বলেছেন ঃ 'যাবূর দ্বারা তোরাহ-এর রহিত হওয়া এবং ইঞ্জিল দ্বারা যাবূর-এর রহিত হওয়ার কথা কুরআন ও তাফসীরে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।'[৪]

ইসলামে যাবূরসহ পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকাবলি ব্যবহার করতে বা সেগুলির উপর নির্ভর করতে নিষেধ বা আপত্তি করার কারণ এই নয় যে, এগুলিতে বর্ণিত সকল

১. ২ শমূয়েল ১১/১-২৭।
২. ১ রাজাবলি ১১/১-১৩।
৩. যাত্রাপুস্তক ৩২/১-৩৫।
৪. ইতোপূর্বে লেখক বলেছেন যে, এইরূপ কথা কোরআন তো দূরের কথা কোন তাফসীর ,হাদীস বা ফিকহের গ্রন্থেও নেই। মুসলিমগণ কখনোই এইরূপ দাবি করেন না।

প্রার্থনা, কাহিনী... ইত্যাদি সবকিছু রহিত হয়ে গিয়েছে। বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদি ব্যবহারে আপত্তির কারণ হলো, এগুলি সত্যিই মোশি, দায়ূদ, যীশু প্রমুখ ভাববাদীর প্রদত্ত সঠিক পুস্তক কিনা সে বিষয়েই যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এ সকল পুস্তকের কোন অবিচ্ছিন্ন সূত্র-পরম্পরা সংরক্ষিত নেই এবং এগুলিতে সকল প্রকারের বিকৃতি ঘটেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে পাঠক তা জানতে পেরেছেন। এজন্য এ সকল প্রচলিত পুস্তককে তোরাহ, যাবূর বা ইঞ্জিল বলে বিশ্বাস করার কোন উপায় নেই।

বাইবেলের পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিত বিধানাদি

উপর্যুক্ত বিষয়গুলি ছাড়া সাধারণ উন্মুক্ত কর্মবিষয়ক বিধানাবলি রহিত হতে পারে। আমরা স্বীকার করি যে, তোরাহ ও ইঞ্জিল বা পুরাতন ও নতুন নিয়মের কিছু কিছু উন্মুক্ত সাধারণ রহিত হওয়ার যোগ্য বিধান ইসলামী শরীয়তে বা ইসলামী ব্যবস্থায় রহিত ও স্থগিত করা হয়েছে। আমরা বলি না যে, পুরাতন ও নতুন নিয়মের সকল বিধানই রহিত হয়েছে বরং আমরা বলি যে, তোরাহ-এর অনেক বিধান নিশ্চিতরূপেই অপরিবর্তিত ও কার্যকর রয়েছে। যেমন মিথ্যা শপথ, হত্যা, ব্যভিচার, সমকামিতা, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য, প্রতিবেশির সম্পদ বা সম্মানের ক্ষতি করার বিষয়ে তোরাহ-এর নিষেধাজ্ঞা এখনও অপরিবর্তিত ও কার্যকর রয়েছে। পিতামাতার সম্মান ও সেবার আবশ্যকতা, পিতা, পুত্র, মাতা, কন্যা, চাচা, ফুফু, মামা, খালাকে বিবাহ করার নিষেধাজ্ঞা, দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করার নিষেধাজ্ঞা ও অনুরূপ আরো অনেক বিধান অপরিবর্তিত ও কার্যকর রয়েছে।

অনুরূপভাবে নতুন নিয়মের অনেক বিধান ইসলামী ব্যবস্থায় অপরিবর্তিত ও কার্যকর রয়েছে। যেমন মার্কলিখিত সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে :"২৯ যীশু উত্তর করিলেন, প্রথমটি এই, 'হে ইস্রায়েল, শুন আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু; ৩০ আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে।' ৩১ দ্বিতীয়টি এই, তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।' এই দুই আজ্ঞা হইতে বড় আর কোন আজ্ঞা নাই।"

এই আজ্ঞা দুইটি আমাদের শরীয়তে বা ইসলামী ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে অপরিবর্তিত ও পালিত। আজ্ঞাদ্বয় কখনোই রহিত বা পরিবর্তিত হয় নি।

পূর্ববর্তী ব্যবস্থাসমূহে রহিতকরণের প্রকারভেদ

রহিতকরণ শুধু ইসলামের বিষয় নয়। পূর্ববর্তী সকল ব্যবস্থায় ও সকল ধর্মেই রহিতকরণের অনেক ঘটনা ঘটেছে। রহিতকরণ দুই প্রকারের : প্রথমত,পরবর্তী ভাববাদীর ব্যবস্থায় পূর্ববর্তী ভাববাদীর কোন ব্যবস্থা রহিত বা স্থগিত করা হবে। দ্বিতীয়ত, একই ভাববাদীর ব্যবস্থার মধ্যে একটি বিধান রহিত করে অন্য বিধান দেওয়া

হবে। উভয় প্রকারের রহিতকরণই পূর্ববর্তী ভাববাদিগণের ব্যবস্থায় ঘটেছে বলে আমরা দেখতে পাই। নতুন ও পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির মধ্যে এই উভয় প্রকারের রহিতকরণের অগণিত উদাহরণ রয়েছে। আমি এখানে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করছি :

(ক) পরবর্তী ভাববাদীর ব্যবস্থায় পূর্ববর্তী ভাববাদীর বিধান রহিতকরণ

প্রথম প্রকারের রহিতকরণ এর কতিপয় উদাহরণ দেখুন :

প্রথম উদাহরণ : আদম (আ)–এর যুগে ভাই–বোনের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। অবরাহামের স্ত্রী সারা অবরাহামের বৈমাত্রেয় ভগ্নি ছিলেন। আদিপুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ১২ আয়াতে উল্লিখিত অবরাহামের বক্তব্য থেকে তা জানা যায়। ১৬২৫ সালে ও ১৬৪৮ সালে মুদ্রিত আরবী অনুবাদে এই আয়াতটি নিম্নরূপ : "আর সে প্রকৃতই আমার ভগিনী[১]; কেননা সে আমার পিতৃকন্যা, কিন্তু মাতৃকন্যা নহে, পরে সে আমার ভার্যা হইল(And yet indeed she is my sister; she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother; and she became my wife)।"

আর মোশির ব্যবস্থায় ভগ্নিকে বিবাহ করা কঠিন ভাবে নিষিদ্ধ। আপন ভগ্নি, বৈমাত্রেয় ভগ্নি ও বৈপিত্রেয় ভগ্নি সকল প্রকারের ভগ্নিকে বিবাহ করাই নিষিদ্ধ। এইরূপ বিবাহ ব্যভিচার বলে গণ্য এবং এইরূপ বিবাহকারী অভিশপ্ত। এইরূপ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ স্বামী–স্ত্রী উভয়কে হত্যা করা অত্যাবশ্যক।

লেবীয় পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের ৯ আয়াতে বলা হয়েছে : "তোমার ভগিনি, তোমার পিতৃকন্যা কিম্বা তোমার মাতৃকন্যা, গৃহজাতা হউক কিম্বা অন্যত্র জাতা হউক, তাদের আবরণীয় অনাবৃত করিও না।"

ডাওয়ালি ও রজার্ডমেন্ট–এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই আয়াতের টীকায় বলা হয়েছে : "এইরূপ বিবাহ ব্যভিচার তুল্য।"

লেবীয় পুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে : আর যদি কেহ আপন ভগিনিকে, পিতৃকন্যাকে, কিম্বা মাতৃকন্যাকে, গ্রহণ করে, ও উভয়ে উভয়ের আবরণীয় দেখে, তবে তাহা লজ্জাতর বিষয়, তাহারা আপন জাতির সন্তানদের সাক্ষাতে হত্যাকৃত[২] হইবে; আপন ভগিনীর আবরণীয় অনাবৃত করাতে সে আপন অপরাধ বহন করিবে।"

দ্বিতীয় বিবরণের ২৭ অধ্যায়ের ২২ আয়াতটি নিম্নরূপ : "যে কেহ আপন ভগিনীর সহিত, অর্থাৎ পিতৃকন্যার কিম্বা মাতৃকন্যার সহিত শয়ন করে, সে শাপগ্রস্ত।"

---

১. বাংলা বাইবেলে: আর সে আমার ভগিনি, ইহাও সত্য বটে;.....

২. বাংলা বাইবেলে এখানে 'হত্যাকৃত'-এর পরিবর্তে "উচ্ছিন্ন" বলা হয়েছে। আরবীতে 'হত্যাকৃত' বলা হয়েছে। ইংরেজি বাইবেলের পাঠ নিম্নরূপ : and they shall be cut off in the sight of their people।

এথেকে প্রমাণিত হলো যে, আদম (আ)-এর ব্যবস্থায় এবং অবরাহামের ব্যবস্থায় (শরীয়তে) ভগিনীকে বিবাহ করা বৈধ ছিল। তা না হলে প্রমাণিত হবে যে, সকল মানুষ 'ব্যভিচার-তুল্য বিবাহের' জারজ সন্তান এবং (আদমের সন্তানগণ ও অবরাহাম) যারা এইরূপ বিবাহ করেছিলেন তাঁরা সকলেই ব্যভিচারী ছিলেন, হত্যাযোগ্য অপরাধে অপরাধী ছিলেন এবং অভিশপ্ত ছিলেন। ভাববাদিগণের বিষয়ে এরূপ চিন্তা কিভাবে করা যায়? কাজেই স্বীকার করতেই হবে যে, এইরূপ বিবাহ পূর্বতন ভাববাদিগণের ব্যবস্থায় বৈধ ছিল, এরপর মোশির ব্যবস্থায় এই বৈধতা 'রহিত' করা হয়।

লক্ষ্যণীয় : ১৮১১ সালে মুদ্রিত আরবী বাইবেলের অনুবাদকগণ অবরাহাম ও সারার সম্পর্ক বিষয়ক অবরাহামের উপর্যুক্ত বিবৃতিটির অনুবাদে লিখেছেন : "কেননা সে আমার পিতার আত্মীয়া, কিন্তু মাতার আত্মীয়া নহে।" বাহ্যত ইচ্ছাকৃতভাবে অনুবাদক এই বিকৃতিটি ঘটিয়েছেন। তিনি 'কন্যা' শব্দটির পরিবর্তে 'আত্মীয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অবরাহাম ও সারার প্রকৃত সম্পর্ক গোপন করা ও এ বিধানটি রহিতকরণ অপ্রমাণিত করার জন্যই সম্ভবত তিনি তা করেছেন। কারণ পিতার আত্মীয়া বলতে চাচাতো বোন, ফুফাতো বোন ইত্যাদিকেও বুঝায়।

দ্বিতীয় উদাহরণ : ১৬২৫ ও ১৬৪৮ সালের আরবী বাইবেলে আদিপুস্তকের ৯ম অধ্যায়ের ৩ আয়াতে নোহের সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করে ঈশ্বর বলেন : "প্রত্যেক গমনশীল প্রাণী তোমাদের খাদ্য হইবে (Every moving thing that liveth shall be meat for you); আমি হরিৎ ওষধির (green herb) ন্যায় সে সকল তোমাদিগকে দিলাম।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, নোহ-এর ব্যবস্থায় সকল প্রাণীই সবুজ শাকসব্জি-ফলমুলের মত বৈধ বা হালাল ছিল। পরবর্তীকালে মোশির ব্যবস্থায় অনেক প্রকারের প্রাণীকে অবৈধ ও নিষিদ্ধ করা হয়, যেগুলির মধ্যে শূকরও রয়েছে। লেবীয় পুস্তকের ১১ অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় বিবরণের ১৪ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

লক্ষণীয় : ১৮১১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত বাইবেলের আরবী অনুবাদে এখানেও বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত আদিপুস্তকের ৩ আয়াতটির অনুবাদে এতে বলা হয়েছে : "প্রত্যেক গমনশীল পবিত্র প্রাণী তোমাদের খাদ্য হইবে, হরিৎ ওষধির ন্যায়...... ।" এখানে অনুবাদক নিজের পক্ষ থেকে 'পবিত্র' কথাটি বাড়িয়ে সংযোজন করেছেন; যেন মোশির ব্যবস্থায় নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষিত প্রাণীগুলি এর আওতায় না পড়ে। কারণ তোরাহ-এ এসকল নিষিদ্ধ প্রাণীকে 'অপবিত্র' বা 'অশুচি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় উদাহরণ : যাকোব (ইয়াকূব আ) লেয়া ও রাহেল নামক দুই বোনকে বিবাহ করেন। এই দুইজনই ছিলেন তাঁর মামাতো বোন। আদিপুস্তকের ২৯ অধ্যায়ে বিষয়টি স্পষ্ট বলা হয়েছে। মোশির ব্যবস্থায় এইরূপ দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। লেবীয় পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের ১৮ আয়াতে বলা হয়েছে : "আর স্ত্রীর সপত্নী

হইবার জন্য তাহার জীবৎকালে আবরণীয় অনাবৃত করণার্থে তাহার ভগিনীকে বিবাহ করিও না।"

এতে প্রমাণিত হলো যে, যাকোবের ব্যবস্থায় দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা বৈধ ছিল এবং পরবর্তীকালে মোশির ব্যবস্থায় সেই বৈধতা রহিত করা হয়। তা নাহলে প্রমাণিত হবে যে, যাকোবের এই বিবাহ দুইটি অবৈধ ছিল এবং এই দুই স্ত্রীর সন্তানগণ সকলেই ব্যভিচার-জাত জারজ সন্তান! নাউযুবিল্লাহ! অধিকাংশ ইস্রায়েলীয় ভাববাদীই যাকোবের এই দুই স্ত্রীর সন্তান।

চতুর্থ উদাহরণ : দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম প্রমাণের আলোচনা থেকে পাঠক জানতে পেরেছেন যে, মোশির পিতা অম্রামের (ইমরানে) স্ত্রী যোকেবদ ছিলেন তাঁর আপন পিসি বা ফুফু। অম্রমের পিতা কহাতের আপন ভগ্নি ছিল যোকেবদ। ১৬২৫ থেকে ১৬৪৮ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত আরবী বাইবেল অনুবাদকগণ এখানেও বিকৃতি সাধন করেছেন ("অম্রাম আপন পিসি যোকেবদকে বিবাহ করিলেন"[১] কথাটিকে বিকৃত করে তাঁরা লিখেছেন : "অম্রম আপন পিসির কন্যা যোকেবদকে বিবাহ করিলেন")। আপন পিসিকে বিবাহ করার অন্যায় গোপন করার জন্যই তাঁরা ইচ্ছাকৃত এই বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। এইরূপ বিবাহ মোশির ব্যবস্থায় নিষিদ্ধ ও অবৈধ।

লেবীয় পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের ১২ আয়াতটি নিম্নরূপ : "তোমার পিতার ভগ্নির (thy father's sister) আবরণীয় অনাবৃত করিও না, সে তোমার পিতার আত্মীয়া।"

এতে প্রমাণিত হলো যে, মোশির পূর্বে মোশির পিতার যুগ পর্যন্ত ধর্মীয় ব্যবস্থায় ফুফুকে বিবাহ করা বৈধ ছিল। তা নাহলে স্বীকার করতে হবে যে, মোশি, হারোণ ও তাঁদের ভগ্নি মরিয়ম এরা সকলেই ব্যভিচার-জাত জারজ সন্তান ছিলেন। নাউযু বিল্লাহ! আরো স্বীকার করতে হবে যে, এঁরা তিনজন এবং এদের দশম পুরুষ পর্যন্ত কেউ সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করতে পারবেন না। কারণ দ্বিতীয় বিবরণের ২৩ অধ্যায়ের ২ আয়াতে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জারজ ব্যক্তি সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করবে না, তার দশম পুরুষ পর্যন্ত। আর এঁরা যদি সদাপ্রভুর সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হন, তবে সেখানে প্রবেশ করবেন কারা?

পঞ্চম উদাহরণ : যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকের ৩১ অধ্যায়ে রয়েছে : "৩১ সদাপ্রভু বলেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে আমি ইস্রায়েলকুলের ও যিহূদা-কুলের সহিত এক নূতন নিয়ম স্থির করিব। ৩২ মিসর দেশ হইতে তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে

---

১. এছাড়া গণনাপুস্তকের ২৬ অধ্যায়ের ৫৯ আয়াতে বলা হয়েছে : "ঐ কহাতের পুত্র অম্রাম। অম্রামের স্ত্রীর নাম যোকেবদ, তিনি লেবির কন্যা, মিসরে লেবির ঔরসে তাঁহার জন্ম।" এখানেও অতি স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, যোকেবদ লেবির ঔরসজাত কন্যা। আর কহাৎ লেবির পুত্র। কাজেই তিনি অম্রামের আপন ফুফু। **

বাহির করিয়া আনিবার জন্য তাহাদের হস্ত গ্রহণ করিবার দিনে আমি তাহাদের সহিত যে নিয়ম স্থির করিয়াছিলাম, সেই নিয়মানুসারে নয়; আমি তাহাদের স্বামী হইলেও তাহারা আমার সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিল, ইহা সদাপ্রভু কহেন।"

এখানে 'নতুন নিয়ম' বলতে নতুন ব্যবস্থা বা নতুন শরীয়তের কথা বলা হয়েছে। এই আয়াতদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, এই নতুনটি পুরাতন নিয়মকে পরিবর্তন বা 'রহিত' করবে। খৃস্টানদের পবিত্র পুরুষ পৌল ইব্রীয়দের প্রতি লেখা তাঁর পত্রের ৮ম অধ্যায়ে দাবি করেছেন যে, এই 'নতুন নিয়ম' হলো যীশুর ব্যবস্থা। তাহলে তাঁর স্বীকারোক্তি অনুসারে যীশুর ব্যবস্থাটি মোশির ব্যবস্থার ব্যতিক্রম এবং যীশুর ব্যবস্থা দ্বারা মোশির ব্যবস্থা রহিত হয়েছে।

উপরের ৫টি উদাহরণ ইহূদী ও খৃস্টান উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই প্রযোজ্য। এগুলির আলোকে উভয় সম্প্রদায় 'রহিতকরণের' বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। খৃস্টানগণের জন্য অন্যান্য উদাহরণ রয়েছে।

ষষ্ঠ উদাহরণ : মোশির ব্যবস্থায় বা শরীয়তে যে কোন কারণে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারেন বা বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারেন। এই তালাকপ্রাপ্ত বা পরিত্যাক্তা স্ত্রী তালাকদাতা স্বামীর গৃহ থেকে বেরিয়ে গেলে অন্য যে কোন পুরুষ তাকে বিবাহ করতে পারেন। দ্বিতীয় বিবরণের ২৪ অধ্যায়ে এ সকল বিধান সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

পক্ষান্তরে যীশুর ব্যবস্থায় একমাত্র ব্যভিচারের অপরাধ ছাড়া কোন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না বা পরিত্যাগ করতে পারে না। অনুরূপভাবে অন্য কোন ব্যক্তি সেই পরিত্যাক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারবে না। এইরূপ বিবাহ ব্যভিচার বলে গণ্য হবে। মথিলিখিত সুসমাচারের ৫ম ও ১৯ অধ্যায়ে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

মোশির ব্যবস্থার গোঁড়া অনুসারী ফরীশিগণ যীশুর নিকট এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন যে, মোশি যেখানে ত্যাগপত্র বা তালাকনামা দিয়ে স্ত্রী পরিত্যাগের বিধান দিয়েছেন, সেখানে আপনি তা নিষেধ করছেন কেন? উত্তরে যীশু বলেন : "তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন বলিয়া মোশি তোমাদিগকে আপন আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু আদি হইতে এরূপ হয় নাই। আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ব্যভিচার দোষ ব্যতিরেকে যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে; এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যাক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে।"

যীশুর এই উত্তর থেকে জানা গেল যে, এই বিধানের ক্ষেত্রে দুইবার 'রহিতকরণ' ঘটেছে। প্রথম যুগে এইরূপ স্ত্রী পরিত্যাগ অবৈধ ছিল। মোশির ব্যবস্থায় সেই অবৈধতা

১. দ্বিতীয় বিবরণ ২৪/১-২।
২. মথি ৫/৩১-৩২; ১৯/৩-৯।

রহিত করে তা বৈধ করা হয়। পুনরায় যীশুর ব্যবস্থায় মোশির দেওয়া বৈধতা রহিত করা হয়। এথেকে আরো জানা গেল যে, মানুষের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমন বিধানও প্রদান করা হয়, যে বিধান প্রকৃতপক্ষে ভাল না।

সপ্তম উদাহরণ : অনেক প্রকারের প্রাণী মোশির ব্যবস্থায় অবৈধ ছিল। খৃষ্টধর্মে সেগুলির অবৈধতা 'রহিত' করা হয়েছে এবং সকল অবৈধ বা অপবিত্র প্রাণী ও খাদ্য আহার বৈধ করা হয়েছে। পৌলের ফতওয়ার মাধ্যমে সেগুলির সাধারণ বৈধতা জানা গিয়েছে।

রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রে ১৪ অধ্যায়ের ১৪ আয়াতটি নিম্নরূপ: "আমি জানি, এবং প্রভু যীশুতে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, কোন বস্তুই স্বভাবত অপবিত্র নয়; কিন্তু যে যাহা অপবিত্র জ্ঞান করে, তাহারই পক্ষে তাহা অপবিত্র।"

তীতের প্রতি প্রেরিত পত্রের ১ম অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে পৌল লিখেছেন: "শুচিগণের পক্ষে সকলই শুচি (Unto the pure all things are pure); কিন্তু কলুষিত ও অবিশ্বাসীদের পক্ষে কিছুই শুচি নয়; বরং তাহাদের মন ও সংবেদ (বিবেক) উভয়ই কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে।"

'যে যাহা অপবিত্র জ্ঞান করে, তাহারই পক্ষে তাহা অপবিত্র' এবং 'শুচিগণের পক্ষে সকলই শুচি' এই দুইটি মূল নীতি বাহ্যতই বড় অদ্ভুত ও আশ্চর্য মূলনীতি। সম্ভবত (যীশুসহ) ইস্রায়েল সন্তানগণ কেউই পবিত্র ছিলেন না, একারণে তাঁদের ভাগ্যে এইরূপ ঢালাও বৈধতা জোটেনি। পক্ষান্তরে খৃস্টানগণ যেহেতু 'পবিত্র' সেহেতু তাঁরা এইরূপ ঢালাও বৈধতা লাভ করলেন। তাঁদের জন্য সব কিছুই বৈধ ও পবিত্র হয়ে গেল।

খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ পৌল মহাশয় এই 'ঢালাও বৈধতা' প্রচারের ক্ষেত্রে খুবই সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য তিনি তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত প্রথম পত্রের ৪র্থ অধ্যায়ে লিখেছেন : "৪ বাস্তবিক ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত বস্তুই ভাল; ধন্যবাদসহ গ্রহণ করিলে কিছুই অগ্রাহ্য নয়, ৫ কেননা ঈশ্বরের বাক্য ও প্রার্থনা দ্বারা তাহা পবিত্রীকৃত হয়। ৬ এই সকল কথা ভ্রাতৃগণকে মনে করাইয়া দিলে তুমি খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম পরিচারক হইবে; যে বিশ্বাসের ও উত্তম শিক্ষার অনুসরণ করিয়া আসিতেছ, তাহার বাক্যে পোষিত থাকিবে।"[১]

অষ্টম উদাহরণ : লেবীয় পুস্তকে ২৩ অধ্যায়ে যে সকল সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক পর্ব পালনের বিধিবিধান প্রদান করা হয়েছে, মোশির ব্যবস্থা অনুসারে সেগুলি সবই ছিল চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। এই অধ্যায়ের ১৪, ২১, ৩১ ও ৪১ আয়াতে সুস্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই পর্ববিষয়ক বিধানগুলি চিরস্থায়ী বিধান।[২]

১. অর্থাৎ সকল অপবিত্র দ্রব্য ও বস্তুই খাওয়া যাবে, এই তথ্যটি বেশি বেশি করে ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রচার করতে পারলেই খৃষ্টের ভাল সেবক হওয়া যায়!

২. এ সকল আয়াতে বারংবার বলা হয়েছে : "ইহা তোমাদের সকল নিবাসে পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি।"

নবম উদাহরণ : শনিবার (the sabbath of the LORD)-কে সম্মান করা এবং এই দিনে সকল প্রকার কাজকর্ম বন্ধ রাখা মোশির ব্যবস্থা অনুসারে একটি অলঙ্ঘনীয় চিরস্থায়ী বিধান। কেউ এই দিনে সামান্যতম কর্মও করতে পারবেন না। কেউ যদি এই দিনে কোন প্রকারের কর্ম করেন এবং এই দিনের মর্যাদা রক্ষা না করেন তবে তাকে হত্যা করা অত্যাবশ্যক। পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির বিভিন্ন স্থানে বারংবার এই বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

যেমন : আদিপুস্তকের ২য় অধ্যায়ের ৩ আয়াতে, যাত্রাপুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ৮-১১ আয়াতে, যাত্রাপুস্তকের ২৩ অধ্যায়ের ১২ আয়াতে, যাত্রাপুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ের ২১ আয়াতে, লেবীয় পুস্তকের ১৯ অধ্যায়ের ৩ আয়াতে, লেবীয় পুস্তকের ২৩ অধ্যায়ের ৩ আয়াতে, দ্বিতীয় বিবরণের ৫ অধ্যায়ের ১২-১৫ আয়াতে, যিরমিয়র পুস্তকের ১৭ অধ্যায়ে, যিশাইয়র পুস্তকের ৫৬ অধ্যায়ে, যিশাইয়র পুস্তকের ৫৮ অধ্যায়ে, নহিমিয়ের পুস্তকের ৯ অধ্যায়ে ও যিহিষ্কেলের পুস্তকের ২০ অধ্যায়ে।

যাত্রাপুস্তকের ৩১ অধ্যায়ে নিম্নরূপ বলা হয়েছে; "১৩ তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আরও এই কথা বল, তোমরা অবশ্য আমার বিশ্রামদিন পালন করিবে; কেননা তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার ও তোমাদের মধ্যে ইহা এক চিহ্ন রহিল, যেন তোমরা জানিতে পার যে, আমিই তোমাদের পবিত্রকারী সদাপ্রভু। ১৪ অতএব তোমরা বিশ্রামদিন পালন করিবে, কেননা তোমাদের নিমিত্ত এই দিন পবিত্র; যে কেহ সেই দিন অপবিত্র করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; কারণ যে কেহ ঐ দিনে কার্য করিবে, সে আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে (that soul shall be cut off from among his people)। ১৫ ছয় দিন কার্য করা হইবে, কিন্তু সপ্তম দিন সদাপ্রভুর উদ্দেশ্য বিশ্রামার্থক পবিত্র মিশ্রাম দিন, সেই বিশ্রামদিনে যে কেহ কার্য করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। ১৬ ইস্রায়েল-সন্তানগণ চিরস্থায়ী নিয়ম বলিয়া পুরুষানুক্রমে বিশ্রামদিন মান্য করিবার জন্য বিশ্রামদিন পালন করিবে। ১৭ আমার ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে ইহা চিরস্থায়ী চিহ্ন; কেননা সদাপ্রভু ছয় দিনে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়া আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।"

যাত্রাপুস্তকের ৩৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "২ ছয় দিন কার্য করা যাইবে, কিন্তু সপ্তম দিন তোমাদের পক্ষে পবিত্র দিন হইবে; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বিশ্রামার্থক বিশ্রাম দিন হইবে; যে কেহ সেই দিন কার্য করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। ৩ তোমরা বিশ্রামদিনে আপনাদের কোন বাসস্থানে অগ্নি জ্বালিও না।"

গণনাপুস্তকের ১৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "৩২ ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন প্রান্তরে ছিল, তখন বিশ্রামদিনে এক জনকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে দেখিল। ৩৩ যাহারা তাহাকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছিল, তাহারা মোশি, হারোণ ও সমস্ত মণ্ডলীর নিকটে তাহাকে আনিল। ৩৪ আর তাহারা তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিল; কেননা তাহার প্রতি কি

কর্তব্য, তাহা ব্যক্ত হয় নাই। ৩৫ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, সেই ব্যক্তির প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে শিবিরের বাহিরে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে। ৩৬ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে শিবিরের বাহিরে লইয়া গিয়া প্রস্তরাঘাত করিল; তাহাতে সে মরিয়া গেল।"

খৃস্টের সমসাময়িক ইহূদীগণের দৃষ্টিতে খৃস্ট শনিবার বা বিশ্রামদিন যথাযথ সম্মান করতেন না। একারণেই তারা খৃস্টকে কষ্ট দিত এবং তাঁকে হত্যা করতে ইচ্ছুক ছিল। এছাড়া যীশুখৃস্টের ভাববাদিত্ব অস্বীকার করারও এটি ছিল অন্যতম কারণ। যোহনলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ের ১৬ আয়াতে বলা হয়েছে; "আর এই কারণ যিহূদীরা যীশুকে তাড়না করিতে লাগিল, কেননা তিনি বিশ্রামবারে এই সকল করিতেছিলেন।"

যোহনলিখিত সুসমাচারের ৯ম অধ্যায়ের ১৬ আয়াতে বলা হয়েছে: "তখন কয়েকজন ফরীশী বলিল, সে ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে আইসে নাই, কেননা সে বিশ্রামবার পালন করে না।"

প্রিয় পাঠক!

উপরে সপ্তম ও অষ্টম উদাহরণে পর্ব ও শনিবার বিষয় যে বিধানগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ পৌল মহাশয় সেগুলি সবই রহিত ও বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল বিধান সবই ছিল এক প্রকারের ইঙ্গিত ও ছায়া মাত্র। কলসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন : "১৬ অতএব ভোজন কি পান, কি উৎসব, কি অমাবস্যা, কি বিশ্রামবার, এই সকলের সম্বন্ধে কেহ তোমাদের বিচার না করুক; ১৭ এ সকল ত আগামী বিষয়ের ছায়ামাত্র (shadow of things of come), কিন্তু দেহ খৃস্টের।"

ডাওয়ালি ও রজার্ডমেন্ট (G. D'Oyley and R. Mant)-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (Notes, Practical and Explanatory to the Holy Bible) এই আয়াতের ব্যাখ্যার টীকায় বলা হয়েছে : "প্রীষ্ট ও ড. ওয়েটবি বলেন: ইহূদীদের মধ্যে তিন প্রকারের পর্ব প্রচলিত ছিল: প্রতি বছর বছর পালিত পর্ব, প্রতি মাসে মাসে পালিত পর্ব ও প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে পালিত পর্ব। এ সকল পর্ব সবই রহিত হয়ে গিয়েছে। এমনকি শনিবার সাবাথ বা বিশ্রামদিন পালনও রহিত হয়ে যায়। তদস্থলে খৃস্টানদের সাবাথ (রবিবার) পালনের ব্যবস্থা করা হয়।"

বিশপ হার্সলি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : "ইহূদী চার্চের (সিনাগগের) সাবাথ তিরোহিত হয়ে যায়। খৃস্টানগণ তাদের সাবাথ অর্থাৎ রবিবার (খৃস্টের পুনরুত্থানের দিবস, প্রভুর দিবস বা Lord's day) পালনে ফরীসীদের শিশুসুলভ আচার-অনুষ্ঠানের অনুসরণ করেন নি।"

হেনরি ও স্কট (M. Henry and T. Scott)-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে (A commentary Upon The Holy Bible) বলা হয়েছে: "যীশুর আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রহিত করে

দিয়েছেন। কাজেই কারো অধিকার নেই যে, এ সকল আচার-অনুষ্ঠান পালন না করার কারণে অন্যান্য জাতিদেরকে আপত্তি করবে। পাসোবার ও লিয়াফান বলেন: শনিবার পালন যদি সকল মানুষ এবং সকল জাতির জন্য বাধ্যতামূলক হতো তবে বর্তমানে যেভাবে প্রকৃতপক্ষে শনিবার পালন রহিত হয়ে গিয়েছে সেভাবে কখনোই তা রহিত করা সম্ভব হতো না। আর সেক্ষেত্রে খৃস্টানগণের জন্য জরুরী হতো, প্রথম যুগের খৃস্টানগণ যেভাবে শনিবার পালন করতেন, সেভাবেই পরবর্তী সকল যুগে পর্যায়ক্রমে খৃস্টানগণ শনিবারকে সম্মান করবেন এবং তা পালন করবেন। প্রথম যুগের খৃস্টানগণ শনিবার পালন করেছেন ইহুদীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এবং তাদেরকে খুশি করার জন্য।"

পাঠক দেখেছেন যে, খৃস্টানদের মহাপুরুষ পৌল মোশির ব্যবস্থার বিধানাবলির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, 'আগামী বিষয়ের ছায়া' হিসাবে ঈশ্বর সেই বিধানগুলি দিয়েছেন। পৌলের এই ব্যাখ্যা তোরাহ-এর বক্তব্যের সাথে মিলে না (তোরাহ-এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ছায়া হিসাবে নয়, বরং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট কারণে এই বিধানগুলি প্রদান করা হয়)।

বিভিন্ন প্রাণীর অবৈধতা ও অশুচির কারণ বর্ণনা করে ঈশ্বর বলেছেন যে, সেগুলি অপবিত্র বা অশুচি, অতএব 'তোমরা পবিত্র হইবে, কারণ আমি পবিত্র'। লেবীয় পুস্তকের ১ অধ্যায়ে এ কথা বলা হয়েছে।[১]

নিস্তারপর্ব (Passover) উপলক্ষ্যে 'তাড়িশূন্য রুটীর পর্ব (the feast of unleavened bread)-এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন: "কেননা এই দিনে আমি তোমাদের বাহিনীদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিলাম; অতএব তোমরা পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধিমতে এই দিন পালন করিবে।" যাত্রা পুস্তকের ১২ অধ্যায়ে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

কুটীরোৎসব (the feast of tabernacles)-এর কারণ উল্লেখ্ করে তিনি বলেন: "ইহাতে তোমাদের ভাবী বংশ জানিতে পারিবে যে, আমি ইস্রায়েল সন্তানগণকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া কুটীরে বাস করাইয়াছিলাম।" লেবীয় পুস্তকের ২৩ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩]

বিভিন্ন স্থানে শনিবারকে মর্যাদা প্রদানের কারণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে: "কেননা সদাপ্রভু ছয় দিনে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়া আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।"[৪]

---

১. লেবীয় ১১/৪৪, ৪৫।
২. যাত্রাপুস্তক ১২/১৭।
৩. লেবীয় ২৩/৪৩।
৪. আদিপুস্তক ২/৩; যাত্রাপুস্তক ২০/১১; দ্বিতীয় বিবরণ ৫/১৪।

দশম উদাহরণ : খতনা ও ত্বক্‌ছেদ করা (Circumcision) অবরাহামের ব্যবস্থায় একটি অলঙ্ঘনীয় চিরস্থায়ী বিধান। আদিপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ে তা স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে।[১] এ জন্য অব্রাহামের দুই পুত্র ইশ্মায়েল ও ইসহাকের বংশধরদের মধ্যে এই বিধান প্রচলিত থাকে। মোশির ব্যবস্থায়ও এই বিধান কার্যকর থাকে। লেবীয় পুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ৩ আয়াতটি নিম্নরূপ: "পরে অষ্টম দিনে বালকটির পুরুষাঙ্গের ত্বক্‌ছেদ হইবে।" যীশুরও ত্বক্‌ছেদ করা হয়েছিল। লূক লিখিত সুসমাচারের ২ অধ্যায়ের ২১ আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন পর্যন্ত যীশুর ত্বক্‌ছেদ দিবস উপলক্ষে নির্ধারিত প্রার্থনা রয়েছে যা তাঁরা এই দিবসের স্মরণে পালন করেন। যীশুর উর্ধ্বারোহণ পর্যন্ত এই বিধান কার্যকর ছিল। যীশু এই বিধান রহিত করেন নি। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রেরিতগণের যুগে তাঁরা এই 'চিরন্তন' বিধানটি রহিত করেন। প্রেরিতগণের কার্যবিবরণ পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ত্রয়োদশ উদাহরণের আলোচনায় পাঠক তা দেখতে পাবেন।

খৃস্টধর্মের মহাপুরুষ পৌল এই বিধানটি রহিত করার বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পত্রের ৫ম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন : "২ দেখ, আমি পৌল তোমাদিগকে কহিতেছি, যদি তোমরা ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হও, তবে খ্রীষ্ট হইতে তোমাদের কিছুই লাভ হইবে না। ৩ যে কোন মনুষ্য ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আমি পুনরায় এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, সে ঋণশোধের ন্যায় সমস্ত ব্যবস্থা পালন করিতে বাধ্য। ৪ তোমরা যে সকল লোক ব্যবস্থা দ্বারা ধার্মিক গণিতক হইতে যত্ন করিতেছ, তোমরা খ্রীষ্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছ, তোমরা অনুগ্রহ হইতে পতিত হইয়াছ। .... ৬ কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে ত্বক্‌ছেদের কোন শক্তি নাই, অত্বক্‌ছেদেরও নাই; কিন্তু প্রেম দ্বারা কার্যসাধক বিশ্বাসই শক্তিযুক্ত।"[২]

এই পত্রেরই ৬ অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে: "কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে[৩] ত্বক্‌ছেদ কিছুই নয়, ত্বক্‌ছেদও নয়, কিন্তু নূতন সৃষ্টিই সার।"

একাদশ উদাহরণ : মোশির ব্যবস্থায় পশু জবাই বা বলিদান সংক্রান্ত অনেক বিধান রয়েছে, যেগুলি চিরস্থায়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যীশুর ব্যবস্থায় সেগুলি সবই রহিত করা হয়েছে।

---

১. আদিপুস্তক ১৭/৯-১৪।

২. অর্থাৎ, অপবিত্র খাদ্যভক্ষণ, ব্যভিচার ইত্যাদির চেয়েও কঠিন অপরাধ হলো ত্বক্‌ছেদ করা। এ সকল অপরাধ করলে কেউ অনুগ্রহ থেকে পতিত হবেনা। কিন্তু ত্বক্‌ছেদ করলে সে অনুগ্রহ থেকে পতিত হবে এবং খৃষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হবে।

৩. (খ্রীষ্ট যীশুতে) এই কথাটুকু বাংলা বাইবেলে নেই। আরবী ও ইংরেজিতে রয়েছে।

দ্বাদশ উদাহরণ : হারোণের বংশধর লেবীয় পুরোহিত, তাদের পোশাক, সেবাকর্মে উপস্থিতির সময় ইত্যাদি বিষয়ে অনেক বিধান মোশির ব্যবস্থায় রয়েছে, সেগুলি সবই চিরস্থায়ী বিধান। যীশুর ব্যবস্থায় সে সকল বিধান সবই রহিত করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ উদাহরণ : প্রেরিতগণ নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ পূর্বক তোরাহ-এর সকল বিধান রহিত করে দেন। শুধু চারিটি বিধান কার্যকর রাখেন : প্রতিমার প্রসাদ বা প্রতিমার জন্য উৎসর্গিত প্রাণী, রক্ত, গলা টিপে মারা প্রাণীর মাংস ও ব্যভিচার এই চারিটি বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা তাঁরা বহাল রাখেন। এই মর্মে তাঁরা বিভিন্ন চার্চ-মণ্ডলীর নিকট পত্র প্রেরণ করেন। প্রেরিতদের কার্যবিবরণের ১৫ অধ্যায়ে এ সকল বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের কয়েকটি আয়াত নিম্নরূপ : "২৪ আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে, আমরা যাহাদিগকে কোন আজ্ঞা দিই নাই, এমন কয়েক ব্যক্তি আমাদের মধ্য হইতে গিয়া কথা দ্বারা তোমাদের প্রাণ অস্থির করিয়া তোমাদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। <u>তাহারা তোমাদিগকে কহিতেছে যে, তোমাদিগকে অবশ্যই ত্বক্‌ছেদ করিতে হইবে এবং ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হইবে (saying, Ye must be circumcised, and keep the law)</u>[১]। ....২৮ কারণ পবিত্র আত্মার এবং আমাদের ইহা বিহিত বোধ হইল, যেন এই কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া তোমাদের উপরে আর কোন ভার না দিই, ২৯ ফলে প্রতিমার প্রসাদ এবং রক্ত ও গলা টিপিয়া মারা প্রাণীর মাংস ও ব্যভিচার হইতে পৃথক থাকা তোমাদের উচিত; এই সকল হইতে আপনাদিগকে সযত্নে রক্ষা করিলে তোমাদের কুশল হইবে। তোমাদের মঙ্গল হউক।"

তাঁরা এই চারিটি বিধান কার্যকর রেখেছিলেন শুধু খৃস্টধর্মে নবদীক্ষিত ইহূদীদেরকে বিরক্ত না করার জন্য। কারণ ইহূদীরা ভালবাসতেন যে, মোশির ব্যবস্থার বিধিবিধান পালন করা হোক। অতৎপর কিছুদিন পরে যখন খৃস্টধর্মের মহাপুরুষ পৌল দেখলেন যে, ইহূদীদের মনোরঞ্জনের আর প্রয়োজন নেই, তখন তিনি এই চারটি বিধানের মধ্যে পানাহার বিষয়ক তিনটি বিধানই রহিত করে দিলেন। ইতোপূর্বে সপ্তম উদাহরণে এ বিষয়ে পৌলের 'ঢালাও বৈধকরণ' ফতওয়াটি উল্লেখ করা হয়েছে।

অধিকাংশ প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত এ বিষয়ে একমত। এভাবে আমরা দেখেছি যে, পুরাতন নিয়মের সকল কর্মবিষয়ক বিধিবিধান খৃস্টীয় ব্যবস্থায় রহিত করা হয়েছে। শুধু ব্যভিচারের অবৈধতার বিধানটিই কার্যকর রাখা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে মোশির ব্যবস্থায় যে শাস্তির বিধান ছিল তা খৃস্টীয় ব্যবস্থায় তুলে দেওয়া হয়েছে। খৃস্টীয় ব্যবস্থায় ব্যভিচারের কোন শাস্তি নেই। এভাবে ব্যভিচার বিষয়ক মোশির ব্যবস্থাও প্রকৃত অর্থে রহিত করা হয়েছে।

১. নিম্নরেখ কথাগুলি ইংরেজি ও আরবী বাইবেলে রয়েছে, কিন্তু বাংলা বাইবেলে নাই।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পুরাতন নিয়ম বা মোশির ব্যবস্থার সকল কর্মবিষয়ক বিধিবিধানই-তা চিরস্থায়ী হোক আর না হোক–সবই যীশুর ব্যবস্থায় রহিত হয়েছে।[১]

চতুর্দশ উদাহরণ : গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে: "২০ খৃষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খৃষ্টই আমাতে জীবিত আছেন; আর এখন মাংসে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই যাপন করিতেছি; তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন, এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন। ২১ আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিফল করি না; কারণ ব্যবস্থা দ্বারা যদি ধার্মিকতা হয়, তাহা হইলে সুতরাং খৃষ্ট অকারণে মরিলেন।"

ড. হেমণ্ড ২০ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: "আমার জন্য খৃষ্ট তাঁর আত্মা উৎসর্গ করে আমাকে মোশির ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করেছেন।" আর ২১ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন : "এই মুক্তিকে আমি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি। আমি মুক্তির জন্য মোশির ব্যবস্থার উপর নির্ভর করি না এবং মোশির ব্যবস্থা পালন করা আমি প্রয়োজনীয় বলে মনে করি না। কারণ মোশির ব্যবস্থা পালন করার অর্থ হলো খৃষ্টের সুসমাচারকে অর্থহীন বলে গণ্য করা।"

ড. ওয়েটবি ২১ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : "মুক্তির জন্য যদি মোশির ব্যবস্থা পালনের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে, তবে খৃষ্ট তাঁর মৃত্যুর বিনিময়ে মুক্তি ক্রয় করলেন কেন? তাহলে তো তাঁর মৃত্যু একটি অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন কাজ বলে গণ্য হবে।"

১. এখানে উল্লেখ্য যে, খৃষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি পৌল ও অন্যান্য 'প্রেরিত' কর্তৃক মোশির ব্যবস্থার এইরূপ রহিতকরণ যীশুর শিক্ষার সরাসরি বিরোধী। যীশু বলেন: "মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে। অতএব যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতিক্ষুদ্র বলা যাইবে; কিন্তু যে কেহ সে সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান বলা যাইবে। কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অধ্যাপক ও ফরীশীদের অপেক্ষা তোমাদের ধার্মিকতা যদি অধিক না হয় তবে তোমরা কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না।" মথি ৫/১৭-২০।

এখানে আরো লক্ষ্যণীয় যে, শনিবারে বিশ্রামদিন পালন করা ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার অন্যতম, যে দশ আজ্ঞা অলঙ্ঘণীয় বলে যীশু বারংবার উল্লেখ করেছেন। এভাবে যীশু ব্যবস্থা পালন করতে এবং সবচেয়ে গোঁড়া ধার্মিক আক্ষরিকভাবে ব্যবস্থা পালনকারী ফরীশীদের চেয়েও পূর্ণতর রূপে ব্যবস্থা পালন করতে বললেন। অথচ মহামতি পৌল ও তাঁর সহচরগণ নতুন ধর্মকে রোমানদের নিকট 'সহজ' ও 'কর্মহীন' বিশ্বাসে পরিণত করে 'দলভারী' করার 'শুভ ইচ্ছায়' অথবা 'ইচ্ছাপূর্বক' যীশুর আজীবনের শিক্ষা বিকৃত করে যীশুর প্রচারিত সত্যিকার ধর্ম বিলুপ্ত করার 'অশুভ ইচ্ছায়' বিভিন্ন কূটতর্কের মাধ্যমে সকল বিধান বিলুপ্ত করেন।

পায়েল বলেন: "ইহূদীদের ব্যবস্থাই যদি আমাদের রক্ষা করবে এবং আমাদেরকে মুক্তি দিবে, তবে খৃস্টের মৃত্যুর কি প্রয়োজন ছিল? মোশির ব্যবস্থা যদি আমাদের মুক্তির জন্য একটি আংশিক বিষয়ও মনে করা হয় তবে মনে করা হবে যে, খৃস্টের মৃত্যু আমাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট ছিল না।"[১]

এ সকল বক্তব্য সবই প্রমাণ করে যে, খৃস্টধর্মে মোশির ব্যবস্থা বা পুরাতন নিয়মের সকল বিধিবিধান রহিত করা হয়েছে এবং খৃস্টানগণ সেগুলি পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত।

পঞ্চদশ উদাহরণ : গালাতীয়দের প্রতি উক্ত পত্রের ৩য় অধ্যায়ে রয়েছে: "বাস্তবিক যাহারা ব্যবস্থার ক্রিয়াবলম্বী, তাহারা সকলে শাপের অধীন (অভিশপ্ত)...... ব্যবস্থার দ্বারা কেহই ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক গণিত হয় না....... ব্যবস্থা বিশ্বাসমূলক নয়...... খ্রীস্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি আমাদের নিমিত্তে শাপস্বরূপ হইলেন।"[২]

লার্ডনার (Nathaiel Lardner) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের নবম খণ্ডের ৪৮৭ পৃষ্ঠায় এই আয়াতগুলি উদ্ধৃত করার পরে বলেন : "আমার মনে হয় এখানে পৌলের কথার অর্থ হলো, খৃস্টের মৃত্যুর মাধ্যমে মোশির ব্যবস্থা রহিত হয়ে গিয়েছে বা তা অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়েছে। অনেকস্থানেই পৌল এই কথাটি শিক্ষা দিয়েছেন।"

অতঃপর তিনি উক্ত খণ্ডের ৪৮৮ পৃষ্ঠায় বলেন : "এ সকল স্থানে পৌল সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন যে, যীশুর মৃত্যুতে মোশির ব্যবস্থা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সবই রহিত ও বিলুপ্ত হয়েছে।"

ষোড়শ উদাহরণ : উক্ত পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে : "২৩ কিন্তু বিশ্বাস আসিবার পূর্বে আমরা ব্যবস্থার অধীনে রক্ষিত হইতেছিলাম, যে বিশ্বাস পরে প্রকাশিত হইবে, তাহার অপেক্ষায় রুদ্ধ ছিলাম। ২৪ এই প্রকারে ব্যবস্থা খৃস্টের কাছে আনিবার জন্য আমাদের পরিচালক দাস হইয়া উঠিল (the law was our school master to bring us unto Christ)। ২৫ কিন্তু যে অবধি বিশ্বাস আসিল, সেই অবধি আমরা আর পরিচালক দাস (school master)-এর অধীন নহি।"

এখানেও খৃস্টানদের পবিত্রপুরুষ পৌল মহাশয় সুস্পষ্টভাবে বললেন যে, খৃস্টের প্রতি বিশ্বাসের পরে তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থার কোন কার্যকারিতা আর নেই।

১. অর্থাৎ বিশ্ববাসীর জন্য সকল পাপের দরজা উন্মুক্ত করে দিতেই যীশু নিজের জীবন দিয়েছেন। তাঁর প্রাণদানের পরে আর কারো কোন ধর্মকর্ম বা পাপবর্জনের প্রয়োজন নেই। ব্যভিচার, খুন, মাদক সেবন,, প্রতিবেশীর প্রতি অত্যাচার, মিথ্যা সাক্ষ্য..... ইত্যাদি সকল ব্যবস্থা-নিষিদ্ধ ধর্ম-কর্ম এখন আমাদের সাধ্যমত বেশি বেশি করতে হবে। কারণ 'ধর্ম পালন' বা 'পাপ বর্জন' করেই যদি স্বর্গে যেতে হয়, তবে খৃস্টের মৃত্যুই অর্থহীন।

২. গালাতীয় ৩/১০-১৩, সংক্ষেপিত।

ডাওয়ালি ও রজার্ডমেন্ট (G. D'Oyley and R. Mant)-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (Notes, Practical and Explanatory to the Holy Bible) ডিনেস্টাইন হোপ-এর নিম্নলিখিত বক্তব্যটি উদ্বৃত করা হয়েছে: "যীশুর মৃত্যু ও তাঁর সুসমাচারের প্রচারের মাধ্যমে মোশির ব্যবস্থা ও আচার-অনুষ্ঠান রহিত হয়েছে।"

সপ্তদশ উদাহরণ : ইফিষীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৫ আয়াতে তিনি লিখেছেন : "শত্রুতাকে, বিধিবদ্ধ আজ্ঞাকলাপরূপ ব্যবস্থাকে, নিজ মাংসে লুপ্ত করিয়াছেন (abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances)।"

অষ্টাদশ উদাহরণ : ইব্রীয়দের প্রতি প্রেরিত পত্রের ৭ম অধ্যায়ের ১২ আয়াতটি নিম্নরূপ: "যাজকত্ব যখন পরিবর্তিত হয়, তখন ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়, ইহা আবশ্যক (For the priesthood being change, there is made of necessity a change also of the law)।"

এই আয়াতে যাজকত্ব, নেতৃত্ব বা ভাববাদিত্ব পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যবস্থা বা শরীয়তের পরিবর্তনকে আবশ্যকীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কাজেই মুসলমানগণ যখন বলেন যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের মাধ্যমে যীশুর ব্যবস্থা পরিবর্তিত বা রহিত হয়েছে, তখন এই মূলনীতির ভিত্তিতে তাঁরা সঠিক কথাই বলেন, কোন ভুল কথা বলেন না।

ডাওয়ালি ও রজার্ডমেন্ট-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই আয়াতের টীকায় ড. সিকনাইটের নিম্নের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে: "নিঃসন্দেহে ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। পশু জবাই, শুচিতা-অশুচিতা ও অন্যান্য বিষয়ের বিধিবিধান পরিবর্তিত হয়েছে, অর্থাৎ রহিত হয়ে গিয়েছে।"

উনবিংশ উদাহরণ : উপর্যুক্ত পত্রের ৭ম অধ্যায়েই ১৮ আয়াতটি নিম্নরূপ: "কারণ এক পক্ষে পূর্বকার বিধির দুর্বলতা ও নিষ্ফলতা প্রযুক্ত তাহার লোপ (রহিতকরণ) হইতেছে (For there is verily a disannulling of the commandment going before for the weakness and unprofitanleness thereof)।"

এই আয়াতে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, দুর্বলতা ও ফলহীনতার কারণে তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের বিধিবিধান রহিত হয়ে গেল।

হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে রয়েছে: "ব্যবস্থা বিধি ও যাজকত্ব রহিত করা হলো, কারণ এগুলি দ্বারা পূর্ণতা অর্জিত হয় না। এর পরিবর্তে নতুন যাজক ও নতুন ক্ষমা স্থলাভিষিক্ত হলো, যাদের মাধ্যমে সত্যবাদী বিশ্বাসিগণ পূর্ণতা লাভ করবেন।"

বিংশ উদাহরণ : ইব্রীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ৮ম অধ্যায়ে রয়েছে: "৭ কারণ ঐ প্রথম নিয়ম যদি নির্দোষ হইত, তবে দ্বিতীয় এক নিয়মের জন্য স্থানের চেষ্টা করা যাইত না।...... ১৩ 'নূতন' বলাতে তিনি প্রথমটি পুরাতন করিয়াছেন; কিন্তু যাহা পুরাতন ও জীর্ণ হইতেছে, তাহা অন্তর্হিত হইতে উদ্যত।"

এখানেও স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের বিধিবিধান ও ব্যবস্থা ত্রুটিযুক্ত এবং প্রাচীন ও জীর্ণ হওয়ার কারণে তা রহিত ও বিলুপ্ত হওয়ার যোগ্য।

ডাওয়ালি ও রজার্ডমেন্ট-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে ১৩ আয়াতের টীকায় পায়েল-এর নিম্নলিখিত বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা হয়েছে: "একথা অন্তত স্পষ্ট যে, মহিমাময় ঈশ্বর নূতন উত্তম বিধানের মাধ্যমে পুরাতন অসম্পূর্ণ বিধানকে রহিত করতে চান। এজন্যই ইহূদীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিধানাবলি বিলোপ করে সেখানে খৃষ্টধর্মকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।"

একবিংশ উদাহরণ : ইব্রীয়দের পত্রের ১০ অধ্যায়ের ৯ আয়াতে বলা হয়েছে: "তিনি প্রথম বিষয় লোপ করিতেছেন, যেন দ্বিতীয় বিষয় স্থির করেন।"

ডাওয়ালি ও রজার্ডমেন্ট-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে ৮ ও ৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় পায়েলের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে: "পৌল এই আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। এগুলির মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইহূদীদের যজ্ঞ ও নৈবেদ্য মুক্তি ও ঈশ্বর প্রেমের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এজন্য যীশু নিজে মৃত্যু গ্রহণ করে সেই অপূর্ণতা পূর্ণ করেছেন। তিনি একটি কর্মের মাধ্যমে অপরটি রহিত করেছেন।"

বিজ্ঞ পাঠক!

উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি বুঝতে পেরেছি:

প্রথমত : পরবর্তী ব্যবস্থা বা ধর্মে পূর্ববর্তী ব্যবস্থা বা ধর্মের কিছু বিধিবিধান রহিত হওয়া শুধু মুসলমানদের দাবি নয় বা ইসলামের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় নয় বরং পূর্ববর্তী ধর্ম ও ব্যবস্থাগুলিতেও তা দেখতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত : তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের সকল বিধানই খৃষ্টধর্মে রহিত ও বিলুপ্ত করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মে যে সকল বিধান 'চিরস্থায়ী' ও 'চিরন্তন' বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলিসহ সকল বিধানই রহিত করা হয়েছে।

তৃতীয়ত : খৃষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ পৌলের বক্তব্যের মধ্যে 'রহিত করা' বা 'বিলোপ করা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

চতুর্থত : খৃষ্টানদের মহাপুরুষ পৌল উল্লেখ করেছেন যে, নেতৃত্ব বা ভাববাদিত্ব পরিবর্তন হলে ব্যবস্থা ও বিধিবিধানের পরিবর্তন হওয়া আবশ্যকীয়।

পঞ্চমত : খৃষ্টীয় মহাপুরুষ পৌল দাবি করেছেন যে, পুরাতন ও জীর্ণ বিষয় বিলুপ্ত হওয়ার যোগ্য। এখানে আমার বক্তব্য হলো, যীশুর ব্যবস্থাটি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রাচীন ও জীর্ণ। কাজেই তা রহিত হওয়া বা বিলুপ্ত হওয়া কোন আপত্তিকর বিষয় নয় বরং চতুর্থ বিষয়টির আলোকে তা আবশ্যকীয়। অষ্টাদশ উদাহরণে পাঠক তা দেখতে পেয়েছেন।

ষষ্ঠত : খৃষ্টানদের প্রাণপুরুষ পৌল মহাশয় এবং খৃষ্টান ব্যাখ্যাকার পণ্ডিতগণ পুরাতন নিয়ম ও তোরাহ সম্পর্কে (জীর্ণ, দুর্বল, নিষ্ফল, অপূর্ণ, অভিশাপের কারণ......

ইত্যাদি) অনেক অশালীন ও অশোভনীয় মন্তব্য করেছেন, যদিও তাঁরা তাকে ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করেন।

সপ্তমত : মুসলিম দৃষ্টিকোণ থেকে খৃষ্টের ব্যবস্থা দ্বারা মোশির ব্যবস্থা, তোরাহ্ বা আজ্ঞাসমূহের রহিতকরণ বা বিলোপ সাধন কোন আপত্তিকর বিষয় নয়। শুধু তোরাহ্-এ যে সকল আজ্ঞা বা বিধানকে 'চিরস্থায়ী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির বিলোপ বা রহিতকরণ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিজনক। কারণ ঈশ্বর যে বিষয়টিকে চিরস্থায়ী, চিরন্তন বা চিরকাল বা পুরুষানুক্রমে পালনীয় বলে ঘোষণা করলেন, সেটিকে তিনিই আবার বিলুপ্ত বা রহিত করবেন তা হতে পারে না। তাহলে তাঁর কথা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।

এখানে লক্ষণীয় যে, বর্তমানে প্রচলিত তোরাহ বা পুরাতন নিয়মে যে সকল বিধানকে এভাবে চিরস্থায়ী বা পুরুষানুক্রমে পালনীয় বলে উল্লেখ করা রয়েছে সেগুলিকে খৃষ্টানগণ রহিত করলে তা আপত্তিকর বলে গণ্য হবে, মুসলিমগণ রহিত করলে তা আপত্তিকর বলে গণ্য হবে না। কারণ খৃষ্টানগণ পুরাতন নিয়মকে 'ঈশ্বরের বাণী' বলে বিশ্বাস করেন, কিন্তু মুসলমানগণ সেভাবে বিশ্বাস করেন না। প্রথমত, প্রচলিত তোরাহ-ই যে মোশির তোরাহ তা মুসলমানগণ স্বীকার করেন না। প্রথম অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মুসলমানগণ স্বীকার করেন না যে, এই প্রচলিত তোরাহটি বিকৃতিমুক্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তা প্রমাণসহ আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, আমরা বিশ্বাস করি না, তবে বাইবেলের বক্তব্য অনুসারে বলতে পারি যে, কোন বিধান বা নির্দেশ প্রদানের পর ঈশ্বর তাঁর ভুল বুঝতে পারেন ও অনুতপ্ত হতে পারেন। অনুরূপভাবে তিনি কোন চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞা করার পরে তা ভঙ্গ করতে পারেন। এ কথা বলছি শুধু বাইবেল অনুসারীদের বিশ্বাসের বিভ্রান্তির প্রমাণ করার জন্য; কারণ পাঠক শীঘ্রই দেখবেন যে, পুরাতন নিয়মের অনেক স্থান থেকে এই কথাগুলি বুঝা যায়। তবে আমি ও 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের' অর্থাৎ মূলধারার কোন মুসলিম পণ্ডিত এইরূপ কথা বিশ্বাস করেন না। আমরা সকলেই এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্ত।

পক্ষান্তরে খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করেন ও স্বীকার করেন যে, তোরাহ ঈশ্বরের বাণী, মোশির লিখিত ও এখন পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছে। ভুল করা বা অনুতপ্ত হওয়া ঈশ্বরের ক্ষেত্রে অসম্ভব। কাজেই সেই তোরাহ-এ যে বিধানকে চিরস্থায়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে তাঁরা রহিত বা লোপ করলে তা নিঃসন্দেহে আপত্তিকর বলে গণ্য হবে।

এ সকল বিধানকে রহিত করার জন্য তাঁরা যে সকল ব্যাখ্যা প্রদান করেন সেগুলি অত্যন্ত পেচানো, দূরবর্তী ও একেবারেই শিশুসুলভ বাতুল কথা। কারণ প্রত্যেক কথার অর্থ সেই কথায় ব্যবহৃত শব্দাবলির স্বাভাবিক অর্থ থেকে গ্রহণ করতে হবে। যেমন, কোন ব্যক্তিকে যদি বলা হয়, 'সর্বদা এই কর্মটি করবে' তবে এখানে 'সর্বদা' বলতে

বুঝা যাবে যে, তার জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত বা তার মৃত্যু পর্যন্ত তাকে এই কাজটি করতে হবে। এখানে 'সর্বদা' বলতে 'কেয়ামত পর্যন্ত' বুঝার কোন অবকাশ নেই; কারণ আমরা সন্দেহাতীতভাবে জানি যে, এই ব্যক্তিটি মহাপ্রলয় বা কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন না।

পক্ষান্তরে যখন কোন মহান বা প্রসিদ্ধ জাতি, সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী, যারা ব্যক্তির পরিবর্তন হলেও জাতি হিসাবে মহাপ্রলয় বা পুনরুত্থান পর্যন্ত টিকে থাকবে, তাঁদের বিষয়ে বলা হয় যে, 'পুরুষানুক্রমে তাঁরা কাজটি করবেন', বা 'সকল প্রজন্মে তাঁরা কাজটি করবেন', বা 'চিরকাল তাঁরা কাজটি করবেন' বা 'শেষ যুগ পর্যন্ত তাঁরা কাজটি করবেন' তবে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, মহাপ্রলয় বা কেয়ামত পর্যন্ত সেই জাতির মানুষেরা কাজটি করবেন।

কাজেই একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে অর্থ বুঝা যায়, জাতি বা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সেই অর্থ গ্রহণ করা বা একটি অর্থকে আরেকটির সাথে তুলনা করা অত্যন্ত দূরবর্তী, অবাস্তব ও পেচানো কথা। এজন্য প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে ইহূদী পণ্ডিতগণ খৃস্টানগণের এ সকল ব্যাখ্যাকে অবাস্তব ও অসম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদেরকে অপব্যাখ্যাকারী ও বিভ্রান্ত বলে গণ্য করেছেন।

(খ) একই ভাববাদী ব্যবস্থায় এক বিধান দ্বারা অন্য বিধান রহিতকরণ

রহিতকরণের দ্বিতীয় প্রকার হলো, একই ভাববাদীর ব্যবস্থার মধ্যে একটি বিধান রহিত করে অন্য বিধান দেওয়া। এই প্রকারের 'রহিতকরণ'-এর কতিপয় উদাহরণ দেখুন:

প্রথম উদাহরণ : ঈশ্বর অব্রাহামকে নির্দেশ দেন 'ইসহাক'কে[১] বলিদান করতে। পরে তিনি সেই নির্দেশ কার্যকর করার আগেই তা রহিত করেন। আদিপুস্তকের ২২ অধ্যায়ে বিষয়টি বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ : যাজক এলির (Eli) বিষয়ে ১ শমূয়েলের ২য় অধ্যায়ে একজন ভাববাদীর বক্তব্য নিম্নরূপে উদ্ধৃত করা হয়েছে: "৩০ অতএব তোমার পিতৃকুল যুগে যুগে আমার সম্মুখে গমনাগমন করিবে, কিন্তু এখন সদাপ্রভু কহেন, তারা আমা হইতে দূরে থাকুক। কেননা যাহারা আমাকে গৌরবান্বিত করে, তাহাদিগকে আমি গৌরবান্বিত করিব; কিন্তু যাহারা আমাকে তুচ্ছ করে, তাহারা তুচ্ছীকৃত হইবে।...... ৩৫ আর আমি আপনার নিমিত্ত এক বিশ্বস্ত যাজককে উৎপন্ন করিব.... ।"

১. বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বর 'ইসহাক'কে বলিদান করার নির্দেশ দেন। তবে বাইবেলের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, এখানে 'ইসহাক' শব্দটি পরিবর্তিত। কারণ এখানে বারংবার বলা হয়েছে যে, তোমার একমাত্র পুত্র, তোমার অদ্বিতীয় পুত্র। এই বিশেষণটি শুধু ইশ্মায়েলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ ইশ্মায়েলের জন্মের ১৪ বছর পরে ইসহাকের জন্ম হয়। কাজেই ইসহাক কখনোই অবরাহামের অদ্বিতীয় পুত্র ছিলেন না, বরং তিনি জন্ম থেকেই তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। আদিপুস্তক ২২/২-১২।

এখানে ঈশ্বর স্বয়ং এলিকে অঙ্গীকার বা 'নিয়ম স্থাপন' করেন যে, যাজকের পদটি চিরস্থায়ীভাবে তাঁর ও তাঁর পিতার বংশে থাকবে। কিন্তু এরপর এই অঙ্গীকারটি ভেঙে দেন এবং রহিত করেন। আর তদস্থলে অন্য বংশ থেকে যাজক উৎপন্ন করেন।

ডাওয়ালি ও রজার্ডমেন্ট-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে পণ্ডিত প্যাট্রিক-এর বক্তব্য নিম্নরূপে উদ্ধৃত করা হয়েছে : "ঈশ্বর ইতোপূর্বে যাজক এলি ও তাঁর স্বজনদেরকে ওয়াদা করেছিলেন যে, প্রধান যাজকের পদটিকে চিরস্থায়ীভাবে তাঁদের মধ্যেই থাকবে। এখানে ঈশ্বর সেই ওয়াদাটি রহিত করেছেন। তিনি এই পদটি হারোনের পর পুত্র ইলিয়াসরকে প্রদান করেন। অতঃপর হারোণের কনিষ্ঠ পুত্র ঈথামরকে প্রদান করেন। এরপর যাজক এলির পুত্রদের পাপের কারণে পদটি ইলিয়াসরের বংশধরদের নিকট চলে যায়।"

এভাবে মোশির ব্যবস্থার কার্যকারিতার যুগেই এই অঙ্গীকারটি দুইবার পরিবর্তিত হয়। যীশুর ব্যবস্থা প্রকাশিত হওয়ার পরে তৃতীয়বার এই ওয়াদা পরিবর্তিত হয়। তখন এই পদটিকে ইলিয়াসরের বংশধর এবং ইথামরের বংশধর কারোরই কোন অধিকার থাকে না।

এই পদটি চিরস্থায়ীভাবে ইলিয়াসর-এর বংশধরকে প্রদান করার বিষয়ে ঈশ্বরীয় অঙ্গীকার বা 'নিয়ম' (covenant) গণনা পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ে (১২ ও ১৩ আয়াতে) উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে: "দেখ, আমি তাহাকে আমার শান্তিকর নিয়ম (my covenant of peace) দিয়াছি; তাহা তাহার পক্ষে ও তাহার ভাবী বংশের পক্ষে চিরস্তায়ী যাজকত্বের নিয়ম (the covenant of an everlasting priesthood) হইবে।"

ইহূদী-খৃস্টানগণের রুচি অনুসারে ঈশ্বরের অঙ্গীকার ভঙ্গের অবস্থা দেখে পাঠক বিচলিত হবেন না। পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলিতে এইরূপ অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে ঈশ্বর তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন।

এছাড়া তিনি কোন কোন কর্ম করে এরপর সেজন্য অনুতপ্তও হয়েছেন। গীতসংহিতার ৮৯ গীতের কোন কোন সংস্করণে ৮৮ গীতের-৩৯ আয়াতে দায়ূদের নিম্নের কথাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে: "তুমি আপন দাসের নিয়ম ঘৃণা করিয়াছ (Thou hast made void the covenant of thy servant), তাঁহার মুকুট ভূমিতে ফেলিয়া অশুচি করিয়াছ।"

এখানে দায়ূদ ঈশ্বরকে বলেছেন যে, "তুমি তোমার দাসের প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার (covenant) ভঙ্গ করেছ।"

আদিপুস্তকের ৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "তাই সদাপ্রভু পৃথিবীতে মনুষ্যের নির্মাণ ও প্রযুক্ত অনুশোচনা করিলেন, ও মনঃপীড়া পাইলেন (And it repented the LORD that he had made man on the earth and it greived him at his heart)। ৭ তার সদাপ্রভু কহিলেন, আমি যে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব; মনুষ্যের সহিত পশু, সরীসৃপ পীব ও আকাশের পক্ষীদিগকেও উচ্ছিন্ন করিব; কেননা তাহাদের নির্মাণ প্রযুক্ত আমার অনুশোচনা হইতেছে।"

এখানে ৬ষ্ঠ আয়াতটি পুরোটুকুই এবং ৭ম আয়াতের শেষে "কেননা তাহাদের নির্মাণ প্রযুক্ত আমার অনুশোচনা হইতেছে" কথাটি প্রমাণ করে যে, মানুষ সৃষ্টি করে ঈশ্বর অনুতপ্ত হয়েছেন, ব্যথিত হয়েছেন এবং আফসোস-অনুশোচনা করেছেন।

গীতসংহিতার ১০৬ গীতে (কোন কোন সংস্করণে ১০৫ গীত) বলা হয়েছে: "৪৪ তখন তিনি তাহাদের সঙ্কটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ৪৫ তিনি তাহাদের পক্ষে আপনার নিয়ম স্মরণ করিলেন, নিজ দয়ায় মহত্ত্বানুসারে অনুশোচনা করিলেন।"

১ শমূয়েল-এর ১৫ অধ্যায়ের ১১ আয়াতটি নিম্নরূপ: "আমি শৌলকে রাজা করিয়াছি বলিয়া আমার অনুশোচনা হইতেছে, যেহেতু সে আমার অনুগমন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আমার বাক্য পালন করে নাই।"

এরপর এই অধ্যায়েরই ৩৫ আয়াতে বলা হয়েছে: "শমূয়েল শৌলের জন্য শোক করিতেন। আর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের উপরে শৌলকে রাজা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুশোচনা করিলেন (and the LORD repented that he had made Saul king over Israel)।"

এখানে একটি কূট-যুক্তি পেশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব। আমরা বিষয়টির বিশ্বাস করি না, তবে বাইবেলে বিশ্বাসীদের সাথে বিতর্কের খাতিরে তা বলতে পারি। তা হলো, আমরা বাইবেল থেকে দেখতে পাই যে, ঈশ্বর বিভিন্ন কাজ করে পরে অনুতাপ করেছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টির জন্য অনুতাপ করেছেন, শৌলকে রাজা বানানোর জন্য অনুতাপ করেছেন। কাজেই এমন হতে পারে যে, খৃষ্টকে প্রেরণ করার পরে খৃষ্ট যখন নিজের জন্য ঈশ্বরত্ব দাবি করলেন–ত্রিতত্ত্ববিদগণের ধারণা অনুসারে–তখনও ঈশ্বর অনুতপ্ত হয়েছিলেন ও অনুশোচনা করেছিলেন। কারণ শৌলের অবাধ্যতা ও ঈশ্বরাদেশ পালন না করার অপরাধের চেয়ে একজন সৃষ্ট মানুষের জন্য ঈশ্বরত্ব দাবি করা অনেক কঠিনতর অপরাধ। ঈশ্বর যেমন জানতেন না যে, শৌল তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করবে বা অবাধ্যতা করবে, তেমনি একথাও সম্ভব যে, ঈশ্বর জানতেন না যে, খৃষ্ট ঈশ্বরত্ব দাবি করবে।

আমি বিতর্কের জন্যই এ কথা বলছি। আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা কখনোই বিশ্বাস করি না যে, আল্লাহ্ কোন কর্মের জন্য অনুতাপ বা অনুশোচনা করতে পারেন। অনুরূপভাবে আমরা কখনোই বিশ্বাস করি না যে, খ্রীষ্ট যীশু কোনভাবে ঈশ্বরত্ব দাবি করেছেন। আমাদের বিশ্বাস অনুসারে ঈশ্বরত্বের মর্যাদা এবং ভাববাদিত্বের মর্যাদা এই প্রকারের নোংরামি ও আপত্তিকর বিষয় থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র।

তৃতীয় উদাহরণ : যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১০ তোমার খাদ্য পরিমাণপূর্বক, অর্থাৎ দিন দিন বিংশতি তোলা করিয়া ভোজন করিতে হইবে। তুমি বিশেষ বিশেষ সময়ে তাহা ভোজন করিবে। ...... ১২ আর ঐ খাদ্যদ্রব্য যবের পিষ্টকের ন্যায় করিয়া ভোজন করিবে, এবং তাহাদের দৃষ্টিতে মনুষ্যের বিষ্ঠা দিয়া তাহা পাক করিবে। ......১৪ তখন আমি কহিলাম, আহা, প্রভু সদাপ্রভু, দেখ, আমার

প্রাণ অশুচি হয় নাই; আমি বাল্যকাল অবধি অদ্য পর্যন্ত স্বয়ং মৃত কিম্বা পশু দ্বারা বিদীর্ণ কিছুই খাই নাই, ঘৃণার্হ মাংস কখনও আমার মুখে প্রবিষ্ট হয় নাই। ১৫ তখন তিনি আমাকে কহিলেন, আমি মনুষ্যের বিষ্ঠার পরিবর্তে তোমাকে গোময় দিলাম, তুমি তাহা দিয়া আপন রুটি পাক করিবে।"

এখানে ঈশ্বর প্রথমে মনুষ্যের বিষ্ঠা দিয়ে রুটি পাক করতে আজ্ঞা করেন। এপর পালন করার পূর্বেই তা রহিত করে বলেন : "আমি মনুষ্যের বিষ্ঠার পরিবর্তে তোমাকে গোময় দিলাম।"

চতুর্থ উদাহরণ : লেবীয় পুস্তকের ১৭ অধ্যায়ে রয়েছে : "৩ ইস্রায়েল-কুলজাত যে কেহ শিবিরের মধ্যে কিম্বা শিবিরের বাহিরে গোরু কিম্বা মেষ কিম্বা ছাগ হনন করে, ৪ কিন্তু সদাপ্রভুর আবাসের সম্মুকে সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে উপহার উৎসর্গ করিতে সমাগম-তাম্বর দ্বারসমীপে তাহা না আনে, তাহার উপর রক্তপাতের পাপ গণিত হইবে; সে রক্তপাত করিয়াছে, সে ব্যক্তি আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।"

দ্বিতীয় বিবরণের ১২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১৫ তথাপি যখন তোমার প্রাণের অভিলাষ হইবে, তখন তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত আশীর্বাদানুসারে আপনার সমস্ত নগর-দ্বারের ভিতরে পশু বধ করিয়া মাংস ভোজন করিতে পারিবে..... ২০ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যেমন অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদনুসারে যখন তোমার সীমা বিস্তার করিবেন, এবং মাংস ভক্ষণে তোমার প্রাণের অভিলাষ হইলে তুমি বলিবে, মাংস ভক্ষণ করিব, তখন তুমি প্রাণের অভিলাষানুসারে মাংস ভক্ষণ করিবে। ২১ আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নাম স্থাপনার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, তাহা যদি তোমা হইতে বহু দূর হয়, তবে আমি যেমন বলিয়াছি, তদনুসারে তুমি সদাপ্রভুর দত্ত গোমেষাদি পাল হইতে পশু লইয়া বধ করিবে, ও আপন প্রাণের অভিলাষানুসারে নগর-দ্বারের ভিতরে ভোজন করিতে পারিবে। যেমন কৃষ্ণসার ও হরিণ ভক্ষণ করা যায়, তেমনি তাহা ভক্ষণ করিবে; অশুচি কি শুচি-লোক, সকলেই তাহা ভক্ষণ করিবে।"

এখানে দ্বিতীয় বিবরণের এই বিধান দ্বারা লেবীয় পুস্তকের বিধানটি রহিত করা হলো।

হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৬১৯ পৃষ্ঠায় এই আয়াতগুলি উদ্ধৃত করার পর বলেন : "এই দুই স্থানের মধ্যে বাহ্যত বৈপরীত্য রয়েছে। কিন্তু যদি এ কথা লক্ষ্য করা হয় যে, মোশির ব্যবস্থা অপরিবর্তনীয় ও স্থির ছিল না বরং ইস্রায়েল সন্তানগণের অবস্থা অনুসারে তার মধ্যে সংযোজন ও বিয়োজন করা হতো, তবে এই বৈপরীত্যের সমাধান দেওয়া খুবই সহজ হবে।"

অতঃপর তিনি বলেন: "মিসর ত্যাগের ৪০তম বছরে প্যালেস্টাইনে প্রবেশের পূর্বে মোশি পূর্বোক্ত বিধানটি, অর্থাৎ লেবীয় পুস্তকের বিধানটি সুস্পষ্টরূপে রহিত করেন। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেখানে ইচ্ছা গোরু, মেষ ইত্যাদি বধ করতে পারবে এবং ভক্ষণ করতে পারবে" (সংক্ষেপিত)।

এভাবে তিনি এই বিধানের রহিতকরণ স্বীকার করলেন। তিনি আরো স্বীকার করলেন যে, মোশির ব্যবস্থার মধ্যে ইস্রায়েল সন্তানগণের অবস্থা অনুসারে সংযোজন ও বিয়োজন করা হতো। ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণের অবস্থা দেখলে বড় অবাক লাগে। এইরূপ সংযোজন ও বিয়োজন যদি অন্য কোন ব্যবস্থা বা ধর্মে ঘটে তবে তাঁরা তা খুব আপত্তিকর বলে মনে করেন এবং দাবি করেন যে, এইরূপ সংযোজন ও বিয়োজন দ্বারা ঈশ্বরের অজ্ঞতা প্রমাণিত হয়।

পঞ্চম উদাহরণ : গণনাপুস্তকের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩, ২৩, ৩০, ৩৫, ৩৯, ৪৩ ও ৪৬ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমাগম তাম্বুর (tabernacle of the congregation) কর্মচারীর বয়স কোন মতেই ত্রিশের কম এবং পঞ্চাশের বেশি হবে না। পক্ষান্তরে এই পুস্তকেরই ৮ম অধ্যায়ের ২৪ ও ২৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের বয়স ২৫ বছরের কম হবে না এবং ৫০ বছরের বেশি হবে না।

ষষ্ঠ উদাহরণ : লেবীয় পুস্তকের ৪র্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, ইস্রায়েল সন্তানগণ যদি প্রমাদবশত সমষ্টিগতভাবে বা সামাজিকভাবে পাপ করে তবে তার প্রায়শ্চিত্ত হলো একটি গোবৎস বলিদান।[১] পক্ষান্তরে গণনা পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, এইরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো একটি গোবৎস ও বিধিমত তাহার সহিত ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ও একটি ছাগল বলিদান।[২]

এখানে দ্বিতীয় বিধানটি প্রথম বিধানকে পরিবর্তিত ও রহিত করেছে।

সপ্তম উদাহরণ : আদিপুস্তকের ৬ষ্ঠ অধ্যায় (১৯ ও ২০ আয়াত) থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বর নোহকে নির্দেশ দেন, সর্বজাতীয় পশু, সর্বজাতীয় পক্ষী ও সর্বজাতীয় ভূচর সরীসৃপ স্ত্রীপুরুষ জোড়া জোড়া করে তাঁর জাহাজের মধ্যে ঢুকানোর জন্য।

পক্ষান্তরে এই পুস্তকেরই ৭ম অধ্যায় (২ ও ৩ আয়াত) জানা যায়, তিনি তাঁকে পশুদের মধ্যে থেকে শুচি (পবিত্র) জাতির পশুর সাত সাত জোড়া এবং পাখীর ক্ষেত্রে শুচি ও অশুচি সকল প্রকারের পাখী প্রত্যেক জাতির সাত সাত জোড়া এবং অশুচি (অপবিত্র) পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির এক এক জোড়া সঙ্গে রাখতে নির্দেশ দেন। এরপর এই অধ্যায় থেকেই (৯ আয়াত) জানা যায় যে, শুচি ও অশুচি সকল প্রকার পশু, পাখী জোড়া জোড়া জাহাজে নোহের নিকট প্রবেশ করে।

এভাবে এই নির্দেশটি দুইবার রহিত ও পরিবর্তিত হয়।

অষ্টম উদাহরণ : ২ রাজাবলির ২০ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ তৎকালে হিষ্কিয়ের সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল। আর আমোসের পুত্র যিশাইয় ভাববাদী তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি আপন বাটীর ব্যবস্থা করিয়া রাখ, কেননা তোমার মৃত্যু হইবে, তুমি বাঁচিবে না। ২ তখন তিনি ভিত্তির দিকে মুখ ফিরাইয়া

১. লেবীয় ৪/১৩-২১।

২. গণনাপুস্তক ১৫/২২-২৬।

সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন; ৩ হে সদাপ্রভু, বিনয় করি, তুমি এখন স্মরণ কর, আমি তোমার সাক্ষাতে সত্যে ও একাগ্রচিত্তে চলিয়াছি, এবং তোমার দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহাই করিয়াছি। আর হিষ্কিয় অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। ৪ যিশায়াহ (যিশাইয়) বাহির হইয়া নগরের মধ্য স্থান পর্যন্ত যান নাই, এমন সময়ে তাঁহার নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, ৫ তুমি ফিরিয়া গিয়া আমার প্রজাদের অধ্যক্ষ হিষ্কিয়কে বল, তোমার পিতৃপুরুষ দায়ূদের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনিলাম, আমি তোমার নেত্রজল দেখিলাম; দেখ, আমি তোমাকে সুস্থ করিব; তৃতীয় দিবসে তুমি সদাপ্রভুর গৃহে উঠিবে। ৬ আর আমি তোমার আয়ু পনের বৎসর বৃদ্ধি করিব....।"

এখানে ঈশ্বর যিশাইয় ভাববাদীর মুখে হিষ্কিয় রাজাকে নির্দেশ দিলেন, তুমি আপন বাটীর ব্যবস্থা কর; কারণ তুমি মারা যাচ্ছ। এরপর যিশাইয় ভাববাদী এই আজ্ঞা যথাস্থানে পৌছে দিয়ে তাঁর নিজ বাড়ি পৌছানোর আগেই তিনি তাঁর এই আজ্ঞা রহিত করলেন এবং হিষ্কিয়ের আয়ু পনের বছর বৃদ্ধি করলেন।

নবম উদাহরণ : মথি লিখিত সুসমাচারের দশম অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "৫ এই বারো জনকে যীশু প্রেরণ করিলেন, আর তাঁহাদিগকে এই আদেশ দিলেন– ৬ তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও।"

মথি লিখিত সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ে (২৪ আয়াতে) যীশু তাঁর নিজের বিষয়ে বলেছেন; "ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।"

এ সকল আয়াতের নির্দেশনা অনুসারে যীশু খৃস্টের মিশন ছিল শুধু ইস্রায়েল সন্তানদের জন্যই, আর কারো জন্য নয়।

পক্ষান্তরে মার্ক লিখিত সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে যীশুর নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্বৃত করা হয়েছে : "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর।"

তাহলে জানা গেল যে প্রথম বিধানটি রহিত করা হলো।

দশম উদাহরণ : মথির সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ে রয়েছে : "১ তখন যীশু লোকসমূহকে ও নিজ শিষ্যদিগকে কহিলেন, অধ্যাপক ফরীশীয়রা মোশির আসনে বসে। ২ অতএব তাহারা তোমাদিগকে যাহা কিছু বলে, তাহা পালন করিও, মানিও.....।"

এখানে যীশু আজ্ঞা ও বিধান দিলেন যে, অধ্যাপক ও ফরীশিগণ যা কিছু বলেন সব কিছু পালন করতে হবে এবং মানতে হবে। অধ্যাপক ও ফরীশিগণ যা কিছু বলেন নিঃসন্দেহে তার অন্যতম কথা হলো তোরাহ-এর তাঁরা যে সকল বিধান চিরস্থায়ী বলে বিশ্বাস করেন সেগুলি মেনে চলতে তাঁরা সব সময় নির্দেশ দেন এবং বলেন। তাহলে

যীশুর এই নির্দেশ অনুসারে সেগুলি অবশ্য পালনীয়। অথচ এগুলি সবই খৃষ্টধর্মে রহিত ও লুপ্ত করা হয়েছে। প্রথম প্রকার রহিতকরণের উদাহরণগুলিতে পাঠক তা দেখতে পেয়েছেন। তাহলে জানা গেল যে, অধ্যাপক ও ফরীশীয়দের কথা মানার ও পালন করার এই খৃস্টীয় নির্দেশটি নিঃসন্দেহে রহিত হয়েছে।

বড় অবাক লাগে যে, প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এ সকল আয়াত উল্লেখ করে বুঝাতে চান যে, তোরাহ রহিত হয় নি। এগুলি দিয়ে তাঁরা প্রমাণ করতে চান যে, তোরাহ-এর রহিত হওয়ার বিষয়ে মুসলিমগণ যে দাবি করেন তা বাতিল। তাঁদের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তোরাহ-এর বিধান অনুসারে তাঁদের সকলের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা অত্যাবশ্যক। কারণ তাঁরা কেউই শনিবার পালন করেন না। আর তোরাহ-এর বিধান অনুসারে শনিবারে মর্যাদা সামান্যতম নষ্ট করলেও তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। প্রথম প্রকারের রহিতকরণের নবম উদাহরণের আলোচনা থেকে পাঠক তা জানতে পেরেছেন।

একাদশ উদাহরণ : প্রথম প্রকারের রহিতকরণের ১৩শ উদাহরণ থেকে পাঠক দেখেছেন যে, প্রেরিতগণ সলা-পরামর্শ করে তোরাহ-এর সকল বিধান রহিত করেন। শুধু চারিটি বিধান তাঁরা বহাল রাখেন। পরবর্তীকালে পৌল এই চারিটি বিধানের মধ্যে তিনটি বিধান রহিত করেন। একই ধর্মে বা একই ব্যবস্থায় এক নির্দেশ দ্বারা পূর্ববর্তী নির্দেশ রহিত করার এটিও একটি উদাহরণ।

দ্বাদশ উদাহরণ : লূক লিখিত সুসমাচারের ৯ অধ্যায়ের ৫৬ আয়াতে যীশুর নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে : "কারণ মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের প্রাণনাশ করিতে আইসেন নাই, কিন্তু রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।" যোহনের সুসমাচারে ৩ অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে এবং ১২ অধ্যায়ের ৪৭ আয়াতেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে।

থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮ আয়াতটি নিম্নরূপ : "আর তখন সেই অধর্মী প্রকাশ পাইবে, যাহাকে প্রভু যীশু আপন মুখের নিশ্বাস দ্বারা সংহার করিবেন, ও আপন আগমনের প্রকাশ দ্বারা লোপ করিবেন।"

এই দ্বিতীয় বক্তব্যটি প্রথম বক্তব্যকে রহিত করেছে।

৯ম থেকে ১২শ পর্যন্ত শেষ চারিটি উদাহরণ থেকে জানা গেল যে, নতুন নিয়মের বিধিবিধান ও নির্দেশাবলি রহিত হওয়া শুধু সম্ভবই নয়, বাস্তবও বটে। বাস্তবিকই নতুন নিয়মের অনেক নির্দেশ, আজ্ঞা ও বিধান রহিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। যীশু নিজেই নিজের দেওয়া কিছু কিছু বিধান অন্য বিধান দ্বারা রহিত করেছেন। পৌল তাঁর নিজের বিধানের মাধ্যমে প্রেরিতদের কিছু বিধান রহিত করেছেন। এমনকি স্বয়ং যীশুর অনেক কথা এবং বিধানও সাধু পৌল তাঁর নিজস্ব 'ফতোয়া' দ্বারা রহিত করেছেন।

মথি লিখিত সুসমাচারের ২৪ অধ্যায়ের ৩৫ আয়াতে যীশুর এই কথাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে : "আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনো হইবে না।"

এই বক্তব্যটি দ্বারা খৃস্টান মিশনারিগণ বুঝাতে চান যে, খৃস্টধর্মের কোন কিছুই পরিবর্তিত বা রহিত করা সম্ভব নয়। এজন্য তাঁরা এই বাক্যের অর্থ বলেন : "আমার কথাবার্তার মধ্যে কোন একটি একটি কথা এবং আমার নির্দেশাবলি থেকে কোন একটি নির্দেশও পরিবর্তিত বা রহিত হবে না।"

উপরের আলোচনা থেকে পাঠক বুঝতে পেরেছেন যে, যীশুর উপর্যুক্ত বাণী থেকে যদি এই অর্থগ্রহণ করা হয় তবে সুসমাচারের এই কথাটিকে মিথ্যা বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কারণ আমরা দেখলাম যে, যীশুর অনেক কথাই রহিত হয়েছে। কাজেই এই বাক্যটিকে 'রহিতকরণ'-এর বিরুদ্ধে পেশ করার কোন উপায় নেই।

এজন্য মথি উদ্ধৃত যীশুর এই বক্তব্যের অর্থ হবে, আমি এখানে ভবিষ্যতের যে সকল ঘটনা উল্লেখ করছি এই 'ভবিষ্যত-বাণী'গুলি অবশ্যই ঘটবে, তার ব্যতিক্রম হবে না। এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলিতে এ সকল 'ভবিষ্যত-বাণী' উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে 'আমার বাক্য' বলতে 'আমার সকল বাক্য' বুঝানো হয় নি; বরং 'আমার এই নির্দিষ্ট বাক্যগুলি' বুঝানো হয়েছে।

বাইবেল-ব্যাখ্যাকার খৃস্টান পণ্ডিতগণও এই মত পোষণ করেছেন। ডাওয়ালি ও রজার্ডমেন্ট-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে মথির উপর্যুক্ত বক্তব্যের টীকায় বলা হয়েছে : "পাদ্রী বাইরাস বলেন : খৃস্টের কথার অর্থ হলো, আমি যে সকল বিষয় ঘটবে বলে জানালাম, সেগুলি অবশ্যই ঘটবে। ডিনস্টাইন হোপ বলেন : অন্যান্য সৃষ্টির মত আকাশ ও পৃথিবী যদিও পরিবর্তনযোগ্য নয়, তবুও তা আমি যে ভবিষ্যত-বাণীগুলি উল্লেখ করলাম সেগুলির মত অত সুদৃঢ় নয়। আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমি যে সংবাদগুলি প্রদান করলাম, সেগুলি ঘটবেই, তাতে কোন ব্যতিক্রম হবে না।"

কাজেই যীশুর উপর্যুক্ত বাক্যকে 'রহিতকরণ' অসম্ভব প্রমাণ করার জন্য পেশ করা যায় না।

প্রিয় পাঠক!

উপরের আলোচনায় আপনি উভয় প্রকারের 'রহিকরণের' বিভিন্ন উদাহরণ দেখতে পেয়েছেন। এ সকল উদাহরণের আলোকে আপনি নিশ্চিতরূপে জানতে পারলেন যে, উভয় প্রকারের 'রহিতকরণ'ই মোশির ব্যবস্থা এবং যীশুর ব্যবস্থায় সংঘটিত হয়েছে। এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। ঈশ্বরের ধর্মীয় বিধান বা ব্যবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন, বিলোপ বা রহিতকরণ সম্ভব নয় বলে ইহুদী খৃস্টান পণ্ডিতগণ যে দাবি করেন তা যে একেবারে ভিত্তিহীন, বাতিল ও অসত্য দাবি তা উপরের আলোচনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে।

আর পরিবর্তন বা রহিতকরণ-এর বিদ্যমানতাই তো বিবেক ও যুক্তির দাবি। পরিবর্তন ছাড়া কিভাবে সম্ভব? স্থান-কাল ও পাত্রের পরিবর্তনের কারণে মানুষের প্রয়োজনের পরিবর্তন হয়। কোন কোন বিধান বা আজ্ঞা বিশেষ সময়ে বিশেষ মানুষদের

পক্ষে পালন করা সম্ভব এবং অন্য সময়ে অন্য মানুষদের জন্য অসম্ভব হতে পারে। কোন কোন আজ্ঞা কিছু মানুষের জন্য পালনযোগ্য ও অন্যদের জন্য পালনের অযোগ্য হতে পারে।

স্বয়ং যীশুই এ কথার উল্লেখ করে বলেছেন : "তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা (the Spirit of truth : আল-আমীন, আস-সাদিক), যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন।" যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ে এ সকল কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

মথিলিখিত সুসমাচারের ৮ অধ্যায়ে (৪ আয়াতে) উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি যখন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করলেন, তখন তিনি তাকে বললেন : "দেখিও, এই কথা কাহাকেও বলিও না।" মথি লিখিত সুসমাচারের ৯ অধ্যায়ে (৩০ আয়াতে) উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি যখন দুইজন অন্ধের চক্ষু খুলে দিলেন তখন তাদেরকে দৃঢ়রূপে নিষেধ করে বললেন : "দেখিও, যেন কেহ ইহা জানিতে না পায়।" লূকলিখিত সুসমাচারের ৮ অধ্যায়ে (৫৬ আয়াতে) উল্লেখ করা হয়েছে যে, যীশু যে মৃত বালিকাটিকে জীবন দান করেন তার পিতামাতাকে আজ্ঞা করেন : "এ ঘটনার কথা কাহাকেও বলিও না।"

পক্ষান্তরে লূক লিখিত সুসমাচারের ৮ম অধ্যায়ে (৩৯ আয়াতে) উল্লেখ করা হয়েছে যে, যীশু সে ব্যক্তির ভূত তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাকে বলেন : "তুমি তোমার গৃহে ফিরিয়া যাও, এবং তোমার নিমিত্ত ঈশ্বর যে যে মহৎ কার্য করিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত বল।"

(এ সকল ঘটনা থেকে জানা যায় যে একই বিধান কারো জন্য পালনযোগ্য ও কারো জন্য পালন করা অসম্ভব হতে পারে।) প্রথম প্রকারের 'রহিতকরণের' উদাহরণগুলির মধ্য থেকে ষষ্ঠ উদাহরণ (তালাক সংক্রান্ত) ও ত্রয়োদশ উদাহরণ (প্রেরিতগণ ও পৌল কর্তৃক ত্বক্ছেদ ইত্যাদি সকল আজ্ঞা রহিতকরণ সংক্রান্ত) এবং দ্বিতীয় প্রকার রহিতকরণের উদাহরণগুলির মধ্য থেকে চতুর্থ উদাহরণ (পশু জবাই করলে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত) থেকেও জানা যায় যে, স্থান, কাল ও পাত্রের পরিবর্তনের কারণে ধর্মীয় বিধান, আচার ও আজ্ঞা পরিবর্তন হতে পারে। এই প্রকারের আরেকটি বিষয় হলো ইস্রায়েল-সন্তানগণ যতদিন মিসরে অবস্থান করেছেন, ততদিন তাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয় নি। কিন্তু মিসর ত্যাগের পরে তাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হল।

১. যোহন ১৬/১২-১৩।

চতুর্থ অধ্যায়
ত্রিত্ববাদ[১] খণ্ডন

১. (Trinity)-এর সাধারণ অর্থ 'তিনত্ব', তিনের সমাহার বা তিনের সমষ্টি (a group of three closely related persons or things)। খৃষ্টধর্মের পরিভাষায় এর অর্থ the unity of Father, Son and Holy Spirit as three persons in one Godhead : এক ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন ব্যক্তির মিলন। এই পরিভাষার জন্য বাংলায় 'ত্রিতত্ব' ও 'ত্রিত্ব' দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। খৃস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণ সহ সকলেই একমত যে, এই (Trinity) শব্দটি বাইবেলের পুরাতন বা নতুন নিয়মের কোথাও নেই। খৃষ্টের কোন বাক্যে কখনো এই শব্দটি বা এই অর্থের কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। এমনকি খৃষ্টের প্রেরিতগণ, শিষ্যগণ বা তাদের শিষ্যগণও এই পরিভাষাটি কখনো ব্যবহার করেন নি। মূলত দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে এই পরিভাষাটির জন্ম। কে এই পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তাও নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। খৃস্টান ধর্মগুরুগণ মনে করেন যে, দ্বিতীয়-তৃতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু কার্থেজের প্রেসবিটার (Presbyter) টার্টোলিন (Tertullian), যিনি ২২০ খৃস্টাব্দের পরে মৃত্যুবরণ করেন, তিনিই সর্বপ্রথম এই পরিভাষাটির ব্যবহার করেন। তখনো এই পরিভাষাটির অর্থ ও ব্যবহার স্পষ্ট ছিল না। সত্যিকার অর্থে বিগত ২০০০ বছরে কখনো এই পরিভাষাটির অর্থ স্পষ্ট হয় নি। খৃষ্ট ধর্মের মধ্যে অগণিত দল, উপদল, মতভেদ সবকিছুই মূলত এই বিশ্বাসটির ব্যাখ্যা নিয়ে। প্রথম খৃস্টীয় শতকগুলিতে অনেক খৃস্টান সম্প্রদায়ই একেশ্বরবাদী ছিলেন। মানুষ ঈশ্বর হতে পারে বা ঈশ্বর মানুষের দেহ গ্রহণ করতে পারেন এইরূপ বিশ্বাস কখনোই ইহুদীদের মধ্যে ছিল না। তবে পৌত্তলিক রোমানগণের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস অতি-প্রচলিত ছিল। তারা সম্রাটকেও ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসাবে পূজা করত। এছাড়া গ্রীক দর্শনভিত্তিক রোমান ধর্মে 'প্রজ্ঞা (Logos)'-কে ঈশ্বরের প্রকাশ বলে বিশ্বাস করা হতো। পৌল ও প্রথম যুগের কিছু খ্রিস্টান গুরু এত সকল বিশ্বাসকে ভিত্তি করে প্রথম 'যীশুর' ঈশ্বরত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। এরপর এই বিশ্বাসের সাথে 'একত্ববাদে'র সমন্বয় এবং যীশুর ঈশ্বরত্বের সাথে মানবত্বের সমন্বয় করার ক্রমাগত প্রচেষ্টার চূড়ান্ত রূপ হলো এই ত্রিত্ববাদ। এখানে পাঠকের জন্য এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায় 'ত্রিত্ববাদ' সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তা থেকে কিছু কথা উল্লেখ করছি :

Neither the word Trinity nor the explicit doctrine appears in the New Testament, nor did Jesus and his followers intend to contradict the Shema in the Old Testament: "Hear, O Israel: The Lord our God is one Lord" (Deuteronomy 6:4). the earliest Christians, however, had to cope with the implications of the coming of Jesus Christ and of the presumed presence and power of God among them, i.e., the Holy Spirit, whose coming was connected with the celebration of the Pentecost. The Father, son, and Holy Spirit were associated in such New Testament passages as the Great Commission: "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit" (Matthew 28:19); and in the apostolic benediction: "The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all" (2 Corinthians 13:14). Thus, the New Testament established the basis for the doctrine of the Trinity. The doctrine developed gradually over several centuries and through many controversies. Initially, both the requirements of monotheism inherited from the Old Testament and the implications of the need to interpret the biblical teaching to Greco-Roman religions seemed to demand that the divine in Christ as the Word, or Logos, be interpreted as subordinate to the Supreme Being an alternative solution was to interpret Father, Son and Holy Spirit as three modes of the self-disclosure of the one god but not as distinct within the being of God itself. The first tendency recognized the distinctness among the three, but at the cost of their equality and hence of their unity (subornationism); the second came to terms with their unity, but at the cost of their distinctness as "persons" (modalism). It was not until the 4th century that the distinctness of the three and their unity were brought together in a single orthodox doctrine of one essence and three persons.....

Contents

এই অধ্যায়কে একটি ভূমিকা ও তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে

ভূমিকা

ভূমিকায় ১২ বিষয় উল্লেখ করেছি। এই বিষয়গুলি পাঠককে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলির আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করবে।

১ম বিষয়

পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলি বারংবার ঘোষণা করছে যে, আল্লাহ বা ঈশ্বর এক, একক, অনাদি, অনন্ত, চিরন্তন, অমরণশীল, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী; তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। কোন কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়, তাঁর সত্ত্বাতেও নয় এবং তাঁর গুণাবলিতেও নয়। তিনি দেহ ও আকৃতি থেকে পবিত্র। এই বিষয়গুলি পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলিতে এত বেশি বলা হয়েছে এবং এত বেশি প্রসিদ্ধ যে, এগুলির জন্য উদ্ধৃতি বা সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা নিষ্প্রয়োজন।

২য় বিষয়

আল্লাহ বা ঈশ্বর ছাড়া অন্য কাউকে উপাসনা বা পূজা করা নিষিদ্ধ। তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়ে বারংবার বলা হয়েছে। যেমন যাত্রাপুস্তকের ২০ এবং ৩৪ অধ্যায়।[১]

দ্বিতীয় বিবরণের ১৩ অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, যদি কোন স্বপ্নদর্শক, যিনি স্বপ্নের মধ্যে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা লাভ করেন, অথবা কোন ভাববাদী (নবী) ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন দেবতা বা কোন কিছুর উপাসনা, সেবা বা পূজা করার আহ্বান জানায়, তবে সেই স্বপ্নদর্শক বা ভাববাদীকে হত্যা করতে হবে। যদি তিনি অনেক মহান অলৌকিক চিহ্নের অধিকারী হন বা অনেক অলৌকিক চিহ্ন প্রদর্শন করতে সক্ষম হন তবুও তাকে হত্যা করতে হবে।[২]

অনুরূপভাবে যদি কারো কোন আত্মীয়, আপনজন বা কোন বন্ধু তাঁকে ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো উপাসনা, সেবা বা ভক্তি করতে প্ররোচিত করে তবে তাকেও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে। তাকে কোনপ্রকারে করুণা প্রদর্শন করা যাবে না।[৩]

দ্বিতীয় বিবরণের ১৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির বিষয়ে যদি প্রমাণিত হয় যে, সে ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো উপাসনা, পূজা, সেবা বা ভক্তি করেছে, তবে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে। সেই ব্যক্তি পুরুষ হোক অথবা নারী হোক, তাকে এই শাস্তি পেতেই হবে।[৪]

---

১. যাত্রাপুস্তক ২০/৩, ৪, ৫, ২৩; ৩৪/১৪, ১৭।
২. দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/১-৫।
৩. দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/৬-১১।
৪. দ্বিতীয় বিবরণ ১৭/২-৭।

তৃতীয় বিষয়

পুরাতন নিয়মের অগণিত স্থানে ঈশ্বর সম্পর্কে এরূপ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায় যে, ঈশ্বরের আকৃতি, দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে। যেমন :

আদি পুস্তকের ১ম অধ্যায়ের ২৬ ও ২৭ আয়াতে এবং ৯ অধ্যায়ে ৬ আয়াতে আকৃতি ও প্রকৃতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যিশাইয় ভাববাদী পুস্তকের ৫৯ অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে ঈশ্বরের মস্তকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দানিয়েল-এর পুস্তকের ৭ অধ্যায়ের ৯ আয়াতে ঈশ্বরের মস্তক ও কেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

গীত সংহিতার ৪৩ গীতের (কোন কোন সংস্করণে ৪৪ গীত) ৩ আয়াতে ঈশ্বরের মুখ, হস্ত ও বাহুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাত্রাপুস্তকের ৩৩ অধ্যায়ের ২২ ও ২৩ আয়াতে ঈশ্বরের মুখ ও পশ্চাদভাগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গীতসংহিতার ৩৩ গীতের (কোন কোন সংস্করণ ৩৪ গীত) ১৫ আয়াতে ঈশ্বরের চক্ষু ও কর্ণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনরূপভাবে দানিয়েলের ৯ অধ্যায়ের ১৮ আয়াতেও ঈশ্বরের চক্ষু ও কর্ণ উল্লেখ করা হয়েছে।

১ রাজাবলির ৮ অধ্যায়ের ২৯ ও ৫২ আয়াতে, যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকের ১৬ অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে এবং ৩২ অধ্যায়ের ১৯ আয়াতে, ইয়োবের পুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ের ২১ আয়াতে, হিতোপদেশ-এর ৫ অধ্যায়ের ২১ আয়াতে এবং ১৫ অধ্যায়ের ৩ আয়াতে ঈশ্বরের চক্ষুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গীতসংহিতার ১০ গীতের (কোন কোন সংস্করণে ১১ গীতের) ৪ আয়াতে ঈশ্বরের চক্ষু ও চক্ষুর পাতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গীতসংহিতার ১৭ গীতের (অন্য সংস্কণে ১৮ গীতের) ৬. ৮. ৯ ও ১৫ আয়াতে ঈশ্বরের কর্ণ, পদ, নাক (নাসারন্ধ্র), শ্বাস-প্রশ্বাস ও মুখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

যিশাইয় ভাববাদী পুস্তকের ৩০ অধ্যায়ের ২৭ আয়াতে ঈশ্বরের ওষ্ঠ ও জিহ্বার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিবরণের ৩৩ অধ্যায়ে (২, ১০ ও ২৭ আয়াতে) হস্ত এবং পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাত্রাপুস্তকের ৩১ অধ্যায়ের ১৮ আয়াতে ঈশ্বরের অঙ্গুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যিরমিয়র ৪র্থ অধ্যায়ের ১৯ আয়াতে ঈশ্বরের অন্ত্র ও হৃদয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যিশাইয়র ২১ অধ্যায়ের ৩ আয়াতে ঈশ্বরের কটিদেশের কথা বলা হয়েছে।

গীতসংহিতার ২ গীতের ৭ আয়াতে ঈশ্বরের প্রজনন-অঙ্গ বা জন্ম-প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রেরিতদের কার্যবিবরণের ২০ অধ্যায়ের ২৮ আয়াতে ঈশ্বরের রক্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তোরাহ-এর মধ্যে দুইটি আয়াত রয়েছে, যেখানে ঈশ্বরকে আকার বা আকৃতির উর্ধ্বে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতদ্বয় হলো দ্বিতীয় বিবরণের ৪র্থ অধ্যায়ের ১২ ও ১৫ আয়াত। আয়াতদ্বয় নিম্নরূপ: "১২ তখন অগ্নির মধ্য হইতে সদাপ্রভু

তোমাদের কাছে কথা কহিলেন; তোমরা বাক্যের রব শুনিতেছিলে, কিন্তু কোন মূর্তি দেখিতে পাইলে না, কেবল রব হইতেছিল। .....১৫ যে দিন সদাপ্রভু হোরেবে অগ্নির মধ্য হইতে তোমাদের সহিত কথা কহিতেছিলেন, সেইদিন তোমরা কোন মূর্তি দেখ নাই; অতএব আপন আপন প্রাণের বিষয়ে অতিশয় সাবধান হও।"

যেহেতু এই দুই আয়াতের অর্থ যুক্তি, জ্ঞান ও বিবেকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এজন্য এই দুই আয়াতের ভিত্তিতে উপর্যুক্ত অগণিত আয়াতকে ব্যাখ্যা করা আবশ্যকীয়। এর উল্টো করা যাবে না। অর্থাৎ এসকল অগণিত আয়াতের দ্বারা ঈশ্বরের আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রমাণিত করে এই দুই আয়াতকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। ইহূদী-খৃস্টানগণও এ বিষয়ে আমাদের সাথে একমত। তাঁরা এই দুইটি আয়াতের বিপরীতে উপর্যুক্ত অগণিত আয়াতকে অগ্রাধিকার প্রদান করে ঈশ্বরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রমাণ করেন না।

বাইবেলের অগণিত বর্ণনা থেকে যেমন ঈশ্বরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আকৃতির কথা জানা যায়, তেমনি পুরাতন এবং নতুন নিয়মের অগণিত বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, ঈশ্বর সিয়ন পাহাড় বা অন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করেন। যেমন,

যাত্রাপুস্তকের ২৫ অধ্যায়ের ৮ আয়াত এবং ২৯ অধ্যায়ের ৪৫ ও ৪৬ আয়াত। গণনাপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৩ আয়াত এবং ৩৫ অধ্যায়ের ৩৪ আয়াত। দ্বিতীয় বিবরণের ২৬ অধ্যায়ের ১৫ আয়াত। ২ শমূয়েলের ৭ অধ্যায়ের ৫ ও ৬ আয়াত। ১ রাজাবলির ৮ অধ্যায়ের ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৯, ৪৫ ও ৪৯ আয়াত। গীত সংহিতার ৯ গীতের ১১ আয়াত, ১০ গীতের (অন্য সংস্করণে ১১ গীতের) ৪ আয়াত, ২৫ গীতের (বা ২৬ গীতের) ৮ আয়াত, ৬৭ গীতের (বা ৬৮ গীতের) ১৬ আয়াত, ৭৩ গীতের (বা ৭৪ গীতের) ২ আয়াত, ৭৫ গীতের (বা ৭৬ গীতের) ২ আয়াত, ৯৮ গীতের (বা ৯৯ গীতের) ১ আয়াত, ১৩৪ গীতের (বা ১৩৫ গীতের) ২১ আয়াত।

যোয়েল ভাববাদীর পুস্তকের ৩ অধ্যায়ের ১৭ ও ২১ আয়াত। সখরিয় ভাববাদীর পুস্তকের ৮ অধ্যায়ের ৩ আয়াত।

মথিলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ের ৪৫ ও ৪৮ আয়াত, ৬ অধ্যায়ের ১, ৯, ১৪ ও ২৬ আয়াত, ৭ অধ্যায়ের ১১ ও ২১ আয়াত, ১০ অধ্যায়ের ৩২ ও ৩৩ আয়াত, ১২ অধ্যায়ের ৫০ আয়াত, ১৫ অধ্যায়ের ১৩ আয়াত, ১৬ অধ্যায়ের ১৭ আয়াত, ১৮ অধ্যায়ের ১০, ১৪, ১৯ ও ৩৫ আয়াত এবং ২৩ অধ্যায়ের ৯ ও ২৩ আয়াত।

ঈশ্বর সুনির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ বা বসবাসরত নন, এইরূপ অর্থ প্রকাশকারী আয়াত পুরাতন ও নতুন নিয়মে খুবই কম। যেমন যিশাইয় ভাববাদী পুস্তকের ৬৬ অধ্যায়ের ১ ও ২ আয়াত এবং প্রেরিতদের কার্যবিবরণের ৭ অধ্যায়ের ৪৮ আয়াত।

এইরূপ দুই একটি আয়াত থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বর পাহাড়, মন্দির ইত্যাদি কোন স্থানে বসবাস করেন না। কিন্তু যেহেতু এই দুই একটি আয়াতের অর্থ যুক্তি.

বিবেক ও জ্ঞানের দিক থেকে ঈশ্বরের মর্যাদা ও গুণাবলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এজন্য এই দুই-একটি আয়াতের ভিত্তিতে উপর্যুক্ত অগণিত আয়াতকে ব্যাখ্যা করা হয়, যে সকল আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ঈশ্বর নির্দিষ্ট কোন স্থানে বসবাস করেন। এ বিষয়েও ইহূদী ও খৃস্টানগণ আমাদের সাথে একমত।

এই তৃতীয় বিষয়টি থেকে বুঝা গেল যে, যদি অধিকাংশ বক্তব্য বাহ্যত স্বতঃসিদ্ধ সত্য ও প্রমাণের বিপরীত হয় এবং অল্প বক্তব্য প্রমাণের পক্ষে হয় তবে অল্পের ভিত্তিতে বেশিকে ব্যাখ্যা করতে হয়। আর যদি অগণিত বাণী ও বক্তব্য স্বতঃসিদ্ধ সত্য ও প্রমাণের পক্ষে হয় এবং অল্প দুই একটি বাণী তার বিপরীত হয় তবে স্বভাবতই এই অল্প দুই চারিটি বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় হয়ে যায়।

চতুর্থ বিষয়

তৃতীয় বিষয় থেকে পাঠক জেনেছেন যে, ঈশ্বরের কোন তুলনা বা ছবি নেই। নতুন নিয়মের অনেক স্থানেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১৮ আয়াতে বলা হয়েছে : "ঈশ্বরকে কেহ কখনো দেখে নাই।"

তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম প্রত্রের ৬ অধ্যায়ের ১৬ আয়াতে বলা হয়েছে : "যাঁহোক মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পারেও না।"

যোহনের প্রথম পত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ১২ আয়াতে বলা হয়েছে : "ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই।"

এ সকল আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, যাকে দেখা যায় তিনি কখনোই ঈশ্বর হতে পারেন না, যদিও ঈশ্বরের বাক্যে বা ভাববাদিগণের বাক্যে বা প্রেরিতগণের বাক্যে তাঁর বিষয়ে 'ঈশ্বর' বা অনুরূপ কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়। কাজেই কারো বিষয়ে শুধু 'ঈশ্বর' বা অনুরূপ কোন শব্দের প্রয়োগ দেখেই ধোঁকাগ্রস্থ হয়ে তাঁকে ঈশ্বর বলে পূজা করা যায় না।

কেউ হয়ত বলতে পারেন, শব্দের স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করাই উচিত। 'ঈশ্বর' শব্দটিকে ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ রূপক হতে পারে। আর কোন শব্দের মূল শাব্দিক অর্থ বাদ দিয়ে রূপক অর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়। এর উত্তরে আমি বলব যে, আদি শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করার বিষয়ে যদি কোন বাঁধা থাকে তবে রূপক অর্থ গ্রহণ করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। বিশেষত যদি অখণ্ডনীয় প্রমাণ দ্বারা শাব্দিক অর্থ গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে তবে রূপক অর্থ গ্রহণ করতেই হবে।

ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে যদি 'ঈশ্বর' বা অনুরূপ শব্দের প্রয়োগ করা হয়, তবে তার জন্য নির্ধারিত কোন কারণ বা সূত্র থাকে। যেমন মোশির নামে প্রচলিত 'পাঁচ

পুস্তকের' কোথাও কোথাও কোন কোন স্বর্গদূত বা ফিরিশতাকে ঈশ্বর বলা হয়েছে, কারণ অন্যদের চেয়ে তাঁদের মাধ্যমে ঈশ্বরের মর্যাদা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

যাত্রাপুস্তকের ২৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "২০ দেখ, আমি পথে তোমাকে রক্ষা করিতে, এবং আমি যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছি, সেই স্থানে তোমাকে লইয়া যাইতে তোমার অগ্রে এক দূত (angle: ফিরিশতা) প্রেরণ করিতেছি। ২১ তাহা হইতে সাবধান থাকিও, এবং তাঁহার রবে অবধান করিও, তাঁহার অসন্তোষ জন্মাইও না; কেননা তিনি তোমাদের অধর্ম ক্ষমা করিবেন না; কারণ তাঁহার অন্তরে আমার নাম রহিয়াছে। ....২৩ কেননা আমার দূত (my angel: ফিরিশতা) তোমার অগ্রে অগ্রে যাইবেন, এবং ইমোরীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, কনানীয়, হিব্বীয়, ও যিবূষীয়ের দেশে তোমাকে প্রবেশ করাইবেন; আর আমি তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব।"

এখানে 'তোমার অগ্রে এক দূত প্রেরণ করিতেছি' এবং 'আমার দূত তোমার অগ্রে অগ্রে যাইবেন' এই বাক্যদ্বয় থেকে স্পষ্টতই জানা যায় যে, 'দিবাতে পথ দেখাইবার জন্য মেঘস্তম্ভে থাকিয়া এবং রাত্রিতে দীপ্তি দিবার জন্য অগ্নিস্তম্ভে থাকিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণের অগ্রে অগ্রে যিনি গমন করিতেন'[১] তিনি ছিলেন সদাপ্রভু ঈশ্বরের একজন দূত, অর্থাৎ angel বা ফিরিশতা। অথচ এই দূত (angel)-কে 'ঈশ্বর' 'সদাপ্রভু' ইত্যাদি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিছু পরে পাঠক তা বিস্তারিত জানতে পারবেন। এখানেও বলা হয়েছে যে, 'তাঁহার অন্তরে আমার নাম রহিয়াছে'।

বাইবেলে অগণিত স্থানে ফিরিশতা ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষের ক্ষেত্রে 'ঈশ্বর' 'প্রভু' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। উপরন্তু সাধারণ মানুষকেও ঈশ্বর বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অভিশপ্ত শয়তানের ক্ষেত্রেও 'ঈশ্বর', 'প্রভু' বা এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি মানবেতর বা জ্ঞানহীন প্রাণী বা জড় পদার্থের ক্ষেত্রেও এ সকল শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই জাতীয় শব্দের ব্যবহারের ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বাক্যের পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে পাঠক সহজেই সঠিক অর্থ বুঝতে পারছেন এবং কোনরূপ অস্পষ্টতার মধ্যে নিপতিত হচ্ছেন না।

আমি এখানে পাঠকের জন্য এই বিষয়ে কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করব। আমি এখানে বাইবেলের বিভিন্ন উদ্ধৃতি প্রদান করব। পুরাতন নিয়মের ক্ষেত্রে আমি ১৮৪৪ সালে লন্ডনে মুদ্রিত আরবী বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করব। আর নতুন নিয়মের ক্ষেত্রে আমিএই সংস্করণ থেকে, অথবা ১৮৬০ সালে বৈরুতে মুদ্রিত আরবী বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করব। উদ্ধৃত স্থানের আয়াতগুলি আমি পুরোপুরি উদ্ধৃত করব না বরং আমার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট আয়াত বা বাক্যগুলি উদ্ধৃত করব এবং অন্যান্য বাক্য বা আয়াতগুলি বাদ দেব।

১. যাত্রাপুস্তক ১৩/২১।

১ম প্রমাণ : ঈশ্বরের দূতকে ঈশ্বর বা সদাপ্রভু বলে আখ্যায়িত করা

আদিপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১ অব্রামের নিরানব্বই বৎসর বয়সে সদাপ্রভু (the LORD) তাঁহাকে দর্শন দিলেন ও কহিলেন, আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর (the Almighty God), তুমি আমার সাক্ষাতে গমনাগমন করিয়া সিদ্ধ হও। ......৪ এবং ঈশ্বর (God) তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া কহিলেন, দেখ, আমিই তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিতেছি, তুমি বহুজাতির আদিপিতা হইবে। ....৭ আমি তোমার সহিত ও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশের সহিত যে নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা চিরকালের নিয়ম হইবে; ফলত আমি তোমার ঈশ্বর (God) ও তোমার ভাবী বংশের ঈশ্বর হইব। ৮ আর তুমি এই যে কনান দেশে প্রবাস করিতেছ, ইহার সমুদয় আমি তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে চিরস্থায়ী অধিকারার্থে দিব, আর আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব। ৯ ঈশ্বর অব্রাহামকে আরও কহিলেন..... ১৫ আর ঈশ্বর অব্রাহামকে কহিলেন ....। ১৮ পরে অব্রাহাম ঈশ্বরকে কহিলেন.... ১৯ তখন ঈশ্বর কহিলেন.....। ২২ পরে কথোপকথন সাঙ্গ করিয়া ঈশ্বর অব্রাহামের নিকট হইতে ঊর্ধ্বগমন করিলেন।"

উপরের আলোচনা থেকে পাঠক জেনেছেন যে, পৃথিবীতে ঈশ্বরকে দেখা যায় না এবং কেউ তাঁকে কখনো দেখেনি। কাজেই এখানে অবরাহাম যাকে দেখলেন ও যার সাথে কথা বললেন তিনি অবশ্যই একজন দূত ও ফিরিশতা। শেষের বাক্য 'কথোপকথন সাঙ্গ করিয়া ঈশ্বর অব্রাহামের নিকট হইতে ঊর্ধ্বগমন করিলেন', এই বাক্যটি থেকেও সুস্পষ্ট যে তিনি একজন দূত ছিলেন। এখানে এই আয়াতগুলিতে এই দূত বা ফিরিশতার ক্ষেত্রে 'ঈশ্বর' (God), 'সদাপ্রভু' (the LORD), উপাস্য (God) (আল্লাহ, রব্ব, ইলাহ) ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এই দূত নিজের বিষয়েও এ সকল শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন : "আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর", "আমি তোমার ঈশ্বর ও তোমার ভাবী বংশের ঈশ্বর হইব", "আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব" ইত্যাদি।

২য় প্রমাণ : ঈশ্বরের দূতকে ঈশ্বর বা সদাপ্রভু বলে আখ্যায়িত করা

আদিপুস্তকের ১৮ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনটি পুরুষ মম্রির এলোন বনের নিকট অব্রাহামকে দর্শন দেন। এই তিনটি পুরুষ ছিলেন ঈশ্বরের দূত বা ফিরিশতা। তাঁরা অব্রাহাম ও সারাকে 'ইসহাকের' জন্মের সুসংবাদ প্রদান করেন এবং লোটের শহর সদোমের ধ্বংসের কথা জানান। এই স্থানে তিন দূতের মধ্যে একজন দূত যিনি অব্রাহামের সাথে কথোপকথন করেন, তাকে বারংবার ঈশ্বর বা সদাপ্রভু বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে ১৪ বার দূতের ক্ষেত্রে এই প্রকারের শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

৩য় প্রমাণ : ঈশ্বরের দূতকে ঈশ্বর বা সদাপ্রভু বলে আখ্যায়িত করা

আদিপুস্তকের ২৮ অধ্যায়ে যাকোবের মামাবাড়ি গমনের ঘটনা বলা হয়েছে। এই ঘটনায় বলা হয়েছে : "১০ আর যাকোব বের্-শেবা হইতে বাহির হইয়া হারণের দিকে যাত্রা করিলেন, ১১ এবং কোন এক স্থানে পঁহুছিলে সূর্য অস্তগত হওয়াতে তথায় রাত্রি যাপন করিলেন। আর তিনি তথাকার প্রস্তর লইয়া বালিশ করিয়া সেই স্থানে নিদ্রা যাইবার জন্য শয়ন করিলেন। ১২ পরে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, আর দেখ, পৃথিবীর উপরে এক সিঁড়ি স্থাপিত, তাহার মস্তক গগনস্পর্শী, আর দেখ, তাহা দিয়া ঈশ্বরের দূতগণ উঠিতেছেন ও নামিতেছেন। ১৩ আর দেখ, সদাপ্রভু তাহার উপরে দণ্ডায়মান; তিনি কহিলেন, আমি সদাপ্রভু, তোমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর ও ইসহাকের ঈশ্বর; এই যে ভূমিতে তুমি শয়ন করিয়া আছ, ইহা আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে দিব। ১৪ তোমার বংশ পৃথিবীর ধূলির ন্যায় হইবে, এবং তুমি পশ্চিম ও পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইবে, এবং তোমাতে ও তোমার বংশে পৃথিবীস্থ যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে। ১৫ আর দেখ, আমি তোমার সহবর্তী, যে যে স্থানে তুমি যাইবে, সেই সেই স্থানে তোমাকে রক্ষা করিব, ও পুনর্বার এই দেশে আনিব; কেননা আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিলাম, তাহা যাবৎ সফল না করি, তাবৎ তোমাকে ত্যাগ করিব না। ১৬ পরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে যাকোব কহিলেন, অবশ্য এইস্থানে সদাপ্রভু আছেন, আর আমি তাহা জ্ঞাত ছিলাম না। ১৭ আর তিনি ভীত হইয়া কহিলেন, এ কেমন ভয়াবহ স্থান! এ নিতান্তই ঈশ্বরের গৃহ, এ স্বর্গের দ্বার। ১৮ পরে যাকোব প্রত্যুষে উঠিয়া বালিশের নিমিত্ত যে প্রস্তর রাখিয়াছিলেন, তাহা ঈশ্বর স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়া তাহার উপর তৈল ঢালিয়া দিলেন। ১৯ আর সেই স্থানের নাম বৈথেল (ঈশ্বরের গৃহ) রাখিলেন, কিন্তু পূর্বে ঐ নগরের নাম লূস ছিল। ২০ আর যাকোব মানত করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি ঈশ্বর আমার সহবর্তী হন, আমার এই গন্তব্য পথে আমাকে রক্ষা করেন, এবং আহারার্থ খাদ্য ও পরিধানার্থ বস্ত্র দেন, ২১ আর আমি যদি কুশলে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিতে পাই, তবে সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর হইবেন, ২২ এবং এই যে প্রস্তর আমি স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়াছি, ইহা ঈশ্বরের গৃহ হইবে; আর তুমি আমাকে যে কিছু দিবে, তাহার দশমাংশ আমি তোমাকে অবশ্য দিব।"

এই পুস্তকের ৩১ অধ্যায়ে যাকোব তাঁর স্ত্রী রাহেল ও লেয়াকে বলেন : "১১ তখন ঈশ্বরের দূত স্বপ্নে আমাকে বলিলেন, হে যাকোব; আর আমি কহিলাম, দেখুন, এই আমি। ১২ তিনি বলিলেন, তোমার চক্ষু তুলিয়া দেখ.... ১৩ যে স্থানে তুমি স্তম্ভের অভিষেক ও আমার নিকটে মানত করিয়াছ, সেই বৈথেলের ঈশ্বর আমি; এখন উঠ, এই দেশ ত্যাগ করিয়া আপন জন্মভূমিতে (the land of the kindred) ফিরিয়া যাও।"

এই পুস্তকের ৩২ অধ্যায়ে রয়েছে : "৯ তখন যাকোব কহিলেন, হে আমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর ও আমার পিতা ইসহাকের ঈশ্বর, তুমি সদাপ্রভু আপনি আমাকে

বলিয়াছিলে, তোমার দেশে জ্ঞাতিদের (unto thy country, and to thy knidred) নিকটে ফিরিয়া যাও, তাহাতে আমি তোমার মঙ্গল করিব। ... ১২ তুমিই ত বলিয়াছ, আমি অবশ্য তোমার মঙ্গল করিব, এবং সমুদ্রতীরস্থ যে বালি বাহুল্য প্রযুক্ত গণনা করা যায় না, তাহার ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব।"

এই পুস্তকের ৩৫ অধ্যায়ে রয়েছে: "১ পরে ঈশ্বর যাকোবকে কহিলেন, তুমি উঠ, বৈথেলে গিয়া সে স্থানে বাস কর; এবং তোমার ভ্রাতা এষৌর সম্মুখ হইতে তোমার পলায়নকালে যে ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে সেই স্থানে যজ্ঞবেদি নির্মাণ কর ২ তখন যাকোব আপন পরিজন ও সঙ্গী লোক সকলকে কহিলেন.... ৩ আর আইস, আমরা উঠিয়া বৈথেলে যাই; যে ঈশ্বর আমার সঙ্কটের দিনে আমাকে প্রার্থনার উত্তর দিয়াছিলেন, এবং আমার গমনপথে সহবর্তী ছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে আমি সেই স্থানে এক যজ্ঞবেদি নির্মাণ করিব। ...৭ তথায় তিনি এক যজ্ঞবেদি নির্মাণ করিয়া সেই স্থানের নাম এল্-বৈথেল (বৈথেলের ঈশ্বর) রাখিলেন; কারণ ভ্রাতার সম্মুখ হইতে তাঁহার পলায়নকালে ঈশ্বর সেই স্থানে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন।"

এই পুস্তকের ৪৮ অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "৩ আর যাকোব যোষেফকে কহিলেন, কনান দেশে, লূস নামক স্থানে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, ৪ ও বলিয়াছিলেন, দেখ, আমি তোমাকে ফলবান্ ও বহুবংশ করিব, আর তোমা হইতে জাতিসমাজ উৎপন্ন করিব, এবং তোমার ভাবী বংশকে চিরস্থায়ী অধিকারার্থে এই দেশ দিব।"

উপরের উদ্ধৃতিগুলি সবই একই ঘটনা কেন্দ্রিক। ৩১ অধ্যায়ের ১১ ও ১৩ আয়াত থেকে জানা গেল, যিনি যাকোবকে দর্শন দেন, তাঁর সাথে কথা বলেন, তাঁকে বিভিন্ন ওয়াদা করেন এবং যাকোব যার জন্য মানত করেন তিনি ছিলেন 'ঈশ্বরের দূত' বা ফিরিশতা। উপরের এই উদ্ধৃতিগুলিতে আমরা দেখতে পাই যে, এই দূতের জন্য 'ঈশ্বর' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে আঠারোর বেশি স্থানে। আর এই দূত নিজেই নিজের বিষয়ে বলেছেন: "আমি সদাপ্রভু, তোমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর ও ইসহাকের ঈশ্বর", "যে স্থানে তুমি স্তম্ভের অভিষেক ও আমার নিকটে মানত করিয়াছ, সেই বৈথেলের ঈশ্বর আমি" ...ইত্যাদি। আর যাকোব এই দূতকে বলেছেন: "হে আমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর ও আমার পিতা ইসহাকের ঈশ্বর, তুমি সদাপ্রভু"। এছাড়া তাঁর বিষয়ে তিনি বলছেন: "সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন...."।

৪র্থ প্রমাণ: ঈশ্বরের দূতকে ঈশ্বর বলে আখ্যায়িত করা

আদি পুস্তকের ৩২ অধ্যায়ে ঈশ্বরের সাথে যাকোবের মল্লযুদ্ধের বর্ণনায় বলা হয়েছে: "২৪ আর যাকোব তথায় একাকী রহিলেন, এবং এক পুরুষ প্রভাত পর্যন্ত তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেন; ২৫ কিন্তু তাঁহাকে জয় করিতে পারিলেন না দেখিয়া, তিনি

যাকোবের শ্রোণিফলকে আঘাত করিলেন। তাঁহার সহিত এইরূপ মল্লযুদ্ধ করাতে যাকোবের উরুফলক স্থানচ্যুত হইল। ২৬ পরে সেই পুরুষ কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেননা প্রভাত হইল। যাকোব কহিলেন, আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না। ২৭ পুনশ্চ তিনি কহিলেন, তোমার নাম কি? তিনি উত্তর করিলেন, যাকোব। ২৮ তিনি কহিলেন, তুমি যাকোব নামে আর আখ্যাত হইবে না, কিন্তু ইস্রায়েল (ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধকারী) নামে আখ্যাত হইবে; কেননা তুমি ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ। ২৯ তখন যাকোব জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, বিনয় করি, আপনার নাম কি? বলুন। তিনি বলিলেন, কি জন্য আমার নাম জিজ্ঞাসা কর? পরে তথায় যাকোবকে আশীর্বাদ করিলেন। ৩০ তখন যাকোব সেই স্থানের নাম পনূয়েল (ঈশ্বরের মুখ) রাখিলেন; কেননা তিনি কহিলেন, আমি ঈশ্বরকে[১] সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিলাম, তথাপি আমার প্রাণ বাঁচিল।"

এখানে যাকোবের সাথে যিনি মল্লযুদ্ধ করেছিলেন তাঁকে 'ঈশ্বর' বলা হয়েছে, অথচ তিনি ছিলেন একজন দূত বা ফিরিশতা। তিনটি বিষয় তা নিশ্চত করে: প্রথমত, 'ঈশ্বরকে মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পারেও না' ইতোপূর্বে পাঠক তা জেনেছেন। দ্বিতীয়ত, এই মল্লযোদ্ধা যদি স্বয়ং ঈশ্বর বা সদাপ্রভু হন, তবে প্রমাণিত হবে যে, তিনি অত্যন্ত দুর্বল ও অতি অক্ষম। কারণ তিনি সারারাত ধরে যাকোবের সাথে লড়াই করেও তাকে কূটকৌশল ছাড়া কাবু করতে পারেন নি। তৃতীয়ত, হোশেয় ভাববাদীর পুস্তকে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাকোব মূলত দূতের সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছিলেন। হোশেয়র পুস্তকের ১২ অধ্যায়ে যাকোবের বিষয়ে বলা হয়েছে : "জরায়ুর মধ্যে সে আপন ভ্রাতার পাদমূল ধরিয়াছিল, আর বয়স কালে ঈশ্বরের[২] সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ৪ হাঁ ,সে দূতের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হইয়াছিল। সে তাঁহার নিকটে রোদন ও বিনতি করিয়াছিল; সে বৈথেলে তাঁহাকে পাইয়াছিল, তিনি সেখানে আমাদের সহিত আলাপ করিলেন।"

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একজন ঈশ্বরের দূতকে উপরের বাক্যে দুইবার 'ঈশ্বর' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৫ম প্রমাণ : ঈশ্বরের দূতকে ঈশ্বর বলা

আদিপুস্তকের ৩৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "৯ পদ্দন্-অরাম হইতে যাকোব ফিরিয়া আসিলে ঈশ্বর তাঁহাকে পুনর্বার দর্শন দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ১০ ফলত ঈশ্বর তাঁহাকে কহিলেন, তোমার নাম যাকোব; লোকে তোমাকে আর যাকোব বলিবে না, তোমার নাম ইস্রায়েল হইবে; আর তিনি তাঁহার নাম ইস্রায়েল রাখিলেন। ১১ ঈশ্বর তাঁহাকে আরও কহিলেন, আমিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি প্রজাবান্ ও বহুবংশ হও; তোমা হইতে এক

১. শমরীয় তোরাহে এখানে বলা হয়েছে: আমি ঈশ্বরের দূতকে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিলাম।
২. গ্রন্থকার উল্লিখিত আরবী অনুবাদে 'ঈশ্বরের দূতের'।

জাতি, এমন কি জাতিসমাজ উৎপন্ন হইবে, আর তোমার কটি হইতে রাজাগণ উৎপন্ন হইবে। ১২ আর আমি অব্রাহামকে ও ইস্‌হাককে যে দেশ দান করিয়াছি, সেই দেশ তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে দিব। ১৩ সেই স্থানে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া ঈশ্বর তাঁহার নিকট হইতে উর্দ্ধগমন করিলেন। ১৪ আর যাকোব সেই কথোপকথন স্থানে এক স্তম্ভ, প্রস্তরের স্তম্ভ, স্থাপন করিয়া তাহার উপরে পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেন এবং তৈল ঢালিয়া দিলেন। ১৫ এবং যে স্থানে ঈশ্বর তাঁহার সহিত কথা কহিলেন, যাকোব সেই স্থানের নাম বৈথেল রাখিলেন।"

একথা স্পষ্ট যে এখানে পূর্বের ঘটনাটিই বলা হয়েছে এবং যাকোব যাঁর দর্শন পেয়েছিলেন তিনি ছিলেন একজন দূত। এখানে ৫ স্থানে তাঁকে 'ঈশ্বর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তিনি নিজের বিষয়ে বলেছেন : "আমিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।"

৬ষ্ঠ প্রমাণ: ঈশ্বরের দূতকে ঈশ্বর সদাপ্রভু ইত্যাদি বলা

যাত্রাপুস্তকের ৩য় অধ্যায়ে রয়েছে : "২ আর ঝোপের মধ্য হইতে অগ্নিশিখাতে সদাপ্রভু[১] তাঁহাকে দর্শন দিলেন; তখন তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ, ঝোপ অগ্নিতে জ্বলিতেছে, তথাপি ঝোপ বিনষ্ট হইতেছে না। ....৪ কিন্তু সদাপ্রভু যখন দেখিলেন যে, তিনি দেখিবার জন্য এক পার্শে যাইতেছেন, তখন ঝোপের মধ্য হইতে ঈশ্বর তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন ... ৬ তিনি আরও কহিলেন, আমি তোমার পিতার ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর। তখন মোশি আপন মুখ আচ্ছাদন করিলেন, কেননা তিনি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতে ভীত হইয়াছিলেন। ৭ পরে সদাপ্রভু কহিলেন.... ১১ মোশি ঈশ্বরকে কহিলেন .... ১২ তিনি (ঈশ্বর) কহিলেন, নিশ্চয় আমি তোমার সহবর্তী হইব; এবং আমি যে তোমাকে প্রেরণ করিলাম, তোমার পক্ষে তাহার এই চিহ্ন হইবে; তুমি মিসর হইতে লোকসমূহকে বাহির করিয়া আনিলে পর তোমরা এই পর্বতে ঈশ্বরের সেবা করিবে। ১৩ পরে মোশি ঈশ্বরকে কহিলেন, দেখ, আমি যখন ইস্রায়েল-সন্তানদের নিকটে গিয়া বলিব, তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তাঁহার নাম কি? তবে তাহাদিগকে কি বলিব? ১৪ ঈশ্বর মোশিকে কহিলেন, "আমি যে আছি সেই আছি" (I am that I am: YHWH/Yahweh/Jehova)। আরও কহিলেন, ইস্রায়েল সন্তানদিগকে এইরূপ বলিও, "আছি" তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ

১. গ্রন্থকার-এর উদ্ধৃতি অনুসারে এখানে 'সদাপ্রভু' বলা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ১৮৪৪ সালে লণ্ডনে মুদ্রিত আরবী বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। তবে প্রচলিত ইংরেজি বাইবেল (KJV), বাংলা বাইবেল ও আরবী বাইবেলে এখানে; "সদাপ্রভুর দূত, ফিরিশ্‌তা বা the angel of the LORD. বলা হয়েছে: "আর ঝোপের মধ্য হইতে অগ্নিশিখাতে সদাপ্রভুর দূত তাঁহাকে দর্শন দিলেন।" এতে আরো স্পষ্ট হয় যে, মোশি ঈশ্বরের নয় বরং ঈশ্বরের দূতের দর্শন পেয়েছিলেন এবং তাঁরই সাথে কথাবার্তা বলেছিলেন, যদিও এই দূতকেই বারংবার 'ঈশ্বর' বা 'সদাপ্রভু' বলে অভিহিত করা হচ্ছে।

করিয়াছেন। ১৫ ঈশ্বর মোশিকে আরও কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে এই কথা বলিও, যিহোবা (সদাপ্রভু) তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর, ও যাকোবের ইশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে পাঠাইয়াছেন; আমার এই নাম অনন্তকাল স্থায়ী, এবং এতদ্দারা আমি পুরুষে পুরুষে স্মরণীয়। ১৬ তুমি যাও, ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে একত্র কর, তাহাদিগকে এই কথা বল, সদাপ্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের, ইসহাকের ও যাকোবের ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিয়া কহিলেন..... ।"

যিনি মোশিকে দর্শন দিলেন ও কথা বললেন তিনি ঈশ্বরের দূত বা ফিরিশতা। কারণ ইতোপূর্বেই পাঠক জেনেছেন যে, 'ঈশ্বরকে মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পারেও না।' এই দূত তাঁর নিজের বিষয়ে বলেছেন : "আমি তোমার পিতার ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর"। আরো বলেছেন যে, তাঁর নাম : "আমি যে আছি সেই আছি"। উপরন্তু মোশিকে নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদেরকে বলেন : "আছি", "তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন", "যিহোবা তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে পাঠাইয়াছেন"। আরো বলছেন : "আমার এই নাম অনন্তকাল স্থায়ী, এবং এতদ্বারা আমি পুরুষে পুরুষে স্মরণীয়"...।

এভাবে এই আয়াতগুলিতে উক্ত দূত বা ফিরিশতাকে ২৫ বারের অধিক 'ঈশ্বর', 'সদাপ্রভু' ইত্যাদি বলা হয়েছে।

যীশুও এই দর্শনদাতা দূতকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন : "মোশির গ্রন্থে ঝোপের বৃত্তান্তে ঈশ্বর তাঁহাকে কিরূপ বলিয়াছিলেন তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই? তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর।" মার্ক তাঁর সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে (২৬ আয়াত), মথি তাঁর সুসমাচারের ২২ অধ্যায়ে (৩১-৩২ আয়াত) এবং লূক তাঁর সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ে (৩৭ আয়াত) যীশুর এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।

আর একথা স্পষ্ট যে, যাকে এভাবে বারংবার ঈশ্বর, সদাপ্রভু ইত্যাদি বলা হচ্ছে তিনি ছিলেন একজন ফিরিশতা বা ঈশ্বরের দূত। এজন্য অধিকাংশ উর্দু ও ফার্সী অনুবাদে এখানে 'ফিরিশতা' বা দূত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, ঈশ্বর বা সদাপ্রভু বলা হয় নি।

৭ম প্রমাণ : ভাববাদীকে ঈশ্বর বলা

যাত্রাপুস্তকের ৭ম অধ্যায়ের ১ম আয়াতটি নিম্নরূপ : "তখনও সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, আমি ফরৌণের কাছে তোমাকে ঈশ্বর করিয়া[১] নিযুক্ত করিলাম (I have made thee a god to Pharaoh); আর তোমার ভ্রাতা হারোণ তোমার ভাববাদী হইবে।"

১. বাংলা বাইবেলে: "ঈশ্বর স্বরূপ করিয়া", আসলে "স্বরূপ" শব্দটি অতিরিক্ত।

যাত্রাপুস্তকের ৪র্থ অধ্যায়ের ১৬ আয়াতে বলা হয়েছে: "তোমার পরিবর্তে সে লোকদের কাছে বক্তা হইবে; ফলতঃ সে তোমার মুখস্বরূপ হইবে এবং তুমি তাহার ঈশ্বর স্বরূপ হইবে।"

এই আয়াতদ্বয়ে মোশির ক্ষেত্রে 'ঈশ্বর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বা মোশিকে ঈশ্বর বলা হয়েছে। এখানে খৃস্টানদের চেয়ে ইহূদীদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা ধরা পড়ে। মোশির প্রতি প্রেমের দাবি এবং মোশিকে সকল ভাববাদীর উপরে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করা সত্ত্বেও ইহূদীগণ এই ধরনের আয়াতের উপর নির্ভর করে মোশিকে ঈশ্বরের আসনে বসান নি বা মোশির জন্য ঈশ্বরতত্ত্বের দাবি করেন নি।

৮ম প্রমাণ : ঈশ্বরের দূতকে ঈশ্বর বা সদাপ্রভু বলা

যাত্রাপুস্তকের ১৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "২১ আর সদাপ্রভু দিবাতে পথ দেখাইবার জন্য মেঘস্তম্ভে থাকিয়া, এবং রাত্রিতে দীপ্তি দিবার জন্য অগ্নিস্তম্ভে থাকিয়া তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, যেন তাহারা দিবারাত্র গমন করিতে পারে। ২২ লোকদের সম্মুখ হইতে দিবাতে মেঘস্তম্ভ ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভ স্থানান্তর হইত না।"

এই পুস্তকের ১৪ অধ্যায়ে রয়েছে: "১৯ তখন ইস্রায়েলী সৈন্যের অগ্রগামী ঈশ্বরের দূত (ফিরিশতা) সরিয়া গিয়া তাহাদের পশ্চাৎ গমন করিলেন, এবং মেঘস্তম্ভ তাহাদের অগ্র হইতে সরিয়া গিয়া তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইল; .... ২৪ কিন্তু রাত্রি শেষ প্রহরে সদাপ্রভু অগ্নি ও মেঘস্তম্ভে থাকিয়া মিসরীয়দের সৈন্যের উপরে দৃষ্টিপাত করিলেন, ও মিসরীয়দের সৈন্যকে উদ্বিগ্ন করিলেন।"

এখানে ১৯ আয়াতে স্পষ্টত বলা হয়েছে যে, অগ্নিস্তম্ভে ও মেঘস্তম্ভে থাকিয়া অগ্রে অগ্রে গমনকারী ছিলেন একজন দূত বা ফিরিশতা। কিন্তু এই দূতকে আরবী অনুবাদে 'আর-রাব্বা' বা 'সদাপ্রভু' এবং আমার নিকট বিদ্যমান উর্দু অনুবাদে 'যিহোবা' (Yahweh/Jehova) বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিবরণের ১ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "৩০ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যিনি তোমাদের অগ্রগামী, তিনি মিসর দেশে তোমাদের চক্ষুগোচরে তোমাদের জন্য যে সমস্ত কার্য করিয়াছিলেন, তদনুসারে তোমাদের জন্য যুদ্ধ করিবেন। ৩১ এই প্রান্তরেও তুমি তদ্রূপ দেখিয়াছ; যেহেতু পিতা যেমন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে বহন করিয়াছেন। ৩২ তথাপি এই কথায় তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিলে না, ৩৩ যিনি তোমাদের শিবির রাখিবার স্থান অন্বেষণ করণার্থে যাত্রাকালে তোমাদের অগ্রগামী হইয়া রাত্রিতে অগ্নি দ্বারা ও দিবসে মেঘ দ্বারা তোমাদের গন্তব্য পথ প্রদর্শন করিতেন।"

এখানেও এই অগ্রগামী দূতকে 'ঈশ্বর সদাপ্রভু' বলে অভিহিত করা হয়েছে তিন স্থানে; কারণ তিনি তাঁদের আগে আগে চলছিলেন এবং মিসরীয় বাহিনীকে উদ্বিগ্ন করেন।

এই পুস্তকের (দ্বিতীয় বিবরণ) ৩১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "৩ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি তোমার অগ্রগামী হইয়া পার হইয়া যাইবেন ... ৪ আর সদাপ্রভু ... করিবেন .... ৫ সদাপ্রভু তাহাদিগকে তোমার সম্মুখে সমর্পণ করিবেন ... ৬ তোমরা লাভবান হও ও সাহস কর, ভয় করিও না, তাহাদের হইতে মহাভয়ে ভীত হইও না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি তোমার সহিত যাইতেছেন। ... ৮ আর সদাপ্রভু তোমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন; তিনিই তোমার সহবর্তী হইবেন... ।"

এই আয়াতগুলিতেও উপর্যুক্ত অগ্রগামী দূতের ক্ষেত্রে ঈশ্বর সদাপ্রভু, সদাপ্রভু ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৯ম প্রমাণ : ঈশ্বরের দূতকে ঈশ্বর বলা

বিচারকর্তৃগণের বিবরণ-এর ১৩ অধ্যায়ের ২২ আয়াতে মানোহ নামক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর সাথে যিনি কথা বলেছিলেন এবং তাঁদেরকে পুত্র লাভের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন তাঁর বিষয়ে বলা হয়েছে : "পরে মানোহ আপন স্ত্রীকে কহিলেন, আমরা অবশ্য মারা পড়িব, কারণ ঈশ্বরকে দেখিয়াছি।"

এখানে তাঁকে ঈশ্বর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই অধ্যায়ের ৩, ৯, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮ ও ২১ আয়াতে বারংবার তাঁকে 'সদাপ্রভুর দূত' বলে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৬ অধ্যায়ে,, ১ শমূয়েল-এর ৩ অধ্যায়ে, যিহিষ্কেল-এর ৪ ও ৯ অধ্যায়ে এবং অমোষ-এর ৭ অধ্যায়ে এভাবে ঈশ্বরের দূত বা ফিরিশতাকে 'ঈশ্বর' বা 'সদাপ্রভু' বলা হয়েছে।

১০ম প্রমাণ : সাধারণ মানুষকে ঈশ্বর বলা

গীতসংহিতার আরবী অনুবাদের ৮১ গীত ও অন্যান্য অনুবাদের ৮২ গীতের ৬ আয়াতে বলা হয়েছে : "আমিই বলিয়াছি, তোমরা ঈশ্বর, তোমরা সকলে পরাৎপরের (মহান ঈশ্বরের) সন্তান (I have said, Ye are gods; and all of you are child of the Most High)।"

এখানে শুধু বিশেষ মানুষদেরকেই নয়—গড়ভাবে সাধারণ মানুষদেরকে "ঈশ্বর" ও "ঈশ্বরের" পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১১শ প্রমাণ : শয়তানকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করা

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্রের ৪ অধ্যায়ে রয়েছে; "কিন্তু আমাদের সুসমাচার যদি আবৃত থাকে, তবে যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদেরই কাছে আবৃত থাকে। ৪ তাহাদের মধ্যে এই যুগের ঈশ্বর (god of this world)[1] অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করিয়াছে, যেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যে খৃষ্ট তাঁহার গৌরবের সুসমাচারের দীপ্তি তাহাদের প্রতি উদয় না হয়।"

১. এখানে বাংলা বাইবেলে ও 'ইঞ্জিলে (god) অর্থ 'দেব' বা 'দেবতা' বলা হয়েছে; অথচ অন্যান্য স্থানে God ও god : আল্লাহ এবং ইলাহ উভয়ের অর্থই 'ঈশ্বর' লেখা হয়েছে।

Contents

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের ধারণা অনুসারে এখানে god of this world বা 'এই যুগের ঈশ্বর' বলতে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। তাহলে দেখা গেল, মানুষ তো দূরের কথা শয়তানকেও ঈশ্বর বলা হয়েছে বাইবেলে।

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতদের এই বিশ্বাসকে আমি "ধারণা" বলে আখ্যায়িত করছি। তার কারণ হলো, তাঁদের মতে ঈশ্বর কোন অকল্যাণ বা ক্ষতির সৃষ্টি করতে পারেন না। কাজেই তিনি মানুষদেরকে 'অন্ধ করেন' এ কথা বলা যায় না। এ জন্য এই কর্মটি শয়তানের বলে মনে করতে হবে।

তাঁদের এই ধারণাটি একটি ভিত্তিহীন কল্পনা মাত্র। তাঁদের 'পবিত্র পুস্তক' বা বাইবেল অনুসারে নিঃসন্দেহে অমঙ্গল বা অকল্যাণের স্রষ্টাও ঈশ্বর। এখানে আমি এ বিষয়ক দুইটি প্রমাণ উল্লেখ করছি। এই জাতীয় আরো প্রমাণ পাঠক পরে দেখতে পাবেন।

যিশাইয়র পুস্তকের ৪৫ অধ্যায়ের ৭ আয়াত নিম্নরূপ: "আমি দীপ্তির রচনাকারী ও অন্ধকারের সৃষ্টিকর্তা, আমি শান্তির রচনাকারী ও অনিষ্টের সৃষ্টিকর্তা; আমি সদাপ্রভু এই সকলের সাধনকর্তা।"

খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ পৌল থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত ২য় পত্রের ২য় অধ্যায়ে বলেন : "আর সেই জন্য ঈশ্বর তাহাদের কাছে ভ্রান্তির কার্যসাধন পাঠান, যাহাতে তাহার সেই মিথ্যায় বিশ্বাস করিবে; যেন সেই সকলের বিচার হয়, যাহারা সত্যে বিশ্বাস করিত না, কিন্তু অধার্মিকতায় প্রীত হইত।"[১]

সর্বাবস্থায় আমাদের উদ্দেশ্য হলো, খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে বাইবেলে 'ঈশ্বর' শব্দের প্রয়োগ প্রমাণ করা, সেহেতু এক্ষেত্রে তাঁদের বিশ্বাস ভুল হলেও আমরা প্রমাণ পেলাম যে, খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারেই বাইবেলে শয়তানকে 'ঈশ্বর' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

১২শ প্রমাণ : উদরকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করা

ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ৩ অধ্যায়ের ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে : "তাহাদের পরিণাম বিনাশ; উদর তাহাদের ঈশ্বর, এবং নিজ লজ্জাতেই তাহাদের গৌরব..... ।"

এখানে খৃস্টধর্মের পবিত্রপুরুষ পৌল উদরকে ঈশ্বর বলেছেন।

১৩শ প্রমাণ : প্রেমকে ঈশ্বর নামে আখ্যায়িত করা

যোহনের প্রথম পত্রের ৪র্থ অধ্যায়ে রয়েছে : "৮ যে প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রেম। ....১৬ আর ঈশ্বরের যে প্রেম আমাদিগতে আছে, তাহা আমরা জানি, ও বিশ্বাস করিয়াছি। ঈশ্বর প্রেম; আর প্রেমে যে থাকে, সে ঈশ্বরে থাকে, এবং ঈশ্বর তাহাতে থাকেন।"

১. ২ থিষলনীকীয় ২/১১-১২।

এখানে যোহন প্রমাণ করলেন যে, ঈশ্বর ও প্রেম একই। উভয় স্থানে তিনি বললেন : "ঈশ্বর প্রেম"। উভয়ের একত্ব বুঝাতে তিনি বললেন : "প্রেমে যে থাকে, সে ঈশ্বরে থাকে, এবং ঈশ্বর তাহাতে থাকেন" (এভাবে প্রেম নামক একটি কর্মকেও ঈশ্বর বলে আখ্যায়িত করা হলো)।

ঐশ্বরিক পুস্তকগুলিতে অগণিত স্থানে মূর্তি বা "ঈশ্বর" বলা হয়েছে। বিষয়টি এত প্রসিদ্ধ যে, এর কোন প্রমাণ উল্লেখ অনাবশ্যক। অনুরূপভাবে শিক্ষক, মালিক ইত্যাদি অর্থে 'প্রভু' বা 'রব্ব' (Lord, Master) শব্দের ব্যবহারও অত্যন্ত বেশি। এই বিষয়েরও কোন প্রমাণ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যোহন লিখিত সুসমাচারের ১ অধ্যায়ের ৩৬ আয়াত নিম্নরূপ: "তাঁহারা কহিলেন, রব্বি, অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ গুরু....।"

এখানে ব্যাখ্যা করে বুঝানো হয়েছে যে, গুরু বা শিক্ষককে 'রব্বা' বা প্রভু বলে আখ্যায়িত করা হতো।

প্রিয় পাঠক!

উপরের আলোচনা থেকে আপনি নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন যে, বাইবেলে "ঈশ্বর', 'সদাপ্রভু" ইত্যাদি শব্দ অনেক সৃষ্টজীব, বস্তু বা কর্মের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এই জাতীয় কোন শব্দ যদি কোন মানুষ বা অনুরূপ কোন সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তাকে কোনভাবেই একজন জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান মানুষ এই সব শব্দের ভিত্তিতে প্রকৃত 'ঈশ্বর' বলে মনে করতে পারেন না। যার সৃষ্টি, পরিবর্তন, মানবীয় দুর্বলতা সুস্পষ্ট ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাকে এভাবে 'ঈশ্বর' বা 'সদাপ্রভু' বলার কারণে তাকে প্রকৃত ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করার অর্থ হবে পবিত্র পুস্তকের সকল সুস্পষ্ট প্রমাণ, বাক্য, জ্ঞান ও বিবেকের সকল দাবি ও প্রমাণকে অস্বীকার করা।

পঞ্চম বিষয়

চতুর্থ বিষয় থেকে আমরা জানলাম যে, বাইবেলে সৃষ্টিকেও অনেক সময় 'রূপক' ভাবে 'ঈশ্বর' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এছাড়াও বাইবেলে অন্যান্য অনেক স্থানে রূপক অর্থের ব্যবহার ও প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ঈশ্বর অব্রাহামকে তাঁর বংশধর বৃদ্ধির অঙ্গীকার করে আদি পুস্তকের ১৩ অধ্যায়ের ১৬ আয়াতে বলেন : "আর পৃথিবীস্থ ধূলির ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করিব; কেহ যদি পৃথিবীস্থ ধূলি গণিতে পরে, তবে তোমরা বংশও গণা যাইবে।"

এই পুস্তকেরই ২২ অধ্যায়ে ১৭ আয়াতে বলেছেন : "আমি অবশ্য তোমাকে আশীর্বাদ করিব, এবং আকাশের তারাগণের ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় তোমার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব....।"

অনুরূপভাবে যাকোবকেও ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন যে, তাঁর বংশধর পৃথিবীর ধূলির ন্যায় হইবে.....। চতুর্থ বিষয়ে আলোচনায় পাঠক তা দেখেছেন।

শাব্দিক অর্থে অব্রাহাম ও যাকোবের বংশধর সারা বিশ্বের সকল ধূলি বা সকল সমুদ্র উপকূলের বালুকার সমান সংখ্যক হওয়া তো দূরের কথা, পৃথিবীর কয়েক মণ বালু বা ধূলির সমান সংখ্যাও তারা হতে পারে নি।

ইস্রায়েল সন্তানদেরকে ঈশ্বর যে দেশ প্রদানের অঙ্গীকার করেন সেই দেশের বর্ণনায় যাত্রাপুস্তকের ৩ অধ্যায়ের ৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সেই দেশে দুধ ও মধুর স্রোত বয়ে যায় (a land flowing with milk and honey)। শাব্দিক অর্থে বিশ্বের কোথাও এইরূপ দেশের অস্তিত্ব নাই।

দ্বিতীয় বিবরণের ১ম অধ্যায়ে রয়েছে: "এবং নগরগুলি অতি বৃহৎ ও গগনস্পর্শী প্রাচীরে বেষ্টিত (walled up to heaven)"। এই পুস্তকের ৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "তুমি আপনা হইতে মহান ও বলবান জাতিগণকে গগনস্পর্শী প্রাচীরে বেষ্টিত (fenced up to heaven) বৃহৎ নগর সকলকে...... ।"

গীতসংহিতার ৭৭ গীতে (অন্য সংস্করণে ৭৮ গীত) বলা হয়েছে : "৬৫ তখন প্রভু জাগিলেন, সুপ্তোত্থিতের ন্যায়, দ্রাক্ষারসে হর্ষনাদকারী বীরের ন্যায়। ৬৬ তিনি আপন বিপক্ষ লোকদিগকে মারিয়া ফিরাইয়া দিলেন, তাহাদিগকে চিরকালীন তিরস্কারের পাত্র করিলেন।"

যোহনের বক্তব্য রূপক অর্থে পরিপূর্ণ। তাঁর কথার মধ্যে এমন আয়াত খুব কমই পাওয়া যায় যা ব্যাখ্যা না করে শুধু শাব্দিক অর্থ দ্বারা বুঝা যায়। যোহন লিখিত সুসমাচার, তাঁর লিখিত পত্রাবলি ও প্রকাশিত বাক্য পাঠ করলে এ কথা ভালভাবেই অনুভব করা যায়। এখানে আমি তাঁর লেখা একটিমাত্র বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। প্রকাশিত বাক্যের ১২ অধ্যায়ে তিনি বলেন : "১ আর স্বর্গমধ্যে এক মহৎ চিহ্ন দেখা গেল। একটি স্ত্রীলোক ছিল, সূর্য তাহার পরিচ্ছদ, ও চন্দ্র তাহার পদের নীচে, এবং তাহার মস্তকের উপরে দ্বাদশ তারার এক মুকুট। ২ সে গর্ভবতী, আর ব্যথিতা হইয়া চেঁচাইতেছে, সন্তান প্রসবের জন্য ব্যথা খাইতেছে। ৩ আর স্বর্গমধ্যে আর এক চিহ্ন দেখা গেল, দেখ, এক প্রকাণ্ড লোহিতবর্ণ নাগ, তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ এবং সপ্ত মস্তকের সপ্ত-কিরীট, ৪ আর তাহার লাঙ্গুল আকাশের তৃতীয়াংশ নক্ষত্র আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল। যে স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসব করিতে উদ্যত, সেই নাগ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, যেমন সে প্রসব করিবামাত্র তাহার সন্তানকে গ্রাস করিতে পারে। ৫ পরে সেই স্ত্রীলোকটি এক পুত্র সন্তান প্রসব করিল; যিনি লৌহদণ্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে শাসন করিবেন। আর তাহার সন্তানটি ঈশ্বরের ও তাঁহার সিংহাসনের নিকটে নীত হইলেন। ৬ আর সেই স্ত্রীলোকটি প্রান্তরে পলায়ন করিল; তথায় এক সহস্র দুই শত ষাট দিন পর্যন্ত প্রতিপালিতা হইবার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক প্রস্তুত তাহার একটি স্থান আছে। ৭ আর স্বর্গে যুদ্ধ হইল; মীখায়েল ও তাঁহার দূতগণ ঐ নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই নাগ ও তাহার দূতগণ যুদ্ধ করিল। .....

বাহ্যত এই কথাগুলি অর্থহীন প্রলাপের মতই। ব্যাখ্যা না করে শাব্দিক অর্থে এই কথাগুলি গ্রহণ করা অসম্ভব। আর এগুলি ব্যাখ্যাও সহজ নয়। অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দূরবর্তী অর্থের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করতে হবে। একথা সুনিশ্চিত যে, খৃষ্টানগণ এ সকল আয়াত ও অনুরূপ বক্তব্যগুলিকে শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করেন না, বরং সেগুলির ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা স্বীকার করেন যে, বাইবেলে অনেক বাক্যই রূপক অর্থে বলা হয়েছে।

"মুরশিদুত তালিবীন ইলাল কিতাবিল মুকাদ্দাসিস সামীন" নামক গ্রন্থের লেখক তাঁর পুস্তকের ১৩ পরিচ্ছেদে লিখেছেন : "পবিত্র বাইবেলের পরিভাষার মধ্যে ব্যাপকভাবে দুর্বোধ্য রূপক অর্থাদির ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষত পুরাতন নিয়মের মধ্যে।"

অতঃপর তিনি বলেন : "নতুন নিয়মের পরিভাষা ও ভাষাশৈলীও অনুরূপভাবে অত্যন্ত রূপক ও উপমাভিত্তিক। বিশেষত আমাদের ত্রাণকর্তার আলাপ-আলোচনা। অনেক খৃস্টান ধর্মগুরু এ সকল বাক্যের শাব্দিক ব্যাখ্যা করার ফলে অনেক বিভ্রান্ত মত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এজন্য আমরা এখানে কিছু উদাহরণ পেশ করছি। এগুলির মাধ্যমে জানা যাবে যে, উপমা ও রূপক অর্থের বাক্যাদির শাব্দিক ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। যেমন, খৃষ্ট তৎকালীন শাসক হেরোদ সম্পর্কে বলেন : "তোমরা গিয়া সেই শৃগালকে বল"।[১] একথা সুস্পষ্ট যে, এখানে 'শৃগাল' বলতে শাব্দিক অর্থে শৃগাল বুঝানো হয় নি, বরং প্রতাপশালী, অত্যাচারী বুঝানো হয়েছে। কারণ শৃগাল নামক প্রাণীটিও ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনার জন্য প্রসিদ্ধ।

"আমাদের প্রভু ইহূদীদেরকে আরো বলেন : "আমিই সেই জীবন্ত রূটী (living bread)[২], যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। কেহ যদি এই খাদ্য খায় তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকিবে, আর আমি যে খাদ্য দিব সে আমার মাংস, জগতের জীবনের জন্য।" যোহন, ৬ অধ্যায়. ৫১ আয়াত। প্রবৃত্তিপুজারী ইহূদীগণ এই কথার আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করেছিল। এজন্য তারা পরস্পরে বিতর্ক করে বলেছিল : এই ব্যক্তি কেমন করিয়া আমাদিগকে ভোজনের জন্য আপনার মাংস দিতে পারে?' (৫২ আয়াত) আর বুঝেনি যে, তিনি এর দ্বারা তাঁর নিজের প্রাণ উৎসর্গ করার কথা বুঝাচ্ছেন। তিনি বিশ্বজগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করেছেন।"

"আমাদের ত্রাণকর্তা তাঁর অভিষেকের সময়ে গোপন সান্ধ্য ভোজনের মধ্যে রুটী (bread) হাতে নিয়ে ভেঙ্গে শিষ্যদেরকে প্রদান করে বলেন: "ইহা আমার শরীর"। এরপর তিনি মদ নিয়ে তাঁদেরকে নিয়ে বলেন; "ইহা আমার রক্ত"। মথি ২৬ অধ্যায়ের ২৬ আয়াত।

---

১. লূক ১৩/৩২।

২. বাংলা বাইবেলে এখানে bread অর্থ 'খাদ্য' লেখা হয়েছে, অথচ অন্যান্য স্থানে bread অর্থ 'রুটী' লেখা হয়েছে। আরবী বাইবেলেও এখানে 'রুটি' লেখা হয়েছে।

"দ্বাদশ শতাব্দী থেকে রোমান ক্যাথলিকগণ এই বাক্যের সম্পূর্ণ উল্টা অর্থ গ্রহণ করেছে। তাদের গৃহীত এই অর্থটি বাইবেলের অন্যান্য বাক্য ও বিশুদ্ধ প্রমাণাদির বিপরীত। তারা এই কথা থেকে একটিই অর্থ বুঝেছেন, তা হলো 'পরিবর্তন' বা 'রূপান্তর (transubstantiation)। অর্থাৎ তাঁরা মনে করেন যে, যখন যাজক কাল্পনিক ভক্তিমূলক বাক্যগুলি উচ্চারণ করেন, তখন এই রুটি ও মদ রূপান্তরিত হয়ে যীশুর মাংস ও প্রকৃত রক্তে পরিণত হয়। অথচ পঞ্চইন্দ্রিয়ের সবগুলির কাছেই সুস্পষ্ট থাকে যে, এই রুটি ও মদ রুটি ও মদই থেকে যায়; এগুলির উপাদানের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। আসলে আমাদের প্রভু যীশুর এই কথার সঠিক ব্যাখ্যা হলো, রুটি তাঁর দেহের সাথে তুলনীয় এবং মদ তাঁর রক্তের সাথে তুলনীয়।"

'মুরশিদুত তালিবীন' গ্রন্থের লেখকের বক্তব্য এখানেই শেষ। তাঁর স্বীকারোক্তি অন্তত স্পষ্ট। শেষে তিনি বললেন : "দ্বাদশ শতাব্দী থেকে রোমান ক্যাথলিকগণ এই বাক্যের সম্পূর্ণ উল্টা অর্থ গ্রহণ করেছে....."। তাঁর এই কথাটি একটু ভাল করে বিবেচনা করতে হবে। তিনি এখানে রোমান ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের প্রতিবাদ করলেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, রুটি ও মদ খৃষ্টের দেহ ও রক্তে রূপান্তরিত হয়ে জীবন্ত খৃষ্টে পরিণত হয়। তিনি পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য দিয়ে সেই বিশ্বাসের প্রতিবাদ করলেন। পক্ষান্তরে তিনি যীশুর কথাটির ব্যাখ্যা করার জন্য এখানে 'তুলনীয়" কথাটি উহ্য আছে বলে দাবি করলেন। যদিও বাইবেলে উল্লিখিত যীশুর বাক্যটির শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ রোমান ক্যাথলিকদের বিশ্বাসই সমর্থন করে। এখানে যীশুর বাক্য নিম্নরূপ: "২৬ পরে তাঁহারা যখন ভোজন করিতেছেন, এমন সময় যীশু রুটী লইয়া আশীর্বাদ পূর্বক ভাঙিলেন, এবং শিষ্যদিগকে দিলেন, আর কহিলেন, লও, ভোজন কর, ইহা আমার শরীর (this is my body)। ২৭ পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদপূর্বক তাঁহাদিগকে দিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে ইহা হইতে পান কর; কারণ ইহা আমার রক্ত (this is my blood), নূতন নিয়মের রক্ত, যাহা অনেকের জন্য, পাপমোচনের নিমিত্ত, পতিত হয়।"

এখানে 'ইহা' (this) কথাটি দ্বারা বাহ্যত হাতে ধরা প্রকৃত রুটির টুকরোটিই বুঝা যায়। 'ইহা আমার শরীর' ও 'ইহা আমার রক্ত' এই বাক্যদ্বয় থেকে সুস্পষ্ট ও বাহ্যত বুঝা যায় যে, 'ইহা' শব্দটি দ্বারা যে বস্তুকে দেখানো হয়েছে তা প্রকৃত দেহ ও প্রকৃত রক্ত। রুটিটি যদি রুটিই থেকে থাকে তবে রুটিটি দেখিয়ে 'ইহা মাংস' বললে মিথ্যা বলা হয়। অনুরূপভাবে মদ যদি মদই থাকে তবে তা দেখিয়ে 'ইহা রক্ত' বললে মিথ্যা বলা হয়। অর্থাৎ এই বাক্যদ্বয়ের বাহ্যিক, শাব্দিক ও প্রকৃত অর্থ হলো, রুটি দেহ ও মদ রক্তে পরিণত হয়েছে।

প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পূর্বে বিশ্বের অধিকাংশ খৃস্টানই ছিলেন রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের অনুসারী। প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পরেও ক্যাথলিকগণই সংখ্যায় বেশি। আমরা দেখছি যে, বাইবেলে উল্লিখিত খৃষ্টের বাক্যের স্পষ্ট ও শাব্দিক

অর্থ দ্বারা সমর্থিত বিশ্বের অধিকাংশ খৃস্টানদের এই ধর্মবিশ্বাসটি ভুল। প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় স্বীকার করেছেন যে, এই বিশ্বাসটি ভুল এবং এই ভুলটি চর্মচক্ষুতেই ধরা পড়ছে।

তাঁদের এই বিশ্বাসের মতই 'ত্রিত্ববাদ' একটি চরম ভুল বিশ্বাস। যদি একথা বিতর্কের খাতিরে মেনে নেয়া হয় যে, বাইবেলের কতিপয় আয়াতের শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ 'ত্রিত্ববাদ' সমর্থন করে তবুও এই বিশ্বাসটি জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধির আলোকে একটি অসম্ভব ও অবাস্তব মতবাদ। পঞ্চইন্দ্রিয় যেমন বাইবেল সমর্থিত উপর্যুক্ত বিশ্বাসকে মিথ্যা ও ভুল বলে প্রমাণ করে, অনুরূপভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয় ত্রিত্ববাদকে মিথ্যা ও ভুল বলে প্রমাণ করে।

এখানে হয়ত খৃস্টানগণ বলতে পারেন, আমাদের কি জ্ঞান ও জ্ঞানেন্দ্রিয় নেই? এই বিশ্বাসটি যদি জ্ঞানের বিপরীত হয় তাহলে আমরা তা স্বীকার করছি কিভাবে? এই উত্তরে আমরা বলব, রোমান ক্যাথলিকগণের কি জ্ঞান বা পঞ্চ-ইন্দ্রিয় নেই? অতীত কালে এবং বর্তমানে তারাই কি সংখ্যায় বেশি নয়? তাহলে তারা এইরূপ একটি কথা কিভাবে বিশ্বাস করলেন, চর্মচক্ষেই যার ভুল ধরা পড়ে?

প্রিয় পাঠক! আরো অনেক বিষয় বাইবেলের বক্তব্যের শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ দ্বারা সমর্থিত এই 'রূপান্তর' (transubstantiation) বিশ্বাসটির ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করে।

প্রথমত : রোমান চার্চের[১] অনুসারিগণ বিশ্বাস করেন যে, শুধু রুটিটিই খৃস্টের দেহ ও রক্তে পরিণত হয় এবং রুটির টুকরোটি পরিপূর্ণ খৃস্টে পরিণত হয়।

খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, খৃস্টের মধ্যে দুইটি পৃথক প্রকৃতি বা সত্তা একত্রিত হয়েছে : ঐশ্বরিক প্রকৃতি ও মানবীয় প্রকৃতি, যা তিনি মরিয়ম থেকে লাভ করেন। এখানে transubstantiation বা 'রুটি ও মদের জীবন্ত খৃস্টে রূপান্তরিত হওয়া' বলতে যদি তাঁরা মনে করেন, রুটির টুকরোটি ঐশ্বরিক ও মানবিক উভয় প্রকৃতির সমন্বিত পরিপূর্ণ জীবন্ত খৃস্টতে পরিণত হয়, তবে তবে তা নিঃসন্দেহে বাতিল ও ভিত্তিহীন।

কারণ এক্ষেত্রে খৃস্টের মানবীয় দেহের উপাদানসমূহ এই রুটির মধ্যে প্রকাশিত হতে হবে, রুটির টুকরোটির মধ্যে চর্ম, অস্থি, রক্ত ইত্যাদি উপাদান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশিত হতে হবে। কিন্তু এগুলি কিছুই রুটির মধ্যে দেখা যায় না। উপরন্তু 'রুটি'-র যাবতীয় উপাদান ও গুণাবলি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যদি কেউ সেই রুটির টুকরোটির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, স্পর্শ করেন বা স্বাদ গ্রহণ করেন তবে তিনি রুটি ছাড়া আর কিছুই অনুভব করবেন না। তিনি যদি রুটিটিকে রেখে দেন তবে রুটি যেভাবে নষ্ট হয় সেভাবেই তা নষ্ট হবে, মানব দেহ যেভাবে নষ্ট হয় সেভাবে নষ্ট হবে না।

১. সাধারণত রোমান চার্চ বলতে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় বুঝালেও আরবীতে বায়যান্টাইন সম্রাটের অনুসারী গ্রীক ক্যাথলিক ও গ্রীক অর্থোডক্স সম্প্রদায়কেও রোমান' বলা হয়। বিস্তারিত দেখুন : Encyclopaedia Britannica, article : Syrian Orthodox Patriarchate of Antioch.

এখানে যদি কোন 'পরিবর্তন' বা 'রূপান্তর' ঘটার দাবি করতে হয় তাহলে 'খৃষ্টের রুটিতে রূপান্তরিত হওয়ার' দাবি করা উচিত, কোন মতেই 'রুটির খৃষ্টে রূপান্তরিত হওয়ার' দাবি করা করার সুযোগ নেই। যদি তারা বলতেন যে, এই অনুষ্ঠানে খৃষ্ট রুটিতে পরিণত হন, তবে সে কথাটি বাতিল ও অযৌক্তিক হলেও 'রুটির খৃষ্টে রূপান্তরিত হওয়ার' মত এত ফালতু বলে গণ্য হতো না।

দ্বিতীয়ত : আগেই বলেছি, খৃষ্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে খৃষ্টের মধ্যে দুই প্রকৃতি রয়েছে : মানবীয় ও ঐশ্বরিক। দুইটি প্রকৃতি এক ও অবিচ্ছেদ্য। আমরা জানি যে, একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে ঈশ্বরের উপস্থিতি কল্পনা করা যায়, কিন্তু কোন মানুষর ক্ষেত্রে তা কল্পনা করা যায় না। খৃষ্টান বিশ্বাস অনুসারে খৃষ্টের ঐশ্বরিক প্রকৃতির একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হওয়া কল্পনা করা গেলেও তাঁর মানবীয় প্রকৃতির ক্ষেত্রে তা কল্পনা করা সম্ভব নয়। মানুষ হিসেবে খৃষ্ট আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। তিনি ক্ষুধার্ত হতেন, আহার করতেন, পান করতেন, ঘুমাতেন, ইহুদীদের ভয়ে ভীত হতেন, তাঁদের থেকে পালিয়ে যেতেন..... ইত্যাদি সকল মানবীয় দুর্বলতা, স্বভাব প্রকৃতি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাহলে আমরা কিভাবে কল্পনা করতে পারি যে, এই মানবীয় দেহ নিয়ে একই সময়ে তিনি অগণিত স্থানে রুটি থেকে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য উপস্থিত হন?

সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হলো, উর্ধারোহণের পূর্বে একটি ঘটনাও ঘটে নি যে, যীশু এভাবে একই সময়ে দুইটি স্থানে বিদ্যমান থেকেছেন। তাঁর উর্ধ্বারোহণের পরেও এইরূপ থাকার কোন ঘটনার কথা জানা যায় না। তাহলে কিভাবে শতশত বছর পরে এইরূপ একটি বাতিল বিশ্বাস উদ্ভাবন করা হলো যে, খৃষ্ট একই মুহূর্তে অগণিত স্থানে রুটি থেকে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য দেহ ও রক্ত নিয়ে উপস্থিত হন?

তৃতীয়ত : যদি আমরা ধরে নিই যে, সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ যাজক একই সময়ে এই পবিত্র নৈশভোজের অনুষ্ঠান (Eucharist/Holy Communion/Lord's Supper) পালন করলেন এবং প্রত্যেকের রুটির কুমারী মরিয়মের গর্ভ থেকে যে জন্মপ্রাপ্ত সেই খৃষ্টে রূপান্তরিত হলো, তবে এই লক্ষ লক্ষ নতুন রূপান্তরিত খৃষ্ট সম্পর্কে আমরা কি ধারণা করব? তাঁরা সকলেই একই খৃষ্ট, না পৃথক পৃথক খৃষ্ট? পৃথক খৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়, কারণ খৃষ্ট তো একজনই। আর একই খৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়, কারণ এই প্রত্যেক খৃষ্ট পৃথক রুটি ও পৃথক উপাদান থেকে তৈরি হচ্ছেন।

চতুর্থত : খৃষ্টানদের বিশ্বাস অনুসারে যাজকের মুখ থেকে 'প্রার্থনা বাক্যগুলি' বের হওয়ার সাথে সাথে তাঁর হাতের রুটিটি রক্তমাংসের প্রকৃত 'খৃষ্টে' রূপান্তরিত হয়। এরপর যাজক রুটিটি ভেঙ্গে ভেঙ্গে সমবেত ভক্তগণকে প্রদান করেন। প্রত্যেকেই তা ভক্ষণ করেন। এই অবস্থায় আমরা কি মনে করব? আমরা কি মনে করব যে, রুটিটি খৃষ্টে রূপান্তরিত হওয়ার পরে যাজক সেই খৃষ্টকে কেটে টুকরো টুকরো করে প্রত্যেক ভক্তকে খৃষ্টের দেহের একটি ছোট অংশ প্রদান করেন? তাহলে তো প্রত্যেক ভক্ত পূর্ণ

খৃষ্টকে পেলেন না। না কি আমরা মনে করব যে, রুটিটি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে রুটির প্রতিটি টুকরো একটি পৃথক পৃথক পরিপূর্ণ খৃষ্টে রূপান্তরিত হয়ে যায়? সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, এখানে তো একজন খৃষ্টকেই উৎসর্গ করা হয়, তাহলে এত খৃষ্ট কোথা থেকে এলেন?

পঞ্চমত : খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, মানবজাতির পাপ মোচনের জন্য খৃষ্ট তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। প্রভুর নৈশভোজন (Eucharist/Lord's Supper)-এর এই অনুষ্ঠানটি ঘটেছিলো ক্রুসারোহণের কিছু আগে। এখন যদি আমরা মনে করি যে, এই অনুষ্ঠানে খৃষ্ট যে দেহ ও রক্ত উৎসর্গ করলেন তা ছিল বিশ্বের পাপ মোচনের জন্য, তবে বুঝতে হবে যে, এই উৎসর্গের মাধ্যমেই বিশ্বের পাপ মোচনের জন্য তবে বুঝতে হবে যে, এই উৎসর্গের মাধ্যমেই বিশ্বের পাপ মোচিত হয়ে গিয়েছিল। তাহলে এর পরে তো আর ইহূদীদের হাতে দ্বিতীয়বার ক্রুসের কাঠে চড়ে প্রাণ উৎসর্গ করার কোন প্রয়োজনই থাকে না। খৃষ্টানগণই তো বিশ্বাস করেন যে, "অনেকের পাপভার তুলিয়া লইবার নিমিত্ত খৃষ্ট একবার উৎসৃষ্ট হইয়াছেন" ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ৯ অধ্যায়ের শেষ আয়াতে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই একই পাপের জন্য তিনি বারংবার উৎসৃষ্ট হবেন ও বেদনা ভোগ করবেন কেন?

ষষ্ঠত : খৃষ্টানদের দাবি যদি সত্য হয় তবে প্রমাণিত হবে যে, খৃষ্টানগণ ইহূদীদের চেয়েও খারাপ। কারণ তারা (ইহূদীরা) যীশুকে একবার মাত্র কষ্ট দিয়েছে বা উৎসর্গ করেছে। এরপর তারা তার উৎকৃষ্ট দেহের মাংসভক্ষণ করার মত নীচতা প্রদর্শন করেনি। আর খৃষ্টানগণ প্রতিদিন অগণিত স্থানে খৃষ্টকে কষ্ট দিচ্ছেন এবং উৎসর্গ করছেন। খৃষ্টানগণ ইহূদীদেরকে অবিশ্বাসী ও অভিশপ্ত বলে বিশ্বাস করেন; কারণ তারা একবার মাত্র খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে উৎসর্গ করেছিল। একবারের উৎসর্গকারী যদি অবিশ্বাসী ও অভিশপ্ত বলে গণ্য হয়, তবে যারা অগণিত বার তাঁকে উৎসর্গ করেন এবং তাঁর মাংস ভক্ষণ করেন ও রক্ত পান করেন, তাদের পরিণতি কি হওয়া উচিত? যারা তাদের 'ঈশ্বরের' প্রকৃত মাংস ভক্ষণ করেন এবং প্রকৃত রক্ত পান করেন তাদের ক্ষপ্পর থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এদের অসহায় দুর্বল 'ঈশ্বর'ই এদের হাত থেকে বাঁচতে পারলো না, তাহলে এদের হাত থেকে কে আর বাঁচতে পারবে? তাদের থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে দূরে রাখুন। এজন্য প্রবাদ বাক্যে বলা হয়েছে : মুর্খ বন্ধুই তোমার প্রকৃত শত্রু।

সপ্তমত ঃ খৃষ্টানগণ মনে করেন যে, প্রভুর নৈশভোজ অনুষ্ঠানে যে রুটি ও মদ উৎসর্গ করা হয় তাতে প্রকৃত খৃষ্টকে উৎসর্গ করা হয়। অর্থাৎ এই অনুষ্ঠানটি পাপমোচনের জন্য খৃষ্টকে উৎসর্গ করার অনুষ্ঠান, যেখানে রুটি প্রকৃত খৃষ্টে রূপান্তরিত হয় এবং সেই প্রকৃত ও জীবন্ত খৃষ্টকে উৎসর্গ করে ভক্তগণ পাপমুক্ত হন। কিন্তু লূকলিখিত সুসমাচারের ২২ অধ্যায়ে (১৯ আয়াতে) উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই নৈশভোজ উপলক্ষে খৃষ্ট বলেন : "ইহা আমার স্মরণার্থে করিও (this do in

remembrance of me)।" নৈশভোজ (Eucharist) যদি প্রকৃত উৎসর্গ হয় তবে তা আবার 'উৎসর্গের স্মরণে' পালিত হবে কিভাবে? কোন কাজ নিজে নিজের স্মরণে হতে পারে না (প্রকৃত বিবাহ অনুষ্ঠানকে বিবাহ বার্ষিকী বলা যায় না)।

এ সকল জ্ঞানী ও বিবেকবান মানুষ যদি পঞ্চইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এইরূপ বিষয়ে এই প্রকারের উদ্ভট কাল্পনিক কথা বলতে পারেন যার অসারতা চর্ম চক্ষে দেখা যায়, তবে ইন্দ্রিয় দিয়ে যার অসারতা প্রমাণ করা যায় না, এইরূপ জ্ঞানভিত্তিক বিষয়ে ও ঐশ্বরিক বিষয়ে উদ্ভট, অবাস্তব ও কাল্পনিক কথাবার্তা বলতে আর তাদের অসুবিধা কি?[১]

তবে আমি উপরের সকল বিষয় পাশ কাটিয়ে, প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের আপত্তির উত্তরে বলব যে, এ সকল মানুষদেরকে আপনার জ্ঞানী ও বিবেকবান বলে বিশ্বাস করেন। এরা যেমন পিতাপিতামহের অন্ধ অনুকরণ করে বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে 'রুটি ও মদের প্রকৃত ও জীবন্ত খৃষ্টে রূপান্তরিত হওয়া'-র মত একটি চক্ষু, হস্ত ও জিহ্বা দ্বারা প্রমাণিত মিথ্যা, উদ্ভট, অযৌক্তিক ও জ্ঞান বিরোধী কথা বিশ্বাস করার বিষয়ে একমত হয়েছেন, তেমনি তাঁরা এবং আপনারা সকলেই 'ত্রিত্ববাদের' মত একটি জ্ঞান, যুক্তি ও বিবেক বিরোধী কথা বিশ্বাস করতে একমত হয়েছেন, যার অসারতা ইন্দ্রিয় দ্বারাও বুঝা যায়।

ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক মানুষ রয়েছেন, যাদেরকে আপনারা (প্রটেস্ট্যান্টগণ) 'ধর্মদ্রোহী' বা ধর্মবিরোধী' বলে অভিহিত করেন। এদের সংখ্যা আপনাদের চেয়ে বেশি বরং ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়ের ধার্মিক খৃষ্টানদের চেয়েও এদের সংখ্যা বেশি। এরাও আপনাদের সমাজের মানুষ। এরাও একসময়ে খৃষ্ট ধর্মে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে ত্রিত্ববাদের মত উদ্ভট ও অযৌক্তিক বিষয়াদি থাকার কারণে তারা খৃষ্টধর্ম ছেড়ে দিয়েছেন। এরা এই ত্রিত্ববাদকে যে ভাবে কঠিনভাবে উপহাস করেন এভাবে আর কোন বিষয় নিয়ে উপহাস করেন না। এ সকল পণ্ডিতের বই পুস্তক পাঠ করলে পাঠক তা সহজেই জানতে পারবেন।

খৃষ্টানদের মধ্য থেকে 'ইউনিটারিয়ান (Unitarian) সম্প্রদায় বা একেশ্বরবাদী খৃষ্টানগণ এই ত্রিতত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা এই বিশ্বাসের ঘোর বিরোধী। আর প্রাচীন ও আধুনিক সকল যুগেই ইহূদীগণ ও মুসলিমগণ এই বিশ্বাসকে পাগলের প্রলাপ বলেই গণ্য করেন।

১. রুটি, মদ এবং এগুলির রূপান্তর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। চক্ষু, হস্ত ও জিহ্বা দিয়ে এগুলির সত্যতা বা অসত্যতা বুঝা যায়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতি ও এ বিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞানভিত্তিক কথা সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নয়। চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি দিয়ে সেগুলির সত্যতা বা অসত্যতা প্রমাণ করা যায় না বরং বিবেক, যুক্তি, জ্ঞান ইত্যাদির মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে হয়। 'রুটি প্রকৃত ও জীবন্ত খৃষ্টে রূপান্তরিত হয়ে গেল' এই কথাটির সত্যতা বা অসত্যতা চক্ষু, হস্ত বা জিহ্বা দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। এ সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কেউ প্রমাণ করতে পারবে যে, এই বিশ্বাস ও দাবিটি মিথ্যা। তার পরেও তাঁরা গায়ের জোরে এই দাবি করতেই থাকবেন এবং নানান উদ্ভট ব্যাখ্যা প্রদান করতে থাকবেন। তাহলে জ্ঞানভিত্তিক ও ঐশ্বরিক বিষয়ে তাঁরা গায়ের জোরে উদ্ভট প্রলাপ বকবেন, এটাই তো স্বাভাবিক।

ষষ্ঠ বিষয়

অধিকাংশ ক্ষেত্রে খৃস্টের বাক্যের মধ্যে অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি তিনি বুঝিয়ে না দিলে তাঁর সমসাময়িক মানুষেরা বরং তাঁর শিষ্যরাও অনেক সময় তাঁর কথা বুঝতে পারতেন না। তিনি তাঁর অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক বাক্যগুলির মধ্যে থেকে যেগুলির ব্যাখ্যা নিজে প্রদান করেছেন, সেগুলি তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। আর যে সকল বাক্যের তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করেন নি, সেগুলির মধ্য থেকে কিছু কথার অর্থ তাঁরা অনেক পরে বুঝতে পেরেছেন। আর কিছু কথা তাঁরা জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বুঝতেই পারেন নি। এই প্রকারের বাক্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে। এখানে অল্প কিছু উদাহরণ উল্লেখ করছি।

যোহনলিখিত সুসমাচারের ২য় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহূদীগণ খৃস্টের নিকট অলৌকিক চিহ্ন দাবি করেন। এ বিষয়ে খৃস্টের সাথে তাদের নিম্নরূপ কথোপকথন হয় : "১৯ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে ইহা উঠাইব। ১০ তখন যিহূদীরা কহিল, এই মন্দির নির্মাণ করিতে ছেচল্লিশ বৎসর লাগিয়াছে; তুমি কি তিন দিনের মধ্যে ইহা উঠাইবে? ২১ কিন্তু তিনি আপন দেহরূপ মন্দিরের বিষয় বলিতেছিলেন। ২২ অতএব যখন তিনি মৃতগণের মধ্যে হইতে উঠিলেন, তখন তাঁহার শিষ্যদিগের মনে পড়িল যে, তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন; আর তাঁহারা শাস্ত্রে ও যীশুর কথিত বাক্যে বিশ্বাস করিলেন।"

এখানে আমরা দেখছি যে, ইহূদীগণ তো দূরের কথা যীশুর শিষ্যগণও তাঁর কথার অর্থ বুঝেন নি। তবে অনেক পরে, যীশুর পুনরুত্থানের পরে শিষ্যগণ এই কথার অর্থ বুঝতে পারেন।

নীকদীম নামক ইহূদী ফরীশী ও অধ্যক্ষকে খৃস্ট বলেন ঃ "সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, উপর হইতে না জন্ম হইলে (বা নূতন জন্ম না হইলে) কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না।"

নীকদীম খৃস্টের এই কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম হন। তিনি বলেন; "মনুষ্য বৃদ্ধ হইলে কেমন করিয়া তাহার জন্ম হইতে পারে? সে কি দ্বিতীয় বার মাতার গর্ভে প্রবেশ করিয়া জন্মিতে পারে?"

তখন খৃস্ট আবার তাঁর কথাটি তাঁকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু এবারেও নীকদীম বুঝতে অক্ষম হন। তিনি আবার প্রশ্ন করেন ঃ "এ সকল কি প্রকারে হইতে পারে?" তখন খৃস্ট তাকে বলেন ঃ "তুমি ইস্রায়েলের গুরু, আর এ সকল বুঝিতেছ না?"....যোহনের সুসমাচারের ৩য় অধ্যায়ে এই কাহিনী বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যত্র যীশু ইহূদীদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ "আমিই সেই জীবন খাদ্য (bread of life) ।:.....আমিই সেই জীবন্ত খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। কেহ যদি এই খাদ্য খায় তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকিবে। আর আমি যে খাদ্য দিব, সে

আমার মাংস....। তখন যিহূদীরা পরস্পরে বাগযুদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিল, এ ব্যক্তি কেমন করিয়া আমাদিগকে ভোজনের জন্য আপনার মাংস দিতে পারে? যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা যদি মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন ও তাঁহার রক্ত পান না কর, তোমাদিগতে জীবন নাই। যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে, এবং আমি তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব। কারণ আমার মাংস প্রকৃত ভক্ষ্য, এবং আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়। যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে থাকে এবং আমি তাহাতে থাকি। যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং পিতা হেতু আমি জীবিত আছি, সেইরূপ যে কেহ আমাকে ভোজন করে, সেও আমা হেতু জীবিত থাকিবে।......

তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেক এ কথা শুনিয়া বলিল, এ কঠিন কথা, কে ইহা শুনিতে পারে?......ইহাতে তাঁহার অনেক শিষ্য পিছাইয়া পড়িল, তাঁহার সঙ্গে আর যাতায়াত করিল না......."

যোহনলিখিত সুসমাচারের ৬ অধ্যায়ে এই কাহিনী বিস্তারিত লেখা হয়েছে।[১]

এখানেও আমরা দেখছি যে, ইহূদীরা এবং যীশুর শিষ্যগণ যীশুর কথা বুঝতে পারলেন না। এমনকি তাঁর কথার দুর্বোধ্যতা ও অসংলগ্নতা দেখে অধিকাংশ শিষ্যই তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেল।

যোহনলিখিত সুসমাচারের ৮ম অধ্যায়ে রয়েছে ঃ "২১ পরে তিনি আবার তাহাদিগকে কহিলেন, আমি যাইতেছি, আর তোমরা আমার অন্বেষণ করিবে, ও তোমাদের পাপে মরিবে; আমি যেখানে যাইতেছি, সেখানে তোমরা আসিতে পার না। ২২ তখন যিহূদীরা বলিল, এ কি আত্মঘাতী হইবে, তাই বলিতেছে, আমি যেখানে যাইতেছি, সেখানে তোমরা আসিতে পার না?......৫১ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কেহ যদি আমার বাক্য পালন করে, সে কখনও মৃত্যু দেখিবে না। ৫২ যিহূদীরা তাঁহাকে বলিল, এখন জানিলাম, তুমি ভূতগ্রস্ত; অব্রাহাম ও ভাববাদিগণ মরিয়া গিয়াছেন; আর তুমি বলিতেছ, কেহ যদি আমার বাক্য পালন করে, সে কখনও মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না।"

এখানে উভয় স্থানেই ইহূদীগণ তাঁর কথা বুঝতে পারে নি। শুধু তাই নয়, উপরন্তু দ্বিতীয় স্থানে তারা তাঁকে ভূতগ্রস্ত বা পাগল বলেছেন।

যোহনলিখিত সুসমাচারের ১১ম অধ্যায়ে রয়েছে ঃ "আর ইহার পরে (যীশু) তাঁহাদিগকে (শিষ্যদিগকে) বলিলেন, আমাদের বন্ধু লাসার নিদ্রা গিয়াছে, কিন্তু আমি নিদ্রা হইতে তাহাকে জাগাইতে যাইতেছি। ১২ তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, সে যদি নিদ্রা গিয়া থাকে, তবে রক্ষা পাইবে। ১৩ যীশু তাঁহার মৃত্যুর বিষয় বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মনে করিলেন যে, তিনি নিদ্রাঘটিত বিশ্রামের কথা বলিতেছেন। ১৪ অতএব যীশু তখন স্পষ্টরূপে তাঁহাদিগকে কহিলেন, লাসার মরিয়াছে।"

১. বিস্তারিত দেখুন ঃ যোহন ৬/৩২-৬৬।

এখানও খৃষ্টের শিষ্যগণ তাঁর কথা বুঝতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত তিনি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করার পরে তাঁরা বুঝলেন।

মথি লিখিত সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ "যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সতর্ক হও, ফরীশী ও সদ্দূকীদের তাড়ী (খামীর ঃ leaven) হইতে সাবধান থাক। ৭ তখন তাঁহারা পরস্পরে তর্ক করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমরা যে রুটী আনি নাই। ৮ তাহা বুঝিয়া যীশু কহিলেন, হে অল্প বিশ্বাসীরা (O ye of little faith), তোমাদের রুটী নাই বলিয়া কেন পরস্পরে তর্ক করিতেছ?........১১ তোমরা কেন বুঝ না যে, আমি তোমাদিগকে রুটীর বিষয় বলি নাই? কিন্তু তোমরা ফরীশী ও সদ্দূকীদের তাড়ী হইতে সাবধান থাক। ১২ তখন তাঁহারা বুঝিলেন, তিনি রুটীর তাড়ী হইতে নয়, কিন্তু ফরীশী ও সদ্দূকীদের শিক্ষা হইতে সাবধান থাকিবার কথা বলিয়াছেন।"

এখানেও খৃষ্টের শিষ্যগণ তাঁর কথা বুঝিতে পারেন নি। তিনি তাদের ধমক দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরেই তাঁরা তাঁর কথার অর্থ বুঝতে পারলেন।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় যীশু যে মৃত বালিকাকে জীবন দান করেন, তার বিষয়ে লূকলিখিত সুসমাচারের ৮ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ ৫২ তখন সকলে তাহার জন্য কাঁদিতেছিল, ও বিলাপ করিতেছিল। তিনি কহিলেন, কাঁদিও না; সে মরে নাই, ঘুমাইয়া রহিয়াছে। ৫৩ তখন তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিল, কেননা তাহারা জানিত, সে মরিয়া গিয়াছে।"

এখানেও সমবেত মানুষদের কেউই তাঁর কথা বুঝতে পারেন নি;এজন্য তারা তাঁকে উপহাস করেন।

লূকলিখিত সুসমাচারের ৮ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, যীশু প্রেরিতগণকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ "৪৪ তোমরা এই সকল বাক্য কর্ণে স্থান দান কর; কেননা সম্প্রতি মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের হাতে সমর্পিত হইবে। ৪৫ কিন্তু তাঁহারা এ কথা বুঝিলেন না, এবং ইহা তাঁহাদের হইতে গুপ্ত থাকিল, যাহাতে তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে না পারেন, এবং তাঁহার নিকটে এ কথার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহাদের ভয় হইল।

এখানেও যীশুর শিষ্যগণ তাঁর কথা বুঝতে পারলেন না। উপরন্তু তাঁর ভয়ে তাঁকে এর ব্যাখ্যাও জিজ্ঞেস করতে পারলেন না।

লূকলিখিত সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ "৩১ পরে তিনি সেই বারো জনকে কাছে লইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমরা যিরূশালেমে যাইতেছি; আর ভাববাদিগণ দ্বারা যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত মনুষ্যপুত্রে সিদ্ধ হইবে। ৩২ কারণ তিনি পরজাতীয়দের হস্তে সমর্পিত হইবেন, এবং লোকেরা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবে, তাঁহার অপমান করিবে, তাঁহার গায়ে থুথু দিবে; এবং কোড়া প্রহার করিয়া তাঁহাকে বধ করিবে; পরে তৃতীয় দিবসে তিনি পুনরায় উঠিবেন। ৩৪ এই সকলের

কিছুই তাঁহার বুঝিলেন না, এই কথা তাঁহাদের হইতে গুপ্ত রহিল, এবং কি কি বলা যাইতেছে, তাহা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।"

এখানেও খৃষ্টের প্রেরিতগণ খৃষ্টের কথা বুঝতে পারলেন না। অবাক বিষয় হলো, যীশু এর পূর্বেও এ সকল বিষয়ে তাঁদের বুঝিয়েছেন। এখানে তিনি দ্বিতীয়বার তাঁদেরকে তা বুঝালেন। আর এখানে তাঁর কথার মধ্যে বাহ্যত কোন অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর প্রেরিতগণ তাঁর কথা বুঝতে পারলেন না।

সম্ভবত তাঁদের এই না বুঝার কারণ হলো, পুরাতন নিয়মের অগণিত আয়াতের ভিত্তিতে ইহূদীদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস অনুসারে তারা জানতেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (The Messiah) বা খৃষ্ট (The Christ, The Appointed) প্রবল প্রতাপশালী রাজা হবেন। যীশুর বিষয়ে তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত ও বহু প্রতীক্ষিত 'খৃষ্ট'। কাজেই তাঁরা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতেন এবং আশা করতেন যে, অচিরেই তিনি রাজ সিংহাসনে আরোহণ করবেন এবং তাঁর দ্বাদশ শিষ্যও তাঁর পাশে রাজ-সিংহাসনে বসবেন। কারণ যীশু তাদেরকে ওয়াদা করেছিলেন যে, তাঁদেরকে তিনি দ্বাদশ সিংহাসনে বসাবেন এবং তাঁরা ইস্রায়েল সন্তানগণের দ্বাদশ-কুলের উপর রাজত্ব করবেন। তাঁরা এই রাজত্ব বলতে জাগতিক রাজত্বই বুঝেছিলেন।

যীশুর উপর্যুক্ত বাক্যগুলি তাঁদের এই রাজত্বলাভের বিশ্বাস ও প্রত্যাশার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। একজন তাঁরা এই কথাগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তা বুঝতে পারেন নি। পাঠক অচিরেই জানতে পারবেন যে, দ্বাদশ শিষ্য কিভাবে শীঘ্রই রাজ সিংহাসনে বসার প্রত্যাশা করতেন।

শিষ্যগণ কর্তৃক খৃষ্টের কথা না বুঝার বা ভুল বুঝার আরো দুইটি কারণ ছিল। তাঁদের অধিকাংশই অথবা সকলেই মৃত্যু পর্যন্ত এই ভুল ধারণা নিয়েই থেকেছেন। বিষয় দুইটি হলো :

প্রথমত, তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, কেয়ামত, অর্থাৎ পৃথিবীর শেষ দিন বা পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত যোহন জীবিত থাকবেন; কেয়ামতের আগে তিনি মরবেন না।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, তাঁদের যুগেই কেয়ামত বা পুনরুত্থান ও বিচার অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম অধ্যায়ে পাঠক তা বিস্তারিত জানতে পেরেছেন।

সর্বোপরি, এ কথা সুনিশ্চিত যে, যীশুর কোন কথাই হুবহু শাব্দিকভাবে সংরক্ষিত হয় নি। কোন সুসমাচারেই তাঁর কথাগুলি হুবহু উদ্ধৃত করা হয় নি বরং তাঁর কথার গ্রীক অনুবাদই সুসমাচারগুলিতে পাওয়া যায়। যীশুর কথার যে অর্থ বর্ণনাকারী বুঝেছেন, সেই অর্থে গ্রীক অনুবাদ সুসমাচারগুলিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

পাঠক এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১৮ প্রমাণ থেকে বিস্তারিতভাবে জেনেছেন যে, মথির লেখা মূল সুসমাচারটি হারিয়ে গিয়েছে। তার গ্রীক অনুবাদটিই বর্তমানে প্রচলিত। কে এই অনুবাদটি করেছেন তা আজ পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। বাকি পুস্তকগুলি যাঁদের নামে প্রচলিত সেগুলিও যে তাঁরাই লিখেছেন তাও কোন বিশ্বস্ত সূত্রের মাধ্যমে নিশ্চিত জানা যায় না। এ সকল পুস্তকের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকারের বিকৃতি প্রবেশ করেছে তাও সুনিশ্চিত। একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, ধার্মিক ও বিশ্বাসী খৃস্টানগণ গ্রহণযোগ্য ও সঠিক কোন বিষয়কে প্রমাণ করার জন্য বা কোন আপত্তি খণ্ডন করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বাইবেলের মধ্যে জালিয়াতি করতেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৩১ নং প্রমাণ থেকে পাঠক জেনেছেন যে, ধার্মিক খৃস্টানগণ ত্রিত্ববাদ প্রমাণের জন্য এবং ত্রিত্ববাদ বিরোধী আপত্তি খণ্ডনের জন্যও বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন বলে শক্তিশালী দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

ত্রিতত্ত্ববাদ প্রমাণ করার জন্য তাঁরা যে সকল জালিয়াতি করেছেন সেগুলির কিছু নমুনা পাঠক সেখানে দেখেছেন। এ সকল ধার্মিক ও বিশ্বাসী খৃস্টান যোহনের প্রথম পত্রের ৫ম অধ্যায়ে নিম্নের বাক্যগুলি অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন : "কারণ স্বর্গে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষ্য সংরক্ষণ করেন : পিতা, বাক্য ও পবিত্র আত্মা; এবং তাঁহার তিন একই। এবং পৃথিবীতে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহার সাক্ষ্য প্রদান করেন....।" তাঁরা লূকলিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ের মধ্যে কিছু কথা সংযোজন করেছেন[১], মথির সুসমাচারের প্রথম অধ্যায় থেকে কিছু শব্দ ফেলে দিয়েছেন,[২] লূকলিখিত সুসমাচারের ২২ অধ্যায় থেকে একটি পূর্ণ আয়াতই তাঁরা ফেলে দিয়েছেন[৩]।

এমতাবস্থায়, যদি বাইবেলের মধ্যে যীশুর এমন কিছু কথা বিদ্যমান থাকে, যেগুলি বাহ্যত ত্রিত্ববাদ সমর্থন করে, তবে সেগুলির উপর নির্ভর করা যাবে না বা সেগুলিকে

১. লূকের প্রথম অধ্যায়ের ৩৫ আয়াতে বলা হয়েছে: "এই কারণ যে, 'তোমার থেকে' পবিত্র সন্তান জন্মিবে তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে।" এই আয়াতের মধ্যে যীশুর মানবীয় সত্তা প্রমাণ করার জন্য "তোমার থেকে' শব্দ দুইটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইংরেজি বাইবেলে (KJV) শব্দ দুইটি রয়েছে : that holy thing which shall be born of thee shall be called the son of God। বাংলা বাইবেলে শব্দ দুইটি নেই।

২. মথির ১/১১ আয়াতটি নিম্নরূপ : "যোশিয়ের সন্তান যিকনিয় ও তাহার ভ্রাতৃগণ, বাবিলে নির্বাসন কালে জাত"। এই আয়াতটির প্রকৃত রূপ ছিল: "যোশিয়ের সন্তান যিহোয়াকীম ও তাহার ভ্রাতৃগণ, এবং যিহোয়াকীমের সন্তান যিকনিয়, বাবিলে নির্বাসন কালে জাত।" এখান থেকে 'যিহোয়াকীম' শব্দটিকে পূণ্যবান খৃস্টানগণ ফেলে দিয়েছেন; যীশুর খৃস্টত্ব প্রমাণের জন্য।

৩. লূক ২২/৪২ আয়াতটি নিম্নরূপ : "তখন স্বর্গ হইতে এক দূত দেখা দিয়া তাঁহাকে সবল করিলেন"। 'স্বর্গের দূত এসে প্রভু যীশুকে সবল করবে' এই কথাটি যীশু খৃস্টের ঈশ্বরত্বের সাথে সাংঘর্ষিক, এজন্য এই আয়াতটি তারা বাইবেল থেকে ফেলে দেন।

বাহ্যিক বা শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করা যাবে না। কারণ সেগুলি অনুবাদকের অনুবাদের ভুল হতে পারে, বর্ণনাকারীর বুঝার ভুল হতে পারে বা ধার্মিক ও বিশ্বাসী খৃষ্টানগণের জালিয়াতি হতে পারে। পাঠক এই ভূমিকার দ্বাদশ বিষয়ের আলোচনা থেকে জানতে পারবেন যে, এই জাতীয় যে সকল খৃস্টীয় বাক্যকে ত্রিত্ববাদের সমর্থনে পেশ করা হয় সেগুলি কোনটিই দ্ব্যর্থহীন নয়।

সপ্তম বিষয়

কোন কোন বিষয় এমন আছে যে, মানবীয় জ্ঞান দিয়ে তার প্রকৃতি ও নিগূঢ় রহস্য পুরোপুরি বুঝা যায় না, তবে মানবীয় জ্ঞান তা অসম্ভব বলে মনে করে না এবং তা স্বীকার করা কোন অযৌক্তিক ও অসম্ভব বিষয় বলে গণ্য হয় না। এইরূপ বিষয় 'সম্ভব' বলে গণ্য। পক্ষান্তরে কোন কোন বিষয়কে মানবীয় জ্ঞান ও মানবীয় স্বভাব একেবারেই অসম্ভব ও অবাস্তব বলে গণ্য করে। এইরূপ বিষয়ের অস্তিত্ব অস্বাভাবিক ও জ্ঞানত অগ্রহণযোগ্য। এজন্য এইরূপ বিষয়কে 'অসম্ভব' বলে গণ্য করা হয়। উভয় বিষয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

দ্বিতীয় "অসম্ভব" বিষয়ের মধ্যে রয়েছে: দুইটি সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী বিষয়ের একত্রিত হওয়া, একই বস্তু একই সময়ে একই দিক থেকে এক ও অধিক হওয়া, বা একা ও জোড়া হওয়া, বিভিন্ন বিপরীত বস্তু একত্রিত হওয়া, উত্তাপ ও শীতলতা, শুষ্কতা ও আদ্রতা, সাদা ও কালো বা আলো ও অন্ধকার, দৃষ্টিমান ও অন্ধ, স্থিরতা ও আন্দোলন, ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী বিষয়ের একই সময়ে একই স্থানে একই ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে একই দিক থেকে একত্রিত ও সম্মিলিত হওয়া। যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কোন চিন্তাভাবনা বা যুক্তি-তর্ক ছাড়াই এগুলিকে অসম্ভব বলে গণ্য করবেন।

এই প্রকারের বিষয়ের মধ্যে রয়েছে, কোন বিষয়কে দ্বিতীয় একটি বিষয় দ্বারা প্রমাণ করা, এরপর দ্বিতীয় বিষয়কে প্রমাণ করতে প্রথম বিষয়কে উপস্থাপন করা। এই জাতীয় বিষয়কে যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি অসম্ভব বলে গণ্য করবেন। আর অকাট্য প্রমাণাদিও এর অসম্ভবতা নিশ্চিত করে।

অষ্টম বিষয়

যদি দুইটি বক্তব্য পরস্পরবিরোধী হয় তবে উভয়ের মধ্যে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ সমন্বয় সম্ভব না হলে উভয় বক্তব্যই বাতিল ও অগ্রণযোগ্য বলে গণ্য হবে, অথবা সম্ভব হলে উভয় বক্তব্যেরই ব্যাখ্যা করতে হবে। আর ব্যাখ্যা অবশ্যই যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য হতে হবে, যাতে কোন মিথ্যা বা অসম্ভব বিষয় থাকবে না।

যেমন কতক আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ঈশ্বরের মানুষের মত দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইত্যাদি রয়েছে, তিনি বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেন, গমনাগমন করেন, দর্শন প্রদান

করেন.... ইত্যাদি। এর বিপরীতে কতক আয়াত থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীতে ঈশ্বরকে দেখা যায় না বা তিনি মানবীয় আকৃতির উর্ধ্বে। আমরা দেখেছি যে, এই পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় করতে হলে ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আর এই ব্যাখ্যা অবশ্যই বুদ্ধিগ্রাহ্য হতে হবে। এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না যে, ঈশ্বরের উভয় প্রকারের গুণই রয়েছে। অর্থাৎ এই বৈপরীত্যের সমাধানে একথা বলা চলে না যে, ঈশ্বরের মানবীয় আকৃতি আছে এবং তিনি এইরূপ আকৃতি থেকে পবিত্র, ঈশ্বরকে দেখা যায় না এবং তিনি বিভিন্ন মানুষকে দর্শন দান করেন, ঈশ্বর বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন ও অবস্থান করেন এবং তিনি এগুলি থেকে পবিত্র....। যদিও আমরা ঈশ্বরের এ সকল গুণের প্রকৃত রহস্য পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারি না, তবুও এইরূপ উদ্ভট সমন্বয় বা ব্যাখ্যা যে বাতুল ও প্রত্যাখ্যাত তা আমরা বুঝতে পারি। এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা পরস্পর-বিরোধিতা বা বৈপরীত্য দূর হয় না।

নবম বিষয়

পরিমাণের একটি প্রকার হলো সংখ্যা। সংখ্যার নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। গণিত বিষয়ের অবস্থাই শুধু তা প্রকাশ করে। প্রত্যেক অস্তিত্বশীল বস্তুরই একটি সংখ্যা আছে। তা হয় এক হবে বা বেশি হবে। যার পৃথক ও প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য আছে, পৃথক ও প্রকৃত স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং পৃথক ও স্বতন্ত্র প্রকাশ আছে তারই প্রকৃত সংখ্যা আছে এবং তা পৃথক গণনার মধ্যে পড়বে। আর যা পৃথক গণনার মধ্যে পড়ে একাধিক বলে গণিত হবে, তা কখনোই আবার এক বলে গণিত হতে পারে না। এভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তাকে একই সময়ে এক এবং একাধিক বলে গণনা করলে তা সপ্তম বিষয়ে উল্লিখিত পরস্পরবিরোধী বিপরীত বিষয়ের একত্রকরণ বলে গণ্য হবে। আমরা দেখেছি যে, তা কখনোই সম্ভব নয়। তবে একটি বিষয় বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ভাবে গণিত হতে পারে। যেমন একটি বিষয় এক দিক থেকে অনেক ও অন্য হিসেবে এক হতে পারে।

দশম বিষয়

আমাদের সাথে ত্রিত্ববাদীদের মতবিরোধ হবে তখনই যখন তাঁরা দাবি করবেন যে, একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ উভয়ই প্রকৃত ও বাস্তব। তাঁরা যদি দাবি করেন যে, ত্রিত্ববাদই হলো প্রকৃত সত্য, আর একত্ববাদ হলো আপেক্ষিক তাহলে আর কোন বিরোধ থাকে না।[১] কিন্তু সমস্যা হলো, তাঁরা দাবি করেন যে, উভয় বিষয়ই প্রকৃত ও বাস্তব। প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের বই পুস্তকে তা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। 'মীযানুল হক' গ্রন্থের প্রণেতা পাদ্রী মি. ফান্ডার (Carl Gottaleb Pfander) তাঁর 'হাল্লুল ইশকাল' নামক

১. সেক্ষেত্রে তাঁরা প্রকৃত বহু-ঈশ্বরবাদী বলে প্রমাণিত হবেন এবং তাঁদের একত্ববাদের দাবি বিবেচনার কোন প্রয়োজন থাকবে না।

পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে লিখেছেন : "খ্রিস্টানগণ একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ উভয়কেই তার প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করেন।"[১]

একাদশ বিষয়

প্রসিদ্ধ মিসরীয় ঐতিহাসিক আল্লামা আহমদ ইবনু আলী মাকরিযী (৮৫৪হি/১৪৪১ খৃ.) তাঁর 'আল-খুতাত' নামক গ্রন্থে তাঁর যুগের বিদ্যমান খৃষ্ট ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবরণ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"খৃস্টানগণের মধ্যে অনেক দল-উপদল রয়েছে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম মালকানিয়া সম্প্রদায় (Melchites/Emperor's Men)[২], নেসটোরিয়ান (Nestorian)

১. এখানে উল্লেখ্য যে, 'অবতারবাদ' বা মানুষরূপে ঈশ্বরের (God incarnate) আগমন বিষয়ক ধর্মবিশ্বাস বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। হিন্দুধর্মেও এই বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু এই বিশ্বাসটির ব্যাখ্যা করতে যেয়ে খৃস্টানদের মত বিপদে কেউ পড়েনি। হিন্দুরা খুব সহজভাবে কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার (God incarnate) বলে বিশ্বাস করেন। এর ব্যাখ্যা চাইলে তারা অতি সহজে বলবেন যে, ঈশ্বর মানুষ রূপে এসেছিলেন.... ইত্যাদি। আবার খৃস্টানরা খৃস্টকে ঈশ্বরের অবতার (God incarnate) বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এর ব্যাখ্যা দিতে তাঁদের খুবই বেগ পেতে হয়। মূলত পুরাতন নিয়মের একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাসের সাথে এই অবতারবাদের সমন্বয় করতে যেয়েই এই বিপদ। এর পাশাপাশি নতুন নিয়মের কিছু কথাও তাঁদেরকে বিপদে ফেলেছে। ৪টি বিষয় তাঁদেরকে বিপদগ্রস্থ করেছে : (১) ঈশ্বরকে তিনটি পরিপূর্ণ স্বতন্ত্রময় সত্তায় বিভক্ত করা, (২) আবার এই তিনটি স্বতন্ত্র সত্তাকে এক বলে দাবি করা, (৩) এই তিনের একজন খৃস্টের মধ্যে আবার পৃথক দুইটি সত্তার অস্তিত্ব দাবি করা এবং (৪) এই ঈশ্বর মানব জাতির পাপের জন্য প্রাণ দিয়েছেন বলে দাবি করা। এই ৪টি বিষয়ের সমন্বিত ব্যাখ্যা তাঁদের জন্য এত কঠিন যে, প্রকৃতপক্ষে কেউ এর ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। ফলে একজনের ব্যাখ্যার সাথে অন্যজনের ব্যাখ্যা মিলে না। প্রাচীন যুগ থেকে অগণিত খৃষ্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতদের মতামত পাঠ করলেই পাঠক তা বুঝতে পারবেন। খৃস্টধর্মের অগণিত দল উপদলও মূলত এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই জন্মেছিল। কোন খৃস্টানই এই তিনটি বিষয়ের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। শেষমেষ অনেকেই এই বলে পার পেতে চান যে, বিষয়টি অযৌক্তিক ও অবাস্তব, তবে যেহেতু ধর্মগ্রন্থে রয়েছে তাই আমরা বিশ্বাস করি (an irrational truth found in revelation)।

২. ত্রিত্বের সাথে একত্বের সমন্বয় ও খৃস্টের ঈশ্বরত্বের সাথে মনুষ্যত্বের সমন্বয়ের দাবিটি একটি অযৌক্তিক ও বুদ্ধি বিরোধী বিষয়। ফলে খৃস্টানগণ কখনোই এ বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। খৃস্টানদের ধর্মীয় ইতিহাস ও অগণিত যাজকীয় সম্মেলনের (ecumenical council) বিবরণ পাঠ করলেই পাঠক তা জানতে পারবেন। ৪৫১ সালে বায়যান্টাইন সম্রাট মার্সিয়নের (Marcian) আহ্বানে ক্যালসিডনের যাজকীয় সম্মেলন (Council of Chalcedon)-এ প্রস্তাব পাশ করা হয় যে, খৃস্টের মধ্যে 'ঐশ্বরিক ও মানবিক' দুইটি প্রকৃতি বা স্বভাবের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান (two distinct natures in Christ)। পরবর্তী শতাব্দীতে সিরিয়া, মিসর ও প্রাচ্যের অধিকাংশ খৃস্টান সম্প্রদায় এই মতের বিরোধিতা করেন। তাঁরা খৃস্টের একক সত্তা ও ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। এদেরকে Monophysites বলা হয়। যে সকল খৃস্টান এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে খৃস্টের দ্বৈত সত্তা ও ব্যক্তিত্বের কথা মেনে নেন তাঁদেরকে এ সকল 'একসত্তাবাদী' খৃস্টান (Monophysites) "মালকানী" অর্থাৎ রাজার মানুষ বা রাজ-চামচা (Melchites/Emperor's Men) বলে অভিহিত করতেন। এদের মধ্যে অন্যতম গ্রীক অর্থোডক্স সম্প্রদায় ও গ্রীক ক্যাথলিক সম্প্রদায়। বিস্তারিত দেখুন Encyclopaedia Britannica, articles : Chalcedon, Council of Syrian Orthodox, Patriarchate of Antioch.

সম্প্রদায়[১], যাকোবাইট (Jacobite) সম্প্রদায়[২], বুয়আনীয় সম্প্রদায়, মার্কোলীয় সম্প্রদায়[৩] যারা রাহাবী বলেও পরিচিত এবং সিরিয়ার হাররান এলাকায় বসবাস করত।

"মালকানীয়, নেস্টোরীয় ও যাকোবাইট খৃস্টানগণ একমত যে, তাঁদের উপাস্য 'ঈশ্বর' তিনটি পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যময় পরিপূর্ণ সত্তা (three hypostases or three concrete realities)। এই তিনটি পৃথক, স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা আবার এক অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সত্তা। এর অর্থ হলো পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা তিনজনে মিলে এক

---

১. চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু নেস্টোরিয়াস (Nestorius) ৪৫১ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বায়যান্টাইন রাজধানী কন্সটান্টিনোপলের বিশপ ছিলেন। তিনি প্রচার করতেন যে, খৃস্টের মধ্যে বিদ্যমান ঐশ্বরিক ও মানবীয় সত্তা একত্রিত ও সংমিশ্রিত হয়ে এক সত্তায় পরিণত হয়নি বরং তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন দুইটি পৃথক সত্তা বিদ্যমান ছিল (independence of the divine and human natures of Christ.... they were two persons loosely united)। তাঁর মতের নিন্দা করার জন্যই ৪৩১ খৃস্টাব্দে ইফেসাসের যাজকীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী ক্যালসিডন সম্মেলনে (৪৫১ খৃ.) তাঁর মতবাদের তীব্র নিন্দা করা হয়। তাঁর অনুসারীদেরকে নেস্টরিয়া (Nestorian) সম্প্রদায় বলা হয়। বর্তমানে অধিকাংশ নেস্টরিয়া খৃস্টান সিরিয়া, ইরাক ও ইরানে বসবাস করেন। বিস্তারিত দেখুন : Encyclopaedia Britannica, articles : Nestorius; Nestorian.

২. ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সিরিয়ার অধিকাংশ খৃস্টান ৪৫১ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ক্যালসেডনীয় যাজকীয় মহাসম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে খৃস্টের 'দ্বৈত ব্যক্তিত্ব' মানতে অস্বীকার করে। এদেরকে যাকোবাইট খৃস্টান বলা হয়। এদেরকে সিরিয় অর্থডক্স সম্প্রদায়ও (Syrian Orthodox Patriarchate of Antioch/Syrian orthodox Church) বলা হয়। এরা Monophysites বা খৃস্টের একক সত্তা বা ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী। অর্থাৎ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, খৃস্টের মধ্যে দুইটি সত্তা নেই; বরং দুইটি থেকে একটি সত্তা আছে (Christ is not "in two natures" : human and divine, but is "one nature out of two natures")। বিস্তারিত দেখুন : Encyclopaedia Britannica, articles : Chalcedon, Council of Syrian Orthodox, Patriarchate of Antioch.

৩. সম্ভবত এখানে মনার্কীয় সম্প্রদায় (Monarchians) বুঝানো হয়েছে। Monarchianism বলতে "একশ্বরবাদী' খৃস্ট ধর্ম বুঝানো হয়। এই মতের অনুসারীরা ত্রিতত্ত্বে বা 'বাক্যে'র ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, 'পিতা'ই হলেন একমাত্র ও একক ঈশ্বর (the sole deity of God, the Father)। যীশু খৃস্ট ত্রাণকর্তা, তবে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অংশ নন। তিনি একান্তই সৃষ্ট মানুষ মাত্র। অলৌকিকভাবে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা ও অলৌকিকত্বের মর্যাদা বুঝানোর জন্যই তাঁকে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলা হয় (Christ was a mere man, miraculously conceived, but constituted the Son of God simply by the infinitely high degree in which he had been filled with divine wisdom and power)। প্রথম খৃস্টীয় শতাব্দী থেকে ৫ম খৃস্টীয় শতাব্দী পর্যন্ত এই মত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। প্রথম শতাব্দীর এবোনাইট সম্প্রদায় এই মতের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীকালে যে সকল প্রাচীন খৃস্টান ধর্মগুরু এই মতবাদ সমর্থন করেছেন ও এর পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দ্বিতীয় শতাব্দীর ধর্মগুরু থিওডোটাস (Theodotus), তৃতীয় শতাব্দীর ধর্মগুরু আরটেমন (Artemon), এন্টিয়কের প্রধান বিশপ সামোসাটার পৌল (Paul of Samosata) প্রমুখ। বিস্তারিত দেখুন : Encyclopaedia Britannica, articles : Monarchianism : Paul of Samosata.

ঈশ্বর।.... তাঁরা বলেন, পুত্র মানবীয় সত্তার সাথে মিশে তাঁর মানবীয় সৃষ্ট সত্তা ও ঐশ্বরিক সত্তা মিশ্রিত হয়ে একক সত্তাময় খৃস্টে পরিণত হন। আর এই খৃস্টই হলেন সকল সৃষ্টির ঈশ্বর ও প্রভু।

"এরপর খৃস্টের ঐশ্বরিক ও মানবীয় সত্তার মিশ্রণের বিষয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন, ঐশ্বরিক ও মানবীয় সত্তা একত্রে মিশ্রিত হয়ে একটি খৃস্টে পরিণত হয়। এই মিশ্রণ আবার উভয় সত্তার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করেনি। খৃস্টই হলেন ঈশ্বর এবং তিনিই মরিয়মের পুত্র, যাকে তিনি গর্ভধারণ করেছিলেন এবং প্রসব করেছিলেন এবং তিনিই ক্রুশে নিহত হন। অর্থাৎ খৃস্টের মানবীয় সত্তা ও ঐশ্বরিক সত্তা উভয়ই ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে নিহত হন।

"আর কেউ কেউ মনে করেন যে, খৃস্টের মধ্যে উভয় সত্তার মিশ্রণের পরেও তাঁর মধ্যে দুইটি সত্তাই ছিল: একটি ঐশ্বরিক ও অপরটি মানবিক। ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছিল শুধু খৃস্টের মানবীয় সত্তা, তাঁর ঐশ্বরিক সত্তা ক্রুশবিদ্ধ বা নিহত হয় নি। মরিয়ম খৃস্টের মানবীয় সত্তাকেই গর্ভধারণ করেন এবং প্রসব করেন। এ হলো নেস্টোরিয়ানদের মত। এরপর তাঁরা বলেন: খৃস্ট উপাস্য ও ঈশ্বর এবং তিনি ঈশ্বরের পুত্র, আমরা এইরূপ অমর্যাদাকর বিশ্বাস থেকে ঈশ্বরের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

"কেউ কেউ মনে করেন, খৃস্টের ঐশ্বরিক সত্তা একক ও অবিচ্ছেদ্য। এই সত্তাটি মানবীয় সত্তার সাথে মিশ্রিত হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন, এই মিশ্রণ ঘটেছিল 'অবতরণের' মাধ্যমে। পুত্র দেহের মধ্যে অবতরণ করেছিলেন এবং মিশ্রিত হয়েছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন, এই মিশ্রণ ছিল শুধু প্রকাশের ক্ষেত্রে। যেমন কাদা, মোম ইত্যাদির উপরে সিলমোহর বসালে বা অঙ্কন করলে তা প্রকাশিত হয়, বা যেমন ভাবে আয়নার মধ্যে মানুষের আকৃতি প্রকাশিত হয়।

"এভাবে তাঁদের মধ্যে অগণিত মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্বে আর কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ মতভেদ দেখা যায় না। এমনকি বলা যায় যে, এমন দুইজন খৃস্টানও পাওয়া কষ্টকর যারা এই বিষয়টির ব্যাখ্যায় পুরোপুরি একমত।

"মালকানীয় সম্প্রদায় বায়যান্টাইন সম্রাটের অনুসারী (গ্রীক ক্যাথলিক ও গ্রীক অর্থোডক্স)। তাঁরা বলেন, 'ঈশ্বর' তিনটি অর্থের নাম। তিনি 'একই তিন এবং তিনই এক'। যাকোবাইট খৃস্টানগণ বলেন যে, ঈশ্বর মূলে এক ও অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর কোন দেহও ছিল না এবং মানবীয় সত্তাও ছিল না। পরে তিনি দেহ গ্রহণ করেন এবং মানুষরূপে প্রকাশিত হন। মার্কোলীয় সম্প্রদায় বলেন : ঈশ্বর এক, তাঁর জ্ঞান তাঁর থেকে পৃথক এবং তাঁরই মত অনাদি। আর খৃস্টকে ঈশ্বরের করুণার প্রকাশ হিসাবে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলা হয়, যেমন অব্রাহামকে 'আল্লাহর প্রেমিক' বলা হয়.....।"

মাকরিযীর বক্তব্য এখানেই শেষ।

পাঠক এখানে লক্ষ্য করুন, পুত্রের ঐশ্বরিক সত্তা এবং খৃষ্টের দেহের মধ্যে সংমিশ্রণের ব্যাখ্যায় মত ও ব্যাখ্যার বাহার লক্ষ্য করুন। কত মত এবং মতভেদ। আর এজন্যই প্রাচীন ইসলামী পুস্তকাদিতে খৃষ্টানদের বিশ্বাস খণ্ডনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের কথা পাওয়া যায়। এখানে লক্ষণীয় যে, মার্কোলীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শুধু এই 'দ্ব্যর্থবোধক' 'পুত্র' শব্দটির ব্যবহার ছাড়া মুসলিম বিশ্বাসের সাথে তাদের ব্যাখ্যার সংঘাত নেই।

প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় যখন দেখতে পেলেন যে, এই সংমিশ্রণের ব্যাখ্যা দান মোটেও সম্ভব নয় এবং সকল ব্যাখ্যার মধ্যেই আপত্তি রয়েছে, তখন তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরীদের সকল মতামত বাদ দেন। তাঁরা নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করেন। তাঁরা এই খৃষ্টের মধ্যে ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের সংমিশ্রণ কিভাবে হলো এবং পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা—এই তিন ঈশ্বর কিভাবে এক ঈশ্বর হলেন সে বিষয়ে তাঁরা কিছুই বলতে চান না।

দ্বাদশ বিষয়

আদম থেমে মোশি পর্যন্ত কোন জাতিগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ত্রিত্ববাদীয় ধর্মবিশ্বাসের অস্তিত্ব ছিল না। ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ তাঁদের এই উদ্ভট ও আজগুবি বিশ্বাসটিকে প্রমাণ করার জন্য আদিপুস্তকের দুই একটি পংক্তির উদ্ধৃতি প্রদান করেন। এগুলি ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ প্রথমত, এগুলির যে ব্যাখ্যা ত্রিত্ববাদিগণ পেশ করেন, তা মূল অর্থের বিকৃতি মাত্র। তাঁরা যে অর্থ করেন তা হলো বক্তার বক্তব্য থেকে নয়, বরং তাঁর পেট থেকে অর্থ বের করার মত। দ্বিতীয়ত, খৃস্টানগণ যে পুরাতন নিয়মের দুই একটি আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন তা আমি অস্বীকার করছি না। তবে আমি দাবি করছি যে, বাইবেলের মধ্যে এমন একটি বাক্যও নেই যা থেকে বুঝা যায় যে, খৃস্টানগণের পূর্বে অন্য কোন জাতির মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল।

মোশির ব্যবস্থা ও ধর্মবিশ্বাসে এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে যে ত্রিতত্ত্ববাদের অস্তিত্ব নেই তা সকলেই জানেন। এজন্য কোন পৃথক প্রমাণ পেশের প্রয়োজন নাই। যে কেউ প্রচলিত তোরাহ পাঠ করলেই তা বুঝতে পারবেন।

যোহন বাপ্তাইজক তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত সন্দেহের মধ্যে ছিলেন যে, যীশুই প্রতিশ্রুতি মসীহ (খৃস্ট) কিনা। মথিলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ে তা স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোহন তাঁর শিষ্যদেরকে যীশুর নিকট প্রেরণ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "যাঁহার আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকিব?"[১]

যদি যীশুই ঈশ্বর হন, তবে বুঝতে হবে যে, যোহন অবিশ্বাসী ও ধর্মদ্রোহী ছিলেন। কারণ ঈশ্বরের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা অবিশ্বাস বা কুফরী। এ কথা কিভাবে চিন্তা

১. মথি ১১/২-৩।

করা যায় যে, যোহন একজন ভাববাদী হয়ে নিজের ঈশ্বরকে চিনতে পারলেন না? তিনি শুধু একজন ভাববাদীই নন, উপরন্তু তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী বলে স্বয়ং যীশু সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। মথির এই অধ্যায়েই (১১ আয়াতে) তা উল্লেখ করা হয়েছে।

ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী খৃস্টের সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে চিনতে পারলেন না, কাজেই পূর্ববর্তী ভাববাদিগণ তাঁকে না চেনাই তো স্বাভাবিক। মোশির যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কোন ইহূদী ধর্মগুরু তাঁকে স্বীকার করেন না। একথা তো সুস্পষ্ট যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁর পূর্ণতার গুণাবলি তাঁরই মত অনাদি, চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। যদি সত্যিই ঈশ্বর 'তিন জনে একজন হন' তবে বুঝতে হবে যে, অনাদিকাল থেকেই তিনি এইরূপ। মোশি ও অন্যান্য ভাববাদীর জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের দায়িত্ব ছিল যে, তাঁরা ঈশ্বরের মর্যাদা ও পূর্ণতা জ্ঞাপক এই অসাধারণ গুণটির কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ইস্রায়েল সন্তানদেরকে জানাবেন।

বড় অবাক লাগে যে, খৃস্টানদের মতে ঈশ্বরের সত্তা ও গুণাবলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ, যে গুণটি বিশ্বাস করার উপর নির্ভর করছে মুক্তি ও পূর্ণতা, সেই গুণটির কথা মোশির ব্যবস্থায় মোটেও উল্লেখ করা হলো না, অথচ এই ব্যবস্থাটি ছিল যীশু পর্যন্ত সকল ভাববাদীর জন্য অবশ্য পালনীয় ব্যবস্থা।

ঈশ্বরের যে গুণটি বিশ্বাস না করলে ভাববাদী ও অ-ভাববাদী কোন মানুষেরই মুক্তি নেই, সেই গুণটির কথা মোশি বা অন্য কোন ভাববাদী স্পষ্টভাবে সকলের জন্য বোধগম্য করে ব্যাখ্যা করলেন না। তাঁরা কেউই বিষয়টির আলোচনা করে এ বিষয়ক সকল সন্দেহ নিরসন করলেন না।

খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ পৌলের মতে যে বিষয়গুলো একেবারেই গুরুত্বহীন, দূর্বল ও অপূর্ণ, সেই বিষয়গুলি মোশি কত বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন, একবার বলে আবার বললেন, বারংবার বিভিন্ন ভাবে বুঝালেন, সেগুলি মেনে চলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব দিলেন, সেগুলি অমান্যকারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের বিধান দিলেন........ অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুক্তির উৎসটির বিষয়ে কিছুই বললেন না।

এর চেয়েও অবাক বিষয় হলো, স্বয়ং যীশু তাঁর উর্ধ্বারোহণ পর্যন্ত কখনোই এই 'বিশ্বাস'টিকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বললেন না। তিনি কখনোই বললেন না যে, "ঈশ্বর তিনটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও সত্তা (three hypostases or three concrete realities): পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। তন্মধ্যে পুত্র সত্তা আমার দেহের সাথে অমুকভাবে সম্পর্কিত ও সম্মিলিত হয়েছে অথবা পুত্র সত্তাটি আমার দেহের সাথে এমন ভাবে সম্পর্কিত ও সম্মিলিত হয়েছে যার নিগুঢ় তত্ত্ব তোমাদের জ্ঞানের ধারণ ক্ষমতার বাইরে। কাজেই তোমরা জেনে রাখ যে, উক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে আমিই ঈশ্বর।" অথবা এই

অর্থে এমন কোন কথা বললেন না যাতে অন্তত এই বিশ্বাসটি স্পষ্টরূপে জানা যেত। ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ ত্রিত্বের পক্ষে তাঁর কোন স্পষ্ট বাক্য পেশ করতে পারেন না। শুধু কয়েকটি দ্ব্যর্থবোধক অস্পষ্ট বাক্যই তাঁদের সম্বল।

'মীযানুল হক' গ্রন্থের প্রণেতা তাঁর 'মিফতাহুল আসরার' (রহস্যের চাবি) নামক পুস্তকে বলেন: "আপনি যদি বলেন যে, তাহলে কেন যীশু তাঁর ঈশ্বত্বের কথা আরো পরিষ্কার ভাবে বললেন না? তিনি কেন স্পষ্টভাবে ও এককথায় বললেন না যে, 'আমিই ঈশ্বর'?"

এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি প্রথমে কিছু কথা বলেন, যেগুলি অগ্রহণযোগ্য ও এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি বলেন: "কারণ, তাঁর পুনরুত্থান ও উর্ধ্বারোহণের পূর্বে কেউ এই সম্পর্ক এবং একত্ববাদ বুঝতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি যদি এই কথা বলতেন তবে তাঁরা বুঝতেন যে, তিনি তাঁর মানবীয় দেহ অনুসারে ঈশ্বর। আর এই কথাটি নিশ্চয়ই বাতিল। এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করাও সে সকল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যেগুলির বিষয়ে তিনি বলেন : "তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা (the Spirit of truth : আল-আমীন, আস-সাদিক) যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।"[১]

এরপর তিনি বলেন : "ইহূদী ধর্মের নেতৃবৃন্দ অনেকবারই তাঁকে গ্রেফতার করতে ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে চেয়েছেন, অথচ তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বের কথা তাঁদের সামনে একান্তই ধাঁধার আকারে পেশ করেছিলেন।"

পাদরী সাহেবের বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, দুইটি কারণে যীশু তাঁর ঈশ্বরত্বের কথা স্পষ্ট করে জানান নি:

প্রথমত, তাঁর উর্ধ্বারোহণের পূর্বে কেউ তা বুঝতে সক্ষম ছিল না।

দ্বিতীয়ত, ইহূদীদের ভয়।

দুইটি ওজরই অত্যন্ত দুর্বল ও একান্তই অবাস্তব ব্যাখ্যা।

প্রথম বিষয়টি একেবারেই বাতিল। কারণ এক্ষেত্রে তাঁর এতটুকু কথাই যথেষ্ট ছিল যে, "আমার দেহের সাথে ঈশ্বরের পুত্রের সত্তার সম্মিলন ও সংমিশ্রণের বিষয়টি বুঝা তোমাদের সাধ্যের বাইরে। কাজেই তোমরা এ বিষয়ে গবেষণা বাদ দেও।

১. যোহন ১৬/১২-১৩। এখানে সুস্পষ্টতই মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এই গুণাবলির সবগুলিই তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং কোনভাবেই 'পবিত্র আত্মার' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।.....

তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমি এই মানবীয় দেহের হিসাবে ঈশ্বর নই; বরং উপর্যুক্ত সম্মিলনের ও সংমিশ্রণের ভিত্তিতে আমি ঈশ্বর।"[১]

এছাড়া তাঁর সাথে ঈশ্বরত্বের সম্পর্ক বুঝার অক্ষমতা তাঁর উর্ধ্বারোহণের পরে দূরীভূত হয়েছে বলে যে দাবি পাদরী করেছেন তা একেবারেই ভিত্তিহীন। এ বিষয়টি বুঝার অক্ষমতা এর পরেও একইভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি আজ পর্যন্ত একজন খৃস্টান পণ্ডিতও এই সম্পর্ক ও একত্ববাদের সাথে এর সম্পর্ক সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি। যে যা বলেছেন সবই আন্দাযে ঢিল ছুড়েছেন। প্রত্যেকের কথার মধ্যেই কঠিন সমস্যা ও বিভ্রান্তি রয়েছে। সর্বদা তাঁরা একে অপরকে বিভ্রান্ত বলে অভিযোগ করেছেন। আর এজন্যই প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ এই সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন। এই পাদরীও তাঁর পুস্তকাদিতে বিভিন্ন স্থানে স্বীকার করেছেন যে, এই বিষয়টি একটি গূঢ় রহস্য যা জ্ঞান দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় ওযরটিও একইভাবে বাতিল। কারণ খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে খৃস্টের আগমনের তো একটিই উদ্দেশ্য, তা হলো ক্রুশে চড়ে প্রাণ দিয়ে সৃষ্টির পাপ মোচন। ইহূদীদের হাতে ক্রুশবিদ্ধ হতেই তো তিনি এসেছিলেন। তিনি নিশ্চিতরূপে জানতেন যে, ইহূদীরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করবে। কখন তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করবে তাও তিনি জানতেন। কাজেই তিনি সঠিক বিশ্বাসটি ব্যাখ্যা করতে ভয় পাবেন কেন?

বড় অবাক কাণ্ড! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টদের থেকে ভয় পাচ্ছেন! তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে লাঞ্ছিত ও দুর্বল জাতিকে তিনি এত ভয় পাচ্ছেন যে, ভয়ের চোটে সেই কথাটিও বলতে পারছেন না, যে কথাটি বিশ্বাস করার উপরে মুক্তি ও পূর্ণতা নির্ভর করছে। অথচ সেই ঈশ্বরেরই সৃষ্ট ভাববাদিগণ, যেমন যিরমিয়, যিশাইয়, যোহন, এরা তাঁদের সামনে সত্য বলতে ভয় পাচ্ছেন না। তাঁদেরকে কঠিন ভাবে যন্ত্রণা ও শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। কাউকে আবার হত্যাও করা হচ্ছে! কিন্তু তাঁরা সত্য প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছেন না।

এর চেয়েও অবাক বিষয় হলো, খৃস্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই বিশ্বাসটি সঠিকভাবে বলার ক্ষেত্রে ইহূদীদেরকে ভয় পাচ্ছেন। অথচ সৎকার্যে আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ

---

১. এই কথাগুলি তিনি নিজে মুখে বললে তাঁর ঈশ্বরত্বের বিষয়টি বুঝা কতই না সহজ হতো! হাজার বছর ধরে তাঁর অনুসারীদের আর ঝগড়া ও দলাদলি করতে হতো না!! তিনি কত কথা বললেন, কত অপ্রয়োজনীয় (!) কথা বললেন, যেগুলি সব তাঁর শিষ্যরা 'রহিত' করে দিলেন! ধার্মিকতার বিষয়ে কত কথা বললেন, যেগুলি মূলত পাপমোচন ও মুক্তির জন্য অপ্রয়োজনীয়। কত কথা তিনি বললেন, যা শিষ্যগণ না বুঝলে আবার বুঝিয়ে দিলেন।.... অথচ যে বিষয়টির উপর পাপমোচন ও মুক্তি নির্ভর করছে, সেই বিষয়টি তিনি একেবারেই বুঝালেন না।.... তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করলেন বিশ্বের পাপ মোচনের জন্য, অথচ যে বিশ্বাস দিয়ে পাপ মোচন হবে সেই বিশ্বাসের কথাটি বুঝালেন না.....

করার বিষয়ে তাঁদেরকে কঠোরতার সাথে সত্য কথা বললেন। এমনকি সে বিষয়ে তাদেরকে গালাগালি করলেন। তিনি ইহূদী অধ্যাপক ও ফরীশীগণকে মুখোমুখি সম্বোধন করে নিম্নের শব্দাবলি ব্যবহার করেনঃ 'হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটরা, ধিক্ তোমাদিগকে।[১], হা অন্ধ পথ-প্রদর্শকেরা, ধিক্ তোমাদিগকে।[২], 'মূঢ়েরা ও অন্ধেরা'[৩], 'অন্ধ ফরীশী'[৪] 'সর্পেরা, কালসর্পের বংশেরা, তোমরা কেমন করিয়া বিচারে নরকদণ্ড এড়াইবে?'[৫] সকল মানুষের সামনে তিনি তাঁদের অন্যায় ও অনাচারগুলি প্রকাশ করে দেন। এমনকি তাদের একজন তাঁকে অভিযোগ করে বলেন যে, "হে গুরু, এ কথা বলিয়া আপনি আমাদেরও অপমান করিতেছেন।"[৬] মথিলিখিত সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ে এবং লূকলিখিত সুসমাচারের ১১ অধ্যায়ে এ সকল বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।[৭] এছাড়াও সুসমাচারগুলির আরো অনেক স্থানে এইরূপ শব্দাদি উল্লেখ করা হয়েছে।

এর পরেও কিভাবে মনে করা যায় যে, খৃষ্ট ইহূদীদের ভয়ে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এই বিশ্বাসটি স্পষ্ট করে বলেন নি? কখনোই তা তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে না, কখনোই না।

উপর্যুক্ত পাদরী মহাশয়ের কথা থেকে জানা গেল যে, খৃষ্ট এই বিষয়টি ইহূদীদের নিকট শুধু 'ধাঁধা' বা অস্পষ্ট আকারেই বর্ণনা করেছেন। আর ইহূদীরা এই অবতারবাদ বা মানুষের জন্য ঈশ্বরত্বের দাবি করা এত ঘৃণা করত যে, এই ধাঁধা বা অস্পষ্ট কথার জন্যই তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার চেষ্টা করেছে একাধিকবার।

১. মথিঃ ২৩/১৩, ১৪, ১৫, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯।
২. মথিঃ ২৩/১৬।
৩. মথিঃ ২৩/১৭, ১৯।
৪. মথিঃ ২৩/২৬।
৫. মথি : ২৩/৩৩।
৬. লূক ১১/৪৫।
৭. মথি ২৩/১৩-৩৭; লূক ১১/৩৭-৫২।

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণাদির মাধ্যমে ত্রিত্ববাদ খণ্ডন

প্রথম প্রমাণ

ভূমিকার দশম বিষয় থেকে আমরা জেনেছি যে, খৃস্টানগণের নিকট একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ উভয়ই প্রকৃত ও বাস্তব সত্য, কোনটিই আপেক্ষিক নয়। কাজেই যেখানেই প্রকৃত ও বাস্তব 'তিন' রয়েছে সেখানেই প্রকৃত 'সংখ্যাধিক্য' বা 'একাধিক্য' রয়েছে। ভূমিকার নবম বিষয় থেকে আমরা তা জানতে পেরেছি। আর এই দুইটি বিষয় : প্রকৃত 'তিনত্ব' এবং প্রকৃত সংখ্যাধিক্য প্রমাণিত হলে আর প্রকৃত 'একত্ব' থাকতে পারে না। কারণ একই বিষয়ে প্রকৃত 'তিন' ও প্রকৃত 'একাধিক্য'-এর সাথে প্রকৃত 'এক' একত্রিত হওয়ার দাবি করলে 'দুইটি প্রকৃত বিপরীত বিষয়' একত্রিত হওয়ার দাবি করা হবে। আমরা ভূমিকার সপ্তম বিষয়ে দেখেছি যে, তা সম্ভব নয়।

তাহলে প্রকৃত 'তিন' ও প্রকৃত 'একাধিক্য' দ্বারা নিঃসন্দেহে বহু ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় এবং একত্ববাদ বা একেশ্বরবাদ বিনষ্ট হয়ে যায়। কাজেই যিনি ত্রিত্বে বিশ্বাস করেন, তিনি কখনোই প্রকৃত একেশ্বরবাদী বলে গণ্য হতে পারেন না। যিনি ঈশ্বরকে প্রকৃতই 'তিন' বলে বিশ্বাস করেন, তিনি কখনোই ঈশ্বরকে প্রকৃতই 'এক' বলে বিশ্বাস করতে পারেন না।

তাঁরা বলে থাকেন : "একথা ঠিক যে, প্রকৃত ত্রিত্ব ও প্রকৃত একত্ব দুইটি পরস্পর-বিরোধী বিষয় এবং তা একত্রিত হতে পারে না। কিন্তু তা সৃষ্টি জগতের ক্ষেত্রে। স্রষ্টা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তা পরস্পরবিরোধী বিষয় নয়।"

তাঁদের এই কথাটি একটি ফালতু ও অর্থহীন প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়। কারণ দুইটি বিষয় যখন প্রকৃত বিরোধী বলে প্রমাণিত হয় তখন একই ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে একই সময়ে একই দিক থেকে তা একত্রিত হতে পারে না। একথা সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন সত্য, স্রষ্টার ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। লক্ষ্য করুন :

(১) যা প্রকৃত 'এক' তার পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ এক-তৃতীয়াংশ থাকতে পারে না। কিন্তু 'তিন'-এর একটি পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে, তা হলো 'এক'।

(২) তিন হলো 'তিনটি এক'-এর সমষ্টি। 'প্রকৃত এক' কখনো একাধিক 'এক'-এর সমষ্টি হতে পারে না।

(৩) প্রকৃত 'এক' তিন-এর একটি অংশ। যদি একই বস্তু একই সময়ে 'তিন' ও 'এক' হয় তবে বুঝতে হবে যে, বস্তুটি একই সময়ে নিজেই পূর্ণ এবং নিজেই নিজের অংশ...।

(৪) এতে প্রমাণিত হবে যে, ঈশ্বর অগণিত অংশের সমষ্টি। কারণ প্রত্যেক 'অংশ' নিজেই পূর্ণ, আবার নিজেই অংশ হয়ে অন্য অংশের সাথে সংযোজিত। এভাবে অন্তহীন অংশের সমন্বয়ে 'ঈশ্বরের সত্তা' গঠিত হবে...।

(৫) একত্ব ও ত্রিত্বের একত্রিত হওয়ার অর্থ হলো 'এক' নিজেই নিজের এক-তৃতীয়াংশ এবং তিন 'এক'-এর এক-তৃতীয়াংশ। আবার তিন নিজেই নিজের তিনগুণ এবং এক নিজেই তিনগুণ।

দ্বিতীয় প্রমাণ

তাঁরা দাবি করেন যে, ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে তিনটি পৃথক পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা বিদ্যমান। যদি এই দাবি সঠিক হয় তাহলে যেমন একাধিক অনাদি সত্তার বিদ্যমানতা প্রমাণিত হবে, তেমনি এতে প্রমাণিত হবে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং ঈশ্বর আপেক্ষিক সমন্বয়ের নাম। কারণ একটি বস্তু যখন একাধিক স্বতন্ত্র সত্তার সংমিশ্রণে অস্তিত্ব লাভ করে, তখন তা তার অস্তিত্বের জন্য প্রতিটি অংশের মুখাপেক্ষী থাকে। একজন মানুষের পাশে একটি পাথর রেখে উভয়ের একত্রিত রূপকে 'একত্ব' বা 'এক' বলা যায় না। আর পরমুখাপেক্ষিতা সৃষ্টজীবের বৈশিষ্ট্য। অনাদি অনন্ত চিরন্তন সত্তা ঈশ্বর কখনো কারো মুখাপেক্ষী হতে পারেন না।

খৃস্টীয় বিশ্বাস অনুসারে 'ঈশ্বর'-এর তিনটি অংশের প্রতিটি অংশই অন্য অংশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তা, যদিও তাঁরা সকলেই একটি 'সমষ্টির' অংশ। আর যদি প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র সত্তা হন এবং কেউ কারো মুখাপেক্ষী না হন তবে এইরূপ স্বতন্ত্র তিনের সমন্বয়ে কখনো প্রকৃত 'এক' গঠিত হতে পারে না।

সর্বাবস্থায়, এই বিশ্বাস অনুসারে 'ঈশ্বর' কোন 'একক' সত্তা নন, বরং কয়েকটি স্বতন্ত্র সত্তার 'সংযুক্ত' ও 'সমন্বিত' রূপ। আর এক্ষেত্রে এই 'সমন্বিত' সত্তা তার অস্তিত্বের জন্য তাঁর অংশগুলির মুখাপেক্ষী থাকবেন। আর একথা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন বস্তুর 'অংশ' সেই বস্তুর পূর্ণরূপ হতে পারে না। এক্ষেত্রে 'পূর্ণরূপ'টি তার অংশগুলির মুখাপেক্ষী। আর এইরূপ মুখাপেক্ষী বস্তু কখনোই অনাদি অনন্ত ও চিরন্তন সত্তারূপে গণ্য হতে পারে না।

তৃতীয় প্রমাণ

খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের তিনটি অংশ : প্রত্যেকে অন্য অংশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, তিনটি অংশের পরিপূর্ণ পৃথকত্ব ঈশ্বরের সত্তার একটি গুণ। এই গুণটি হয় পূর্ণতার গুণ বলে গণ্য হবে, অথবা অপূর্ণতা বলে গণ্য হবে। যদি তা পূর্ণতা ও মহত্ত্ব প্রকাশক গুণ বলে গণ্য হয়, তবে তাতে খৃস্টীয়

বিশ্বাস ভুল বলে প্রমাণিত হবে। খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, যাবতীয় পূর্ণতাজ্ঞাপক ঐশ্বরিক গুণ প্রত্যেক সত্তার মধ্যে পৃথকভাবে বিদ্যমান। কিন্তু এখানে প্রমাণিত হলো যে, 'পৃথকত্বের' এই গুণটি প্রত্যেক সত্তার মধ্যে পৃথকভাবে বিদ্যমান নয়। কারণ 'পৃথক' হতে হলে অন্য কিছুর প্রয়োজন; যা থেকে পৃথক হতে হবে।

আবার যদি এই পৃথকত্বের গুণটিকে অপূর্ণতাজ্ঞাপক গুণ বলে গণ্য করা হয় তবে এতে প্রমাণিত হবে যে, ঈশ্বরের মধ্যে কিছু অপূর্ণতাজ্ঞাপক গুণ রয়েছে যা কখনোই সম্ভব নয়।

চতুর্থ প্রমাণ

খৃস্টের মধ্যে ঐশ্বরিক সত্তা ও মানবীয় সত্তা মিশ্রিত হয়ে যদি প্রকৃতই 'অভিন্ন এক'-এ পরিণত হয়ে থাকে তবে প্রমাণিত হবে যে, 'পুত্র' নামক অংশটি অনন্ত ও অসীম নয়, বরং সীমাবদ্ধ ও অন্তময়। আর যার সীমা ও অন্ত রয়েছে, তার মধ্যে বৃদ্ধি বা বিয়োজনের সম্ভাবনা রয়েছে। আর এক্ষেত্রে তাকে সুনির্ধারিত পরিমাপ দিয়ে পরিমাণ করা সম্ভব। আর এইরূপ পরিমাণ যোগ্য হওয়া বা সীমাবদ্ধ হওয়া সৃষ্ট জীবের বৈশিষ্ট্য। এতে প্রমাণিত হবে যে, পুত্র সৃষ্ট এবং ঈশ্বরও সৃষ্ট।

পঞ্চম প্রমাণ

ঈশ্বরের তিনটি অংশের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য যদি প্রকৃত হয় তবে স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশক কে হবে? ঈশ্বরের অনাদি সত্তা এই তিন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান। কাজেই এই মূল সত্তা দ্বারা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ হবে না। অতিরিক্ত কোন বিষয় এই স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করবে। এক্ষেত্রে বুঝা যাবে যে, ঈশ্বর তাঁর প্রকাশের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী।

ষষ্ঠ প্রমাণ

ঈশ্বরের 'পুত্র' অংশের 'মানবীয়' রূপ পরিগ্রহণের বিষয়ে খৃস্টানদের শতধাবিভক্ত মত রয়েছে। আমরা দেখেছি যে, যাকোবাইট খৃস্টানগণের মতে "ঈশ্বর মূলে এক ও অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর কোন দেহও ছিল না এবং মানবীয় সত্তাও ছিল না। পরে তিনি দেহ গ্রহণ করেন এবং মানুষ রূপে প্রকাশিত হন।" এই মতটি নিঃসন্দেহে বাতিল। কারণ এতে প্রমাণিত হবে যে, ঈশ্বরের চিরন্তন সত্তা পরিবর্তনশীল ও রূপান্তরযোগ্য।

অন্যান্য সম্প্রদায় এইরূপ পরিবর্তনের কথা বলেন না, শুধু ঐশ্বরিক ও মানবিক সত্তার 'সংমিশ্রণের' (Personal unity) কথা বলেন। আমাদের কথা হলো, এই সংমিশ্রণ (union of the divine nature of the second Person of the Trinity with the human nature of Jesus, the son of Mary) কিভাবে ঘটল? অবতরণের মাধ্যমে না অন্য কোন পদ্ধতিতে? যদি 'অবতরণের' বা 'দেহ-পরিগ্রহণ' (incarnation)-এর

মাধ্যমে এই সংমিশ্রণ ঘটার দাবি করা হয়, তবে আমরা এই দাবির অসারতা প্রমাণ করার জন্য ত্রিত্বের সংখ্যা অনুসারে তিনটি কারণ উল্লেখ করব।[১]

প্রথমত : "অবতরণ" বা "মাংস-হওয়া" অর্থ কী? অবতরণ বা 'মাংস পরিগ্রহণ' বলতে কি বুঝানো হচ্ছে?

মানবীয় সত্তার মধ্যে পুত্রের ঐশ্বরিক সত্তা কিভাবে সম্মিলিত (union of the divine nature with the human nature) হলো? গোলাপের পানি যেমন গোলাপের মধ্যে, তেল যেমন সরিষার মধ্যে, আগুন যেমন কয়লার মধ্যে থাকে সেভাবে? খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে এভাবে মিশ্রণ অসম্ভব। কারণ যদি 'পুত্র' দেহবিশিষ্ট সত্তা হতেন তবে এইরূপ মিশ্রণ কল্পনা করা যেত। কিন্তু খৃস্টানদের মতে 'পুত্র' নিরাকার ও দেহহীন।

তাহলে এই মিশ্রণ কি দেহের মধ্যে রঙের মিশ্রণের মত ছিল? এইরূপও হওয়া সম্ভব নয়। কারণ এইরূপ মিশ্রণের ক্ষেত্রে প্রথমত দেহের জন্য একটি স্থানের প্রয়োজন। এরপর রঙ দেহের মধ্যে মিশ্রিত হবে। এইরূপ মিশ্রণ দেহবিশিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে কল্পনা করা যায়, নিরাকারের জন্য তা কল্পনা করা যায় না।

তাহলে কি এই মিশ্রণ দ্বারা পুত্র একটি অতিরিক্ত গুণ অর্জন করলেন? এই ধারণাও তো চিরন্তন ও অনাদি সত্তার ক্ষেত্রে অসম্ভব। কারণ এতে প্রমাণিত হবে যে, ঈশ্বর তাঁর প্রকাশের জন্য অতিরিক্ত কিছুর মুখাপেক্ষী। এভাবে আমরা দেখছি যে, ঈশ্বরের পুত্র

---

১. খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, তাঁদের ধর্ম পুরাতন নিয়মের ধর্মের শিক্ষা থেকে গৃহীত। কিন্তু এই দাবিটি একটি অন্তঃসারশূণ্য মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। পুরাতন নিয়মের "মসীহ", "বাক্য" ইত্যাদি কয়েকটি শব্দের বিকৃত অর্থ ছাড়া পুরাতন নিয়মের কোন ধর্ম বিশ্বাস বা ধর্মীয় আচারই প্রচলিত খৃস্টধর্মে নেই। খৃস্টধর্মের ভিত্তি হলো গ্রীক দর্শন ভিত্তিক রোমান প্যাগান ধর্ম। ইসলাম ধর্ম ভারতে আগমনের পরে সম্রাট আকবর হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তিতে 'ইসলাম' ধর্মকে 'সাইজ' করে নতুন ধর্ম তৈরির চেষ্টা করেন। তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টায় পৌল ও তাঁর সহকর্মিগণ সফল হয়েছিলেন। গ্রীক লগস (logos) শব্দটির অর্থ 'জ্ঞান', 'বিবেক', 'পরিকল্পনা', 'বাক্য' ইত্যাদি (word, reason, plan)। গ্রীক দর্শনে ও রোমান পৌত্তলিক ধর্মে এই 'লগস' শব্দটিকে ঈশ্বরের বিশেষ গুণ এবং সৃষ্টির উৎস মনে করা হতো। এছাড়া মানুষের মধ্যে 'বিবেক' বা 'জ্ঞান'-কেও ঐশ্বরিক শক্তি বলে বিশ্বাস করা হতো। এর পৌত্তলিক ব্যবহারও ছিল। শব্দটির প্রতি এই পৌত্তলিক ভক্তি ও গ্রীক দর্শনের ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করে 'খৃস্টকে' মূর্তিমান লগস বলে প্রচার করা হয়। বলা হয় 'বাক্য মাংস হলেন'। বিস্তারিত দেখুন : Encyclopaedia Britannica, articles : Logos; Incarnation. বাক্যের দেহগ্রহণ যদি জিন, ভূত বা ফিরিশতার দেহ গ্রহণের মত কিছু বলে তাঁরা দাবি করতেন, তবে তাঁদের সমস্যা কম হতো। তাঁরা দাবি করেন যে, যীশুর মানবীয় সত্তার সাথে বাক্যের ঈশ্বরীয় সত্তা মিশ্রিত হয়। এই মিশ্রণের ব্যাখ্যা তাঁরা কোন দিনই দিতে পারেন নি। তবে সাধারণ দাবি হলো, অবতরণ (incarnation)-এর মাধ্যমে এই দেহগ্রহণ হয়। এখানে তিন পর্যায়ে গ্রন্থকার এই বিশ্বাসের অসারতা তুলে ধরেছেন।

অংশের যীশুর মানবদেহের সাথে সংমিশ্রণের কোনরূপ যৌক্তিক বা বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত : অবতরণের প্রেক্ষাপট বা কারণ কী ছিল? অবতরণের অর্থ যাই হোক না কেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা বলব যে, ঈশ্বরের পুত্র অংশ যদি কোন দেহের মধ্যে অবতরণ করেন তবে দেখতে হবে তিনি কেন অবতরণ করলেন : তাঁর জন্য কি অবতরণ করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল? অবতরণ করতে কি তিনি বাধ্য ছিলেন? না তা তাঁর জন্য ঐচ্ছিক ছিল?

প্রথম ক্ষেত্রে বিষয়টি তাঁর সত্তার মৌলিক চাহিদা বলে অথবা অতিরিক্ত বিষয় বলে গণ্য হবে। যদি অবতরণকে পুত্র অংশের অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক চাহিদা বলে গণ্য করা হয়, তবে বুঝতে হবে যে, এই অবতরণ ছাড়া ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব পূর্ণতা পায় নি। আর এইরূপ সত্তাকে চিরন্তন ঐশ্বরিক সত্তা হিসাবে কল্পনা করা যায় না। এছাড়া তিনি যেখানে অবতরণ করবেন তা যদি অনাদি ও চিরন্তন না হয় তবে বুঝতে হবে চিরন্তন সত্তা সৃষ্ট বস্তুর মুখাপেক্ষী, যা ঈশ্বরের সত্তার জন্য অসম্ভব। আর যদি তা অনাদি ও চিরন্তন হয় তবে প্রমাণ হবে যে, ঈশ্বর ছাড়াও একাধিক চিরন্তন সত্তা বিদ্যমান। এই বিষয়টিও অকল্পনীয়।

আর যদি মনে করা হয় যে, বিষয়টি জরুরী ছিল, তবে তাঁর সত্তার মৌলিক চাহিদা ছিল না, বরং অতিরিক্ত সংযোজন ছিল, তবে প্রমাণিত হবে যে, এই অবতরণের মাধ্যমে ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে নতুনত্ব প্রবেশ করেছে। আর যে সত্তার মধ্যে নতুনত্ব প্রবেশ করতে পারে তা অনাদি ও চিরন্তন ঐশ্বরিক সত্তা হতে পারে না।

তৃতীয়ত : অবতরণের পরিণতি কি হল? যদি মনে করা হয় যে, ঈশ্বরের পুত্র অংশ বা পুত্র সত্তা যীশুর দেহের মধ্যে অবতরণ করেন, তবে প্রশ্ন হলো, এই অবতরণের পরিণতি 'পুত্রের' ক্ষেত্রে কী হলো? অবতরণের মাধ্যমে কি পুত্র ঈশ্বরের সাথে তাঁর অবস্থান পরিত্যাগ করে 'যীশু'-র দেহের সাথে মিশে গেলেন? নাকি তিনি যীশুর দেহের সাথে মিশে যাওয়ার পরেও ঈশ্বরের দেহের সাথেও মিশে থাকলেন?

যদি তাঁরা বলেন যে, ঈশ্বরের 'পুত্র' অংশ ঈশ্বরের 'সত্তা'-র মধ্যেও থাকলেন, আবার অবতরণ করে 'যীশু'-র দেহের সাথেও মিশে গেলেন, তবে তা বাতিল মত বলে গণ্য হবে। কারণ একই সত্তা কিভাবে দুই স্থানে 'অবতরণ' করবেন? আর যদি তাঁরা বলেন যে, তিনি ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে তাঁর স্থান পরিত্যাগ করে যীশুর দেহ গ্রহণ করেন বা দেহের সাথে মিশ্রিত হয়ে যান, তবে এতে প্রমাণিত হবে যে, ঈশ্বরের 'সত্তা' তাঁর একটি অংশ হারিয়ে ফেলেন। ঈশ্বরের একটি অংশ ঈশ্বর থেকে বের হয়ে চলে যায়, ফলে 'ঈশ্বর'ই তাঁর ঈশ্বরত্ব হারিয়ে ফেলেন।

যদি খৃষ্টানগণ দাবি করেন যে, ঈশ্বরের পুত্র অংশ যীশুর দেহের সাথে সম্মিলিত

হয়েছিলেন 'অবতরণ' বা দেহ-গ্রহণ পদ্ধতিতে নয়, বরং অন্য ভাবে, তবে আমাদের প্রশ্ন হলো, এই সম্মিলন (union)-এর ফল কি হলো? উভয় সত্তা পৃথকভাবে বিদ্যমান থাকলেন? না উভয়ে বিলীন হয়ে তৃতীয় সত্তার রূপ পরিগ্রহণ করলেন? না উভয়ের একটি আরেকটির মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেন?

যদি 'সম্মিলন' (union)-এর পরে যীশুর মানবীয় সত্তা ও পুত্রের ঐশ্বরিক সত্তা উভয়ে পৃথকভাবে বিদ্যমান থাকলেন বলে দাবি করা হয়, তবে এতে 'সম্মিলন'-ই হয়নি বলে প্রমাণিত হলো।

আর যদি উভয়ের সত্তা বিলীন হয়ে 'তৃতীয় নতুন সত্তা'য় পরিণত হয় তবে সেক্ষেত্রেও 'সম্মিলন' হয়নি বলেই প্রমাণিত হবে; কারণ এক্ষেত্রে উভয় সত্তা বিলীন হয়ে তৃতীয় সত্তার জন্ম দিয়েছে।

আর যদি দাবি করা হয় যে, উভয় সত্তার একটি অপরটির মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে, তবে এক্ষেত্রেও 'সম্মিলন' হয়নি বলেই প্রমাণিত হলো। কারণ এক্ষেত্রে যে কোন একটি সত্তা বিলীন হয়েছে। আর কোন বিলীন ও অস্তিত্বহীন বিষয় সম্পর্কে বলা যায় না যে, তা অন্যের সাথে সম্মিলিত রয়েছে।

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, 'সম্মিলন' (union of the divine nature of the second Person of the Trinity with the human nature of Jesus, the son of Mary) তত্ত্বটি একটি অসম্ভব ও ভিত্তিহীন কথা। কোনভাবেই এই সম্মিলন কল্পনা করা যায় না।

কেউ কেউ বলেছেন, এই সম্মিলন ও সংমিশ্রণ হয়েছিল প্রকাশের পদ্ধতিতে, যেমন দর্পণের মধ্যে মানুষের প্রকাশ ঘটে, কাদা ও মোমের উপরে অঙ্কন বা সীলমোহরের প্রকাশ ঘটে তেমনি ভাবে। তাঁদের মতানুসারে প্রকৃতপক্ষে কোন সম্মিলন (union) ঘটেনি, বরং ভিন্নতা রয়ে গিয়েছে। কারণ কাদা বা মোমের উপরে সীলমোহরের প্রকাশ ঘটলেও তা প্রকৃত সীলমোহর নয়, বরং তা প্রকৃত সীলমোহর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটি বস্তু। অনুরূপভাবে দর্পণে যে মানবাকৃতি প্রকাশিত হয় তা প্রকৃত মানুষের সত্তা নয়, বরং পৃথক একটি বস্তু। তাহলে প্রমাণিত হবে যে, 'পুত্রের সত্তা' আর 'খৃস্টের সত্তা' দুইটি পৃথক সত্তা। শুধু এতটুকু বলা যাবে যে, 'পুত্রের' প্রকাশ অন্যান্যদের চেয়ে 'খৃস্টের' মধ্যে বেশি ঘটেছে। যেমন বদখশান শহরে কিছু কিছু পাথরের উপরে সূর্যের আলো পড়ে তা থেকে এমন কিছু মূল্যবান পাথরের জন্ম হয়, যা অন্য কোন পাথরের ক্ষেত্রে হয় না।

খৃস্টধর্মের এই 'ঈশ্বরের ত্রিত্ব' ও 'খৃস্টের দ্বিত্ব' মতবাদের অবাস্তবতা ও অসারতা বর্ণনা করে এক কবি বড় সুন্দর কথা বলেছেন :

একটি অসম্ভব কথা, যার চেয়ে বেশি অসম্ভব কিছুই হতে পারে না,

একটি কথা যা প্রকৃত পক্ষে বলা যেতে পারে না,
একটি মিথ্যা চিন্তা ও একটি অসত্য কথা,
তারা তা প্রকাশ করেছেন, আর তা উৎপত্তি হলো কল্পনা থেকে,
ঈশ্বর মহান ও পবিত্র! তাঁরা যা বলেছেন তা ঈশ্বরের অবমাননা,
তা একটি মহাপাপ যার শাস্তির কথা বলা যায় না।

সপ্তম প্রমাণ

ক্যাথলিকগণ বিশ্বাস করেন যে, প্রভুর নৈশভোজে (Eucharist) রুটি জীবন্ত খৃস্টে রূপান্তরিত হয়। প্রটেস্ট্যান্টগণ এই বিশ্বাসকে বাতিল বলে খণ্ডন করেছেন। কারণ পঞ্চ ইন্দ্রিয় সাক্ষ্য দেয় যে, ধারণাটি মিথ্যা। তাঁরা ক্যাথলিকদের এই বিশ্বাসকে নিয়ে উপহাস করেন।

প্রটেস্ট্যান্টদের এই খণ্ডন ও উপহাস তাঁদের নিজেদের ক্ষেত্রেও একইরূপে প্রযোজ্য। তাঁরা খৃস্টের মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা ছিল বলে দাবি করেন। আর পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাঁদের এই কথাটি মিথ্যা বলে প্রমাণ করে। কারণ যারা খৃস্টকে দেখেছেন, তাঁরা তাঁর মধ্যে একটিই মানবীয় সত্তা দেখতে পেয়েছেন। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সঠিক তথ্যপ্রদানকারী ইন্দ্রিয় চক্ষুর সাক্ষ্যকে তাঁরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। আর এটিই খৃস্টানদের 'অর্থহীন অন্তঃসারশূন্য দর্শনবাক্যগুলির' দরজা উন্মোচন করে।

সকল ত্রিত্ববাদী খৃস্টান সম্প্রদায়ই এ বিষয়ে কঠিভাবে বিভ্রান্ত হয়েছেন। খৃস্টান পণ্ডিতগণ তাত্ত্বিকভাবে খৃস্টের 'ঐশ্বরিক সত্তা' ও 'মানবীয় সত্তা'-র মধ্যে যে পার্থক্যের কথা বলেন, সাধারণ খৃস্টানগণ তার কিছুই বোঝেন না বা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত রক্তমাংসের মানুষ 'খৃস্ট'কেই ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ মূলত খৃস্টের মানবীয় সত্তা বা মানবীয় ব্যক্তিত্বকেই তাঁরা ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করেন। এ সকল অন্তঃসারশূন্য তাত্ত্বিক কথাবার্তার মধ্যে তাঁরা দিশেহারা হয়ে কঠিনতম বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হন।

বিভ্রান্তির একটি নমুনা দেখুন। কথিত আছে যে, তিনজন মানুষ খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন। একজন খৃস্টান পাদরী তাদেরকে খৃস্টধর্মের মৌলিক ধর্মবিশ্বাসগুলি যত্নসহকারে শিক্ষাদান করেন। বিশেষ করে খৃস্টধর্মের মূল বিশ্বাস 'ত্রিত্ববাদ'-টি তিনি খুবই যত্নসহকারে শিক্ষা দান করেন। এই তিন নব্য খৃস্টান উক্ত পাদরীর সেবা ও সাহচর্যে নিয়োজিত থাকেন।

এই পাদ্রীর একজন বন্ধু তাঁর নিকট বেড়াতে আসেন। তিনি তাঁকে ধর্মপ্রচারের অগ্রগতি ও ধর্মান্তরিতদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, এই তিন ব্যক্তি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। বন্ধু বলেন : তারা কি খৃস্টধর্মের জরুরী বিশ্বাসগুলি শিক্ষা

করেছে? তিনি বলেন : হাঁা, তাদেরকে তা শিক্ষা দিয়েছি।

তিনি তাদের ধর্মীয় পারঙ্গমতা বুঝানোর জন্য তাদের একজনকে ডেকে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। উত্তরে সেই খৃষ্টধর্মগ্রহণকারী ব্যক্তি বলেন : "আপনি আমাকে শিখিয়েছেন যে, ঈশ্বর তিনজন। একজন স্বর্গে থাকেন। অন্যজন কুমারী মেরির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় জন স্বর্গ থেকে কপোতের ন্যায় এই দ্বিতীয় ঈশ্বরের উপর নেমে আসেন, যখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছর হয়েছিল।"

এই উত্তর শুনে উক্ত পাদরী অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং তাকে তাড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, এই লোকটি একটি জ্ঞানহীন মূর্খ।

এরপর তিনি উক্ত তিন ব্যক্তির দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ডেকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। এই ব্যক্তি বলেন : আপনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, তিনজন ঈশ্বর বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে একজন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। এখন দুইজন ঈশ্বর বিদ্যমান।'

এই উত্তরেও পাদরী রাগান্বিত হন এবং তাকে তাড়িয়ে দেন।

এরপর তিনি তৃতীয় ব্যক্তিকে ডেকে তাকে প্রশ্ন করেন। এই ব্যক্তি ছিলেন অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান এবং ধর্মবিশ্বাসকে যথাযথ বুঝার ও হৃদয়ঙ্গম করার বিষয়ে আগ্রহী। তিনি উত্তরে বলেন : "গুরু, আপনি আমাকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন সবই আমি যত্নের সাথে মুখস্থ করে রেখেছি। প্রভু খৃস্টের আশীর্বাদে আমি তা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছি। আমি জানি যে, একই তিন এবং তিনই এক। এর মধ্যে থেকে একজন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। ফলে এই 'একই তিন ও তিনই এক' ঈশ্বর নিহত হয়েছেন। এখন আর কোন ঈশ্বর বিদ্যমান নেই। কারণ নিহত হওয়ার পরেও যদি ঈশ্বর বিদ্যমান থাকেন তাহলে মিশ্রণ (union)-এর কোন অর্থ থাকে না।"

প্রিয় পাঠক!

এখানে জিজ্ঞাসিতরা কোন ত্রুটি করেন নি। এই বিশ্বাসটিই এমন অযৌক্তিক ও বুদ্ধির অগম্য যে, যে কোন সাধারণ মানুষই এ বিষয়ে এভাবে দিশে হারিয়ে ফেলেন। আর ধর্মতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ খৃষ্টান পণ্ডিতগণ দিশে হারিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, 'তাঁরা তা বিশ্বাস করেন কিন্তু তা বুঝেন না (the Trinity of Persons being conceived as an irrational truth found in revelation)[১]।' এই বিশ্বাস বা তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করতে এবং এর বর্ণনা দিতে তারা ব্যর্থ হন। এজন্য আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে সূরা নিসার শেষে লিখেছেন : "খৃষ্টানগণের ধর্মবিশ্বাসটি যুক্তি ও জ্ঞানের একেবারেই অগম্য...। এত বেশি বাজে কথা ও অর্থহীন প্রলাপ বিশ্বের বুকে আর কোন

১. Encyclopaedlia Britannica, article : Eastern Orthodoxy.

ধর্মের মধ্যে নেই। আর জ্ঞান ও বুদ্ধির এত বিরোধী কোন ধর্মমতও বিশ্বে খুঁজে পাওয়া যায় না।"

সূরা মায়েদার তাফসীরে তিনি বলেন : "খৃস্টানদের 'ত্রিত্ববাদ'-এর মত এত অযৌক্তিক ও ফালতু ধর্মমত পৃথিবীর বুকে আর একটিও দেখা যায় না।"

পাঠক উপরের আলোচনা থেকে যুক্তি ও জ্ঞানের নিরীখে অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন যে, ঈশ্বরের সত্তার প্রকৃত ত্রিধাবিভক্তি বা প্রকৃত ত্রিত্ব কখনোই সম্ভব নয়। কাজেই যদি খৃস্টের বাক্যের মধ্যে এমন কোন কথা পাওয়া যায়, যা দ্বারা বাহ্যত ত্রিত্বের অর্থ বুঝা যায়, তবে সেই বাক্যটি ব্যাখ্যা করতে হবে। কারণ যখন আমরা দেখব যে, সকল প্রকারের যুক্তি, বিবেক ও জ্ঞানের আলোকে একটি বিষয় অসম্ভব, অথচ খৃস্টের কোন বাক্য বাহ্যত সেই বিষয়টি সম্ভাব্যতার কথা বলছে, তখন আমরা নিম্নের যে কোন একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি :

১. জ্ঞান এবং সেই বাক্যটি উভয়কেই বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করব,

২. উভয় বিষয়কেই পরিত্যাগ করব,

৩. খৃস্টীয় বাক্য (revelation)-কে যুক্তি, বিবেক ও জ্ঞানের উপরে স্থান দেব,

৪. যুক্তি, বিবেক ও জ্ঞানকে খৃস্টীয় বাক্যের (revelation) উপরে স্থান দেব।

প্রথম পদক্ষেপ সন্দেহাতীতভাবে অসম্ভব ও অকল্পনীয়। কারণ যা জ্ঞান, যুক্তি ও বুদ্ধির আলোকে সন্দেহাতীতভাবে অসম্ভব ও অবাস্তব, তাকে আবার সম্ভব ও বাস্তব মনে করার কোন উপায় নেই।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণও অসম্ভব : কারণ এতে একটি বিষয়ের সম্ভাব্য দুইটি দিকই অস্বীকার করা হয়।

তৃতীয় পদক্ষেপটি গ্রহণ করাও সম্ভব নয়। কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তাঁর জ্ঞান, তাঁর ক্ষমতা, তাঁর ভাববাদী প্রেরণ ইত্যাদি বিষয় প্রমাণিত হওয়ার পরেই ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা, প্রত্যাদেশ (revelation) বা খৃস্টীয় বাক্যের নির্ভরযোগ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হবে। আর উক্ত বিষয়গুলি মূলত জ্ঞান ও বুদ্ধির মাধ্যমেই প্রমাণ করতে হবে। কাজেই জ্ঞান বিরোধী বা জ্ঞানের অগম্য প্রত্যাদেশ (revelation)-কে বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করার জন্য জ্ঞানের দাবিকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আমরা যদি এক্ষেত্রে জ্ঞানের দাবিকে অগ্রহণযোগ্য বলি, তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও গুণাবলি প্রমাণের ক্ষেত্রেও জ্ঞানের দাবিকে অস্বীকার করতে হবে। বিশেষত, যখন যুক্তি, জ্ঞান ও বুদ্ধির পক্ষে খৃস্টীয় অন্যান্য বাক্য রয়েছে, তখন এগুলি সব বাদ দিয়ে জ্ঞান বিরোধী খৃস্টীয় বাক্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া অবাস্তব ও অসম্ভব।

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এক্ষেত্রে চতুর্থ পদক্ষেপটি গ্রহণ করা ছাড়া কোন

উপায় নেই। অর্থাৎ জ্ঞান-বিরোধী খৃস্টীয় বাক্য বা ঐশ্বরিক বাক্যকে জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

এই প্রকারের ব্যাখ্যা খৃস্টধর্মে অনুপস্থিত নয় বা কমও নয়, বরং অনেক। এই অধ্যায়ের ভূমিকার তৃতীয় বিষয়ের আলোচনা থেকে পাঠক জানতে পেরেছেন যে, ইহূদী-খৃস্টানগণ ঈশ্বরের মানবীয় গুণাবলি, দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়া ইত্যাদি বিষয়ক বাইবেলের অগণিত আয়াত বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ না করে এগুলিকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের এই ব্যাখ্যার পক্ষে মাত্র দুইটি আয়াত রয়েছে। যেহেতু আয়াত দুইটির অর্থ জ্ঞান, বিবেক ও যুক্তির পক্ষে, এজন্য এগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে অগণিত আয়াত তাঁরা ব্যাখ্যা করেন।

অনুরূপভাবে যে সকল আয়াত থেকে ঈশ্বরের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করা, চলাচল করা ইত্যাদি বুঝা যায় সেগুলিকেও তাঁরা ব্যাখ্যা করেন। অল্প কিছু আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ঈশ্বর এইরূপ বসবাস, চলাচল ইত্যাদি থেকে উর্ধ্বে। জ্ঞান ও বুদ্ধিও এ কথাই সমর্থন করে। যেহেতু অল্প কয়েকটি আয়াতের অর্থ জ্ঞানের সপক্ষে, এজন্য এগুলির ভিত্তিতে অগণিত আয়াতকে তাঁরা ব্যাখ্যা করেন। ভূমিকার ৪র্থ ও ৫ম বিষয় থেকে পাঠক তা জেনেছেন।

কিন্তু জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ক্যাথলিক খৃস্টানগণের বিষয়ে বড় অবাক লাগে। কখনো তাঁরা জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় উভয়ের সাক্ষ্য বাতিল করে দেন। আবার কখনো তাঁরা জ্ঞান ও যুক্তির সাক্ষ্য বাতিল করে দেন।

প্রভুর নৈশভোজের বিষয়ে তাঁরা জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় (rationality, reason and sence) সবকিছুর সাক্ষ্য বাতিল করে দেন এবং বলেন যে, খৃস্টের উর্ধ্বারোহণের ১৮০০ বছর পরে সৃষ্ট, আমাদের চোখের সামনে বানানো রুটি ও মদ প্রভুর নৈশভোজের অনুষ্ঠানে খৃস্টের প্রকৃত মাংস ও রক্তে রূপান্তরিত হয়। এই জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় (rationality, reason and sence) বিরোধী বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাঁরা সেই রুটি ও মদকে পূজা করেন এবং রুটি ও মদ-এর মত জড়পদার্থকে ভক্তিভরে প্রণাম বা সাজদা করেন।

আবার কখনো তাঁরা জ্ঞান, স্বভাববোধ ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে (rationality, reason, axiom, intuitive, fundamental and self-evident truth) অস্বীকার করে এবং যুক্তির সকল প্রমাণ দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেন যে, প্রকৃত একত্ব ও প্রকৃত ত্রিত্ব উভয়ই একই ব্যক্তিত্বের মধ্যে একই সময়ে একই দিক থেকে একত্রিত হতে পারে।

প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের জ্ঞানী পণ্ডিতদের অবস্থা দেখে অবাক হতে হয়। তাঁরা প্রথম বিষয়ে ক্যাথলিকদের বিরোধিতা করছেন, অথচ দ্বিতীয় বিষয়ে বিরোধিতা করছেন না। দুইটি বিষয়ই জ্ঞান, ইন্দ্রিয় ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যের বিরোধী।

তাঁরা দাবি করেন যে, দ্বিতীয় বিষয়টি অযৌক্তিক ও জ্ঞানবিরোধী হলেও যেহেতু

ঐশ্বরিক বাণী বা প্রত্যাদেশ (revelation)-এর মধ্যে তা পাওয়া যায় সেহেতু আমরা তা আক্ষরিকভাবে ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করি ও বিশ্বাস করি। তাঁদের এই কথা অনুসারে প্রথম বিষয়টিও তাঁরা মানতে বাধ্য। কারণ ঐশ্বরিক বাণী (revelation)-এর মধ্যে যা বিদ্যমান তা আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থে প্রথম বিষয়টিও প্রমাণ করে। এজন্য তাঁদের উচিত ছিল প্রথম বিষয়ে ক্যাথলিকদের উপহাস না করে তাঁদের অনুসরণ করা।

এজন্য এক্ষেত্রে ক্যাথলিকদেরকে বরং ভাল বলতে হয়। তাঁরা জ্ঞান, ইন্দ্রিয় ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য (rationality, reason, sence and axiom) সবকিছুর সাক্ষ্য বাতিল করে অন্ধভাবে খৃস্টের কথার বাহ্যিক অর্থ আঁকড়ে ধরে থাকার দাবি করছেন।[১]

ত্রিত্ববাদিগণ যেমন একদিকে খৃস্টের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে তাঁকে ঈশ্বরত্বের মর্যাদায় উঠিয়েছেন, তেমনি তাঁরা তাঁর ও তাঁর পূর্বপুরুষদের বিষয়ে অনেক নোংরা ও অশালীন কথা বলেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, খৃস্ট অভিশপ্ত বা শাপগ্রস্থ ছিলেন, তিনি মৃত্যুর পরে নরকে গমন করেন, সেখানে তিনদিবস অবস্থান করেন...ইত্যাদি। পাঠক পরবর্তী আলোচনা থেকে তা জানতে পারবেন। এছাড়া তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, দায়ূদ, শলোমন ও খৃস্টের অন্যান্য পূর্বপুরুষ সকলে জারজ সন্তানের বংশধর। তাঁদের পূর্বপুরুষ যিহূদার পূত্রবধু তামর শ্বশুরের সাথে ব্যভিচার করে পেরস নামক সন্তান জন্ম দেন। এরা সকলেই সেই পেরসের সন্তান। এরা আরো বিশ্বাস করেন যে, খৃস্টের পূর্বপুরুষ দায়ূদ উরিয়র স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন এবং শলোমন শেষ জীবনে ধর্মত্যাগ করে প্রতিমাপূজা করেন। এ সকল বিষয় পাঠক ইতোপূর্বে জেনেছেন।

সেল (George Sale) ছিলেন (অষ্টদশ শতকের) একজন খৃস্টান পণ্ডিত। তিনি কিছু ইসলামী বিষয়েও শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইংরেজি ভাষায় কুরআন কারীমের অনুবাদ করেন (১৭৩৪ সালে প্রথম প্রকাশিত)। তাঁর অনুবাদটি খৃস্টান পণ্ডিতগণের নিকট গ্রহণযোগ্য। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে কয়েকটি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ১৮৩৬ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত তাঁর ইংরেজি অনুবাদ থেকে আমি তাঁর কয়েকটি উপদেশ উল্লেখ

---

১. ক্যাথলিক বা প্রটেস্ট্যান্ট কেউই খৃস্টের কথাকে শাব্দিক ও আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করেন নি বা পালন করেন নি। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, তাদের ধর্মবিশ্বাসের যা কিছু মূলনীতি তার কিছুই খৃস্টের বাক্যের মধ্যে আক্ষরিকভাবে নেই। যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, খৃস্ট ঈশ্বরের পুত্র এবং বিশ্বাস করেন যে, খৃস্টকে সৎ বলা যাবে না, কারণ তিনি বলেছেন যে, 'কেন আমাকে সৎ বলিতেছ, একজন ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর' (লূক ১৮/১৯) তবে আমরা বলতে পারি যে, তিনি আক্ষরিক অর্থে খৃস্টের বাক্য মান্য ও পালন করেছেন, যদিও যাকে তিনি খৃস্টের বাক্য বলে বিশ্বাস করছেন তা সত্যিই তাঁর বাক্য কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু তিনি যদি বলেন যে, 'খৃস্ট ঈশ্বর', অথবা বলেন যে 'তিনই এক' বা 'একই তিন' তবে কখনোই বলা যাবেনা যে, তিনি খৃস্টের বাক্যকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। কারণ খৃস্ট কখনোই এ সব কথা বলেন নি।

করছি। তিনি বলেন :

"প্রথমত, আপনারা মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে জ্ঞান-বিরোধী ধর্মীয় বিষয়গুলি শেখাবেন না। কারণ তারা এমন বোকা নয় যে, এ সকল জ্ঞান বিরোধী বিষয় আমরা তাদেরকে গেলাতে পারব। যেমন মূর্তি বা প্রতিকৃতির উপাসনা[১], প্রভুর নৈশভোজ ইত্যাদি বিষয়। এ সকল বিষয় গ্রহণ করতে তাদের খুবই অসুবিধা হয়। যে সকল চার্চে বা ধর্মমতে এই ধরনের বিষয় রয়েছে সেগুলি কখনো মুসলমানদেরকে আকর্ষণ করতে পারে না।"

এখানে এই খৃস্টান পণ্ডিত স্বীকার করছেন যে, প্রতিকৃতি উপাসনা এবং প্রভুর নৈশভোজ জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি 'জ্ঞান বিরোধী'।[২] প্রকৃত সত্য কথা হলো, এই সকল বিষয় যারা বিশ্বাস করেন তারা নিঃসন্দেহে একত্ববাদের ছায়া থেকে বঞ্চিত এবং বহুঈশ্বরবাদের অন্ধকারে নিমজ্জিত। মহিমাময় আল্লাহ তাঁদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

---

১. খৃস্টানগণ উপাসনায় বা প্রার্থনায় যীশু, মেরি, ক্রুশ ইত্যাদির প্রতিমূর্তির (icon) পূজা করেন, এগুলির উদ্দেশ্যে প্রণতি জানান ও প্রার্থনা করেন, যদিও বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে মূর্তি, প্রতিমা ও প্রতিকৃতির পূজা-অর্চনা কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

২. তিনি আরো স্বীকার করলেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে ইসলামী ধর্মবিশ্বাস এত স্বচ্ছ, যৌক্তিক ও জ্ঞানমুখি যে, মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ জ্ঞান-বিরোধী কুসংস্কারের ও বিশ্বাসের প্রতি স্বভাবজাত ঘৃণা সৃষ্টি হয়। এজন্য তাঁরা এই প্রকারের বিষয় মানতে পারেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
খৃষ্টের বাক্যের দ্বারা ত্রিত্ববাদ খণ্ডন

প্রথম বাক্য : যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ে ৩ আয়াতে যীশুখৃষ্ট ঈশ্বরকে সম্বোধন করে বলেছেন : "আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায় (And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.)।"

এখানে যীশু অনন্ত জীবন কী তা অতি সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, অনন্ত জীবন হলো আল্লাহকে একমাত্র সত্য ঈশ্বর বা উপাস্য বলে জানা এবং যীশুখৃষ্টকে তাঁর প্রেরিত (রাসূল) বলে জানা।

তিনি বলেন নি যে, 'ইহাই অত্যন্ত জীবন যে, তাহারা জানিবে তোমার সত্ত্বা তিনটি সম্পূর্ণ সত্ত্বার সমন্বয় এবং যীশু মনুষ্য ও ঈশ্বর, অথবা যীশু মাংস প্রকাশিত ঈশ্বর (God manifested in the flesh/God in the flesh/God incarnate)।'

যীশু এ কথা বলেছিলেন ঈশ্বরকে সম্বোধন করে প্রার্থনার মধ্যে। কাজেই ইহুদীদের ভয়ে প্রকৃত সত্য এড়িয়ে গিয়েছিলেন বলে চিন্তা করার কোন সুযোগ এখানে নেই। যদি সত্যই 'ত্রিত্বে বিশ্বাসের' উপর অনন্ত জীবনের ভিত্তি হতো তবে নিশ্চয়ই তিনি এখানে তা উল্লেখ করতেন।

উপরের খৃষ্টীয় বাক্য থেকে প্রমাণিত হলো যে, অনন্ত জীবন হলো আল্লাহ্র প্রকৃত (true) একত্বে বিশ্বাস করা এবং খৃষ্টের প্রেরিতত্বে বিশ্বাস করা। প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করেছি যে, প্রকৃত একত্ব নিঃসন্দেহে প্রকৃত ত্রিত্বের বিপরীত ও সাংঘর্ষিক। অনুরূপভাবে খৃষ্টের প্রেরিত হওয়া তাঁর ঈশ্বর হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ প্রেরিত ও প্রেরণকারী ভিন্ন ব্যক্তি হওয়া অত্যাবশ্যক।

উপরের বাক্য দ্বারা প্রমাণিত অনন্ত জীবন-ঈশ্বরের প্রকৃত একত্ব ও খৃষ্টের প্রেরিতত্বে বিশ্বাস শুধু ইসলাম ধর্মেই রয়েছে। অন্য সকল ধর্ম এই অনন্ত জীবন থেকে বঞ্চিত। পারসিয়ান অগ্নিউপাসক, ভারতীয় ও চীনের অংশীদারী বা পৌত্তলিকগণ অনন্ত জীবন থেকে বঞ্চিত। কারণ তাদের মধ্যে উপরের বিশ্বাসের দুটি অংশের একটিও

পাওয়া যায় না। ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানগণও অনন্ত জীবন থেকে বঞ্চিত। কারণ তাদের মধ্যে উপরের বিশ্বাসের প্রথম অংশটি অবিদ্যমান। ইহূদীগণ সকলেই তা থেকে বঞ্চিত; কারণ তাদের মধ্যে উপরের বিশ্বাসের দ্বিতীয় অংশটি অবিদ্যমান।

দ্বিতীয় বাক্য : মার্কলিখিত সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "২৮ আর অধ্যাপকদের এক জন নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে তর্ক বিতর্ক করিতে শুনিয়া, এবং যীশু তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকল আজ্ঞার মধ্যে কোন্‌টি প্রথম? ২৯ যীশু উত্তর করিলেন, প্রথমটি এই, 'হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু; ৩০ আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে। ৩২ অধ্যাপক তাঁহাকে কহিল, বেশ, গুরু, আপনি সত্য বলিয়াছেন যে, তিনি এক, এবং তিনি ব্যতীত অন্য নাই; ৩৩ আর সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত বুদ্ধি ও সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহাকে প্রেম করা এবং প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করা সমস্ত হোম ও বলিদান হইতে শ্রেষ্ঠ। ৩৪ তখন সে বুদ্ধিপূর্বক উত্তর দিয়াছে দেখিয়া যীশু তাহাকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য হইতে তুমি দূরবর্তী নও।"

মথিলিখিত সুসমাচারের ২২ অধ্যায়ে উপর্যুক্ত দুটি আজ্ঞার কথা উল্লেখ করে যীশু বলেন : "এই দুইটি আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদীগ্রন্থও ঝুলিতেছে।"[১]

এ থেকে একটি বাস্তব মহাসত্য জানা গেল। তা হলো, প্রথম যে আজ্ঞাটি তোরাহ ও সকর ভাববাদীর গ্রন্থেই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যা ঈশ্বরের রাজ্যের নৈকট্যের মূল কারণ তা হলো একত্ববাদ, অর্থাৎ একথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহই একমাত্র ঈশ্বর বা উপাস্য এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। যদি ত্রিত্ববাদের উপরে মুক্তি নির্ভর করতো, তবে নিশ্চয়ই তা তোরাহ ও অন্য সকল ভাববাদীর গ্রন্থে প্রথম আজ্ঞা হিসেবে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হতো। আর তাহলো যীশু বলতেন " 'প্রথম আজ্ঞাটি এই 'ঈশ্বর প্রভু এক, যিনি তিনটি প্রকৃত ও সম্পূর্ণ পৃথক সত্তার অধিকারী।' এই কথাটি কখনোই কোন ভাবাবাদীর গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলা হয় নি।

ত্রিত্ববাদিগণ বিভিন্ন ভাববাদীর গ্রন্থের অপ্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বাক্য থেকে কষ্টকল্পনা করে ত্রিত্ববাদের পক্ষে কিছু 'কাল্পনিক ব্যাখ্যা' প্রদান করেন। ত্রিত্ববাদ বিরোধীদের সামনে প্রমাণ হিসেবে এগুলি একেবারেই মূল্যহীন। কারণ এ সকল কাল্পনিক ব্যাখ্যা অতি দূরবর্তী ও অত্যন্ত অস্পষ্ট। এগুলির বিপরীতে সুস্পষ্ট বাক্যাবলি রয়েছে যা ত্রিত্ববাদ প্রত্যাখ্যান করে এবং একত্ববাদ প্রমাণ করে। এখানে এতটুকু প্রমাণ করাই যথেষ্ট যে, মুক্তি ও অনন্ত জীবন লাভের জন্য যদি ত্রিত্বে বিশ্বাসের কোন প্রয়োজন থাকত, তবে ইস্রায়েলীয় ভাববাদিগণ অবশ্যই অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে তা উল্লেখ করতেন, যেভাবে তাঁরা একত্ববাদের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. মথি/২২/৪০

দ্বিতীয় বিবরণের ৪র্থ অধ্যায়ে রয়েছে : "৩৫ সদাপ্রভুই ঈশ্বর, তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই, ইহা যেন তুমি জ্ঞাত হও... ৩৯ অতএব অদ্য জ্ঞাত হও, মনে রাখ যে, উপরিস্থ স্বর্গে ও নিচস্থ পৃথিবীতে সদাপ্রভুই ঈশ্বর, অন্য কেহ নাই।"

উক্ত গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে : "৪ হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু; ৫ আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ, ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে।"

যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৪৫ অধ্যায়ে রয়েছে : "৫ আমিই সদাপ্রভু, আর কেহ নয়; আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই; তুমি আমাকে না জানিলেও আমি তোমার কটি বদ্ধ করিব; ৬ যেন সূর্যোদয়ের স্থানাবধি (পূর্ব থেকে) পশ্চিম দিক্ পর্যন্ত লোকে জানিতে পারে যে, আমি ব্যতীত অন্য নাই; আমিই সদাপ্রভু, আর কেহ নয়।"

তাহলে জানা গেল যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকল মানুষকে মুক্তির জন্য জানতে হবে যে, আল্লাহ এক, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তাদের এ কথা জানার প্রয়োজন নেই যে, ঈশ্বর সদাপ্রভু তিনটি পৃথক সত্ত্বার অধিকারী।

যিশাইয় পুস্তকের ৪৬ অধ্যায়ে ৯ আয়াতে বলা হয়েছে; "আমিই ঈশ্বর, আর কেহ নয়; আমি ঈশ্বর, আমার তুল্য কেহ নাই।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ১৮১১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে অনুবাদক মার্কলিখিত সুসমাচারের উপর্যুক্ত আয়াতটির বিকৃত অনুবাদ করেছেন। The Lord our God is one Lord-এর অনুবাদে "আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু"-র পরিবর্তে তিনি লিখেছেন : "তোমার ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু।"

এই বিকৃতির দ্বারা বাক্যটির সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য নষ্ট করা হয়েছে। কারণ উত্তম পুরুষের সর্বনাম 'আমাদের ঈশ্বর প্রভু' প্রমাণ করে যে, যীশু ঈশ্বর নন; বরং তিনিও অন্যদের একমাত্র ঈশ্বর প্রভুর বান্দা মাত্র। কিন্তু মধ্যম পুরুষের সর্বনাম 'তোমার ঈশ্বর প্রভু' থেকে তা প্রমাণিত হয় না। বাহ্যত ইচ্ছাকৃতভাবেই এই বিকৃতি করা হয়েছে।

তৃতীয় বাক্য : মার্কলিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ে ৩২ আয়াতে বলা হয়েছে : "কিন্তু সেই দিনের বা সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না; স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।"

এই বাক্যটি সন্দেহাতীতভাবে ত্রিত্ববাদের বাতুলতা ঘোষণা করছে। কারণ যীশু এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, কিয়ামত বা বিনাশ দিবসের জ্ঞান একমাত্র ঈশ্বরের আছে, আর কারো নেই। অন্য সকল সৃষ্টির সাথে তাঁর নিজেকেও তিনি এই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত বলে উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনিও অন্য সকল সৃষ্টির সমান বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁকে ঈশ্বর কল্পনা করলে তা কখনোই সম্ভব নয়।

বিশেষত, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, খৃস্টধর্মের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে 'বাক্য' এবং ঈশ্বরের 'পুত্রসত্ত্বা' বলতে ঈশ্বরের জ্ঞানকেও বুঝানো হয়। খৃস্টানগণ

বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের জ্ঞান ঈশ্বরের বাক্য বা ঈশ্বরের পুত্রসত্ত্বা যীশুর সত্ত্বার সাথে একাকার হয়ে ছিল। এই সংমিশ্রণের প্রকৃতি নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ মনে করেন, ঈশ্বরের বাক্য, জ্ঞান বা পুত্র সত্ত্বা যীশুর সত্ত্বার মধ্যে অবতরণ করে। যাকোবাইটগণ মনে করেন যে, ঈশ্বরের পুত্র সত্ত্বা বা বাক্য খৃস্টের সত্তায় রূপান্তরিত হয়। যেভাবেই হোক, তারা বিশ্বাস করেন যে, যীশু ছিলেন ঈশ্বরের জীবন্ত জ্ঞান। আর সেক্ষেত্রে পিতা ঈশ্বরের চেয়ে পুত্র ঈশ্বরের মধ্যে জ্ঞান বেশি থাকা উচিত। তা না হলে অন্তত পুত্রের জ্ঞান পিতার চেয়ে কোন অংশেই কম হতে পারে না।

খৃস্টান পণ্ডিতগণ যীশুর এ জাতীয় বাক্যের ব্যাখ্যায় অনেক সময় বলেন যে, যীশু তাঁর দেহের দিকে লক্ষ্য করে ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যার কোন উপায় নেই। কারণ 'জ্ঞান' কোন দৈহিক বিষয় নয় বা দেহ সম্পৃক্ত গুণ নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, দেহ, প্রাণ, সত্ত্বা বা আত্মায় কোন দিক থেকেই যীশু ঈশ্বর ছিলেন না।

চতুর্থ বাক্য : মথিলিখিত সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ে রয়েছে : "২০ তখন সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা আপনার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রণিপাতপূর্বক তাঁহার কাছে কিছু যাঞ্চা করিলেন। ২১ তিনি তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি চাও? তিনি কহিলেন, আজ্ঞা করুন, যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই পুত্রের এক জন আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে, আর একজন বাম পার্শ্বে, বসিতে পায়। ২২ কিন্তু যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, ... ২৩ ... কিন্তু যাহাদের জন্য তাহার পিতা কর্তৃক স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাদের ভিন্ন আর কাহাকেও আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বা বাম পার্শ্বে বসিতে দিতে আমার অধিকার নাই।"

এখানে যীশু তার অধিকার ও ক্ষমতা অস্বীকার করলেন এবং একমাত্র ঈশ্বরেরই সকল ক্ষমতা তা ঘোষণা করলেন। যদি তিনি ঈশ্বর হতেন তবে এ কথা বলা কখনোই সম্ভব ছিল না।

পঞ্চম বাক্য : মথিলিখিত সুসমাচারের ১৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "১৬ আর দেখ, এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, হে সৎ গুরু (Good Master), অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আমি কিরূপ সৎকর্ম করিব? ১৭ তিনি তাহাকে কহিলেন, আমাকে কেন সৎ (good) কহিতেছেন? একজন ব্যতীত আর কেউই সৎ নন, তিনি ঈশ্বর।"[১]

---

১. বাংলা বাইবেলে এই আয়াতদ্বয়ের অনুবাদ অন্যভাবে করা হয়েছে। গ্রন্থকার যে আরবী পাঠ উল্লেখ করেছেন তা কিং জেমস ভারসন বা অথোরাইজড ভার্সনের হুবহু অনুবাদ। ইংরেজিতে আয়াতদ্বয় নিম্নরূপ : "16 And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? 17 And he said unto him, Why callest thou me good? there is one good but one, that is, God". ১৯৯২ সালে মুদ্রিত আরবী বাইবেলের ভাষ্য একইরূপ। পক্ষান্তরে বাংলা বাইবেলের ভাষ্য নিম্নরূপ : "১৬ আর দেখ, এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, হে গুরু, অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আমি কিরূপ সৎকর্ম করিব? ১৭ তিনি তাহাকে কহিলেন, আমাকে সৎ এর বিষয়ে কেন জিজ্ঞাসা কর? সৎ এক জন মাত্র আছেন।" এখানে অনুবাদের বিকৃতি বা পরিবর্তন খুবই সুস্পষ্ট।

এ কথাটি ত্রিত্ববাদের মূলোৎপাটন করে। যীশু বিনয়ভরে নিজেকে সৎ (good) বলতেও আপত্তি করেছেন। তিনি ঈশ্বর হলে তবে এই কথাটি অর্থহীন প্রলাপে পরিণত হবে। তিনি ঈশ্বর হলে তাঁর উপর দায়িত্ব ছিল যে, তিনি বলবেন : "পিতা এবং আমি এবং পবিত্র-আত্মা ছাড়া আর কেউই সৎ নন।" প্রয়োজনের সময়ে মুক্তির মূলমন্ত্রকে তিনি না বলে নীরব থাকতেন না।

যে ব্যক্তি নিজের বিষয়ে 'সৎ' বিশেষণটি প্রয়োগ করতে রাজি হন নি, তাঁর বিষয়ে ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ যে সকল বিশেষণ প্রয়োগ করে সেগুলিতে কি তিনি কখনো সন্তুষ্ট হতে পারেন? তারা তাদের প্রার্থনার মধ্যে বলে, 'হে আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর যীশু খৃষ্ট, তুমি নিজের হাতে যাকে সৃষ্টি করেছ তাকে নষ্ট করো না।' যীশু এ সকল কথায় কখনো রাজি করতে পারেন না।

ষষ্ঠ বাক্য : মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ে রয়েছে : "৪৬ আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, এলী এলী লামা শবক্তানী, অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ? ৫০ পরে যীশু আবার উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া নিজ আত্মাকে সমর্পণ করিলেন।"

লূকলিখিত সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ে ৪৬ আয়াতে বলা হয়েছে : "আর যীশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া কহিলেন, পিতঃ, তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি; আর এই বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।"

এই কথাগুলি যীশুর ঈশ্বরত্বের দাবি সর্বোতভাবে মিথ্যা বলে প্রমাণ করে। যারা দাবি করেন যে, যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা অবতরণ করেছিল অথবা যারা দাবি করেন যে, যীশুর মানবীয় সত্ত্বা ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল তাদের সকলের দাবিই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। তিনি যদি ঈশ্বরই হতেন তবে 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?' বলে অন্য কোন ঈশ্বরের নিকট তিনি ত্রাণ বা সাহায্য প্রার্থনা করতেন না। তিনি একথাও বলতেন না যে, 'পিতঃ, তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি'। কারণ ঈশ্বর এরূপ অসহায় হতে পারেন না বা ঈশ্বর এভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারেন না।

যিশাইয়র ৪০ অধ্যায়ের ২৮ আয়াতে বলা হয়েছে : "তুমি কি জ্ঞাত হও নাই? তুমি কি শুন নাই? অনাদি অনন্ত ঈশ্বর, সদাপ্রভু, পৃথিবীর প্রান্ত সকলের সৃষ্টিকর্তা ক্লান্ত হন না, শ্রান্ত হন না; তাঁহার বুদ্ধির অনুসন্ধান করা যায় না।"

উক্ত গ্রন্থের ৪৪ অধ্যায়ের ৬ আয়াতে রয়েছে : "সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের রাজা, তাহার মুক্তিদাতা; বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমিই আদি, আমিই অন্ত, আমি ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই।"

যিরমিয়ের ১০ অধ্যায়ের ১০ আয়াতে : "কিন্তু সদাপ্রভু সত্য ঈশ্বর; তিনিই জীবন্ত (living) ঈশ্বর ও অনন্ত কালস্থায়ী রাজা...।"

১ম অধ্যায়ের ১২ আয়াতে রয়েছে : "হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার পবিত্রতম, তুমি কি অমর নহ? (অনাদিকাল হইতে নহ?)"[১]

১ম তিমথীয়ের ১ম অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে : "যিনি যুগপর্যায়ের রাজা, অক্ষয় (অমর : immortal) অদৃশ্য একমাত্র ঈশ্বর..."

যে ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, যাকে কোন ক্লান্তি, শ্রান্তি বা দুর্বলতা স্পর্শ করতে পারেন না, যিনি জীবন্ত-চিরঞ্জীব, পবিত্রতম, অমর ও অক্ষয়, তিনি কিভাবে অসহায় হয়ে ত্রাণ প্রার্থনা করতে করতে মৃত্যুবরণ করবেন? মরণশীল ক্ষয়শীল অসহায় অক্ষম কি ঈশ্বর হতে পারে? কখনোই নয়! কোনভাবেই নয়!! বরং তাদের ধারণা ও বর্ণনা অনুসারে এই অন্তিম সময়ে যীশু যাঁর কাছে ত্রাণ প্রার্থনা করে চিৎকার করেছিলেন তিনিই হলেন প্রকৃত ও সত্য ঈশ্বর।

বড় অবাক লাগে! খৃস্টানগণ ঈশ্বরের মৃত্যুতেই সন্তুষ্ট হয় নি বরং তারা আরো বিশ্বাস করে যে, তাদের ঈশ্বর মৃত্যুর পরে নরকে প্রবেশ করেছেন!!

১৯শ শতকের ইরাকী মুসলিম পণ্ডিত জাওয়াদ ইবনু সাবাত (১৮৩৪ খৃ) তাঁর খৃস্টধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ 'আল-বারাহীন আস-সাবাতিয়া'য় লিখেছেন যে, ১৬০৩ সালে মুদ্রিত খৃস্টীয় প্রার্থনা পুস্তকে লেখা হয়েছে " "খৃস্ট যেরূপ আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং সমাধিস্থ হয়েছেন, তেমনিভাবে আমাদের জন্য একথা বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক যে, তিনি নরকে (জাহান্নামে) প্রবেশ করেছেন।"

আহমদ শরীফ ইবনু যায়নুল আবেদীন ইসপাহানী খৃস্টধর্ম প্রচারকদের ভুলভ্রান্তি ও মিথ্যাচারের প্রতিবাদে একটি বই লিখেন। এই বইটির প্রতিবাদে খৃস্টান সন্যাসী (monk) ফিলিপস কোয়াডনলস 'খায়ালাত ফিলিপস' (ফিলিপসের খেয়ালগুলি) নামে আরবী ভাষায় একটি বই লিখেন। ১৬৪৯ খৃস্টাব্দে বইটি রোমে বিসলোকেটে মুদ্রিত হয়েছে। দিল্লী শহরে অবস্থিত ইংরেজদের লাইব্রেরী থেকে এই পুস্তকের একটি প্রাচীন কপি ধার হিসেবে আমার হাতে আসে। উক্ত সন্ন্যাসী উক্ত পুস্তকে লিখেছেন : "তিনি আমাদের মুক্তির জন্য বেদনার্ত হয়েছেন এবং নরকে অবতরণ করেছেন। অতঃপর তৃতীয় দিবসে মৃতদেহের মধ্য থেকে উত্থিত হয়েছেন।"

খৃস্টীয় প্রার্থনাপুস্তক (prayer book)-এ এথানাসিয়াস (Athanasius)-এর ধর্মীয় বিশ্বাস-তত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে, যে তত্ত্বের উপর খৃস্টানগণ তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এই বিশ্বাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে : "হেল (Hell) বিদ্যমান। এর অর্থ নরক।"

---

১. গ্রন্থকার যে আরবী পাঠ উল্লেখ করেছেন তার আক্ষরিক 'তুমি কি অমর নহ?' ইংরেজীতে everlasting বলা হয়েছে। বাংলা বাইবেলে 'অনাদিকাল হইতে নহ' অনুবাদ করা হয়েছে।

জাওয়াদ ইবনু সাবাত (১৮৩৪ খৃ) বলেন, প্রাদ্রী মার্টিরোস (সম্ভবত সে সময়ে বাংলাদেশে কর্মরত পাদরী Henry Martyn) এইসব বিশ্বাসের ব্যাখ্যায় বলেন, খৃষ্ট যেহেতু মানুষের দেহ গ্রহণ করেছিলেন, সেহেতু মানবীয় সকল অবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া তাঁর কোন উপায় ছিল না। এজন্যই তিনি নরকে প্রবেশ করেন এবং সেখানে শাস্তিভোগও করেন। যখন তিনি নরক থেকে বেরিয়ে আসেন তখন নরকে যারা শাস্তিভোগ করছিল তাদের সকলকে বের করে নিয়ে আসেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, এই বিশ্বাসের কোন প্রমাণ কি বাইবেলে আছে? তিনি বলেন, এই বিশ্বাসের কোন দলিলের প্রয়োজন নেই। তখন সেই মজলিসে উপস্থিত একজন খৃষ্টান কৌতুক করে বলেন, পিতা খুব কঠিন হৃদয় ছিলেন! তা না হলে তিনি পুত্রকে নরকে ফেলে রাখতেন না!! এতে পাদ্রী রাগান্বিত হন এবং লোকটিকে মজলিস থেকে বের করে দেন। লোকটি পরে আমার কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। তবে সে আমাকে প্রতিজ্ঞা করায় যে, তার জীবৎকালে আমি তার ইসলাম গ্রহণের কথা কাউকে বলব না।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মোতাবেক ১২৪৮ হিজরীতে যোশেফ ওয়েলফ নামক এক ব্যক্তি লাখনৌ শহরে আগমন করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ পাদ্রী ছিলেন এবং তিনি নিজেকে 'ঐশ্বরিক প্রেরণা' (inspiration/revelation) বা ইলহাম-প্রাপ্ত বলে দাবি করতেন। তিনি দাবি করতেন যে, ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে যীশু খৃষ্টের (ঈসা মাসীহের) অবতরণ ঘটবে। শীআ সম্প্রদায়ের নেতা ও পণ্ডিতের সাথে এ বিষয়ে তাঁর লিখিত ও মৌখিক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। শীআ পণ্ডিত তাঁকে যীশুর নরক গমনের এই বিশ্বাস সম্পর্কেও প্রশ্ন করেন। তখন পাদ্রী মহাশয় বলেন : হ্যাঁ, খৃষ্ট নরকে প্রবেশ করেন এবং শাস্তি ভোগ করেন। কিন্তু এতে কোন অসুবিধা নেই। তিনি তাঁর অনুসারীদের মুক্তির জন্যই নরকভোগ করেন।

খৃষ্টানদের কোন কোন সম্প্রদায় এর চেয়েও জঘন্য বিশ্বাস পোষণ করতো। বেল তাঁর ইতিহাসে দ্বিতীয় খৃষ্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ অধ্যাত্মবাদী (Gnostic) খৃষ্টান সম্প্রদায় 'মারসিওনীয় সম্প্রদায়ের[১] বর্ণনায় বলেন : "এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পরে যীশু নরকে প্রবেশ করেন। তিনি নরক থেকে (ভ্রাতৃহন্তা) আদমপুত্র) কয়িনকে এবং (সমকামী) সদোমবাসীদেরকেও মুক্ত করেন। কারণ তারা তাঁর কাছে এসেছিল এবং তারা অমঙ্গলের স্রষ্টা ঈশ্বরের আনুগত্য করতো না। পক্ষান্তরে যীশু (নিহত আদমপুত্র) হেবল, নোহ, অবরাহাম ও অন্য সকল প্রাচীন ভাববাদী ও সৎ মানুষকে নরকের মধ্যে রেখে আসেন। কারণ এরা প্রথম দলের মানুষদের বিরোধিতা করেছিল। এই সম্প্রদায় বিশ্বাস করত যে, যে ঈশ্বর যীশুকে প্রেরণ করেছিলেন তিনিই বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা নন (বরং বিশ্বের স্রষ্টা দু'জন : মঙ্গলের স্রষ্টা ঈশ্বর ও অমঙ্গলের স্রষ্টা ঈশ্বর)। এজন্য তারা পুরাতন নিয়মের কোন গ্রন্থকেই ঐশ্বরিক প্রেরণা-লব্ধ বলে বিশ্বাস করত না।"

১. অধ্যাত্মবাদী গুরু মারসিওনের (Marcion) অনুসারী।

এভাবে আমরা দেখেছি যে, এই খৃস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাসের মধ্যে কয়েকটি বিষয় রয়েছে :

প্রথমত, যীশুর নরক গমনের পূর্ব পর্যন্ত সকল ভাববাদী, সৎ মানুষ ও পাপীর আত্মা নরকে শাস্তি ভোগ করছিল।

দ্বিতীয়ত, যীশু নরকে গমন করেন।

তৃতীয়ত, যীশু পাপীদের আত্মাগুলিকে নরক থেকে মুক্ত করেন এবং পাপীগণ যীশুর পক্ষে।

পঞ্চমত, বিশ্বের স্রষ্টা দু'জন ঈশ্বর : মঙ্গলের স্রষ্টা ও অমঙ্গলের স্রষ্টা। যীশু প্রথম ঈশ্বরের প্রেরিত দূত এবং অন্য সকল প্রসিদ্ধ ভাববাদী দ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রেরিত দূত ছিলেন।

ষষ্ঠত, পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলি ঐশ্বরিক নয়।

মীযানুল হক গ্রন্থের প্রণেতা পাদ্রী ফান্ডার তাঁর লেখা 'হাল্লুল ইশকাল ফী জাওয়াবি কাশফিল আসতার' (পর্দা-উন্মোচন গ্রন্থের উত্তরে আপত্তির সমাধান) নামক পুস্তকে লিখেছেন : "এ কথা সত্য, খৃস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে যে, যীশু নরকে প্রবেশ করেছিলেন এবং তৃতীয় দিনে উত্থিত হন এবং স্বর্গারোহণ করেন। কিন্তু এখানে নরক বলতে 'হাউস' (House) বুঝানো হয়। এ হলো নরক ও মূল আকাশের মধ্যবর্তী স্থান। এর অর্থ হলো, নরকবাসীদেরকে তাঁর মহত্ত্ব প্রদর্শন করতে এবং 'আমিই জীবনের মালিক এবং আমি ক্রুসে মৃত্যুর মাধ্যমে পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রদত্ত হয়েছি এবং আমি শয়তান ও নরককেও পরাভূত করেছি, বিশ্বাসীদের জন্য তারা অস্তিত্বহীনের মত হয়ে গিয়েছে' এ কথার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তিনি নরকের হাউসে প্রবেশ করেন।"

মি. ফান্ডারের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য নিম্নরূপ :

প্রথমত, খৃস্টীয় প্রার্থনা পুস্তকের বক্তব্য ও ফিলিপস কোয়াডনলস-এর বক্তব্য থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, 'জাহান্নাম' বা 'নরক' বলতে মূল নরককেই বুঝানো হয়েছে। এথানাসিয়াস (Athanasius)-এর ধর্মীয় বিশ্বাস-তত্ত্বের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, 'নরক' তার প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত। মি. ফানডার নিজেও স্বীকার করেছেন যে, খৃস্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে যীশুর নরকবাসের কথা রয়েছে। এরপর তিনি তা ব্যাখ্যা করেছেন। কাজেই প্রমাণ ছাড়া তাঁর ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর নিজের ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য থেকে তাঁকে প্রমাণ করতে হবে যে, জাহান্নাম ও মূল আসমানের মধ্যে একটি স্থান রয়েছে যাকে 'হাউস' বলা হয়। এরপর তাঁকে প্রমাণ করতে হবে যে, যীশুখৃস্ট শাস্তিভোগের জন্য নয়, বরং তাঁর দাবিকৃত মহত্ত্ব 'প্রদর্শন' ও 'দৃষ্টি আকর্ষণ' করার জন্যই নরকে প্রবেশ করেছিলেন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ইউরোপের বিজ্ঞানীদের মতে আসমানেরই অস্তিত্ব নেই। আধুনিক যুগের প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণ এ

বিষয়ে এ সকল বিজ্ঞানীর মতের অনুসরণ করেন। কাজেই তাঁর এ ব্যাখ্যা তাদের নিজেদের বিশ্বাস অনুসারেই সঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত, এই তথাকথিত 'হাউস'টি কি পুরস্কার ও আনন্দের নিবাস? না কি কষ্ট ও শাস্তির নিবাস? যদি 'হাউস'টি আনন্দের স্থল হয়ে থাকে তবে সেখানে গিয়ে সেখানে অবস্থানকারীদের 'দৃষ্টি আকর্ষণের' কোন প্রয়োজন নেই; কারণ তারা তো আগে থেকেই সুখ, আনন্দ ও পরিতৃপ্তির মধ্যেই ছিলেন। আর যদি তা কষ্ট ও শাস্তির নিবাস হয় তবে এই ব্যাখ্যা অর্থহীন। কারণ এটিও নরকের অংশ এবং শাস্তিভোগের জন্যই তথায় গমন করতে হয়।

তৃতীয়ত, ক্রুসবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত লাভ করার বিষয়টি নিঃসন্দেহে একটি উদ্ভট ও অযৌক্তিক কথা। কারণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলতে তারা আদম সন্তানদের পাপ বুঝান না, বরং তারা এখানে পাপ বলতে মূল পাপ (Original sin) অর্থাৎ আদম কর্তৃক নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের পাপ বুঝান। আর আদমের পাপে তাঁর সন্তানদের শাস্তি হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। পিতার পাপের জন্য কখনোই সন্তানদেরকে জবাবদিহি করা যায় না, যেমন পুত্রের পাপের জন্য পিতাকে জবাবদিহি করা যায় না। নিঃসন্দেহে এইরূপ করা বে-ইনসাফি ও যুলুম।

যিহিষ্কেল পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ে ২০ আয়াতে বলা হয়েছে : "যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে; পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না; ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না; ধার্মিকের ধার্মিকতা তাহার উপর বর্তিবে, ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার উপর বর্তিবে।"

চতুর্থত, মৃত্যুর মাধ্যমে শয়তানকে পরাজিত করার অর্থ কী? বাইবেলের নতুন নিয়মের বর্ণনা অনুসারে যীশুর জন্মের পূর্ব থেকেই শয়তান অনন্তকালীন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যিহূদার পত্রের ৬ আয়াতে বলা হয়েছে : "আর যে স্বর্গদূতেরা আপনাদের আধিপত্য রক্ষা না করিয়া নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি মহাদিনের বিচারার্থে ঘোর অন্ধকারের অধীনে অনন্তকালীন শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়াছেন।" যারা পূর্ব থেকেই পরাজিত ও 'অনন্তকালীন শৃঙ্খলে আবদ্ধ' তাদেরকে আবার মৃত্যুর মাধ্যমে কিভাবে পরাজিত করা হলো?

আরো অবাক বিষয় হলো, খৃস্টানগণ তাদের কল্পিত ঈশ্বরের মৃত্যু ও নরকভোগেও পরিতৃপ্ত নয়, উপরন্তু তারা আরো বাড়িয়ে বলে যে, তিনি অভিশপ্ত হয়ে যান (না'উযু বিল্লাহ!)। যীশুর অভিশপ্ত হওয়ার বিষয়টি খৃস্টানদের নিকট সর্বজনস্বীকৃত বিষয়। মীযানুল হক গ্রন্থের প্রণেতা (মি. ফানডার) হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রশান্তি ও তৃপ্তির সাথে তা মেনে নিয়েছেন। তাঁর পুস্তকাদিতে তিনি তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। খৃস্টানদের পবিত্র পুরুষ পৌল নিজেও তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

গালাতীয় ৩ অধ্যায়ের ১৩ আয়াতে পৌল লিখেছেন : "খ্রীষ্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি আমাদের নিমিত্তে শাপস্বরূপ হইলেন; কেননা লেখা আছে, যে ব্যক্তিকে গাছে টাঙ্গান যায় সে শাপগ্রস্ত।"

আমরা মনে করি, এরূপ শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত ঘৃণ্য। উপরন্তু তোরাহ-এর বিধান অনুসারে ঈশ্বরকে অভিশাপদানকারীকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা জরুরী। মোশির যুগে এক ব্যক্তিকে ভুলক্রমে এরূপ কাজ করার কারণে পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছিল। লেবীয় পুস্তকের ২৪ অধ্যায়ে তা বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।"[১] ঈশ্বরকে অভিশাপকারীই শুধু নয়, উপরন্তু পিতামাতার অভিশাপকারীকেও হত্যা করা জরুরী। লেবীয় পুস্তকের ২০ অধ্যায়ে তা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

সপ্তম বাক্য : যোহনলিখিত সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ের ১৭ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, মগ্দলীনী মরিয়মকে সম্বোধন করে যীশু বলেন : "আমাকে স্পর্শ করিও না, কেননা এখনও আমি ঊর্ধ্বে পিতার নিকটে যাই নাই; কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে আমি ঊর্ধ্বে যাইতেছি।"

এখানে যীশু ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর নিজেকে অন্য সকল মানুষের সমান বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : "যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর"। তাঁর একথা বলার উদ্দেশ্যই হলো যেন মানুষ তাঁকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাঁকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র বলতে না পারে। তিনি সুস্পষ্টভাবে বললেন যে, তাঁর শিষ্যরাও তাঁরই মত ঈশ্বরের পুত্র। অর্থাৎ তারাও যেমন ঈশ্বরের প্রকৃত পুত্র নয়, বরং রূপক অর্থে 'আল্লাহর বান্দা' অর্থে ঈশ্বরের পুত্র, তিনিও ঠিক তেমনি রূপক অর্থে 'আল্লাহর বান্দা' অর্থে ঈশ্বরের পুত্র, প্রকৃত অর্থে নন। ঈশ্বর যেমন তাদের সকলের ঈশ্বর, ঠিক তেমনিভাবে তিনি তাঁরও ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের দাস অর্থে ঈশ্বরের পুত্র।

এখানে লক্ষণীয় যে, খৃষ্টানদের বর্ণনা অনুসারে যীশু একথা বলেছেন মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পরে স্বর্গারোহণের কিছু আগে। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বর্গারোহণের পূর্ব পর্যন্ত আজীবনই তিনি নিজেকে 'আল্লাহর বান্দা' বা 'ঈশ্বরের দাস' বলে উল্লেখ করেছেন ('ঈশ্বরের পুত্র' পরিভাষাটি এই অর্থেই ব্যবহৃত করেছেন)। এর সাথে কুরআনের বর্ণনা মিলে যায়। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যীশু আল্লাহকে বলবেন " "তুমি আমাকে যে আদেশ করেছিলে তা ব্যতীত আমি কিছুই বলি নি; তা এই : তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত কর... ।"[৩]

১. লেবীয় ২৪/১০-১৭।

২. লেবীয় ২০/৯। আরো দুখুন : যাত্রাপুস্তক ২১/১৫ ও ১৭।

৩. সূরা ৫ : মায়িদা, ১১৭ আয়াত।

এই বাক্যে যীশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করা হয়েছে; কারণ যীশু ঈশ্বর হলে অন্য কেউ তাঁর থেকে মহান হন কিভাবে? ঈশ্বরের চেয়ে মহান তো দূরের কথা, ঈশ্বরের সমকক্ষও কেউ হতে পারে না।

নবম বাক্য : যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ের ২৪ আয়াতে যীশুর নিম্নের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে : "আর তোমরা যে বাক্য শুনিতে পাইতেছ, তাহা আমার নয়, কিন্তু পিতার, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

এখানেও যীশু স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তিনি ঈশ্বর নন, বরং ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রেরিত 'রাসূল' মাত্র এবং তাঁর মুখ থেকে যে বাক্য তারা শুনেছে তা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহী অর্থাৎ প্রত্যাদেশ বা প্রেরণা।

দশম বাক্য : মথিলিখিত সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেন : "৯ আর পৃথিবীতে কাহাকেও 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিও না, কারণ তোমাদের পিতা এক জন, তিনি সেই স্বর্গীয়। ১০ তোমার 'আচার্য' বলিয়া সম্ভাষিত হইও না, কারণ তোমাদের আচার্য এক জন, তিনি খ্রীষ্ট।"

এখানে যীশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করা হয়েছে এবং তাঁর প্রেরিতত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। যীশু স্পষ্টতই বলেছেন, সকলের পিতা বা ঈশ্বর একজনই আর তিনি আচার্য বা শিক্ষক মাত্র।

একাদশ বাক্য : মথিলিখিত সুসমাচারের ২৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে : "তখন যীশু তাঁহাদের সহিত গেৎশিমানী নামক এক স্থানে গেলেন, আর আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি যতক্ষণ ঐখানে গিয়া প্রার্থনা করি, ততক্ষণ তোমরা এইখানে বসিয়া থাক। ৩৭ পরে তিনি পিতরকে এবং সিবদিয়ের দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, আর দুঃখার্ত ও ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। ৩৮ তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ত হইয়াছে; তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জাগিয়া থাক। ৩৯ পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক। ৪০ পরে তিনি সেই শিষ্যদের নিকটে আসিয়া দেখিলেন... ৪২ পুনরায় তিনি দ্বিতীয় বার গিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, হে আমার পিতঃ, আমি পান না করিলে যদি ইহা দূরে যাইতে না পারে, তবে তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক। ৪৩ পরে তিনি আবার আসিয়া দেখিলেন, ...৪৪ আর তিনি পুনরায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়া তৃতীয় বার পূর্বমত কথা বলিয়া প্রার্থনা করিলেন।"

উপরের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত যীশুর অবস্থা ও কথাবার্তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি ঈশ্বর ছিলেন না, বরং ঈশ্বরের দাস ও মানুষ ছিলেন। ঈশ্বর কি কখনো দুঃখার্ত, বেদনার্ত ও আকুল হতে পারেন? ঈশ্বর কি মৃত্যু বরণ করেন এবং অন্য

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন? ঈশ্বর কি অন্য ঈশ্বরের কাছে এভাবে আকুল আবেগ ও কাতরতা নিয়ে প্রার্থনা করেন? কখনোই নয়।

সর্বোপরি, খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে যীশু ঈশ্বর ছিলেন, তাঁর রক্ত দিয়ে বিশ্ববাসীকে নরক থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই তিনি দেহ গ্রহণ করে এই বিশ্বে এসেছিলেন। তাহলে এই দুঃখ, বেদনা ও আহাজারির অর্থ কী? আর সম্ভব হলে এই পানপাত্র দূরীভূত করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনারই বা অর্থ কী?

দ্বাদশ বাক্য : যীশুর অভ্যাস ছিল, তিনি যখন নিজের সম্পর্কে বলতেন তখন নিজেকে 'মনুষ্যপুত্র' (son of man) বলে উল্লেখ করতেন।[১] সুসমাচারগুলি বা প্রচলিত নতুন নিয়মের পুস্তকগুলি পাঠ করলে বিষয়টি খুবই সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ শুধু মথি লিখিত সুসমাচার থেকেই কয়েকটি স্থানের উল্লেখ করছি; ৮ অধ্যায়ের ২০ আয়াত, ৯ অধ্যায়ের ৬ আয়াত, ১৬ অধ্যায়ের ১৩ ও ২৭ আয়াত, ১৭ অধ্যায়ের ৯, ১২, ২২ আয়াত, ১৮ অধ্যায়ের ১১ আয়াত, ১৯ অধ্যায়ের ২৮ আয়াত, ২০ অধ্যায়ের ১৮ ও ২৮ আয়াত, ২৪ অধ্যায়ের ২৭ আয়াত, ২৬ অধ্যায়ের ২৪, ৩৫ ও ৬৪ আয়অত।

বাহ্যত মনুষ্য পুত্র মানুষ ছাড়া আর কিছুই হতে পারেন না।

---

১. হিব্রু বা সেমিটিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভু অর্থে ঈশ্বরকে 'পিতা' বলার প্রচলন ছিল। তেমনিভাবে মানুষদেরকে বা ঈশ্বরের প্রিয় মানুষদেরকে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলার প্রচলন ছিল। এই অর্থে যীশুও ঈশ্বরকে পিতা বলতেন। তবে মানুষ যেন অতি ভক্তির কারণে তাঁকে প্রকৃত অর্থে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে শিরক বা অংশীদারিতায় নিপতিত না হতে পারে, এজন্য তিনি নিজেকে সর্বদা 'মনুষ্য পুত্র' বলে আখ্যায়িত করতেন (অনুবাদক)।

ইফাবা (উন্নয়ন)/২০০৭-২০০৮/অ. স./৪৬৭১-৩২৫০